সমরেশ মজুমদার

ছ'টি রোম্যান্টিক উপন্যাস

19,
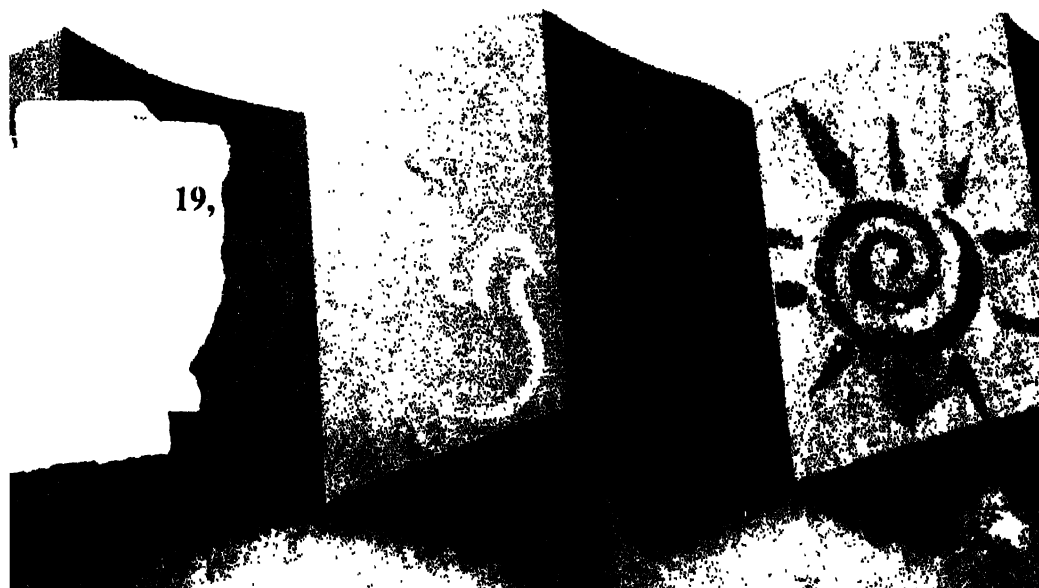
ছ'টি রোম্যান্টিক উপন্যাস

ছ'টি রোম্যান্টিক উপন্যাস

সমরেশ মজুমদার
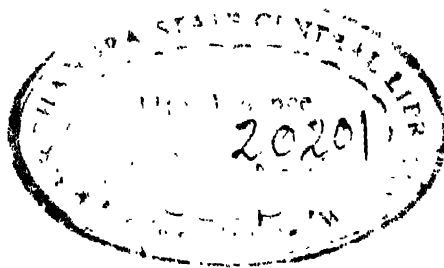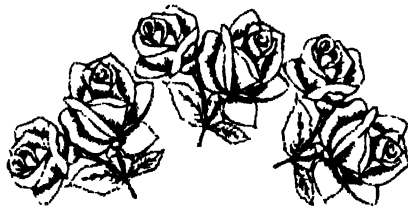
দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

CHHATI ROMANTIC UPANYAS
A Collection of Romantic Novels *by* SAMARESH MAJUMDER
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041

Rs. 350.00

ISBN 978-81-295-0982-6

প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত

৩৫০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং : লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

অধ্যাপক আনিসুজ্জমান
শ্রদ্ধাস্পদেষু

মিনিবাস থেমে নেমে জায়গাটা মোটেই পছন্দ হল না ভাস্করের। বাঁদিকটা মিনি বড়বাজার, সামনে গাড়ির জট পাকানো আবহাওয়া। ডানদিকে তাকালে একটা খেলার মাঠ দেখা যায় বটে তবে সেটা অযত্নে রাখা। খানিকটা নিচে পাহাড় কেটে বড় মাঠ তৈরি যিনি করেছিলেন তাঁর চেষ্টাকে শ্রদ্ধা জানানোর বাসনা এখনকার কারও নেই। চারপাশের বাড়িঘর দোকনপাটও খুব পুরনো চেহারার।

অথচ সেবক ব্রিজ পেরিয়ে ডানদিকে কালিঝোরা বাংলোকে রেখে উঠে আসবার সময় থেকেই মন প্রফুল্ল হচ্ছিল। এদিকে কখনই আসা হয়নি ভাস্করের। ডানদিকে খরস্রোতা তিস্তা আর চমৎকার ঝিমধরা পাহাড় দেখতে দেখতে বারংবার মনে হচ্ছিল দার্জিলিংয়ের পথের চেয়ে এর চেহারা-চরিত্র আলাদা। অথচ বাসটার্মিনাসে নামার পর তার মন খারাপ হয়ে গেল। একটা ঘিঞ্জি এলাকা ছাড়া কিছু ভাবা যাচ্ছে না।

কিন্তু শীত পড়েছে জব্বর। এখন কলকাতায় ঘাম ঝরছে আর এখানে মনে হচ্ছে স্লিভের বদলে পুরোহাতা কিছু থাকলে ভাল হত। আর বিকেল তিনটেয় যদি এই অবস্থা হয় তাহলে সন্ধের পর ঘরের বাইরে পা দেওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

মিনিবাসের ছাদ থেকে মালপত্র নামানো হলে ভাস্কর তার সুটকেস তুলে নিল। তিনটে লোক ছুটে এসেছিল মাল বইবার জন্যে কিন্তু ভাস্কর তাদের হঠিয়ে দিল। ভাস্কর জানে সে বিরক্তিভরে কিছু বললে যারা জ্বালাতন করতে আসে তারা সব সরে যায়। হয়তো তার চেহারা এবং কণ্ঠস্বরে এমন একটা ব্যাপার আছে—কোনও দালাল বা পাণ্ডা তাকে ঘাঁটাতে চায় না।

ভাস্কর লম্বায় ঠিক ছয় ফুট। শরীরে সামান্য মেদের প্রলেপ থাকায় লাবণ্য আছে, ব্যায়ামবীরদের মত কাঠ-কাঠ ভাবটা নেই। কিন্তু তার চওড়া বুক, সরু কোমর এবং সুগঠিত হাত দেখলে বোঝা যায় শুধু ঈশ্বরের দান নয়, ওই শরীর-নির্মাণের পেছনে অধ্যবসায় আছে। মজার ব্যাপার, ঝামেলাবাজ মানুষেরা তাকে দেখেই বুঝতে পারে সুবিধে হবে না।

সুটকেসটা ভারী কিন্তু অসুবিধে হচ্ছিল না ভাস্করের। তিনটে জায়গায় সে উঠতে পারে। সার্কিট হাউস, টুরিস্ট লজ অথবা---। না, অন্য কোথাও তাকে উঠতে হবে আজ। সে যে এসেছে এখানে তা যত কম লোক জানতে পারে তত ভাল। শহরটাকে ভাল করে দেখে-শুনে তারপর আত্মপ্রকাশ করা যাবে।

বাজারের গায়েই সাইনবোর্ডটা নজরে এল, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা লজ'।

এখানেই ওঠা যাক। ভাস্কর স্থির করল একটা অ্যাটাচড় বাথ আর পরিষ্কার বিছানা যদি থাকে তাহলে এই হোটেলেই আজকের রাতটা কাটানো যাক। সিঁড়ি ভেঙে ঘরে ঢুকতে সে কাউন্টারের গায়ে অলস ভঙ্গিতে বসে থাকা এক বৃদ্ধাকে দেখতে পেল। বৃদ্ধার শরীরে টিবেটিয়ান পোশাক। ওকে দেখে যে হাসি ওঁর ঠোঁটে ফুটল তা শুধু মায়েদের মুখেই দেখা যায়।

ভাস্কর জিজ্ঞাসা করল, সিঙ্গল রুম, অ্যাটাচড় বাথ, খালি আছে?

বৃদ্ধা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। তারপর হিন্দিতে বলল, পঞ্চাশ টাকা করে লাগবে। একদিনের ভাড়া অ্যাডভান্স। খারাপ মেয়েছেলে ভাড়া করে রাত্রে শোওয়া চলবে না। বাস।

ভাস্করের চোখে কৌতুক চলকে উঠল, ব্যাপারটা নতুন শুনছি। আমি যাকে আনছি যে খারাপ না ভাল তা বুঝবে কী করে?

আমি ঠিক বুঝতে পারি।

এই নিয়ম এখানকার অন্য হোটেলে চালু আছে?

মাথা খারাপ! তাহলে ওরা ব্যবসা করে খাবে কী করে?

তুমি ব্যবসা করতে চাও না?

আমার পেট ভরে গেলে হল। আমি আর আমার নাতনী, দুটো মাত্র পেট, তার জন্যে নোংরা ঘাঁটব কেন?

খাতায় নিজের নাম সই করার আগে যে দ্বিধা ছিল তা কাটিয়ে উঠল সে এক পলকেই। মিথ্যা কথা লেখার কী দরকার? এই মুহূর্তে এই শহরে কেউ তাকে চিনবে না। চাবি নিয়ে সে দোতলার যে ঘরটায় উঠে এল সেটা মোটেই বড় নয়। এই হোটেলকে শ্যাবি বলার যথেষ্ট কারণ আছে। এবং সম্ভবত সে ছাড়া অধিকাংশ বোর্ডারই হয় টিবেটিয়ান নয় সিকিমিজ। একটা অপরিচ্ছন্ন গন্ধ করিডোরে পাক দিলেও ঘরের বিছানাপত্র মোটামুটি ছিমছাম। বাথরুমের দরজাটা খুলে ভাস্করের মনে হল এইটেই বোধ হয় হোটেলের শ্রেষ্ঠ ঘর। নইলে এই চেহারার হোটেলের বাথরুমের অবস্থা এতটা ভদ্র হত না। শুধু ওপবের জানালাটা বেশ নড়বড়ে। জোরে হাওয়া দিলেই বোধ হয় খুলে পড়বে। ভাস্কর আবার ঘরে ফিরে এল। তারপর জুতোসুদ্ধ বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। এই শহরের অনেক প্রশংসা শুনেছে সে এতকাল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পর্যন্ত নানান প্রশংসাবাক্য লেখা হয়েছে। নিশ্চয়ই এই বাজার এলাকাই সমস্ত শহর নয়।

ঠিক এই সময় বন্ধ দরজায় জোর আঘাত শুরু হল। কেউ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে দমাদম কয়েকটা লাথিও কষিয়ে দিল ওপাশের কাঠে। ভাস্কর উঠল। তারপর আচমকা দরজার পাল্লা হাট করে খুলে দিতেই একটা লোক হুড়মুড়িয়ে ভেতরে ঢুকে টেবিলে প্রচন্ড ধাক্কা খেল ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলার জন্যে। লোকটার হাতে কয়েকটা প্যাকেট ছিল, সেগুলো ছিটকে গেল এদিক-ওদিকে।

ততক্ষণে ধাতস্থ হয়েছে লোকটা। ঘরটা দেখতে দেখতে বলল, সবি। আমি ভেবেছিলাম আমার রুম। রুমমেট মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করছে বলে দরজা খুলছে না। শালা মালের ঘোরে ঘর বদলে ফেলেছি। মার্জনা করবেন দাদা। দুটো হাত জোড় করল লোকটা।

প্রচণ্ড ক্রোধ শরীরে জন্ম নিয়েছিল, অনেক কষ্টে সংবরণ করল ভাস্কর। লোকটা রোগা, শরীর-ভর্তি গরম জামা সত্ত্বেও সেটা বোঝা যায়, এই বিকেলেই মাঙ্কি ক্যাপ সেঁটেছে মাথায় এবং ভালরকম মদ পেটে পড়েছে ওর। এই অবস্থায় ঘর পাল্টে ফেলা অসম্ভব নয়। সে চাপা গলায় বলল, বসুন!

বসব? রং নাম্বার হয়ে যাওয়ার পরও বসব?

রং নাম্বাব?

ঘবের নম্বর। পাশাপাশি। অন্য ঘর হলে ছাতু হয়ে যেতাম এতক্ষণে, আপনি তবু বসতে বলছেন! সব মাইরি হেভি চেহারার টিবেটিয়ান বোর্ডাব। শুধু আমার রুমমেট বাঙালি, অত্যন্ত নোংরা লোক।

পড়ে যাওয়া প্যাকেটগুলো তুলে লোকটার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ভাস্কর জিজ্ঞাসা করল, আপনার বন্ধু?

না না। এখানে এসে আলাপ। আমি আজ রুম চেঞ্জ করব বলে ঠিক করেছিলাম, আর পারা যাচ্ছে না।

কেন? ভাস্করের মজা লাগছিল ওর কথা বলার ধরন দেখে। একটু খেঁকুড়ে কিন্তু মনে হচ্ছে সরল।

আরে মশাই, রোজ ঘরে ঢুকে দেখি আমার বিছানায় মাথার ক্লিপ চুলের ফিতে পড়ে আছে। কাকে কী বলব? চেপে যেতাম। কাল রাত্রে শুতে গিয়ে নাকে সুড়সুড়ি লাগল। হাত দিয়ে দেখলাম ইয়া লম্বা একটা চুল, তাতে আবার সুবাসিত তেলের গন্ধ। আর পারলাম না। বলে ফেললাম। তিনি বললেন, তাঁর শিষ্য-শিষ্যারা আসেন, বসার জায়গা কম বলে আমার খাটটাকে ব্যবহার করেন। আমি যেন কিছু মনে না করি! বুঝুন! কথাগুলো একটানা বলে সোজা হয়ে বসতেই একটা হেঁচকি উঠল।

ভাস্কর হাসল, হোটেলের মালিকানকে জানান। তিনি বলেছেন বাজে মেয়েদের এখানে ঢোকা নিষেধ। তাহলে এরা আসছে কি করে?

বাজে মেয়ে নয়তো। শিষ্যা। পঞ্চাশ বছরের গুরুদেব হোটেলে বসে আছেন আর শিষ্যারা আসছে একের পর এক। না চলি, দেখি ঘর খালি হল কিনা। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে ভাস্কর তাকে বাধা দিল, আর একটু বসুন। কী করেন আপনি? মানে আপনার পরিচয় এখনও জানা হয়নি।

শাজাহান সেন। স্রেফ বেড়াতে এসেছি এখানে। চাকরি একটা মার্চেন্ট ফার্মে। একান্নবর্তী পরিবার। সেখানে বাস করে মাল খাবার সুযোগ পাই না। মা জীবিতা আছেন, খুব কনজারভেটিভ পরিবার। বছরে দশদিনের জন্য ছিটকে বেরিয়ে এই জায়গায় এসে চুটিয়ে মাল খেয়ে যাই। এখানে মাল খাওয়ার ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। মশাই-এর নাম?

দুনম্বর হেঁচকিটা এবার উঠল।

ভাস্কর চ্যাটার্জি। সেলস্-এ কাজ করি। কিন্তু শাজাহানবাবু, আপনার নামের সঙ্গে সেন উপাধি একটু গোলমেলে লাগছে না?

মোটেই না। আমার মায়ের প্রিয় কবিতা ছিল রবীন্দ্রনাথের শাজাহান। আমি হিন্দু মুসলিম ব্যাপারের উর্ধ্বে। মায়ের প্রিয় কবিতার নামে আমার নামকরণ।

শাজাহান সামান্য টলছিল। কিন্তু সে যে মদ্যপান করেছে এটা কিছুতেই বোঝাতে চাইছিল না। যদিও ওর কথা জড়ানো তবু বুঝতে অসুবিধে হয় না। ভাস্করের ভাল লাগছিল লোকটাকে। বলল, চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি। নইলে আবার কার ঘরে ধাক্কা দিয়ে বিপদে পড়বেন।

শাজাহান ঘাড় ঘুরিয়ে ভাস্করকে দেখল, আপনি মানুষটা তো দেখছি বেশ ভাল। বেশ, চলুন।

শাজাহানকে ধরতে হল না। ওর পায়ে এখনও বেশ শক্তি আছে। আসলে ভাস্করের খুব ইচ্ছে করছিল গুরুদেবটিকে দেখতে। সুযোগটাকে কাজে লাগাল সে।

শাজাহানবাবুর ঘরের দরজা বন্ধ। ভাস্কর বাইরে থেকে খুব ভদ্রভাবে আওয়াজ করল। কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়া এল না।

শাজাহান চাপা গলায় বলল, কেসটা বুঝতে পারছেন? আমার ঘর অথচ আমাকে তীর্থের কাকের মতো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে!

তৃতীয়বার আঘাতের পর দরজা খুলল। অত্যন্ত বিরক্ত ভঙ্গিতে একটা শুঁটকো চেহারার লোক ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, কি, ইয়ার্কি হচ্ছে? যে-ই যায় সে-ই একবার দরজায় শব্দ করে। গুরুদেব একটু শান্তিতে সাধনা করবেন তার উপায় নেই। ও আপনি! তা আপনার এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কী প্রয়োজন পড়ল? বললাম না, দূরবীন দাঁড়া পর্যন্ত বেড়িয়ে আসুন!

সন্ধে হয়ে এসেছে যে। তারপর মাইরি ঠাণ্ডাটাও। বাইরে ঘুরতে পারলাম না।

শাজাহানের কণ্ঠস্বর হঠাৎ একদম পাল্টে গেল যেন। মিনমিন করছে।

আসুন।

শাজাহান ভেতরে পা বাড়ানো মাত্র দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ভাস্কর বুঝতে পারছিল না কী করবে। সে শাজাহানের সঙ্গে এসেছে এখানে। ঘরটার অর্ধেক অধিকার শাজাহানের। অতএব সে ওর অতিথি হিসেবে ঢুকতেই পারে ঘরে। কিন্তু লোকটা এখানে আসা মাত্র অমন পাল্টে গেল কেন? যেন খুব ভয় পাচ্ছিল সামান্য প্রতিবাদ করতে। তাছাড়া লোকটা তাকে দেখা সত্ত্বেও মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল। ব্যাপারটা অত্যন্ত অপমানজনক হলেও ভাস্কর মত পাল্টাল। ঠিক এখনই ঘরে ঢোকা উচিত হবে না। শাজাহানবাবুর সঙ্গে যখন আলাপ হয়েছে তখন যে-কোনো সময় ওর খোঁজে হাজির হওয়া যাবে। নিজের ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে এল ভাস্কর। কাউন্টারে সেই বৃদ্ধার হাতে এখন জপের মালা। মালা ঘোরাতে ঘোরাতেও ভদ্রমহিলা যে আড়চোখে তাকে দেখে নিলেন তা টের পেল সে।

পাহাড়ি শহরগুলোর একটা চরিত্রগত মিল আছে। বিকেলের ছায়া ঘন হলেই চারপাশ কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হয়। একটা অদ্ভুত মায়াবী কিন্তু গা-ছমছমে ভাব প্রতিটি পথের বাঁকে ওৎ পেতে থাকে। বাজার এলাকা এবং বাসস্ট্যান্ড গায়ে গায়ে। সেটা পেরিয়ে ওপরের রাস্তায় উঠে আসতেই মন ভাল হয়ে গেল ভাস্করের। চমৎকার সুন্দর সাজানো রাস্তার দুপাশে দোকান। এই দোকানগুলো নিশ্চয়ই ট্যুরিস্টদের জন্যে। রাস্তাটায় একটা কুটো পড়ে নেই। সামান্য এগতেই একটা তেমাথা পেল সে। তেমাথার পাহাড়ের গায়ে সুন্দর একটা ম্যাপ এঁকে শহরের কোথায় কি আছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভাস্কর ম্যাপটার সামনে দাঁড়াল। দূরবীন দাঁড়া নামের জায়গাটা এখান থেকে অনেক দূরে। অথচ সেখানেই শাজাহানকে পাঠাচ্ছিল লোকটা। নির্ঘাৎ ওদের সময় প্রয়োজন ছিল। শাজাহানকে ওরা এখনই ঘরে রাখতে চাইছিল না। তারপরেই ভাস্করের খেয়াল হল, শাজাহান বলেছিল সে ছাড়া আর একজন ওই ঘরে থাকে যে নাকি গুরুদেব। তাহলে ওই সিড়িঙ্গে-মার্কা লোকটা কে? ওটাকে তো কখনই গুরুদেব বলে মনে হয় না। ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হেসে ফেলল ভাস্কর। খামোকা সে শাজাহানকে নিয়ে চিন্তা করে যাচ্ছে। এইজন্যে তো সে এখানে আসেনি। শাজহানের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সামান্য আগে। ওকে একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে যাচ্ছে।

ম্যাপের ওপর কয়েকবার চোখ বোলাবার পর শহরটা মাথায় বসে গেল।

কয়েক পা হাঁটাহাঁটি করা মাত্র সন্ধে নামল অসাড়ে। বোঝা গেল আশে-পাশের দোকানে আলো জ্বলে ওঠায়। এই রাস্তায় প্রতিটি দোকান চমৎকার সাজানো এবং টিবেটিয়ান বা সিকিমিজ সেল্‌সম্যান কাউন্টারে। দোকানপাটের এলাকাটা পার হতেই চোখ জুড়িয়ে গেল ভাস্করের। এই শহরটাকে কেন এত সুন্দর বলা হয় তা মুহূর্তেই পরিষ্কার হয়ে গেল। এ-পাহাড় থেকে সে-পাহাড় যেখানেই শহরটা গড়িয়েছে সেখনেই টুকরো টুকরো আলোর হিরে জ্বলছে। আর কি নয়ন-ভোলানো ভ্যালি। এই আবছা আলোয় আরও মায়াবী মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা মাথায় রেখে হাঁটতে লাগল ভাস্কর। দুপাশে লম্বা দেওদার গাছ। অন্য পাহাড়ি শহরের সঙ্গে এর পার্থক্য এটাও। প্রচুর গাছ দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে গার্ড অফ অনার দেবার ভঙ্গিতে।

ক্রমশ পথ আরও নির্জন হয়ে গেল। এবং নিচের জঙ্গলের মাথায় একটা প্রায় গোল চাঁদ আবদারের ভঙ্গিতে উঠে বসল। পায়ের তলায় চাঁদ, কবি হলে বোধ হয় এমনটা বলা যেতে পারত।

রাস্তায় নাম ক্লিন হার্ট রোড। নির্মল হৃদয় সরণি। চমৎকার রাস্তাই। এদিকের বাড়িগুলোও লাগোয়া নয়, একটার সঙ্গে আর একটার ফারাক বেশ। এর গেট থেকে মূল বাড়ির প্রভেদ অনেকটা। প্রত্যেকটা বাড়ির গেটে ইংরেজিতে লেখা হয়েছে—কুকুর থেকে সাবধান। এই রাস্তায় সেই বাড়ির মালিকান থাকেন কিন্তু কোন বাড়ি তা ঠাওর করা যাচ্ছে না। রাস্তায় লোক নেই যে প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া যাবে তার কাম্য বাড়ি কোনটি। গেটে কোনো নম্বর নেই। ঠিক এই সময় পেছনে মোটরবাইকের আওয়াজ উঠল। ভাস্কর স্বস্তি পেল। যদি এই শহরের বাসিন্দা হন, নিশ্চয়ই হবেন, নইলে সন্ধের পর এমন অঞ্চলে বাইক চালাতেন না। ভাস্কর দেখল নিচে রাস্তা বেয়ে এঁকে-বেঁকে মোটর বাইকটা ওপরে উঠে আসতে আসতে থেমে গেল। চালক একটা গেটের সামনে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে যেন আচমকাই মিলিয়ে গেল।

ভাস্কর ধীরে ধীরে ফিরে এল মোটর-বাইকটার কাছে। খুব দামী এবং শক্তিশালী বাইক। নাহলে এই পাহাড়ে এত স্বচ্ছন্দে ছুটতে পারত না। ঠিক তখনই গেট পেরিয়ে বাগান আর বাগান পেরিয়ে সুন্দর বাড়িটার একটা ঘরে আলো জ্বলে উঠল। ভাস্করের কেমন যেন অনুভূতিতে এল, এইটেই সেই বাড়ি। কিংবা বাড়িটা যদি অন্য কারো হয়, তাহলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে হদিস নিয়ে আসা যায় মহিলার বাড়ি কোনটি!

গেট খুলে ভেতরে ঢুকল ভাস্কর। চমৎকার গন্ধ ছিটোচ্ছে বাগানের ফুলগুলো। কিন্তু ভেতরে পা দেওয়া মাত্র একটা অদ্ভুত শিরশিরে নির্জনতা চেপে ধরল। ঝিঁঝি ডাকছে বিশাল গাছগুলো থেকে।পাহাড়ি এই গাছগুলোর একটা চরিত্র আছে। ঝিঁঝিগুলো তাদের সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে নেয়। ভাস্কর খালি বারান্দায় পা রাখতে যাচ্ছে তখনই গলাটা ভেসে এল। হিসহিসে তীক্ষ্ণ গলা, যাতে ঘেন্না এবং জ্বালা স্পষ্ট, আবার কী দরকার? তোমাকে আমি বলে দিয়েছি এখানে না আসতে!

মহিলার বয়স অনুমান করা মুশকিল কণ্ঠস্বর থেকে। কিন্তু বেশ কর্তৃত্ব আছে স্বরে। ভাস্কর বারান্দা থেকে পা নামিয়ে নিল। একটা রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সে ধীরে ধীরে ঘুরে জানলার পাশে এসে দাঁড়াল। জানালাটা বন্ধ, কাচের ভেতরে পর্দা আছে। এখান থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিল সে। ছেলেটি, সম্ভবত যে প্রবেশ করেছে, বাইক থেকে নেমে বলল, কিন্তু আমার যে না এসে উপায় নেই।

উপায় নেই মানে? কী বলতে চাও? মহিলাকণ্ঠ চিৎকার করে উঠল।

শীতল গলায় ছেলেটি বলল, গলা নামিয়ে কথা বলো। চিৎকার করে কেউ কথা বললে আমার সহ্য হয় না। তারপর হঠাৎ একটু হাসি জড়ানো সেই গলায়, তোমায় না দেখে থাকতে পারি না।

মিথ্যে কথা। একশো ভাগ মিথ্যে। তুমি টাকার ধান্দায় এসেছ।

টাকা! ছেলেটি আবার হাসল, হ্যাঁ, সেটাকেও ভালবাসি। তোমাকে তো নিয়ে যেতে পারব না বাইকে চাপিয়ে, ওটাকে পারব, দাও।

আমি আর টাকা দিতে পারব না.

দিতে হবে।

সে রকম কোনো কথা ছিল না।

ছেলেটি হাসল, রাগ করলে তোমাকে খুব সুন্দর দেখায়। বিশেষ করে তোমার গজদাঁতটা। বিউটিফুল!

মেয়েটি বলল, আমি রাগ করতে যাব কোন্ দুঃখে?

ছেলেটি বলল. সত্যি রাগ করোনি, তাহলে দুটো হুইস্কি খাওয়াও।

মেয়েটি বলল, আগে বলো তুমি ব্ল্যাকমেইল করতে আসোনি?

ছেলেটি জানাল, সে-সব কথা পরে হবে। আগে হুইস্কি!

মেয়েটি বলল, ঠিক আছে।

ভাস্কর আর অপেক্ষা করল না। খুব সতর্ক পায়ে সে বাগান ছেড়ে রাস্তায় উঠে এল। কয়েক পা হাঁটতেই এক বৃদ্ধ দম্পতিকে সে এগিয়ে আসতে দেখল বাজারেব দিক থেকে। বৃদ্ধের হাতে ছড়ি, বৃদ্ধা তাঁর কনুই আঁকড়ে ধীরে ধীরে উঠে আসছেন। কাছাকাছি হতে ভাস্কর দেখল এঁরা বাঙালি নন। চেহারায় বিদেশি কিংবা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মনে হয়। তবে এই এলাকার বাসিন্দা তা বৃদ্ধের হাতে বাজারের ব্যাগ দেখে বোঝা যাচ্ছে। ভাস্কর ওঁদের সামনে দাঁড়িয়ে বিনীত গলায় জিজ্ঞাসা করল, এটাই ক্লিন হার্ট রোড, তাই না?

ইয়েস। বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে মাথা নাড়তেই বৃদ্ধা হাত ছেড়ে রুমালে মুখ মুছলেন। এই ঠান্ডায় যেন ওর মুখে ঘাম জমছিল।

মিসেস জুলি শেরিংয়ের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন? বৃদ্ধ একটু বিব্রত চোখে বৃদ্ধার দিকে তাকাতে জানালেন, দ্যাট টিবেটিয়ান লেডি। আই সি! বৃদ্ধর এবার মনে পড়ল, তুমি অনেকটা এগিয়ে এসেছ মাই বয়। ওই যে রাস্তাটা, যেখানে বাঁক নিয়েছে, তার গায়েই দেখবে শেরিংদের গেট। বাঁ-দিকের নিচের কটেজ। ওটা আগে ছিল মিটার হ্যারল্ড টমসনের। মাই ওল্ড ফ্রেন্ড। টমসন অস্ট্রেলিয়ার চলে যাওয়ার সময় শেরিংদের বিক্রি করে গেল। টমসন ছিল বিরাট পুলিস অফিসার আর শেরিংরা নাকি মদের দোকান চালায়। তাও কান্ট্রিলিকার।

ও জন, তুমি বড্ড বেশি কথা বলছ। বৃদ্ধা চাপা গলায় শাসন করতে বৃদ্ধ যেন সতর্ক হলেন, ওয়েল, নাইস টু মিট য়ু জেন্টলম্যান, গুড নাইট! ভাস্করকে ছাড়িয়ে টুক টুক করে ওরা উঠে গেলেন ওপরে।

না আর কোনো সন্দেহ নেই। সে জুলি শেরিংয়ের বাড়িতেই ঢুকে পড়েছিল। চটপট পায়ে সে পা চালাল শহরের দিকে। এর মধ্যে জম্পেশ অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। আজ আর কোন কাজ নয়। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে টেনে ঘুম। প্রথম দিনেই একটা নাটক শুনতে পাবে এমনটা কে আশা করেছিল!

সেই সুন্দর রাস্তায় এখনও দোকানপাট খোলা। তবে পথে তেমন মানুষজন নেই। আলো জ্বলছে তবে দার্জিলিংয়ের মত এখানে টুরিস্টদের ভিড় নেই। ভাস্করের মনে পড়ল তার হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। বাইরে যদি খেতে হয় তাহলে এখনকার কোনো রেস্তোরাঁতে খেয়ে যাওয়াই ভাল। ঘড়িতে এখন আটটাও বাজেনি। হঠাৎ তার সেই কান্ট্রিলিকার শপের কথা মনে পড়ল। আজ একবার সেখানে গেলে কেমন হয়? যদিও একটু আগে ঠিক করেছিল আজ আর কোনো কাজ নয়, তবু তাকে এখন দোকানটা টানছে, ওই নাটকটা শোনার জন্যেই হয়েতো। সে একটা পানের দোকানদারকে সিগারেট কেনার অছিলায় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল, আজ এই শহরে ড্রাই-ডে। সমস্ত মদের দোকান বন্ধ।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে হোটেলের দিকে ফিরছিল ভাস্কর। রাস্তাটা অন্ধকার। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে নামতে হয়। খানিকটা অন্যমনস্ক ছিল সে। তিন লক্ষ টাকার ইনসুরেন্স ক্লেইম করেছে জুলি শেরিং। লোকাল অফিস সেটাকে ফরোয়ার্ড করেছে কলকাতার অফিসে। মিস্টার শেরিং ভারতবর্ষে এসেছিলেন বাষট্টি সালে। চিন যখন তিব্বত দখল করল তখন যেসব টিবেটিয়ান এদেশে পালিয়ে আসেন নানারকম সঞ্চয় নিয়ে মিস্টার শেরিং তাঁদের মধ্যে একজন। প্রথমে আশ্রিত, তারপর

ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব পেয়ে যান ভদ্রলোক। এই শহরে এসে টিবেটিয়ান দেশি মদের একটা ভাল দোকান খুলে বসেন। আর খোলামাত্র ব্যবসাটা জমে উঠল তাঁর। এ সবই সম্ভব, ঠিক। কিন্তু সেই মানুষটা মরে গেলেই তিন লক্ষ টাকা ইনসুরেন্স কোম্পানির কাছে ক্লেইম পাঠানো হবে এবং কোম্পানি তা মেনে নেবে, এটা যেন একটু বেশি রকমের বাড়াবাড়ি। ব্যাপারটা তিরিশ হাজার হলে কোম্পানি গায়ে মাখত না। কিন্তু তিন লাখ বলেই কর্তাদের টনক নড়ছে। আর প্রিমিয়াম দেওয়া হয়েছে বড়জোর চারটে।

ফলে কোম্পানি একটা নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বিশাল পাহাড়ি অঞ্চলে যে সমস্ত ইনসুরেন্স ক্লেইমে রহস্যের গন্ধ থাকবে সেগুলোর সত্যতা যাচাই করা দরকার। এবং এই উদ্দেশ্যেই ভাস্করকে এখানে পাঠানো। ভাস্কর কোম্পানির গোয়েন্দা বিভাগের খুব নামকরা অফিসার। সন্দেহজনক দাবির কেস এই অঞ্চল থেকে গেছে পাঁচটি। প্রত্যেকটির সুরাহা করে ফিরতে কত সময় লাগবে কেউ জানে না। হয়তো ছয় মাস, কিংবা এক বছর। তবে ভাস্কর যে এখানে আসছে তা কোম্পানির লোকাল অফিস জানে না। সে নিজেই চায়নি ওরা আগে থেকে জেনে যাক। বলা যায় না, হয়তো সর্ষের মধ্যেই ভূত বিচরণ করছে!

দিনের বেলায় বাস-স্ট্যান্ডে যেরকম অভদ্র ব্যস্ততা থাকে এখন এই সন্ধে পেরনো সময়টায় তা নেই। কিছু মিনিবাস দাঁড়িয়ে আছে বটে, সেগুলোর আলো নেভানো এবং লোকজন নেই। এখনও শহরটাকে ভাল করে দেখা হয়নি কিন্তু অনুমানেই বলা যায়, এই জায়গাটা চোর বদমাস গুণ্ডাদের আরামের। কারণ এইখানেই পাঁচ মিশালি নিম্নবিত্ত মানুষেরা হল্লা করে কথা বলতে পারে। এখানে কোন রুচি বা শোভনতা ভ্রূ কুঁচকে থাকে না। একটা পান সিগারেটের দোকানের সামনের এসে দাঁড়াতেই ভাস্কর দেখতে পেল একটি অল্পবয়সী নেপালি ছেলে তাকে লক্ষ্য করছে। এই কি পেছন পেছন আসছিল? অন্ধকারে পায়ের আওয়াজটাকে ঠিক পাত্তা দেয়নি সে।

চট করে পানের দোকান ছেড়ে দিয়ে ভাস্কর ধারের রেলিংয়ে এসে দাঁড়াল। এখান থেকে নিচের খেলার মাঠটাকে নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছে।

এবং তখনই ভাস্কর টের পেল ছেলেটি তার দিকে এগিয়ে আসছে শব্দহীন পায়ে। আসুক। আসতে দাও। ভাস্কর তার শরীরের মাসল একটুও শক্ত করল না। যেন অত্যন্ত তন্ময় হয়ে সে আর্ট দেখছে। ঠিক তখনই কোমরে একটা ধারাল এবং তীক্ষ্ণ কিছু স্পর্শ করল এবং সেই সঙ্গে চাপা গলায় একটা হুমকি, জেবমে যো-হ্যায় নিকালো, নেহি তো খতম হো যায়েগা।

ভাস্কর হাসল। শব্দহীন। ছেলেটিকে নেহাৎই নভিস। নাহলে ওর আক্রমণটা একটু অন্য ধরনের হতো। সে ঠিক করল জবাব দেবে না। শুধু ওই তীক্ষ্ণ ছুরির উপস্থিতিটাই তার অস্বস্তি বাড়াচ্ছিল। ছেলেটি এবার চাপা হুঙ্কার দিল, নিকালো!

চকিতে ভাস্করের ডান গোড়ালি পেছনে উঠে গেল ততটাই যতটায় ছেলেটির তলপেটে আঘাত করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে কুঁক্ করে একটা শব্দ হল। এবং চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভাস্কর বাঁ হাতের পাশ দিয়ে দ্বিতীয় আঘাত করল ছেলেটির ধারাল ছুরি ধরা হাতে। সঙ্গে সঙ্গে ছুরিটা উড়ে গিয়ে পড়ল খানিকটা দূরের চাতালে। ছেলেটি তখন দাঁড়িয়ে টলছে। ওর দুটো পা এক জায়গায় নেই। ভাস্করের আফসোস হল, এই দ্বিতীয় আঘাতটা করার কোনো দরকার ছিল না। ছুরিটা হাতের মুঠো থেকে এমনিই খসে পড়ত।

ভাস্কর বাঁ হাত বাড়িয়ে ছেলেটির জামার কলার ধরল, তোর নাম কী?

ছেলেটি তখনও কথা বলার অবস্থায় ফিরে আসেনি। ভাস্কর ওকে এমন একটা ঝাঁকুনি দিল যে কিছু শব্দ ছিটকে এল মুখ থেকে। তা থেকে অন্তত এটুকু বোঝা গেল সে ক্ষমা চাইছে।

ভাস্কর ওকে ধরে নিয়ে গেল পানের দোকানের সামনে। দোকানদার এতক্ষণ বোবা চোখে দেখছিল। এখন মাথা নামিয়ে কাজের ভান করতে লাগল। ভাস্কর লোকটাকে জিজ্ঞাসা করে, একে তুমি চেনো?

ওদের দিকে না তাকিয়ে পানওয়ালা ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল। কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা গেল, আর বেশি কিছু বলতে সে নারাজ। ভাস্কর এবার ছেলেটিকে বলল, তুই কি এইসব করে বেড়াস?

ছেলেটি ততক্ষণে বোধ হয় খানিকটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছিল। খানিকটা জেদের ভঙ্গিতে সে ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

চাকরি-বাকরি করিস না?

কই মুঝে নোকরি নেহি দেতা।

জেলে গেছিস?

হ্যাঁ, তিনবার!

ভাস্কর এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিল। তাপর ওর জামাটা ছেড়ে দিল, যা ছুরিটা কুড়িয়ে নে। আমি ওই কাঞ্চনজঙ্ঘা লজে আছি। কাল খুব ভোরে আমার সঙ্গে দেখা করিস। তোর উপকার হবে।

ভাস্কর আর দাঁড়াল না। তবে সে অনুভব করছিল ছেলেটি তখনও সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো হতভম্ব হয়ে গেছে, এরকম শিক্ষাপ্রাপ্তি ওর বোধ হয় এই প্রথম।

কাঞ্চনজঙ্ঘা লজের রিসেপশনিস্টের ডেস্কটা এখন খালি। একজন বৃদ্ধ টিবেটিয়ান উল্টোদিকের চেয়ারে বসেছিলেন। তাঁর হাতের মালা ঘুরছে। নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াতে সেই বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একটা প্লেটে অদ্ভুত ধরনের খাবার নিয়ে তিনি বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। ভাস্কর তাঁকে দেখে মাথাটা সামান্য দোলাল। বৃদ্ধা আড়চোখে তাকে দেখে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। ভাস্কর সিদ্ধান্ত নিল, এই টিবেটিয়ানরা নিশ্চয়ই কম কথা বলে আর যা বিদঘুটে গন্ধ এখানে, কাল সকাল হলেই হোটেল পাল্টাতে হবে।

শাজাহান সেনের ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল সে। লোকটার খবর নেওয়া দরকার। তখন যেভাবে ঘরে ঢুকেছিল সেটা সুবিধের নয়। সে দরজায় নক্ করল। ভেতর থেকে কোনো উত্তর এল না। আরও দুবার নক্ করার পর সে জোরে দরজাটাকে ঠেলতেই সেটা খুলে গেল। এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না ভাস্কর। বাঁদিকে ডানদিকে চোখ বুলিয়ে সে দেখে নিল করিডোরে কেউ আছে কিনা, তারপর সামান্য নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরের ভেতর পা বাড়াল। সুন্দর ধূপের গন্ধ পাক খাচ্ছে ঘরে। এবং শাজাহান সেন উপুড় হয়ে পড়ে আছেন তাঁর খাটে। এছাড়া ঘরে আর কেউ নেই। ভাস্কর এগিয়ে গিয়েই বুঝতে পারল শাজাহান বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। এঁর এই ঘুম স্বাভাবিক নয়। সে মৃদু গলায় ডেকেও সাড়া পায়নি। অথচ শাজাহানের পিঠ নিঃশ্বাসের তালে দুলছে। দুবার আলতো করে চড় মারল সে শাজাহানের গালে। কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। ভাস্কর আর অপেক্ষা না করে দ্রুত বেরিয়ে এল। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিজের ঘরের তালা খুলল। আজ সন্ধে থেকে একটার পর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে। ঠান্ডা মাথায় সবকিছু তলিয়ে দেখতে হবে। পাশের যে ঘরে নাটক চলছে, তা জুলি শেরিংয়ের ঘটনার চেয়ে কম চমকপ্রদ নয়।
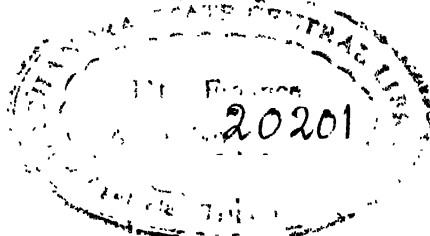
সকালটা এল টাটকা রোদ নিয়ে। কাচের জানালার বাইরে ঝকঝকে নীল আকাশ পাহাড়ের ওপর উপুড় হয়ে রয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ভাস্কর বেল টিপল। এরা খাবার না দিক, চা অন্তত দিতে পারে।

মিনিটখানেক বাদে একটি টিবেটিয়ান বালক দরজায় এসে দাঁড়াতে ভাস্কর হুকুমটা জানাল। ছেলেটা একটুও না হেসে চলে গেল। এবং তখনই দরজায় এল শাজাহান সেন, গুডমর্নিং! কেমন আছেন?

গুড মর্নিং! আসুন। কেমন আছেন? ভাস্কর স্বাভাবিক গলায় বলল।

আছি। ভাবছি আজই ফিরে যাব।

সে কি? কেন?

ওই ঘরে যা চলছে তারপর আর এখানে থাকা যায় না।

কী চলছে?

বলা নিষেধ।

অন্য হোটেলে যান।

অন্য হোটেলে গেলে আমায় শেষ করে দেবে শাসিয়েছে।

ভাস্কর এবার লোকটিকে ভাল করে দেখল। আপাতচোখে সরল বলেই মনে হয়। সে নিচু গলায় প্রশ্ন করল, ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলবেন? হয়তো আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

কোনো লাভ হবে না।

এই সময় চা নিয়ে ঢুকল ছেলেটি। শাজাহানকে এই ঘরে যেন একটু অবাক হল সে। তবে মুখে কিছু না বলে সে বেরিয়ে গেল। শাজাহান বলল, এইটে আর এক চীজ। চায়ে মুখ দেবেন না। শরীর গুলিয়ে উঠবে।

কেন?

টিবেটিয়ান চা। হতকুচ্ছিত খেতে। বিশ্বাস না হয় চুমুক দিয়ে দেখুন। চায়ের দিকে তাকিয়ে ভাস্করের মনে হল কথাটা সত্যি। সে উঠে দাঁড়াল, আপনার হাতে কোনো কাজ আছে?

না। এখানে তো কাজ করার জন্যে আসিনি। দুপুরে বাস ধরব। ততক্ষণ আমি ফ্রি। কেন, কিছু করতে হবে?

চলুন একটু বেড়িয়ে আসি। জায়গাটা আপনার চেনা। ভাল খাবারের দোকান কোথায় আছে দেখিয়ে দিন। শাজাহানের আপত্তি ছিল না। দরজায় তালা দিয়ে ভাস্কর বলল, আপনার ঘরে তালা দেবেন না?

শাজাহান মাথা নাড়ল, আমার রুমমেট ঘুমুচ্ছেন। দশ টাকা বেশি দিলে তখন আপনার সিঙ্গল রুমটা পেয়ে যেতাম। কিপ্টেমি করে যে কি ভুল করেছি!

বাইরে বেরিয়ে এসে ভাস্কর জিজ্ঞাসা করল কাল রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন?

খাওয়া-দাওয়া? কাল রাত্রে? আচমকা প্রশ্নে ঘাবড়ে গেল শাজাহান, হঠাৎ এইরকম প্রশ্ন করছেন কেন? আমি কি খুব বেশি মাল খেয়েছিলাম কাল রাত্রে? আমার না, বেশি মাল খেলে খাবার খেতে ইচ্ছে করে না!

আপনি কাল রাত্রে বেশি মদ খাননি। আর যখন ঘরে ঢুকেছিলেন তখন তো সন্ধে। নিশ্চয়ই গুরুদেবের সামনে মদ খাননি।

না, না। এইবার মনে পড়ছে। তাই বলি, এখন এত খিদে পাচ্ছে কেন? না, কাল রাত্রে কিছু খেয়েছি বলে মনে হচ্ছে না। চলুন ওই দোকানটায় চমৎকার চা করে। দেখছেন কেমন

গরম গরম জিলিপি ভাজছে! আহা, চোখ জুড়িয়ে যায়!

সকালবেলায় মিষ্টি খাওয়া ধাতে নেই ভাস্করের। সে চা এবং একটা বিস্কুট খেল। শাজাহান গোটা ছয়েক জিলিপি শেষ করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলল, স্টমাকটা একদম খালি হয়ে ছিল, প্রাণ জুড়োল।

ভাস্কর ঠাট্টা করে বলল, আপনি দেখছি অদ্ভুত মানুষ! রাত্রে মদ খান, ভোরে জিলিপি!

সিওর! আমার ডায়াবেটিস নেই, ব্লাডসুগার নেই, আমি খাব না কেন?

পাহাড় ভাঙতে ভাঙতে ভাস্কর জিজ্ঞাসা করল, কাল রাত্রে ঠিক কী হয়েছিল বলুন তো শাজাহানবাবু? আপনার হঠাৎ নেশা হয়ে গেল কি করে? যখন ঢুকলেন তখন তো সামান্যই ড্রিঙ্ক করেছিলেন, তাতে বেঘোর হবার কথা নয়! ভাস্কর একটু উস্কে দিতে চাইল।

কি হয়েছিল সত্যি আমার মনে নেই। ঘরে ঢুকে দেখলাম গুরুদেব শব-সাধনা করছেন। আমি ঢুকে পড়েছি বলে শিষ্যমহারাজ খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, এভাবে হুটপাট ঢুকে পড়বেন না। গুরুদেবের অর্চনায় বিঘ্ন হলে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে! গুরুদেব সেই অবস্থায় বললেন, বাক্‌সংযম কর বৎস। বরং ওকে প্রসাদ পাইয়ে দাও।

শিষ্যমহারাজ আমাকে মন্ত্রপূত কারণবারি পান করতে দিলেন। আমি দেখলাম নেশাটা জলো হয়ে এসেছিল, তাই সেটাকে জমাট করতে মেরে দিলাম পুরোটা। ব্যস, আর কিছু খেয়াল নেই। শাজাহান বিবৃতি শেষ করল।

ভাস্কর খানিকটা অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করল, শব-সাধনা করেছিলেন, বললেন না? শব মানে ডেড বডি এল কি করে ওই ঘরে? আর এইসব তো শুনেছি তান্ত্রিকরা করে থাকেন!

শাহাজাহান ঠোঁটে একটা আওয়াজ করল, ডেড বডি হতে যাবে কেন, একটি মেয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে আর গুরুদেব তার পিঠে পদ্মাসনে বসে ধ্যান করেন। মাইরি সব বলব আপনাকে, দেখলে সহ্য করা যায় না।

একটি মেয়ে মানে, রোজ কি একই মেয়ে আসে?

নো, নেভার! প্রত্যেক দিন তো নতুন মুখ দেখি।

ভাস্কর মাথা নাড়ল। লোকটা যে দু'নম্বরি তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এই পাহাড়ে ও রোজ একটা করে মেয়ে পাচ্ছে কোত্থেকে? নাঃ, আজ যেমন করেই হোক লোকটার সঙ্গে আলাপ করতে হবে। তবে লোকটা যদি এমন ধান্দাবাজ হয়, তাহলে ডাবল-সিটেড রুম নিতে যাবে কেন? কেন আর একজন অচেনা মানুষকে রুমমেট হিসেবে সঙ্গে রাখবে? ও তো স্বচ্ছন্দে সিঙ্গল-সিটেড রুম নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারত। এইখানেই খটকা লাগছিল ভাস্করের। শাজাহান লোকটা দুনম্বরি নয় তো? এইসব কথা বলে তার সঙ্গে অন্য মতলবে ভিড়ছে না তো?

মুখে কিছু প্রকাশ করল না সে। বলল, শাজাহানবাবু, আজকের দিনটা থেকে যান। এতদিন কষ্ট করলেন, আর একটা দিন করলে কোনো অসুবিধে হবে না। বুঝলেন?

শাজাহান মাথা নাড়ল, আমি যে অ্যানাউন্স করে ফেলেছি!

সেটা শুনে গুরুদেব কী বলছেন?

উনি খুব চটে গেলেন। বললেন, আমার নাকি ধৈর্য নেই, সংযম-শক্তি নেই। আমার দ্বারা সাধনা হবে না। আমি একটু তন্ত্রসাধনা শিখতে চেয়েছিলাম, তাই উনি খেপে গেলেন আমি চলে যাব শুনে।

আপনার হঠাৎ ওসব শেখার ইচ্ছে হল কেন?

মানে, এই আর কি! রোজ মশাই ভৈরবী দেখতে দেখতে—।

হো হো করে হেসে উঠল ভাস্কর। যাক, এতক্ষণে শাজাহানের মতলবটা বোঝা গেল। শাজাহান বেশ সংকুচিত হচ্ছিল, বলল, না না, এটা ঠাট্টার বিষয় নয়। আমি একটা বইতে পড়েছিলাম, টিবেটে তন্ত্রের প্রচার ছিল।

হাসি থেমে গেল ভাস্করের, টিবেটে? হ্যাঁ, তিব্বতে তো শাক্ততন্ত্র প্রবেশ করেছিল। বুদ্ধের মন্দিরে শাক্তদের অনেক প্রতীক আছে। কিন্তু তার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক মশাই?

বাঃ, এই গুরুদেব তো অরিজিন্যাল টিবেটিয়ান!

টিবেটিয়ান? হতভম্ব হয়ে গেল এবার ভাস্কর।

ইয়েস, অরিজিন্যাল! যেহেতু উনি বুদ্ধের মতাবলম্বী নন তাই ওর জাতভাইরা তাঁকে এড়িয়ে চলে। তবে চমৎকার বাংলা বলতে পারেন। শিষ্যমহারাজ বলেন, গুরুদেব নাকি পৃথিবীর যে কোনো ভাষায় কথা বলতে পারেন। যোগীরা একটা স্টেজে চলে গেলে বোধ হয় ওই সব ক্ষমতা অর্জন করেন। তবে শিষ্যমহারাজ বাঙালি, একটু খেঁকুড়ে টাইপের।

লোকাল লোক?

জিজ্ঞাসা করিনি।

সমস্ত ব্যাপারটাই দুর্বোধ্য মনে হচ্ছিল ভাস্করের কাছে। ওরা হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছিল। এবার শাজাহান জিজ্ঞাসা করল, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

এমনি, উদ্দেশ্যবিহীন বেড়ানো আর কি!

শাজাহান নিজের ঘড়ি দেখল, ন'টা বেজেছে, এখন একটু খাওয়া যাক।

কি খাবেন? সলজ্জ মুখ শাজাহানের। তারপর শরীরটা বেঁকিয়ে বলল, সে জন্যে এই পাহাড়ে মাঝে একা ছুটে আসি। এখানে একটা সুন্দর বার আছে।

এই সাত সকালেই মদ খাবেন?

সাতসকাল কোথায়? ন'টা বেজে গেছে!

টিবেটিয়ান মদ? ভাস্করের চোখ ছোট হল।

না, না এই বাঙালির লিভার ওসব সহ্য করতে পারে না। আমি পুরো ইংলিশ।

তাহলে আজ যাচ্ছেন?

বলছেন যখন আর একদিন না হয় খাওয়া যাক।

শাজাহানকে ছেড়ে উল্টো পথ ধরল ভাস্কর। মেন রোডে আসা মাত্র সে মোটর-বাইকটাকে দেখতে পেল। তার আরোহী চোখে সানগ্লাস সেঁটে সিটের ওপর স্টাইলে বসে একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছে। লোকটি বৃদ্ধ নেপালি। আরোহী ছেলেটির কথায় বারংবার মাথা নাড়ল লোকটি। তারপর আচমকা স্টার্ট দিয়ে মোটর-বাইকটাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ছেলেটি ডানদিকের রাস্তায়। সেই সময় ভাস্কর নেপালি ছেলেটিকে দেখতে পেল। দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে তাকে দেখছে। ভাস্কর চিনতে পারল। এই ছোকরাই গতরাত্রে ছিনতাই করতে এসেছিল। সে ইশারায় ওকে কাছে ডাকতে ছেলেটি এপাশ ওপাশ দেখে এগিয়ে এল, আপকো হোটেলমে গিয়া থা।

ভাস্করের মনে পড়ল ওকে সে দেখা করতে বলেছিল। সে মাথা নেড়ে জিজ্ঞাসা করল, তোর নাম কী?

পদম বাহাদুর।

তুই ছুরি দেখিয়ে রোজ কত টাকা কামাস?

দশ বিশ পঞ্চাশ, কভি কভি একদম নিল।

এখন কী করছিস?

কুছ নেহি।

তুই এই শহরের সবকিছু জানিস?

হলুদ দাঁত বের বের হাসল পদম। তারপর হাত সামান্য বাড়িয়ে বলল, এই হাতটাকে যেমন চিনি তার চেয়ে কম নয়।

তুই চাকরি চাস?

ফুঃ, কেউ আমাকে চাকরি দেবে না! সবাই জানে আমি কি করি। নিরাসক্ত মুখে কথাগুলো শোনাল পদম।

ভাস্কর হাসল, তুই যদি কথা দিস আর কখনও ছিনতাই করবি না তাহলে আমি তোর জন্যে চেষ্টা করতে পারি। তার আগে বল তো, এখানে দিশি মদ কোথায় পাওয়া যায়?

এবার যেন ছেলেটি স্বাভাবিক হল, অনেক রকমের দেশি মদ এখানে পাওয়া যায়। আপনি কোনটা চাইছেন বললে আমি এনে দিতে পারি। হাঁড়িয়া, চোলাই, পচাই আউর তিব্বতিরা যে মাল খায় তারও একটা বড় দোকান হয়েছে এখানে। তবে সেটাকে সাহেব দিশি মদ বলবেন কিনা জানি না। বহুৎ খারাপ গন্ধ আর তেমনি কড়া, কলজে জ্বলিয়ে দেয়।

ভাস্কর হাসল, এইরকম মদই আমার পছন্দ। দোকানটা কোথায়, তুই আমাকে সেখানে নিয়ে চল।

পদম বাহাদুর ইতস্তত করছিল, আপনি ওখানে যাবেন না সাহেব। আমরাই যেতে চাই না। আসলে ওই দোকানের খদ্দের সব তিব্বতী। মাল খেলে ওদের মেজাজ খুব চড়া থাকে।

তোর চেয়েও?

মানে?

তোকে যদি আমি কব্জা করতে পারি তো ওদের পারব না! তাহলে বল তোর চেয়ে বড় শের এই শহরে আছে! ভাস্কর ইচ্ছে করে গলার স্বরে ব্যঙ্গ মিশিয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি মুখ ভ্যাটকাল। তারপর দুই কাঁধ নাচিয়ে বলল, চলুন। তবে গোলমাল হলে আমাকে দোষ দেবেন না। আমি যে কোনো নেপালির সঙ্গে টক্কর নিতে পারি কিন্তু তিব্বতিদের হালচাল বুঝতে পারি না। ঠিক হ্যায়—।

পদম আগে আগে হাঁটছিল। রাস্তাটা ঢালু, বাঁদিকে নামছে। পদমের হাঁটাচলার মধ্যে এক ধরনের বিদেশি ভাব আছে। অথবা বিলিতি ছবির প্রভাবও হতে পারে। অবশ্য এই শহরে বিদেশি ছবির চেয়ে হিন্দির পোস্টারই বেশি চোখে পড়ছে। তা ওদের নায়ক-নায়িকারাও তো আন্তর্জাতিক।

এখন সবে সকাল শেষ হয়েছে। নিচের রাস্তাটায় বেশ ভিড়। দোকানপাট আছে তবে ওপরের ম্যাল রোডের মত অত সাজানো নয়। কিন্তু ব্যবসাপত্র বেশ জমজমাট তা তাকালেই ধরা যায়। গলির মধ্যে ঢুকতে হল না। বড় রাস্তা থেকে একটা কাঠের সাঁকো সোজা থেমেছে একটা কাঠের বারান্দায়। বাড়িটার ওপর ইংরেজি এবং সম্ভবত টিবেটিয়ানে লেখা রয়েছে। দ্বিতীয়টি বোঝার সামর্থ্য ভাস্করের নেই। প্রথমটির সরল অর্থ খুশমেজাজি পানশালা।

পদম বলল, আমি ভেতরে যাব না।

কেন? ভাস্কর অবাক হল।

পদম উত্তর দিল না। মাথা নামিয়ে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়াল যার অর্থ সে আর এ বিষয়ে কথা বলতে ইচ্ছুক নয়। ভাস্কর আর জোর করল না। সে সাঁকোর ওপর পা রাখল। বেশ মজবুত সাঁকোর দুপাশে কাঠের রেলিং। বারান্দাটা ফাঁকা। কিন্তু সেখানেও কয়েকটা খালি বেঞ্চি, বোঝাচ্ছে

ভেতরের ভিড় বেশি হলে ওগুলোর প্রয়োজন হয়। সে দরজায় দাঁড়ানো মাত্র একটা বিদঘুটে গন্ধ নাকে এল। তীব্র এবং শরীর-গোলানো গন্ধটায় অ্যালকোহল মিশে রয়েছে। ঘর না বলে হলঘর বলাই ঠিক। এই সময় তেমন ভিড় নেই। ভাস্কর গুনে দেখল মাত্র পাঁচজন পান করছে। এরা প্রত্যেকেই তিব্বতের মানুষ। কাউন্টারে যে লোকটি পরিবেশন করছে তার চেহারা বিশাল। অনুমানে বোঝা যায় তিন-চারজন সাধারণ মানুষকে সে অবহেলায় ছুড়ে ফেলতে পারে। ভাস্করকে দরজায় দাঁড়াতে দেখে লোকটা তার চেরা এবং প্রায় বোজা চোখ সমেত মাথাটা নাড়ল।

ভাস্কর ভাব-জমানোর হাসি হাসল কিন্তু লোকটির কোনো প্রতিক্রিয়া হল না। ততক্ষণে ভেতরে পা দিয়েছে ভাস্কর। হলঘরটির একটা বিশেষত্ব আছে। প্রতিটি টেবিলের সঙ্গে মাত্র একটি চেয়ার সাঁটা। অর্থাৎ তোমাকে পান করতে হবে একা একা। আড্ডা মেরে পাঁচজন মিলে খাওয়া এখানে চলবে না। যে পাঁচজন খাচ্ছে তারা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত এবং নির্বাক।

ভাস্কর অনেক খালি টেবিলের একটায় বসল। চেয়ার মোটেই আরামদায়ক নয়। এই ব্যবস্থা নিশ্চয়ই, একজন মানুষ যেন অযথা সময় এখানে না কাটায় সেই কারণে। সে কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে দেখল স্বাস্থ্যবান লোকটি অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই সে ইঙ্গিত করল কাউন্টারের কাছে এগিয়ে যেতে। ভাস্কর একটু সময় নিল। লোকটার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে সে খুব বিরক্ত হচ্ছে। ভাস্কর এবার ইঙ্গিত করল লোকটাকে কাছে আসতে। দশ সেকেন্ডে তাকে দেখল লোকটা, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের কাজে মন দিল। ভাবখানা এমন, চুলোয় যাও!

সাতসকালে মদ্যপান করার বিন্দুমাত্র বাসনা ছিল না। জায়গাটা তার দেখতে আসাই উদ্দেশ্য। এই পানশালার মালিক ছিলেন মিস্টার শেরিং। তিনি মারা গিয়েছেন। সকালবেলার খদ্দের দেখে অবশ্য ঠাওর করা যায় না এই পানশালার বিক্রি কত। তবে তিন লক্ষ টাকার জীবন বীমা সাধারণ আয়ের মানুষ করে না। কাউন্টারের পেছনে কয়েকটা ঘর আছে। সেগুলোয় কারা থাকে? একটি মানুষ তার জীবনের নিরাপত্তা বা তার পরিবারকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে বিমা করতেই পারে। কিন্তু ভাস্কর শুধু দেখবে মিস্টার শেরিংয়ের মৃত্যুতে কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নেই!

শেষ পর্যন্ত সোজা পায়ে ভাস্কর হেঁটে গেল কাউন্টারে। তারপর সামান্য হেসে বলল, গিভ মি সাম টিবেটিয়ান ব্রেকফাস্ট!

নো ব্রেকফাস্ট, অনলি ড্রিংকস্! লোকটা চেরা চোখে তাকাল।

ইজ ইট টিবেটিয়ান?

ইয়েস। ভেরি গুড। অনলি ইন দিস শপ!

আই সি। ঠিক হ্যায়। আই লাইক টিবেটিয়ান ড্রিংক। তবে এখন নয়। আজ বিকেলে আসব। গুডবাই। কথাটা শেষ করে ঘুরে দাঁড়াতেই ভাস্কর দেখল একটা গাড়ি এসে কাঠের সাঁকোর সামনে দাঁড়াল। ড্রাইভার দ্রুত নেমে দরজা খুলে দিতেই জুলি শেরিং গাড়ি থেকে নামল। সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টারের লোকটা চঞ্চল হয়ে বাইরে বেরিয়ে দরজায় ছুটে গেল। ভাস্কর চট করে বাঁদিকে সরে গেল যাতে ভদ্র-মহিলার সামনাসামনি না পড়তে হয়। ভদ্রমহিলা যথেষ্ট লম্বা, ছিপছিপে শরীর দুম্বায় ঢাকা সত্ত্বেও বোঝা যায় ওর যৌবনে বেশি রকমের বাড়াবাড়ি। কিন্তু মাথা সোজা করে যখন চোখ নীল চশমায় ঢেকে হেঁটে এলেন তখন ভাস্কর ব্যক্তিত্ব শব্দটা মনে করতে পারল। লম্বাটে কিন্তু সুশ্রী মুখ। টিবেটিয়ানরা যেরকম ফর্সা হয় ইনি তার চাইতে একটু বেশি। বয়স অনুমান করা মুশকিল। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হলে বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু ভাস্কর জানে মিস্টার শেরিংয়ের

একটি কুড়ি বছরের মেয়ে রয়েছে যে তিব্বতেই থেকে গিয়েছিল বাষট্টি সালে ভারতে পালিয়ে আসবার সময়। সেই মেয়ের মা যে এত অল্পবয়সী তা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। কোনো কোনো চিত্রাভিনেত্রী নাকি বাহান্নতে বত্রিশে নেমে থাকেন! এই মহিলা সেই কৌশলটি আয়ত্ত করেছেন।

জুলি শেরিং মদ্যপায়ীদের দিকে তাকাল না। গর্বিত পদক্ষেপে হলঘরটা পেরিয়ে ঢুকে গেল কাউন্টারের পাশ দিয়ে ভেতরের ঘরে। আর স্বাস্থ্যবান লোকটি বলদের মত ওর পেছন পেছন দরজা পর্যন্ত পৌঁছে বিনীত ভঙ্গিতে আবার কাউন্টারে ফিরে এল। ভাস্কর আর দাঁড়াল না।

জুলি শেরিং নিয়মিত এই পানশালায় তদারকিতে আসেন। অর্থাৎ কর্মচারিদের ওপর দায়িত্ব চাপানোর মহিলা নন। ওঁর হাঁটার ধরন, মুখের গড়ন এবং গাম্ভীর্য বলে দেয়, এই মহিলা মোটেই সাধারণ রমণী নন। বাইরে বেরিয়ে এসে ঠাণ্ডা বাতাস নিল সে বুকভরে। ঘরের মধ্যে এই সময়টুকু থেকেই যেন নেশা হয়ে যাচ্ছিল। এই মদ সত্যিই তীব্র।

জুলি শেরিংয়ের সঙ্গে আজ কথা বলা যেতে পারত। সে যে উদ্দেশ্যে এসেছে তাতে কথা বলার সম্পূর্ণ অধিকার তার আছে। কিন্তু না, আর একটু অপেক্ষা করা যাক। নদীর জল, মাটি, শ্যাওলা ইত্যাদি দেখার পর স্নানে নামাই ভাল।

রাস্তায় নামতেই পদম এগিয়ে এল, পিয়া সাব?

ভাস্কর সত্যি কথা বলতে গিয়েও মত পাল্টাল। সে নীরবে এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল যার অর্থ দুটোই হতে পারে। পদমের চোখ বিস্ফারিত হল, আপনার খাওয়া অভ্যেস ছিল নিশ্চয়ই। ওই যে লোকটা কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকে, ও বহুৎ বদমাস। একা তিনটে লোককে শুইয়ে দিতে পারে। আর ওই যে মেমসাহেব এইমাত্র ঢুকলেন তিনি হলেন দোকানের মালিকান। খুব ঘাগু চীজ।

খবর পাওয়া যাচ্ছে। খুশি ভাস্কর। কিন্তু প্রকাশ না করে খানিকটা বিরক্তি প্রকাশ করল, ভদ্রমহিলা সম্পর্কে অভদ্র ভাষায় কথা বলছ কেন?

ভদ্রমহিলা! ও যদি তুড়ি মারে তাহলে যে কোনো লোকের লাশ পড়ে যাবে। তিব্বতিরা পর্যন্ত ওকে এড়িয়ে চলে। ওর ডান হাত হল কাউন্টারের লোকটা। ওই বারে মাতালরা ঝামেলা করতে সাহস করে না। ওর স্বামী যখন মারা গেল তখন অনেকেই সন্দেহ করেছিল মৃত্যুটা সাদা কিনা!

সাদা কিনা মানে? ভাস্কর সতর্ক হল কিন্তু ভঙ্গিতে প্রকাশ করল না।

মানে মানুষরা বলে বুড়ো স্বামীকে হয়ত ওর পছন্দ হয়নি।

কী ভাবে মারা গেল লোকটা? উল্টো পথে হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করল ভাস্কর। মিস্টর শেরিংয়ের মৃত্যুর বিশদ বিবরণ যে ফাইলে আছে সেটি সে পড়েছে। পুলিস মৃত্যুর পেছনে কোনো অস্বাভাবিকত্ব লক্ষ্য করেনি। যে ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছেন তিনিও বলেছেন মৃত্যুটা স্বাভাবিক। মিস্টার শেরিং কিছুদিন থেকেই বিভিন্ন অসুখে ভুগছিলেন। তাঁর মৃত্যু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। অনেক মানুষের সামনে ওই কাউন্টারের ওপর লুটিয়ে পড়েছিলেন তিনি বুকের যন্ত্রণায়। এই অবধি কোনো গোলমাল নেই। গোলমাল ছিল কিনা জানতেই তার এই শহরে আসা। অতএব এই ছেলেটি যদি কিছু তথ্য দিয়ে দেয়, গুজব যত বানানোই হয় একটা সত্যের বীজ থাকে সুদূর নেপথ্যে।

মদ খেয়ে! পদম হাসল, এ শালা তিব্বতি মদ কলিজা পুড়িয়ে দেয়। খুব মদ খেত লোকটা। কেউ কেউ বলে, ওই মদে কিছু মিশিয়ে দিত মেয়েটা। আবার কেউ বল, মদ খেত বটে কিন্তু তার চেয়ে আর একটা নেশা ছিল বুড়োর!

কী নেশা? ভাস্কর হতাশ হচ্ছিল! ছেলেটার কথাগুলো সাধারণ গপ্পোবাজ অলস মানুষের বানানো। তার মধ্যে সত্যতা হয়তো আদৌ নেই এবং এ থেকে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

ছোবল খেত লোকটা, সাপের ছোবল।

দূর! ছোবল খেলে তো মরে যাবে। এই নেশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সত্ত্বেও অজ্ঞ সাজল ভাস্কর।

হ্যাঁ যাবে, আপনি আমি মারা যাব। কিন্তু যাদের অভ্যেস আছে তারা ঠিক থাকে। তবে সে-সব সাপ খুব ছোট ছোট। বিষ সবে জমেছে। একটা কৌটোতে আটকে রাখা হয়। কৌটোর ওপরে ছোট্ট ফুটো থাকে। ছোবল খাওয়ার আগে খুব জোরে কৌটোকে নাড়ালে সাপটা রেগে যায়। তখন সেই ফুটোতে জিভ রাখলে সাপ ছোবল মারবেই। অত ছোট ফুটো. ছোট সাপ, বিষে তাই মানুষ মরে না কিন্তু জব্বর নেশা হয়ে যায়। সারাদিন পড়ে থাকে নেতিয়ে। আমেরিকাতে শুনেছি সাহেবরা ইঞ্জেকশনে ওই বিষ শরীরে ঢুকিয়ে নেয়। মানুষ বড় আজব জিনিস সাহেব! খুব বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ল পদম।

মনে মনে তারিফ করল ভাস্কর। সাপের বিষ নেবার পদ্ধতিটা ও সঠিক না জানলেও কায়দাটার আন্দাজ আছে। মিস্টার শেরিং যে ওই নেশা করতেন তার প্রমাণ চাই। সে জিজ্ঞাসা করল, তুই সাপের বিষ কাউকে নিতে দেখেছিস? চোখের সামনে?

মাথা নাড়ল পদম, নাঃ। সাপকে আমার খুব ভয় করে। তবে, নামচে বস্তিতে একজন তিব্বতি থাকে যে নাকি ওই ছোট ছোট সাপ ধরে বিষের কারবার করে। হয়তো ও ই দিত বুড়োটাকে!

নামচে বস্তি এখানে আছে?

হ্যাঁ. এখান থেকে মাইল দেড়েক হেঁটে গেলেই নামচে বস্তি।

তুই আমাকে সেই লোকটার কাছে নিয়ে যেতে পারবি?

কেন? এই প্রথম যেন সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল পদম বাহাদুর।

আমি সাপ কিনব। মদ খেয়ে কোনো কাজ দিচ্ছে না।

সাহেব, এটা ঠিক নয়। আপনি তিব্বতির মাল খেলেন তবু মনে হচ্ছে যেন চা খেয়ে এলেন তার মানে মদ হেরে গেছে। কিন্তু সাপের বিষ যেসব মানুষ নেয় তারা শুনেছি মানুষ থাকে না

ভাস্কর হাসল। ছেলেটা সত্যিকারের ফিনতাইবাজ নয়! জেল খাটলেও নয়। কিংবা ওসব হলেও মনের আনাচে কানাচে কিছু নরম ব্যাপার আছে। মানুষের ভেতর আর একটা নরম মানুষ না থাকলে অন্যের সত্য উপলব্ধি করা যায় না। সে নিচু গলায় বলল, তোর সঙ্গে আমার একটা বন্দোবস্ত দরকার।

পদম বেশ ঘাবড়ে গিয়ে তাকাল

ভাস্কর বলল, তুই তোর অভ্যেস ছাড়লে চাকরির ব্যবস্থা করব বলেছি। এ ছাড়া আমার সঙ্গে যে ক'দিন ঘুরবি তার জন্যে আলাদা পাবি, রাজি?

পদম হাসল, হেসে মাথা নাড়ল।

ম্যাল রোডে ধরে ওরা হাঁটছিল। এই সময় সেই মোটর-বাইকওয়ালাকে নিচে নেমে যেতে দেখল ভাস্কর। সে জিজ্ঞাসা করল লোকটাকে চিনিস?

ঘাড় নাড়ল পদম, খুব ভাল ব্যাডমিন্টন খেলে। সরকারি চাকরি করে। এখানকার মেয়েরা ওর জন্যে পাগল।

ক্রমশ ওরা এগিয়ে এল ক্লিন হার্ট রোডে। এখন এই রাস্তায় মোটামুটি লোকচলাচল করছে।

তবে জায়গাটা যেহেতু বড়লোকদের, তাই আজেবাজে মানুষজন নেই। ভাস্কর চটপট চারপাশে তাকিয়ে নিল। তারপর পদমকে বলল, তুই এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবি। আমি ওই বাংলোর ভেতর যাব। কেউ গেট খুলে ঢুকছে দেখলেই সিটি বাজাবি। সিটি বাজাতে পারিস?

পদমের মুখ উজ্জ্বল হল, সে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল, ভাস্কর বুঝল, অপরাধ জগতের সঙ্গে জড়িত কোনো মানুষ একজন সঙ্গি পেলে সুখী হয়। পদম এতক্ষণে তাকে ওইরকম কিছু ভাবছে।

জায়গাটা সামান্য নির্জন হওয়া মাত্র ছোট পাঁচিল ডিঙিয়ে ভাস্কর ভেতরে ঢুকে পড়ল। দুপাশে ফুলের বাগান এবং লম্বা সারি। এই মুহূর্তে জুলি শেরিং বাড়িতে নেই। তার সাকরেদ স্বাস্থ্যবান মানুষটিও কাউন্টার সামলাচ্ছে। রাত্রে যে মোটর-বাইকওয়ালা জুলিকে দেখছিল সেও নিচে নেমে গেছে। এখন এই মুহূর্তে বাড়িতে আর কে কে থাকতে পারে? এই বাড়ির ভেতরটা জুলির অজান্তে একবার ভাল করে দেখতে চায়। খুব বুদ্ধিমান মানুষও কখনও কখনও বোকার চেয়ে সাধারণ ভুল করে বসে। এক্ষেত্রে সেরকম কিছুর সন্ধান পাওয়া গেলেও যেতে পারে। মাথা নিচু করে ঢালু বাগান দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল ভাস্কর যতটা সম্ভব ওই অবস্থায় যাওয়া যায়। হঠাৎ মাটির দিকে চোখ পড়তে ও কোনোক্রমে গতি সামলাতে গিয়ে বসে পড়ল। তার চোখের সামনে তিনটে নগ্ন তার ছয় ইঞ্চির ফারাকে লাইন করে চলে গেছে বাড়িটাকে পাক খেয়ে। একটু অন্যমনস্ক, একটু বেশি গতি থাকলে ওই তারের সঙ্গে পায়ের সম্পর্ক হতই। এই তার কীসের? সামান্য ঝুঁকে ভাস্করের সন্দেহ হল খুব, ওই তারের ভেতর দিয়ে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চলছে। পকেট থেকে একটা ছোট স্ক্রু-ড্রাইভার জাতীয় জিনিস বের করল সে। যার হাতলটা কাঠের কিন্তু ডগাটা লোহার। সাবধানে সেই ডগাটা একটা তারে ছোঁয়ানো মাত্র ভাস্করের ঠোঁটে হাসি ফুটল। বাঃ, চমৎকার! ওই তিনটে তারে পা পড়লে সে হয়তো মারা যেত না কিন্তু অজ্ঞান হয়ে আটকে থাকতে হতো যতক্ষণ না কেউ এসে তাকে উদ্ধার করে। নিজের অনুপস্থিতিতে বাড়িটাকে সুরক্ষিত করার চমৎকার ব্যবস্থা করে গেছে জুলি শেরিং।

পেছনে সরে এসে ভাস্কর লাফ দিল যতটা উঁচু দিয়ে সম্ভব, যাতে সে তিনটে তারের পরিধি ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে চলে আসতে পারে। এবং তখনই সে একটা চাপা শিস শুনতে পেল। শিস দিতে দিতে কেউ বাড়িটার ডানদিক দিয়ে উঠে আসছে। চকিতে সে বাড়িটার বাঁদিকে একটা আড়ালে চলে এল। তার মনে পড়ল গতকাল যখন সে গেট খুলে এই বাড়ির বারান্দা পর্যন্ত উঠে এসেছিল তখন কেউ তাকে বাধা দেয়নি এবং কোনো বৈদ্যুতিক তার পায়ের তলায় পড়েনি। সে ব্যাপারটা তো ওই মোটর-বাইকওয়ালার ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। অর্থাৎ এই সাবধানতা অবলম্বন করা হয় জুলি শেরিং যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় তখনই। এবং তখনই ভাস্কর শিস দিতে দিতে আসা লোকটিকে দেখতে পেল। দুম্বা জাতীয় পোশাকে দুটো হাত ঢুকিয়ে এক স্বাস্থ্যবান প্রৌঢ় বাড়ির চারপাশে চোখ বোলাল। এবং তারপর বেশ উদাস ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে লাগল এপাশে। ভাস্কর নিশ্চিন্ত হল। লোকটা মোটেই সতর্ক নয়।

মিনিটখানেক বাদে অজ্ঞান মানুষটিকে টেনে নিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে শুইয়ে দিল ভাস্কর। এই বাড়ি খালি ভেবেছিল সে। অথচ একটি লোককে দেখা গেল। একাধিক আছে কি না তা বোঝা যাচ্ছে না। ভাস্কর সতর্ক পায়ে এগিয়ে এল। এদিকটা বেশ ঢালু। লোকটাকে অজ্ঞান করতে একটু বেশি শক্তি ব্যয় করতে হয়েছে। আচমকা আঘাত করার সময় লোকটার ঘাড়ে বেশি শক্তি প্রয়োগ করা ঠিক হয়নি। অন্তত ঘন্টাখানেকের মধ্যে চেতনা ফিরবে না এটা সে নিশ্চিত।

বাড়ির পেছনে চলে এল সে। বাংলোটা খুব বড় নয়। বড়জোর গোটাচারেক ঘর এবং একটা

হল থাকতে পারে। বাড়ির পেছনে একটা টুকরো লন পেরিয়ে আউট হাউস গোছের রয়েছে। তার একটা দরজা খোলা। বোঝা যাচ্ছে প্রৌঢ় লোকটি ওই ঘর থেকে বেরিয়ে টহল দিতে বেরিয়েছিল।

অভ্যস্ত হাতে জানলাটা খুলে ফেলল। এতদিন হয়ে গেল তবু এইরকম সময়ে মনে একটা গ্লানি জন্মায়। সন্তর্পণে সে ভেতরের কার্পেটে পা দিতেই মনে হল কোথাও মৃদুস্বরে একটা বাজনা বাজছে। তার মানে এই বাংলোয় মানুষ আছে। ভাস্কর সতর্ক চোখে তাকাল। এইটি বোধ হয় স্টোর রুম। প্রচুর জিনিসপত্র স্তূপ করা রয়েছে। সে ধীরে ধীরে দ্বিতীয় ঘরটিতে ঢুকল। এটা শোওয়ার ঘর বোঝা যাচ্ছে। পরিপাটি বিছানা। একটা মেয়েলি পোশাক। এটা নিশ্চয়ই জুলি শেরিংয়ের ঘর। এই টিবেটিয়ান মহিলার যা পোশাক আছে তা কোনো আধুনিক আমেরিকানদের লজ্জিত করবে। ওয়ার্ডবোবের নিচে দুটো ভারী সুটকেস। ও-দুটো খোলার সময় এখন নেই। তিন নম্বর ঘরটাতে ঢুকল সে। এটি কি স্টাডি রুম? প্রচুর বইপত্র সাজানো দেওয়ালে। ভাস্কর একটু অন্যমনস্ক হয়ে বইগুলো দেখছিল। এনসাইক্লোপিডিয়ার সারি। হঠাৎ মাঝখান থেকে একটা বই তুলে নিতেই ওর শরীর শক্ত হল। একটা ছোট নব রয়েছে দেওয়ালে। গোপন কিছু লুকোবার জন্যেই ওই বইয়ের প্রদর্শনী। নবটা ধীরে ধীরে ঘোরাতেই পায়ের তলার কাঠের মেঝে নড়তে লাগল। ভাস্কর দেখল কার্পেট একটা জায়গা যেন সামান্য নিচু হয়ে ঝুলছে। দ্রুত সেখানকার কার্পেট সরিয়ে নিতে সে সুন্দর একটা গর্ত দেখতে পেল। তিন ফুট বাই চার ফুট গর্তের মধ্যে দুটো কাঠের বাক্স। সে ছোট বাক্সটা তুলে চাপ দিতেই ডালাটা খুলে গেল। একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ এবং তার পাশে ছোট শিশিতে সামান্য তরল পদার্থ। ভাস্কর চোখের সামনে বস্তুটাকে ধরল। কাঁচের আড়ালে সাদা তরল কি হতে পারে তা সে ঠাওর করতে পারছিল না। এই ভাবে গোপনে কেন সিরিঞ্জের এই বস্তুটি লুকিয়ে রাখা হবে? শিশির জিনিসটি যে ওষুধ নয় তা টের পাওয়া যাচ্ছে, কারণ শিশির গায়ে কোনো লেবেল নেই। বাক্স সমেত ও-দুটোকে সে পকেটে চালান করে দ্বিতীয় বাক্সে হাত দিতে গিয়েই চমকে উঠল। তার শরীর শক্ত হয়ে উঠল। তার অনুভূতির প্রতিটি প্রতিফলিত হচ্ছিল পেছনে কারোর উপস্থিতি। সে ধরা পড়ে গিয়েছে। যে এসেছে সে কোনো কথা বলছে না। ভাস্কর ধীরে ধীরে হাত সরিয়ে নিল। তারপর বিদ্যুৎগতিতে লাফিয়ে উঠে যখন মুখোমুখি হল তখন তার হাতে ৩৮ রিভলবার। সে দেখল দরজায় দাঁড়িয়ে একটি ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ে, তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। মেয়েটির চোখে এতক্ষণ বিস্ময় ছিল, অস্ত্র তাকে ভীত করল। মুখে হাত চাপা দিয়ে সে একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠল। ভাস্কর ততক্ষণে ওটা পকেটে চালান করে দিয়েছে। তারপর দ্রুত নব ঘুরিয়ে কার্পেটটাকে সমান করে দিয়ে মেয়েটিকে সামনে এসে দাঁড়াল, সরি, আমি সত্যি দুঃখিত। কিন্তু এ ছাড়া আমার অন্য কোনো উপায় ছিল না।

মেয়েটি তখনও ভীত এবং সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ভাস্কর কথাগুলো বলেছিল ইংরেজিতে। কিন্তু তার একটি শব্দ মেয়েটি বুঝেছে কিনা তাতে তার সন্দেহ হল। সে এবার হিন্দিতে কথাগুলো বলল। মেয়েটির মুখে সামান্য স্বাভাবিকতা ফিরে এল। ভাস্কর দুটো হাত যুক্ত করে হিন্দিতেই বলল, আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চাই না। মেয়েটি যে এবারও সব বুঝেছে তা স্পষ্ট হল না। অর্থাৎ মেয়েটি ইংরেজি জানে না এবং হিন্দি সামান্য বুঝলেও বলতে পারে না।

অতএব ভাস্কর পৃথিবীর আদিম ভাষার সাহায্য নিল। দুটো হাতের এবং ঠোঁটের সাহায্যে নির্বাক কথা বলার চেষ্টা করল সে। বোঝাতে চাইল, আর মেয়েটির কোন ভয় নেই। সে কোনো

ক্ষতি করবে না। বিশেস প্রয়োজনে তাকে এখান আসতে হয়েছিল। মেয়েটি ইংরেজি বুঝবে না ভেবে সে পকেট থেকে তার আইডেন্টিটি কার্ড বের করে মেয়েটির সামনে ধরল। মেয়েটি এতক্ষণ একাগ্র হয়ে ভাস্করের অঙ্গভঙ্গি বুঝবার চেষ্টা করছিল। এবার কার্ডটাকে দেখে হাত বাড়িয়ে সেটাকে নিল। কার্ড খুলতেই ভাস্করেব উজ্জ্বল ছবি। ছবির নিচের দিকে অফিসের স্ট্যাম্পে রয়েছে। মেয়েটি ছবি এবং মানুষের মধ্যে দু'তিনবার দৃষ্টি বদল করল। তারপর তার ঠোঁটের কোণে এক-চিলতে হাসি ফুটল। তাই দেখে ভাস্কর খুব সরল হাসির চেষ্টা করল। মেয়েরা বলে থাকে যে ভাস্করের হাসিতে একটা মুখোশ আছে। তিনটে খুন করে এসেও ওই হাসি হাসলে মনে হয় সারল্য একেই বলে।

মেয়ে এবাব পেছন ফিরল। তার ঘর থেকে ভেসে আসা বাজানা থেমে গেছে সেটা এতক্ষণে খেয়ালে এল। সে দ্রুত নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল।

ভাস্কর বুঝতে পারছিল না সে কী করবে। এই মুহূর্তে তার এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। মেয়েটি তার ভাষা ইচ্ছে করে না বোঝার ভান করছে কি না তা সে জানে না। তাছাড়া সে যে এসেছে তার একটা সাক্ষী রয়ে গেল। যদি মেয়েটি ইংরেজি পড়তে পারে তাহলে কার্ডে তার নাম জেনে নিয়েছে। সেটা বিরাট ভুল হয়ে গেল। আসলে মেয়েটির চোখ-মুখ এমন নিষ্পাপ সুন্দর যে ওর বিশ্বাস পাওয়ার জনেই কার্ডটি বের করে দেখিয়েছিল যে সে সাধারণ চোর বদমাশ নয়। ব্যাপারটা হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া, ভাস্কর যেন নিজের কাছেই স্বীকার করল, এমন সুন্দরী যুবতী মেয়ে সে আর কখনও দ্যাখেনি। কি অদ্ভুত জাদু আছে মেয়েটির নীল চোখে। আপেলের মত লাল গাল, ঈষৎ চাপা নাক অথচ সেটাই গোলাপি ঠোঁটের ওপর অদ্ভুত মায়াবি হয়ে আকর্ষণ বাড়িয়েছে। নিশ্চয়ই এই মেয়ে এদেশে বেশি দিন আসেনি। জুলি শেরিংয়ের মেয়ের তো তিব্বতে থাকার কথা। আর 'ক্লেইম' -এ বলা নেই মেয়েটি এই দেশে চলে এসেছে কিনা। কিন্তু আসতে ভিসা পাশপোর্টের প্রয়োজন। এদেশে চিরকাল থেকে যেতে চাইলে নাগরিকত্ব দরকার। ভাস্করে সন্দেহ হল মেয়েটি কোনো বৈধ ছাড়পত্র ছাড়াই এই দেশে এসেছে। এবং সেই কারণেই জুলি শেরিং ওকে প্রকাশ্যে বেব করেননি। এই জন্যই মেয়েটি তার নিজের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলতে কিংবা বুঝতে পারে না। কিন্তু জুলি শেরিংয়ের মেয়ের বয়স তো কুড়ি, অথচ একে দেখে ষোলো-সতেবোর বেশি কিছুতেই মনে হয় না। ভাস্কব মাথা নাড়ল, মেয়েদের বয়স বুঝতে চাওয়া তাদের মনের চেয়েও কষ্টকর।

চলে যাওয়া উচিত অথচ মেয়েটি তাকে টানছে। এবং সেই মুহূর্তে পাশের ঘরে বাজনা বেজে উঠল। ভাস্কর কয়েক পা এগিয়ে মেয়েটির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। রেকর্ড-প্লেয়ারে একটা রেকর্ড চাপিয়ে মেয়েটি ওর দিকে অপাঙ্গে তাকাতেই ভাস্করের বুকের ভেতব পাক দিয়ে উঠল। সে হাসল, মেয়েটিও হাসল। এবার পরিষ্কার ঝকঝকে পাহাড়ি হাসি। সে হাত বাড়াল, অনেকটা করমর্দন করার ভঙ্গিতে। মেয়েটি একটু তার আঙুল স্পর্শ করা মাত্র বাইরে তীব্র সিটি বেজে উঠল।

চকিতে চেতনা ফিরে পেল ভাস্কর। সে ইশারায় মেয়েটিকে বোঝাল পরে দেখা হবে, তারপর দ্রুত ঘবগুলো পেরিয়ে জানলাটার কাছে চলে এল। এক লাফে সেটা ডিঙিয়ে বাইরে নামবার আগে সে দেখতে পেল মেয়েটি পেছন পেছন এসে তাকে পরম বিস্ময়ে চলে যেতে দেখছে।

বাগানে নেমেই সতর্ক হল ভাস্কর। পদম যখন সিটি বাজিয়েছে তখন কেউ না কেউ এ বাড়িতে ঢুকেছে। সে চারপাশে নজর বুলিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে চলে আসতেই খেয়াল হল সেখানেই প্রৌঢ়টির অচেতন শরীর পড়ে আছে। বোধহয় প্রৌঢ়ের শরীরে তখন সাড় ফিরে আসছিল। ওর

পেছনে সময় নষ্ট করার মত সময় আর নেই। কারণ গেট খুলে একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে নিরাপদ দূরত্বে। গাড়ির ড্রাইভার একজন টিবেটিয়ান নিচে নেমে চিৎকার করে কাউকে ডাকল। তারপর সাড়া না পেয়ে গাড়ির দিকে মুখ বাড়িয়ে কিছু জানাল। এইবার পেছনের দরজা খুলে গেল। ভাস্কর দেখল জুলি শেরিং মাটিতে নেমে বাড়িটার দিকে এক পলক তাকাল। তারপর চাপা গলায় ড্রাইভারকে হুকুম করতেই সে একটু পিছু হটে দৌড়ে অনেকখানি লাফ দিয়ে বৈদ্যুতিক তারের সীমানা পেরিয়ে এ পাশে চলে এল। ভাস্কর আবার দেখল জুলি শেরিংকে। শক্তসমর্থ মহিলা যে একদা মেয়ের মতই সুন্দরী ছিলেন তার প্রমাণ এখনও তার শরীরে। সে আর অপেক্ষা করল না। যতটা সম্ভব নিচু হয়ে সে তারের সীমানা লাফিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গিতে উঠে এল পাঁচিলের গায়ে। পাঁচিল টপকাবার সময় যদি জুলি শেরিং এদিকে তাকায় তাহলে সে ধরা পড়ে যাবে। এখানে কোনো আড়াল নেই। ভেতরে তখন একটি বিশেষ নাম ধরে চিৎকার চেঁচামেচি চলছে। বোধহয় অচেতন প্রৌঢ়কে খুঁজছে ড্রাইভার। ঠিক তখনই বাইরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল মেয়েটি। আর তাকে দেখতে পেয়েই ক্ষিপ্ত হল জুলি শেরিং। চিৎকার করে বলল, গো ইনসাইড। তারপরেই নিজের ভাষার অনর্গল কিছু বলতেই মেয়েটি ঈষৎ ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ভেতরে চলে গেল। এই সুযোগটি হারাল না ভাস্কর। জুলি শেরিংয়ের উত্তেজনার সুযোগ নিয়ে সে পাচিল টপকে রাস্তায় উঠে এল। এবং সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পদমের মুখোমুখি হল। দাঁত বার করে হাসছে পদম। ইশারায় তাকে সঙ্গে আসতে বলে দ্রুত পা চালাল ভাস্কর। ক্লিন হার্ট রোড ছাড়িয়ে আসার পর ভাস্করের মনে হল এবার একটু খাওয়া যাক। সকাল থেকে অনেক উত্তেজনা হয়েছে।

মেটামুটি একটা ভাল রেস্তোরাঁ দেখে সে পদম বাহাদুরকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে চিকেন রোস্ট আর টোস্টের অর্ডার দিল। পদম এখন তার সামনে বসে পিটপিটিয়ে হাসছে।

সাহেব, একটা কথা বলব?

মাথা নাড়ল ভাস্কর।

পদম বলল, আপনি আমার চেয়ে অনেক বড় ওস্তাদ। একটা চিড়িয়া পর্যন্ত ওই বাড়িতে ঢুকতে সাহস পায় না আর আপনি— কথাটা শেষ করল না পদম কিন্তু ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল যে ভাস্কর তার চেয়ে অনেক বড় দরের অপরাধী। ভাস্করের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। তার ইচ্ছে করছিল এক চড়ে ছেলেটার মুখ ভোঁতা করে দেয়। তার আফসোস হচ্ছিল এই ছিনতাইবাজকে সাক্ষী রাখার জন্যে। কিন্তু সে নিজেকে শান্ত করল। পদম বাহাদুরকে তার প্রতি পদে প্রয়োজন হবে। অনেক চেষ্টায় সে হাসির ভান করল। তারপর পকেট থেকে তার আইডেন্টিটি কার্ড বের করে পদমের সামনে মেলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ চোখ পাল্টে গেল পদমের। মাপ কিজিয়ে সাব। আমি বুঝতে পারিনি। আর কখনও এমন ভুল হবে না। বারংবার কথাগুলো বলে সে নিজের গালে নিজেই চড় মারল, সাহেব যে বড় অফিসার তা বুঝতে পারিসনি শালা, তুই আবার আদমি চিনে ছুরি তুলবি?

ভাস্কর গম্ভীর গলায় বলল, এটা আর কখনও যেন না হয়। আবার বলছি, এতদিন যা করেছিস সে-সব কথা একদম ভুলে যা।

ঠিক হ্যায় সাহেব। আর বলব না। বিনীত ভঙ্গিতে জানাল পদম।

খাওয়া দাওয়ার পর পদমের চেহারা পাল্টে গেল। সে বোধহয় জীবনে ওই রেস্তোরাঁয় ঢুকে অত দামী খাবার খায়নি। ফুর্তিতে চটপটে গলায় জিজ্ঞাসা করল, এবার কি করতে হবে সাহেব?

নামচে বস্তিতে চল। রোস্টেড মুরগি কিনে একটা প্যাকেটে ভরল ভাস্কর।

হুকুমটা যে মোটেই পছন্দ হল না তা পদমের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। খানিকটা অনিচ্ছায় সে একবার ভাস্করের দিকে তাকিয়ে হাঁটা শুরু করল। অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা শহরের ব্যস্ততা ছাড়িয়ে এল। রাস্তা বেশ নির্জন। গরিব পাহাড়ি মানুষেরা সাংসারিক কাজ করছে দুপাশের কাঠের বাড়িতে। ভাস্কর খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল। নীল চোখের মেয়েটি তাকে প্রবল আকর্ষণ করছিল। সেই সঙ্গে জুলি শেরিংয়ের গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ানোর ভঙ্গি বুঝিয়ে দিয়েছিল সে ওই মেয়ের মা। জুলি কিছুতেই মেয়েকে বাড়ির বাইরে আসতে দেবে না। আর সেই নিষেধ শোনামাত্র মেয়ের মুখেচোখে যে ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছিল তা থেকে অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে মা মেয়ের সম্পর্ক ভাল নয়। মেয়েটি কি মাকে বলবে একটা লোক গোপনে বাড়িতে ঢুকে লুকানো নব ঘুরিয়েছে? বলে দেওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য মায়ের প্রতি বিতৃষ্ণা যদি বেশি হয় তাহলে অন্য কথা। ভাস্কব নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না মেয়েটি জুলি শেরিংকে তার কথা জানাবে কি না। জানলাটা সে ভাঙেনি। কায়দা করে ছিটকিনি খুলেছিল মাত্র। খুব সতর্ক চোখে পরীক্ষা না করলে বোঝা যাবে না দাগটা। অবশ্য সেই প্রৌঢ় মানুষটি সাক্ষী দেবে ওই বাড়িতে আগন্তুক ঢুকেছিল। যারা নিজের বাড়ি বৈদ্যুতিক তার দিয়ে ঘিরে রাখে বাইরের মানুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্যে তারা অচেতন প্রৌঢ়টিকে আবিষ্কার করার পর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেই। হয়তো মেয়েটি বাধ্য হবে সমস্ত কথা বলতে। আবার সেটা নাও হতে পারে। ভাস্কর অনিশ্চয়তায় দুলছিল। শুধু বারংবার তার মনে পড়ছিল মেয়েটি যখন তার আঙুল স্পর্শ করেছিল তখন অদ্ভুত একটা সুখের অনুভুতি ছড়িয়ে পড়েছিল শরীরে। কিন্তু তাকে দেখে মেয়েটি চিৎকার করেনি কেন? চোর বা ডাকাত বলে ভয় পায়নি কেন? শঙ্কিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু শেষে একটু একটু করে সহজও তো হয়ে আসছিল। রহস্য উদ্ধাব করতে পারছিল না ভাস্কর।

কতটা পথ হেঁটে এসেছে খেয়াল ছিল না, এখন মুখ ফিরিয়ে দেখল শহরটা অনেক ওপরে। পাহাড়ি পথে নামার সময় দূরত্ব টের পাওয়া যায় না। এই সময় একটা বাঁকে দাঁড়িয়ে পদম আঙুল তুলে দেখাল, ওইটে হল নামচে বস্তি।

এদিকে জনবসতি বেশি নেই। অনেকটা ফাঁকা পাহাড় আর জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে বস্তিটাকে দেখা যাচ্ছে। পঁচিশ ত্রিশ ঘর বাসিন্দা সেখানে রয়েছে। অবশ্য রাস্তা পিচের এবং পরিষ্কার।

দূরত্বটা অতিক্রম করতে বেশি সময় লাগল না। পদম এখন বেশ স্মার্ট হয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে কথা বলছে কম। কিন্তু সমানে শিস দিয়ে চলেছে আগে আগে। বস্তিতে পৌঁছে ভাস্কর বুঝল এদের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। কর্মঠ মানুষজন তেমন চোখে পড়ল না। বৃদ্ধ বৃদ্ধা এবং শিশুরা ওদের অবাক চোখে দেখছিল। পদম মানুষগুলোকে একদম পাত্তা না দিয়ে শেষপ্রান্তে চলে এল। সেখানে বস্তি থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা কাঠের দোতলা জীর্ণ বাড়ি দাঁড়িয়ে। সেটার দিকে আঙুল তুলে পদম নিচু গলায় বলল, ওই বাড়িটায় বুড়ো থাকে। যাওয়ার আগে আর একবার ভাববেন সাহেব। তিব্বতি বুড়োটাকে মাঝে মাঝে শয়তান ভর করে। তখন ওর চোখের সামনে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

নীরবে মাথা নাড়ল ভাস্কর। তারপর প্যাকেটটা হাতে ঝুলিয়ে সে এগিয়ে গেল কাঠের বাড়িটার দিকে। সে লক্ষ্য করল বস্তির বাচ্চা এবং বৃদ্ধারা বেশ দূরে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে।

কাঠের দোতলাটায় ঘর, নিচে শুধু গোটা আটেক বিম যার ওপর বাড়িটা দাঁড়িয়ে। জরাজীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে ওপরের বারান্দায় উঠে ভাস্কর ডাকল, কোই হ্যায়?

হুম্। একটা চাপা হুঙ্কারের মত আওয়াজ ভেসে এল দুটো ঘরের কোনো একটা থেকে। তারপর অদ্ভুদ একটা বাজনা বেজে উঠল। ডুম ডুম ডুমাং, ডুম ডুম ডুমাং। এবং সেইসঙ্গে অদ্ভুত গলায়

অবোধ্য ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণের মত কিছু শব্দ। ভাস্কর মুখ ঘুরিয়ে দেখল পদম তো বটেই বস্তির উৎসুক দর্শকরা আওয়াজ হওয়া মাত্র ত্রস্তে অনেক দূরে সরে গেল। সামান্য ইতস্তত করে সে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে প্রথম ঘরটার দরজার সামনে দাঁড়াতেই একটা গর্জন ছিটকে এল। ব্যাপারটা এমন আচমকা যে ভাস্করের নিঃশ্বাস এক পলকের জন্যে থমকে গেল। ঘরের ভেতরটায় প্রায় অন্ধকার। খোলা দরজা দিয়ে যেটুকু আলো যাচ্ছে তাতেই মানুষটিকে দেখতে পেল। ওরকম তীব্র জ্বলন্ত চোখ এর আগে কখনও দেখেনি ভাস্কর। তিব্বতি পোশাক পরা এক বৃদ্ধ বাবু হয়ে বসে দু-তিন ফুট লম্বা তেল-চুকচুক একটা কিছু নাচিয়ে যাচ্ছে সামনে। লোকটির মাথায় বিশ্রী ধরনের জটা। ভাস্কর একটু সামলে নিয়ে হাসবার চেষ্টা করল। তারপর হিন্দিতে বলল, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

সঙ্গে সঙ্গে হাতের সঞ্চালন থেমে গেল। লোকটি বলল, কী চাও?

কথা না বললে কী করে বোঝাব? ভাস্কর আর একটু এগিয়ে আসতেই লোকটি চিৎকার করে উঠল, তফাত যাও। নইলে তোমার মাথায় গোখরো ছোবল মারবে।

হকচকিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল ভাস্কর। সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল লোকটা সশব্দে, সবাই ভয় পায়। হুঁ হুঁ বাবা, নাগকে ভয় পায় না এমন কোনো জীব পয়দা হয়নি। ওই যে দেখ অতবড় চেহারার জীব হাতি সে পর্যন্ত নাগকে চটায় না। তুমি তো কোন ছার?

ততক্ষণে ভাস্কর বুঝেছে গোখরোর ব্যাপারটা অভিনয় মাত্র। সে এবার খাবারের প্যাকেটটা এগিয়ে ধরল, আপনার জন্যে এনেছিলাম।

কী আছে ওতে?

দামী দোকানের খাবার।

দেখি। ছুঁড়ে দাও ওখান থেকে।

একটু বিরক্ত হয়ে প্যাকেটটা ছুঁড়তেই লুফে নিল লোকটা। তারপর তড়িঘড়ি বাঁধন খুলে মুরগির ঠ্যাং বের করে শিশুর মত হাসল। ভাস্কর দেখল হাতে ঠ্যাং ধরে হায়েনার মত চিবিয়ে খাচ্ছে। যেন কোনো কালে সে এইসব খাবার খায়নি বা অনেকদিন হয়তো একেবারেই অভুক্ত আছে।

খাওয়া শেষ হলে লোকটা তৃপ্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল, কী চাই?

ভেতরে আসব?

আসতে পার। তবে হ্যাঁ, আমাকে ঘুষ দিয়ে যে কাজ হাসিল করবে সেটি হচ্ছে না। আমি সহজে ভুলি না। লোকটি মাথা নাড়ল।

সতর্ক ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল ভাস্কর। আশেপাশে সাপের কোনো চিহ্ন নেই। মাথার ওপর একটা ঝুলজমা সিলিং। একটা ভাঙা টুল দেখতে পেয়ে সেটাকে টেনে নিয়ে বসল ভাস্কর।

মতলব কী?

আমার যে মতলব আছে তা জানলেন কী করে?

এখানে তো মতলব ছাড়া কেউ আসে না। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে সাপের বিষ চাই, মানুষ মারার জন্যে বিষ চাই, নেশা করার জন্যে সাপের কৌটো দরকার—হাজির হও এখানে। সব শালা ধান্দাবাজ। তোমার ধান্দাটা কি বলে ফেল! লোকটা তার আলখাল্লার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তেল চুকচুকে সত্যিকারের সাপ বের করে এনে আদর করতে লাগল।

আপনি সাপের বিষ চেনেন?

অ্যাঁ? তুমি কোনো মাকে জিজ্ঞাসা করেছ বুকের দুধ দেখেছে কিনা! কি আজব বাৎ। আমি

বিষ চিনব না কি তুমি চিনবে? তোমার কী চাই?

ভাস্কর হাসল, আপনিই বলুন তো কী চাই?

হঠাৎ প্রচণ্ড খেপে গেল লোকটা, আমাকে মুরগি খাইয়ে কিনে নিয়েছ? খেলা হচ্ছে আমার সঙ্গে? কথা শেষ করে শিস দিল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের সাপটা তড়াক করে খাড়া হয়ে ফণা তুলল। যদিও ভাস্কর বেশ দুরত্বে বসেছিল তবু তার শরীরে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা জিজ্ঞাসা করল, ধান্দাটা কি সত্যি করে বলো। নইলে ও তোমাকে ছাড়বে না।

ওটাকে শান্ত হতে বলুন আগে নইলে কথা বলা যাবে না।

মানে?

আমাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে পারবেন না।

লোকটা এবার অদ্ভুত চোখে ভাস্করকে দেখল। তারপর ঠোঁটে একটা শব্দ করতেই সাপটা গুটিয়ে এল। সেটাকে আবার তুলে নিয়ে লোকটা বলল, শাবাশ! হিম্মতবাজ মানুষের সঙ্গে কথা বলার আরাম আছে। এখানে যারা আসে তাদের মধ্যে জুলি ছাড়া আর কারও এমন হিম্মত নেই।

নাড়া খেল ভাস্কর। বাঃ, চমৎকার!

সে নীচু গলায় বলল, ছোট সাপ রাখেন?

ছোট সাপ?

ছোবল খাওয়ার সাপ?

তুমি তো নেশা করো না।

কী করে বুঝলেন?

তোমাকে দেখে।

অন্যের জন্যে দরকার।

যার দরকার তাকেই আসতে বলো।

আপনার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাই। মিস্টার শেরিংকে চিনতেন? যার মদের দোকান ছিল?

বুড়ো শেরিং? হ্যাঁ, লোকটা নেশা করত বটে। তারপর হঠাৎ সুর পাল্টে জিজ্ঞাসা করল, তার কথা তুমি জানলে কি করে? তোমার সঙ্গে আলাপ ছিল?

হ্যাঁ, বুড়ো শেরিং আপনার কথা বলেছিল আমাকে। মদ খেলে আমার নেশা হয় না, বমি হয়ে যায়। বুড়ো বলেছিল তাই আপনার কাছে আসতে। মিথ্যে কথা বলতে গলা কাঁপল না ভাস্করের।

লোকটা মাথা নাড়ল। তারপর উঠে দাঁড়াতে আরও দুটো সাপ ওর শরীর থেকে নেমে আসনের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে রইল। লোকটা এতক্ষণ সাপের সঙ্গে বাস করছিল? পাশের দরজা খুলে লোকটা ভাস্করকে ডাকল। ভাস্কর কাছে যেতেই বলল, ওই ঘরে তিরিশটা কালনাগিনী ছিল এক সময়। এখন মাত্র পাঁচটা আছে। আর কৌটোয় ধরা সাপ আছে পনেরোটা। ওগুলো আমাকে বাঁচিয়ে রাখে। লোকেরা নিজেদের ধান্দায় আমার কাছে এসে কিনে নিয়ে যায়। তুমি যখন বুড়ো শেরিংয়ের বন্ধু তখন তোমায় বলি বুড়ো লোকটা ভাল ছিল। অন্তত আমার কাছে। অনেক টাকা খেয়েছি ওর কাছে সাপ বিক্রি করে।

ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসে ভাস্কর বলল, জুলি শেরিং কি রোজ আপনার কাছে আসে?

রোজ? রোজ কেউ আমার কাছে আসে না। জুলিকে পাঠিয়েছিল বুড়ো শেরিং। দুবার এসেছিল সে। বুড়ো বলত ছোবলে তার কাজ হয় না। তাই ইঞ্জেকশন দিয়ে বিষ ঢোকানোর কথা বলত হাতের শিরায়। আমি রাজি হতাম না। এসব কথা তোমাকে আমি বলছি কেন? হঠাৎ সচেতন হল বৃদ্ধ। তারপর সন্দেহের চোখে তাকাল।

ততক্ষণে পকেট থেকে কাঠের বাক্স বের করে শিশিটা সামনে ধরেছে ভাস্কর, এটা কোন্ সাপের বিষ?

দেখি? চকচক করে উঠল লোকটার চোখ।

ভাস্কর একটু দোনামনা করল। তারপর শিশিটা বৃদ্ধ লোকটার হাতে তুলে দিল। লোকটা চোখের সামনে শিশিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। তারপর বলল, এটা কোনো সাপের বিষ নয়।

চমকে উঠলও ভাস্কর, কী বলছেন? ঠিক করে বলুন?

লোকটা মাথা নাড়ল, আমাকে বিষ চিনিও না। আমি এই শিশিটাকে চিনি। এতে করেই কেউটের বিষ নিয়ে গিয়েছিল জুলি শেরিং। কিন্তু এখন এতে যা আছে তা সাপের বিষ নয়। বলতে বলতে ছিপি খুলে সাবধানে ঘ্রাণ নিল লোকটা। তারপর দ্রুত মাথা নেড়ে বলল, না কক্ষণো না। এ সাপের বিষ নয়, ওষুধ। শিশিটা বন্ধ করে ছুঁড়ে দিল লোকটা ভাস্করের হাতে। লুফে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, যে রোজ সাপের ছোবল খায় তাকে কেউটে কামড়ালে মরবে?

মাথা নাড়ল বুড়ো, একদিন অজ্ঞান হয়ে থাকতে পারে। হয়তো দুদিন। কিন্তু রোজ যার শরীরে বিষ ঢুকছে তার কলজে শক্ত হয়ে যায়।

পার্স খুলে দশটা টাকা বের করল ভাস্কর। তারপর বলল, অনেক ধন্যবাদ। যদি কখনও দরকার হয় আবার দেখা হবে।

টাকাটা ছুঁড়ে দিয়ে সে বেরিয়ে এল বাইরে।

ভাস্করকে স্বচ্ছন্দে হেঁটে আসতে দেখে পদম বাহাদুর এগিয়ে এল, তিনশো টাকা দাম নিল সাহেব?

তিনশো?

ওই যে কৌটোর সা কিনতে গেলেন তার দাম।

আমি সাপ কিনিনি পদম। কারণ আমার ওই নেশা নেই।

কথাটা শুনে হকচকিয়ে গেল ছেলটা। সাহেব এসেছিল সাপ কিনতে ছোবল খেয়ে নেশা করবে বলে। যাওয়ার সময় বলছে সেই নেশা নেই। সে ভাস্করের পাশে হাঁটতে হাঁটতে উশখুশ করছিল। সাহেবকে এখন তার আরও রহস্যময় লাগছে। তবে সে এটুকু বুঝতে পেরেছে এই মানুষটি বেশ ক্ষমতাবান। এর সঙ্গে লেগে থাকলে আখেরে কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। লোকটার গায়ে যে শক্তি আছে এতে তার নিজের কোনো সন্দেহ নেই। সঙ্গে আবার ছবিওয়ালা কার্ড আছে যা একমাত্র পুলিসদের থাকে বড় বড় পুলিসদের। পদম সেটা শুনেছে।

দুপুরে স্নান করে মিনিট তিরিশ শুয়েছিল ভাস্কর। বুড়ো শেরিং সাপের ছোবলের নেশা করত। তাতে তার তৃপ্তি হত না। সে ইঞ্জেকশনে সাপের বিষ ভরে নেশা শুরু করেছিল। এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিও বউ জুলিকে সেটা বুড়ো তিব্বতির কাছ থেকে সংগ্রহ করে আনতে। জুলি দুবার গিয়েছে, বুড়োর কথায় জানা গেল। ধরা যাক, প্রথমবার সে ঠিক বিষ এনেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার বিষ এনে তার জায়গায় যে জিনিসটা শিশিতে ঢেলেছিল সেটা জানতে আর কয়েক ঘন্টা লাগবে। শহরে ফিরে ভাস্কর একটা ল্যাবরেটরিতে জমা দিয়ে এসেছে সেটাকে পরীক্ষার জন্যে নিজের

পরিচয়পত্র দেখিয়ে। যদি ওই জিনিসের কিছু পরিমাণ বুড়ো শেরিংয়ের শরীরে কোনো ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে গিয়ে থাকে তাহলে ব্যাপারটায় কোনো অন্ধকার থাকে না।

সকালের ব্রেকফাস্ট বেশ ভারী হয়ে যাওয়ায় মনে হয়েছিল দুপুরের খাওয়ায় তেমন দরকার হবে না। কিন্তু এতটা পথ ওঠানামা করার পর এখন বেশ খিদে পাচ্ছে। কাল এখানে আসার পর থেকে সে লোকাল অফিসের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেনি। ওদের না জানিয়ে যতটা এগিয়ে যাওয়া যায় ততটাই ভাল। কারণ জুলি শেরিংকে সাহায্য করতে ওখানে কেউ নিবেদিত প্রাণ হয়ে আছে কিনা কে জানে। কিন্তু আজ না হোক, আগামীর কালই একবার যাওয়া উচিত। হেডঅফিসকে সে বলেনি এতটা গোপনে কাজ করবে। কে জানত, জুলি শেরিং বাড়ির চারপাশে ইলেকট্রিক তার ছড়িয়ে রাখে। ব্যাপারটা কী করে পুলিসের অনুমতি পেল তাই বিস্ময়ের।

ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করবে সে অনিল মিত্রকে। অনিল এই শহরের পুলিসের বড়কর্তা। একসময়ে ওরা খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। ভাস্কর ভেবেছিল তার উপস্থিতির কথা অনিলকেও জানাবে না। কিন্তু ল্যাবরেটারি যদি রিপোর্ট দেয় ওই শিশির ওষুধ গোলমেলে তাহলে হয়তো প্রয়োজন হবে।

এছাড়া আর একটি ব্যাপার ঘটেছে। তার অনুপস্থিতিতে কেউ এই ঘরে ঢুকেছিল। তার সুটকেশ হাতড়েছে কেউ। ইচ্ছে করেই সে ওটায় চাবি দিয়ে যায়নি। টাকা পয়সা বা অন্য দরকারি জিনিস সে চিরকাল সঙ্গেই রাখে। অতএব অনুসন্ধানকারী কোনো কিছুর তল্লাশ পায়নি। কিন্তু প্রশ্নটা হল কে এসেছিল? জুলি শেরিংয়ের পক্ষে কিছুতেই জানা সম্ভব নয় তার অস্তিত্বের কথা। তাহলে?

এই সময় দরজায় শব্দ হল। ভাস্কর সতর্ক হয়ে উঠে খুলে দিতেই শাজাহানবাবুকে দেখতে পেল। নেশায় চুর হয়ে আছেন ভদ্রলোক। দুটো পা স্থির থাকছে না। তাঁকে দেখে বললেন, সরি, আবার নম্বর ভুল করে ফেলেছি। আপনি কিছু মনে করবেন না ভাই।

আপনি খুব বেশি নেশা করছেন।

করতাম না। আপনি বললেন থেকে যেতে। আমি দেখলাম যখন চান্স পাওয়া গেল তখন মনের সুখে খেয়ে নিই। কলকাতায় গেলে তো আর মদ খেতে পাব না স্ত্রীর জ্বালায়। হাসতে চেষ্টা করেন ভদ্রলোক। ভাস্কর ওর হাত ধরল, চলুন আপনার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি। বাধ্য ছেলের মত শাজাহান ওর সঙ্গে হেঁটে এল। দরজা বন্ধ ছিল। ভাস্কর কয়েকবার আওয়াজ করার পর প্রৌঢ় এবং স্থূলকায় এক ভদ্রলোক দরজা খুললেন। তাঁর চুলগুলো ঘাড় অবধি নেমেছে। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। বেশ দুধে ঘিয়ে মানুষ তা এক নজরেই বোঝা যায়। কপালে সিঁদুরের টিপ কিন্তু শরীরে ফিনফিনে পাঞ্জাবির ওপর শাল আর লুঙ্গি করে পরা সিল্কের একটা কাপড়।

শাজাহান সেই অবস্থায় বললেন, গুরুদেব। খুব বড় তান্ত্রিক।

আইচ্ছা! আয়েন, ঘরে আয়েন। আপনর কথা এঁর লগে অনেক শুনছি। উদার গলায় আহ্বান জানালেন ভদ্রলোক।

ঘরে ঢুকে শাজাহান নিজের বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। এবং তখনই ভাস্করের চোখে পড়ল একজন মধ্যবয়সী সুদর্শনা মহিলা সামান্য আড়ষ্ট ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে তার দিকে তাকিয়ে আছে। গুরুদেব ডাকলেন ঘরে আয়েন, একটু আলাপ করি।

ভাস্কর এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসল। ভদ্রলোকের পাশ ঘেঁষে হাঁটার সময় সে বিলিতি সুবাস পেয়েছে। মানুষটি সৌখিন সেটা বোঝা যাচ্ছে। বিছানায় পড়ামাত্র কোনো মানুষের নাক ডাকে শাজাহানকে না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল। সেদিকে তাকিয়ে গুরুদেব বললেন, নন-ডিস্টার্বিং এলিমেন্ট! আপনার নিশ্চয়ই মনে হয় কেন আমি সিঙ্গল রুম না নিয়ে এর সঙ্গে শেয়ার করে আছি! তার কারণ আমার অনেকটা স্পেস চাই। সিঙ্গল রুম বড্ড ছোট। আর অন্য হোটেলে

গেলে বাঙালিদের উপদ্রব বেশি। আমি একটু সাধনা করি, শিষ্য-শিষ্যারা আসে। ওরা অবশ্য আমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু আমি মশাই কোনো গৃহীর কাছে থাকতে চাই না।

আচমকা ছিমছাম বাংলায় কথা বলা শুরু করলেন গুরুদেব। প্রাথমিক পূর্ববঙ্গীয় টান উধাও হয়ে গেল। আমার ঘরে কি খুঁজতে গিয়েছিলেন? আচমকা প্রশ্ন করল ভাস্কর।

আপনার আইডেন্টিটি। নির্বিকার মুখে জানালেন গুরুদেব।

এতটা আশা করেনি ভাস্কর। লোকটি অত্যন্ত ঘোড়েল কিংবা শয়তান।

আপনি নিশ্চয়ই বলবেন আপনার অনুপস্থিতিতে কাজটা করা অন্যায়। একশোবার অন্যায়। কিন্তু পাশের ঘরে একজন বাঙালি টিকটিকি বাস করলে সেটা কার ভাল লাগে মশাই।

আপনার ব্যবসা কী?

সেটা নাই জানলেন। কারণ আপনি তো আমার উদ্দেশ্যে আসেননি।

আমি কী উদ্দেশ্যে এসেছি সেটা আপনি জানেন?

ঠিকঠাক জানি না। তবে আপনি যখন একটা মদের দোকানে ঢুকে মদ না খেয়ে বেরিয়ে আসেন এবং সেই দোকানের মালিকের বাড়িতে চোরের মত ঢোকেন তখন এটা পরিষ্কার যে আমার সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। বিগলিত হাসলেন গুরুদেব।

তীব্র চোখে তাকাল ভাস্কর, আপনি কে?

আমি একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ। তবে হ্যাঁ, আপনার ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা অন্যায় হয়ে গেল এজন্যে আবার দুঃখ প্রকাশ করছি। এখন বলুন তো আমি আপনার কী সেবা করতে পারি? গুরুদেব ফিরে গেলেন নিজের আসনে। তারপর গাঁট হয়ে বসলেন।

সেবা?

অতিথি নারায়ণ, তার সেবা করব না?

ভাস্কর লোকটির চোখের দিকে তাকাচ্ছিল না। একটা লোক তার ঘরে ঢুকেছিল চোরের মত জানতে পেরেও সে উত্তেজিত হচ্ছে না। লোকটার নিশ্চয়ই কিছু ক্ষমতা আছে। এবং ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বললে সেই ক্ষমতায় আক্রান্ত হতে হয়। সে মহিলার দিকে তাকাল। সেই থেকে ভদ্রমহিলা একই ভঙ্গিতে বসে আছেন। এবং তখনই মনে হল উনি ঠিক চেতনায় নেই। সে বলল, আপনাকে আমি বুঝেছি। আপনার ব্যবসাটাও।

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন না কেন?

আমি নির্বোধ নই বলে।

হুম্।

যদিও আপনি জানেন আমি আপনার উদ্দেশ্যে এখানে আসিনি কিন্তু মানুষকে সম্মোহিত করে আপনার কী লাভ সেটা জানতে পারি

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর গুরুদেব বললেন, নাঃ, আপনি বুদ্ধিমান। আর বুদ্ধিমানের সঙ্গে মিত্রতা করতে আমি ভালবাসি। তবে শুনুন। আমি আজ পর্যন্ত কোনো মানুষের ক্ষতি করিনি। তবে অত্যন্ত প্রয়োজনে চাপ দিয়ে টাকা নিই যাতে একটু ভালভাবে থাকতে পারি। টাকা নিই তারই কাছে যার সেটা দেওয়ার ক্ষমতা থাকে। আচ্ছা, আপনাকে একটা উদাহরণ দেখাই—। বলতে বলতে গুরুদেব উঠে মহিলার সামনে বসলেন, কমলাদেবী, আপনি খুব ভদ্রমহিলা, আপনার স্বামী কি আপনাতে আসক্ত?

মহিলা খুব ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, আগে ছিল, এখন না।

ওঁর ব্ল্যাক মানি আছে?

অনেক। মহিলা জবাব দিলেন যেন বহুদূর থেকে স্বর ভেসে এল। এবার গুরুদেব ভাস্করের দিকে তাকিয়ে হেসে নিজের আসনে ফিরে গিয়ে বললেন, এখন ইচ্ছে করলে আমি ওঁর কাছ থেকে অনেক গোপন তথ্য জেনে নিতে পারি যা পরে আমার টাকা উপায়ে সাহায্য করবে। কোন পুলিসের বাপের সাধ্য নেই আমাকে ধরে। আসলে আমি প্রকাশ্যে কোনো ক্রাইম করছি না। তাই না? গুরুদেব মধুর হাসলেন, আমার এখানে শিষ্যরা আসে বলে হোটেলের মালিকানের কোনো আপত্তি নেই কেন তা বুঝলেন? এখন এই অবস্থায় যদি শুনি পাশের ঘরে এমন কেউ এসেছে যার গতিবিধি সন্দেহজনক তাহলে অস্বস্তি হয় কি না বলুন? তাই মন স্থির করতে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখলাম আপনার জিনিসপত্র। আগেই ক্ষমা চেয়েছি, আবার চাইছি। এবার আপনি আসুন কারণ ভদ্রমহিলার চেতনা ফিরে আসার সময় হয়েছে। আমি দশ-বারো মিনিটের বেশি আচ্ছন্ন রাখতে পারি না কাউকে।

ভাস্কর উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, আপনি চালিয়ে যান। আপনার কোনো অপরাধ যদি আমার চোখে প্রমাণ সমেত ধরা না পড়ে তাহলে তাতে আমার আপাতত কোনো মাথাব্যথা নেই। তবে প্রয়োজনে হয়তো আপনাকে আমার দরকার হতে পারে। সেই সময় কি সাহায্য পেতে পারি?

আবার বিগলিত হলেন গুরুদেব, অবশ্যই। আমি আর আটচল্লিশ ঘন্টা এখানে আছি। তার মধ্যে প্রয়োজন হলে জানাবেন।

তৃপ্তি করে দুপুরের খাওয়া যখন শেষ করল ভাস্কর তখন এই পাহাড়ি শহরে রোদ নেই, আকাশে হালকা মেঘ উড়ছে এবং ঘড়ির কাঁটা তিনটের ঘরে। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে সে সোজা ল্যাবরেটরিতে চলে এল।

রিপোর্ট দেখে চমকে উঠল সে। বৃদ্ধ সাপুড়ের কথাই ঠিক। ওটা কোনো সাপের বিষ নয়। তীব্র দুটো অ্যাসিড মিশিয়ে রাখা হয়েছে শিশিতে। সেটা ধমনীতে প্রবেশ করার কয়েক মিনিটের মধ্যে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে। এই মিশ্রণের সঙ্গে শঙ্খচূড়ের বিষের খুব সূক্ষ্ম সাদৃশ্য আছে। শরীরে বেশিক্ষণ থাকলে পোস্টমর্টেমে দুটোকে গুলিয়ে ফেলার একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। তবে অ্যাসিড এবং সাপের বিষের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান তা বিশেষজ্ঞ মাত্রেরই চোখে পড়বে। কিন্তু এখানে যে একটা কৌশল ছিল তা পরিষ্কার।

রাস্তায় নেমে মন স্থির করতে দুদণ্ড সময় নিল ভাস্কর। মিস্টার শেরিংয়ের শরীরে যদি এই বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে ওই সিরিঞ্জ এবং শিশিটি কেন নষ্ট করে ফেলা হল না? কেন সেটা সঞ্চয় করে রাখলেন বাড়ির মালিকান? কেউ কি নিজের অপরাধ প্রমাণ করার ব্যবস্থা জিইয়ে রাখে? হঠাৎ ভাস্করের মাথায় আর একটা প্রশ্ন ঢুকল। ওই সিরিঞ্জেই এই শিশির মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়েছিল? এটা জানতে পারা অবশ্য এমন কিছু অসুবিধের নয় যদি না খুব সুপটু হাতে ওটাকে বিশুদ্ধ করা হয়!

কাঁধ ঝাঁকালো ভাস্কর। অনেক হয়েছে। এর মধ্যে সে এই সত্যে পৌঁছেছে যে মিস্টার শেরিং প্রচণ্ড নেশা করতেন। মদ-গাঁজায় তাঁর শানাতো না বলে ছোট সাপের ছোবল নিতেন। শেষ দিকে তাতেও আরাম না হওয়ায় সাপের বিষ ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে শরীরে নেওয়া শুরু করেন। এই সুযোগটিকে কাজে লাগালো কেউ। সাপের বিষের বদলে অ্যাসিডের মিশ্রণ দেওয়া হয়েছিল মিস্টার শেরিংকে। কী স্বার্থ ছিল তার। বুড়ো সাপুড়ের কথা অনুযায়ী জুলি শেরিং দুবার সাপের

বিষ আনতে গিয়েছিল। সহজ ধারণায় জুলিকেই এর জন্যে দায়ী করা উচিত। এবং সেটার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। দুজনের বয়সের পার্থক্য তো ছিলই, হয়তো অবৈধ প্রেমও এটা করতে সাহায্য করেছে। তাছাড়া বৈদ্যুতিক তারের বেড়া, স্বাস্থ্যবান প্রহরী, মেয়েকে লুকিয়ে রাখার ঘটনাগুলো প্রমাণ করছে ভদ্রমহিলা সোজা চরিত্রের মানুষ নন।

কিন্তু তাহলে জুলি শেরিং এই বস্তুগুলো কেন রেখে দেবে বাড়িতে? আর ওই মোটববাইক চালিয়ে ছোকরাটাই বা কে? সে-ই কি জুলির প্রেমিক? এত সহজে সব কিছুর সমাধান হয়ে যাচ্ছে, মন মানতে চাইছিল না। সে হাতঘড়ি দেখল। আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে গুরুদেবটির সেই মানচিত্র আঁকা দেওয়ালের সামনে আসার কথা। লোকটা অপরাধ করছে ঠিকই কিন্তু এমন অপরাধ তার আওতার মধ্যে পড়ে না। সম্মোহন করে দোষের কথা জেনে নিয়ে পরে চাপ দিয়ে টাকা আদায় করা অবশ্যই আদালত ক্ষমা করবে না কিন্তু আপাতত তার এ নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। সে পুলিসে চাকরি করে না। তাকে যা করতে বলা হয়েছে সেটা করতে এসেই একেবারে সমুদ্রের মাঝখানে ডুব দিয়ে ফেলেছে। আগে এটা সামাধান হোক।

যদিও গুরুদেব কথা দিয়েছিলেন কিন্তু ভাস্করের সন্দেহ ছিল পরিচয় প্রকাশিত হবার পর ভদ্রলোক হাওয়া হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু ঠিক সময়ে ওঁকে হাজির হতে দেখে ভাল লাগল তার। পাঁচ ফুটের মধ্যে থাকলে সে কখনই লোকটার চোখের দিকে তাকাবে না বলে ঠিক করেছে। মুখোমুখি হতেই গুরুদেব বললেন, বলুন, আপনার কোন সেবায় আমি লাগতে পারি?

ভাস্কর উদাস চোখে হাসল। তারপর বলল, আপনি তো একটার পর একটা অপরাধ করে যাচ্ছেন। আজ একটা ভাল কাজ করুন।

কী কাজ? গুরুদেবের গলার স্বর বেশ চিন্তিত।

এই শহরের সমস্ত মহিলাকে আপনি চেনেন?

ওই যাঃ! এমন কথা বললেন, যেন আমি---। না মশাই, তা চিনি না।

জুলি শেরিং বলে কাউকে চেনেন?

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন গুরুদেব। তারপর বললেন, উঁহু। আমি আছি টিবেটিয়ান হোটেলে। শেরিং যখন তখন মনে হচ্ছে টিবেটিয়ান। ওই লাইনে নেই। আমার সব শিষ্য বাঙালি, মারোয়াড়ি।

ভালই হল! আপনি আমার সঙ্গে এই ভদ্রমহিলার বাড়িতে যাবেন। ধরে নিন আপনি শুনেছেন যে স্বামীর মৃত্যুর পর জুলি ওই বাড়ি বিক্রি করবে। আপনি ওখানে একটা আশ্রম খুলতে চান। তাই দরাদরি করতে এসেছিন। আর আমি আপনার শিষ্য, সঙ্গে এসেছি।

যাচ্চলে? খামোকা মিথ্যে বলতে যাব কেন?

একটা ভাল কাজ করতে। আমি দেখতে চাই আপনার সম্মোহনের ক্ষমতা কতটুকু। এই একটি কাজ করলে আপনার সঙ্গে সন্ধি হতে পারে। বেশি কিছু জানতে চাইবেন না। শুধু আমার প্রশংসা করে যাবেন।

সম্মোহন করার পর কি করতে হবে।

আপনি চলে আসবেন। আর দ্বিতীয়বার যাবেন না। মেয়েটি খুব মারাত্মক। সমস্ত বাড়ি ইলেকট্রিক তারে ঘিরে রাখে। এবং আটচল্লিশ ঘণ্টা নয়। আগামীকালই এই শহর থেকে চলে যাবেন কারণ জুলির কর্মচারিরা মারাত্মক।

কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর প্রায় নিমরাজি হয়ে গুরুদেব সঙ্গী হলেন। ভাস্করকে আর একবার তার পরিচয়পত্র দেখাতে হয়েছিল ভদ্রলোক যতই তড়পান না কেন ভাস্কর বুঝতে পারছিল তাকে দেখাব পর ওঁর মনে একটা ভয় কাজ করছে।

ক্লিন হার্ট রোডে এখন বেশ লোক চলাচল করছে। দিনটা এখনও মরে যায়নি বটে তবে পৃথিবীতে আর রোদ নেই। গুরুদেব কয়েকবার ওর চোখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু ভাস্কর সেই সুযোগ দেয়নি। নির্দিষ্ট বাড়িটির সামনে এসে ওরা দাঁড়াল। বাইরের থেকে বোঝা যাচ্ছে না জুলি শেরিং আছে কিনা। আজকের ঘটনার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে তাও তো জানা নেই। হুট করে ঢুকে গেলে বৈদ্যুতিক তারটা খুঁজতে হবে। কাল রাত্রে সে যখন ঢুকেছিল তখন যদি তারে বিদ্যুৎ থাকত তাহলেই হয়ে গিয়েছিল। এটা থেকে বোঝা গেছে জুলি বাড়িতে থাকলে তারটা নিষ্ক্রিয় থাকে।

গুরুদেবকে সাবধানে পা ফেলতে বলে গেট খুলে ভেতরে ঢুকল ভাস্কর। সেই চটপটে লোকটাকে এখন বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছে, ঠিক যেখানটায় জুলির গাড়ি থেমেছিল সেখানে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে ডাকল, কেউ আছেন? বাড়িতে কেউ আছেন?

নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল। ভাস্কর সবিস্ময়ে দেখল জুলি দাঁড়িয়ে আছে দরজার মাঝখানে, ছবির মত। অভিব্যক্তিতে কিছুটা বিস্ময়, অনেকটাই বিরক্তি। স্পষ্ট ইংরেজিতে উচ্চারণ করল, কী চাই?

ভাস্কর বলল, নমস্কার, আমার গুরুদেব আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

গুরুদেব? এবার জুলির বিস্ময় যেন বেড়ে গেল।

উনি পৃথিবী-বিখ্যাত যোগী আনন্দস্বামী। এই শহরে একটা যোগাশ্রম খুলতে চান। সেই ব্যাপারেই—আপনি ওঁর নাম শোনেননি? যতটা সম্ভব অভিনয় করার চেষ্টা করল ভাস্কর। যদিও কপালের টিপ ছাড়া গুরুদেবকে মোটেই যোগী বলে মনে হচ্ছে না। অবশ্য যোগীরা টিপ পরে কি না সেটাও তার জানা নেই।

এক মুহূর্তে দ্বিধা করল জুলি শেরিং। তারপর খানিকটা নিরাসক্ত গলায় বলল, যদিও যোগীদের সম্পর্কে আমার কোনো আগ্রহ নেই তবু আপনারা খানিকক্ষণ বসতে পারেন।

সতর্ক পায়ে প্রথমে হেঁটে গেল ভাস্কর। না পায়ে কোনো বিদ্যুতের স্পর্শ নেই। ওকে দরজার কাছে পৌঁছতে দেখে হাঁটা শুরু করলেন গুরুদেব।

জুলিং শেরিং ততক্ষণে ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলেছে। এখন বাইরে ঠান্ডা বাড়ছে। তা সত্ত্বেও জুলির শরীরে এখন লাল রঙের ম্যাক্সি যার কোমর চাপা। মহিলার বয়স আন্দাজ করা মুশকিল কিন্তু যৌবন যে অচল তা বুঝিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা আছে। ধবধবে সাদা সোফায় এমন ভঙ্গিতে বসল ভাস্কর যাতে গুরুদেব এবং জুলি মুখোমুখি বসতে পারে। জুলিং শেরিং যে তাকে দেখছে সেটা বুঝতে পেরে ভাস্কর সরল ভাবভঙ্গি করার চেষ্টা করল। গুরুদেব বসলেন। জুলি ঘরের কোণে একটা বুদ্ধমূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে বলল, কী চাই বলুন।

ভাস্কর দেখল গুরুদেব নিচের কার্পেট দেখছেন। যদিও জুলি যে দূরত্বে দাঁড়িয়ে সেটা সম্মোহনের সীমায় নয় কিন্তু ওকে এত লাজুক দেখাচ্ছে কেন? সে বলল, আমরা খবর পেয়েছি আপনি আপনার স্বামীর মৃত্যুর পর এই বাড়ি বিক্রি করে দিতে চান। গুরুদেবের ইচ্ছে এইটে কিনে নিয়ে যোগ সেন্টার খোলেন।

কে খবর দিল? খুব শীতল গলা জুলি শেরিংয়ের।

একজন দালাল।

আমি কোনো দালালকে চিনি না। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর এই বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার নেই। আপনাদের আর কিছু জানা বা বলার আছে?

ভাস্কর বিপাকে পড়ল। সে গুরুদেবকে বলল, গুরুদেব, আপনি কিছু বলুন। উনি বলছেন দালাল আমাদের ভুল সংবাদ দিয়েছে।

গুরুদেব মুখ তুললেন। তারপর উল্টোদিকের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন, ওই বুদ্ধমূর্তি কোত্থেকে এনেছেন?

আমি জানি না। কারণ এটা শেরিং পরিবারে কয়েক বছর ধরে আছে।

খুব জীবন্ত। খু-উ-ব। গুরুদেব অন্যদিকে দৃষ্টি রাখছিলেন।

এটা বিক্রির জন্য নয়। এনিথিং মোর?

নাঃ। গুরুদেব উঠে দাঁড়ালেন।

ভাস্কর বিপাকে পড়ল। যে জন্যে লোকটাকে সঙ্গে আনা তা কাজেই লাগল না। ওরকম চটপটে লোকটার পরিবর্তনের কারণ ধরতে পারছে না সে। তবু কথা বানানোর জন্যে বলল, আমাদের গুরুদেব অতীত এবং ভবিষ্যৎ বলতে পারেন। আপনার যদি তেমন কিছু জানার আগ্রহ থাকে—।

তাই নাকি! অদ্ভুত হাসি খেলে গেল জুলির মুখে, আমার ওসবে মোটেই বিশ্বাস নেই, আমি বর্তমান নিয়েই ভাবি।

ভাস্কর ইতস্তত করল। তারপর বলল, এখানে মানে আপনার বাড়ির গেট পেরিয়েই গুরুদেব বলছিলেন এই মহিলা খুব দুশ্চিন্তায় আছেন। তাই আপনাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম।

মহিলা একটুও না নড়ে কাঁধ ঝাঁকালেন। ভাস্কর দেখল গুরুদেব একবারও মহিলার দিকে তাকাচ্ছেন না। তার খুব রাগ হচ্ছিল। লোকটা নির্ঘাৎ তাকেও ভাঁওতা দিয়েছে। ওসব সম্মোহন-টম্মোহন বাজে কথা। স্রেফ ফোর টুয়েন্টি। এই বাড়ি থেকে একবার বেরিয়ে গেলে আবার ঢোকা মুশকিল হবে। কিন্তু এ ছাড়া আর কী উপায়!

পেছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বড় রাস্তায় উঠেই গুরুদেব হাত জোড় করলেন, মাপ করুন ভাই। আমি হেরে গেলাম।

হেরে গেলেন! মানে?

মানে, যেই ওই মেয়েছেলেটার দিকে তাকাতে গিয়েছি, অমনি চোখে পড়ে গেছে বুদ্ধদেবের চোখে। মাইরি কি বলব, বুদ্ধদেবের চোখে এমন জ্যোতি যে আমার সব শক্তি ভোঁতা হয়ে গেল। মেয়েছেলেটা নড়ছিল না ওখান থেকে যে বুদ্ধদেবকে এড়িয়ে সম্মোহিত করব। আপনাকেও বলতে পারছি না ব্যাপারটা। তবে হ্যাঁ, খানদানী চীজ। একে ক্লায়েন্ট করতে পারলে মোটা টাকা কামানো যাবে। তবে হ্যাঁ, ওই বুদ্ধমূর্তি—! খুব আফসোসের গলায় বললেন গুরুদেব। ব্যাপারটাকে একদম উড়িয়ে দিতে পারল না ভাস্কর। এ গল্প তো জানা, ক্রুশ সামনে থাকলে ড্রাকুলারা পালিয়ে যায়। এটাও সেরকম হতে পারে তো।

ঠিক সেই সময় মোটরবাইকটাকে উঠে আসতে দেখল সে। ছেলেটা একটা চামড়ার জ্যাকেট গায়ে চাপিয়েছে। ভাস্কর গুরুদেবকে বলল, এটাকে বধ করুন তো। বলেই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে লাগল। বাঁক ঘুরে এসে ছেলেটি এই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠল, কী চাই? সে তখন স্পিড কমিয়েছে মাত্র, চলা থামায়নি।

আপনার জন্যে জরুরি খবর আছে।

এবার অনেকটা হতভম্ব হয়ে ছেলেটি ইঞ্জিন বন্ধ করল, কে আপনারা? কী খবর? কে দিয়েছে?

গুরুদেব বললেন, একসঙ্গে তিনটে প্রশ্ন! উত্তর দিচ্ছি। আমার দিকে তাকাও। হ্যাঁ, চমৎকার এই রকম চোখাচোখি। বাঃ, উত্তর পাচ্ছ? তিন-তিনটে প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছ?

ভাস্কর অবাক হয়ে দেখল ছেলেটি সুবোধ বালকের মত ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

বাঃ! কী নাম তোমার?

এ. কে. প্রধান।

কী কাজ করো?

এখানকারক ইন্সুরেন্স অফিসের ইনচার্জ।

বাঃ! কোনো দুশ্চিন্তা আছে?

হ্যাঁ। হেড অফিস যদি জুলিদের কেসটা অ্যাপ্রুভ না করে তাহলে ও আমাকে বিয়ে করবে না। আমি বিপদে পড়ে যাব। ছেলেটা মমির মত দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। ভাস্কর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ম্যাজিক অনেক দেখেছে সে, কিন্তু এমন দ্যাখেনি। সে অন্যদিকে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, ওর এই অবস্থা কতক্ষণ থাকবে? আপনার কোনো ডোজ আছে?

তা আছে। এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত এক ঘন্টা।

তাহলে আপনি কেটে পড়ুন।

অ্যাঁ!

যা বলছি শুনুন।

না মানে এর কাছ থেকে অনেক মশলা পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে।

সেটা আপনার দরকার লাগবে না। আমি প্রশ্ন করলে উত্তর দেবে? জিজ্ঞাসা করেই সে ছেলেটির দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ল, কত বছর চাকরি হয়েছে তোমার?

বারো বছর। তেমনি পুতুলের মত উত্তর দিল ছেলেটি। ইশারা করল গুরুদেবকে চলে যেতে ভদ্রলোকের মোটেই যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি স্থান ত্যাগ করলেন।

ছেলেটিকে, প্রশ্ন করল ভাস্কর, জুলি কত টাকার ক্লেইম করেছেন?

তিন লাখ।

ওর মেয়েকে দেখেছ?

না। মেয়ে নেই।

মিস্টার শেরিং কি জুলিকে ভালবাসত?

হ্যাঁ। জুলি ভালবাসত না। জুলি ভালবাসে আমাকে।

ও। কিন্তু জুলির একটা মেয়ে আছে সতের আঠারো বয়স তার। ওই বাড়িতেই আছে। তুমি জানো না?

জানি না।

মিস্টার শেরিংকে কে হত্যা করেছে?

হত্যা করেনি কেউ! সাপের বিষ ইনজেক্ট করেছিল নিজেই। তাতে মারা গেছে। এটা অবশ্য আত্মহত্যা হতে পারে। জুলি ধরেছিল বলে ডাক্তার এটাকে হার্টফেল বলে চালিয়েছে। আমিও তাই চেয়েছিলাম।

কোন ডাক্তার? কোথায় থাকে?

পাশেই! হিল কটেজে। ডক্টর এস. কে. রায়।

ঠিক তখনই একটা গাড়ির শব্দ পেল ভাস্কর। সে তাড়াতাড়ি বলল, আজ সকালে তুমি জুলির বাড়িতে গিয়েছিলে। বুঝেছ? বলে দ্রুত রাস্তার পাশে একটা বিশাল পাথরের আড়ালে চলে এল। আর তখনই জুলি শেরিংয়ের গাড়িটা বাঁক ঘুরে হর্ন বাজাল। ভাস্কর সন্তর্পনে দেখল ব্রেক চেপে গাড়ি থামিয়ে জুলি মাটিতে নেমে অবাক হয়ে প্রধানকে দেখছে। এই যে একটা গাড়ি এল তাতেও

কোনো সম্বিৎ আসেনি প্রধানের। তেমনি শূন্য চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

মুহূর্তেই ছুটে গেল জুলি তার কাছে, প্রধান ডার্লিং, কী হয়েছে?

কে?

ও গড! আমাকে চিনতে পারছ না? আমি জুলি। তোমাকে খুব অ্যাবনর্মাল দেখাচ্ছে। কী হল তোমার? উদ্বিগ্ন হল জুলি।

ও জুলি। আমি তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম আজ সকালে। তোমার একটা মেয়ে আছে। মেয়েটার বয়স সতের-আঠারো। নামতা পড়ার মত কথাগুলো বলে যেতেই ঠাস করে চড় মারল জুলি প্রধানের গালে। তারপর উন্মাদিনীর মত ধাক্কা দিল সে, ইউ, ইউ। তুমি আজ আমার বাড়িতে চোরের মত ঢুকেছিল? আমার গার্ডকে অজ্ঞান করে আমার মেয়েকে ভুলিয়েছ তুমি?

সত্যিকারের একটা পুতুল হয়ে গেছে প্রধান। জুলির ধাক্কা তাকে ছিটকে নিয়ে গেল রাস্তার ওপাশে একটা পাথরে ওপর। পাথরটা হয়তো নড়বড়ে ছিল। প্রধানের আঘাত সেটা সহ্য করতে না পেরে কাত হয়ে পড়ল একপাশে। আর প্রধানের শরীরটা বেটাল হয়ে গড়িয়ে গেল নিচে। চিৎকার করে ছুটে গেল জুলি পাথরটা কাছে। তারপর অনেকটা ঝুঁকে নিচের দিকে তাকাল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরে দাঁড়াল। ব্যাপারটা ভাস্করের কাছে এমন আকস্মিক যে কী করবে বুঝতে পারছিল না। সে যেদিকে রয়েছে ঠিক তার উল্টোদিকে ঘটেছে ওটা। জুলি শেরিংয়ের মুখ সাদা, ভূত দেখার আতঙ্ক তার চোখে। পরমুহূর্তে সে ছুটে গেল গাড়িতে। তারপর মোটরবাইকের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল রাস্তার গতিতে নিচের দিকে। যেন জায়গাটা ছেড়ে যেতে পারলে সে বেঁচে যায়।

এইবার দৌড়ে এল ভাস্কর। পাথরটা যেখানে বেটাল হয়েছিল সেখানে এসে দেখল নিজে, বেশ নিচে ঢালু উপত্যকায় জঙ্গল ছড়িয়ে। প্রধানের শরীরটা সেই জঙ্গলে ঢুকে গেছে। শুধু তার দুটো পা দৃশ্যমান। কোন রকমে নিচে নামল ভাস্কর। প্রধানের শরীরটা স্পর্শ না করে বুঝল এখনও প্রাণ আছে। মাথার কাছাকাছি কোথাও আঘাত জব্বর হওয়ায় রক্তপাত হচ্ছে। ছেলেটা এখনও অচেতন।

এই মুহূর্তে প্রধানকে তুলে নিয়ে ওপরে ওটা তার একার পক্ষে অসম্ভব। সে আর দাঁড়াল না। ওপরে উঠে আসতেই দেখতে পেল কালকের সেই বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা ফিরছেন। বৃদ্ধা বৃদ্ধাকে কিছু বলতেই তিনি গলা তুললেন, হেই জেন্টলম্যান, গুড ইভনিং! তুমি কি এখনও বাড়িটা খুঁজে পাওনি?

ভাস্করের মনে পড়ল। বুড়ো কালকের কথা মনে রেখেছেন। সে বলল, হ্যাঁ, পেয়েছি। সেখানে থেকেই আসছি।

এই সময় পরিত্যক্ত মোটরবাইকটার ওঁদের চোখে পড়ল। বৃদ্ধ বললেন, এটা কার বাইক? কাউকে তো দেখছি না।

বৃদ্ধা বললেন, মনে হচ্ছে সেই ছোকরাটার, যে জুলির বাড়িতে প্রায়ই আসে। দ্যাট নটরিয়াস চ্যাপ! লেটস গো।

ওরা হাঁটা শুরু করতেই ভাস্কর জিজ্ঞাসা করল, মাপ করবেন, এখানে কারও বাড়িতে টেলিফোন আছে?

আছে। ডাক্তার রায়ের বাড়িতে আছে। হিল কটেজ।

খুব দূরে?

না! ওইতো, জুলি শেরিংয়ের নেক্সট-ডোর নেবার।

ভাস্কর দেখল এখান থেকে হেঁটে শহরে পৌঁছে পুলিস কিংবা হাসপাতালে খবর দিতে যে সময় লাগবে তাতে রাত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। ততক্ষণ প্রধানের শরীর ওইভাবে পড়ে থাকলে বাঁচার সুযোগ থাকবে কিনা সন্দেহ। বরং একজন ডাক্তারের বাড়ি থেকে টেলিফোন করতে পারলে হাসপাতাল খুব দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ডাক্তার রায়ের বাড়িটা তাকে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। গেট খুলে কম্পাউন্ডে ঢুকতে ভাস্করের খেয়াল হল প্রধানের কথা। এই ডাক্তারই মিস্টার শেরিংয়ের ডেথ-সার্টিফিকেট লিখেছেন জুলির চাপে। যদিও প্রতিবেশী তবু গাছপালার জন্যে জুলির বাড়ির এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। এই মানুষটির কথার ওপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে।

ডাক্তার সাহেব যে বাড়িতেই থাকবেন এতটা আশা করেনি ভাস্কর। সে সোজা নিজের পরিচয় পত্র দেখিয়ে বলল, একটা টেলিফোন করতে চাই, খুব জরুরি। অনুমতি দেবেন?

ডাক্তার পরিচয়পত্রটি দেখার পর সন্দেহের চোখে তাকিয়েছিলেন, অনুরোধ শুনে সহজ হলেন, অবশ্যই। ওই কোণে রয়েছে।

পর পর দুটো টেলিফোন করল ভাস্কর। প্রথমটা হাসপাতালে। দ্বিতীয়টা লোকাল থানায়। দু'জায়গায় জানাল ক্লিন হার্ট রোডের বাঁকে একটা মোটরবাইক পড়ে আছে। তার পাশে খাদের দিকে উঁকি মারলে নিচে একটি মানুষের শরীর দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এখনও জীবিত। যদি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলে বেঁচে যেতে পারে। দু'জায়গা থেকেই প্রশ্ন করা হল, তার পরিচয় কী? জবাব না দিয়ে টেলিফোনের লাইন কেটে দিল সে। .

ডাক্তার রায় ইনফরমেশনগুলো শুনছিলেন। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমাদের রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? কোথায়?

ভাস্কর তাকে থামাল, আপনি বসুন। পুলিস আর হাসপাতাল তাদের দায়িত্ব বুঝবে। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

আমার সঙ্গে? আমি কী করেছি?

যদি বলি এই অ্যাক্সিডেন্টের সঙ্গে আপনিও জড়িত।

কী আজেবাজে কথা বলছেন? আমি আজ সারাদিন বাড়ি থেকে বের হইনি। তাছাড়া কার অ্যাক্সিডেন্ট হল তাও জানি না। কে আপনি?

আমার পরিচয় তো একটু আগেই দেখতে পেয়েছেন। আমরা অনেক কিছু করি না জেনে যা অন্য ঘটনাকে ডেকে আনে। মিস্টার শেরিং-এর মৃত্যুটাকে কি আপনার নর্মাল ডেথ মনে হয়েছিল ঈষৎ ঝুঁকে একটা সোফায় বসল ভাস্কর। ইঙ্গিতে ডাক্তারকেও বসতে বলল।

হতবাক হয়ে গেলেন কয়েক মুহূর্ত। শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞসা করলেন, আমাকে এই প্রশ্ন কেন?

কারণ আপনি সার্টিফিকেট লিখেছিলেন। ডাক্তার রায়, আপনার সম্পর্কে আমার কোনো অসদ্ভাব নেই। আমি শুধু আলোচনা করতে চাই এই পরিচয়পত্রের জোরে। বসুন। ভাস্কর আবার কার্ডটা বের করল।

কার্ডটার দিকে আর একবার তাকিয়ে ডাক্তার রায় বিপরীত সোফায় বসলেন। ভাস্কর জিজ্ঞসা করল, এটাকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে হল কেন?

কারণ ওটা মিস্টার শেরিংয়ের কাছে অস্বাভাবিক নয়। ওঁর হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হার্ট অ্যাটাক। ডাক্তার রায় চেষ্টা করছেন স্বাভাবিক হতে।

কিন্তু কেন হার্ট অ্যাটাক্‌ড হল? সাপের বিষে?

আই সি! আপনি দেখছি সবই জানে। তাহলে আপনাকে আমি খুলেই বলি। মিস্টার শেরিং আমার পেশেন্ট ছিলেন না। পেশেন্ট ছিলেন মিসেস শেরিং। ওঁর প্রায়ই মাথার যন্ত্রণা হয়। মিস্টার শেরিং নেশা করতেন। ওঁদের কোনো দাম্পত্য জীবন ছিল না। মদ গাঁজা ছাড়িয়ে ভদ্রলোক শুনতাম সাপের ছোবল নিতেন। শেষ পর্যন্ত সেটাও খুব কাজে আসত না। তখন মিসেস শেরিং ওকে নিয়ে এলেন আমার কাছে। এসব শুনে আমি পরামর্শ দিলাম নেশা ছাড়ার জন্যে। কিন্তু তখন উনি এমন স্টেজে চলে গেছেন যে নেশা না করলে বাঁচবেন না। আমার কাছে শেরিং এলেন কী করে ইঞ্জেকশন নিতে হয় জানতে। আমি ওঁর পরীক্ষা করিয়ে ছিলাম। কোনো বিষাক্ত সাপের বিষ ওঁকে কাহিল করতে পারবে কি না সন্দেহ ছিল। তবে আমি নিষেধ করেছিলাম। ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে বিষ শরীরে নেওয়াতে আমার আপত্তি ছিল। অত্যন্ত অন্যায় ব্যাপার--

ডাক্তারকে থামিয়ে ভাস্কর প্রশ্ন করল, জুলি আপত্তি করেনি?

আমার আড়ালে করেছে কি না জানি না তবে বলেছিল কোনো মানুষ যদি ওই নেশা করে আরাম পায় তো সে কী করতে পারে। আমি ওর কষ্টটা বুঝতে পেরেছিলাম। যাক, মিস্টার শেরিং নিয়মিত বিষ শরীরে নিতে লাগলেন ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে। কিন্তু প্রায় মাসখানেক বাদে একদিন ওঁর দোকানের ভিতরের ঘরে ইঞ্জেকশান নিয়ে কাউন্টারে বেরিয়ে আসতেই হার্ট অ্যাটাক হল। বিষ তিনি স্বইচ্ছায় নিতেন। তাই কেউ তাঁকে হত্যা করেনি। তিনি বিষ নিয়মিত না নিলে অসুস্থ হয়ে পড়তেন। এবং আত্মহত্যা করার বিন্দুমাত্র বাসনা ছিল না। ওই পদ্ধতিতে বিষ নিয়ে মাসখানেক বহাল তবিয়তে ছিলেন। তাই এটাকে আমি আত্মহত্যাও বলতে পারি না।

কেন? এই বিষ তো শেষ পর্যন্ত মরণ ডাকতে পারে জেনেও তিনি নিতেন।

সিগারেট খেলে ক্যান্সার হতে পারে জেনেও মানুষ সিগারেট খায়। তার জন্য কি আপনি বলবেন সে আত্মহত্যা করেছে? দার্শনিকভাবে হয়তো বলা যায় কিন্তু আইনত? হত্যা কিংবা আত্মহত্যা যখন নয় তখন আমার পক্ষে নর্মাল ডেথ সার্টিফিকেট দিতে বাধা ছিল না।

কিন্তু আপনি ইতস্তত করেছিলেন। জুলি শেরিং আপনাকে চাপ দিয়েছিল সেটা লিখতে, তাই না?

অবাক হলেন ডাক্তার রায়, কে বলেছে আপনাকে?

ব্যাপারটা অস্বীকার করতে পারেন?

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন ডাক্তার রায়, এই খেলে আমার ক্ষতি হলেও হতে পারে, আর এটা খেলে আমার ক্ষতি আজ নয় কাল হবেই— এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। তাই আমি সামান্য দ্বিধায় ছিলাম, আত্মহত্যা লিখব কি না। কিন্তু জুলি আমাকে বোঝাল যে মিস্টার শেরিং মরতে চাননি। তিনি ইঞ্জেকশন নিয়ে কাস্টমারদের দেখাশোনা করবার জন্যে বাইরে এসেছিলেন। এই সময় হয়তো বিষ ওঁর হৃদযন্ত্র স্তব্ধ করে বা- -

থামলেন কেন?

কোনো বিষের প্রতিক্রিয়া নয়। মিস্টার শেরিংয়ের বয়স হয়েছিল। হার্ট অ্যাটাক হওয়ার যে কোনো কারণ থাকতে পারে। ডাক্তার রায় জানালেন।

কিন্তু ধরুন, সেইদিন মিস্টার শেরিংয়ের সাপের বিষের শিশিতে যদি কেউ অন্য কিছু তীব্রতম বিষ ঢেলে রাখে এবং শেরিং সেইটাকেই সাপের বিষ ভেবে শরীরে ইনজেক্ট করেছিলেন, এরকম ভাবনার কথা আপনার মাথায় এল না কেন? ওঁর বডি পোস্টমর্টেম না করে দাহ করতে দিলেন? কেটে কেটে প্রশ্নগুলো করার সময় ভাস্কর বুঝতে পারছিল ভদ্রলোক সত্যি নির্দোষ। কোনো মানুষের মাথায় দ্বিতীয় চিন্তা প্রবেশ করলে যে প্রতিক্রিয়া হয় সেটাই দেখছে সে।

মিস্টার রায় হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞসা করলেন, এ আপনি কী বলছেন? কে খুন করবে ওই বৃদ্ধকে! তিনি তো কারো কাজে, বিশেষ করে মিসেস শেরিংয়ের কোনো ব্যাপারে বাধা দিতেন না। না-না, এ হতে পারে না।

কিন্তু আপনার মনে দ্বিধা এসেছিল ডেথ সার্টিফিকেট লেখার সময়।

স্বাভাবিক। আসতই না, যদি লোকটার নেশার অভ্যেস না থাকত। তাছাড়া এটা হত্যা বা আত্মহত্যা না হলেও ওই কারণেই নাকি সে কিছু টাকা পাবে না ইন্সুরেন্স কোম্পানি থেকে। ব্যাপারটা সমর্থন করেছিল প্রধান। আমি ভাবলাম বিধবা মেয়েটা কেন বিনা দোষে বঞ্চিত হবে।

ডাক্তার রায়ের কথা শেষ হওয়া মাত্র ভাস্কর উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, আপনি মনে হয় নির্দোষ। তবে সেটা প্রমাণিত হবে যদি আমি আপনার কাছে এসেছিলাম এই সংবাদ তৃতীয় ব্যক্তি না জানে।

বিস্মিত মানুষটিকে পেছনে রেখে ভাস্কর বাইরে এসে দেখল মৃদু ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সন্ধে হয়ে এল বলে। আর দু-পা হাঁটতে না হাঁটিতেই পথে আলোগুলো জ্বলে উঠল। দুর্ঘটনার জায়গায় এসে দেখল মোটরবাইকটা রয়েছে। পুলিসের একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকজন পুলিশ কিছু খোঁজাখুঁজি করছে। টর্চ জ্বেলে ওরা নিশ্চয়ই প্রধানের শরীরটাকে এতক্ষণে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে। এবং তখনই ওর খেয়াল হল। প্রধানকে বাঁচাতে হবে। যে করেই হোক। দুর্ঘটনার জন্যে যদিও না মারা যায় তাহলে ওকে আজকালের মধ্যে মেরে ফেলার চেষ্টা হবেই। জুলি শেরিং কোনো প্রমাণ রাখতে চাইবে না। এবং তখনই সে অনিল মিত্রকে দেখতে পেল। দুজন পুলিসের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিচ থেকে উঠে আসছে।

ভাস্করকে দেখে চমকে উঠল অনিল মিত্র। তারপর চিৎকার করে বলল, হোয়াট এ সারপ্রাইজ! তুমি এখানে?

এই তো। কেমন আছ? ভাস্কর হাসল।

ছিলাম ভালই। এইমাত্র একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আবার ঠিক এটাকে অ্যাকসিডেন্ট বলতেও মন চাইছে না। লোকটা আমাদের পরিচিত। মোটরবাইকটাকে মাঝ রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে নিচের ওই ঝোপে পড়েছিল। ভঙ্গি দেখে বোঝাই যায় আত্মহত্যা করতে চায়নি। কোনো গাড়ির সঙ্গে ক্র্যাশ হলে মোটরবাইকটা নিটোল থাকত না। নিজের মোটবাইকটাকে ওখানে দাঁড় করিয়ে ছেলেটা কী করে ওই খাদে গিয়ে পড়ল সেটাই বুঝতে পারছি না।

রহস্যজনক ব্যাপার: ও বেঁচে আছে?

হ্যাঁ। মাথায় চোট লাগায় বেহুঁস হয়ে আছে। হসপিটালইজড্ করা হয়েছে।

ওখানে গার্ড রাখো যদি ছেলেটিকে বাঁচাতে চাও।

মানে? যদি এটা হত্যাকাণ্ড হয় তাহলে হত্যাকারী চাইবে না ও বেঁচে থাকুক। কে ধরা পড়তে চায় বলো?

অনিল মিত্র চিন্তা করল একটু, তুমি ভালই বলেছ। ছেলেটার স্টেটমেন্ট নেওয়া যায়নি এখনও। এখানে তো কোনো ক্লুও পেলাম না। কাল সকালে আর একবার আসব। বাই দ্য বাই, উঠেছ কোথায়?

কাঞ্চনজঙ্ঘা লজ।

যাচ্চলে! ওটা তো টিবেটিয়ানদের। খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে। কী ব্যাপার!

কোনো ব্যাপারই নয়।

অনিল মিত্র, ওকে হোটেল পর্যন্ত লিফট দিল। বাজারের গায়ে ওর গাড়ি থেকে নামিয়ে বারংবার

বলল সোজা ওর কোয়ার্টার্সে চলে আসতে। ভাস্কর কোনো কথা জানায়নি। দেখা যাক, আর একটু দেখা যাক। এমন কি একজন বাঙালি যে টেলিফোনে খবরটা দিয়েছিল কিন্তু পরিচয় জানায়নি—তাকে নিয়েও দুশ্চিন্তা অনিল মিত্রের।

অনিলের জিপটা চলে যাওয়া মাত্র ভাস্করের মনে হল এবার একটু ভারী বয়সের পোশাক পরা দরকার। সে হোটেলের দিকে কয়েক পা এগিয়ে আসতেই সামনে দাঁড়াল পদম বাহাদুর, সেলাম সাহেব।

ভাস্কর হাসল, এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

আরে বাপ! আপনাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি তামাম শহরে। এখন দেখছি খোদ এস-পি সাহেবের জিপ থেকে নামছেন। ওই জিপ দেখতে পেলে আমরা ত্রিসীমানায় আসি না। এস-পি সাহেব আপনাকে যখন নামাতে এসেছিল তখন আপনি আরও ভারী অফিসার। হুকুম করুন সাব, এখন আমাকে কী করতে হবে? পদম সোজা হয়ে দাঁড়াল।

তুই এখানে একটু অপেক্ষা কর। আমি হোটেল থেকে ঘুরে আসি।

নিজের ঘরে দরজা খুলতে গিয়ে ভাস্কর শুনল পাশের ঘরে দরজাটা খুলে গেল। তারপর টলায়মান পায়ে শাজাহান যেন এগিয়ে এল, কী ব্যাপার স্যার! গুরুদেব হাওয়া হয়ে গেলেন!

তাই নাকি?

হ্যাঁ বিকেলে বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে মালপত্র নিয়ে উধাও।

হোটেল চেঞ্জ করেননি তো?

না-না। আমি নিজে ওকে লাস্ট বাসে তুলে দিয়েছি। আর হ্যাঁ, এই চিঠিটা আপনাকে দিতে বলে গিয়েছিলেন। শাজাহানের কাঁপা হাত থেকে খামটা নিয়ে ছিঁড়ল ভাস্কর। সাদা কাগজে গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে, মহিলা মারাত্মক। চোখের সামনে যা দেখলাম তারপর আর এই শহরে থাকা আমার পক্ষে সেফ নয়। উদোর পিন্ডি চিরকালই বুধোর ঘাড়ে পড়ে! মুচকি হেসে চিঠিটা পকেটে রেখে দরজা খুলল সে। শাজাহানকে কোনো কথা বলার সুযোগ দিল না ভাস্কর। অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছেন গুরুদেব। স্থান ত্যাগ করেও তিনি হোটেলে ফিরে আসেননি। কোনো আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। নাটকটা দেখার পর মনে হয়েছে ছেলেটির পড়ে যাওয়ার পেছনে সম্মোহন কাজ করেছে। আর ঝুঁকি নিতে চাননি ভদ্রলোক। ভালই হল। লোকটা যা করত সেটার দ্বিতীয় অংশে অপরাধ ছিল। চাপ দিয়ে টাকা আদায় করা আইনের চোখে অন্যায়। কিন্তু সম্মোহনের প্রভাবে যদি কেউ ভেতরের কথা বলে দেয় তাহলে আইনের কিছু করার আছে কি না শক্ত। তবে লোকটা ঠিক সময়ে বিদায় নিয়েছে।

জামাকাপড় পাল্টে বাইরে এল। তার আগ্নেয় অস্ত্রটিতে ছটি গুলি আছে। ঈশ্বর করুন, এগুলোর একটাও যেন তাদের স্থান ত্যাগ না করে। এখন ভাস্করের পরনে ব্যাংলারের জিনস স্কিন টাইট চামড়ার জ্যাকেট, মাথায় ঠান্ডা থেকে বাঁচবার জন্যে বারান্দা দেওয়া টুপি। শাজাহানের সেনের সঙ্গে ইচ্ছে করেই দেখা করল না। ফালতু কিছু সময় নষ্ট হবে। বাড়ি থেকে পালিয়ে লোকটা এখানে আসে শুধু মদ্যপান করতে। মানবচরিত্র বুঝতে চাওয়া ঈশ্বরেরও অসাধ্য।

পদম বাহাদুর চটপট চলে এল, সেলাম সাহাব। ভাস্কর বুঝতে পারছিল ওর চোখ খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যেন হিন্দি ছবির কোনো নায়ককে সে চোখের সামনে দেখছে। ভাস্কর বলল, সেই মদের দোকানে যাব। তোর সঙ্গে ছুরিটা আছে তো?

জী সাব! যেন একটা কাজের ইঙ্গিত পেল পদম।

পদমকে পায়ের গোড়ালিতে নিয়ে ভাস্কর ম্যাল রোডে যখন উঠে এল তখন বড়

দোকানগুলোতে ঝকঝকে আলো জ্বলছে! উল্টো রাস্তা দিয়ে নামতে নামতে পদম বলল, সাহেব, আমাকে কি ভেতরে ঢুকতে হবে? ভাস্কর মাথা নাড়ল।

কিন্তু সাহেব, আমি তিব্বতিদের মদ সহ্য করতে পারি না।

করতে হবে না।

অর্থ ধরতে পারল পদম। ভাস্করের সঙ্গে হাঁটার তাল রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছিল সে। এই পথে আলো আছে। কিন্তু সাতটা বাজতে না বাজতেই চারধার কেমন নিঝুম হয়ে গেছে। পাশের বাড়িগুলোর কোনো শব্দ নেই এই শহরে রাত আসে সন্ধের ঘাড়ে চেপে। এবং এলেই মানুষজন ঝিমিয়ে পড়ে।

খুশ-মেজাজী পানশালার সামনে এসে পদমের পা থেমে গেল: ভাস্কর বলল, কী হল?

আমাকে ভেতরে যেতেই হবে সাব?

ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে মায়া হল ভাস্করের। সে জিজ্ঞসা করল, তোর মতন মাস্তান ভেতরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে কেন?

একটা গোলমাল হয়েছিল তিন মাস আগে ওখানে। তারপর ওদের বারম্যান জোহাং বলে দিয়েছিল আমি যেন ভেতরে আর না ঢুকি। ও শালা ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে।

ঠিক আছে। আমার বন্দুকে আওয়াজ শুনলেই তুই চলে আসবি। আমি খুব বিপদে না পড়লে আওয়াজ করব না।

ভাস্কর আর দাঁড়াল না। মিসেস শেরিংয়ের গাড়িটা দেখা যাচ্ছে। রাস্তার একটা ধারে পার্ক করা আছে। ভেতরে আলো জ্বলছে। ফাঁকা বারান্দায় পা দিয়ে দরজাটা ঠেলতেই তীব্র মদের গন্ধ নাকে এল। সোজা ভেতরে ঢুকতেই স্প্রিং-এর চাপে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এখন প্রায় প্রতিটি টেবিল ভরতি। প্রত্যেক টেবিলে একজন করে বসে পান করছে। একটা বাজনা বাজছে রেকর্ডে। যারা খাচ্ছে তারা কোনো কথা বলছে না। কাউন্টারের দিকে তাকাল সে। সকালের সেই স্বাস্থ্যবান লোকটি নেই। তার বদলে যে খদ্দেরদের দেখছে তাকে চিনতে পারল ভাস্কর। আজ সকালেই তাকে অজ্ঞান করে রেখেছিল। তার মানে শেরিংদের বাড়ির প্রহরী বদল হয়েছে। আরও শক্তিশালী এবং বিশ্বাসী লোক ওখানে গিয়েছে পানশালা ছেড়ে।

বসার জায়গা না পেয়ে সে সামনে পা বাড়াতে বারম্যান মুখ তুলে তাকাল। লোকটার পক্ষে তাকে চেনা মোটেই সম্ভব হবে না। কারণ সে ওকে পেছন থেকে আঘাত করেছিল। কাউন্টারে পৌঁছে সে মেজাজে বলল, এ কেমন বার যেখানে বসার জায়গা পাওয়া যায় না! আমি কি দাঁড়িয়ে খাব? লোকটা তার চেরা চোখে দেখল, এরা সব রেগুলার কাস্টমার। দাঁড়িয়ে খেতে না ইচ্ছে চলে যেতে পারেন।

আমি তো চলে যেতে আসিনি?

লোকটা একটু অবাক হয়ে ভাস্করকে দেখল। ভাস্কর বলল, ভেতরে তো অনেক ঘর দেখছি। তার একটায় চেয়ার নিয়ে বসতে পারি।

ওখানে বসার জায়গা নেই। খেতে হলে এখানেই, নইলে কেটে পড়ো। ঝামেলা-বাজ লোকদের জন্যে আমার অন্য অবস্থা আছে।

তাই নাকি? আমি ওই ঘরটায় বসব। ইঙ্গিতে কাউন্টারের পেছনের একটা ঘর দেখাল ভাস্কর।

কি? মেমসাহেবের ঘরে? চটপটে হাতে লোকটা কাউন্টারের নিচ থেকে একটা রবার জড়ানো রড বের করতেই ভেতর থেকে জুলি শেরিং বেরিয়ে এল, হোয়াটস দ্য প্রব্লেম?

বারম্যান কিছু বলার আগেই ভাস্কর বলল, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

হু দ্য হেল য়ু আর?

ভাস্কর আশ্বস্ত হল। যাক ভদ্রমহিলা হয়তো টুপি এবং স্থানের জন্যেই তাকে এখনও চিনে উঠতে পারেননি।

আপনার স্বামীর ইন্সুরেন্স-এর ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন ছিল।

ইন্সুরেন্স?

ভাস্কর পকেট থেকে আইডেন্টিটি কার্ডটা বের করে খুলে মহিলাকে দেখাল। এক মুহূর্ত দ্বিধা। তারপর জুলি শেরিং মাথা নেড়ে বলল, ভেতরে আসুন। তারপরেই তিব্বতি ভাষায় কিছু নির্দেশ বারম্যানকে দিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল। বারম্যান তখনও তীব্র চোখে ভাস্করকে দেখছে। ভাস্কর আর ইতস্তত না করে কাউন্টারের সুইংডোর খুলে ভেতরে পা দিল।

দরজায় এসে দাঁড়াতেই সে দেখল একটা বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে বসে আছে জুলি। তাকে দেখামাত্র উল্টোদিকের একটা চেয়ারে ইশারা করে বলল, বসুন।

ভাস্কর দেখল ঘরে আর একটা দরজা আছে। আসবাব বলতে ওই টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার। দেওয়ালে এক টিবেটিয়ান বৃদ্ধের ছবি। সম্ভত উনিই মিস্টার শেরিং। পাকানো জীর্ণ শরীর।

আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো!

এই টুপি এবং চামড়ার জ্যাকেট বিভ্রান্তি এনেছে। সে ধীরে ধীরে টুপিটা খুলে টেবিলে রাখতেই জুলি চমকে উঠল, আরে আপনিই আজ বিকেলে একজন গুরুদেবকে সঙ্গে নিয়ে আমার বাড়িতে এসেছিলেন না?

ঠিকই।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কোন পরিচয়টা সত্যি?

ওটা প্রমাণ করা মুশকিল হবে। আর এই আইডেন্টিটি কার্ড সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয় নিশ্চয়ই?

তখন প্রশ্ন করলেন না কেন?

তখন শুধু আপনাকে দেখতে গিয়েছিলাম। শুনুন, হেড-অফিস আমাকে পাঠিয়েছে। মিস্টার শেরিংয়ের নর্মাল মৃত্যুর খবর থাকা সত্ত্বেও হেড-অফিস নিজের লোক দিয়ে যাচাই করে নিতে চায়। কারণ টাকার অঙ্কটা মোটেই কম নয়। ভাস্কর অত্যন্ত তৎপর গলায় কথাগুলো বলে চোখের দিকে তাকাল।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল জুলি, বুঝলাম। আমার স্বামীর অত্যন্ত স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। এখানে এক হল ঘর মানুষ দেখেছে তিনি বুকের যন্ত্রণায় ঢলে পড়েছেন। কেউ আঘাত করেনি। ডাক্তার পরীক্ষা করে সেই রকম সার্টিফিকেট দিয়েছে। এখন আপনার কোম্পানি আমাকে টাকাটা দিতে বাধ্য। যদি না দেয় তাহলে আমি কেস করব।

কেসে আপনি জিতবেন কি হারবেন সেটা আমার ওপর নির্ভর করছে। কথাটা বলে উঠে দাঁড়াল ভাস্কর। তারপর দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, প্রধান আমাকে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন সে এখন কোথায়?

মুহূর্তেই জুলির মুখ মোমের মত সাদা হয়ে গেল, কোথায়?

হাসপাতালে। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছে।

প্রধান কী বলেছে আপনাকে? নির্লিপ্ত গলায় কথা বলতে পারছিল না জুলি।

আজ সকালে সে আপনার বাড়িতে গিয়েছিল।

ইয়েস। হি ইজ এ চিট্। থিফ। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল জুলি।

হতে পারে। কিন্তু আপনার বাড়িতে আর একজনের অস্তিত্ব সে জানিয়েছে।

দাঁড়ান। ভাস্করের চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে কাঁধ নাচাল জুলি। তারপর বলল, আমাকে ভয় দেখিয়ে কেউ পার পায়নি কিন্তু।

ভয় দেখাতে যাব কেন?

বেশ, কাল ন'টায় আমার ওখানে আসুন। ব্রেকফাস্ট করবেন। হঠাৎ জুলি প্রসন্ন মুখে নিমন্ত্রণ করল।

ঠিক আছে। তবে দয়া করে ইলেকট্রিক অফ করতে ভুলবেন না। প্রধান এই তথ্যটাও জানিয়েছে। নমস্কার।

লম্বা পা ফেলে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে কাউন্টারে দাঁড়াল। তারপর মদ্যপানরত মানুষগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে সে হলঘর পেরিয়ে দরজা খুলে বাইরে এসে পদম বাহাদুরকে খুঁজল। কাঠের সাঁকোটা পার হয়ে আসা মাত্র পদম শিস বাজিয়ে অস্তিত্ব জানাল।

পদমকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটছিল ভাস্কর। এখানে অবধি যা অঙ্ক পাওয়া গিয়েছে তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না মিস্টার শেরিংকে কেউ খুন করেছে। এবং এই কেউটির মুখোশ খুলে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাস্করের মনে একটা খুঁত খুঁত ভাব থেকেই যাচ্ছিল। জুলি শেরিং জানে এটা হত্যাকাণ্ড প্রমাণিত হলে সন্দেহটা তার ওপরেই প্রথম পড়বে। এবং সেটা জেনেও কেন সে বিষের শিশি এবং সিরিঞ্জ রেখে দিল বাড়িতে? হোক না লুকোন জায়গায় কিন্তু নষ্ট করল না কেন? দ্বিতীয়ত বাড়িতে সে নিজের মেয়েকে অত্যন্ত গোপনে রেখে দিয়েছে যা তার আপাতত বন্ধু প্রধানও জানত না। যদি সত্যি সে প্রধানের সঙ্গে জড়িত থাকত তাহলে এই সত্য একদিন না একদিন ফাঁস করতেই হত।

ঠিক এই সময় একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। গাড়িটা তীব্র গতিতে ওপরে উঠে আসছে। পদম বলল, সরে আসুন সাহেব। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে ড্রাইভারের মাথার ঠিক নেই। এই বলে সে রাস্তা থেকে এক পা উঁচুতে উঠে দাঁড়াল। ভাস্কর এবার আলোটা দেখতে পেল। এখানে পথ বেশি চওড়া নয়। দুপাশের পাহাড় নেমে এসে পথটাকে যেতে দিয়েছে। আলোটা এ পাহাড় সে পাহাড় ঝেঁটিয়ে উপরে উঠে সোজা হল। যেন বিশাল চোখে দুটো হায়না তেড়ে আসছে। ড্রাইভারের হাত কাঁপছে। পদম আবার চেঁচালো, হঠ যাইয়ে সাব।

এবং শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে ওপরে উঠতেই গাড়িটা তীব্র গতিতে পাহাড়ের যে ধারে ওরা হাঁটছিল সেদিকটা ঘেঁষে তেড়ে এসে না পেরে ছিটকে এগিয়ে গেল সামনে। তখনই দড়াম করে একটা আওয়াজ এবং কাচ ভেঙে পড়ার শব্দ ছড়িয়ে পড়ল রাত্রের নিস্তব্ধতায়।

পদমের চাপা গলা শোনা গেল, শালে শুয়ার কি বাচ্চা!

পাথরটা ছুড়েছে পদমই। সেটা গিয়ে সোজা আঘাত করেছে গাড়ির পেছনের কাচে। ড্রাইভার বোধহয় এইটে আশা করেনি, থতমত হয়ে ব্রেক করতেই বোধহয় চেতনায় ফিরে এল। ভাস্করেরা দৌড়ে যাওয়ার আগেই সে গাড়ি সমেত উধাও। পদম বলল, পাহাড়ে এইরকম খুবই হয়। মাল খেয়ে সব শালা আমজাদ হয়ে যায়। কিন্তু ইচ্ছে করলে কাল-পরশু এই গাড়িটাকে ধরা যাবে। কাচ পাল্টাতে ওকে গ্যারেজে যেতেই হবে। সাহেব যদি চান তাহলে এই কাজটুকু করতে পারি।

ভাস্কর মাথা নাড়ল, তার দরকার হবে না। আমি পুলিসকেই বলব। তুই বরং একটা কাজ কর। সামনের বাঁকটা থেকে আড়ালে চলে যাবি। দেখবি কেউ আমার পিছু নিয়েছে কি না। যদি নেয় তাহলে দুপুরে যে হোটেলে খেয়েছিলাম সেখানে এসে আমাকে জানাবি। ঠিক আছে?

একটা কাজের মত কাজ পেল যেন পদম। বাঁকটা আসা মাত্র সে নিমেষের মধ্যেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ভাস্কর পকেটে হাত ঢুকিয়ে একা বড় বড় পা ফেলে হেঁটে আসছিল। এখন এই শহরটা আপাত চোখে ঘুমন্ত। শীত আরও বাড়ছে। কিন্তু ভাস্কর ভাবছিল জুলি শেরিং এই ভুলটা করতে গেল কেন? নির্জন পথে গাড়ি চাপা দিয়ে কাউকে মারতে যাওয়া সব সময় সফল হবে এই রকম ভাবনা এল কেন মাথায়? এতক্ষণ জুলি সম্পর্কে তার যে দ্বিধাটা জন্মাচ্ছিল সেটা আবার ম্লান হয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে একটা চিন্তা কাজ করল, হয়তো গাড়িটা জুলি পাঠায়নি। যে পাঠিয়েছে সে এখনও পর্দার আড়ালে রয়েছে। এমনও তো হতে পারে।

একসঙ্গে খাওয়া শেষ করে হোটেলে ফিরে এল ভাস্কর। পদমকে সে সকাল আটটায় হোটেলে দেখা করতে বলল। না, পদমের রিপোর্ট অনুযায়ী তাকে কেউ অনুসরণ করেনি। পদম এ ব্যাপারে খুব নিঃসন্দেহ। তাছাড়া যেসব চোর-বাটপাড় গুণ্ডা এসব কাজ করে তাদের নাড়িনক্ষত্র পদম জানে। তাদের কাউকেই পদম দ্যাখেনি, শুধু সাহেব চলে আসার পর একজন মহিলা গাড়ি নিয়ে উঠে এসেছিল। সেটা সাহেব চলে আসার পনেরো মিনিট পরে। ভাস্কর তাকে দেখেনি। হয়তো সে ততক্ষণে শহরের তেমাথা পেরিয়ে চলে এসেছে।

অতএব এইটুকু ধরে নেওয়া যায় কেউ তার পেছনে আসেনি যখন তখন আজকের রাত্রের মত সে নিরাপদ। হোটেলে ঢুকতেই রিসেপশনের সামনের চেয়ারে শাজাহান সেনকে বসে থাকতে দেখল ভাস্কর। ওকে দেখামাত্র শাজাহান যেন প্রাণ ফিরে পেল, ওঃ, আপনার পথ চেয়ে বসে আছি।

ভাস্কর হেসে ফেলল, কোনো মেয়ে যা করে না আপনি তাই করলেন?

ইয়ার্কি না! আমাকে তো আজ থেকে যেতে বললেন। বিকেলে একটু মদের সন্ধানে বেরিয়েছিলাম, এসে দেখি গুরুদেব হাওয়া আর তার জায়গায় একটা বিশাল তিব্বতি শুয়ে জপ করছে। উঃ কি মারাত্মক চাহনি! আর আমার ব্যাগ থেকে মাত্র দশটা টাকা রেখে তিনি সব নিয়ে গেছেন। প্রায় কেঁদে ফেলল শাজাহান।

পুলিসে জানিয়েছেন?

দূর! পুলিস গুরুদেবের কী করবে?

করবে। কারণ আপনার গুরুদেব যখন হোটেলে ফিরছেন তখন কোনো বাস নিচে নামে না। আমার মনে হয় না তিনি নিজে একটা গাড়ি ভাড়া করে রাত্রের পাহাড়ি পথে নামবেন। অর্থাৎ এই শহরে খুঁজলেই তাঁকে পাওয়া যাবে। আচ্ছা, চলুন আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

শাজাহানকে নিয়ে বেরিয়ে এল ভাস্কর। বেচারার অবস্থা খুব কাহিল। কাল সকালে হোটেল থেকে বেরুনারও উপায় নেই। বিল মেটানোর পয়সা নেই। এরপরে গাড়িভাড়া আছে। লোকটার ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল ভাস্করের। সম্মোহন করে টাকা আদায় করে খুশি হয়নি, এই ছ্যাচড়ামো পর্যন্ত করল।

অনিল মিত্র সব ব্যাপারটা শুনে জিজ্ঞাসা করল, এই রকম একটা লোক তোমার হোটেলে ছিল বিকেলে বললে না কেন?

তখন তুমি একটা প্রব্লেম নিয়ে ছিলে আর আমারও মাথায় আসেনি। বাট আই অ্যাম সিওর, ও এই শহরে এখনও পর্যন্ত আছে।

তুমি লোকটার যে বিবরণ দিলে তাকে আমি কিছুক্ষণ আগে হাসপাতালে দেখেছি। যদি আমার

ভুল না হয়ে থাকে—। অনিল মিত্রকে চিন্তিত দেখাল।

হাসপাতালে? ভাস্কর অবাক হল।

হ্যাঁ। আজ একটা কেস পেয়েছি। পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছে—ওহো, তুমি তো জানো, সেই স্পটেই দেখা হল। তোমাদের বিবরণ-মাফিক লোকটি হাসপাতালে গিয়ে অনুরোধ করেছিল সে পেশেন্টকে একবার দেখতে চায়। ওর জ্ঞান তখনও ফেরেনি বলে দেখতে দেওয়া হয়নি। ও যখন গিয়েছিল তখন আমি হাসপাতালে ছিলাম। বাই দ্য বাই, ছেলেটির পরিচয় তুমি জানো? অনিল মিত্র সরাসরি প্রশ্ন করল।

ভাস্কর এত তাড়াতাড়ি নিজেকে প্রকাশ করতে চায়নি। অথচ সোজাসুজি মিথ্যে কথা বলতেও খারাপ লাগছিল, তুমি তো বলেছিলে চেনা মানুষ।

হ্যাঁ। এই শহরের একজন নামকরা রোমিও। কাজ করে ভাল! ইনফ্যাক্ট তোমাদের কলিগ্ বলতে পার।

কলিগ্? যতটা সম্ভব বিস্ময় দেখাল ভাস্কর।

হ্যাঁ। তোমাদের ইন্সুরেন্স ডিপার্টমেন্টের স্থানীয় এক কর্তা ওই ছোকরা! সম্প্রতি এক সধবা টিবেটিয়ান মহিলার সঙ্গে মাখামাখি হচ্ছিল। মহিলা একটু রহস্যময়ী।

রহস্যময়ী এই কারণে যে তিনি বাইরের কারও সঙ্গে মেশেন না। স্বামী বেঁচে থাকলেও ওদের মদের দোকান আর বাড়ি ছাড়া মাঝে মাঝে গাড়ি নিয়ে নির্জন পাহাড়ে একা বসে থাকেন। দো শি ইজ টিবেটিয়ান কিন্তু তাকে দেখলে মনে হবে শি ইজ ফ্রম হলিউড্!

হাসল অনিল।

ফেরার পথে হাসপাতালে এল ওরা। না এখনও প্রধানের জ্ঞান ফেরেনি। হেড-ইনজুরি। ডাক্তার বলেছেন বাহাত্তর ঘণ্টা না গেলে কোন ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব নয়। ভাস্কর দেখল যে ব্লকে প্রধান রয়েছে তার বারান্দায় দুটো সেপাই পুতুলের মত দাঁড়িয়ে। যারা বুদ্ধিমান তাদের পক্ষে ওদের কাঠের পুতুল বানিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়। প্রধানের প্রাণনাশের চেষ্টা হলে আটকাবে কে? তবে ও বেঁচে থাকলেও বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে কোনো সাহায্যে আসবে না। বাহাত্তর ঘণ্টা অনেক দীর্ঘ সময়। যা করার এর মধ্যেই করতে হবে।

থানা-পুলিস করে শাজাহান সেন একটু ভরসা পেয়েছিল। ভাস্কর অনিল মিত্রকে দিইয়ে বলিয়েছে লোকটাকে আগামীকালই খুঁজে বের করা হবে। তাছাড়া ওর কাছে যদি টাকা নাও পাওয়া যায় তাহলে পুলিসের অয়ারলেসের মাধ্যমে শাহজাহানের বাড়িতে খবর দেওয়া যাবে টাকা পাঠিয়ে দিতে। দু- তিনদিন আরও থেকে যেতে হবে সেক্ষেত্রে। ভালই হবে এতে। কারণ শাজাহান স্বীকার করল এতবার সে এসেছে কখনই দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো দেখা হয়নি! মদ খেতে খেতেই তার সময় গিয়েছে। এখন যে দুদিন অপেক্ষা করতে হবে তাতে তো মদ খাবার পয়সা থাকবে না, সুযোগটা কাজে লাগানো যাবে। তবে ওই টিবেটিয়ান রুমমেটকে নিয়ে থাকা—এটাই প্রধান সমস্যা।

শাজাহানকে হোটেলে পাঠিয়ে ভাস্কর রাস্তা পাল্টাল। ওর কেবলই মনে হচ্ছিল গুরুদেব জুলি শেরিংয়ের বাড়িতে যাবে। ব্ল্যাকমেল করা যার নেশা সে এই সুযোগ ছাড়বে না। আরও কিছু খবরের জন্যে প্রধানকে কথা বলাতে চেয়েছিল নিশ্চয়ই। লোকটা জেনেছে ইন্সুরেন্সটা যদি হেড অফিস অনুমোদন না করে তাহলে জুলি প্রধানকে বিয়ে করবে না। এর মানে ব্যাপারটায় কিছু ভাঁওতা আছে। আর জুলি যে ফেলে দিয়েছে ছেলেটিকে সেটাও লোকটা কোনো আড়াল থেকে

চাক্ষুষ করতে পারে। অতএব নিশ্চয়ই এতক্ষণে লোভের সাপ ফণা তুলেছে। পৃথিবীর যে কোনো নেশার চেয়ে যা মারাত্মক।

পথ নির্জন, ঠাণ্ডাটা বাড়ছে হু হু করে। রাস্তার আলোগুলোকে কুয়াশায় ডাইনির চোখের মত দেখাচ্ছে। দু-পকেটে ভাস্করের হাত, এক হাতে রিভলভারের স্পর্শ। পদমটাকে ছেড়ে না দিয়ে সঙ্গে আনলে ভাল হত।

প্রধানের কাণ্ডটা যেখানে ঘটেছিল সেখানে এখন কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নেই। এই শহরে বোধহয় রাত ঘনালে গাড়ি করেও মানুষ বের হতে চায় না। বাঁক ঘুরতেই জুলির বাড়িটা চোখে পড়ল। ছবির মত চুপচাপ। কোথাও কোনো আলো জ্বলছে না। গুরুদেব যদি এসে থাকেন তাহলে তো এতক্ষণে আলো জ্বলা উচিত ছিল। কারণ জুলির গাড়িটা বাড়ির সামনে দেখা যাচ্ছে। নিজেকে আড়ালে রেখে প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকল ভাস্কর। না, বাড়িটায় কোনো মানুষ জেগে আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। আর থাকলেও গুরুদেব নেই। জুলি শেরিং আলো নিভিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে কথা বলার পাত্র নয়।

ঘুম ভাঙল একটু দেরিতে এবং দরজায় শব্দ হওয়ায়। ভাস্কর খানিকটা সময় নিয়ে দরজা খুলতে দেখল একজন সেপাই দাঁড়িয়ে আছে খাম হাতে। ওর নাম জিজ্ঞাসা করে খামটা দিয়ে চলে গেল সে। খানিকটা অবাক হয়ে সে চিঠিটা বের করল অনিল মিত্র জানিয়েছে লোকটির হদিশ পাওয়া গিয়েছে। সে উঠেছে একটা প্রাইভেট গেস্ট হাউসে। তবে জিনিসপত্র রেখে সন্ধে নাগাদ সেই-যে বেরিয়েছে এখনও ফেরেনি। ফিরলেই ওকে ধরে ফেলা যাবে। আর হ্যাঁ, প্রধানকে বাঁচানো যায়নি। কাল রাত তিনটে নাগাদ অজ্ঞান অবস্থায় সে মারা গিয়েছে। পোস্ট মর্টেমের জন্যে বডি রেখে দেওয়া হয়েছে।

ঠোঁট কামড়াল ভাস্কর। একজন সাক্ষী চলে গেল। মৃত্যুটা কি আঘাত-জনিত না নতুন কোনো প্রচেষ্টায় সেটা চিঠিতে বোঝা যাচ্ছে না। আর এই গুরুদেবটি কোথায় গেলেন জিনিসপত্র ফেলে। ওর এক সিড়িঙ্গে শিষ্য ছিল সে-ই বা কোথায়? ঘড়ি দেখল ভাস্কর। সর্বনাশ। ন'টা বাজতে আর বেশি দেরি নেই। এই পাহাড়ি শহরগুলোর আবহাওয়া বড্ড সময় আড়াল করে রাখে। আজ রোদ নেই। সকালটা শুরু হয়েই যেন সন্ধে হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই মাথার ওপর বড্ড বেশি মেঘের চলাফেরা চলছে এখন।

ঠিক পাঁচ মিনিট আগে জুলি শেরিংয়ের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেল ভাস্কর। পদম বাহাদুর তার পেছনে। ও ঠিক সময়ে সঙ্গ নিয়েছে। শাজাহানবাবু বেরিয়েছেন পর্যটনে। পদমকে যা বোঝাবার এতটা পথ চলার সময়ে বুঝিয়ে দিয়েছে ভাস্কর। জুলি শেরিংয়ের বাড়িটা চোখে পড়ামাত্র সে পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল এমন একটা জায়গা খুঁজে নিতে যেখান থেকে দেখা এবং শোনার দুটো কাজই চমৎকার চলে।

সাদা পুলওভার এবং স্টোন-ওয়াশ প্যান্টে নিজের চেহারাটা যে আরও খুলেছে এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ছিল ভাস্কর। হোটেলের বুড়িটা তো বটেই এই পদমটা পর্যন্ত তার দিকে ঘুরে ঘুরে তাকিয়েছে। কী দেখছে জিজ্ঞাসা করায় বলেছিল, সাহেব, অনেক নাম-করা ফিল্মস্টার এখানে আসে শুটিং এর জন্যে, তারাও তোমার কাছে এখন হার মেনে যাবে।

ভাস্কর সুপুরুষ। তবে কিছু কিছু পোশাক তাকে আরও আকর্ষণীয় করে এ তথ্য তার জানা। একজন সুন্দরী মহিলার কাছে আসতে হলে নিজের চেহারা খোলতাই করাই উচিত। এবং তখনই

ওর সেই মেয়েটিকে মনে পড়ল। কাল থেকে প্রায়ই ওকে মনে পড়ছে। এভাবে কোনো মেয়ে তাকে কখনও টানেনি। কিন্তু জুলি যদি হত্যাকারী হয় বা মেয়েটির যদি এদেশে আসার ভিসা না থাকে তাহলে সে কী করতে পারে? ভাস্কর প্রার্থনা করছিল ওই দুটোই যেন বেঠিক হয়।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকল সে। বেশ ঘন ছায়া বাগানে। সকাল ন'টায় মেঘ নেমে এসেছে মাথার ওপরে। বৈদ্যুতিক তারের জায়গাটায় এসে সে সতর্ক হল। সেই সময় দরজা খুলে গেল। এবং ভাস্করের সমস্ত শরীরে আর এক রকমের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হল। জুলি শেরিং দরজা খুলে আশ্চর্য রকমের মিষ্টি হাসি হাসল তার দিকে চেয়ে। মহিলার বয়স বোঝাই যাচ্ছে না। অতিরিক্ত রকমের একটা লাল শর্টস আর দুধেল গেঞ্জি ওর পরনে। পায়ে ঘাসের চটি। চোখে নীল হরিণচোখো চশমা। মাথার চুল ফেঁপে মেঘ হয়ে দুলছে। যদিও মেঘের জন্যে ঠাণ্ডা আজ কম কিন্তু এত ছোট প্যান্ট পরার মত আবহাওয়া নয়। তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জুলি হাসল আবার, হা-ই!

ভাস্কর পা ফেলল। লুকনো তারে যদি বিদ্যুৎ থাকত তাহলে জুলি নিশ্চয়ই ওকে ডাকত না। এগিয়ে যেতে সে বলল, হ্যালো!

ঘরের ভেতরে ঢুকে জুলি বলল, আপনার দেখছি চমৎকার সময়জ্ঞান। এখন ঠিক নটা।

ভাস্কর জুলির দিকে না তাকিয়ে সোফায় বসতে যাচ্ছিল। এই মহিলার বয়স সে জানে কিন্তু যা দেখছে তার সঙ্গে কিছুতেই মেলে না। সব মেয়ের শরীরে চুম্বক থাকে না। ঈশ্বর কাউকে কাউকে সেটা দীর্ঘকালের জন্যে লিজ দিয়ে দেন। জুলি সেই রকম। আজকের এই পোশাক, উন্মুক্ত দীর্ঘ উরু এবং পায়ের গোছ যা কিনা শঙ্খের চেয়ে সুন্দর, না দেখলে সে এর হদিশ পেত না। এই মহিলার কী করে অত বড় মেয়ে থাকতে পারে?

সোফায় বসার আগে জুলি বাধা দিল, ওঃ নো! আজকের এমন আবহাওয়ায় এই বন্ধ ঘরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসবে। আমার সঙ্গে অন্য একটা ঘরে আসা হোক। সেখানে অন্তত অবাঞ্ছিত অতিথিরা আমাদের বিরক্ত করাতে আসবে না। প্লিজ। বলার ভঙ্গিতে এমন একটা আদুরে ভঙ্গী আনল জুলি যে ভাস্কর নিজের হৃদস্পন্দন অনুভব করল। কিন্তু অন্য ঘর কেন? সেই গুণ্ডা টাইপের বারম্যানটা কি কাছে-পিঠে ওৎ পেতে আছে? সে পকেটে হাত ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়াল। রিভলবারের স্পর্শ তাকে-অনেকটা নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে দিল। জুলি শেরিং তখন চলতে শুরু করেছে। টাইট খাটো লাল শর্টস তার ভারি নিতম্বকে শাসন করার নিষ্ফল চেষ্টা চালাচ্ছিল। এই দৃশ্যের সামনে পৃথিবীর সেরা সন্ন্যাসীকেও সমস্যায় পড়তে হবে। কেন যে সেকালে মুনিঋষিদের মতিভ্রম হত আজ বোঝা গেল।

জুলি তাকে যে ঘরটায় নিয়ে এল তার তিনদিকে কাচের দেওয়াল, ছাদেও স্বচ্ছ কাচের ঢাল। দেওয়ালের কাচে এমন একটা ঘষা ভাব আছে যা দেখলেই ভাস্কর বুঝল বাইরে থেকে ভেতরটা দেখা যাবে না, সে স্পষ্ট বাগান এবং আকাশে মেঘ দেখতে পেল। এখানে বেতের হেলানো রঙিন চেয়ার যাতে নরম কুশন দেওয়া। তার একটায় জুলি বসলে মুখোমুখি বসল ভাস্কর। আশ্চর্য, চারদিক বন্ধ মনে হচ্ছে তা সত্ত্বেও একটা হিমেল বাতাস পাক খাচ্ছে এই ঘরে। সত্যি, জুলি এই পোশাকে সামনে না বসলে দম বন্ধ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

দুটো পা আড়াআড়ি ভাঁজ করে জুলি বলল, দুঃখের খবরটা নিশ্চয়ই শুনেছেন? প্রধান মারা গেছে।

চমকে তাকাল ভাস্কর। এই সংবাদ জুলি পেয়ে গেছে।

জুলি হাসল, আজ সকালে আমি ফুল দিতে গিয়েছিলাম। বেচারা! যাক, ব্রেকফ্রাস্ট আনতে বলি?

একটু পরে। ভাস্কর কোনো রকমে উচ্চারণ করল।

আপনাকে আজ খুব হ্যান্ডসাম দেখাচ্ছে। রিয়েলি, অনেককাল পরে আমি একজন সুপুরুষ দেখলাম। আশঙ্কা করছি আপনার বান্ধবীর সংখ্যা আপনি নিজেও জানেন না। ঠোঁটে আলতো হাসি জুলির।

ভাস্কর বুঝতে পারছিল ক্রমশ তার ওপর প্রভুত্ব কায়েম করে যাচ্ছে জুলি। এ আর এক সম্মোহন। এখনই কাজের কথায় আসা উচিত। সে বলল, মিসেস শেরিং---!

বলো শুধু জুলি। নামটা মিষ্টি নয়?

ওয়েল, জুলি। আমার কোম্পানি মনে করে মিস্টার শেরিংয়ের মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়নি। প্রধান আমাকে সে তথ্য দিয়েছে---।

সে তথ্য আর কাজে লাগবে না। হি ইজ ডেড। আচমকা উত্তেজিত হয়ে উঠে বসল জুলি, আপনার কী জিজ্ঞাসা আছে তাই বলুন।

হাসল ভাস্কর। জুলি যত উত্তেজিত হবে তত ভাল। সে প্রশ্ন করল, কোনো সাধারণ মানুষ তার বাড়ির চারপাশে ইলেকট্রিক অয়্যার লুকিয়ে রাখে না। আপনি কেন রেখেছেন?

তার সঙ্গে মিস্টার শেরিংয়ের মৃত্যুর কী সম্পর্ক?

আমি আসছি সে প্রসঙ্গে। জবাব দিন।

এইটে আপনার এক্তিয়ারের বাইরে। কিন্তু আপনাকে আমার ভাল লেগেছে। সুতরাং আমি কথা বলছি। যেভাবে উত্তেজিত হয়েছিল প্রায় সেইভাবেই শান্ত হয়ে গেল জুলি, আমার বাড়িতে একজোড়া বুদ্ধমূর্তি আছে। যেটাকে আপনি বাইরের ঘরে দেখেছেন সেটা নকল। আসলটি ভিতরে। ওই মূর্তিটির ওপর অনেক টিবেটিয়ান এবং আমেরিকানদের লোভ আছে। এর আগে কয়েকবার চেষ্টা হয়েছিল মূর্তিটি চুরি করার। তাই সিকিউরিটির জন্যে ওই অয়্যার লাগিয়েছি। এবং এটা পুলিসের অনুমতি নিয়ে।

পুলিস আপনাকে অনুমতি দিয়েছে?

হ্যাঁ, রাত এগারোটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত।

কিন্তু প্রধান বলেছে, সকালেও আপনি বাড়িতে না থাকলে ওটা চালু থাকে।

হয়তো ভুলে অফ করা হয়নি।

আপনার মেয়ের লিগ্যাল পেপারস আছে এদেশে থাকার?

আমার মেয়ে? এখানে আমার মেয়েকে আপনি কোথায় পেলেন?

এই বাড়িতে একটি তরুণী নেই? চোখে চোখ রাখার চেষ্টা করল ভাস্কর। কিন্তু চশমার দেওয়াল কী করে ডিঙোবে সে?

আমি ছাড়া এখানে কোনো মহিলা থাকে না। অবশ্য আমি জানি না আপনি আমাকে তরুণী বলতে চাইবেন কিনা? মদির হাসি হঠাৎ ঝরনার মত ছিটকে উঠল।

মিথ্যে কথা বলছে। ভাস্কর নিজের মনে বলল। সে যে চাক্ষুষ করে গেছে সেটা তো ইনি জানেন না। সে হাসল, কথাটা কি সত্যি?

প্রধান আপনাকে ভুল তথ্য দিয়েছে।

আমি যদি বাড়িটা ঘুরে দেখতে চাই?

স্বচ্ছন্দে। ঠোঁট কামড়াল জুলি।

একটু অবাক হল ভাস্কর। এতটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে কি করে কথাটা বলল জুলি? মেয়েটি যদি এই বাড়িতে থাকে? হঠাৎ তার মনে হল, ওকে এখান থেকে গত রাত্রে সরিয়ে দেওয়া

হয়নি তো? না. খুঁজতে চাওয়া বোকামি হবে। সে হেসে বলল, বিশ্বাস করলাম।

খুশি হল জুলি, বিশ্বাসই দুটো মানুষকে কাছে আনে। আপনার নামটা পড়েছি। কিন্তু কোথায় থাকেন তা জানি না।

কলকাতায়।

ওহ্! কী করে থাকেন? চিৎকার গোলমাল! বিবাহিত?

প্রসঙ্গান্তরে দ্রুত চলে যাওয়ার দক্ষতা দেখে ভাল লাগল ভাস্করের, নাঃ! এখনও সময় করে উঠতে পারিনি! মিস্টার শেরিং কোন্ সাপের বিষ পছন্দ করতেন?

মুহূর্তেই আবার রক্ত জমল মুখে. সেটা মিস্টার শেরিং জবাব দিতে পারতেন। আমি ওঁর স্ত্রী তার মানে এই নয় আমাকে সব খবর জানতে হবে।

ঠিকই। মাথা নাড়ল ভাস্কর, যদি আপনি নামচে বস্তিতে সেই বুড়ো সাপুড়ের কাছে বিষ আনতে না যেতেন, তাহলে আপনার কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট যুক্তি থাকত। তাই না?

এবার স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে উঠে বেশ জোরে হেসে উঠলেন মহিলা। তারপর একেবারে ভাস্করের সামনে দাঁড়িয়ে ঈষৎ ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, বুদ্ধিমান মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আমার চিরকাল ভাল লাগে। যত দেখছি যত শুনছি তত আমার ভাল লাগাটা বাড়ছে। হাত মেলান, সব কথা বলছি।

ভাস্কর চোখ তুলতেই ঝুঁকে পড়া জুলির গেঞ্জিকে হাঁসফাস করতে দেখল। সম্মোহিতের মত সে হাতে হাত মেলাতেই জুলি সোজা হয়ে বলল, গুড। শুনুন, আমার স্বামী নেশা করতেন। প্রথমে মদ। তারপর গাঁজা। তারপর পাউডার। আমাদের বয়সের পার্থক্য ছিল বটে কিন্তু এই নেশার জন্যে আমাদের দাম্পত্য জীবন বলতে কিছু ছিল না! শেষ পর্যন্ত ছোট সাপের ছোবল নিতেন। তাতেও নেশা ফিকে হয়ে গেলে শঙ্খচূড় সাপের বিষ ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে নিতেন। কিন্তু উনি মারা গেছেন স্রেফ হার্ট-অ্যাটাকে। দুবার উনি আমাকে বাধ্য করেছিলেন সেই সাপুড়ের কাছে যেতে। কিন্তু এসব আপনি ওর মৃত্যুর কারণ হিসেবে আদালতে প্রমাণ করতে পারবেন না। ডাক্তার যে ডেথ-সার্টিফিকেট দিয়েছেন তাতে এসবের উল্লেখ নেই।

ভাস্কর মাথা নাড়ল। সব ঠিক। শুধু শেষ সত্যটি বললেন না মহিলা। জুলি এগিয়ে এল এবার। একটা হাত আলতো করে তুলে দিল ভাস্করের কাঁধে, বিশ্বাস করুন আমাকে। এই দেশে এসে এখন আমি একা। ওই টাকাটা আমাকে নিরাপত্তা দেবে। আপনি আমার কথাও ভাবুন।

কী ভাবতে হবে বলুন?

আপনি আমার পাশে দাঁড়ান।

তারপর?

আপনাকে আমার ভাল লেগেছে।

আমারও। বলে উঠে দাঁড়াল ভাস্কর। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত খুশিতে তার একটা হাত তুলে নিয়ে তাতে নিজের গাল চেপে ধরে চোখ বন্ধ করে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলতেই ভাস্কর বলে উঠল, কেউ আসছে।

আসুক।

আমরা বোধ হয় বড্ড তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছি। ঝড়ে কিছুই নড়ে না।

উঁহু, আমি ওসব থিওরিতে বিশ্বাস করি না। যখন হওয়ার হয় তখন যে কোন ভাবেই তা হতে পারে। জুলির চোখ বন্ধ তখনও।

সেই সময় পেছনের দরজার দিকে চোখ যেতেই মনে হল কিছু একটা সরে গেল সেখান

থেকে। তাদের কেউ লক্ষ্য করছে? একটা শব্দ হচ্ছিল যেন তখন থেকে এক নাগাড়ে। সে তাকাতেই শব্দটা থেমে গেল। এবার যেন শরীরে সাড় ফিরে পেল ভাস্কর। বেচারা প্রধান বোধহয় এই ভাবেই ভুল করেছিল।

সে ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়িয়ে নিল, আমি এবার বাড়িটা ঘুরে দেখতে চাই। আপত্তি নেই তো এখন?

নিশ্চয়ই না। কিন্তু এখনও কি অবিশ্বাসের কারণ আছে?

আমার চোখ এবং কানের মধ্যে কোনো ফারাক রাখতে চাই না। আসুন। খানিকটা অনিচ্ছায় জুলি তাকে পেছনের দরজায় নিয়ে এল। তারপর একটার পর একটা ঘর। কোথাও মানুষের চিহ্ন নেই। জুলির শোয়ার ঘরে এসে ভাস্কর বলল, মিস্টার শেরিংয়ের জিনিসপত্র এখানে দেখছি না কেন? মনে হয় ভদ্রলোক এই বাড়িতেই থাকতেন না।

বাজুতে চিমটি কাটল আলতো করে জুলি, আমার শোয়ার ঘরে ও কেন থাকবে? বলেছি না আমাদের দাম্পত্য জীবন ছিল না।

বাড়িতে কেউ নেই?

এ প্রশ্ন কেন?

কাউকে দেখছি না। অথচ তখন বললেন ব্রেকফাস্ট আনতে বলব? কাকে আনতে বলতেন?

ও। আমাদের ওপাশে একটা আউটহাউস আছে। এখন এই বাংলোয় আমি—আমরা একা। একটা চোখ ঈষৎ কাঁপল জুলির।

আমি একবার মিঃ শেরিংয়ের ঘরে যাব।

ওঃ ভাস্কর! বিলিভ মি প্লিজ। এসো।

প্রায় টানতে টানতে চতুর্থ ঘরে নিয়ে গেল জুলি তাকে। এই সেই ঘর। দেওয়াল ভর্তি বই। তলায় কার্পেট। সে জিজ্ঞাসা করল. এইসব বই কে পড়তেন? মিস্টার শেরিং?

না। বাড়িটা ছিল হ্যারল্ড টমসন নামে একজনের। সে আমাদের এটা বিক্রি করে চলে গেছে অস্ট্রেলিয়ায়। বইগুলো নিয়ে যায়নি। মিস্টার শেরিং, এখানে শুতেন, যখন বাড়িতে থাকতেন।

ওই বইগুলো তিনি পড়তেন না?

যে লোকটা চব্বিশ ঘণ্টা নেশায় ডুবে থাকত তার বই পড়ার সময় কোথায়? আর আমি অত পুরনো মোটা বইতে ইন্টারেস্টেড নই।

আপনাদের সেই দ্বিতীয় বুদ্ধমূর্তি কোথায়? দেখলাম না তো!

আমার ঘরে একটা সুটকেশে রাখা হয়েছে। আমি বাইরে রাখতে সাহস পাই না। মিস্টার শেরিং ওইটে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল এই মূর্তির ইজ্জত রেখো আর এই বাড়ি বিক্রি কোরো না।

নিয়ে আসুন মূর্তিটা। হুকুমের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল ভাস্কর। 'এই বাড়ি বিক্রি কোরো না।' কথাটার মধ্যে কোনা তাৎপর্য ছিল, না জুলি বানিয়ে বলল? জুলি দুটো মিথ্যে বলছে। এক, কাল অন্য মেয়ে এখানে ছিল, দুই, আজ এই বাড়িতে আর কেউ আছে যার অস্তিত্ব তার অনুভূতিতে সে টের পাচ্ছে। জুলি খানিকটা বিরক্ত হয়ে পাশের ঘরে চলে গেছে মূর্তিটা আনতে। হঠাৎ ভাস্করের মনে এল, জুলি কি এই ঘরে যে লুকনো গর্ত আছে তার হদিশ জানে না? সে একটা বাক্স ওখান থেকে নিয়েছে কিন্তু আর একটা কাঠের বাক্স গর্তে ছিল। তাতে কি আছে? ঠিক তখনই জুলি সামনে সে দাঁড়াল। ঠিক দরজার ফ্রেমে। ওর হাতে চমৎকার এ বুদ্ধমূর্তি। কালো পাথরের খোদাই করা নিখুঁত। জুলি বলল, এইটে আমাদের পারিবারিক সম্পদ। এর ওপর লোভ

অনেকের। বিশ্বাস হল? ভাস্কর এগিয়ে গিয়ে মূর্তিটি স্পর্শ করতে যেতেই জুলি এক পা পিছিয়ে গেল, নাঃ। এই পরিবারের বাইরের কারও একে স্পর্শ করার অধিকার নেই। ওর গলার স্বরে প্রতিরোধ।

ঝুঁকে দেখতে লাগল ভাস্কর। স্পর্শ না করে যতটা দেখা যায়। এবং ঠিক তখনই জুলির শরীরের পাশ দিয়ে ওপাশের ঘরের দেওয়ালটা চোখে পড়ল। দেওয়ালের গা জুড়ে বিশাল পর্দা। পর্দার তলায় দুটো চামড়ার জুতো। একটা জুতো সামান্য নড়ল। ভাস্কর অনেক চেষ্টায় নিজের ভাবান্তর প্রকাশ করল না। ছায়াটার হদিশ পাওয়া গেল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, এই মূর্তির দাম কত?

অন্তত তিন লক্ষ ডলার। কিংবা তারও বেশি হতে পারে।

তিন লক্ষ ডলার? আমি এইরকম একটা মূর্তির খবর জানি যা দশ লাখ ডলারে বিক্রি হয়েছিল লস-এঞ্জেলেসের এক নিলামে। এটা বিক্রি করলেই তো আপনি বড়লোক। ইনসুরেন্সে ওই টাকা তো এর কাছে সামান্য। তাই না?

এটা বিক্রি করা অসম্ভব। কিন্তু ওই টাকাটা আমার চাই। আর সেই আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। যাই, এটাকে রেখে আসি। জুলি পেছন ফিরে এগিয়ে যেতেই ভাস্কর আবার জোড়া জুতোর দিকে তাকাল। পর্দার আড়ালে জুতোজোড়া সরে সরে যাচ্ছে। ভাস্কর যতটা সম্ভব নিজেকে আড়াল করে দাঁড়াল দরজার পাশে। আর সেই সময় টিবেরিয়ানটির মুখ বেরিয়ে এল পর্দার ফাঁক দিয়ে। উঁকি মেরে সে এই দরজার দিকে একবার দেখে চোখের পলকে ঢুকে গেল জুলির ঘরে। লোকটা যে গেল কিন্তু এতটুকু শব্দ হল না। এই লোকটিকেই সে দেখেছিল প্রথমদিন পানশালার কাউন্টারে। সেই সময় জুলি ফিরে এল নিশ্চিন্তে ভঙ্গিতে।

ভাস্কর প্রশ্ন করল, আচ্ছা, ওই মূর্তিটার কথা আপনার পরিচারকরা জানে? ওর দামের কথা?

না। দামের কথাও জানে না। ওরা জানে ড্রইংরুমের মূর্তিটাই মূল্যবান।

ওরাও তো এটা চুরি করতে পারে!

না। ওরা বিশ্বস্ত। তাছাড়া ওরা জানে না আমি কোথায় রেখেছি মূর্তিটাকে। হাসল জুলি।

ঠিক নয়। এই মুহূর্তে আপনার ঘরে একজন ঢুকেছে। যাকে আপনি পাহারা দেবার কাজে আপনার পানশালা থেকে আনিয়েছেন। জুলি, আপনি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছেন।

ঠোঁট কামড়াল জুলি। তারপর বলল, এ থেকে প্রমাণ হয় না আমার স্বামীর মৃত্যু অস্বাভাবিক।

কিন্তু এই মূর্তি এই মুহূর্তে চুরি হয়ে যেতে পারে জুলি!

নাঃ বলেই জুলি দৌড়ালো। কিন্তু দু-পা যেতে না যেতেই থমকে দাঁড়াল সে। বুটজোড়া এবার দরজার সামনে দাঁড়াল। তার এক হাতে কালো পিস্তল। অন্য হাতে কাগজে মোড়া প্যাকেট।

জুলি চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়তেই সে বিদ্যুৎগতিতে সরে দাঁড়াল। তারপর পিস্তলটা ভাস্করের দিকে উঁচিয়ে ধীরে ধীরে দ্বিতীয় দরজার দিকে এগিয়ে গেল। জুলি মরিয়া হয়ে তেড়ে আসছিল কিন্তু তার আগেই লোকটা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

জুলি এবার চিৎকার করে উঠল, বিশ্বাসঘাতক! ওকে আমার আনাই ভুল হয়েছিল! হাউ হাউ করে কেঁদে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল মেয়েটা। খুব অসহায় দেখাচ্ছিল এই মুহূর্তে। কয়েক পলক ওর দিকে তাকিয়ে ভাস্কর চটপট মিস্টার শেরিংয়ের ঘরে চলে এল। তারপর শেলফ থেকে সেই বইটা সরিয়ে বোতাম টিপতেই পায়ের তলার কার্পেট ঝুলে পড়ল। দ্রুত হাতে কার্পেট সরাতেই সে দ্বিতীয় বাক্সটাকে দেখতে পেল গর্তের মধ্যে। সন্তর্পণে গর্তটা থেকে বাক্স তুলতেই মনে হল ওটা খুব হাল্কা। ঢাকনা খুলে মাথা নাড়ল সে। বাক্সটা খালি।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় অস্ফুট শব্দ হল। ভাস্কর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল জুলি অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। ওর চোখে এখনও জল।

ওটা কি? ওখানে গর্ত কি ভাবে এল? ছুটে এল জুলি। ওর চোখে বিস্ময়! ভাস্করের হাত থেকে বাক্সটা টেনে নিয়ে চিৎকার করে উঠল সে. এই বাক্স কোত্থেকে এল?

তুমি জানতে না এই গর্তের কথা!

না। জানতাম না। এই ঘরে আমি আসতাম না।

মিথ্যে কথা।

বিশ্বাস করো। আমি এর কিছুই বুঝতে পারছি না। জুলি চিৎকার করে উঠল, কিন্তু এই বাক্সটাকে আমি চিনি। এতেই ওই বুদ্ধ মূর্তিটা ছিল। ও জানত। নিশ্চয়ই জানত: কিন্তু আমাকে মূর্তিটা দিয়ে ও এখানে বাক্সটা রাখতে গেল কেন? নিজেকেই প্রশ্ন করল জুলি।

এই প্রথম বিশ্বাস করল সে।

ভাস্কর জুলির কাঁধে হাত রাখল, তোমার মেয়ে এখন কোথায়? মিথ্যে কথা বললে নিজেরই ক্ষতি হবে।

দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল জুলি। অনেক কষ্টে নিজেকে ফিরে পেল সে. ঘুমে।

কাল রাত্রে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছ?

হ্যাঁ।

গুরুদেব কোথায়?

আবার তাকাল জুলি। ইতস্তত করল। ভাস্কর বলল, সত্যি কথা বললে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

অজ্ঞান হয়ে আছে। লোকটা আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছিল।

কী বলেছিল?

বলেছিল ও দেখেছে আমি প্রধানকে খুন করেছি। কিন্তু বিশ্বাস করো আমি তা করতে চাইনি। আমি সামান্য ঠেলেছিলাম কিন্তু ও পুতুলের মত খাদে চলে গেল।

আমি দেখেছি।

তুমি দেখেছ? এই প্রথম স্বস্তি পেল জুলি, তাহলে বলো আমি খুন করতে চেয়েছিলাম কিনা?

না। কিন্তু আর একটা কথা বলো। মিস্টার শোরিং ইঞ্জেকশন নিয়েছিলেন কোথায়? পানশালায় না এখানে?

ওর দুটো সিরিঞ্জ ছিল। একটাতে সব সময় বিষভরা থাকত। প্রয়োজন হলেই নিত। ওই বিষের ভয়ে আমরা তটস্থ থাকতাম। শেষ দিকে বলত সাপের বিষ ইনজেক্ট করেও নাকি বেশিক্ষণ আরাম হচ্ছে না। ও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই গর্ত কোত্থেকে এল? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমি এই বিশ্বাসঘাতকে ছাড়ব না। ওকে আমি খুন করবই। আমাদের পারিবারিক বুদ্ধমূর্তি ওটা। হিংস্র ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল জুলি. তুমি ওকে যেতে দিলে কেন?

ও কোথাও যায়নি। সাধারণ গলায় জানাল ভাস্কর।

মানে?

তার আগে বলো গুরুদেবের অজ্ঞান শরীরটা কোথায় আছে?

ঘুমে। যে বাড়িতে আমার মেয়ে আছে। ও ওকে পাহারা দিচ্ছে।

জ্ঞান ফিরে এলে তোমার মেয়ে পারবে সামলাতে?

ওর শরীর বাঁধা আছে শক্ত করে। উঠতে পারবে না।

কিন্তু- -।

এসো। জুলির হাত ধরে বেরিয়ে এল ভাস্কর। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল জুলি। লনে পুলিশ গিজগিজ করছে। অনিল মিত্র ওদের দেখে এগিয়ে এল, লোকটাকে ধরেছি। বুদ্ধমূর্তি নিয়ে পালাচ্ছিল।

থ্যাঙ্ক ইউ। হাত বাড়িয়ে বুদ্ধমূর্তিটা গ্রহণ করল ভাস্কর।

কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। অনিল মিত্র বললেন।

ঘুম কি জুরিসডিকশনে?

হ্যাঁ। কেন?

তাহলে আমাদের পেছনে পেছনে চলে এসো। ওখানে গিয়ে কিছু ইন্টারেস্টিং তথ্য দেব। এসো জুলি, তোমার গাড়িটা নাও। পুলিসের গাড়ি নিয়ে প্রথমে যাওয়া ঠিক হবে না। তাড়া দিল ভাস্কর।

না! জুলি শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

ভাস্কর চট করে অনিল মিত্রকে দেখে নিল। অনিল যেন এখনই কোনো গন্ধ না পায়! তারপর চাপা গলায় বলল, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। আমার সঙ্গে চলো।

নিতান্ত অনিচ্ছায় জুলি গাড়িতে উঠল, পাশে ভাস্কর। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, অনিল, তোমরা এমন ভাবে ফলো করো যাতে কেউ বুঝতে না পারে। যে বাড়িতে ঢুকব সেটা কভার করে অপেক্ষা করবে আধঘণ্টা। আমি না বের হলে চার্জ করবে।

বাট হোয়াই? অনিল মিত্র চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল আবার।

এসো বলছি। গাড়িটা যখন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসছে তখন পদম বাহাদুরকে নজরে এল! খুব উৎসাহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পুলিস দেখে এগোচ্ছে না। হাত নাড়ল ভাস্কর, হোটেলে থাকিস। এখনই ফিরছি।

কথাটা পছন্দ হল না পদমের। সে বোধ হয় আরও উত্তেজনা চাইছিল! কিন্তু ছেলেটাকে যা যা বলেছিল তা মান্য করেছে। অনিল মিত্রকে খবর দিয়ে না আনলে লোকটি গ্রেফতার হত না।

বুদ্ধমূর্তিটা মাঝখানে সিটের ওপর, জুলির হাতে স্টিয়ারিঙ। সে বলল, আমি জানি তুমি আমাকে ধরিয়ে দেবে প্রধানের খুনের কেসে। কিন্তু তা যদি আমি হতে না দিই?

কী রকম? কৌতুক করে বলল ভাস্কর।

যদি এই গাড়িটা নিয়ে খাদে ঝাঁপ দিই?

চমকে উঠল ভাস্কর। এখন তাদের ডানদিকে বিশাল খাদ, বাঁ দিকে পাহাড়। সে আড়চোখে জুলির দিকে তাকাল। জুলির নগ্ন পা, সতেজ বুক আর আকর্ষণ করছে না। তরল একটা হিমস্রোত নেমে এল। তার মনে হল ও যা বলছে তা অবহেলায় করতে পারে। তাহলে কিছু করার উপায় থাকবে না। সে নির্লিপ্ত হবার চেষ্টা করল। এখন প্রার্থনার সুরে কথা বললে জুলির জেদ চেপে যাবে। একটা কাণ্ড ঘটাতে দ্বিধা করবে না কারণ গাড়ির নিয়ন্ত্রণ ওর হাতে। ভাস্কর বলল, তোমাদের পারিবারিক বুদ্ধমূর্তিটা বেহাত হয়ে যাবে তাহলে।

মানে? চমকে উঠে পাশের মূর্তিটার দিকে তাকাল।

আমার যতদূর বিশ্বাস এই মূর্তি জাল।

জাল?

হ্যাঁ। আসল মূর্তি ছিল ওই গর্তের দ্বিতীয় বাক্সে! এটা আমার অনুমান। তুমি বললে বাক্সটায়

মূর্তি ছিল। অথচ মিস্টার শেরিং তোমাকে বাক্সটা না দিয়ে লুকিয়ে রাখলেন গোপন জায়গায়। এটা বিশ্বাস করতে পারছি না।

তুমি কি বলতে চাও এটা—মূর্তিটায় হাত দিল জুলি।

প্লিজ, অপেক্ষা করো জুলি।

বাড়িটা ছবির মত একটা পাহাড়ের মাথায়। পথে আসার সময় ওরা লক্ষ্য করেছিল পুলিসের গাড়ি বেশ দূরত্ব রেখে আসছে। বাড়িটার সামনে গাড়িটা দাঁড় করাতেই ভাস্কর লাফিয়ে নামল। জুলি নামতেই সে বলল, পেছন দিকে কোনো দরজা আছে?

হ্যাঁ।

বাড়িতে আর কে কে আছে?

ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই।

তুমি সামনের দরজায় নক করো। কথাটা বলে দ্রুত পায়ে ভাস্কর পেছনের দরজায় হানা দিল। সেটা ভেতর থেকে বন্ধ। কিন্তু এপাশে একটা জানলার পাল্লা খোলা। কিন্তু তার গায়ে মোটা গ্রিল। অতএব ভাস্করকে আবার সামনে চলে আসতে হবে।

জুলি নেই। দরজাটা খোলা।

খুব সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল ভাস্কর। আর তখনই ভেতরের ঘরে আওয়াজ হল। কাল রাত্রে আমাকে খুব মারা হয়েছিল না? মেয়েকে পাহারায় রাখা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা থাপ্পড়ের শব্দ এবং জুলির আর্তনাদ। লোকটি চাপা গলায় বলল, গাড়িতে আর কেউ ছিল? আমার দিকে তাকাও।

হ্যাঁ।

কে?

ভাস্কর।

ঠিক তখনই পা চালাল ভাস্কর। সতর্ক ভঙ্গিতে অথচ অত্যন্ত দ্রুত পায়ে সে দূরত্বটা অতিক্রম করল। মাথার ওপরে হাত তুলুন! নইলে গুলি উড়ে যাবে।

চট করে ফিরে দাঁড়াবার চেষ্টা করল গুরুদেব কিন্তু থমকে উঠল ভাস্কর. একদম চালাকি করার চেষ্টা করবেন না।

গুরুদেব যেন কী করা যায় চিন্তা করতে পারছে না। আর সময় নষ্ট করল না ভাস্কর। রিভলবারের বাঁট দিয়ে খুব জোরে আঘাত করল সে গুরুদেবের মাথায় সঙ্গে সঙ্গে কাটা কলাগাছের মত লুটিয়ে পড়ল গুরুদেব। ততক্ষণে জুলি ছুটে গিয়েছে পাশের ঘরে। গিয়ে চিৎকার করে উঠল।

ভাস্কর বুঝল গুরুদেবের সম্বিৎ ফিরতে অন্তত মিনিট দশেক সময় লাগবে। সে একটা কাপড়ের টুকরোয় ওর চোখ দুটো বাঁধল। তারপর ধীরে ধীরে পাশের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। পাথরের মত বসে আছে একটি সতেরো বছরের মেয়ে। চোখ নড়ছে না। শরীর শক্ত। আর তাকে দু হাতে ধরে ঝাঁকিয়ে জুলি বলল, কথা বল্ তুই এমন করছিস কেন? কী হয়েছে তোর? কথা বল্?

তোমার মেয়ে?

হ্যাঁ। যা ইচ্ছে করো তুমি, ও আমার মেয়ে।

আমি কিছুই করতে চাই না। তবে কিছুক্ষণ ওকে ডেকে কোনো লাভ হবে না। ও এখন

সম্মোহিত। তারপর ওর চোখের সামনে চোখ রেখে সে জিজ্ঞাসা করল, বুদ্ধমূর্তিটা কোথায়?

পাশের ঘরে। খাটের তলায়। বিড়-বিড় করে বলল মেয়েটি। তার ঠোঁট যেন কাঁপল না।

দৌড়ে পাশের ঘরে ঢুকল ভাস্কর। তারপর বুদ্ধমূর্তিটা সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল জুলির কাছে। মেয়ের পাশে হাঁটু গেড়ে অসহায় ভঙ্গিতে বসে আছে সে। এই কয়েক মিনিটেই তাকে খুব বয়স্কা দেখাচ্ছে। বুদ্ধমূর্তির দিকে অবাক চোখে তাকাল সে।

ভাস্কর বলল, এই মূর্তি মিস্টার শেরিং ওই গর্তের বাক্সে রেখেছিলেন লুকিয়ে। এক বাড়িতে থেকে তুমি যে তা জানতে না এটা আমি বিশ্বাস করি। তোমার মেয়ে দেখেছিল এটাকে। তাই এখানে চলে আসার সময় ও লুকিয়ে নিয়ে এসেছিল। কারণ বৌদ্ধ এবং এই পরিবারের মানুষ হিসেবে ওর নিশ্চয়ই লোভ হয়েছিল মূর্তিটার ওপর। ওর কোনো দোষ নেই। বাইরে যেটা ছিল তোমার কাছে সেটা জাল। ওই গর্তে আর একটা বাক্স ছিল। তাতে ছিল দুটো অ্যাসিডের মিশ্রণ আর একটা অব্যবহৃত সিরিঞ্জ। তোমার কথাই সত্যি। মিস্টার শেরিং গোপনে অ্যাসিড নেবার ঝুঁকি নিচ্ছিলেন। শরীরে ইনজেকশনে অ্যাসিড পুরে বাকিটা গর্তে রেখে উনি পানশালায় গিয়েছিলেন। বাকিটা তোমরা জানো। না জুলি, তুমি মিস্টার শেরিংকে খুন করোনি, তুমি চাওনি প্রধান নিহত হোক। আইন দিয়ে জোর করে তোমাকে বাঁধা যায় হয়তো কিন্তু আমি সেটা চাই না। কিন্তু তুমি স্বামীর ইনসুরেন্সের টাকা চেয়ো না। ওটা তো জেনেশুনেই আত্মহত্যা। ঝুঁকি নেওয়া, যদি না মরি তাহলে ভাল লাগবে—এই রকম। তোমার দোকান আছে আর এই বুদ্ধমূর্তি রইল। মেয়ের জন্যে কাগজপত্র ঠিক করে নিও। আমি চলি। ওই লোকটার ব্যবস্থা পুলিস করবে।

দুটো পাথরের মূর্তিকে ঘরে রেখে বাইরের ঘরে এল ভাস্কর। গুরুদেব তখনও বেহুঁশ। ভারী পায়ে সে আকাশের নিচে আসতেই দেখল অনিল মিত্র এগিয়ে আসছেন। বাহিনী নিয়ে। ক্লান্ত গলায় ভাস্কর বলল, ভেতরে যাও। ওখানে তোমার আসামী আছে। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে হাঁটতে শুরু করল।

ম নী শ

টমসন এন্ড হিউস কোম্পানির পরিচালন সমিতির জরুরি সভা বসেছে কলকাতায়। সদস্যরা খুব উত্তেজিত। পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে কোম্পানির অনেকগুলো চা-বাগান বেশ সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। মাস কয়েক আগে টমসন এন্ড হিউস লাভবার্ড টি এস্টেট কিনেছে। এই কেনার ব্যাপারে কোম্পানির চেয়ারম্যান-এর সঙ্গে একমত হননি কয়েকজন সদস্য। স্বাধীনতার পরও ওটা একটা স্কটিশ কোম্পানির বাগান ছিল। মালিকানা বদলে একজন মাড়োয়ারির হাতে গিয়ে বাগানটি প্রায় পরিত্যক্ত-পর্যায়ে এসে গিয়েছিল। চেয়ারম্যান টি.কে.সেন যুক্তি দিয়েছিলেন ওই বাগানের চায়ের পাতা অন্য বাগানের পাতার সঙ্গে মেশালে আন্তর্জাতিক বাজারে টমসন এন্ড হিউস প্রচুর ব্যবসা করতে পারবে। তাঁরই আগ্রহে প্রচন্ড অর্থনৈতিক ঝুঁকি নিয়েও কোম্পানি লাভবার্ড কিনতে রাজি হয়েছিল।

আজকের জরুরি সভার অন্যতম বিষয় হল লাভবার্ড। মালিকানা পাওয়ার পর বাগানের কাজ শুরু করার জন্যে টিকোজি চা-বাগানের ম্যানেজার মনীশ সোমকে লাভবার্ডের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। মনীশ অত্যন্ত দক্ষ এবং কোম্পানির গর্ব। লাভবার্ডে যাওয়ার সাতদিন আগে মনীশ বিয়ে করেছিল। সেই মনীশকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। শ্রমিকরা তাকে ঘিরে ধরে মেরেছিল এই তথ্য জানা গেছে কিন্তু তার কোনো হদিশ নেই। মনীশের নতুন বউ বাগান ছেড়ে আসেনি। সে জেদ ধরেছে যতক্ষণ না স্বামীর শরীর দেখছে, তা মৃত হলেও, ততক্ষণ বাগান ছেড়ে আসবে না।

টি কে সেনের বিরোধীপক্ষের অন্যতম শ্রীযুক্ত রমেশ ভাটিয়া সভায় বললেন, 'লাভবার্ড টি এস্টেট একটি শ্মশান ছাড়া আর কিছুই নয়। সেখানকার শ্রমিকরা কয়েকবছর মাইনে পায়নি, য়ুনিয়নের নানারকম খেয়ালে তারা পুতুলের মত নাচছে। আগের মালিকের অপদার্থতা তারা ভুলতে পারছে না। কোম্পানি ভাল করেই জানত এখানে কোনো আইনশৃঙ্খলা থাকতে পারে না। সুস্থ কাজের পরিবেশ ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। এসব জানা সত্ত্বেও এই বিরাট আর্থিক ক্ষতির বোঝাটা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়! আমাদের একজন দক্ষ ম্যানেজারকে নির্বাচিত করা হয়েছে ওই হাড়িকাঠে মাথা গলিয়ে দিতে। ওর নববধূর জীবনে যে অভিশাপ নেমে এল তার জন্যে দায়ী কে? জেনেশুনে আমাদের আগুনে হাত রাখতে বলা হয়েছে, কোনো সাবধানবাণীতে কর্ণপাত করা হয়নি। অতএব আমি এ ব্যাপারে দায়ী করে কোম্পানির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ রাখছি।'

রমেশ ভাটিয়া অত্যন্ত প্রশান্ত মুখে আসন গ্রহণ করতেই সদস্যরা গুঞ্জন শুরু করলেন। আজও সদস্যরা দ্বিধাবিভক্ত। তবে বিরোধীরা সঙ্গত কারণে বেশি উত্তেজিত। অরুণ শর্মা, যাকে টি. কে. সেনের ডামি বলা হয় তাকে টাই-এর নট নিয়ে অস্বস্তিতে নাড়াচাড়া করতে দেখা গেল। সমস্ত সদস্যরা এখন চেয়ারম্যানের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। টি. কে. সেন এতক্ষণ সামনে রাখা কাগজপত্রে চোখ বোলাচ্ছিলেন। এবার ধীরে সুস্থে সেগুলোকে গুছিয়ে চশমা খুলে চোখ মুছলেন রুমালে। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'মাননীয় সদস্যবৃন্দ,আমরা সত্যি সত্যি একটা বিরাট যুদ্ধে নেমে পড়েছি। স্বীকার করছি, আমি আপনাদের এই যুদ্ধে নামাতে উদ্যোগী হয়েছিলাম। কিন্তু কেন? কারণ আমি চেয়েছিলাম কোম্পানি আরও বিস্তারিত হোক। মাননীয় যে সদস্য আমার

বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন তিনি একটা তথ্য এই মুহূর্তে বিস্মৃত হয়েছেন যে এই কোম্পানি আমার প্রাণের মত। আমি মনে করি না যে লাভবার্ড চা বাগান কিনে কোম্পানি কোনো ভুল করেছে।' কথা থামিয়ে সতর্ক চোখে সদস্যদের দেখে নিলেন টি, কে. সেন। কয়েকজোড়া চোখ তাঁর মুখের ওপর স্থির।

'আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে শক্ত করা। লাভবার্ডের মত সোনার হাঁস শুকিয়ে মরছে দেখে আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। লাভবার্ডকে তাই বাঁচাতেই হবে। হ্যাঁ, মনীশ সোমের ঘটনাটি সত্যিই দুঃখজনক। অবশ্য এই মুহূর্তে আমরা তাকে মৃত ঘোষণা করতে পারছি না। আমি মনে করি এটা একটা দুর্ঘটনা। যে কোন কাজেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং তাই বলে কাজ বন্ধ করে দেওয়া বুদ্ধিমানের উচিত নয়। বাধা আছে বলে আমরা হার্ডল রেসে যোগ দেব না? আবার বলছি, দায়িত্ব আমার। কিন্তু আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিতে চাই সমস্যার সমাধান আমি করব। এ ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যা আমি এক মাস পরে আপনাদের জানাব। আমার বিরুদ্ধে যে আর্থিক অপচয়ের অভিযোগ তোলা হয়েছে কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্ট থেকে প্রমাণিত হবে। এ নিয়ে এখনই ভেবে কোনো লাভ নেই মনে রাখবেন, আমাদের নৌকো এখন মাঝ নদীতে, তীরে আনবার জন্যে ধৈর্য ধরতেই হবে।'

এই প্রথম টি. কে. সেন এইরকম নিচু গলায় কথা বললেন। স্থির হল, এক মাস পরে আবার পরিচালন সমিতির সভা বসবে। এই সময়ে যা সিদ্ধান্ত চেয়ারম্যান নেবেন তার জন্যে তিনি সভার কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। সভার শেষে অরুণ শর্মা চেয়ারম্যানের চেম্বারে এল, 'ওফ, স্প্লেন্ডিড স্যার, ওয়ান্ডার ফুল, আপনার বক্তৃতা শুনে রমেশ ভাটিয়া আর মুখ খুলতে সাহস পায়নি।'

টি. কে সেন নিস্পৃহ চোখে তাকালেন, কয়েকটা মাটির পুতুল সামনে না রাখলে মাঝে মাঝে অসুবিধে হয়, শর্মা সেইরকম। শর্মা আপ্লুত-ভাবটা কাটিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনি এ সমস্যা কী করে সমাধান করবেন আমি ভেবে পাচ্ছি না।'

টি. কে. সেন এবার শর্মার মুখের দিকে তাকালেন। এই লড়াই-এর ফলের ওপর তাঁর ভাগ্য নির্ভর করছে। যদি তাঁর গোপন খবর ঠিক হয়ে থাকে তাহলে--। না, এছাড়া কোনো উপায় নেই ঝুঁকিটা তাঁকে নিতেই হবে। যদি ওটা লেগে যায় তাহলে রমেশ ভাটিয়ারা জীবনে আর মুখ খুলতে সাহস পাবে না। সেন শর্মার দিকে তাকালেন। তারপর ইন্টারকমে সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলেন এয়ারপোর্টে খবর নিতে বাগডোগরায় প্লেন নির্দিষ্ট সময়ে ছেড়ে গেছে কি না। আজকাল ট্রেনের মত প্লেনও ঘন্টা দুই তিন লেট করে। যদি আজও সেরকম হয়---। হাসলেন সেন। ইটস্ এ গেম। একটা লাক-ট্রাই করা যাক। সেন বললেন, 'বিয়িং চেয়ারম্যান অব দা বোর্ড আমি তোমাকে একটা দায়িত্ব দিতে চাই।'

'অফকোর্স!' শর্মা পুলকিত হন।

তুমি নিশ্চয়ই জানো, মনীশ সোমের ঘটনাটার পর লাভবার্ড চা বাগানের দায়িত্ব নিতে আমাদের অন্য বাগানের ম্যানেজাররা কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। অথচ আমরা আজেবাজে লোককেও ওখানে পাঠাতে পারি না, তাই তো?' সেন স্থির দৃষ্টিতে ওর মুখ লক্ষ্য করলেন।

'সিওর। কিন্তু আমি এর মধ্যে কী ভাবে আসছি, মানে—।'

সেন হাসলেন, 'নো নো। আমি তোমাকে ওই বাগানে যেতে বলছি না। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কোন এফিসিয়েন্ট ম্যানেজার যখন লাভবার্ড যেতে চাইছে না তখন আমার প্রবলেম আরো বেড়ে গেল।'

শর্মা বলল, 'কোনো রিটায়ার্ড ম্যানেজারকে পাওয়া যাবে না?'

সেন বললেন. 'ইয়েস, দেয়ার ইউ আর। কিন্তু বৃদ্ধদের প্রাণের ভয় অনেক বেশি, তাই না? ওই যে ভাটিয়া যখন বলল, হাড়িকাঠ, কোন বৃদ্ধ তাতে রাজি হবে?'

এই সময় ইন্টারকমে সেক্রেটারির গলা ভেসে এল, 'বাগডোগরার প্লেন আজ চার ঘন্টার মত লেট স্যার। তিনটে পনেরোতে টেক অফ্।'

সেনের মুখ হাসিতে ভরে উঠল। তারপর শর্মার দিকে তাকিয়ে সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলেন, 'দেড় ঘণ্টা সময় আছে। একটা সিট ব্যবস্থা করো।

'ও কে স্যার।'

সেন এবাব চুরুটটা হাতে নিলেন. 'তুমি দেড় ঘণ্টা সময় পাচ্ছ শর্মা। তোমাকে আজকের প্লেনে শিলিগুড়িতে যেতে হবে। ইট্‌স এ সিক্রেট মিশন। ওখানে তুমি আমাদের কোনো লোকের সঙ্গে মিট্ করবে না। তোমার কাজ হবে এই লোকটিকে খুঁজে বের করা। ওই ব্রিফ কেসে সমস্ত কাগজপত্র রেডি করা আছে। ওর ফাইলের একটা ডুপ্লিকেট কপিও ওপরে আছে। প্লেনে যেতে যেতে তুমি পড়ে নিও যাতে কথা বলতে সুবিধে হয়। তোমার ওপর আমার সবকিছু নির্ভর করছে।

'হু ইজ দিস ম্যান স্যার?'

'হি ইজ আওয়ার ম্যান ফর লাভবার্ড।'

সেদিন বিকেলে শিলিগুড়ির সিনক্লেয়ার হোটেলে বসে শর্মা ব্যাপারটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। দমদম থেকে বাগডোগরা আসবার পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময়ে সে ফাইলটা পড়ে নিয়েছে তাকে যা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে তা জেনেছে। কিন্তু ব্যাপারটা ওর বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। মনীশের মত দুঁদে ম্যানেজার লাভবার্ডে গিয়ে মিসিং হয়ে গেল আর এ তো তার কাছে কিছুই নয়। যাক, শর্মা ভাবল, এ নিয়ে ভেবে লাভ নেই। ওকে এখন সেনের গুড বুকে থাকতে হবেই, সেন যেমনটি করতে বলেছে তেমনি করে গেলেই হল। ফলের দায় সেনের কিন্তু এই ফাইনা ওয়েদারে সেই চালসার পথে ছুটতে হবে এটুকু ভাবলেই গায় জ্বর আসছে। এখন কয়েক পাত্র খেয়ে একটু--- শিলিগুড়িতে আমোদ প্রমোদের তো কোনো অভাবই নেই।

এয়ারপোর্ট থেকেই গাড়ি দুদিনের জন্যে ভাড়া করা ছিল। সন্ধে হওয়ামাত্র শর্মা বেরিয়ে পড়ল শিলিগুড়ি ছেড়ে কাজ শেষ হলে রাত্রেই ফিরে আসতে পারবে। অবশ্য যার কাছে যাচ্ছে তাকে যদি পাওয়া যায়। লোকটা একরোখা এবং মোটেই ফালতু কথা বলে না। তিন বছর গোল্ডেন টি চা-বাগানে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারি করেছিল। ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে গোলমাল হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে ওই চালসার কাছে পোলট্রি ফার্ম করে বসে আছে। গোল্ডেন টি এস্টেট যে কোম্পানির তারা বেশ জাঁদরেল। ব্রিটিশ আমলের নিয়মকানুন এখনও চালু আছে ওদের বাগানগুলোতে। সেইরকম একটি নিয়ম হল কোনো ম্যানেজার তার নিচের তলার মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে মিশতে পারবে না, কোনো আত্মীয় যদি সামান্য কোনো চাকরি করেন তাহলে তাঁর সঙ্গে যোগ রাখা চলবে না। এই লোকটি প্রায় তিন বছর ওই কানুন মেনে নিলেও শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ করেছিল। ফলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তাকে পোলট্রি ফার্ম করতে হয়েছে। অন্য কোনো চা-বাগানে অবশ্য লোকটা আর কাজ খুঁজতে যায়নি। শর্মার সন্দেহ হল, সেখানে নিশ্চয় চাকরি পায়নি। কে আর এই রকম বিদ্রোহীকে যেচে ঘরেডেকে আনে। লোকটার একটিমাত্র গুণ রিপোর্টে চোখ পড়লো, সে নাকি গোল্ডেন টি-এস্টেটের শ্রমিকদের খুব প্রিয় ছিল। শুধু এটুকুর ওপর নির্ভর করে সেন সাহেব লোকটিকে কেন নির্বাচন করলেন এটাই মাথায় ঢুকছে না শর্মার।

মালবাজার ছাড়াতেই বেশ রাত হয়ে গেল। ড্রাইভারকে গন্তব্যস্থল জানানো ছিল। চালসার কাছে এসে সে খুঁজে পেতে গাড়ি দাঁড় করালো। খুব ক্লান্তি লাগছিল শর্মার। একদিনে প্রচুর পরিশ্রম হয়ে গিয়েছে। সেন সাহেব না বললে তাকে কখনই এখানে আনতে পারত না কেউ। আফটার অল আই এম ডিরেকটর অফ টমসন অ্যান্ড হিউস। মনে মনে বিড় বিড় করতে করতে শর্মা গাড়ি থেকে নামল। ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার। ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে অবশ্য ঘনঘন গাড়ি ছুটছে কিন্তু দু পাশে কোনো আলো নেই। খুঁজে পেতে শেষ পর্যন্ত পোলট্রি ফার্মটা বের করল শর্মা। এদিকে লোকালয় নেই বলতে গেলে। কয়েক ঘর নেপালি কুঁড়ে তৈরি করে থাকে। আর আছে জঙ্গল যার ভেতরে বিকেলের পর ঢোকার কোনো মানে হয় না। এইরকম জায়গায় পোলট্রি ফার্মের কথা ভাবা যায়? জায়গা কম নয় এবং সেটাকে তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। গেট খুলে ভেতরে ঢুকতেই থতমত হয়ে গেল শর্মা। এত রাত্রে আসাটাই ভুল হয়েছে, কাল ভোরে এলে মহাভারত অশুদ্ধ হত না। কোনরকমে আবার গেট বন্ধ করে নিজেকে আড়াল করল সে। কুকুর দুটো তীব্র গতিতে ছুটে এসে চিৎকার করে যাচ্ছে সামনে। অন্ধকারে ওদের যে আবছা শরীর দেখা যাচ্ছে তাতেই রক্ত জমে যাওয়ার জোগাড়। শেষ পর্যন্ত শর্মা চিৎকার করল, 'এনিবডি হিয়ার? কোই হ্যায়?'

কোনো সাড়া এল না ভেতর থেকে। কুকুর দুটো একটু থমকে আবার চিৎকার শুরু করল। শুধু অন্ধকারটা যেন সামান্য নড়ে উঠল। শর্মার অস্বস্তি বেড়ে গেল। সে আবার চিৎকার করে ডাকল। তারপরেই চোখে পড়ল দূরে একটা হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে। শর্মার গলা শুকিয়ে এল, ছমছম করছে চারধার।

মুখের কাছে আলো তুলে এক বৃদ্ধ মদেসিয়া প্রশ্ন করল, 'কৌন?'

'চ্যাটার্জি হ্যায়?'

'আপ কোন?'

'অরুণ শর্মা, ডিরেক্টর অফ—' বলতে গিয়ে থেমে গেল অরুণ শর্মা। এই অশিক্ষিত লোকটা মানেই বুঝবে না। তাই শেষ করল, 'কলকাত্তা সে আয়া।'

'সাবকা তবিয়ত ঠিক নেহি হ্যায়।'

'ক্যা হুয়া? বোখার?'

'নেহি! এইসাহি—।'

'লেকিন উসসে হাম মিলনে চাহতা হুঁ। তুম ওহি কুত্তাকো সামালো।'

লোকটা যেন নিতান্তই অনিচ্ছায় কুকুর দুটোকে ডাকল। ডাক শুনে তারা বাধ্য হবে ফিরে গেল নিজেদের জায়গায়। শর্মা গেট খুলে লোকটার পেছন পেছন হাঁটতে লাগল। দু পাশে মুরগিরা এবার কিচির-মিচির করে উঠল। শর্মার মনে হল পোলট্রি ফার্মটা নেহাৎ ছোট নয়। বড় বড় দুটো গাছের আড়াল সরতেই বাড়িটা চোখে পড়ল। কাঠের একতলা বাড়ি। ছটা বিমের ওপর দুটো ঘর। একটা ঘরের দরজা বন্ধ কিন্তু ভেতরে আলো জ্বলছে। লোকটার হ্যারিকেনের আলোয় শর্মা সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল। দরজার শেকল ধরে দুবার শব্দ করে লোকটা ডাকল, 'সাব, সাব, এক আদমি আপসে মিলনে আয়া।'

'কৌন?' একটা জড়ানো গলায় প্রশ্নটা ছুটে এল।

'আই অ্যাম ফ্রম ক্যালকাটা।' শর্মা নিজেই জানান দিল।

একটু পরেই দরজা খুলে গেল। ভেতরের হ্যারিকেনের আলো আড়ালে চলে যাওয়ায় লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। দরজায় হাত রেখে সে প্রশ্ন করল, 'হু আর ইউ?'

'দিস ইজ শর্মা, অরুণ শর্মা অফ টমসন অ্যান্ড হিউস।'

'টমসন অ্যান্ড হিউস!' জড়ানো গলায় লোকটা উচ্চারণ করল। যেন স্মৃতিতে হাতড়ে নিতে গিয়ে স্পর্শ পেল, 'দ্যাট বিগ টি-কোম্পানি?'

'ইয়েস। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

'আমার সঙ্গে? কেন? আমি কে?'

'আমরা কি বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলব?' শর্মার বিরক্তি লাগছিল।

'আমি বুঝতে পারছি না আপনি ঠিক জায়গায় এসেছেন কি না।'

'আমি কি শিবাজী চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলছি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'তাহলে ভেতরে আসতে পারি?'

শর্মা ঘরে ঢুকে নাক কোঁচকাল। এরকম অগোছালো গরিব ঘরে অনেককাল ঢোকা হয়নি। এই লোকটা বিলিতি কোম্পানিতে ম্যানেজারি করেছিল? ন্যাড়া টেবিলের উপরে লাল বোতল আর গেলাস পড়ে আছে। ওগুলো যে দিশি মদ যাকে এদিকে হাঁড়িয়া বলা হয় তা বুঝতে অসুবিধে হল না। ঘরের এক কোণে তক্তাপোষের ওপর চ্যাপ্টা বিছানা। হায়, এই রকম একটা লোকের সঙ্গে তাকে কথা বলতে হবে সেন সাহেবের জন্যে। তবে এই সামান্য সময়ের মধ্যে শর্মা টের পেয়েছিল শিবাজী চ্যাটার্জি নরম কাদার তাল নয়।

'আমার নাম অরুণ শর্মা, টমসন এন্ড হিউসের ডিরেক্টর।' একটা কাঠের চেয়ারে বসে ব্রিফকেসটা কোলের ওপর রেখে শর্মা বলল।

'আমার কাছে কেন এসেছেন? মুরগি এবং ডিম ছাড়া আমি কিছু জানি না।' শিবাজী আবার টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে গেলাসটা হাতে নিল, 'আপনার কি হাঁড়িয়া চলবে?'

'নো থ্যাঙ্কস।' বোঁটকা গন্ধে গা গুলোচ্ছিল শর্মার।

গেলাসের বাকি মদটা শেষ করে শিবাজী হাতের উল্টোপিঠে মুখ মুছল। তারপর চেয়ারে ধপ করে বসে দুটো পা ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করল। চোস্ত পাজামা আর মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি পরা দীর্ঘ দেহ এবং সুদর্শন এই পুরুষটির চেতনা ঠিক আছে কিনা সন্দেহ হল শর্মার। এই রকম মাতাল হয়ে থাকে নাকি সব সময়? সেনসাহেব যদি খবরটা জানতেন তাহলে নিশ্চয়ই ওকে পাঠাতেন না। শর্মা অবাক হচ্ছিল এই লোকটার হদিশ কোলকাতায় বসে সেন সাহেব কেমন করে পেলেন!

'আপনি কি এখন আপনার পোলট্রি নিয়ে ব্যস্ত?'

'আমি কিছুতেই আর ব্যস্ত নই। এগুলো আছে এবং আমিও আছি।'

'আপনি কি অন্য কোনো চাকরি করবেন?'

'নো। আর চাকর হবার বাসনা নেই। আমি চমৎকার আছি।' শিবাজী চোখ খুলছিল না। এমন কি ওর শরীরও নিশ্চল।

'কিন্তু আপনাকে যে আমাদের দরকার।'

এবার চোখ খুলল শিবাজী, 'কী বললেন? আমাকে দরকার? কেন?'

'আপনি কি সব কথা শোনবার মত মন দিতে পারবেন?'

'হোয়াট ডু ইউ মিন? আমি মাতাল?'

'না আমি সে কথা বলতে চাইনি, কিন্তু আমার ব্যাপারটা সিরিয়াস। ওয়েল, শুনুন, আমাদের কোম্পানি আপনাকে ম্যানেজার হিসেবে চাইছে।' শর্মা শিবাজীর উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো মতে সামাল দিতে চাইল।

'চাইছে? হঠাৎ, আমি তো চাকরি ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছি না। তাছাড়া কেউ চাইলেই যে আমি ছুটে যাব একথা ভাবছেন কি করে?' খিঁচিয়ে উঠল শিবাজী। ওর গলার স্বর এখন আরো জড়িয়ে আসছে।

'শুনুন মিস্টার চ্যাটার্জি। আমরা একটা নতুন চা-বাগান কিনে ভীষণ বিপদে পড়েছি। আপনি আমাদের বাঁচাতে পারেন বলে কোম্পানির চেয়ারম্যান মনে করেন। আপনাকে তাই ম্যানেজারের পোস্ট অফার করা হচ্ছে।'

'হোয়াই? আমার মধ্যে কি গুণ খুঁজে পেয়েছেন?'

'আপনি গোল্ডেন টি-এস্টেটের অ্যাসিস্টেট ম্যানেজার ছিলেন। সেখানে শ্রমিকদের সঙ্গে আপনার রিলেশন খুব ভাল ছিল।'

'সেইজন্যে আমাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হয়েছে। আমাকে ওরা স্লেভ করে রেখেছিল। না মশাই, আর আমার স্লেভ হবার বাসনা নেই, চা-বাগানে চাকর হিসেবে ঢোকার কোনো ইচ্ছে নেই। ওয়েল, এবার আপনি যেতে পারেন।' হাত নাড়ল শিবাজী। কিন্তু সেটায় জোর না থাকায় আচম্বিতে টেবিলের ওপর আছড়ে পড়ল।

অপমানটা হজম করতে শর্মার কষ্ট হচ্ছিল। অনেক চেষ্টায় সে নিজেকে সংযত করল। এই মাতাল-টাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না, কিন্তু একে রাজি না করাতে পারলে সেনসাহেব-এর ছায়া আর পাওয়া যাবে না। লোকে যে আড়ালে তাকে ডামি বলে সেটাই সেনসাহেবের কাছে প্রমাণিত হবে। অতএব শর্মা আবার মুখ খুলল, 'কিন্তু আপনি একটা কথা বুঝতে চাইছেন না! প্রায় তিন হাজার গরিব মানুষ অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। মাসের পর মাস মাইনে নেই, কাজ নেই এবং য়ুনিয়নের উত্তেজনার শিকার হয়ে এখন জীবন্মৃত। উন্মাদের মত আচরণ করছে তারা। একটা চা-বাগান চিরকালের জন্য নষ্ট হতে চলেছে। আপনি কি এসব বাঁচাতে চান না?' বক্তৃতাটা দিতে পেরে খুশি হল শর্মা। এত সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারবে নিজেও ভাবেনি।

'মাইনে দেননি কেন আপনারা?'

'আমরা তখন মালিক ছিলাম না। বাগানটাকে আমরা সদ্য কিনেছি। যিনি মালিক ছিলেন—'

'এসব কথা আমার কাছে বলে কী লাভ। রাত হয়েছে, আপনি—।'

বক্তৃতাটা যে মাঠে মারা যাবে ভাবতে পারেনি শর্মা। কাতর গলায় সে বলল, 'মিঃ চ্যাটার্জি, আপনি ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখুন। চেয়ারম্যান মনে করেন যে আপনি ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবে না।'

'কেন? বাগান কিনেছেন, সেখানে ম্যানেজার পাঠান, স্টাফদের মাইনে দিন, লেবার পেমেন্ট করুন। ব্যাস, মিটে যাবে সব সমস্যা। আমি কে?'

'আমরা তাই চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের একজন এক্সপেরিয়েন্সড ম্যানেজার বাগানে যাওয়ামাত্র হাওয়া হয়ে গেছে। ভয় পাচ্ছি হি ইজ মার্ডারড্।' শর্মা সংবাদটা দিল।

'কোন বাগান?'

'লাভবার্ড।'

নামটা শোনামাত্র যেন চমকে উঠল শিবাজী। শর্মা সেটা লক্ষ্য না করে বলল, 'বাগানটা আমরা কিনেছি। শুনুন মিঃ চ্যাটার্জি, আমাদের কোম্পানি মনে করে ওই বাগানের চায়ের পাতার একটা বিশেষত্ব আছে যেটা ঠিকমত ব্যবহার করলে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট পাওয়া যাবে। কিন্তু আগের

মালিক যে প্রব্লেম ক্রিয়েট করে গিয়েছে তা সলভ না করতে পারলে আমাদের অর্থ সুনাম সব জলে যাবে।' শর্মা অনুনয়ের ভঙ্গিতে তাকাল।

শিবাজী এবার সোজা হয়ে বসল, জড়ানো গলায় যেন একটা ধার এসেছে মনে হল শর্মার, 'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন না?'

'হোয়াই শুড আই?'

'হি ইজ দেয়ার!' বিড়বিড় করল শিবাজী।

'কে?' অবাক হল শর্মা।

'কেউ না। কিন্তু তাতে আমার কী! নো, আমি আর চাকরি করব না।'

শর্মা আর ধৈর্য রাখতে পারছিল না। অনেক অনুরোধ করা হয়েছে। এই মাতালটা যদি রাজি না হয় তাহলে সে কী করতে পারে। এখন শিলিগুড়িতে ফিরে গিয়ে সেনসাহেবকে ট্রাঙ্ককলে ঘটনাটা বলতে হবে। এরকম মাতালকে চাকরি দিলে লাভবার্ডের বারোটা বাজবে। শর্মা উঠল। তারপর শেষবার চেষ্টা করার ভঙ্গিতে বলল, 'মিঃ চ্যাটার্জী, আপনাকে এর জন্যে ভালো টাকা দেওয়া হবে—।'

টাকা? গেট আউট, গেট আউট ফ্রম হিয়ার। চিৎকার করে উঠল শিবাজী। ওর সমস্ত শরীর কাঁপছিল। উত্তেজনায় লাল বোতলটা মুঠোয় নিল সে।

শর্মা আর দাঁড়াল না। অপমানে ওর সমস্ত শরীর ঝিমঝিম কাছে। বারান্দায় লণ্ঠন হাতে লোকটা দাঁড়িয়েছিল। ওকে দেখামাত্রই সে চলতে শুরু করল। মাটিতে নেমে শর্মার মাথায় চিন্তাটা এল। সেনসাহেব যদি তার কথা শুনে বিগড়ে যান, যদি তাকে অপদার্থ মনে করেন তাহলে সে কী করবে? স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে টমসন অ্যান্ড হিউসে সেনসাহেবের দিন শেষ। যদি আজ টেলিফোনে সেন সাহেব কোনো কড়া কথা বলেন তাহলে তাকে দ্বিতীয় ট্রাঙ্ককলটি করতে হবে। মধ্যরাত হলেও রমেশ ভাটিয়া নিশ্চয়ই সেনসাহেবের ব্যর্থ প্রচেষ্টার খবর পেয়ে খুশি হবে। নেক্সট চেয়ারম্যানকে খুশি করার এছাড়া কোনো রাস্তা নেই।

মধ্যরাতে যখন সিনক্লেয়ার হোটেল থেকে শর্মা টি. কে. সেনের বাড়ির টেলিফোন পেল তখন সে ভীষণ ক্লান্ত। এক হাতে হুইস্কির গ্লাস নিয়ে সে রিসিভারে কান পেতে শুনল ওপাশের টেলিফোনটা বেশ কিছুক্ষণ বাজার পর চাকর এসে রিসিভার তুলল, 'হ্যালো।'

'সাহাবসে বাত করেগা। শর্মা বোল রহা হুঁ।'

'নমস্তে সাব। সাহাব নেহি হ্যায়।'

'নেহি হ্যায়? ইতনা রাতমে কাঁহা গ্যায়া?'

'অফিসসে লৌটা নেহি।'

'ঠিক হ্যায়। বোলনা হাম শিলিগুড়িসে ফোন কিয়া থা।'

'জী সাব।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ঠোঁট কামড়ালো শর্মা। শালা বুড়ো নিশ্চয়ই কোথাও ফূর্তি মারছে ওকে এই গর্তে পাঠিয়ে দিয়ে। তারপরেই তার খেয়াল হল টি. কে. সেন তো মদ খান না, মেয়েমানুষের দোষ নেই। তাহলে এত রাত অবধি কোথায় যেতে পারে? হঠাৎ শর্মার খুব অস্বস্তি শুরু হল। দ্বিতীয় টেলিফোনটা করার চিন্তাটা চট করে সে মাথা থেকে সরিয়ে ফেলল। সেনসাহেব হলেন এমন লোক যাকে দাহ না করা পর্যন্ত মৃত ভাবা মুশকিল!

ঠিক সকাল সাতটায় সাদা অ্যাম্বাসাডার ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে নেমে মাঠের ওপর দাঁড়াল। সেন সাহেব এতক্ষণ গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে পড়ে ছিলেন, এবার সোজা হয়ে বসলেন। বসে বললেন, 'বাঃ, চমৎকার।'

ড্রাইভার বাংলা বোঝে। গতকাল চারটে থেকে সে টানা গাড়ি চালিয়ে এখন কুকুরের চেয়েও পরিশ্রান্ত। সাহেব যতই চোখ বন্ধ করে ঘুমুবার চেষ্টা করুক এরকম অবস্থায় যে ঘুম হয় না তা সে জানে। ষাট বছর বয়সে গন্তব্যস্থলে এসে যে এত ভাল মুডে কথা বলবেন এটা সে ভাবতে পারেনি।

সেনসাহেব দরজা খুলে নেমে চারপাশে তাকালেন। নেপালি এবং মদেসিয়াদের ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে। না, ঠিকানাটা ঠিকই আছে। ছড়ি হাতে নিয়ে তিনি এগিয়ে যেতেই পোলট্রি ফার্মের সাইনবোর্ডটা দেখতে পেলেন। বেশ নিরিবিলিতে ফার্ম করেছে তো ছোকরা। কিন্তু এখান থেকে মাল সাপ্লাই দেয় কী করে? ভ্যান আছে নাকি! গত তিন-চার মাসের কোনো খবর তাঁর কাছে নেই।

গেটের সামনে দাঁড়াতেই কুকুর দুটো চিৎকার করল। সেনসাহেব তাদের নিচু গলায় ডাকলেন। ওদের ডাক একটু কমে এল। এই সময় বুড়ো মদেসিয়াকে দেখতে পেলেন লোকটা তাঁকে দেখে এগিয়ে এল, 'জী সাব।'

'চ্যাটার্জি আছে?'

'জী হাঁ।'

'কুকুর দুটো কামড়ায় না তো?'

'নেহি।'

সেনসাহেব ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গতকাল কোলকাতা থেকে একজন সাহেব এসেছিল এখানে?'

'জী সাব। হামারা সাহাব বহুৎ গোসা হুয়া থা। উসকো গেট আউট কর দিয়া।' বুড়ো লাল হাসি হাসল।

সেনসাহেব মৃদু মাথা নাড়লেন। তাঁর কখনো ভুল হয় না। হেসে ফেললেন তিনি। শয়তান না দেবতা কোনটা হচ্ছেন কে জানে। ছড়ি ঘুরিয়ে পোলট্রি দেখতে দেখতে খানিকটা এগোতেই শিবাজীকে দেখতে পেলেন তিনি। লাল গেঞ্জি আর নীল জিনস পরে একটা খাঁচা পরিষ্কার করছে। ওঁকে দেখে বেশ অবাক হয়ে কাজ থামাল সে। ততক্ষণে সেনসাহেব পৌঁছে গেছেন। হাত বাড়িয়ে বললেন, 'শিবাজী চ্যাটার্জি?'

প্যান্টে হাত মুছে শিবাজী করমর্দন করল, 'হ্যাঁ। আপনি?'

'বলছি। কোথাও বসতে পারি?'

'কী ব্যাপার বলুন তো। আমি এখন খুব ব্যস্ত।' শিবাজী জরিপ করছিল। 'বিউটিফুল জায়গা। অজ্ঞাতবাসে থাকার পক্ষে চমৎকার। মুরগিগুলো কেমন ডিম দিচ্ছে?

শিবাজী বৃদ্ধকে বুঝতে পারছিল না। সে হেসে বলল, 'আপনার উদ্দেশ্যটা বলুন।'

'তাহলে ব্যস্ততা কমেছে? আমরা কি এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলব? সারারাত গাড়িতে বসে এখন আমি ক্লান্ত।'

'সারারাত—! আপনি কোত্থেকে আসছেন?'

'কোলকাতা।'

শিবাজী চমকে উঠল। এবং সকালে ওঠার পর এই প্রথম তার গতরাতের কথা মনে পড়ল। সেই অবাঙালি লোকটিও কোলকাতা থেকে এসেছিল। টাকার লোভ দেখিয়েছিল শেষটায়। শিবাজী

ভ্রূ কোঁচকালো। 'কী ব্যাপার বলুন তো, হঠাৎ কোলকাতা থেকে আমার কাছে ঘনঘন লোকজন আসছে?'

'কাল রাত্রে একজন এসেছিল, আর কেউ?'

'না। শিবাজী নিজেই বারান্দা থেকে দুটো চেয়ার টেনে ঘাসের ওপর রাখল। ভোরের ঠান্ডা বাতাস চমৎকার বইছে। মুরগিদের চিৎকারের সঙ্গে পাখির ডাক মিশেছে। সেনসাহেব চেয়ারে আরাম করে বসে বললেন, 'যাকে পাঠিয়েছিলাম তার ওপর ভরসা রাখতে পারিনি। এসে দেখছি ঠিকই করেছি।'

শিবাজী বিরক্ত হল, 'ও! কালকের ভদ্রলোক—।'

'আমারই লোক।' সেনসাহেব হাসলেন, 'খুব বিরক্ত করেছে?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি কে?'

'আমি টি. কে. সেন। টমসন হিউসের এক নম্বর বলে সবাই।'

শিবাজী হতভম্ব হয়ে গেল। অতবড় কোম্পানির চেয়ারম্যান সারারাত গাড়িতে বসে এখানে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? এই বৃদ্ধের নাম সে শুনছে। খুব ছোট অবস্থা থেকে লড়াই করতে করতে আজ ঈর্ষাযোগ্যপদে পৌঁছেছেন। সে মুখ ফিরিয়ে নিল, 'বলুন, আমি কী করতে পারি।'

'লাভবার্ডের দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে। বোর্ডের সঙ্গে লড়াই করে আমি চা-বাগানটা কিনেছি। প্রথম রাউন্ডে আমি হেরে গেছি, কারণ আমাদের ম্যানেজারকে পাওয়া যাচ্ছে না। এভাবে চললে আমাকে হয়তো রেজিগ্‌নেশন দিতে হবে পারে। আমি হারতে শিখিনি।' সেনসাহেব খুব গম্ভীর গলায় কথা বলছিলেন যেন নিজের সঙ্গেই নিজের কথা।

'এটা আপনাদের ব্যাপার—। আমি কী করতে পারি।'

'আমি জানি তুমি কি করতে পার। তোমায় তুমি বলছি কারণ আমি তোমার বয়সটাকে অনেক অনেক আগে ছেড়ে এসেছি। লাভবার্ড এখন প্রায় মরুভূমি হয়ে রয়েছে। কিন্তু সেখানে যদি সবুজ পাতা জন্মানো যায় তাহলে একটা বিরাট কাজ হবে। প্রথমত, কয়েক হাজার গরিব মানুষ বাঁচবে, দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্ন করবে। আমি চ্যালেঞ্জটা নিয়েছি, তুমি আমাকে সাহায্য কর।'

'কী ভাবে?'

'আমি তোমাকে ম্যানেজার হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করছি। তুমি স্বাধীনভাবে প্রব্লেমগুলো ট্যাকল করো। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে যা দরকার তাই করবে এবং এ ব্যাপারে আমার সমর্থন পাবে।'

'আপনি আমার ইতিহাস জানেন?'

'না জানলে আমি সময় নষ্ট করতে আসতাম না।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু আমি আর চাকরি করব না।'

'তুমি এসকেপিস্ট আমি বিশ্বাস করি না।'

'এসকেপিস্ট!'

'নিশ্চয়ই। যেখানে হাজার হাজার মানুষের উপকার করতে পারো, সেখানে তুমি এই জঙ্গলে বসে মুরগির ময়লা পরিষ্কার করছ।'

'অনেক হয়েছে, আপনি অনেক বলেছেন। গোল্ডেন টি-তে থাকতে আমার মা যেহেতু খুব সামান্য চাকরি করতেন তাই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে দেওয়া হয়নি। আমি একজন সাবঅর্ডিনেট বাবুর বাড়িতে যেতে পারতাম না। ওই ম্যানেজারদের ক্লাবে গিয়ে মদ গেলা ছাড়া

আমার কোনো সোস্যাল লাইফ ছিল না। চা-কোম্পানি আমাকে টাকা দিয়ে আমার ব্যক্তিগত জীবন কিনে নিয়েছিল। না, আর নয়।' মুখ বিকৃত করল শিবাজী।

হাসলেন সেনসাহেব, 'এসব আমি জানি। কিন্তু তুমি আর একটা কথা বললে না। চাকরি ছেড়ে দিয়ে তুমি মায়ের কাছে ফিরে গিয়ে টিকতে পারোনি কেন? কেন এই বনবাসে চলে এলে?'

শিবাজীর চোয়াল শক্ত হল, 'ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'সেইজন্যেই তোমাকে এসকেপিস্ট বলছি। চ্যাটার্জি, তোমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় কোম্পানি কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবে না। দিনকাল এখন পাল্টে গেছে। আমরা ব্রিটিশ রুলস ফলো করি না। কিন্তু লাভবার্ডকে তোমার ভাই-এর হাত থেকে বাঁচাও। ওর মোকাবিলা করার সুযোগ এটা, আর পালিয়ে থেকো না।'

শিবাজী চমকে উঠল। তারপর চোখ রাখবার চেষ্টা করল, 'আপনি এত কথা জানলেন কী করে?'

'জানতে হয়। তোমার ভাই আগরওয়ালের লোক।'

'আগরওয়াল কে?'

'লাভবার্ডের আগের মালিক। লোকটা বাগান ছেড়ে গেলেও ইন্টারেস্ট ছাড়েনি। তোমার ভাই-এর মাধ্যমে ও এখনও রাজত্ব চালাচ্ছে।'

শিবাজীর মাথার ভেতরটা গরম হয়ে উঠল। সে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কথাগুলো সত্যি?'

'বিশ্বাসীদের জন্যে।'

'আপনি আমাকে সব স্বাধীনতা দেবেন?'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু আমার এই পোলট্রি—'

'উই উইল টেক কেয়ার অফ ইট। তুমি যদি কখনো চাকরি ছেড়ে ফিরে আসো এখানে তাহলে দেখবে তোমার মুরগিরা সুস্থ আছে।'

সকাল দশটা নাগাদ শর্মার ঘুম ভাঙল টেলিফোনের শব্দে। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সে রিসিভারটা তুলতেই সেনসাহেবের গলা শুনতে পেল, 'গুড মর্নিং শর্মা, রাত্রে আশা করি ভাল ঘুম হয়েছিল।'

তড়াক করে বিছানায় উঠে বসল শর্মা, 'ইয়েস স্যার। আমি কাল রাত্রে অনেকবার আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম স্যার, কেউ ধরেনি?'

'তারপর?'

'লোকটা ভীষণ একরোখা, মাতাল। ওকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না।'

'আচ্ছা!'

'আমি কি আজকের দুপুরের ফ্লাইটটা ধরব?'

'নিশ্চয়ই। তবে তার আগে আর একবার ওর কাছে যাও।'

'আবার! কিন্তু।'

'গিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা দিয়ে কাগজপত্র বুঝিয়ে দাও।'

'তার মানে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। লোকটা ওয়ার্থলেস। আমি আজই কোলকাতায় গিয়ে সব কথা বুঝিয়ে বলছি আপনাকে।'

'অত কষ্ট করতে হবে না শর্মা, তুমি পোশাক পরে তোমার পাশের ঘরে চলে এস।' কট্ করে লাইনটা কেটে যেতে শর্মা হতভম্ব হয়ে গেল। কী শুনল সে? এটা কি ট্রাঙ্কল নয়? সেনসাহেব

কি এই হোটেলে আছেন? কখন এলেন! চটপট বাথরুমে ঢুকল শর্মা। এই প্রথম তার মনে হল, লোকেরা যা বলে থাকে তা সত্যি। সেনসাহেবের কাছে সে ডামি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু তাকে প্রমাণ করতে হবে, সিঁড়িতে পা রাখতে গেলে একটু ঝুঁকতেই হয়।

আম কাঁঠাল আর দেওদার গাছের সারির মাঝখানের চওড়া মসৃণ ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে তীব্র বেগে গাড়িটা চালাচ্ছিল শিবাজী। টমসন অ্যান্ড হিউসের এ্যাকাউন্টে মালবাজার থেকে মাসখানেকের জন্যে ভাড়া নেওয়া হয়েছে। গত তিন মাস ধরে ক্রমাগত মদ্যপান করে প্রথমে গাড়ি চালাতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। নার্ভগুলো ঠিক নেই। সকাল থেকেই শুধু হাই উঠছে, গা ম্যাজম্যাজ করছে। জোর করে নিজেকে ঠেকিয়ে রেখেছে সে। চাকরি করার কোনো ইচ্ছেই ছিল না তার। কিন্তু লাভবার্ড-এর নাম শোনার পর, এত স্বাধীনতা পেয়ে শেষ পর্যন্ত হ্যাঁ বলতেই হল। এখন তার বাঁ পাশের ব্রিফকেসে তার সঙ্গে টমসন এন্ড হিউসের চুক্তির কাগজগুলো আছে। শর্মা লোকটা খুব বুদ্ধিমান কিংবা পদমর্যাদাসম্পন্ন নয়। নাহলে অতবড় কোম্পানির একজন ডিরেক্টর আজ তার সঙ্গে অত বিনয়ের সঙ্গে কথা বলত না। জীবনের দুটো জ্বালার বদলা নেবার জন্যেই সে লাভবার্ড টি এস্টেটের ম্যানেজার হতে রাজি হয়ে গেল।

ঘড়িতে এখন দুপুর একটা। এই স্পিডে চললে আর ঘন্টা তিনেকের মধ্যে লাভবার্ড পৌঁছে যাবে সে। শর্মা বলেছে বাগানে ঢোকার আগে থানায় গিয়ে পুলিস সঙ্গে নিতে। এ সমস্ত ব্যবস্থা নাকি কোম্পানি করে রেখেছে। মনীশ সোমকে সে চেনে না। গোল্ডেন টি আর টিকোজি চা-বাগানের মধ্যে দীর্ঘ দূরত্ব। কিন্তু লোকটা নিশ্চয়ই গোঁয়ার্তুমি করেছিল। মিসেস সোম এখন বাগান আঁকড়ে পড়ে আছেন তাঁর স্বামী ফিরে আসবে এই আশায়। কিন্তু শিবাজী জানে এরকম ক্ষেত্রে সেই আশা কম। তাছাড়া সে আছে ওখানে। যে-কোন ভাবেই শ্রমিকদের কাছে নিজেকে হিরো বানিয়ে রাখতে ওর জুড়ি নেই। শিবাজী মাঝে মাঝে ভাবে, যে এককালে কম্যুনিজম নিয়ে পড়াশুনা করেছে, নকশাল আন্দোলনে যোগ দিয়েছে নিজের ক্যোরিয়ারের কথা চিন্তা করেই সে হঠাৎ বদলে গেল কী করে? এইবার ওরা মুখোমুখি হবে। প্রথমবার হেরে গিয়েছিল শিবাজী। এবার ছাড়বে না।

বিনাগুড়ি ক্যান্টনমেন্ট ছাড়িয়ে এগোতেই শিবাজীর মনে হল তার ঘুম পাচ্ছে। ভীষণ ক্লান্তি লাগছে এইটুকু ড্রাইভ করতেই। সে বুঝতে পারছিল তিন মাস তার জীবন থেকে অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে। বাঁ দিকে একটা পাঞ্জাবি ধাবার সামনে গাড়ি দাঁড় করালো সে। একটু চা খেলে কেমন হয়। একটা ছোঁড়া ছুটে এসেছিল গাড়ির কাছে। জায়গাটা একদম ফাঁকা। শুধু লং রুটের ট্রাকের ড্রাইভাররা যাতায়াতের পথে এখানে খাবার খেতে দাঁড়ায়।

এখন অবশ্য কোন ট্রাক নেই। শুধু একটা কালো অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে আছে কিছুটা দূরে। কোনো লোকজন সেটায় নেই।

'সাব, কেয়া চাহিয়ে?'

'কী আছে?'

'সব কুছ।' ছোকরা পাকা মুখে হাসল।

'আচ্ছা!' শিবাজীর মজা লাগল, 'তোর মালিককে ডাক।'

'ও আভি নেহি আয়েগা।'

'কেন?'

'আগরওয়াল সাব আয়া হ্যায়। উসকো সাথ—!' বলে হাতের মুদ্রায় বুঝিয়ে দিল মদ খাচ্ছে।

বুঝিয়ে লাল দাঁত বের করে হাসল।

'তোদের এখানে মদ পাওয়া যায়?'

'জী সাব। ভুটানকা রাম, হুইস্কি, ব্রান্ডি—।'

শিবাজী আর পারল না। গম্ভীর গলায় বলল, 'একটা ছোট হুইস্কির বোতল নিয়ে আয়, জলদি।' ছেলেটা হুকুম পাওয়া মাত্র ছুটে নিয়ে এল। সঙ্গে একটা গেলাস আর বিয়ারের বোতলে রাখা জল। সামচির ডিস্টিলিয়ারিতে তৈরি হুইস্কিটা দাঁত দিয়ে খুলে গেলাসে ঢেলে খানিকটা গলায় নিয়ে মুখ বিকৃত করল সে। তারপর জল মেশালো। আঃ, দ্রব্যটি শরীরে যেতে আচমকা যেন শীতল বাতাস বইল। পলকেই ম্যাজম্যাজানি ভাবটা উধাও। চারিয়ে চারিয়ে কয়েকটা সিপ নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'গাড়িটা কার?' ছেলেটা দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ। এবার সচকিত গলায় বলল, 'আগরওয়ালা সাবকা। বহুৎ বড়া আদমি।'

'পুরো নাম কী?'

ছেলেটা একটু ভাবল, তারপর দৌড়ে ভেতরে চলে গেল। আবার ফিরে এসে বলল, 'বাবুরাম আগরওয়াল।'

'কাকে জিজ্ঞাসা করলি?'

'মালিককো।'

ঠিক সেই সময় ভেতর থেকে দুজন লোক বেরিয়ে এল। একজন লম্বা পাঞ্জাবি, বেশ ভাল স্বাস্থ্য। অন্যজন দারুণ মোটা, পঞ্চাশের ওপাশে বয়স, ঘাড়ে গর্দানে মাংস পরনে সিল্কের পাঞ্জাবি আর ধুতি। ওকে দেখেই হঠাৎ খেয়াল হল শিবাজীর, এই নামটা শর্মার মুখে সে শুনেছে। এত দ্রুত যে লোকটির দেখা পাবে তা ভাবেনি। নামে এক হলে অবশ্য মানুষ এক হবে এমন কথা নেই, তবু যাচিয়ে দেখা যাক। অবশ্য তার জন্যে অপেক্ষা করতে হল না। দুজনেই ওর দিকে এগিয়ে এল। আগরওয়ালা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আমাকে খুঁজছেন?' হাসল শিবাজী, গেলাসটা নামাল না, বলল 'না। গাড়িটা কার তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।'

'কেন? ওটা তো এমন কিছু অসাধারণ নয়। আপনার পরিচয় জানতে পারি?'

আগরওয়ালার মুখে একটা অস্বস্তি ফুটে উঠল।

'শিবাজী চ্যাটার্জি। আপনিই ওই গাড়িটার মালিক?'

এবার পাঞ্জাবি ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'ওরকম দশখানা গাড়ি আছে আগরওয়াল সাহেবের। চা-বাগান ছিল বিক্রি করে দিয়েছেন।'

হঠাৎ মদ খাওয়ার ইচ্ছেটা মিলিয়ে গেল শিবাজীর। দু পেগ হয়তো পেটে গেছে কিন্তু সে ছোকরাকে ডেকে গেলাস আর জল ফিরিয়ে দিয়ে হুইস্কির বোতলটা রেখে দিল, 'কত দিতে হবে?'

পাঞ্জাবী দামটা বলতেই সে টাকা দিয়ে দিল। তারপর স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে বলল, 'গাড়িটা ধোয়ামোছা করাবেন, বড্ড বেশি ধুলোমেখে রয়েছে। না হলে চা-বাগানের মত ওটাও বিক্রি হয়ে যাবে।'

তারপর আর দাঁড়াল না। সোজা বেরিয়ে এল পিচের রাস্তায়। আর তারপরেই আফসোস হল। এ কি কথা বলে এল সে। বিক্রি করলেই যার লাভ হয় সে তো ইচ্ছে করেই বিক্রি করবে। মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্ট দিয়ে এই সব কুমিরদের বিচার করতে যাওয়া মূর্খামি। তবে লোকটাকে দেখে রাখা গেল। রিপোর্ট যদি ঠিক হয় তাহলে লাভবার্ড ছেড়ে চলে এলেও আগরওয়াল নাকি লেবার য়ুনিয়নকে কিনে রেখেছে। পিছন থেকে সে এখনো কলকাঠি নেড়ে চলেছে। এই লোকটির

মুখোমুখি হতে হবে নিশ্চয়ই কখনো। ভালই হল দেখা পেয়ে।

বিকেল চারটের আগেই লাভবার্ড-এর কাছাকাছি এসে গেল শিবাজী। বিকেলের ছায়া এখনও ঘন হয়নি। হুইস্কি পেটে পড়ায় শরীরটা বেশ চাঙ্গা লাগছে। এতক্ষণে তার থানায় যাওয়ার কথা খেয়াল হল। রিপোর্ট বলেছে, শ্রমিকেরা নাকি প্রচন্ড খেপে আছে, তাদের খেপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব সঙ্গে পুলিস নিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু এখানে এসে মত পাল্টাল শিবাজী। পুলিস সঙ্গে নিয়ে কদিন চা-বাগানের মত জায়গায় থাকা যায়? প্রথম থেকেই শ্রমিকদের শত্রু করে দিয়ে কোনো লাভ নেই। যা কিছু বোঝাপড়া একা একাই করতে হবে। থানায় যাবে না সে।

নাশনাল হাইওয়ে থেকে একটা সরু পিচের রাস্তায় ঢুকতেই লাভবার্ড শুরু হল। বাগানের থেকে গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল শিবাজী। কোনোদিন এখানে কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রায় জঙ্গল হয়ে রয়েছে বাগানটা। শেড ট্রিও চোখে পড়ছে না। নিঃশব্দে ড্রাইভ করতে লাগল সে। অযত্ন শব্দটাকে চাগাছগুলোর শরীরে কেউ যেন খোদাই করে দিয়েছে। যাতায়াতের সাদা নুড়ি বিছানো পথে ঘাস গজিয়েছে, ইদানীং বোধহয় এটা ব্যবহৃত হয় না। পাখির ডাক এবং ঝিঁঝির একটানা শব্দ ছাড়া আর কোনো প্রাণের অস্তিত্ব নেই। নিঃশব্দে গাড়িটাকে বাগানের মধ্যে দিয়ে নিয়ে এল সে। হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরতেই ফ্যাক্টরির ছাদ চোখে পড়ল। মাঝে মাঝে আরও ছোট দু একটা বাড়ি যাদের মাথার চাল খোলা, কারো দরজা জানলা নেই। চট করে পদচিহ্ন গ্রামের বর্ণনা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

শিবাজী গাড়ি থামিয়ে চারপাশে সতর্ক চোখে দেখে নিল। এত চুপচাপ ভগ্নদশা চারধারে যে ওর অস্বস্তি শুরু হল। শিবাজীর হাত চট করে সামনের খোপে রাখা হুইস্কির বোতলটায় চলে গেল। দ্রুত ছিপি খুলে সে এক ঢোক মুখে পুরতেই কিছু সতেজ হয়। এখনও তার কাঁচা মদ গিললে গলা জ্বলে। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে সামান্য ধাতস্থ হয়ে সে দরজা খুলে নিচে নামল। না, একটাও লোক নেই, এতবড় ফ্যাক্টরি এলাকা খাঁ খাঁ করছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে শিবাজী ফ্যাক্টরির দরজায় পৌঁছে দেখল সেখানে দুটো তালা ঝুলছে। একটা বিশাল অন্যটা ছোট। ছোটটা নিশ্চয়ই কোম্পানির থেকে দেয়নি। অর্থাৎ সাধারণ শ্রমিকদের পরিচালিত করতে বেশ বুদ্ধি ব্যয় হচ্ছে। হাসপাতাল বলে সামনের বাড়িটাকে চিনতে পারল সে। এখানে একটা টেবিল চেয়ারও অবশিষ্ট নেই। শিবাজী আবার গাড়িতে এসে উঠল।

ফ্যাক্টরি ছাড়িয়ে আসতেই একটা ছোট্ট নদীর শব্দ কানে এল। দুপাশে সিমেন্টের বাঁধ দিয়ে নিচে নদীর শরীর চেপে বেগ বাড়ানো হয়েছে। নদীটা ফ্যাক্টরির গা ছুঁয়ে নিচে নেমে গেছে। সাঁকো ডিঙিয়ে সে আর একটু এগোতেই পাশাপাশি দুটো বাংলো দেখতে পেল। বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয় এ দুটো ম্যানেজারদের বাংলো। একটির গেট হাট করে খোলা, লন পেরিয়ে বাংলোর দরজা আঁট করে বন্ধ। পাশেরটিতে কাউকে দেখা যাচ্ছিল না বটে তবে মনে হয় কেউ এখানে থাকে। এবং তখনই শিবাজীর মনে পড়ে গেল, মিসেস সোম এই বাগানে এখনও স্বামীর প্রতীক্ষায় রয়েছেন। এটা যদি ম্যানেজারের বাংলো হয় তাহলে তাঁর তো এখানেই থাকার কথা। গাড়ি থেকে নেমে ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করার চিন্তাটাকে সে তৎক্ষণাৎ বাতিল করল। না, এই বাগান সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল না হয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে যাওয়া ঠিক নয়। তাছাড়া মহিলা তাকে কীভাবে নেবেন তাও বোঝা যাচ্ছে না। উনি যদি মনে করেন স্বামী জীবিত তাহলে ম্যানেজার হিসেবে ওর আসাটাকে উনি ভাল চোখে নাও দেখতে পারেন। গাড়িটাকে সেখানেই পার্ক করে শিবাজী চাবি দিয়ে পথে নামল। একটু ঘুরে ফিরে চারধার দেখা যাক।

নদীর পাশ দিয়ে একটা মাটির পথ চলে গেছে। দু পাশে দেওদার গাছের ছাউনি। বিকেল পেরিয়ে চলেছে। রোদের শরীরে ছায়া মিশছে। শিবাজী একটি মানুষের খোঁজে হাঁটছিল যার সঙ্গে কথা বলা যায়। রিপোর্টটি কি ভুল? এই চা-বাগানের শ্রমিকরা যদি ক্ষিপ্ত হয়ে থাকে তবে তারা গেল কোথায়? হাঁটতে হাঁটতে সে কুলিলাইনের সামনে এসে দাঁড়াল। আশ্চর্য ব্যাপার, গরু ছাগল মুরগি পর্যন্ত নেই। শ্মশানের মত খাঁ খাঁ করছে চারধার। আর একটু এগোতেই সে বিরাট অশ্বত্থ গাছের দেখা পেল। অজস্র ডালপালা মাটিতে নামিয়ে বুড়ো গাছটা ঝিম মেরে রয়েছে। তার কাছে যেতেই সে চমকে উঠল। গাছের নিচে মোটা শেকড়ের ওপর একটা লোক বসে আছে। লোকটাকে মানুষ বলে চিনতে খুব কষ্ট হয়। সমস্ত দেহে মাংস বলতে কিছু নেই, হাড়ের খাঁচার ওপর চামড়া টাঙানো। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে কোনরকমে আটকে রয়েছে। লোকটা ওকে দেখে একটা হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'সেলাম বড়সাব।' তারপর উঠে মুখ নামিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়াল।

লোকটার দিকে তাকিয়ে কষ্ট হল শিবাজীর। এই সময় তার শরীরে আবার অস্বস্তি শুরু হল। আঃ বোতলটাকে ফেলে আসাটা প্রচণ্ড ভুল হয়ে গেছে!

সে জিজ্ঞাসা করল, 'বসো তোমাকে উঠতে হবে না।'

লোকটা যেন খুব অবাক হল। তার মুখ থেকে অসাড়ে বেরিয়ে এল, 'সাব।'

'তোমার নাম কী?'

'শুকরা, হাম সাত দিন নেহি খায়া সাব।' বলে লোকটা ডুকরে কেঁদে উঠল। ওর বুকের খাঁচাটা কাঁপতে লাগল। শিবাজী লক্ষ্য করল একে যতটা বৃদ্ধ দেখাচ্ছে ততটা বৃদ্ধ এ নয়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আর সব লোক কোথায়?'

লোকটা কান্না সামলে কথা বলতে পারছিও না। যতবার মুখ খুলছে ততবার শরীর কাঁপিয়ে কান্না আসছে। হঠাৎ শিবাজীর খেয়াল হল এত কান্না সত্ত্বেও লোকটার চোখ থেকে একফোঁটাও জল পড়ছে না। অথচ ওর কান্নাটা অভিনয় নয়, শরীরের সমস্ত জল শুকিয়ে গিয়েছে নাকি। এইসময় শিবাজী সচকিত, পাশের কুঁড়ে থেকে কঙ্কালসার মানুষের মিছিল বেরিয়ে আসছে। শীর্ণ অর্ধউলঙ্গ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং শিশুরা ওর দিকে ভয়ে ভয়ে এগোচ্ছে। ক্রমশ ওরা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। তারপর সমস্বরে চিৎকার উঠল, 'ভুকা হ্যায় সাব খানে দেও।' শিবাজীর সারা শরীরে কাঁপুনি এল। লোকগুলো কাঠির মত হাত বাড়িয়ে ধরেছে সামনে। সে দ্রুত অশ্বত্থ গাছের মোটা শেকড়ের ওপরে উঠে দাঁড়াল। অন্তত পঞ্চাশজন মানুষ সামনে কিন্তু একটিও কমবয়সী অথবা যুবক-যুবতী নেই। সে হাত তুলে ওদের থামাতে চাইল। চিৎকারটা যেহেতু কান্নায় মেশানো তাই ওদের শান্ত হতে সময় লাগল। এখনও অন্ধকার নামেনি পৃথিবীর শরীরে, কিন্তু মুখ তুলতেই শিবাজীর অস্বস্তি হল। এই শীর্ণ কঙ্কালসার মানুষগুলোর মাথা ডিঙিয়ে নীল আকাশের গায়ে ক্যাটকেটে সাদা চাঁদ লাফ দিয়ে উঠে বসল যেন।

সেদিক থেকে মুখ নামিয়ে শিবাজী চকচকে চোখগুলোর দিকে তাকাল। তার পর হিন্দিতে চিৎকার করে বলল, 'তোমরা অনেক কষ্ট করেছ কিন্তু আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি এবার তোমাদের কষ্টের দিন শেষ হয়েছে। আজ থেকে আমি এই চা বাগানের ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়েছি। আমার কাজ তোমাদের ভালমন্দ দেখা এবং আমিও আশা করব তোমরা আমার পাশে থাকবে। যা হোক, তোমাদের মধ্যে যারা একটু সক্ষম তারা আমার কাছে এসো আমি তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করছি।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলোর মধ্যে শোরগোল পড়ে গেল। নিজেদের মধ্যে অনেকটা চেঁচামেচি করে চারজন প্রৌঢ় এগিয়ে এল। শিবাজী বলল, 'এখানে চাল-ডালের দোকান কোথায়?'

'বাজারমে সাব।'

শিবাজী পার্স খুলে একটা একশো টাকার নোট বের করে বলল, 'এইটে নিয়ে বাজারে যাও। চাল ডাল কিনে এনে খিচুড়ি তৈরি করে সবাইকে খেতে দাও। তোমাদের সর্দার কে?'

দুজন বৃদ্ধ একসঙ্গে হাত তুললে দূরে দাঁড়িয়ে। শিবাজী জানে, চা-বাগানের কাজের সময় এক একটা দলের একজন করে সর্দার থাকে এবং তারা একসঙ্গে কুলিলাইনে থাকতেও পারে। সে সর্দারদের বলল, 'তোমরা দেখাশুনা করবে যাতে এই লাইনের সবাই খাবার পায়!' তারপর একটু থেমে সতর্ক ভঙ্গিতে সে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে যারা আছে তাদের মধ্যে যদি কেউ য়ুনিয়নের মেম্বার হও তাহলে স্বচ্ছন্দে আমাকে বলতে পারো।'

সামনে দাঁড়ানো চার প্রৌঢ়ের একজন বলল, 'উনলোক ইহাঁ নেহি হ্যায় সাব।' শিবাজী মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'আমি এখন বাংলোয় ফিরে যাচ্ছি। তোমরা চা-বাগানের সমস্ত লোককে বাংলোর সামনে কাল সকাল ন'টায় আসতে বলবে। খবরটা আজ রাত্রেই যেন সবাই পায়।'

শিবাজী আর দাঁড়াল না। হন হন করে হাঁটতে লাগল যে পথ দিয়ে এখানে এসেছিল। এই মানুষগুলোর শরীর, চাহনি থেকে দূরে সরে যেতে চাইছিল যেন।

ঝুপ করে সন্ধে নামতেই চাঁদের গায়ে আলো জ্বলে উঠল। সেই নির্জন পথে হাঁটতে হাঁটতে শিবাজী বুঝতে পারছিল না সমস্ত চা বাগানটাতেই এ রকম মানুষেরা ছড়িয়ে রয়েছে কি না। সাধারণ আট দশটি এলাকার শ্রমিকরা দলবদ্ধ হয়ে থাকে। এলাকাগুলোকে বলে লাইন। একটা লাইনের যদি এই অবস্থা হয় অন্য লাইনের তা থেকে আলাদা হতে পারে না। এই মানুষগুলোকে কাজে ফিরিয়ে আনা মুশকিল হবে। সে নিজে এগিয়ে গিয়ে য়ুনিয়নের সঙ্গে আলোচনায় বসবে না, ওদের জন্যে অপেক্ষা করবে।

ফিনফিনে জ্যোৎস্নায় হাঁটতে হাঁটতে শিবাজীর খেয়াল হল রাতটার কথা। যে খালি বাংলো আসবার সময় সে দেখে এসেছে সেটা বাসযোগ্য আছে কি না কে জানে। যদি না থাকে তাহলে এখনই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। লাভবার্ডের আশেপাশে কোনো হোটেল নেই, কোনো ডাকবাংলো খুঁজে নিতে হবে। আর একটু এগোতেই মনে হল কেউ বা কারা যেন তার পেছনে আসছে। সে মুখ ঘুরিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। কিন্তু সন্দেহটা বদ্ধমূল হল আরো কয়েক পা হেঁটে। এবার পেছনে নয় পাশে। ওদিকটায় বুনো জঙ্গলে ছেয়ে আছে। মানুষ হাঁটলেও দেখা যাবে না। লাভবার্ড যতই শ্মশান হোক নিশ্চয়ই এখানে বন্য জন্তু আসবে না। শিবাজী স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চলবার ভান করে আচম্বিতে সরে গিয়ে ডানদিকের জঙ্গলের ডালপালা সরাতেই মেয়েটিকে দেখতে পেল। সাদা শাড়ি পরা মদেসিয়া মেয়ে। ধরা পড়ে বিব্রত চোখে খানিক তাকিয়ে দৌড়ে গেল সামনের দিকে। তারপর জঙ্গল ছেড়ে রাস্তায় উঠে সোজা ছুটতে লাগল। শিবাজী দুটো কারণে আরও বিস্মিত হল। এই মেয়েটি কেন তাকে অনুসরণ করবে? এরা কখনোই ব্যক্তিগত অসৎ উদ্দেশ্যে অপরিচিত পুরুষের পিছু ধাওয়া করে না। দ্বিতীয়ত, মেয়েটির পোশাক, এবং স্বাস্থ্য ওই কুলি-লাইনের মানুষের মতো নয়। এত অভাবের মধ্যে থেকেও ও কি করে ব্যতিক্রম রইল?

একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল শিবাজী; কখন গাড়ির কাছে এসে পৌঁছেছে বুঝতে পারেনি। গাড়িটাকে দেখে মনটা প্রফুল্ল হল। তারপর সে পাশাপাশি দাঁড়ানো দুটো বাংলোর দিকে তাকাল। একটা কাচে আলোর প্রতিফলন অন্যটা আবছা অন্ধকারে মাখামাখি। সে দ্বিতীয়টির গেট পেরিয়ে ঢুকল। ছ-মাসের মধ্যে এখানে মানুষ বাস করেছে কিনা সন্দেহ। শিবাজী লন পেরিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল। বারান্দায় শুকনো পাতা এবং ময়লা ছড়ানো। বাঁ দিকের প্রথম

ঘরটা খুলতেই বোঁটকা গন্ধ নাকে এল। শিবাজীর আফসোস হল, টর্চটা সে গাড়িতেই ফেলে এসেছে। ও ঠিক করল এখানেই থাকবে। সঙ্গে কিছু খাবার আছে তাই দিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

গাড়িতে ফিরে এসে জিনিসপত্রগুলো সে বাংলোয় নিয়ে এল। তারপর টর্চ জ্বেলে ঘরে ঢুকেই চমকে গেল। ওটা কী? ছোট্ট একটা জন্তু ঘরের কোনায় মরে পড়ে আছে। তার শরীর পচে গেলেও ওটা যে কুকুর তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। শিবাজী ছিটকে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। একটা লোমওয়ালা কুকুর চুপচাপ এই ঘরে এসে মরে পড়ে থাকতে পারে না, নিশ্চয়ই কেউ ওটাকে মেরে এখানে ফেলে রেখে গেছে। তারপর পাশের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। না এটায় কোনো গন্ধ নেই। শুধু একটা স্প্রিং-এর খাট এবং ছেঁড়া গদি ছাড়া কোনো আসবাবও নেই। জিনিসপত্রগুলো ঘরের মধ্যে এনে সে দরজাটা দেখে নিল, হ্যাঁ, ছিটকিনিটা অটুট আছে। প্রথমে জানলা দুটো খুলে দিতেই ঘরের অন্ধকার চলে গেল। সুন্দর জ্যোৎস্না এসে পড়ল ঘরের ভেতরে। স্যুটকেশ খুলে দুটো মোটা চাদর বের করে সে খাটের ওপর পেতে দিল। আর তখনি মনে হল আজকের জন্যে অনেক হয়েছে আর নয়। এবার একটু পেটে না দিলেই নয়।

ভুটানের হুইস্কি কাঁচাই খেয়ে নিল সে অনেকটা। গত তিন মাসে আজই অনেকটা সময় মদ ছাড়া গেল। কথাটা ভাবতেই হাসি পেল। টি. কে. সেন কিছু বলেননি, কিন্তু শর্মা তাকে বলেছিল যেন এই সময় ড্রিঙ্কটা না করে। তাকে নাকি এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। এরকম একটা শ্মশানে এসে ড্রিঙ্কস ছাড়া কোনো মানুষের মাথা ঠাণ্ডা থাকে কি না তার জানা নেই। কিন্তু বোতলটা খুব শিগগিরই শেষ হয়ে যাবে। ইদানীং হাঁড়িয়া খাওয়ার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। তাই সঙ্গে আর কোনো স্টক নেই। ব্যাপারটা ভাবতেই অস্বস্তি শুরু হল। এই লোকগুলো ভাত খায় না যখন তখন নিশ্চয়ই হাঁড়িয়াও বানায় না। শিবাজী বোতলের অবশিষ্ট অংশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল যাতে তার চোখে ওটা ফুরোবার আগে ঘুম আসে। কয়েক মাস আগে ঘুম তাকে ছেড়ে গিয়েছিল। এই তরল পদার্থটি তা ফিরিয়ে দিয়েছে। মদ কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না। যদি করে তাহলে জীবনটি সঙ্গে নিয়ে যায়, সে বড় স্বস্তির!

জামাকাপড় খোলেনি, পায়ে জুতো, বিছানায় হেলান দিয়ে পড়েছিল শিবাজী। এবার একটু ঘুম লাগছে। হুইস্কির বোতল শেষ। হঠাৎ তার মনে হল দরজায় যেন শব্দ হল। কেউ খুব মৃদু আঘাত করছে। প্রথমে সে ওটাকে মনের ভুল বলে উড়িয়ে দিয়ে আবার চোখ বন্ধ করেছিল। কিন্তু তারপরেই নারীকণ্ঠ শুনতে পেল। খুব চাপা গলায় কেউ ডাকছে, 'সাব্, সাব্।'

নেশাটা অতিক্রুত পাতলা হয়ে যেতে লাগল শিবাজীর। সে তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টলে গেল। কোনোরকমে খাট ধরে নিজেকে সামলে সে দরজাটা হাতড়ে খুলল। এখন ঘরের মধ্যে জ্যোৎস্না নেই, চাঁদ সরে গেছে কখন। দরজা খুলতেই মেয়েটাকে চোখে পড়ল। সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ, মুখ নিচের দিকে নামানো,হাতে কাপড়ে ঢাকা থালা।

শিবাজী জড়ানো গলায় বলল, 'কে তুমি? কী চাই?'

গলা শুনে মেয়েটা যেন একটু ভয় পেল। তারপর কোনো রকমে থালাটা এগিয়ে ধরল, 'মেমসাব খানা ভেজা।'

'মেমসাব? কে মেমসাব?'

'ওহি কুঠিমে হ্যায়।'

'কী আছে ওতে?'

'খানা। রোটি আউর সবজি।'

হাত নাড়ল শিবাজী। যেন শূন্যে মাখন কাটল, 'নেহি চাহিয়ে। আমি আজ রাত্রে কিছু খাব না যাও।' দরজা বন্ধ করে দিতে গিয়ে তার হঠাৎ খেয়াল হল। মেয়েটি তখনও দাঁড়িয়েছিল পাথরের মত। সে কপাটে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার মেমসাহেব একা থাকেন?'

'হ্যাঁ। হাম আউর মেমসাব। আপ খানা নেহি খায়েগা?'

'বললাম তো না!' চিৎকার করে উঠতে গিয়েও সামলে নিল শিবাজী। গায়ে পড়ে ওদের অতিথি সেবা করতে কে মাথার দিব্যি দিয়েছে। তারপরই সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এই বাগানে থাকো?'

'হ্যাঁ'।' বলে মেয়েটি আর দাঁড়াল না। বারান্দা দিয়ে এগিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে মিলিয়ে গেল। ঘরে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল শিবাজীর। খামোকা তাকে ডেকে নেশাটার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেল মেয়েটা। নিশ্চয়ই মিসেস সোম পাঠিয়েছেন ওকে। কিন্তু ভদ্রমহিলা ওর অস্তিত্ব টের পেলেন কী করে? তার মনে পড়ল ওই মেয়েটি তাকে অনুসরণ করেছিল। তার মানে, সে গাড়ি থেকে নেমে যখন কুলি লাইনের দিকে গিয়েছিল, তখনই মিসেস সোম তাকে দেখতে পেয়ে ওই মেয়েটিকে পাঠিয়েছিলেন খোঁজ-খবর নিতে। কুলিদের কাছে কি সে বলেছিল তার পদের কথা? মনে পড়ছে না। বলে থাকলে এই মেয়েটি নিশ্চয়ই সেকথা শুনে এসেছে, ওর মেমসাহেবকে বলেছে। তাই এই খাতির। কোন কারণ নেই, তবু এই মুহূর্তে শিবাজী ওই ভদ্রমহিলার ওপর ক্ষিপ্ত হল। নেশার সময় সে কোনো বাধা সহ্য করতে পারে না। টলতে টলতে ও কুড়িয়ে সে পাশের দরজা খুলল। ওটা নিশ্চয়ই বাথরুম। কিন্তু জায়গাটা মরুভূমির চেয়েও শুকনো। এই সময় বাথরুমের পেছনে খুব দ্রুত পায়ের শব্দ উঠল। আর তারপরেই জমাদার আসার দরজায় দ্রুত করাঘাত হল। আবার কে এল? সে দরজা খুলবে না ঠিক করতেই মেয়েটির চাপা এবং ব্যস্ত গলা শুনতে পেল, 'সাব্, সাব্, জলদি খুলিয়ে!'

'একটু অবাক হয়েই দরজাটা অনেক কষ্টে খুলল শিবাজী। মেয়েটি সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তখনও হাঁপাচ্ছে। ওকে দেখেই বলল, 'জলদি নিকালিয়ে সাব্, উনলোক আতা হ্যায়। জলদি আইয়ে।'

'কারা আসছে?'

'পিছে বাত করিয়ে।' সে মেয়েটি বাথরুমে ঢুকে পড়ল। তারপর তার ঘরে গিয়ে স্যুটকেশটা তুলে নিল এক হাতে, অন্য হাতে চাদর। ওর ভাবভঙ্গিতে একটি ভীত হরিণের ছন্দ। মেয়েটি যেন তাকে ঠেলেই সিঁড়ি দিয়ে নিচের মাটিতে নামল। তারপর দৌড়ে বাংলোর পেছনে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। কী ব্যাপার বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল শিবাজী। কিন্তু হঠাৎই ওর মনে হল মেয়েটা চোর নয় তো! তাকে খাবার দিয়ে নিজেকে ভাল প্রতিপন্ন করে এখন স্যুটকেশ নিয়ে পালাচ্ছে বোধ হয়। সে টলতে টলতে দৌড়ে পেছনের জঙ্গলে ঢুকে পড়তেই লজ্জা পেল। মেয়েটি তখনও তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। চোর হলে হাওয়া হয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ সময় পেত।

অনুমান মিথ্যে হওয়ায় সে রাগত গলায় জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে?"

মেয়েটি নিঃশব্দে ঠোঁটে আঙুল দিল। তারপর মুখ বাড়িয়ে বাংলোটাকে দেখে নিয়ে বলল, 'চার আদমি আপকো লিয়ে আয়া হ্যায়।'

'আমার জন্যে? কেন?'

মেয়েটি এবার যা বলল তাতে সত্যি অবাক হয়ে গেল শিবাজী। খাবার ফেরত নিয়ে সে যখন গেটের কাছে পৌঁছেছে তখন দুটো লোককে দেখতে পায়। ওরা নিচু গলায় কথা বলছিল, ওদের হুকুম আছে যে সাহেব আসবে তাকেই যেন খতম করে দেওয়া হয়, আর একজন বলল,

একটু অপেক্ষা করা যাক। এই সাহেবটার গায়ে বেশ শক্তি আছে মনে হয়। ওদের দুই সঙ্গী এসে গেলে একসঙ্গে ঢুকবে। এমনভাবে করতে হবে যাতে কেউ টের না পায়। একথা শুনে মেয়েটি আর গেট দিয়ে না বেরিয়ে খাবারের থালা লনের ঝোপের মধ্যে রেখে পেছন দিকে চলে এসেছে। সামনের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে সাহস পায়নি, যদি ওরা দেখে ফেলে তাই। সাহেবের এই রাত্রে আর বাংলোয় ফিরে যাওয়া উচিত হবে না। এবং ওখানে ওরা সাহেবকে না পেলে নিশ্চয়ই এখানে খুঁজতে আসবে। সেক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যাওয়া মঙ্গল।

শিবাজীর সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। তাকে কে খুন করতে চাইবে? সে যে এসেছে এখানে তাই এত দ্রুত রটে গেল কী করে? কিছুই বুঝতে পারছিল না শিবাজী। নিশ্চয়ই য়ুনিয়ন থেকে এরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তাহলে?

সে মুখ বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করল। বাংলোর পাশ দিয়ে অনেক দূরের গেটের মুখটা দেখা যাচ্ছে। এমনকি তার গাড়িটাও। এই সময়ে তার চোখে চারটে মূর্তি ধরা পড়ল। গেট পেরিয়ে ওরা লনে ঢুকতেই বাংলোর আড়ালে হারিয়ে গেল। তার মানে সমস্ত ব্যাপারটাই সত্যি।

মেয়েটি ততক্ষণে আবার মাটিতে রাখা স্যুটকেশ তুলে নিয়েছে, 'সাব্।' হঠাৎ শিবাজীর মনে হল এই মেয়েটি খামোকাই তার জন্যে নিজেকে বিপদে জড়াচ্ছে। এর চেয়ে কোনমতে যদি সে গাড়িটার কাছে পৌঁছাতে পারত। কিন্তু যেতে হলে ওদের সামনে দিয়েই যেতে হবে। তার পক্ষে কি ওই চারটে লোকের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব? পেটে যদি হুইস্কি না পড়ত তাহলে একবার চেষ্টা করা যেত। এই প্রথম মদ খাওয়ার জন্যে তার আফসোস হল। মেয়েটি ততক্ষণে আর একটু দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। আর কিছু ভেবে পেল না শিবাজী। চুপচাপ ওকে অনুসরণ করল। দৌড়ে যাচ্ছে মেয়েটি গাছপালা এড়িয়ে। তাল রাখতে অসুবিধে হচ্ছিল শিবাজীর। মিনিট দশেক পরে ওরা চা-বাগানের অনেক গভীরে চলে এল। গাছগুলো এখানে প্রায় কাঁধ ছুঁয়েছে। এখানে বসে পড়লে কারো পক্ষে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। বিরাট এলাকা জুড়ে নতুন গালচের মতন চা-বাগানের ওপর চাঁদ গলে গলে পড়ছে। মেয়েটি একটু পরিষ্কার জায়গা বেছে নিয়ে চাদরটা পেতে তার ওপর স্যুটকেশটা রাখল।

শিবাজী বেশ কৃতজ্ঞ গলায় বলল, 'তুমি এবার যাও। হয়তো ওরা তোমাদের বাংলোয় যেতে পারে।'

মেয়েটি মাথা নাড়ল। তারপর হিন্দিতে বলল, 'এখানে আপনাকে কেউ খুঁজে পাবে না। আপনি সকালের আগে উঠে দাঁড়াবেন না। খুব মশা আছে, কষ্ট হবে, কিন্তু কিছু করার নেই।' বলে নিঃশব্দে চা-গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল। এতদূর ছুটে এসে ভীষণ ক্লান্ত লাগল শিবাজীর। এইভাবে চা-গাছের বনে তাকে আত্মগোপন করতে হবে কখনো চিন্তাও করেনি। তবে মেয়েটির জন্যে হয়তো আজ প্রাণ বেঁচে গেল। কেন বাঁচালো মেয়েটি?

কিছুক্ষণের মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল শিবাজী। মশা তো বটেই, চা-গাছের শরীর থেকে ঝাঁক ঝাঁক পোকামাকড় বেরিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। অথচ এখান থেকে বাইরে বের হবার কোনো উপায় নেই। এবার শিবাজীর অন্যরকম আফসোস হল। এখন যদি পর্যাপ্ত হাঁড়িয়া কিংবা হুইস্কি থাকত তাহলে এই পোকামাকড়গুলো সে স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করতে পারত। মদের কথা মনে হতেই ওর শরীর আইঢাই করতে লাগল। এবং শেষ পর্যন্ত সে গুঁড়ি মেরে হেঁটে চা-বাগান থেকে বেরিয়ে এল। স্যুটকেস কিংবা চাদরের কথা এই মুহূর্তে তার খেয়াল রইল না।

সুন-সান চারধার। শুধু ঝিঁঝির ডাক ছাড়া কোনো শব্দ নেই। শিবাজী প্রায় নিঃশব্দ পায়ে

রাস্তায় নামল। কোনো মানুষের চিহ্ন নেই কোথাও, ওরা তাহলে তাকে খুঁজতে এদিকে আসেনি। সে জঙ্গল পেরিয়ে আবার বাংলোর কাছে চলে আসতেই স্থির হল। একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে বাংলোর নিচে। চাঁদের আলো কমে যাওয়ায় লোকটির মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। নিজেকে আড়াল রেখে শিবাজী লোকটিকে লক্ষ্য করল। খুব স্বাস্থ্যবান নয় কিন্তু দুর্বলও মনে হচ্ছে না। ওই অনাহারী মানুষগুলোর সঙ্গে নিশ্চয়ই এ বাস করে না। এরপরেই চাপা গলায় কথা বলতে বলতে তিনজন লোক ফিরে এল। ওদের মধ্যে একজন বেশ উত্তেজিত কারণ সে খুব হাত পা নাড়ছিল। শিবাজী আড়ালে আড়ালে আর একটু কাছে এগোতেই ওদের গলা শুনতে পেল। উত্তেজিত লোকটা বলছিল, 'পুরো এলাকা খুঁজে এলাম কিন্তু কোথাও পেলাম না। মালিক বিশ্বাস করবে এই কথা?'

দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'মেমসাহেবের বাংলো দেখেছিস?'

'হ্যাঁ! ওখানে ও যায়নি। মেমসাহেবের ঘর ছাড়া সবকটা ঘর দেখেছি।'

'মেমসাহেবের ঘরেও থাকতে পারে।'

'এ শালা এক নম্বরের গাধা। যে মেয়েমানুষ স্বামীর জন্যে বসে আছে সব ছেড়ে সে অন্য পুরুষকে ঘরে ঢোকাবে?'

'কিন্তু যাবে কোথায়? আমরা এখানে আসার আগে ও বাংলোয় ছিল, পেছনের দরজা খোলা। ও কী করে টের পেল যে আমরা আসছি? কেউ নিশ্চয়ই বেইমানি করেছে।'

'ওসব কথা ভেবে কোনো লাভ নেই। এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে, চল ফিরে যাই, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।'

'মালিককে কী বলবি?'

'বলব বাংলোয় ছিল না।'

'কিন্তু গাড়িটা? ওটা তো এখানেই রয়েছে, মালিক বিশ্বাস করবে?'

'আরে মালিক তো দেখতে আসছে না। আমরা যা দেখাব মালিক তাই দেখবে। তাছাড়া লোকটা যাবে কোথায়? এখানে থাকলে আজ নয় কাল সুযোগ পাবই।

নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে ওরা গেট থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর একজন একটু ঝুঁকে গাড়ির পেছনের চাকার হাওয়া খুলে দিল। দিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল। প্রায় পনেরো মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল শিবাজী। আজ রাত্রে ওরা আর ফিরে আসবে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু মালিকটি কে? সে চাইছে । কেউ এখানে ম্যানেজার হয়ে আসুক। তার প্রথম কাজ হবে এই লোকটিকে খুঁজে বের করা। মালিকের সঙ্গে মোকাবিলা না করলে এই চা-বাগানে থাকা যাবে না বোঝা যাচ্ছে।

সতর্ক পায়ে গেটের কাছে এসে দাঁড়াল শিবাজী। এই নির্জন রাতের আকাশ এখন ঘোর লেগেছে। তারাগুলো অনেকটা নিচে নেমে এসেছে। না, ওরা সত্যি চলে গেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে লনটা দেখতে গিয়ে ওর চোখ ছোট হয়ে এল। সে দ্রুত একটা গাছের নিচে গিয়ে হাত বাড়িয়ে থালাটা তুলে নিল। ঢাকাটা সরাতে কয়েকটা রুটি আর আলুর তরকারি দেখতে পেল। মেয়েটি তাহলে এখানেই রেখে গিয়েছিল এটাকে! এবং এই খাদ্যদ্রব্যটি দেখামাত্র শিবাজীর প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেল। অথচ দুটো রুটি খাওয়ার পর তার আর সেই ইচ্ছেটা রইল না। এখন একটু বিশ্রাম দরকার! বাংলোয় ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়া যাক। কারণ মনে হয় ওরা আজ আসবে না। কিন্তু শিবাজীর খেয়াল হল স্যুটকেশ এবং চাদর চা-বাগানের মধ্যে পড়ে আছে। অতএব বাংলোতে যাওয়া অর্থহীন। অথচ এই রাত্রে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়েও থাকা যায় না। এই সময় তার নজর গেল গাড়িটার দিকে। পেছনের চাকা বসে গিয়ে গাড়িটা বেঁকে রয়েছে। সে থালা

বাটি গাছের তলায় রেখে ভেতরে ঢুকে লক করে দিল। চমৎকার! এখানে অন্তত মশা ঢুকবে না। আর ওরা যদি ফিরেও আসে তাহলে হয়তো গাড়ির মধ্যে উঁকি না-ও দিতে পারে। আর বেশি ভাবতে পারছিল না সে। পেছনের লম্বা সিটে শরীরটাকে এলিয়ে দিতেই চোখ বন্ধ হয়ে এল। অনেক অনেক দিন বাদে মদের প্রতিক্রিয়া ছাড়া শুধু ক্লান্তি তার চোখে ঘুম এনে দিল। তখন সেই শ্মশান হতে চলা চা-বাগানের ওপর ঢলে পড়া চাঁদ আর আলো ছড়াতে পারছিল না। পৃথিবীর শরীর থেকে একটা গভীর অন্ধকার চুঁইয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল চারধারে। ঠিক সেই সময় পাশের বাংলোর জানলা খুলে গেল। নির্ঘুম রাত কাটানো একটা রমণীর মুখ জানলায়, নীরক্ত গাছের মত স্থির।

রোদ কড়া হবার পর ঘুম ভাঙল শিবাজীর। ভাঙতেই সেই লোকগুলোর কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তড়াক করে উঠে বসল সে। হাত ঘড়িতে এখন সবে সাতটা কিন্তু মনে হচ্ছে প্রচুর বেলা হয়ে গেছে। চারধারে ময়লা এবং অগোছালো অবস্থা। অন্যমনস্ক হয়ে সে বাংলোয় উঠে এসে ঘরের দরজায় দাঁড়াতেই চমকে উঠল। পরিষ্কার করে বিছানা পাতা, স্যুটকেসটা একটা টেবিলের ওপরে সযত্নে রাখা। ঘরে ঢুকে বাথরুমের দিকে তাকাতেই বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। সেখানে দুটো বড় বালতিতে জল এবং মগ রেখে দেওয়া হয়েছে। এত পরিচর্যা কে করল? সঙ্গে সঙ্গে শিবাজীর মনে মেয়েটির মুখ ভেসে এল। আশ্চর্য! এত সহৃদয়তা মেয়েটি দেখাচ্ছে কেন?

কাল থেকে জলের স্পর্শ পায়নি সে। দরজা বন্ধ করে বাথরুমে ঢুকে গেল। আঃ জলের ছোঁয়া কি আরামদায়ক, অনেকদিনের পুরনো ভালবাসার মতন। নিজেকে সতেজ করে শোওয়ার ঘরে ফিরে এল শিবাজী। এখন এক কাপ চা পেলে হতো। আর সেই সময় তার চোখে খালি হুইস্কির বোতলটা পড়ল। দ্রুত এগিয়ে সে ওটাকে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল, একদম তলায় সামান্য তলানি পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের প্রতি কোষ উন্মুখ হয়ে উঠল, সে বোতলটা নিয়ে বাথরুমে ঢুকে তাতে কিছুটা জল ঢেলে নাড়াতে লাগল। বোতলের গায়ে জড়িয়ে থাকা অ্যালকোহল যেন জলের সঙ্গে মিশে যায়, একটুও বাদ না পড়ে। এই সময় দরজায় কেউ নক করল।

শিবাজীর হাত আচমকা স্থির হয়ে গেল। কে এসেছে? সেই লোকগুলো নয়তো! শিবাজী বোতলটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল। তারপর সতর্ক চোখে ঘরটায় চোখ বোলাল। না, আত্মরক্ষা করার মত কোনো অস্ত্র নেই। আবার শব্দ হতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, 'কে?'

'চা।'

নরম নারীকণ্ঠে শব্দটা উচ্চারিত হতেই শিবাজীর উত্তেজনা শিথিল হয়ে গেল। সে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই মেয়েটিকে দেখতে পেল। আজ সকালে অন্য শাড়ি পরেছে মেয়েটি, হাতের ট্রেতে চায়ের পট, কাপ এবং প্লেটে কয়েকটা বিস্কুট। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখতে রাখতে বোতলটাকে দেখল মেয়েটা। শিবাজী সেটা লক্ষ্য করেই জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাকে এসব কে করতে বলেছে?'

মেয়েটি জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। শিবাজী আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার মেমসাহেব জানে?'

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

'কিন্তু এতে তোমার বিপদ হতে পারে। ওরা জানলে—, ওরা গতকালই সন্দেহ করেছিল কেউ আমাকে খবর দিয়েছে। তোমার এসব না করাই ভাল।'

মেয়েটি নিচু গলায় বলল, 'জানি।'

'জানো যখন করছ কেন? তোমার মেমসাহেবকে এই কথাটা বলে দিও।'

মেয়েটি সেই ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এখানে থাকবেন না?'

'কেন থাকব না? এই বাগানকে না বাঁচিয়ে আমি ফিরব না।'

শিবাজী দেখল মেয়েটির মুখ কথাটা শোনামাত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দুটো চোখ হাসিতে মাখামাখি, বলল, 'চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নিন।' বলে দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

চা খেয়ে শিবাজীর মনে হল এবার ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করা উচিত। ওঁর আতিথ্য সে নিচ্ছে অথচ—। পাজামা পাঞ্জাবি পরে সে বাংলো থেকে বেরিয়ে এল। ন'টা বাজতে এখনো বেশ দেরি আছে। কাল সন্ধেবেলায় সে বলে এসেছে ওদের এখানে আসতে, কিন্তু আসবে কিনা ঈশ্বর জানেন। কিন্তু খবরটা যদি ছড়ায় যে সে ওদের রাত্রে খাইয়েছে তাহলে তো না আসার কোনো কারণ নেই। দেখা যাক। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শিবাজী ঠিক করল আজ প্রথমে এই চাকা দুটোকে সারাতে হবে। এটাকে যে করেই হোক সচল রাখতে হবে। নেহাৎ ক্ষতি করার জন্যেই ওরা এটার হাওয়া খুলে চলে গেল। পাশের বাংলোর গেটের দিকে পা বাড়াতেই শিবাজী থমকে দাঁড়াল। ওরা আসছে। লাইন দিয়ে রুগ্ণ অশক্ত মানুষেরা ওর বাংলোর দিকে এগিয়ে আসছে। বেশ ভয়ে ভয়ে এবং সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে পা ফেলছে ওরা। ন'টার অনেক আগেই এসে পড়েছে ওরা, কী ব্যাপার? বোধ হয় ঘড়ির ব্যবহার নেই কিংবা ঘড়ি রাখার বিলাসিতা এই মুহূর্তে করতে পারছে না। শিবাজী আবার নিজের বাংলোর সামনে ফিরে এল। লোকগুলো তাকে দেখতে পেয়ে প্রথমে থমকে দাঁড়াল। তারপর একে একে এগিয়ে এসে সামনের মাঠে উবু হয়ে বসল। শিবাজী লক্ষ্য করছিল আজ শুধু বৃদ্ধ কিংবা শিশুই নয়, অল্পবয়সী এবং শক্ত লোকেরাও এদের মধ্যে আছে। শুধু একদিক নয় বিভিন্ন দিক থেকে শ্রমিকদের মিছিল শুরু হল। ঠিক অর্গানাইজড মিছিল নয় তবু একটা শৃঙ্খলা ছিল ওদের মধ্যে। ক্রমশ মানুষের সংখ্যা বাড়তে লাগল। এত মানুষ একসঙ্গে বসেছে কিন্তু কেউ কোনো কথা বলছে না। সামান্য গুঞ্জন নেই। শিবাজীর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। এটা কী করে সম্ভব? প্রত্যেকের চোখ তার দিকে স্থির।

এর সময় ওদের আসা বন্ধ হল। শিবাজীর সামনে বসা লোকগুলোর মধ্যে গত সন্ধ্যার কিছু মুখ দেখতে পেল। যে লোক দুটো নিজেদের সর্দার বলেছিল তাদের কাছে ডাকল সে। লোক দুটো নড়বড়ে পায়ে উঠে আসতেই সে বলল, 'সবাই খবর পেয়েছে?'

ওরা একসঙ্গে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ'

শিবাজী বলল, 'এখানে আর যে সমস্ত সর্দার আছে, তাদের এগিয়ে আসতে বলো।'

লোক দুটো চিৎকার করে সেকথা বলতেই মুখে মুখে জনতার মধ্যে সেটা ছড়িয়ে গেল। মিনিট পনেরো লাগল সর্দারদের এগিয়ে আসতে। শিবাজী লক্ষ্য করল এরা প্রত্যেকেই প্রায় অশক্ত এবং প্রৌঢ়। এত মানুষের কাছে বক্তব্য রাখতে গেলে একটা মাইক থাকলে ভাল হত। শিবাজী একটু হতাশ ভাবে চারপাশে তাকিয়ে গাড়ির বনেটের ওপর উঠে দাঁড়াল। এখন প্রায় প্রতিটি মানুষকে সে দেখতে পাচ্ছে। অনেকটা উঁচু পর্দায় গলা তুলে সে কথা শুরু করল, আজ আমি তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হব বলে এখানে আসতে বলেছিলাম। এই চা বাগান তোমাদের চা-বাগান। তোমাদের বাবা-ঠাকুর্দারা এই বাগানের গাছগুলোকে লাগিয়েছিল, এরা বেঁচে থাকলেই তোমরা বেঁচে থাকবে। আমি ম্যানেজার হিসেবে মাত্র গতকাল এসেছি। আমি কথা দিচ্ছি, আমি তোমাদের পাশে থাকব।

আমি জানি কয়েক মাস হল তোমরা মাইনে পাচ্ছ না, তোমাদের পেটে খাবার নেই। তোম আন্দোলন করেছিলে কয়েকটা দাবি নিয়ে কারণ তোমাদের মালিকরা তোমাদের সুখসুবিধে দেখ

না। কিন্তু যে হাঁস ডিম দেয় তার পেট কাটলে হাজার হাজার ডিম পাওয়া যায় না বরং হাঁসটাই মরে যায়। তোমাদের য়ুনিয়নের কোনো দোষ আমি দিচ্ছি না তাদের এই কথাটা বোঝা উচিত ছিল। যাহোক,এখন মালিক বদল হয়েছে। দেশের খুব বড় কোম্পানি এই বাগান কিনেছে। তারা চায় যে এই বাগানের ভাল কাজ হোক, তাতে এই দেশের উপকার হবে। তারা মনে করে তোমাদের ঠকিয়ে তোমাদের কষ্ট দিয়ে সেই কাজ হবে না। আমি তোমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখব আর তোমরা আবার মন দিয়ে কাজ শুরু করবে।

এই বাগানের যা অবস্থা তাতে কাজ শুরু করতে এখনও কিছুদিন দেরি হবে। এই সময়ে কোম্পানি তোমাদের খাওয়া-দাওয়ার দায়িত্ব নিচ্ছে। প্রতিটি লাইনের সর্দারদের টাকা দেওয়া হবে যাতে একসঙ্গে রান্না হতে পারে।

শিবাজী দম নেবার জন্যে থামতেই একটা খুশির গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল জনতার মধ্যে। এই প্রথম ওরা নিজেদের মানুষ বলে প্রমাণ করল।

'আমি য়ুনিয়নের নেতাদের সঙ্গে আলাপ করতে সবসময় রাজি আছি। আমি তোমাদের বন্ধু হয়ে এসেছি, শত্রু ভাবনার কোনো কারণ নেই। আমার বিরুদ্ধে কেউ যদি তোমাদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করে তাহলে এই কথা মনে রেখ। আমি জোরের সঙ্গে বলছি, তোমাদের কষ্টের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। তোমরা যে যা কাজ করতে সেই কাজে আবারে ফিরে এস।' কথা বলতে বলতে শিবাজী লক্ষ্য করল একটা জিপ আর ভ্যান ছুটে আসছে। ওগুলো চোখে পড়ামাত্র কুলিদের মধ্যে একটা সন্ত্রস্তভাব দেখা দিল। কাছাকাছি আসতেই শিবাজী বুঝল ওগুলো পুলিসের গাড়ি। একটু দূরে গাড়িগুলো থেমে যেতেই পিলপিল করে কয়েকজন রাইফেলধারী নেমে এল। আর তখনই ঘটে গেল প্রতিক্রিয়া। সামনে উবু হয়ে বসে থাকা চুপচাপ মানুষগুলো আতঙ্কিত গলায় চিৎকার করতে করতে দৌড়তে শুরু করল যে দিকে যে পারে। শিবাজী ওদের থামাবার চেষ্টাও করেও বিফল হল।

'আপনি কি মিস্টার চ্যাটার্জি?'

শিবাজী দেখল একজন পুলিস অফিসার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

'আপনি গতকাল এখানে আসবেন আপনার কোম্পানি আমাদের জানিয়েছিল কিন্তু আপনার কাছ থেকে কোনো খবর পাইনি। কিছুক্ষণ আগে থানায় ফোন এল আপনি খুব বিপদগ্রস্ত, সব অ্যাটাক করেছে, তাই আমরা—' পুলিস অফিসার পালিয়ে যাওয়া শ্রমিকদের দেখছিলেন।

'কে খবর দিল? আমি তো দিইনি এবং আমাকে কেউ আক্রমণ করেনি। বরং আপনারা আসায় ওরা ভয় পেল অযথা। দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে আপনারা কিরকম আত্মীয়তা করেছেন তার প্রমাণ দেখতে পেলাম!' শিবাজী উত্তেজিত হয়ে পুলিসের গাড়ি দুটোকে দেখল।

'তাহলে আপনি খবর পাঠাননি?'

'নো, নেভার।'

'কিন্তু আমরা খবর পেয়েছিলাম লাভবার্ড এখন খুব খারাপ জায়গা হয়ে গেছে। আপনার আগের ভদ্রলোককে আমরা এখনও খুঁজে বের করতে পারিনি। ওঁর স্ত্রী বিশ্বাস না করলেও আমরা, আনঅফিসিয়ালি বলছি, হি ইজ মার্ডারড্। যা হোক, আপনাকে সবরকম প্রোটেকশন দিতে বলা হয়েছে। আপনি এদের সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন।'

'ধন্যবাদ।' খুব তেতো লাগছিল লোকটার উপস্থিতি।

'আপনি যদি চান তাহলে এখানে পুলিশ গার্ড রেখে দিতে পারি।'

'না আমি চাই না। আপনাদের সাহায্য নিলে আমি এখানে কোনো কাজ করতে পারব না।

শুধু থাকাই সার হবে। যদি কখনও দরকার হয় আমি নিজে আপনাদের খবর দেব।' শিবাজী গাড়ির বনেট থেকে নেমে দাঁড়াতেই পুলিস অফিসার ওর দিকে একটু চোখ কুঁচকে তাকিয়ে ফিরে গেলেন গাড়ির দিকে। একটু বাদেই পুলিসের গাড়ি দুটো চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল। এখন চারধার ফাঁকা। সর্দারগুলো পর্যন্ত ধারেকাছে নেই। প্রচণ্ড আফসোস হচ্ছিল শিবাজীর। একটা সম্পর্ক তৈরি করার মুহূর্ত ভেঙে গেল পুলিসগুলোর জন্যে। কিন্তু ওদের খবর দিল কে সে আক্রান্ত হয়েছে? যারা দিয়েছিল তারা জানত পুলিশ এলেই এদের জমায়েত ভেঙে যাবে। মাথা নাড়লো শিবাজী, এরা সত্যিই বুদ্ধিমান। কোনোরকম হাঙ্গামা না করে কি সুন্দর তার পরিকল্পনা ভেস্তে দিল। শিবাজী এবার দেখতে পেল কয়েকজন বাঙালি ভদ্রলোক দূরে অফিস ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, পুলিস চলে যেতে এবার গুটি-গুটি এগিয়ে আসছেন। সাতজন, সংখ্যাটি গুনল সে। বেশির ভাগই বয়স্ক। সামনে এসে হাত জোড় করে নমস্কার জানালেন তাঁরা।

শিবাজী সেটা ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কি এই বাগানের স্টাফ? তার অনুমান ভুল হয়নি। এক প্রবীণ ভদ্রলোক তখনও হাতজোড় করেছিলেন, বললেন, 'হ্যাঁ স্যার। আই অ্যাম হেডক্লার্ক।'

'কী নাম আপনার?'

'জয়দেব সামন্ত স্যার।'

'কজন স্টাফ আছেন আপনারা?'

'মোটমাট বাইশজন বাবু ছিলাম। সবাই পালিয়েছে ভয়ে। শুধু আমাদের কোথাও যাবার জায়গা নেই তাই বেঁচে মরে আছি এখানে। আর পারছি না স্যার, আমাদের বাঁচান। আমরা শুনছিলাম কাল রাত্রেই যে আপনি এসেছেন কিন্তু ভয়ে আসতে পারিনি।' সামন্ত নিবেদন করলেন।

'ভয় কেন? কীসের ভয়?'

'প্রাণের স্যার। কিভাবে বেঁচে আছি বোঝাতে পারব না স্যার।'

'এখন এলেন এতে প্রাণ বাঁচবে?' হাসল শিবাজী।

'আর পারলাম না। সবাই যুক্তি করে চলে এলাম।'

'হুম।' শিবাজী গম্ভীর হল।

'স্যার, একটা কথা বলব?'

শিবাজী তাকিয়ে দেখল, একটি দরকচা-মারা মুখ কথা বলছে। সে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

'স্যার, আপনি আমাদের কাদার মাদার। দয়া করে আমাদের চাকরি শেষ করে দেবেন না। কোনোদিন আবার কাজ শুরু হবে এই আশায় বেঁচে আছি। চাকরি চলে গেলে আত্মহত্যা করতে হবে স্যার।' প্রায় ডুকরে উঠল লোকটা।

ঠোঁট কামড়াল শিবাজী, 'আপনি কী করতেন?'

'পাতিবাবু ছিলাম।'

শিবাজী লোকগুলোকে আর একবার দেখল। তারপর বলল, 'দেখুন, পুরনো স্টাফদের চেঞ্জ করার কোনো ইচ্ছে কোম্পানির নেই। এই কয়মাস বাগানে কাজ না হওয়ায় যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে তাই আপনাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। এই বাগানকে দাঁড় করাতে গেলে আপনাদের সক্রিয় হতে হবে। যতক্ষণ আমি কারো কাজে গাফিলতি না দেখছি ততক্ষণ চাকরি যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আপনারা যে যা কাজ করতেন তাই করুন। প্রথম এক মাস কোম্পানি আপনাদের কাজ লক্ষ্য করবে। সন্তুষ্ট হলে আগামী মাস থেকে টমসন অ্যান্ড হিউস আপনাদের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে আসবে। বুঝতে পেরেছেন সবাই।

প্রত্যেকেই উজ্জ্বল মুখে মাথা নাড়ল।

শিবাজী বলল, 'আপনারা কাল থেকেই কাজে লেগে যাবেন। আর শুনুন, আপনাকে বলছি, যাঁরা আপনাকে পৃথিবীতে এনেছেন এবং লালন করেছেন তাঁদের ছাড়া অন্য লোককে বাপ-মা বলবেন না। নিজের মেরুদণ্ডকে শক্ত করতে শিখুন। মিঃ সামন্ত, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।'

ওঁরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ফিরে গেলেন। শুধু সামন্ত শিবাজীকে অনুসরণ করলেন। বাংলোয় ঢুকে শিবাজীর খেয়াল হল এখানে বসার চেয়ার পর্যন্ত নেই। তাই সে ঘুরে দাঁড়াল, 'আপনি কি মনে করেন আজই যদি অফিস এবং ফ্যাক্টরির দরজা খোলা যায় তাহলে কোনো গোলমাল হতে পারে?'

'ফিফটি ফিফটি চান্স স্যার। সাধারণ কুলিরা চাইছে কাজ করতে কিন্তু—।' ভদ্রলোক বাকি কথাটা শেষ করলেন না।

'সব দরজা খুলিয়ে পরিষ্কার করান। ও হ্যাঁ, দুটো করে তালা দেখলাম, কী ব্যাপার?'

'একটা ওরা লাগিয়ে গেছে। কোম্পানির চাবি সোম সাহেবের কাছে ছিল।'

'ও। চাবি বাংলোয় আছে কি না খোঁজ নিন। কারা তালা লাগিয়েছে?'

'বুঝতেই পারছেন স্যার।'

'ভেঙে ফেলুন। যে সমস্ত গার্ড ফ্যাক্টরি এবং অফিসের চার্জে ছিল তাদের ডেকে পাঠান। আর কালকের মধ্যে জরুরি যেসব খরচ আছে তার একটা এস্টিমেট করে আমাকে দিন।'

'স্যার, পুলিসের হেল্প নেবেন না?'

'না। আপনি ভয় পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'শারীরিক আক্রমণের আশঙ্কা?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, তাহলে হাত পা গুটিয়ে বাড়িতে বসে থাকুন, কাজে আসতে হবে না।' সামন্ত থতমত হয়ে গেলেন। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'ঠিক আছে স্যার, আমি চেষ্টা করছি।'

'সামন্তবাবু, মনীশ সোমের ব্যাপারটা খুলে বলুন তো!'

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন সামন্ত। শিবাজী খুব সাধারণ গলায় প্রশ্নটা করেছিল। সামন্তবাবুর চোখের দিকে তাকিয়েছিল। উনি বললেন, 'স্যার, এ বিষয়ে আমি পুলিসকে জানিয়েছি। আমি সেই মুহূর্তে স্পটে ছিলাম না।'

'ওঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?'

'হয়েছিল স্যার। উনি চা-বাগানে এসেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কোনো আন্দোলন-ফান্দোলন তিনি বরদাস্ত করতে পারবেন না। সমস্ত স্টাফকে নিয়ে আমি যেন কাজে যোগ দিই। তারপর উনি য়ুনিয়নের নেতাদের ডেকে পাঠালেন। তাদের সঙ্গে কী আলোচনা হল জানি না কিন্তু তারপরেই কুলিরা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল। তিনি খুব জেদ করে কুলিদের বোঝাবেন বলে ওদের মধ্যে চলে গেলেন। তারপর আর ওঁকে পাওয়া যায়নি। এসব কথা আমি পুলিসকে বলেছি স্যার।' সামন্ত কথাগুলো শেষ করে মুখ নামালেন।

শিবাজীর মনে হল ভদ্রলোক কিছু চেপে গেলেন। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?'

'হ্যাঁ, আমি ওকে বুঝিয়ে বলতে গিয়েছিলাম। উনি কিছুতেই বাগান ছেড়ে যাবেন না। রোজ

সকালে একটি মদেসিয়া মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে লাইনে লাইনে ঘুরে বেড়ান স্বামীর খবর পাওয়ার জন্যে।''

শিবাজী বুঝল এভাবে বললে কোনো কথা সে বের করতে পারবে না। কথা ঘোরালো সে, 'শুনুন, আমার বাংলোটা বাসযোগ্য করতে হবে। আজই কিছু ফার্নিচারস চাই। আর বাংলোর বাবুর্চি-চাকরদের ডেকে পাঠান। না হলে আমার খাওয়া হবে না।'

'আপনি চা খেয়েছেন স্যার।'

'হ্যাঁ। যান, আপনি কাজ শুরু করে দিন।'

সামন্ত পিছু ফিরে এগোতে শুরু করলেই শিবাজী জিজ্ঞাসা করল, 'সামন্তবাবু, আগরওয়াল এখনও এই বাগানে আসে?'

শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন সামন্ত। তারপর খুব ধীরে মাথা নাড়লেন. 'হ্যাঁ।'

'লেবার য়ুনিয়নের অফিস কোথায়?'

'তিন নম্বর লাইনে।'

'সীতেশ এখন এখানে আছে?'

এবার অবাক চোখে ফিরে তাকালেন সামন্ত, 'আপনি ওকে চেনেন স্যার?'

'আমার প্রশ্নটার উত্তর পাইনি।'

'দিন তিনেক হল দেখছি না। শুনেছি বাইরে গিয়েছে।'

'ঠিক আছে, যান।'

সামন্ত চলে যাওয়ার পর চারধার আবার নির্জন হয়ে গেল। শিবাজী ঘরে চলে এল। সমস্ত ঘটনাগুলো একটু খতিয়ে দেখা যাক। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে সে ব্যাপারটা চিন্তা করছিল। প্রচুর কাজ সামনে। কোথা থেকে শুরু করবে ভেবে কূল পাওয়া যাচ্ছে না। টি. কে. সেনের সঙ্গে তার কথা হয়েছে চা-বাগানে প্রথমে কাজের আবহাওয়া ফিরিয়ে আনতে হবে। তারপরেই সে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারদের সাহায্য পাবে কাজ শুরু করার। প্রতিদিনের রিপোর্ট তাকে পাঠাতে হবে শিলিগুড়িতে। সেখানে শর্মা রয়েছে, সে যোগাযোগ রাখবে সেনসাহেবের সঙ্গে। অতএব বাবুদের কাল থেকে কাজ শুরু করতে বলা মানে কাজ নয়, কাজের আবহাওয়া ফিরিয়ে আনা। শিবাজী আশা করছিল আজই য়ুনিয়নের লোকেরা তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। সীতেশ কি আসবে! চোয়াল শক্ত হল শিবাজীর। এই সময় দরজায় শব্দ হল।

শিবাজী সতর্ক ছিল। তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে সে দেখল, এক বৃদ্ধ নেপালি দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। সে জিজ্ঞসা করল, 'কী চাই?'

'সেলাম সাহাব। হাম খানসামা।'

'আচ্ছা। কে পাঠাল তোমাকে? সামন্তবাবু?'

'নেহি সাব, আভি শুনা আপ আয়।

'ও ঠিক আছে। তোমার রান্নার জিনিসপত্র সব ঠিক আছে?'

'জী হাঁ।'

শিবাজী মানিব্যাগ বের করে পঞ্চাশটা টাকা এগিয়ে ধরল, 'আজ এই দিয়ে কাজ চালাও। এখানে আর যারা কাজ করত তাদের খবর দাও। তুমি তো বাজারে যাবে?'

'জী সাব।'

'তাহলে গাড়ির টায়ার সারাতে পারবে এমন একটা লোক ধরে আনবে আসার সময়।' শিবাজী বাইরে বেরিয়ে এল। রোগা পাকানো শরীর খানসামার। বয়স আঁচ করা মুশকিল।

'কত বছর আছ এই বাংলোয়?'

'পঞ্চাশ সাল সাব।' লোকটা বিনীত গলায় বলল।

হতভম্ব হয়ে গেল শিবাজী। নাইনটিন থার্টি থ্রি থেকে কাজ করছে এই লোকটা! কথা বলে লোকটা ধীরে ধীরে বাংলো থেকে নেমে গেল। হঠাৎ শিবাজীর মনে হল, এই লোকটা যদি জাল হয়! আদৌ হয়তো খানসামার কাজ করেনি কোনদিন, সেরেফ তাকে ধোঁকা দিয়ে টাকাটা হাতিয়ে নিয়ে গেল! পেছন থেকে লোকটাকে আর একবার দেখে মাথা নাড়ল সে, দেখা যাক।

এখন কী করা যায়। শিবাজী ঠিক করল বাগানটাকে ঘুরে দেখা দরকার। কিন্তু এতটা এলাকা পায়ে হেঁটে ঘুরতে গেলে সারাটা দিন কেটে যাবে। সে ধীরে ধীরে অফিস-অঞ্চলে গেল। সামন্তবাবু এখনও ফিরে আসেননি। শিবাজী সাঁকোর ওপর দাঁড়াল। চমৎকার জায়গা। খানিকটা বাদেই পাহাড় শুরু হয়েছে বলে ভাল বৃষ্টি পায়। একপাশে তরাই-এর বিশাল জঙ্গল। সাহেবরা এই একটি জিনিস ভারতবর্ষকে দিয়ে গেছে। কথাটা ভাবতেই হাসি পেল তার। আমরা বলি স্বাধীনতা দেওয়ার সময় সাহেবরা দেশটাকে ভাগ করে গিয়েছে। কিন্তু কেউ ভাবি না এদেশ কখনই জোড়া ছিল না। সাহেবরা এদেশে এসে টুকরো টুকরো রাজ্যগুলোকে জুড়ে ছিল। যা কিছু কৃতিত্ব ওদেরই। এখন অবশ্য এসব কথা ভাবতে ভাল লাগে না। জনমানবশূন্য এই রকম একটা জঙ্গুলে এলাকায় এতবড় একটা শিল্প স্থাপন করার কথা ওরাই তো ভাবতে পেরেছে। স্বাধীন হয়ে আমরা সেগুলোকে আবার জঙ্গলের পথে ঠেলে দিচ্ছি।

সামন্তবাবু ফিরে না আসা অবধি আপাতত কিছু করার নেই। আর তখুনি শিবাজীর মনে পড়ল মিসেস সোমের কথা। ভদ্রমহিলা প্রতিদিন স্বামীকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। যা শুনেছে সে তাতে স্পষ্ট, সোম বেঁচে নেই। উনি কি এই খবরটা জানেন না? তাছাড়া একটা জিনিস তার বোধগম্য হচ্ছে না, ওদের তো খুব অল্পদিন বিয়ে হয়েছিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করে এমন টান জন্মাল যাতে মিসেস সোম নিজের জীবন বিপন্ন করে এখানে থেকে গেছেন স্বামীর জন্যে? সেন সাহেব চান শিবাজী সোমের ব্যাপারটা তদন্ত করুক। সামন্তর সঙ্গে কথা বলে তার মনে হয়েছে এর ভেতরে বেশ রহস্য আছে। ম্যানেজার হিসাবে লাভবার্ডে এসে তার কর্তব্য মিসেস সোমের সঙ্গে দেখা করা। তাছাড়া ভদ্রমহিলা ইতিমধ্যে তাকে যথেষ্ট ঋণী করেছেন পরিচারিকাকে পাঠিয়ে। শিবাজী ঠিক করল চাবি চাইবার অজুহাতে সে ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করবে। শোকাতুরা মহিলার সঙ্গে কথা বলতে তার অস্বস্তি হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তো অন্য কোনো উপায় নেই।

ধীরে ধীরে ফিরে এল শিবাজী বাংলোর কাছে। বন্ধ গেট খুলে সে এগিয়ে গেল ভেতরে। লনটা পরিষ্কার, এবং ফুলের গাছগুলোও বেশ তাজা। সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে সে কাউকে দেখতে পেল না। এতবড় বাংলোয় যে মানুষ আছে তা বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। শব্দ করে সে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠল। লম্বা বারান্দার একপাশের প্রতিটি দরজা বন্ধ। অর্থাৎ কেউ নেই বাংলোতে। সামন্তবাবুর কথা খেয়াল হল ওর, ভদ্রমহিলা রোজ লাইনে লাইনে ঘুরে বেড়ান। দরজাগুলোয় বাইরে থেকে তালা দেওয়া নেই, তাহলে পেছনের দরজা দিয়ে নেমে গেছেন মহিলা।

বারান্দার ওপর পেতে রাখা বেতের চেয়ারে আরাম করে বসল শিবাজী। সকাল থেকে এই আরামটুকু চাইছিল শরীর, বসে বুঝতে পারল। ঘড়িতে এখন সময় বেড়েছে। রোদের রঙ ধারালো হয়েছে। খিদে পাচ্ছিল শিবাজীর। আর তারপরই শরীরটা আইঢাই করতে লাগল। একফোঁটা মদ নেই সঙ্গে। খানসামাটাকে বলে দিলে হতো তখন। এ অঞ্চলে ভুটানি মদ পাওয়া যায়। এত টেনসনের মধ্যে শরীর মদ ছাড়া স্থির থাকতে পারে না। অস্থির লাগছিল শিবাজীর। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দ্রুত নিচে নেমে এল। খানসামাটার ফিরে আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন? লন পেরিয়ে

গেটের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে সে যেন আচমকা বরফ হয়ে গেল।

কালকের সেই মেয়েটি গেট খুলছে, তার কনুইতে একটা বেতের বাস্কেট ঝোলানো। মেয়েটির পেছনে যিনি দাঁড়িয়ে তাঁর বয়স আন্দাজ করার মত মানসিক অবস্থা শিবাজীর ছিল না। এত অপরূপা কখনও সে দেখেনি। বাঙালি মেয়েদের তুলনায় যথেষ্ট লম্বা মহিলা, ছাড়া ফিনফিনে চুল পিঠে উড়ছে সামান্য বাতাসে, বিশাল চোখে পৃথিবীর সব সমুদ্র জমে গাঢ় হয়ে রয়েছে। ওঁর নাক আর ঠোঁটের গড়নে চট করে ভেনাস ছাড়া আর কারো মুখ মনে পড়ে না। সরু ভুরু একবার গুটিয়ে পাখির মত ডানা মেলে দিল। মেয়েটি তাকে দেখছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে সে ভদ্রমহিলাকে কিছু বলে মাথা নিচু করে শিবাজীর পাশ দিয়ে বাংলোর ভেতরে চলে গেল। ভদ্রমহিলা তখনও গেটে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিলেন। শিবাজী সচেতন হয়ে হাতজোড় করল, 'নমস্কার! আমি অনধিকার প্রবেশ করেছি বলে মার্জনা চাইছি। ভেবেছিলাম আপনারা বাংলোয় আছেন। আমার নাম শিবাজী চ্যাটার্জি, কোম্পানি আমাকে পাঠিয়েছে।'

ভদ্রমহিলার ঠোঁট দুটো সামান্য নড়ল। আলতো করে 'নমস্কার' শব্দটা বেরিয়ে এল। তারপর পিঠ থেকে আঁচলটা কাঁধের ওপর দিয়ে টেনে সামনে নিয়ে এলেন। শিবাজীর মনে হল এতে যেন রূপ আরো খুলে গেল।

ভদ্রমহিলা অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে হেঁটে এলেন, 'আসুন।'

শিবাজী এক মুহূর্ত চিন্তা করল। চাবিটা দরকার।

বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে সে সামনের দিকে তাকাল। বেশ কড়া রোদ বাইরের মাঠে, জঙ্গলের ওপরে। শুধু পাখির চিৎকার ছাড়া কোনো যান্ত্রিক শব্দ বা মানুষের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে না। দোতলায় উঠেই দেখেছিল ঘরের দরজা খোলা। পরিচারিকাটিই খুলেছে। মহিলা নিঃশব্দে ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। শিবাজী বুঝতে পারছিল শুধু রূপ নয় মহিলা অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

মিনিট পাঁচেক বাদে মহিলা এলেন। এর মধ্যে শাড়ি পাল্টেছেন তিনি, সামান্য ঘরোয়া হয়েছেন। মহিলার পেছনে সেই মেয়েটি এল। হাতে কফির কাপ আর বিস্কিট। নিঃশব্দে বেতের টেবিলে নামিয়ে রেখে চলে গেল সে।

শিবাজীর বিপরীত দিকে বসলেন মহিলা। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই আমার পরিচয় জানেন।'

'অবশ্যই। মিস্টার সোমের ব্যাপারটার জন্যে আমি দুঃখিত।'

ভদ্রমহিলা মুখ ফিরিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। তারপর যেন নিজেকে শক্ত করেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি লাভবার্ডে কি ডেজিগনেশনে এসেছেন?'

শিবাজীর ভুরু কুঁচকে উঠল। খুব চটপট আন্দাজ করে নিল সে ব্যাপারটা। তারপর হেসে বলল, 'সেটা এখনও ঠিক হয়নি। কোম্পানি আমাকে এখানে পাঠিয়েছে কাজের আবহাওয়া ফিরিয়ে আনবার জন্যে।'

'আর কিছু নয়?'

'হ্যাঁ, মিস্টার সোমের ব্যাপারটা দেখবার জন্যে।'

'শুনলাম আপনি ম্যানেজার হিসেবে এসেছেন?' প্রশ্ন করে সরাসরি তাকালেন মহিলা।

শিবাজী প্রায়-মিথ্যে কথাটা বলল, 'মিস্টার সোমের ব্যাপারটা ডিসাইডেড না হওয়া পর্যন্ত ওটা আইনসম্মত নয়, তাই না?'

এবার ভদ্রমহিলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শিবাজীর মনে হল উনি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস

ফেললেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এর আগে কোন বাগানে ছিলেন?'

'মুরগিদের বাগানে। পোলট্রি করতাম। অবশ্য চা-বাগানের কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। আপনি মিস্টার সোমের কোনো খোঁজ পেলেন?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন ভদ্রমহিলা 'না। আর পাব বলে মনেও হয় না। একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে এখানে।'

'তাহলে—'।

'কি তাহলে? আমি এখানে একা রয়েছি কেন? আপনার কোম্পানিও চায়নি যে আমি এই বাগানে থাকি। কিন্তু মনীশ ফিরে না আসা অবধি ওরা আমাকে এখানে থাকতে দিতে বাধ্য, তাই না? আর যতক্ষণ না মনীশ মৃত বলে প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ আমার অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না।' ভদ্রমহিলা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলো বললেন, 'নিন, কফি খান।'

শিবাজী কফির কাপ তুলে নিল। এই কথাগুলো ঠিক স্বচ্ছন্দ নয়। অন্য কিছুর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে যেন! ভদ্রমহিলা কি জেনেশুনেই এখানে রয়ে গেছেন? কেন? সে জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু এইভাবে একা একা—।'

'আমি তো একাই ভীষণ একা—।'

কথাগুলো এমন স্বরে বলা যে শিবাজীর মনে হল সে যেন গভীর কুয়োর তলায় ডুবে যাচ্ছে। প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্যে সে বলল, 'মিস্টার সোমের কাছে একটা চাবির তোড়া ছিল সেটা আমার দরকার।'

'চাবি? ও হ্যাঁ। সেটা ছিল কিন্তু এখন নেই।'

'নেই মানে?'

'ও যেদিন নিরুদ্দিষ্ট হল সেদিন ওরা এসেছিল বাংলোয়। সমস্ত তছনছ করে শুধু ওই চাবির তোড়াটা নিয়ে চলে গেল।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল শিবাজী। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি একা আছেন, ওরা আর হামলা করেনি?'

'না। শুধু—।'

'বলুন!'

'থাক সে কথা। আপনি এই বাগানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন বলে মনে করেন?'

'নিশ্চয়ই।'

দেখুন চেষ্টা করে।' কথাটা বলে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন মহিলা। শিবাজী উঠে দাঁড়াল, 'আমি চলি। যদি কোনো প্রয়োজন বোধ করেন তাহলে খবর দেবেন।' শিবাজী আর দাঁড়াল না। খুব দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল সে। বুঝতে পারছিল এই মহিলার অসম্ভব আকর্ষণীশক্তি আছে যা এড়িয়ে চলে যাওয়া কষ্টকর। কিন্তু এটাও ঠিক, ভদ্রমহিলা স্বাভাবিক নন। মেয়েদের ব্যাপারে তাব কোনো বিশেষ মোহ কখনও ছিল না। এই ব্যাপারটার কোনো গুরুত্ব সে কখনও দেয়নি। সত্যিকথা বলতে কি তার জীবনের এতগুলো বছরে কোনো মেয়ে আঁচড় কাটতে পারেনি! কিন্তু এই মহিলাকে প্রথমবার দেখার পরই—। শিবাজী লন পার হতে হতে মাথা নাড়ল, কিন্তু কিছুতেই পেছন ফিরে তাকানোর টানটা অস্বীকার করতে পারল না। গেট বন্ধ করতে করতে সে এক পলক তাকিয়ে নিল। বারান্দাটা খাঁ খাঁ করছে। মিসেস সোমের কোনো অস্তিত্ব নেই সেখানে।

বাংলোর সামনে ওরা দাঁড়িয়েছিল। ওকে দেখে সামন্তবাবু এগিয়ে এলেন, 'এদের নিয়ে এসেছি স্যার। এরা আগে আমাদের ফ্যাক্টরির গার্ড ছিল। আপনার খানসামার সঙ্গে শুনলাম আগেই পরিচয় হয়েছে। আর এ হল মোটর মেকানিকস।'

শিবাজী লোকটিকে বলল, 'পেছনে দুটো চাকা আছে। স্টেপনি নিয়ে এসেছেন সঙ্গে? গুড। চাকা দুটো পাল্টে দিন। আর ওতে হাওয়া ভরতে হবে।'

লোকটি ঘাড় নেড়ে চলে যেতে শিবাজী বলল, 'সামন্তবাবু, সবকটা তালা ভাঙতে হবে। তবে তার আগে নতুন তালা কিনতে হবে।'

'কেন চাবি নেই?'

'না। মিসেস সোম বললেন ওটা ওঁর কাছে নেই।'

সামন্তবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, 'বেশ।'

শিবাজী বলল, 'এক কাজ করুন। এই চারজন গার্ডের ডিউটি ভাগ করে দিন। যতক্ষণ না ফ্যাক্টরির কাজ শুরু হচ্ছে ততক্ষণ এরা আমাদের বাংলো দুটোকে গার্ড করবে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি আসছি।

শিবাজী দোতলায় উঠে আসতেই খেয়াল হল কুকুরটার কথা। ওই ঘরের দরজাটা এখনও বন্ধ। সে বারান্দা থেকে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'সামন্তবাবু এখানে কার কাছে বেশ লোমওয়ালা ভালো জাতের কুকুর ছিল?'

'লোমওয়ালা কুকুর?' সামন্তবাবু মুখ উঁচু করে বললেন, 'মনে পড়ছে না তো, ও ও হ্যাঁ, সোমসাহেব নিয়ে এসেছিলেন।'

'সেটা এখনও আছে?'

'আমি জানি না স্যার। ওদের বাংলোয় আমি যাইনি।'

শিবাজী মাথা নাড়ল। ওই ঘরে সোমসাহেবের কুকুরটাকে কে মেরে রেখে গেল? সে বলল, কাউকে দিয়ে ধুয়ে দিতে বলবেন ঘরটা। কুকুর পচে রয়েছে।'

ঘরে ঢুকে শিবাজী ঠিক করল চটপট স্নান করে নেবে। বাথরুমে উঁকি মারতে গিয়ে শুনল নিচের উঠোনে কথা হচ্ছে। সে পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল খানসামাটাকে হাত নেড়ে সেই মেয়েটি কিছু বোঝাচ্ছে কিন্তু খানসামা তাতে রাজি হচ্ছে না। সে জিজ্ঞসা কবল, 'কী ব্যাপার?'

খানসামা এবং মেয়েটি একসঙ্গে চমকে উঠল। খানসামা কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করল, 'সাব, ইয়ে লেড়কি আপকো খানা লেআনে মাঙ্গতা।'

'কেন?'

মেয়েটি উত্তর দিল না। খানসাম ওর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। তারপর বলল, 'এক ঘণ্টামে হাম খানা পাকায়ে লেগা বেটি!'

শিবাজী জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাকে কি মিসেস সোম পাঠিয়েছে?'

খুব ধীরে একবার মাথা নেড়েই মেয়েটি দৌড়ে ওদিকের বাংলোয় চলে গেল। দুটো বাংলোর পেছনের দিকে নিশ্চয়ই যাতায়াতের পথ আছে। শিবাজী বুঝতে পারছিল না মেয়েটির উদ্দেশ্য কী! গত রাত্রেও কি ওর মনিবকে না জানিয়ে উপকার করে গেছে!

স্নান শেষ করে পোশাক পাল্টে শিবাজী বেরিয়ে এল। সামন্তবাবু দুটো লোককে লাগিয়ে দিয়েছেন বাংলো পরিষ্কাব করার কাজে। দরজায় তালা দিয়ে সে নিচে নেমে বলল, 'আপনি আসুন, আমার সঙ্গে।'

গাড়ির চাকা বদল হয়ে গিয়েছিল। সামন্তবাবু আর মেকানিককে পেছনে বসিয়ে শিবাজী চা-

বাগানের পথে নামল। গাছগুলো দেখতে দেখতে সে জিজ্ঞাসা করল, 'লাস্ট প্লাকিং কবে হয়েছে?'

'প্রায় দু-বছর স্যার।'

'তাহলে বাগানের এই অবস্থা কেন?'

কুলিরা নিজেরাই পাতি তুলে অন্য বাগানে বিক্রি করার চেষ্টা করেছিল প্রথমে। সেটা বন্ধ হয়ে গেলে বাড়িতে বাড়িতে পাতা শুকাতো। কিছু খুচরো ব্যবসাদার তাই সামান্য দামে কিনে নিয়ে ভাল চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রি করে। ফলে ডালপালা ভেঙে একাকার কাণ্ড করেছে ওরা।' সামন্তবাবু জবাব দিলেন।

হঠাৎ বাগানের পথ শেষ হয়ে গেল। এই পথ দিয়ে গতকাল ঢুকেছিল শিবাজী এবার আন্দাজেই বাঁ দিকে ঘুরল সে। এক পাশে চা বাগান অন্য পাশে কুলিলাইন। তারপরেই পর পর কোয়ার্টার্সগুলো শুরু হল। শিবাজী জিজ্ঞাসা করল, 'বাবুদের?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'আপনার কোন্‌টা?'

'ওই যে মাঝখানেরটা।'

শিবাজী দেখল সামন্তবাবুর কোয়ার্টার্স অন্যগুলোর চেয়ে বেশ বড়। সে আচমকা জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা সামন্তবাবু, অ্যাদ্দিন মাইনে পাননি, আপনার চলছে কী করে?' প্রশ্নটা করেই সে সামনের আয়নায় চোখ রাখল। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মুখ যেন দুমড়ে উঠল একটু। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'চলছে কি আর! আমার এক ছেলে কুচবিহারে কেরানির কাজ করে। সে টাকা পাঠায় একশো করে। আর বউ-এর গয়না বিক্রি করে কোনোরকমে টিকে আছি। মেয়েটার বিয়ে দেব কি করে জানি না।'

'কয় ছেলেমেয়ে আপনার?'

'চারটে। দুই মেয়ে দুই ছেলে। বড় মেয়েটির বিয়ে দিয়েছি ফালাকাটায়।' শিবাজীর মনে হল প্রৌঢ় এই মুহূর্তে সত্যি কথা বলছেন! মিথ্যে কথা এত আন্তরিকতায় বলা সম্ভব নয়। অন্য কোনো সূত্রে টাকা পাচ্ছেন না এই লোকটি। একটু বাদেই সাঁকো ছাড়াতেই ওরা বাজার এলাকায় এসে পড়ল। খুব বড়সড় না হলেও লাভবার্ডের এই গঞ্জটি নেহাৎ ছোট নয়। সব রকম দোকানই আছে এখানে। একটা গ্যারেজের সামনে গাড়িটাকে দাঁড় করাতে বললেন সামন্তবাবু। শিবাজী থামতেই মেকানিক নেমে পেছন থেকে চাকা দুটো বার করে বলল, 'আমি এগুলোকে ঠিক করে রাখছি, যাওয়ার সময় নিয়ে যাবেন।'

'কত দিতে হবে?'

'না না কিছু দিতে হবে না স্যার। আপনি নতুন ম্যানেজার হয়ে এসেছেন এ তো আমাদের সৌভাগ্য। এককালে আমি বাগানের কাজ কত করেছি। শুধু অধমকে মনে রাখবেন স্যার।'

শিবাজী দেখল একটি রোগা মতন মানুষ হাত জোড় করে নমস্কার করছে গাড়ির জানালায় ঝুঁকে। সামন্তবাবু বললেন, 'ইনি হচ্ছেন বটুবাবু। ওই গ্যারেজের মালিক।'

শিবাজী মাথা নাড়ল কিন্তু কোনো কথা বলল না। সে ঠিক করল চাকা দুটো ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় পয়সা দিয়ে যাবে। খামোকা কারও দয়া নিতে যাবে কেন?

দুপাশে চায়ের বাগান, মাঝখানে এই গঞ্জটা চা-বাগানের এক্তিয়ারে নয়। লাভবার্ডের পাশেই আর একটি শিল্প গড়ে উঠেছে, সেটি হল কাঠের ব্যবসা। টিম্বার মার্চেন্টস্‌দের বড় বড় স-মিল ছড়িয়ে আছে দুধারে। ঘণ্টাখানেক ধরে ঘুরে ঘুরে দেখল শিবাজী। কিছু সরকারি অফিস রয়েছে লাভবার্ডে। সামন্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করে সে স্টেট ব্যাঙ্কের অফিসে গিয়ে সেনসাহেবের দেওয়া

একটা বেয়ারার চেক ভাঙিয়ে নিল। তারপরে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে ফার্নিচারের দোকান আছে?'

'না স্যার। কুচবিহারে আছে। তবে কিছু সাধারণ বেতের চেয়ার, চা গাছের টেবিল লোকাল লোক বানায়। আমি তাদের খবর দিয়েছি, বিকেলের মধ্যে বাংলোয় পৌঁছে যাবে। ওসব দেখার পর আর কি চাই বলে দিলে আমি কুচবিহারে অর্ডার পাঠিয়ে দেব।' সামন্তবাবু বললেন।

একটা চৌমাথায় এসে গাড়ি থামাল শিবাজী। তারপর সটান দরজা খুলে রাস্তা পেরিয়ে দোকানটায় চলে এল। একটা প্রায় বাচ্চা ছেলে কাউন্টারে ঝুঁকে পড়ে পুরনো কাগজ পড়ছিল, ওকে দেখে সোজা হয়ে বলল, 'কী দেব?'

শিবাজীর শরীরের রক্ত চনমনে হয়ে উঠল। আলমারিতে থরে থরে সাজানো আছে বিভিন্ন রঙের বোতলগুলো। সে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'ভুটানের জিনিস নেই?'

ঘাড় নাড়ল ছেলেটি, 'না। ওসব আমরা বিক্রি করি না। ওই ওপাশের রেস্টুরেন্টে পাবেন। ওগুলো বিক্রি করা বে-আইনি।'

শিবাজী ছেলেটিকে দেখল। তারপর দুটো বড় হুইস্কির বোতল কিনে হাতে ঝুলিয়ে গাড়িতে চলে এল। চৌমাথায় দাঁড়ানো মানুষেরা এই দৃশ্য অবাক হয়ে দেখল। ওই দোকান থেকে যারা মদ কেনে তারা এইভাবে দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যায় না। সামন্তবাবু আঁতকে উঠেছিলেন। শিবাজী বোতল দুটো পেছনের সিটে ফেলে দিতে তিনি সসঙ্কোচে বললেন,'এ আপনি আনতে গেলেন কেন? ওদের বললে বাংলোয় পৌঁছে দিত।' শিবাজী স্টিয়ারিং-এ বসে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন কী হয়েছে?'

'না, মানে, আপনাকে মানায় না।'

হঠাৎ মাথার ভেতরে আগুন জ্বলে উঠল শিবাজীর। ইঞ্জিন বন্ধ করে সে ঘুরে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে কী মানায় সামন্তবাবু? বাংলোয় বসে পা নাচাব আর আপনারা চাকরের মত সব সময় হাতজোড় করে থাকবেন, আর ম্যানেজার ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে আড্ডা মারতে পারব না, শনিবার ক্লাবে গিয়ে হুল্লোড় করব আর আপনারা যখন সেলাম করবেন তখন অবহেলায় অন্যদিকে তাকিয়ে থাকব---এই তো? আমাকে কি মানায় না মানায় সেটা আমি জানি। দয়া করে এ ব্যাপারে আমাকে কোনো কথা বলবেন না।'

ওর কথার উত্তাপে কুঁকড়ে গিয়েছিলেন সামন্তবাবু। কোনোরকমে বলতে পারলেন 'আমি স্যার ঠিক ওকথা—মানে—!'

'চুপ করুন।' শিবাজী গাড়ি চালু করল। ওর ইচ্ছে করছিল এখনই বোতলটা খুলে প্রকাশ্যে খায়। নিজের গাড়িব মধ্যে খাওয়াটা নিশ্চয়ই বে-আইনি নয়।

সামনের আয়নায় চোখ রেখে সে দেখল সামন্তবাবু মুখ নিচু করে বসে আছেন। বৃদ্ধের মুখ খুব করুণ হয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ ইচ্ছেটাকে বাতিল করল শিবাজী।

গ্যারেজের সামনে এসে প্রথমে লক্ষ্য করেনি। তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। সামন্তবাবু দরজা খুলে নেমে গেলেন খবর নিতে। ঠিক সেই সময় বাবুরাম আগরওয়াল নেমে এলেন একটা গাড়ি থেকে। দু হাত জোড়া করে বললেন, 'নমস্তে বাবুজি, আবার আপনার সঙ্গে দেখা হল।'

শিবাজী একটু চমকে গিয়েছিল। সেটা সামলে হেসে বলল, 'মনে হচ্ছে এখন আমাদের ঘন ঘন দেখা হবে।'

বাবুরাম বলল, 'সে তো ভাল কথা। এইমাত্র খবর পেলাম আপনিই ওই হতচ্ছাড়া চা-বাগানটার ম্যানেজার হয়ে এসেছেন। তা কি মনে হয়, ওটাকে মানুষ করতে পারবেন?'

'দেখি।'

'গোল্ডেন টি এস্টেট থেকে তো সরে পড়তে হয়েছিল, তা এরা আপনাকে খুঁজে বের করল কী করে?' মিটিমিটি হাসছিল বাবুরাম।

'যাদের গরজ থাকে তারা খুঁজে নেয়। এই যেমন আপনি আমার সম্পর্কে এত খোঁজখবর নিয়েছেন।' শিবাজী তাকিয়ে দেখল সামন্তবাবু এগিয়ে আসছেন ; পেছনে চাকা দুটো নিয়ে মেকানিকস আর বটুবাবু। সে ব্যাগ খুলে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে বলল, 'সামন্তবাবু ওকে দিয়ে দিন, অনেক সময় নষ্ট করেছে আমার জন্য।'

চাকা দুটো তুলে দিয়ে সামন্তবাবু নোটটা মেকানিকসের হাতে দিতেই বটুবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ছি ছি ছি, একি করছেন স্যার! না না দিতে হবে না।'

শিবাজী লক্ষ্য করেছিল বাবুরামকে দেখামাত্রই সামন্তবাবু কেমন মিইয়ে গিয়েছেন। জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একপাশে। সে ওঁকে ডাকল, 'কী হল, উঠে পড়ুন। নাকি পুরনো মালিককে দেখে ভক্তি জানাবেন!'

সামন্তবাবু উঠতেই বাবুরাম বলল, 'বাবুজি, আপনি কাল গাড়ি বিক্রি করার কথা বলছিলেন না? তা ভাড়া গাড়িতে না চড়ে আমার একটা কিনেই নিন, সস্তায় পড়বে। চাকরদের কেউ ভক্তি করে না, যদি করে তো মালিককেই করে।' বলে সোজা চলে গেলেন নিজের গাড়ির দিকে।

শিবাজী এক পলক তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়ল। না না, এখনই ঝগড়াঝাঁটি করাটা ঠিক হবে না। পায়ের তলায় মাটি না থাকলে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করা উচিত নয়। সে গাড়ি ছাড়তেই পেছন থেকে সামন্তবাবু বলে উঠলেন, 'উঃ, কি ডেঞ্জারাস লোক!'

'কার কথা বলছেন? আপনার প্রাক্তন মালিক তো বেশ কথা বলেন!' গাড়ি চালাতে চালাতে বলল শিবাজী।

'ওই মুখ মিষ্টিটাই ছিল। কুরে কুরে বাগানটার সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে।'

'কিন্তু আপনি ওকে দেখে এত ভয় পাচ্ছিলেন কেন? এখন তো বাবুরাম আপনার মালিক নয়।' শিবাজী হেসে আয়নায় চোখ রাখল।

সামন্তবাবু সজোরে মাথা নাড়লেন, 'না স্যার, আপনি ওকে এত লাইটলি নেবেন না। ও যা ইচ্ছে করতে পারে।'

বাবুদের কোয়াটার্সের সামনে এসে শিবাজী চট করে রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামল। সামন্তবাবুর কোয়ার্টাসের সামনে দাঁড়িয়ে গাড়ি থামিয়ে সে বলল, 'বেলা হয়েছে সামন্তবাবু, যান নাওয়া খাওয়া শেষ করে আসুন।'

সামন্তবাবু খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, 'আপনি আমাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিলেন স্যার! ছি ছি ছি!'

'ছি ছি কেন?'

'আপনি হলেন ম্যানেজার আর আমি—!' সামন্তবাবুর কথা থেমে গেল। দুটি ছেলে মেয়ে এবং একজন বয়স্কা দরজা খুলে বিস্ফারিত চোখে এদিকে তাকিয়ে আছে। সামন্তবাবু দরজা খুলে নেমে নমস্কার করতেই শিবাজী মত পাল্টাল। গাড়ি থেকে সটান নেমে এসে বলল, 'সামন্তবাবু, আপনার কোয়ার্টাসটা আমি দেখব।'

'আমার কোয়াটার্স কেন স্যার?' খুব ঘাবড়ে গেলেন ভদ্রলোক।

'ম্যানেজার হিসেবে আপনারা কেমন আছেন সেটা দেখা আমার কর্তব্য। উনি কি আপনার স্ত্রী?' মহিলাকে ইঙ্গিত করল শিবাজী।

'হ্যাঁ স্যার। আমার ওয়াইফ।'

শিবাজী সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করল, 'আমি এখানে এসেছি ম্যানেজার হিসেবে।'

ভদ্রমহিলা বোধহয় বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে অভ্যস্ত নন। সসঙ্কোচে ঘোমটা আর একটু টেনে দিলেন।

শিবাজী বলল, আপনার ওপর একটা দায়িত্ব দেব। অন্যান্য বাবুদের স্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ করে আপনারা এখানে কী কী জিনিসের অভাব বোধ করছেন তার একটা লিস্ট করুন। সেইটেই আমি পেতে চাই। আমার কথা আপনি বুঝতে পারছেন?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন মহিলা। বোঝা যাচ্ছে খুব অবাক হয়েছেন ভদ্রমহিলা। এক দৃষ্টিতে তিনি এখন শিবাজীকে দেখছেন। সামন্তবাবুকে বাকি কাজগুলোর কথা মনে করিয়ে দিয়ে শিবাজী গাড়ি নিয়ে আবার রাস্তায় উঠে এল। চা-বাগানের ভেতরে ঢুকে ওর সমস্ত শরীরে অস্বস্তি শুরু হল। হাত বাড়িয়ে একটা বোতল তুলে নিয়ে গাড়ি থামাল তারপর ঢাকনা খুলে খানিকটা গলায় ঢেলে দিল! জ্বলতে জ্বলতে মদ পেটে নামছে। প্রথমে শরীরটা গুলিয়ে উঠল। শিবাজী ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সেটাকে সামলাল। তারপরেই চমৎকার হালকা হয়ে গেল শরীরটা। এখন একটু জল পেলে হতো। আরও কিছুটা কাঁচা মদ খেয়ে নিয়ে শিবাজী গাড়ির স্টিয়ারিং ধরল। খুব ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে সে গাড়ি চালাচ্ছিল। বাবুরাম আগরওয়াল তাহলে লাভবার্ডে এসে গেছে। কিন্তু ওরা আসছে না কেন? য়ুনিয়নের লোকজন তার সঙ্গে নিজে থেকে আলাপ করতে না এলে সে যোগাযোগ করবে না। দাঁতে দাঁত চেপে শিবাজী বলল, 'কাওয়ার্ড।'

সাঁকোর কাছে পৌঁছবার আগে বোতলের এক-চতুর্থাংশ খালি হয়ে এসেছিল। শিবাজীর মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করছিল। চোখের সামনে অফিসবাড়িটা দেওয়ালে টাঙানো হাওয়ায় দোলা ক্যালেন্ডার হয়ে যাচ্ছে। সে গাড়ি থামাল আর সঙ্গে সঙ্গে ঝনঝন শব্দ হল। অস্পষ্ট চোখে সে দেখল গাড়ির বনেটে আস্ত থান ইট এসে পড়ল। তৎক্ষণাৎ গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল শিবাজী। মাটিতে পা রাখতেই শক্ত হল শরীর। না চোখের সামনে কেউ নেই। ইটটা তুলে নিলে সে বনেট থেকে। এটা আর একটু ওপর দিয়ে এলে সামনের কাচ চুরমার হতো।

শিবাজী একটু এগিয়ে চিৎকার করল, 'যে ইঁট ছুঁড়েছে সে সামনে এসে বলো কি চাই। আমাকে মেরে কী লাভ হবে?'

কেউ সাড়া দিল না। দু পাশের অনেক গাছপালা এবং ছোট্ট নদী প্রায় স্থির। শিবাজী বাংলোর সামনে গাড়ি দাঁড় করাতেই দেখল কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখেই তারা সেলাম করল।

গাড়ি থেকে নেমে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই?'

একটি লোক বলল, 'হামলোক ভুখা হ্যায় সাব।'

অবহেলায় পকেট থেকে ব্যাগ বার করে সে একটা নোট ছুঁড়ে দিয়ে টলতে টলতে বাংলোর ভেতরে ঢুকতেই থমকে দাঁড়াল। বাংলোর সিঁড়ির নিচের ধাপে মিসেস সোম দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর দৃষ্টি শিবাজীর মুখের ওপর স্থির। মাথাটা কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না। শিবাজী বুঝতে পারল তাতে ঘৃণা এবং অবহেলা ঠিকরে উঠেছে। তারপর নিঃশব্দে ওর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

শিবাজী শূন্যে হাত নাড়ল। তারপর টলতে টলতে ওপরে উঠে নিজের বিছানায় আছড়ে পড়ল। স্প্রিং-এর খাটটা প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে চুপ করে গেল। শিবাজীর খুব ঘুম পাচ্ছিল।

চোখ খুলে মনে হল সবে সকাল হয়েছে। তারপরই মাথাটা ভার ভার লাগল। শিবাজী দেখল সে বিছানায় শুয়ে রয়েছে, জুতো খোলা মাথা বালিশে। কেউ তাকে সযত্নে শুইয়ে দিয়ে গিয়েছে। সে বিছানা ছেড়ে দেখল এখন ভর-বিকেল। চারধারে ঝির-ঝির শব্দ ছড়িয়ে পড়েছে। চোখেমুখে

জল দিয়ে বাইরে আসতেই খানসামা সেলাম করে সামনে এসে দাঁড়াল, 'সাব, খানা—!'

শব্দটা শুনেই মনে পড়ল আজ সারাদিন সে প্রায় অভুক্ত রয়েছে। অথচ তেমন খিদেও পাচ্ছে না। ঘাড় নেড়ে শিবাজী বলল, 'এক কাপ চা করে দাও। ওটা রাত্রে খাব।'

খানসামা যেন বিষণ্ণ হল। 'বড়া বাবু আয়া হ্যায় সাব।'

শিবাজী বারান্দায় এসে দেখল সামন্তবাবু বসে আছেন। এর মধ্যে তার বাংলোয় বেতের চেয়ার এবং চা-গাছের টেবিলে এসে গিয়েছে। যাক, ভদ্রলোক করিৎকর্মা আছেন। ওকে দেখেই সামন্তবাবু উঠে নমস্কার করে একটা খাম এগিয়ে ধরল।

শিবাজী খামটা নিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, 'যতবার দেখা হবে ততবার নমস্কার করবেন না তো। বিরক্তিকর। কার চিঠি?'

সামন্তবাবু বললেন, 'য়ুনিয়নের। আমার বাড়িতে দিয়ে গেছে আপনাকে দেবার জন্য। আজকেই উত্তর চায়।'

শিবাজী চিঠিটা পড়ল। লাভবার্ড চা-বাগানে কাজ শুরু করার আগে কোম্পানির উচিত শ্রমিক-য়ুনিয়নের সঙ্গে কথা বলা। যে অবিচার এবং অন্যায় এত দিন ধরে শ্রমিকদের ওপর করা হয়েছে যার জন্যে তারা আজ বিধ্বস্ত তার সুরাহা না করে কোন কাজ এই চা-বাগানে করা যাবে না। ম্যানেজারকে এই সঙ্গে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যে তিনি যেন সাধারণ শ্রমিকদের ক্ষুধার সুযোগ নিয়ে তাদের বিপথগামী না করেন। কোনরকম প্রতারণা এই বাগানে বরদাস্ত করা হবে না। ম্যানেজার অবিলম্বে এই বাগান ছেড়ে চলে যান এবং অন্য কোথাও য়ুনিয়নের সঙ্গে আলোচনায় বসুন। সেই সময় কোম্পানির হয়ে যে-কোনো সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা তার যেন থাকে। একথা মনে করা হচ্ছে যে ম্যানেজারের উপস্থিতি লাভবার্ড চা-বাগানের শ্রমিক সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে।

চিঠিটা পড়ে শিবাজী জিজ্ঞাসা করল, 'উত্তর কে নিয়ে যাবে?'

'রাত্রে আমার বাড়িতে আসবে।'

শিবাজী একমুহূর্ত চিন্তা করল। এ চিঠির উত্তর দেওয়া উচিত হবে কি না। প্রথমে ঠিক করেছিল দেবে না। এইরকম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ভদ্রতা করা ঠিক নয়। কিন্তু তারপরেই মনে হল তাতে দূরত্ব বেড়ে যাবে। লাভবার্ডকে চালু করতে হলে ওদের সঙ্গে একটা সমঝোতা প্রয়োজন। কাছাকাছি হলে তার পক্ষে লড়াই করা সহজ হবে। সে ভেতরে এসে লক্ষ্য করল এখানেও চেয়ার আর চা-গাছের টেবিল সাজানো হয়েছে। গাড়ি থেকে তার মদের বোতল তুলে এনেছে কেউ। সেনসাহেবের দেওয়া টমসন অ্যান্ড হিউসের প্যাড খুলে সে লিখল ; যেহেতু লাভবার্ড কোম্পানির অধিকারে তাই কোনো অবস্থাতেই তার পক্ষে চা-বাগান ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। শ্রমিকদের কল্যাণ যদি কাম্য হয় তাহলে যে কোনো দিন তার সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে। এ ব্যাপারে সে তাঁদের সঙ্গে কথা বলবে যাঁরা শ্রমিকদের যথার্থ প্রতিনিধি।

চিঠিটা সামন্তবাবুর হাতে দিয়ে শিবাজী জিজ্ঞাসা করল, 'তালা ভেঙেছেন?' সামন্তবাবু মাথা নাড়লেন, 'না স্যার। আপনি সামনে না থাকলে—।'

'বেশ। কাল সকালে লোকজন নিয়ে চলে আসবেন। আর এখানে যতগুলো কুলি-লাইন আছে তাদের সর্দারদের খবর পাঠান। যতদিন কাজ না হচ্ছে ততদিন তাদের একটা আর্থিক সাহায্য কোম্পানি দেবে যাতে প্রত্যেকের পেটে কিছু খাবার যায়। আপনার টাকার দরকার আছে নিশ্চয়ই।'

মাথা চুলকালেন সামন্তবাবু, হ্যাঁ—মানে—!'

সামন্তবাবুকে বিদায় করে এক কাপ চা খেল শিবাজী। খুব দ্রুত সন্ধে হয়ে আসছে। কিন্তু

আজ দিনের আলো মিলিয়ে যাওয়ার আগেই আকাশে প্রকাণ্ড চাঁদ লাফ দিয়ে উঠে বসল। তিরতিরে জ্যোৎস্নায় আবছা অন্ধকারটা দ্রুত মিশে গিয়ে খুব শান্ত করে দিল লাভবার্ডকে। শিবাজী বাংলো থেকে নেমে এল নিচে। সিঁড়ির কাছে একটা লোক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে সেলাম করল। এটি সেই সকালে ঠিক করা গার্ডদের একজন। সে ভাবল লোকটা কতটা বিশ্বাসী? মাঝরাত্রেই এর স্বরূপ পালটে যাবে না তো! কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। একটা লোক বাংলোয় পাহারার জন্যে আছে এটা ভাবলেও অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। গেটের কাছে আসতেই শিবাজীর চোখ পড়ল পাশের বাংলোর দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করতে লাগল সে। তার মনে পড়ল দুপুরে ভদ্রমহিলা তার দিকে কি দারুণ ঘৃণা নিয়ে তাকিয়েছিল। না, এখন যাওয়াটা উচিত হবে না। পুরো একটা দিন কেটে গেল এখানে। কিন্তু কোনো কাজ হল না। এখনও সে জানে না মনীশ সোমের সঠিক অবস্থা কী। এখনও লাভবার্ডকে শান্ত করার কোনও রাস্তা খুঁজে পায়নি। আজ সকালে পুলিসগুলো যদি না আসত তাহলে হয়তো কুলিদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থায় আসা যেত। হঠাৎ তার খেয়াল হল দুপুরে ভদ্রমহিলা তার বাংলোয় এসেছিলেন কেন? কোনো বিশেষ প্রয়োজন ছিল কি? না কি কুকুরটার খবর পেয়েছিলেন! মনীশ সোমের কুকুরকে তার বাংলোর ঘরে মেরে ফেলে রাখল কেন ওরা? শিবাজীর মনে হল তার কর্তব্য একবার গিয়ে ভদ্রমহিলার খবর নেওয়া। সেই চাপা আকর্ষণটাকে ও চটপট প্রয়োজনের পোশাক পরিয়ে দিয়ে স্থির হল।

গেট খুলে নির্জনে পা বাড়াল শিবাজী। নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে বাংলোটা। একটাও শব্দ নেই কোথাও। ওরা কি ভেতরে নেই? শিবাজী একটু ইতস্তত করল। তারপর চুপচাপ বারান্দায় উঠে এল। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠবার সময় সে সতর্ক ছিল যেন কোনো শব্দ না হয়। দোতলায় উঠেই মানুষের গলা শুনতে পেল শিবাজী। পুরুষকণ্ঠে কেউ কিছু বলছে। শব্দটা আসছে একদম কোণের ঘর থেকে। খুব অবাক হয়ে গেল সে। এখন এই বাংলোয় কোনো পুরুষের থাকার কথা নয়। পা টিপে টিপে সে ঘরটার সামনে এল। দরজা ভেজানো। নিঃশব্দে কান পাততেই শুনতে পেল পুরুষটি বলছে, 'আপনার উচিত কোম্পানিকে লেখা।'

'কিন্তু মনীশ যদি বেঁচে না থাকে!'

'তার কোনো প্রমাণ নেই। এই অবস্থায় ম্যানেজার হিসেবে কোম্পানি কাউকে পাঠাতে পারেন না।'

'কিন্তু উনি সেটা অস্বীকার করেছেন।'

'মিথ্যে কথা!'

'বেশ। কিন্তু আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন—।'

'আমি কথা রাখব।'

'মনীশ যদি না থাকে তাহলে যে কী করব—!' মিসেস সোমের গলা ভেঙে এল। শিবাজী আর একটু এগোল। সামনেই কাচের জানলা। ভেতরে যদিও পর্দা ঝোলানো তবু তার ফাঁক দিয়ে সে তাকাতেই চমকে উঠল। মুখে সামান্য দাড়ি, পোশাক খুব বিন্যস্ত নয়, হাতে সিগারেট জ্বলছে, একটা চেয়ারে শরীর এলিয়ে যে কথা বলছে তার দিকে তাকিয়ে মাথায় আগুন জ্বলে উঠলেও কোনোরকমে নিজেকে সামলালো সে। লোকটি বলল, 'আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন মহিলা। ঝালর দেওয়া একটা ম্যাক্সি ওঁর পরনে। খুব বিষণ্ণ লাগছিল ওকে। লোকটি বলল, 'আমার সঙ্গে আপনার আলাপ আছে একথা ওকে জানানোর দরকার নেই। মনে রাখবেন, যতদিন মিস্টার সোমকে না পাওয়া যাচ্ছে ততদিন আপনি এখানে নিশ্চিন্ত।'

'কিন্তু আমার তাতে কী লাভ?'

'এত করে বোঝাই তবু কেন বুঝছেন না।' লোকটি হাসল, 'আর হ্যাঁ, কুলি লাইনে ঘোরাফেরা বন্ধ করবেন না। ওটা আমাদের খুব কাজে লাগবে। সবাই আপনার সম্পর্কে খুব সহানুভূতিশীল। আমি আজ উঠি। আপনি মন ঠিক করুন।' লোকটি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতেই শিবাজী দ্রুত পিছিয়ে গেল। কিন্তু সিঁড়ির কাছে পৌঁছে যাওয়ার আগেই ও-ঘরের দরজা ঠেলে সে বেরিয়ে আসতে পারবে। এক লহমায় শিবাজী দেখে নিল পাশের ঘরের দরজা ঈষৎ খোলা। প্রথমে সেটাকে খোলা দেখেছিল কি না খেয়াল নেই কিন্তু সে আর সময় নষ্ট করল না। চকিতে সেই ঘরটায় ঢুকে পড়ল। প্রায় অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না কিন্তু বাইরের বারান্দায় পায়ের শব্দ হল। লোকটি যেন নেমে যেতে যেতে দাঁড়াল তারপর আওয়াজটা দ্রুত মিলিয়ে গেল।

শিবাজী বুঝতে পারছিল না মিসেস সোম বারান্দায় রয়েছেন কিনা। এখনই বাইরে বের হলে মুখোমুখি দেখা হয়ে যেতে পারে। সে আরও খানিকটা অপেক্ষা করল। মিসেস সোমের সঙ্গে সীতেশের কি সম্পর্ক? ওঁর ঘরে সীতেশকে দেখে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে শিবাজীর। কোম্পানির অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে মনীশ সোমকে ইলোপ বা খুন করেছে সীতেশরাই। সেই সীতেশের সঙ্গে মনীশের স্ত্রীর এত ভাব কী করে হয়? ভদ্রমহিলাকে কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না। শিবাজীর আফসোস হল। এই ঘরে না ঢুকে আগে থাকতেই নিচে অপেক্ষা করলে সীতেশের হদিশ পাওয়া যেত অনুসরণ করলে। লাভবার্ড টি এস্টেটের শ্রমিক য়ুনিয়নের একটা বড় মাতব্বর হল সীতেশ। সে এসে ম্যানেজারের স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শিবাজীর মনে হল সে এই ঘরে একা নেই। খুব মৃদু হলেও কারও নিঃশ্বাস পড়ছে এখানে। মুখ ফিরিয়ে সে কাউকে দেখতে পেল না। অদ্ভুত একটা শির-শিরানি এল শরীরের। চকিতে সে বারান্দায় পা রেখে দু'পাশে তাকাল। না, বারান্দায় কেউ নেই। মিসেস সোম বোধহয় ঘর ছেড়ে বের হননি। নিঃশব্দে নীচে নেমে এল সে। চাঁদের রঙ আরও ঘন হয়েছে, তকতকে জ্যোৎস্নায় মাখামাখি পৃথিবী। শিবাজী ঘুরে দাঁড়াল। না, এভাবে ফিরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। ঝালর দেওয়া ম্যাক্সি তাকে টানছিল।

সে আবার উঠে এল, এবার সশব্দে, জাগান দিয়ে, যেন এই প্রথম আসছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে একটু কাশল, 'আসতে পারি?'

এবার প্রথম ঘরটার দরজা খুলে গেল। সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে চোখে বিস্ময় কিন্তু দুটো ঠোঁটে ঈষৎ হাসি খেলে গেল। তারপরেই সে পাশের ঘরে গিয়ে কিছু বলতেই মিসেস সোম এসে দরজায় দাঁড়ালেন। মেয়েটিকে আর দেখা গেল না। ম্যাক্সি শরীরে লতিয়ে রয়েছে, মিসেস সোম খুব অবাক চোখে তাকালেন। শিবাজী নমস্কার করল, 'হয়তো অসময়ে বিরক্ত করলাম—।'

মহিলা খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে বারান্দার চেয়ারে বসে ওকে হাত বাড়িয়ে আর একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। শিবাজী ওঁর চাহনিতে একটা শীতল স্পর্শ পেল। বাইরের পৃথিবীতে যে জ্যোৎস্নার ঝড় উঠেছে তার বিন্দুমাত্র ভদ্রমহিলাকে যেন স্পর্শ করছে না। সে উল্টোদিকের চেয়ারে বসে হাসল, 'আপনি আজ দুপুরে আমার ওখানে গিয়েছিলেন, কোনো দরকার ছিল?'

মিসেস সোম বললেন, 'আমি ভাবতে পারছি না কোম্পানি একজন মাতালকে এইরকম পরিস্থিতিতে কী করে পাঠাল!'

শিবাজী চমকে উঠল। ওর মুখে আচমকা রক্ত জমল। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ চোখে ভদ্রমহিলাকে কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিল। তারপর খুব তেতো গলায় বলল, 'সাধারণ মানুষের চেয়ে কখনও কখনও মাতালরা বেশি কাজের হয়, তাই বোধহয়। আমি দুঃখিত আজ আপনাকে আপ্যায়ন করতে পারিনি।'

'তার দরকার নেই।'

'আপনার কুকুর কি হারিয়েছে?'

'জানি। ওকে আপনার বাংলোয় কেউ খুন করেছে। আমি ভাবতে পারছি না ওই অবলা প্রাণীটিকে খুন করে কার কী লাভ হল!'

'আশা করি আপনি জানেন আমি আসার আগেই ওকে খুন করা হয়েছিল! আমার বিশ্বাস মিস্টার সোমের ঘটনাটার পরেই এটি হয়।'

'আপনি ভাবছেন মিস্টার সোম মারা গেছেন?'

'না, আমি কিছুই ভাবছি না।'

'কিন্তু উনি মারা গেলে আপনি লাভবান হবেন। শুনুন, আপনি এখানে থাকলে ওকে ফিরে পাওয়া আমার পক্ষে অসুবিধেজনক হবে। আমি চাই আপনি অবিলম্বে বাগান ছেড়ে চলে যান।'

'কিন্তু কোম্পানি তা চায় না। মিসেস সোম, কোম্পানি ইচ্ছে করলে একজন ম্যানেজার বর্তমান থাকতেও আর একজনকে তার জায়গায় পাঠাতে পারে। এক্ষেত্রে মিস্টার সোম অনুপস্থিত, অতএব কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। আমি বুঝতে পারছি কথাগুলো আপনার নয়। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।'

'একটা মাতালের সাহায্য? আপনার সম্পর্কে এখানকার শ্রমিকরা কী ভাবতে শুরু করেছে খোঁজ নিন। যতই আপনি টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করতে চান আসলে মানুষ যা ভাববার তা ভাববেই।'

'না। যদি ওরা কিছু ভাবে আমার ড্রিঙ্ক করার জন্যে তাহলে সেটা ওদের ভাবানো হচ্ছে। এখানকার শ্রমিক য়ুনিয়ন নির্বাচিত নয়। যারা এর নেতা তাঁদের সততা সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে।'

'নতুন কথা নয়। চিরকালই মালিকপক্ষ একথা বলে থাকে। আপনি সীতেশবাবুকে চেনেন? হি ইজ পারফেক্ট জেন্টলম্যান। নিজের ক্যারিয়ারের দিকে না তাকিয়ে তিনি শ্রমিকদের উপকারের জন্য এদের মাঝে রয়েছেন। এসব কথা আমাকে শুনিয়ে কোনো লাভ নেই।' মিসেস সোম উঠে দাঁড়ালেন। যেন আর কোনো কথা বলার দরকার নেই, 'আমি কোম্পানিকে লিখব।'

'তা লিখুন।' শিবাজী হাসল,'সীতেশ আপনাকে কী বুঝিয়েছে?'

'মানে?'

'সে যদি জনদরদী হবে তাহলে আপনার স্বামীকে ইলোপ করল কে?'

'কিছু হুলিগানস্। সীতেশরা নয়।'

'কী লাভ তাদের। আর এই চা-বাগানে একটা মানুষকে গুম করে রাখা হয়েছে অথচ নেতারা জানে না এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'হয়তো কোম্পানিই ওকে গুম করিয়েছে যাতে শ্রমিকরা বিপদে পড়ে। চাপ দিয়ে যাতে কাজ আদায় করা যায়।'

'কী বলছেন আপনি!'

'এই সম্ভাবনাও আছে, তাই না?'

'কে বুঝিয়েছে একথা, সীতেশ?'

'কেন, মিথ্যে কথা? প্রমাণ করতে পারেন?'

'তার দরকার নেই। কেননা যে আপনাকে বুঝিয়েছে তাকে আমার চেয়ে আর কেউ বেশি চেনে না। যিনি চিনতেন তিনি আর নেই।'

'কে?'

'আমার মা! মিসেস সোম, সীতেশ আমার মায়ের পেটে জন্মেছিল।' শিবাজী উঠে দাঁড়াল। তারপর আর একটি কথাও না বলে নিচে নেমে এল। লন পেরিয়ে গেটে এসে সে মুখ ফেরাল

না। কারণ তার সমস্ত ইন্দ্রিয় বলছিল আজ মিসেস সোম বারান্দা ছেড়ে যেতে পারেননি।

চল্লিশ মিনিট ধরে ওঁদের কথা শুনে গেল শিবাজী। একটার পর একটা দাবি। প্রতিটি মেনে নেওয়া যে অসম্ভব, শিবাজীর মনে হল একথা ওরাও বোঝে। প্রথম দাবি, যে কয় মাস কাজ হয়নি তার পুরো বেতন সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীকে দিতে হবে। দুই, পে-স্কেল পুনর্বিন্যাস করতে হবে। তিন, শতকরা বিশ ভাগ বোনাস ঘোষণা করতে হবে। চার, বাগানের দায়িত্বপূর্ণ পদে শ্রমিকদের ছেলেদের নিতে হবে! পাঁচ, বাগানে কোনো সমস্যা দেখা দিলে কোম্পানি সমাধানের চেষ্টা করবে না, য়ুনিয়নের নির্বাচিত একটা কমিটির কাছে তা পাঠাতে হবে। কমিটি যে রায় দেবে কোম্পানিকে মেনে নিতে হবে।

দাবিগুলো শুনতে শুনতে এঁদের মুখের দিকে তাকিয়েছিল শিবাজী। দুজন মদেসিয়া এবং একজন বাঙালি। প্রত্যেকেই বেশ সুস্বাস্থের অধিকারী এবং দেখলেই বোঝা যায় কোনো কায়িক পরিশ্রম করেন না। এঁরা ঠিক সময়ে এসেছেন শিবাজীর বাংলোয়। প্রত্যেকের পোশাক পরিষ্কার। যে জিপটা ওঁদের এনেছে সেটা বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে। ওঁদের বক্তব্য শেষ হলে শিবাজী জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা চা খাবেন?' তিনজনই মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তারপর বাঙালি ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'না। ফয়সালা না হওয়া অবধি কিছু খেতে পারব না।'

'আপনারা কি এই বাগানের সঙ্গেই যুক্ত?'

'মানে?'

'লাভবার্ডে কাজ করেন?'

'না। আমরা এদের রিপ্রেজেন্টেটিভ।'

'আপনাদের কি মনে হয় কোম্পানি সব দাবি মেনে নেবেন?'

'নাহলে এখানে কাজ হবে না।'

'শুনুন, পাঁচ নম্বরটা ছাড়া আপনাদের অন্যান্য দাবি যাতে মেনে নেওয়া যায় সেটা বোঝাতে আমি চেষ্টা করব। কিন্তু একটা শর্তে!'

তিনজনেই খুব বিস্মিত চোখে তাকালেন।

'মনীশ সোমের হদিশ দিতে হবে।'

বাঙালি ভদ্রলোক চটপট বললেন, 'রিয়েলি আমরা জানি না। সেদিন যে শ্রমিক বিক্ষোভ ঘটেছিল সেটা আমরা অর্গানাইজ করিনি। আমরা ঠিক করেছিলাম নতুন ম্যানেজারের সামনে আমরা শ্রমিকদের নিয়ে এই দাবিগুলো নিয়ে ধরনা দেব। কিন্তু তার আগেই হয়ে গেল ব্যাপারটা।'

'কিন্তু মিস্টার সোমকে কোথায় রাখা হয়েছে তা আপনাদের অজানা একথা বিশ্বাস করি কী করে।'

ভদ্রলোক হাত উল্টে বললেন, 'কিন্তু সেটাই সত্যি।'

'তাহলে আমার কিছুই করার থাকছে না।' হতাশ গলায় বলল শিবাজী।

'আপনি কি আমাদের ব্ল্যাকমেল করতে চাইছেন?' বাঙালি ভদ্রলোক উত্তেজিত গলায় বললেন।

'না। সেটা আমার স্বভাব নয়। আপনারা তাহলে একথাও জানেন না প্রথম রাত্রে কারা আমাকে খুন করতে এসেছিল?' শিবাজী সরাসরি জিজ্ঞাসা করল।

অন্য দুজন এবার চমকে উঠে একসঙ্গে বললেন, 'সে কি!' শিবাজী বুঝতে পারল এই অবাক হওয়াটা কিছুতেই অভিনয় হতে পারে না। বাঙালি ভদ্রলোক বললেন, 'তাজ্জব ব্যাপার। আপনি থানায় ডায়েরি করেছেন?'

'না।' হাসল শিবাজী, 'আমি আপনাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে চাই না।'

'আপনি কিন্তু আবার আমাদের জড়াতে চাইছেন!'

'শুনুন। আমি জানি আপনারা য়ুনিয়নের নির্বাচিত প্রতিনিধি নন। আপনাদের সঙ্গে কথা বলা আইনসম্মত হচ্ছে না। তবু আমি চাই প্রত্যেকের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখতে। ধরুন, এই মুহূর্তে আমি আপনাদের দাবি মেনে নিলাম, আপনারা তিনজনেই এই টেবিলে কথা দিয়ে যেতে পারবেন যে আগামীকাল থেকে কাজ শুরু হবে?' শিবাজী সোজা হয়ে বসল।

আচমকা এরকম প্রস্তাবে তিনজনেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তারপর মদেসিয়া ভদ্রলোক বললেন, 'না। আমাদের সময় দিতে হবে।'

'কেন?'

'কারণ এ নিয়ে আলোচনা করব।'

'শুনুন, আপনারা যে কটা দাবি রেখেছেন সেগুলো সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল, কোম্পানি যেদিন থেকে চা-বাগান কিনেছে সেদিন থেকে শ্রমিকদের দায়িত্ব তার, অতএব তার আগের বকেয়া মাইনে দেবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। বেতনহার পুনর্বিন্যাস করার কথা কোম্পানি চিন্তা করবে। অন্য বাগানের চেয়ে যদি কম টাকা দেওয়া হয় তাহলে আমি কথা দিচ্ছি এই দাবি মেনে নেওয়া হবে। বিশ পার্সেন্ট বোনাস দেওয়ার প্রশ্ন এই সময়ে ওঠে না কারণ কোম্পানি বিরাট আর্থিক ঝুঁকি নিয়ে বাগান কিনেছে এবং আগামী এক বছরের মধ্যে উৎপাদন ভালো হবে বলে মনে হয় না। যতদিন কোম্পানি ভালো লাভ না করবে ততদিন সাড়ে আট পার্সেন্টের বেশি বোনাস দেওয়া সম্ভব নয়। শ্রমিকদের যদি উপযুক্ত সন্তান থাকে তাহলে অবশ্যই কোনো পদ খালি হলে তাকে বিবেচনা করা হবে। আর যেহেতু চা-বাগানটি কোম্পানির সম্পত্তি তাই কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা ম্যানেজারই সমাধান করবেন তবে ইচ্ছে করলে য়ুনিয়নের পরামর্শ চাইতে পারেন। এই হল বক্তব্য। আপনারা যদি শ্রমিকদের উন্নতি চান তাহলে আকাশকুসুম চিন্তা করে সেটাকে বন্ধ করে দেবেন না।'

এবার তিনজনেই উঠে দাঁড়ালেন, 'আজ বিকেলের মধ্যে এই ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য জানিয়ে দেব!'

শিবাজী মাথা নাড়ল। একটু বাদেই জিপের ইঞ্জিন সচল হতে সে ব্রিফকেস থেকে কাগজ বের করল, সেনসাহেবকে পুরো ব্যাপারটা জানাতে হবে। বৃদ্ধ নিশ্চয়ই উতলা হয়েছেন। তার দৈনিক রিপোর্ট দেবার কথা ছিল। কিন্তু রোগ অনেক গভীরে। এই অসুখ সহজে সারবে না।

পুলিশের উপস্থিতিতে ফ্যাক্টরি এবং অফিসের তালা খোলার কথা চিন্তা করে ছিল শিবাজী কিন্তু পরে মত পাল্টাল। এই মুহূর্তে ফ্যাকটরি খুলে কোনো লাভ নেই, তাতে অযথা টেনসন বাড়বে। শুধু অফিসঘর খুলে দেওয়া যাক। ওখানে কোনো শ্রমিক কাজ করে না অথচ চা-বাগান চালু করতে গেলে প্রাথমিক কিছু কাজকর্ম এখনই শুরু করা দরকার যা অফিসঘর ছাড়া হবে না। এগারোটার পর সামন্তবাবু এলে সে নিজে তালা ভাঙল। ফার্নিচার সবই ঠিকঠাক আছে কিন্তু ফাইলপত্রের অবস্থা দেখে সন্দেহ হল ওগুলো আস্ত আছে কি না। সামন্তবাবু তার স্টাফদের নিয়ে এসেছিলেন। শিবাজী ওঁদের কাজে লাগতে বলল। প্রথমে কী কী প্রয়োজনীয় রেকর্ড নেই তার জরিপ আর তার আশু খরচের একটা বাজেট তৈরি করতে বলে বাইরে এল সে।

কী করে খবর রটে কে জানে, এখন অফিসের সামনে জনা দশেক মানুষ উবু হয়ে বসে আছে। ওকে দেখে নড়েচড়ে উঠল সবাই। সামন্তবাবু ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'বিভিন্ন লাইনের সর্দার এরা, খাবে বলে টাকা চাইছে।'

শিবাজী সামন্তবাবুকে বলল, 'না, আজ ওদের হাতে টাকা দেব না। আপনি বাজারের কোনো

দোকানের সঙ্গে ব্যবস্থা করুন যাতে প্রতিটি লাইনে চাল আর ডাল পৌঁছয়।'

সামন্তবাবু মাথা নাড়লেন, 'সেই ভাল স্যার।'

সামন্তবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাঙ্কে গেল শিবাজী। সেখানে টাকাপয়সার ব্যবস্থা করে সে একা বেরিয়ে পড়ল। প্রথমে রিপোর্টটা পাঠানোর ব্যবস্থা করল। তারপর লাভবার্ড ছেড়ে রওনা হল। সমস্ত চা-বাগানের কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থাটির অফিসে যখন পৌঁছল তখন প্রায় দুটো বাজে। সেখানে কথাবার্তা বলে বেশ অবাক হয়ে গেল শিবাজী। লাভবার্ড টি. এস্টেটের শ্রমিক য়ুনিয়নের তরফে যাঁরা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তাঁরা অনুমোদিত নন। আগরওয়াল যখন মালিক ছিলেন তখন থেকেই এই চা-বাগানের শ্রমিক য়ুনিয়ন কেন্দ্রীয় সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে। লাভবার্ডের শ্রমিকদের কষ্ট লাঘব করার জন্যে কেন্দ্রীয় সংস্থা এর মধ্যে যতবার এগিয়ে এসেছে ততবার ওখানকার নেতৃবৃন্দ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। যেহেতু এই নেতাদের প্রভাব লাভবার্ডের শ্রমিকদের ওপর অপরিসীম তাই কেন্দ্রীয় সংস্থার এ ব্যাপারে কিছু করার নেই। আগরওয়ালা চলে যাওয়ার পর লাভবার্ডের নেতারা কেন্দ্রীয় সংস্থার সঙ্গে সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। তারা এখন কারো নাক গলানো পছন্দ করছে না। কেন্দ্রীয় নেতাদের অনুমান লাভবার্ডের শ্রমিক য়ুনিয়নের অন্যতম নেতা সীতেশ চ্যাটার্জির রাজনৈতিক মতামতের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য থাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। তবে গত কয়েক বছর ওখানে কোনো নির্বাচন হয়নি বা সীতেশ চ্যাটার্জিদের বিরোধীরা জোরদার হতে পারেনি।

এতক্ষণে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হল শিবাজীর কাছে। আগরওয়ালের সময় থেকেই এই য়ুনিয়ন আলাদা হয়ে গেছে এবং এদের পেছনে আর অন্যান্য বাগানের শ্রমিক সংস্থাগুলোর মদত নেই। কোনো রাজনীতি এতগুলো মানুষকে অনাহারে রাখতে পারে না। যাক, এখন লড়াইটা আরও সহজ হয়ে গেল। সে ফেরার পথে একটা ডাকঘর থেকে টেলিগ্রাম করে দিল সেনসাহেবকে, লাভবার্ড য়ুনিয়ন কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন।

খিদে পেয়েছিল খুব। কিন্তু স্নান না করলেই নয়। বাংলোর গেটে দাঁড়ানো গার্ড তাকে সেলাম করল। শিবাজী হন হন করে দোতলায় উঠে এসে দেখল তার ঘরের দরজা খোলা। একটু বিরক্ত হল সে। খানসামাকে বলে যেতে হবে ঘরের দরজা যেন বন্ধ রাখে। বাইরে অবশ্য গার্ড আছে তবু—। ঘরে ঢুকে সে দেখল টেবিলের ওপর খাবার চাপা দেওয়া রয়েছে। এর মানে কি? লোকটা তার জন্যে অপেক্ষা করতে পারল না। সে বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে খানসামাকে ডাকল। চার-পাঁচবার ডাকা সত্ত্বেও কোনও সাড়া এল না নিচের কিচেন থেকে। কিচেনের দরজা বন্ধ। লোকটা খাবার ঢেকে রেখে না বলে চলে গেল? সে একবার ভাবল গার্ডকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে খানসামা কিছু বলে গিয়েছে কি না। কিন্তু এত খিদে পেয়েছে যে ব্যাপারটা পরেই জানা যাবে ঠিক করে সে স্নান করে নিল। পোশাক পাল্টে খাওয়ার টেবিলে বসে ওর কপালে ভাঁজ পড়ল। সামনে রাখা হুইস্কির বোতল দুটোর একটার মুখ খোলা। তার মানে কেউ খেয়েছে। কে খেতে পারে? এই ঘরে খানসামা ছাড়া অন্য কেউ নিশ্চয়ই ঢোকেনি। মাথায় আগুন চড়ে গেল। সে টেবিল ছেড়ে পেছনের দরজা দিয়ে নিচে নেমে এল। চাপা গলায় সে ডাকল, 'খানসামা!' কোনো সাড়া নেই। জায়গাটা যেন হঠাৎই আরও নির্জন হয়ে গেল। সে কিচেনের দরজায় কোন তালা দেখতে না পেয়ে সামান্য ঠেলতেই ওটা খুলে গেল। ঘরটা অন্ধকার। রান্না হয়ে যাওয়ার পর লোকটা একটুও পরিষ্কার করেনি। দরজা সম্পূর্ণ খুলে দেওয়ায় যে আলোটুকু ঢুকেছিল তাতেই দেখা গেল হাঁড়ি কড়াই ওল্টানো। আর একটা কালচে তরল পদার্থ গড়িয়ে গড়িয়ে ঘরের মাঝখানে এসে থেমে গেছে। শিবাজী ঘরে ঢুকে স্তব্ধ হয়ে গেল। কোনার জানলার নিচে খানসামা চিত হয়ে পড়ে আছে। তার গলার ক্ষত থেকে প্রচুর রক্ত বেরিয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে। সতর্ক

পায়ে শিবাজী খানসামার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দুটো চোখ বিস্ফারিত, লোকটার নাকেও চোট লেগেছে। এক পলকেই বোঝা যায় ওর প্রাণ অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছে। খুব ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওরা গলা কাটা হয়েছে। তবে যে কেটেছে সে সামনাসামনি আঘাত করেছে। লোকটার দুটো হাতই মুঠো করা। শিবাজীর বুক কেঁপে উঠল। এই বৃদ্ধকে এমন নৃশংস হত্যা করল কে? কী দোষ করেছিল এ? শিবাজীর জন্যে কাজ করতে আসাটাই ওর জীবন হারানোর কারণ? তাহলে বাইরের ওই গার্ড আর সামন্তবাবুরও তো এই দশা হতে পারে?

শিবাজী চোখ ফেরাতে দেখল কড়াইতে কি একটা ঝোল পড়ে আছে। কড়াইটা নামানো এবং দেখলে বোঝা যায় রান্নাটা শেষ হয়নি। যদি রান্না শেষ না হয় তাহলে খানসামা তাকে খাবার দিয়ে আসবে কেন? শিবাজী চমকে উঠল। খানসামার বদলে অন্য কেউ তার খাবার পরিবেশন করে আসেনি তো। সে দরজাটা ভেজিয়ে দ্রুত ওপরে চলে এল। তারপর খাবারের থালাটা নিয়ে নিচে নেমে চারপাশে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কাক উড়ে এল সামনে। শিবাজী একটু দূরে থালাটা নামিয়ে রেখে লক্ষ্য করতে লাগল। কাকের সঙ্গী বাড়ল। পরম আনন্দে খেয়ে যাচ্ছে ওরা। কিন্তু একটু বাদেই দুজনেই যেন অস্বস্তিতে পড়ল। খাবার ছেড়ে ওরা সরে দাঁড়াল। তারপর প্রচণ্ড চিৎকার করতে করতে উড়ে যেতে চেষ্টা করল। খানিক ডানা ঝাপটে শেষ পর্যন্ত দুটো কাকই শুয়ে পড়ল মাটিতে। শিবাজী আর দাঁড়াল না। ওপরে উঠে এসে মুখ খোলা বোতলটা উপুড় করে দিল বাথরুমের নালায়। অন্যটার সিল অটুট আছে। এতক্ষণে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। খানসামাটাকে ওরা কজ্জা করতে পারেনি। ফলে বেচারাকে জীবন দিতে হল। ওরা নিশ্চিত ছিল যে সে এই খাবার খাবেই। বাইরের দরজাটা ভেজিয়ে শিবাজী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে অটুট হুইস্কির বোতলটা খুলে এক ঢোঁক গিলল। সঙ্গে সঙ্গে যে নার্ভাস ভাবটা এসেছিল সেটা কমতে লাগল। ওরা তো অন্য যে কোনো উপায়েই তাকে খুন করতে পারত, খামোকা খানসামাকে মারতে গেল কেন?

এখন থানায় খবর দিতে হয়। পুলিশ এসে তাদের কাজ করুক। গার্ডকে দিয়ে সামন্তবাবুকে ডেকে পাঠানোর জন্য শিবাজী উঠতেই অন্য একটা চিন্তা তার মাথায় এল। যারা খাবারে বিষ মিশিয়েছে, খানসামাকে খুন করেছে, তারা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে ফলাফলের জন্যে। কেউ নিশ্চয়ই দেখতে আসবে সে মরে গেছে কিনা! যে আসবে তাকে ধরতে পারলে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। এই সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। অবশ্য তারা যদি আগেই এখানে লুকিয়ে তার ওপর নজর রাখে তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু এই চান্সটা নেওয়া উচিত। সে এগিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে গেটের দিকে তাকাল। গার্ড এক হাতে খইনি নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে টিপে যাচ্ছে। তার মানে লোকটা জানে না যে খানসামা খুন হয়েছে। মৃত্যুকে পাশে রেখে কেউ ওরকম নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

শিবাজী বাথরুম পেরিয়ে নিচের দিকে উঁকি মারল। না, কেউ নেই। অন্তত ধারে কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কিচেন এবং খানাসামার ঘরের পেছনেই জঙ্গল শুরু হয়েছে। সেখানে কেউ লুকিয়ে থাকলে এই বাথরুম থেকে নেমে যাওয়া সিঁড়িটাকে দেখতে পাবে না। সতর্ক পায়ে সে নেমে এল নিচে। তাবপর আড়ালে চলে এল জঙ্গলের কাছে। দ্রুত ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে সে নিজেকে গাছের আড়াল করল।

এখন বিকেল পুরোপুরি নামেনি কিন্তু রোদ্দুরে তার ছোঁয়া লেগেছে। শিবাজী উদ্বিগ্ন হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। না, কোনো মানুষের এদিকে আসার সংকেত নেই। ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠল সে। না, ফাঁদটা বোধ হয় কাজে লাগল না। সে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সামান্য এগোতেই পাতা দুটোকে

দেখতে পেল। গাছ থেকে ছিঁড়ে রক্ত মুছে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তার মানে খুনী এই পথেই গিয়েছে। সরু পায়ে চলা পথটার দিকে তাকাল শিবাজী। খুনী সশস্ত্র, তার সঙ্গে কিছু নেই। এই অবস্থায় এগিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজে হবে না হয়তো, কিন্তু—। সে মাথা নাড়ল। না, দেখাই যাক। ধীরে ধীরে হেঁটে এল জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। পাখির ডাক ছাড়া কোনো শব্দ নেই। এই পথ দিয়েই সেই মেয়েটি তাকে বাগানের মধ্যে নিয়ে যায়নি অথচ পথটা পরিষ্কার। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর জঙ্গলটা শেষ হল। সেই রাস্তাটা আর তারপরই চা-বাগান। আর তখনই তার ইন্দ্রিয় সজাগ হল। কেউ আসছে। চট করে একটা গাছের আড়ালে চলে এল শিবাজী।

পনেরো ষোলো বছরের মদেসিয়া ছেলেটাকে দেখে তার মতলববাজ বলে মনে হল না। এক হাতে গুলতি ঝুলিয়ে চা-বাগান পেরিয়ে রাস্তায় নামল ছেলেটা। তারপর সোজা চলে এল এই পথটার দিকে। ওদিকে কোন কুলি-লাইন আছে কি না জানে না শিবাজী, কিন্তু শুধু চোখে চা বাগানের পর জঙ্গল ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এই পথটা সোজা গিয়ে তার বাংলোর পেছনে শেষ হয়েছে, এখানে আসবে কেন ও। শিবাজী আচমকা আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেটার সামনে দাঁড়াতেই সে ভূত দেখার মত চমকে উঠল। ওর মুখ থেকে গোঙানির মত একটা শব্দ বের হল এবং চটপট পেছন ফিরে দৌড়তে লাগল চা-বাগানে ঢুকে। শিবাজী আর ইতস্তত করল না। সে প্রাণপণে ছুটতে লাগল ছেলেটাকে ধরার জন্য। কিন্তু ছেলেটা এই রকম জায়গায় চলতে অভ্যস্ত, ওর সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। বয়স এবং মদ যে শরীরের ওপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে এই প্রথম টের পেল সে। ওদের ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে। চা-বাগানের অনেকটা ভেতরে এসে শিবাজী ছেলেটাকে হারিয়ে ফেলল। প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছিল সে। মিনিট পাঁচেক দৌড়েই মনে হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে যাবে। সে হতাশ চোখে চারধারে তাকাল। বিকেল ঘন হচ্ছে। ওপাশের জঙ্গলটা কাছে এগিয়ে এসেছে। খুব গভীর এই জঙ্গল বোধহয় সোজা হিমালয়ের শরীরে উঠে গেছে। শিবাজী একটু সামলে নিয়ে সামনের দিকে এগোল। এখন আর ছেলেটিকে ধরা সম্ভব নয়। চমৎকার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার জন্য আফসোস হচ্ছিল ওর।

চা-বাগানের শেষ প্রান্তে একটা ছোট্ট পাহাড়ি নদী। প্রস্থে বিশ ফুটের বেশি নয় কিন্তু স্রোত আছে খুব। কোমরের বেশি জল হবে না। শিবাজী নদীর নিচের নুড়িগুলো আর এক ঝাঁক ছোট মাছ দেখতে পেল। ছেলেটা যদি জঙ্গলে যায় তা হলে এই নদী পেরিয়ে যেতে হবে। তবে যেহেতু ছেলেটার আকৃতি ছোট তাই জলে নিশ্চয় গলা পর্যন্ত ডুবে যাবে ওর। শিবাজী নদীর ধার দিয়ে সন্তর্পণে এগোতে লাগল যদি কোথাও কোনো সূত্র থাকে। না, জল সর্বত্র সমান নয়। কোথাও সামান্য বিস্তার ঘটায় সেটা হাঁটুর কাছে নেমে এসেছে। আর সেখানেই ছেলেটিকে দেখতে পেল শিবাজী। স্ট্যাচুর মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। শিবাজী খুব সন্তর্পণে পা ফেলতে লাগল। কাছাকাছি যেতেই ছেলেটি ঘাড় ফেরালো। এবার শিবাজীকে দেখতে পেয়েই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। কান্নাটি স্পষ্ট নয়। মুখ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু শব্দগুলো গোঙানির চেহারা নিচ্ছে। প্রায় দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটাকে খপ করে ধরে ফেলল শিবাজী, 'কী হয়েছে?'

প্রশ্নটা করবার জন্যে সে তৈরি ছিল না। আপ্সেই বেরিয়ে এল। ছেলেটি হাত বাড়িয়ে সামনের দিকটা দেখিয়ে দিল। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না শিবাজী, ঘন জঙ্গলে ছায়া নেমেছে। গাছগুলো একই রকম দেখাচ্ছে এখন। কিন্তু তার পরেই নজরে পড়ল, জঙ্গলের কিনারায় কিছু নড়ছে। ঠাওর করে দেখতে গিয়ে সজাগ হল। অন্তত গোটা ছয়েক হাতি ওখানে নেমে এসেছে। এবার পরিষ্কার হয়ে গেল শিবাজীর কাছে। ওই হাতির দলটার জন্যেই ছেলেটা নদী পার হতে পারেনি। আবার তার জন্যে ওর পেছনে ফেরাও সম্ভব হয়নি। নদী পার হয়ে জঙ্গলে যাচ্ছিল কেন ছেলেটা? প্রশ্নই করল সে ওকে।

ছেলেটা এবার গোঙানি থামিয়ে হঠাৎ নিজের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল আপ্রাণ। কিন্তু শিবাজী ওকে আচমকা চড় মারল। আঘাত খেতেই গুটিয়ে গেল ছেলেটা। শিবাজী জিজ্ঞাসা করল, 'তোর নাম কী?'

ছেলেটা উত্তর দিল না, ওর ঠোঁট কাঁপল।

শিবাজী আবার হাত তুলল, 'বল, নইলে তোকে মেরেই ফেলব। কোথায় যাচ্ছিলি তুই? কে পাঠিয়েছে?'

এবার ছেলেটার মুখ বিকৃত হল এবং একটা গোঙানি বেরিয়ে এল। শিবাজী প্রথমে বুঝতে পারেনি, আর একটা চড় মারতে ছেলেটা সত্যি সত্যি মরিয়া হয়ে কিছু বলতে চাইল কিন্তু গোঙানি ছাড়া কিছু বের হল না। এবার শিবাজীর চোখ ছোট হল। ভান করছে না সত্যিকারের বোবা। কিন্তু ওর চোখ দেখে আর অবিশ্বাস থাকল না। এবার সে তাজ্জব হয়ে গেল। ওরা খবর নিতে এই বোবা ছেলেটাকে পাঠিয়েছে। এ যদি ধরা পড়ে তাহলে কিছুই বলতে পারবে না, কিন্তু একে চাপ দিলে পথ দেখিয়ে ওদের কাছে নিয়ে যেতে তো পারবে।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর ঘর কোথায়?'

ছেলেটা এবার যেন আশ্বস্ত হয়ে আঙুল দিয়ে জঙ্গলটা দেখিয়ে দিল। কী আশ্চর্য! শিবাজী আবার জঙ্গলের দিকে তাকাল। সেখানে মানুষের বসতি আছে অনুমান করা দুঃসাধ্য। ও আর দাঁড়াল না। ছেলেটির হাত ধরে বাংলোর দিকে হাঁটতে লাগল। ছেলেটি প্রথমে কিছুতেই সঙ্গে আসতে চাইছিল না, কিন্তু শিবাজী ওকে বাধ্য করল। একে পুলিসের হাতে তুলে দিয়ে ঘটনাটা জানাতে হবে। খানসামা হত্যার সঙ্গে এই ছেলেটি অবশ্য কোনো না কোনোভাবে যুক্ত আছে।

ওরা যখন চা-বাগান ছেড়ে রাস্তায় উঠে এল তখন প্রায় সন্ধ্যা। আর এই সময় শিবাজী ওদের দেখতে পেল। মিসেস সোম আর সেই মেয়েটি হেঁটে আসছেন। ভদ্রমহিলা আজ সাদা শাড়ি ব্লাউজ পরেছেন। খুব স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে ওঁকে। এদের দেখেই মেয়েটি থমকে দাঁড়াল। তারপর ছুটে এসে সে ছেলেটার হাত ধরল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার গোঙানি শুরু হল। মাথা দুলিয়ে সে যে কি বলতে চাইল তা শিবাজীর বোধগম্য হল না।

শিবাজী জিজ্ঞাসা করল, 'একে তুমি চেন?'

মেয়েটি বড় বড় চোখে ওকে দেখে মাথা নামিয়ে ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'তোমার কেউ হয়?'

'ভাই।'

এবার শিবাজী অবাক হয়ে গেল। এই মেয়েটি তাঁর জীবন বাঁচিয়েছিল আর ওর ভাই খুনীদের দূত হিসেবে কাজ করছে। এবার মিসেস সোম ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। ওঁর ঠোঁটে হাসি ঝুলছে, 'কী ব্যাপার, জঙ্গল থেকে ওর হাত ধরে বের হলেন কেন?'

শিবাজী গম্ভীর হয়ে গেল, 'কারণ আছে নিশ্চয়।'

এইসময় মেয়েটি তার ভাষায় বলল, 'ওকে ছেড়ে দিন বাবুজি, ও খুব বোকা।'

শিবাজী বলল, 'না ওকে ছাড়তে পারি না। আমি জানি ওকে ধরতে পারলেই আসল জায়গার খবর পাব।'

'না বাবুজি, ও কিছুই জানে না।'

'তুমি কী করে বুঝলে আমি কীসের কথা বলছি?'

'ও একটু আগে বলল, ওর কথা আমি বুঝতে পারি।'

'তাহলে ওর কাছ থেকে জেনে নাও ওকে কারা আমার বাংলোয় পাঠিয়েছিল। যারা পাঠিয়েছিল তারা কোথায় থাকে।' শিবাজী কড়া গলায় বলল।

মেয়েটি ওই একই প্রশ্ন করল ছেলেটাকে। কিন্তু সে গুম হয়ে রইল, একটা শব্দ বের হল না ওর মুখ থেকে। এবার মেয়েটি বলল, 'বাবুজি, ওকে আপনি আমার কাছে ছেড়ে দিন। ও ছাড়া আমার আর ভাই নেই। আমি কথা দিচ্ছি ও পালাবে না।'

শিবাজী এবার নরম হল। এই মেয়েটিকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ দেখছে না সে। চাপ দিয়ে যে কথা বের করা যায় না একটু ভালবাসা তা সম্ভব করতে পাররে। সে ছেলেটির হাত ছেড়ে দিল। মেয়েটি ওকে দাঁড়াতে বলে মিসেস সোমকে বলল, 'আমি ওকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসব?'

মিসেস সোম ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতে শিবাজী বলল, 'ওদিকে কিন্তু হাতি বেরিয়েছে।'

মেয়েটি তখন ছেলেটার হাত ধরেছে, 'আমরা অন্য রাস্তায় যাব!'

মিসেস সোম বললেন, 'তাড়াতাড়ি ফিরিস।'

ভাইকে নিয়ে মেয়েটি উল্টোপথে ফিরে গেল। এখন ছেলেটাকে খুব শান্ত দেখাচ্ছে। ওরা চোখের আড়ালে চলে যেতেই শিবাজী সচকিত হল। এই নির্জন বনভূমিতে মিসেস সোম তার দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখাচোখি হতেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছিল?'

'আমার খানসামা খুন হয়েছে।'

ভদ্রমহিলা চমকে উঠলেন, 'কেন?'

'খুন যারা করে তাদের একটা উদ্দেশ্য থাকে। এক্ষেত্রে সেটা আমার খাবারে বিষ মেশাবার চেষ্টা। বাকিটা এখনও জানি না। এই ছেলেটা বোধহয় জানতে যাচ্ছিল আমি মরেছি কিনা!'

'তার মানে স্পাই?'

'হয় তো।'

'কিন্তু কে করবে এসব?'

'যারা আপনার স্বামীকে লুকিয়ে রেখেছে। যাক, এদিকে কোথায় যাচ্ছিলেন?'

'এই রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে একটা বট গাছ আছে। ওখানটায় একবার যেতে হবে। আচ্ছা নমস্কার।' মিসেস সোম যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালেন।' শিবাজী ডানদিকে তাকিয়ে কোনো মোড় দেখতে পেল না। রাস্তাটা সোজা দিগন্তে মিলিয়েছে যেন। সে বলল, 'এই সন্ধেবেলায় ওদিকে আপনার একা একা যাওয়া ঠিক হচ্ছে না।'

মিসেস সোম দাঁড়ালেন, 'আমি তো একাই। তাছাড়া আমার কিছু হবে না।'

'এত ভরসা পাচ্ছেন কী করে?'

'যদি কিছু হতো তাহলে এতদিনে হয়ে যেত।'

'আমি আপনাকে সঙ্গ দিতে পারি।'

'না দরকার নেই।' ভদ্রমহিলা হাসলেন, 'তাতে আপনার মদ খাবার সময় নষ্ট হবে।'

শিবাজী ঠোঁট কামড়ালো, 'নাকি সীতেশ চ্যাটার্জির ভয়ে রাজি হচ্ছেন না?'

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা ঘুরে দাঁড়ালেন, 'কী বলতে চাইছেন?'

'আপনার এইভাবে ঘুরে বেড়ানোটা রহস্যজনক। তাছাড়া সীতেশের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে।'

'হ্যাঁ আছে, কারণ এইখানে উনিই একমাত্র বাঙালি যিনি আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছেন। ওঁর জন্যেই শ্রমিকরা আমার ক্ষতি করেনি। সেদিন আপনি বললেন উনি আপনার ভাই। কিন্তু—।'

'ও স্বীকার করেনি, এই তো?'

'না, তার পরে আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।'

হঠাৎ শিবাজীর মনে হল ভদ্রমহিলা সত্যি অসহায়। উনি জানেন না ঠিক কোন অবস্থায় তিনি রয়েছেন। শিবাজী বলল, মিসেস সোম আপনি যদি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেন তাহলে—।'

'সত্যি করে বলুন তো কেন এসেছেন আপনি?'

'আপনি তো জানেন। এই চা-বাগানের শান্তি ফিরিয়ে এনে শ্রমিকদের কাজ দেওয়া আর আপনার স্বামীকে খুঁজে বের করাই আমার দায়িত্ব।'

'কিন্তু ওঁকে খোঁজার কি চেষ্টা করেছেন?'

'মিসেস সোম, এইভাবে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালে কাউকে খুঁজে বের করা যাবে না। যারা আপনার স্বামীর ক্ষতি করেছে তারা আমাকেও সহ্য করছে না। আমি তাদের ধরতে পাবলেই আপনার স্বামীর খবর পাব।'

'বেশ, কিন্তু কতটা এগিয়েছেন আপনি?'

'অনেকটা।'

'না। আমি এখানকার গরিব শ্রমিকদের চিনেছি। ওর খুব সরল। আমাকে এর মধ্যেই ওরা ভালবেসেছে। এরা কোনো অন্যায় করতে পারে না।'

'আমি একমত। কিন্তু আজই আমি খবর পেয়েছি এখানকার য়ুনিয়নের নেতারা ওদের ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রেখেছে। য়ুনিয়ন বলতে এখানে কিছু নেই। অন্য চা-বাগানগুলোর য়ুনিয়নের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। এই ব্যাপারটাই প্রমাণ করে শ্রমিকদের ব্যবহার করছে।'

'আপনি সীতেশবাবু সম্পর্কে এ কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। কারণ ওকে আমার চেয়ে ভালো কেউ চেনে না। যাক, ওই বটগাছের কাছে যাচ্ছিলেন কি জন্যে?' এমন সাধারণ গলায় প্রশ্ন করল শিবাজী যে ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে বললেন, তিন নম্বর লাইনের এক বুড়ো বলল ওই বটগাছের নিচে নাকি একটা নতুন জুতো কদিন থেকে পড়ে থাকতে দেখেছে। একবার দেখে আসি।'

শিবাজীর খুব মায়া হল। সে বলল, 'চলুন। যেহেতু আমিও ওকে খুঁজছি তাই আপত্তি করবেন না দোহাই।'

ভদ্রমহিলা যেন মন স্থির করতে না পেরে রাজি হলেন। পাশাপাশি ওরা হেঁটে যাচ্ছিল। শিবাজীর মনে পড়ল তার এখন অনেক কাজ। গার্ড যদি খানসামাকে আবিষ্কার না করে থাকে তাহলে আজ রাত্রেই পুলিসকে খবরটা দিতে হবে। একটা রিপোর্ট পাঠাতে হবে সেনসাহেবকে। এবং আশ্চর্য, যে যেখানে ছিল সেইখানে আছে। এই মহিলার সঙ্গে সময় নষ্ট না করে তার ওই কাজগুলো অবিলম্বে করা দরকার। মনে মনে সে কি এই মহিলার সঙ্গ চাইছে? জুতোটা তো অন্য কারও হতে পারে। সব বুঝেও সে ভদ্রমহিলাকে ছেড়ে যেতে পারছে না।

বটগাছটা অবধি ওরা নিঃশব্দে হেঁটে এল। শিবাজী লক্ষ্য করছিল অদ্ভুত লাবণ্য আছে মহিলার। সেই সঙ্গে এক ধরনের তেজ। বটগাছটার নিচে এসে ওরা খুঁজতে শুরু করল। এখন যে ছায়া তাতে ভাল করে কিছু ঠাওর করা শক্ত। ওরা দুজনে দুদিকে ছিল এবং প্রথম শিবাজীর চোখেই জুতোটা পড়ল। আধপুরনো অ্যাম্বাসাডারের এক পাটি পড়ে আছে। গলা তুলে মিসেস সোমকে ডাকল সে, 'একটু এদিকে আসুন।'

'পেয়েছেন?' মিসেস সোমের গলা কেঁপে উঠল।

'একটা জুতো দেখছি।'

'অ্যাম্বাসাডার?'

এবার নিজেকে খুব দুর্বল মনে হল শিবাজীর। এখন তো কথা ফেরাবার কোনো উপায় নেই। ততক্ষণে ভদ্রমহিলা এসে গেছেন। দ্রুত হাতে ঘাসের ওপর থেকে জুতোটাকে তুলে নিয়ে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। শিবাজী লক্ষ্য করল, ব্রাউন রঙের অ্যাম্বাসাডারটার ওপর ধুলো পড়েছে কিন্তু চটচটে কিছু শুকিয়ে রয়েছে বোঝা যাচ্ছে। সে নিজের গলা শক্ত করে জিজ্ঞাসা করল, 'এইটে কি—!'

নীরবে মাথা নাড়লেন মহিলা। হ্যাঁ। তারপর শূন্য চোখে সামনের জঙ্গলের দিকে তাকালেন। শিবাজী ভেবে পাচ্ছিল না। এইরকম জায়গায় মিস্টার সোমের জুতো কী করে আসবে? যেখান থেকে তিনি উধাও হয়েছেন সেখান থেকে এই জায়গার দূরত্ব তো অনেকখানি।

মিসেস সোম জুতো হাতে নিয়ে সেইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। শিবাজী নিচু গলায় বলল, 'চলুন, রাত হয়ে যাচ্ছে।'

আর সঙ্গে সঙ্গে ডুকরে কেঁদে উঠলেন ভদ্রমহিলা। শিবাজী দেখল কাঁদতে কাঁদতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন উনি। কান্নার শব্দ ক্রমশ বাড়তে লাগল। এই নির্জন অন্ধকার মতো বনভূমিতে সেই আর্তস্বর ছড়িয়ে যাচ্ছিল। গতকালের আগে ওঠা চাঁদ যেন আজ এই কান্নার জন্যই অপেক্ষা করছিল, এবার টুক করে জঙ্গলের মাথায় উঠে এসে সহাস্যে শোক দেখতে লাগল। শিবাজী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ তার মনে হল এই মহিলার কান্না স্বামীকে হারানোর আশংকার চাইতে অনেক বেশি নিজের হেরে যাওয়ার সম্ভাবনার জন্যে।

খানিকক্ষণ চলে যেতে দিয়ে সে বলল, 'এবার উঠুন।'

'ও নেই, আর নেই। মাগো, আমি কী করব।' ডুকরে উঠলেন মহিলা আকাশের দিকে মুখ তুলে। শিবাজী দেখল ওঁর গাল ভেসে যাচ্ছে জলে; ঠোঁট কাঁপছে থরথরিয়ে। শিবাজী সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল, 'আপনি হয়তো ভুল করছেন, এই জুতো ওঁর নাও হতে পারে। তাছাড়া জুতো দেখা মানেই যে পরিণতি ওই হবে একথা ভাবছেন কেন।'

মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে মহিলা পাগলের মতো মাথা নাড়লেন, 'না, এছাড়া হতে পারে না। আমি ওর জুতো চিনেছি। দেখুন, এখানে রক্ত পড়েছিল, ও ভগবান। ওরা আমাকে মিথ্যে স্তোক দিয়েছে। দোহাই আপনি আর মিথ্যে বলবেন না।' আবার কান্নায় জড়িয়ে গেল ওঁর গলা।

শিবাজী প্রথমে ইতস্তত করছিল তারপর আলতো করে মিসেস সোমের মাথা স্পর্শ করল, 'উঠুন।' ওর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যা অমান্য করতে পারলেন না ভদ্রমহিলা। খুব ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ওঁর হাতে তখনও জুতোর পাটিটি রয়েছে। তারপর নিজের মনেই বললেন, 'আমি এখন কী করব।'

শিবাজী খানিক অপেক্ষা করল। ফিনফিনে জ্যোৎস্নার জাল ছুড়ে দিয়েছে চাঁদ। সে বলল, 'শক্ত হতে হবে আপনাকে। এখনও বলছি এটা কোনো প্রমাণ নয়। তবে চূড়ান্ত ক্ষতির কথা ভেবে রাখলে—।'

হঠাৎ ওর দিকে তাকালেন ভদ্রমহিলা, 'সীতেশবাবু আপনার ভাই?'

'হ্যাঁ।'

'উনি আমাকে বলেছিলেন মনীশকে যারা লুকিয়ে রেখেছে তারা আর যাই হোক মেরে ফেলবে না। কিন্তু এই জুতোটা—'

'মিসেস সোম, আমি সীতেশকে বিশ্বাস করি না।'

মাথা নাড়লেন ভদ্রমহিলা। কী বুঝলেন তিনি শিবাজী জানল না। তারপর হঠাৎ শক্ত গলায় বললেন, 'আমার নাম লাবণ্য।'

হকচকিয়ে গেল শিবাজী। এই পরিস্থিতিতে সে এই রকম সংলাপ আশা করেনি। ভদ্রমহিলা

কি মিসেস সোম সম্বোধনটির মধ্যে এই মুহূর্তে একটা যন্ত্রণা অনুভব করছেন? সে বলল, 'চলুন, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

নিঃশব্দে ভদ্রমহিলা ওর পাশাপাশি হেঁটে এলেন। মাথা বুকের ওপর ভেঙে পড়েছে। বটগাছ ছেড়ে আসবার আগে উনি জুতোর পাটিটা মাটিতে রেখে এসেছেন। শিবাজীর মনে হচ্ছিল এই অল্প সময়ে ভদ্রমহিলা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছেন।

লাবণ্য সোমকে ওঁর বাংলোর পেছনের দরজায় পৌঁছে দিয়ে নিজের বাংলোর দিকে পা বাড়াতে গিয়ে শিবাজী বুঝল ওখানে প্রচুর লোক জমা হয়েছে। সে জঙ্গল পেরিয়ে উঠোনে আসতেই দেখতে পেল পুলিসের লোকজন খানসামার মৃতদেহ বের করেছে বাইরে।

ওকে দেখে সামন্তবাবু ছুটে এলেন, 'স্যার, আমরা ভীষণ চিন্তা করছিলাম আপনাকে নিয়ে। কোথায় গিয়েছিলেন?'

শিবাজী এ কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'ডেডবডি কে দেখতে পেয়েছে প্রথমে?'

'অদ্ভুত ব্যাপার। একটু আগে কেউ থানায় খবর দিয়েছিল এখানে একটা ডেডবডি পড়ে আছে। খবর দিয়েই সে হাওয়া হয়েছে। দারোগাবাবু আমায় নিয়ে এখানে এসে সার্চ করতেই ওকে পাওয়া গেল।'

কথাগুলো শুনে শিবাজী ঠোঁট কামড়াল। চমৎকার কাজ। ওরা তাহলে সব খবর রাখে। এই সময় পুলিস অফিসার এগিয়ে এলেন, 'নমস্কার। আপনাকে খুঁজছিলাম আমি।'

'বলুন।'

'আপনার এখানে একজন খানসামা মার্ডারড হয়েছে।'

'জানি।'

'জানেন কিন্তু আমাকে খবর দেননি কেন?'

'উপায় ছিল না। আমি অপরাধীকে ধরতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু— । চলুন, আপনাকে সব কথা বলছি। ওখানে দুটো কাক মরে পড়ে আছে। খাবারের প্লেটটা—।' শিবাজী দূরে আঙুল বাড়াতে সবাই দেখল জ্যোৎস্নায় কাক দুটো ঘুমিয়ে আছে কিন্তু তাদের সঙ্গী বেড়েছে। একটা বেড়াল চিত হয়ে রয়েছে পাশে।

পুলিস অফিসার বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ! কী ব্যাপার?'

'আসুন বলছি।'

বিশদ শুনে পুলিস অফিসার বললেন, 'আপনি কি কাউকে সন্দেহ করছেন? আমার কাছে স্বচ্ছন্দে নাম বলতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করার জন্যে ওপর থেকে নির্দেশ এসেছে।'

'যারা মিস্টার সোমকে খুন করেছে তারাই এর জন্যে দায়ী।'

শিবাজীর কথাশুনে ভদ্রলোক চমকে উঠলেন, 'আপনি কি করে বুঝলেন মিস্টার সোমকে খুন করা হয়েছে?'

'ওঁর একপাটি জুতো দেখে এলাম পেছনের রাস্তার শেষে যে বটগাছ রয়েছে তার তলায়। রক্তমাখা। তাছাড়া যারা আমাকে মারতে চায় তারা ওকে যত্ন করবে না, এটা তো সরল সত্য। আপনি কোনো ক্লু পেলেন?'

'না। সেইটেই আশ্চর্য—।'

শিবাজী লোকটির মুখের দিকে তাকাল। যদিও এখন রাত তবু পেছনের জঙ্গলের পথে রক্ত মোছা পাতা খুঁজে পাওয়া কি খুব কষ্টকর।

কাল সকালে আবার আসবেন জানিয়ে ডেডবডি নিয়ে চলে গেলেন পুলিস অফিসার। আর

তখনই শিবাজীর মনে হল আজ সারাটা দিন তার খাওয়া হয়নি। এক কাপ চা হলেও চলত। সে ঘরে ঢুকে বোতলটা খুলে গলায় ঢালতে গিয়ে থেমে গেল। কে জানে, ওর অনুপস্থিতিতে এর মধ্যে কিছু মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা। না, ঝুঁকি নিয়ে কোনো লাভ নেই। খুব খারাপ লাগছিল তবু বোতলটা কমোডে উপুড় করে দিল সে।

বারান্দায় পায়ের শব্দ হতেই শিবাজী দেখল সামন্তবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন, 'স্যার।'

'বলুন।'

'ব্যাপারটা খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না।' ভদ্রলোকের গলা অত্যন্ত করুণ শোনালো। সে জিজ্ঞাসা করল, 'অসুবিধেটা কী?'

'ওই বুড়ো খানসামা বড় ভাল লোক ছিল। তাকে পর্যন্ত মেরে ফেলল।'

'হ্যাঁ, আমাকে যারা সাহায্য করছে তারা—! আপনি ভেবে দেখুন।'

'আমার আর ভাববার কী আছে। আপনি আমার মালিক, আপনাকে সাহায্য করাই আমার কর্তব্য। কিন্তু আমি অন্য কথা ভাবছি। এই রকম পরিস্থিতিতে আপনার এখানে রাত্রে থাকাটা উচিত হবে কিনা। তাছাড়া খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার আছে।'

'তাহলে কোথায় যাওয়া যায়?'

'একটা কথা বলব স্যার। আপনি আজ রাত্রে ক্লাবে চলে যান।'

'ক্লাবে?'

'হ্যাঁ। মাইল সাতেক দূরে ম্যানেজারদের ক্লাব আছে। ওখানে একটা গেস্ট রুমও রয়েছে।'

শিবাজী মনস্থির করল, 'ঠিক আছে। আপনি সব বন্ধটন্ধ করে গাড়িতে অপেক্ষা করুন। গার্ডকে ছেড়ে দিন আজ রাত্রের জন্যে। আমি পাশের বাংলো থেকে ঘুরে আসছি।' কথাটা বলে সে গলা পাল্টালো, সামন্তবাবু, আপনি আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন, একজন মহিলা যে একা একা এখানে রয়েছেন তাঁর কথা চিন্তা করছে না?'

'ওঁর কোনো ভয় নেই আর। হলে এতদিনে হয়ে যেত।'

শিবাজী মাথা নেড়ে ম্লান হাসল। তারপর সামন্তবাবুকে গুছিয়ে নেবার দায়িত্ব দিয়ে বাংলো থেকে বেরিয়ে এল। ও ইচ্ছে করেই পেছনের গেট দিয়ে ঢুকল। একদম নিস্তব্ধ চারধার। বাংলোর গাছপালাগুলো পর্যন্ত স্থির। সে নিঃশব্দে পেছনের সিঁড়িতে অপেক্ষা করল। সেই মেয়েটিকে তার দরকার। সে কি ফিরে এসেছে? সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল শিবাজী। বারান্দা ডিঙিয়ে দরজায় নক করতেই সেটা হাট করে খুলে গেল। শিবাজী দেখল ঘরে আলো জ্বলছে না। বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছেন লাবণ্য সোম। এর ভঙ্গি দেখে বুক ধক্ করে উঠেছিল শিবাজীর। কিন্তু ঘরে পা দিয়ে বুঝল, না সন্দেহ ঠিক নয়। সে মৃদু স্বরে ডাকল, 'মিসেস সোম।' তারপরেই সংশোধন করল, 'লাবণ্যদেবী!'

খুব ধীরে ধীরে বালিশ থেকে মুখ তুললেন লাবণ্য।

'আপনার দরজা খোলা ছিল?'

লাবণ্য জবাব দিলেন না। বিছানায় উঠে বসে দু' হাতে মুখ ঢাকলেন, 'আপনার কোম্পানি নিশ্চিন্ত হল। আমি কালই চলে যাব।'

শিবাজী বলল, 'আমি ওকথা বলতে আসিনি।'

'কিন্তু আমাকে তো যেতে হবে। কোথায় যাব জানি না।'

'আপনার বাবা-মা—।'

'কেউ নেই। মামার বাড়িতে ছিলাম। সেখানে ফিরে যাওয়া—। মনীশকে বিয়ে করে আমি চাকরিটা পর্যন্ত ছেড়ে এসেছি। না, তবু আপনাদের আর বিরক্ত করব না।' মুখ থেকে হাত নামিয়ে

তাকালেন লাবণ্য। শিবাজী দেখল ভদ্রমহিলার মুখ ফুলে গেছে, অঝোরে কেঁদেছেন বোঝা যায়।

শিবাজী প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইল, 'আপনার কাজের মেয়েটি ফিরেছে?'

'জানি না।' অন্যমনস্ক গলায় বললেন লাবণ্য।

'ওকে আমার দরকার ছিল।' শিবাজী ঘুরে দাঁড়াল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'লাবণ্যদেবী, শোক তো রয়েছেই জীবনে। যে সামলাতে পারে সে-ই বেঁচে থাকে। আমাকে যারা মদ খেতে দ্যাখে তারা আমার শোকের কথা কতটা জানে? আর আশ্চর্য ব্যাপার, এখানে আসার পর মদ খাওয়ার কথা খেয়ালই থাকছে না।'

'কেন?'

'জানি না। হয়তো কাজের চাপ, যা কিনা মদের বিকল্প। আমি খুব গরিব মায়ের ছেলে ছিলাম। সেই মা তিলে তিলে আমাকে বড় করলেন। চা-বাগানের ম্যানেজারির চাকরির জন্যে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে হয়েছিল আমাকে। সে অনেক গল্প। যে ভাইকে আপনি দেখছেন সে ছাড়া আমার কেউ নেই। স্কুল থেকে রাজনীতি করত। উগ্র রাজনীতি। আমি ম্যানেজারি করতাম বলে ঘেন্না করত। লুকিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে বাধা দিত। অথচ ওর জন্যেই মাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। ও এবং ওর বন্ধুরা আমাকে মারতে চেয়েছিল কিন্তু মারা গেলেন মা। এ আমি ভুলতে পারব না কোনোদিন। কিন্তু তবু তো ভুলেছি আমি। মদ খেয়েছি, সাময়িক ভুলেছি আবার নেশা কেটে গেলে যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছি। তখন মদটা ছাড়িনি। কিন্তু তাতেও তো কিছু হল না। সব ক্ষমা করতে পারতাম যদি জানতাম তার আদর্শটা সৎ। যে এখন স্বার্থের পা চাটা কুকুর সে কেন তখন অমন কাজ করেছিল? এ ক্ষমা করা যায় না।' শিবাজীর গলায় নিজের অজান্তেই কাঁপুনি এসেছিল। হঠাৎ তার মনে হল এসব কথা এখানে বলছে কেন? বোধহয় নিজেকে আড়াল করবার জন্যেই লাবণ্যের বিস্মিত চোখের সামনে থেকে সরে এল সে। যাওয়ার আগে বলল, 'দরজাটা বন্ধ করে দিন।'

সামন্তবাবু গাড়িতে বসেছিলেন। শিবাজী দেখল তার স্যুটকেশটা পেছনের সিটে রয়েছে। কোনো কথা না বলে সে গাড়িটা চালু করল। হেড লাইটের তীব্র আলো চা-বাগানকে ছুরির মত কাটছিল। বাবুদের কোয়ার্টার্সের সামনে এসে সে ঘড়ি দেখল, পৌনে আটটা। সামন্তবাবু নেমে দাঁড়াতেই পেছনের কোয়ার্টার্সের দরজা খুলে গেল। সামন্তবাবুর স্ত্রী এবং সন্তানেরা এসে দাঁড়িয়েছেন। মেয়ে ডাকল, 'বাবা!' সামন্তবাবু ওদের কাছে গিয়ে স্ত্রীর হাত থেকে একটা খাম নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কখন দিয়ে গেছে?'

'একটু আগে।'

সামন্তবাবু খামটা হাতে নিয়ে ফিরে এলেন, 'স্যার ওরা এটা দিয়ে গেছে।'

শিবাজী জানে ওতে কী আছে। গাড়ির দরজা খুলে সে সোজা চলে এল সামন্তবাবুর স্ত্রীর সামনে, 'আমাকে এক কাপ চা খাওয়ান তো!'

ভদ্রমহিলা এই প্রস্তাবে রীতিমত হতভম্ব হয়ে স্বামীর দিকে তাকালেন।

সামন্তবাবু তোতলালেন, 'স্যার, আমার বাড়িতে চা খাবেন?'

'কেন!' আপনার বাড়িতে চা হয় না?'

'না না তা বলছি না—।'

'শুনুন সারাদিন কিছু খাইনি। মাথা ধরে যাচ্ছে। আর কথা বাড়াবেন না।'

সামন্তবাবুর বাইরের ঘরে বেশ পরম তৃপ্তির সঙ্গে রুটি তরকারি আর চা খেল শিবাজী। অনেকদিন বাদে এরকম সাধারণ ঘরোয়া রান্নার স্বাদ পেল সে। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সামন্তবাবুর স্ত্রী মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিলেন খাওয়া। নরম গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর দুটো রুটি দেব?'

'না।' শিবাজী হাসল, 'জানি না কার ভাগ কমিয়ে দিলাম। দিন, চিঠিটা দেখি এবার।' সামন্তবাবু খামটা ধরেই ছিলেন। এবার এগিয়ে দিতে শিবাজী সেটাকে খুলল, 'কোম্পানির তরফ থেকে আজ সকালের আলোচনায় যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তা অবাস্তব এবং শোষণমূলক প্রমাণিত হওয়ায় প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে!'

শিবাজী চিঠিটা ভাঁজ করে আচমকা প্রশ্ন করল, 'সামন্তবাবু, এঁদের আপনি চেনেন?'

'য়ুনিয়নের নেতাদের?'

'হ্যাঁ। তবে লাভবার্ডে কোনো স্বীকৃত য়ুনিয়ন নেই।'

'সে রকম কী যেন শুনছিলাম। বাবুরামজির আমলে ওদের প্রায়ই দেখতাম।'

'কে কে আছে? সই থেকে নাম বোঝা যাচ্ছে না।'

'সীতেশ চ্যাটার্জি, রবি দে, সোমরা ওরাঁও আর হীরা মান্ডি।'

'কোথায় থাকে ওরা?'

তিন নম্বর লাইনে একটা ঘরে ওদের অফিস ছিল। সোমসাহেবের ঘটনার পর ওটা বন্ধ হয়ে রয়েছে।'

'আপনি কোনো চাপে নেই তো।' সন্দেহ বোঝাল শিবাজী।

এবার স্ত্রীর দিকে তাকালেন ভদ্রলোক। মুখখানা খুব করুণ হয়ে উঠেছে। শিবাজী দেখল সামন্তবাবুর স্ত্রী ঘাড় নেড়ে ইশারা করছেন কিছু বলতে।

সামন্তবাবু বললেন, 'স্যার, অ্যাদ্দিন ছিলাম না ওরা আমাকে কেয়ার করত না। কিন্তু আপনার সঙ্গে যোগাযোগের পর নানা রকম শাসানি দেখাচ্ছে। আজ সকালে আমার বাড়ির দরজায় এক টিন মল ঢেলে দিয়ে গেছে কেউ। তারপর খানসামার ঘটনার পর আমি—।' কি করে শেষ করবেন বুঝতে পারলেন না সামন্তবাবু, ওঁর গলার স্বর কাঁপতে লাগল।

শিবাজী উঠল, 'আমি বুঝতে পারছি। দেখি কী করতে পারি।'

প্লান্টার্স ক্লাবের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল শিবাজী। এখন বেশ রাত। লোকালয় থেকে অনেকটা দূরে সাহেবদের আমলে বোধহয় এই ক্লাব তৈরি করা হয়েছিল। জেনারেটর দিয়ে আলো জ্বালা হয়েছে। ক্লাবের সামনে গোটা তিনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থেকে নেমে সে সোজা চলে এল লন পেরিয়ে। সামনেই একজন দারোয়ান ছিল দাঁড়িয়ে; লোকটা সন্দিগ্ধ চোখে তাকে দেখতেই সে সেক্রেটারির খোঁজ করল।

মিনিট দশেক বাদে এক গ্লাস হুইস্কি নিয়ে বিরাট বারান্দায় বসেছিল শিবাজী। সামান্য দূরে তিনজোড়া মানুষ খুব উচ্চস্বরে গল্প করছেন। সেক্রেটারি ভদ্রলোক ওকে দেখে বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'আমি শুনেছি আপনি লাভবার্ডে এসেছেন কিন্তু ওখানে কি কাজ শুরু করা সম্ভব?'

'পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়।'

'আপনি এর আগে কোন বাগানে ছিলেন?'

'গোল্ডেন টি থেকে চাকরি ছেড়েছিলাম।'

'কেন?'

'প্রতি মুহূর্তে অপমানিত বোধ করেছিলাম তাই।'

ভদ্রলোকের মুখের চেহারা যেন বদলে গেল এক মুহূর্তে। যদিও এখানকার গেস্ট রুম পেতে কোনো অসুবিধে হল না কিন্তু শিবাজী জানিয়ে দিয়েছিল সে যখন এখনও সদস্য নয় তাই এ বাবদ যা খরচ লাগবে তা সে আলাদা করে দেবে। হুইস্কি খেতে খেতে এখন সে ব্যাপারটা ঝালিয়ে নিচ্ছিল। মনীশ সোম নিহত হয়েছেন এটা স্পষ্ট। লাভবার্ডের তথাকথিত য়ুনিয়নের নেতারা

কি কারণে অন্য চা-বাগান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ রকম স্বৈরাচার করছে এটাই বোঝা দায়। যারা একটা খানসামাকে খুন করতে পারে তাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা সুস্থ নয়। এরা আসছে জিপ চালিয়ে, সমস্ত খবরাখবর রাখছে অথচ সাধারণ শ্রমিকদের বেঁচে থাকার জন্যে কোনো ব্যবস্থা করছে না। বোঝা যাচ্ছে লাভবার্ডের মানুষ এদের ভয় করে। ভয় করার যথেষ্ট কারণ এরা দেখেছে। শিবাজীর মনে হচ্ছে এখানে যারা নেতা বলে পরিচিত তারা খুব সংঘবদ্ধ গুন্ডা ছাড়া কিছু নয়।

আর সেই কারণেই তার খটকা লাগছে। সীতেশের এই পরিণতি হল। মনে আছে, সে যখন টোকনাই থেকে ট্রেনিং নিয়ে চা-বাগানের চাকরি পেল তখন সীতেশ বছর পনেরোর কিশোর। বিদেশি কোম্পানির বন্ডে সই করার পর ওর সঙ্গে আর দেখা হত না। মা চাকরি করতেন প্রাইমারি স্কুলে, সীতেশ পড়ত স্কুলে। চাকরির শর্ত মেনে সে মায়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে দেখা করতে পারত না। বারংবার তখন অনুরোধ করেছিল মা যেন প্রাইমারি স্কুলের সামান্য কটা টাকা ছেড়ে দিয়ে পাকাপাকি তার কাছে চলে আসেন। কিন্তু ভদ্রমহিলা কিছুতেই রাজি হননি। স্বামীকে হারানোর পর যে চাকরি তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে, যার জন্যে তিনি ছেলেদের মানুষ করছেন তা রিটায়ার্ড হবার আগে ছাড়তে পারবেন না। কিন্তু তিনি শিবাজীর কষ্ট বুঝতেন। প্রতি শনিবার মধ্যরাত্রে সে যখন দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেত তখন তিনি তার অপেক্ষায় জেগে থাকতেন। পাশের ঘরে ঘুমাতো সতীশ। ওর সঙ্গে কথা হতো না, মাও চাইতেন না ও জানুক। যদি কারো কাছে মুখ ফসকে বলে ফেলে তাহলে শিবাজীর চাকরি থাকবে না। খুব সতর্কতার সঙ্গে তখন শিবাজীকে আসতে হত মায়ের কাছে। কাকপক্ষীতেও টের পেত না। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার কষ্ট মায়ের কাছে পৌঁছেই দূর হয়ে যেত। আবার ভোরের মধ্যে ফিরতে হতো চা-বাগানে। এর কিছুদিন বাদেই মা অনুযোগ করতেন সীতেশের পড়াশোনায় মন নেই। প্রায়ই বাইরে বাইরে ঘোরে, জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেয় না। মাঝে মাঝে রাত্রেও বাড়ি ফেরা বন্ধ করল সীতেশ। আর তারপরেই একদিন মধ্যরাত্রে ওরা তার পথ আটকাল। সীতেশ আর চারটে ছেলে। সীতেশের হাত খালি কিন্তু অন্যদের ছিল না। সীতেশ স্পষ্ট বলল, দিনের আলোয় যদি সে মায়ের সঙ্গে দেখা না করতে পারে তাহলে এখানে আসার দরকার নেই। বুর্জোয়া কোম্পানির চাকর হয়েই যেন সে থাকে। ভবিষ্যতে যদি চোরের মতো সে আসে তাহলে শিবাজী নিজের দায়িত্বে আসবে। সেখান থেকেই ফিরে যেতে তাকে বাধ্য করেছিল ওরা। শিবাজী হতবাক হয়ে গিয়েছিল। মায়ের চিঠিতে জেনেছিল সীতেশ উগ্র রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছে। পুলিস ওর খোঁজ করছে। এর কিছুদিন পরে হঠাৎ মায়ের চিঠি আসা বন্ধ হল। শিবাজী খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। শেষে মরিয়া হয়ে এক রাত্রে ছুটে গিয়েছিল মায়ের কাছে। অন্ধকারে গাড়ি রেখে সে যখন নিঃশব্দে বাড়িতে ঢুকছে তখনই গলা পেয়েছিল সে। খুব শীর্ণ। জানান দিতে তিনি বলেছিলেন, 'ওরে তুই ফিরে যা, এখন আসিস না।'

সেই মুহূর্তে সে ভেবেছিল এই চাকরি ছেড়ে দেবে। সেটা বলতেই সে আবার মাকে ডেকেছিল। মা দরজা খুলে দাঁড়াতেই শিবাজীর মনে হয়েছিল কেউ যেন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কি বোধ সেই মুহূর্তে কাজ করেছিল সে জানে না কিন্তু বিপদ বুঝতে পেরে আচমকা এক পাশে লাফিয়ে যেতেই পাড়া কাঁপিয়ে বোমাটা ফেটেছিল। শিবাজী দেখেছিল সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই বোমা ফাটল। তার টুকরোগুলো ছিটকে গেল চারধারে। আর, আর মায়ের দরজায় দাঁড়ানো শরীরটা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে ঢলে পড়ল। শিবাজী এত নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল প্রথমে কী করবে বুঝতে পারেনি। সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছিল একটা শরীর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সেটা কার শরীর তা দেখতে পায়নি সে। আর তখনই আশেপাশে চিৎকার চেঁচামেচি উঠল। শিবাজী মায়ের কাছে ছুটে গিয়েছিল। চেতনা ছিল তখনও তাঁর, ছেলেকে দেখে বলেছিলেন,

'তুই চলে যা, আমি ঠিক আছি, তুই যা।'

এখন মাঝে মাঝে নিজের কাছেই অবাক লাগে। কেন সে সেদিন পাগলের মত দৌড়ে বেরিয়ে এসেছিল? কেন কেউ দেখার আগেই গাড়িতে উঠে বসেছিল? সে কি শুধু ধরা পড়ে চাকরি হারাবার ভয়ে? নাকি আবার আক্রান্ত হবার আশঙ্কায়? ওরা তাকেই হত্যা করতে চেয়েছিল এটা স্পষ্ট।

পুলিস মায়ের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করে বিফল হয়েছে। বোমার আঘাতে মা নিহত হননি। কিন্তু সেই যে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন আর ওঠেননি। শিবাজী কিছুদিন ছুটি নিয়ে চুপচাপ বসেছিল। সীতেশ তাকে খুন করতে এসে মায়ের মৃত্যুর কারণ হল। চোখে না দেখলেই কোনো সত্য মিথ্যে হয়ে যায় না। চাকরি ছেড়ে দেবার ইচ্ছেটা একটু একটু করে চলে গিয়েছিল তখন। যার জন্যে চাকরি ছেড়ে দেবে ভেবেছিল সে-ই যখন নেই তখন আর কী দরকার! চা-বাগানের কাজে আরো বেশি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল। গোল্ডেন টি-এর শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল হয়ে গেল তার। কর্তৃপক্ষ সেটা ভাল চোখে দেখতে চাইলেন না। তাকে নানা রকম নিষেধ করা হতে লাগল। কিন্তু যেহেতু তার মাধ্যমে শ্রমিক সমস্যার নানান সমাধান হয় তাই চাকরি যাচ্ছিল না। আর সেই সময় এল সীতেশ। না, তার কাছে নয়। চা-বাগানে শ্রমিক য়ুনিয়ন করতে এসে মালিকদের প্রিয়পাত্র হয়ে গেল। উগ্রপন্থী নয় আর কিন্তু তার কি চরিত্র শিবাজী বুঝতে পারেনি। সেই সময় একটা ধর্মঘটের ব্যাপারে শ্রমিকরা সীতেশের ওপর এত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল যে সে বাধ্য হয়েছিল গোল্ডেন টি ছেড়ে যেতে। আর তখন সেই ধর্মঘটের বিরুদ্ধে কোম্পানিকে সাহায্য করবে না ভেবে যখন শিবাজী স্থির করেছে তখন কোম্পানি তার কাছে কৈফিয়ত চাইল। সীতেশ নাকি তাদের জানিয়ে গেছে সেই শ্রমিকদের উত্তেজিত করছে! এক কথায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল সে। না, আর কোনো দাসত্ব নয়। কিন্তু সীতেশের মুখটা মনে পড়লেই বুক জ্বলে যেত। সীতেশ লাভবার্ড চা-বাগানে গিয়েছে এটা সে শুনেছিল। তারপর নিজেকে একটু একটু করে গুটিয়ে নিয়েছিল সে। অথচ, বুকের ভেতর চিতাটা গনগনে হয়েই থাকত।

সেই সীতেশ এখানে। সেই রাজনীতি চাওয়া উগ্রপন্থী ছেলে এখন স্রেফ একটা গুন্ডাদের নেতা হয়ে রয়েছে। এই পরিণতি কী করে হল? অবশ্য সীতেশ নেতা কিনা সে বিষয়ে তার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু এবার সে ছাড়বে না। লাভবার্ডের সাধারণ মানুষগুলোকে সে বাঁচাবেই! আর তাহলেই মাকে হত্যা করার বদলা নেওয়া হবে।

শিবাজী উঠে দাঁড়াল। সামনে এখন কেউ নেই। যে তিন জোড়া মানুষ ছিল তারা কখন উঠে গেছে। শিবাজী দেখল তাকে কেউ লক্ষ্য করছে না। চুপচাপ নেমে এল সে লনে। তারপরে নিঃশব্দে গাড়িতে গিয়ে উঠল। তারপর সোজা চলল লাভবার্ডের দিকে। সে যে আজ রাত্রে বাগান ছেড়ে এসেছে এই খবর ওরা পাবেই। সামন্তবাবুকে চাপ দিলে বা এখানে কোনো সূত্র থাকলে বাকি খবরটা জানতে ওদের অসুবিধে হবে না। অতএব এখানে রাত্রে থাকাটা নিরাপদ নয়।

দ্বিতীয়ত, শিবাজীর মন বলছিল আজকের রাত্রে একটা কিছু ঘটবে। ওই খানসামাটাকে খুন করে ওরা চুপচাপ বসে থাকবে না। তৃতীয়ত, মিসেস সোমের কাজের মেয়েটি ভাই এর মুখ থেকে কী খবর বের করে আনে সেটা জানা দরকার। দেরি হলে হয়তো খবরটা কাজে লাগবে না।

একটা ব্যাপারে সে জোর পাচ্ছে। লাভবার্ডে যা ঘটছে তা কোনো ট্রেড-য়ুনিয়ন আন্দোলন নয়, স্রেফ কিছু লোকের স্বার্থসিদ্ধির ভাঁওতা। এর বিরুদ্ধে স্বচ্ছন্দে লড়া যায়।

লাভবার্ডে সে যখন এসে পৌঁছাল তখন ঘড়িতে প্রায় এগারোটা। চাঁদ আছে কিন্তু তেমন

ধার নেই। জ্যোৎস্নাকে এই সময় ভৌতিক মনে হয়। বাগানে ঢোকার মুখে একটা খড়ের চালার আড়ালে গাড়িটাকে ঢুকিয়ে দিল শিবাজী। না, সে সামনের দিকে যাবে না। বড় রাস্তা ছেড়ে চা-বাগানের ফালিপথে ঢুকে পড়ল সে। মার্জনার অভাবে প্রচুর আগাছা জমেছে, হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু এই পথে বাংলোয় তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যাবে এবং কারো নজরে পড়বে না।

সেই নদীর গায়ে এসে বিরত হল শিবাজী। সাঁকোটা খানিক দূরে, সেখানে গেলে এইভাবে লুকিয়ে আসার কোনও মানে হয় না। সে নদীর ধার দিয়ে আর একটু উজানে ফিরে এল। আগাছায় জায়গাটা ঢেকে আছে। আর তারপরেই সে দেখতে পেল নদীর ওপর লোহার বিম পেতে তা থেকে জাল পেতে দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবত আবর্জনা আটকাতে যাতে ওগুলো ফ্যাক্টরিতে না ঢুকে পড়ে। নেটটা এখন শতচ্ছিন্ন কিন্তু লোহার বিম দুটো রয়েছে। একটু ঝুঁকি নিয়ে ওর ওপর দিয়ে শিবাজী ছোট্ট নদীটা পার হয়ে এল। উজানে আসায় সে বাংলো দুটো ছাড়িয়ে চলে এসেছে। এখন অন্ধকারগোলা পথে আবার ফিরে চলল।

মিসেস সোমের বাংলোটা নিস্তব্ধ। এক ফোঁটা আলো নেই কোথাও। সতর্ক পায়ে লন পেরিয়ে সে ভেতরে ঢুকল। কোথাও কোনো গাছে আচমকা ঘুম ভাঙা কাঠঠোকরা চেঁচিয়ে উঠল। শিবাজী বাংলোর পেছনে চলে এল। কোনো মানুষের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ নজর রেখে সে পেছনের পথে তার বাংলোয় চলে এল। আচমকা দেখতেই মনে হল বাংলোটা যেন হানাবাড়ি। মিনিট দশেক নিজেকে আড়ালে রেখে হতাশ হল সে। না কোনো ঘটনাই ঘটল না। ওরা বোধহয় আজ রাত্রে তার সন্ধানে আসবে না।

আর তখনই পায়ের শব্দ পেল শিবাজী। কেউ যেন ছুটে আসছে। গাছের গায়ে নিজেকে মিশিয়ে সে অপেক্ষা করল। জঙ্গলের পথ দিয়ে একটু বাদেই ছুটে এল মেয়েটি। প্রচন্ড হাঁপাচ্ছে। মেয়েটির পরনে সায়া এবং ব্লাউজ ছাড়া কিছু নেই, দেখলেই বোঝা যায় বেশ বিধ্বস্ত। মেয়েটি সামান্য দম নিয়ে সোজা বাথরুমের সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজায় আঘাত করতে লাগল, 'সার, সার।' তারপর কোনো সাড়া না পেয়ে নেমে এসে সামনে ছুটে গেল। শিবাজী প্রথমে সন্দেহ করল এটা টোপ কি না। কিন্তু এই মেয়েটি তার জীবন একবার বাঁচিয়েছে তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল। ওদিকে মেয়েটি তখন বাংলোর সামনের বারান্দায় পৌঁছে গিয়েছে। শিবাজী ধীরে ধীরে সামনে এসে দেখল মেয়েটি সিঁড়ির ওপর উবু হয়ে বসে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। সে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

গলা শুনে প্রথমে মেয়েটির কান্না যেন আটকে গেল, সে বিস্ফারিত চোখে তাকাতেই শিবাজীকে দেখতে পেল। তারপরেই বিদ্যুতের মত সে দূরত্বটা অতিক্রম করে শিবাজীর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, 'আমার ভাইকে বাঁচাও সাহেব।' মেয়েটির কান্না আরও সোচ্চার হল। শিবাজী খুব নার্ভাস বোধ করছিল। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

অনেক কষ্টে মেয়েটির মুখ থেকে কথাগুলো বের করতে পারল। ভাইকে নিয়ে মেয়েটি ঘুরপথে লাইনে ফিরে গিয়েছিল। যাওয়ার পথে সে জানতে পেরেছিল দুটো লোক ভাইকে পাঠিয়েছিল, বাংলোর অবস্থা দেখে আসবার জন্যে। নতুন সাহেব কী করছে তা গোপনে দেখে ওদের খবর দিতে হবে। ভাই প্রথমে রাজি হয়নি কিন্তু ওরা শাসিয়েছিল না দিলে তোর দিদি খতম হয়ে যাবে। ওরা চা-বাগানের শেষ প্রান্তে যে বাংলোবাড়ি আছে জঙ্গলের লাগোয়া সেখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করবে বলেছিল। মেয়েটি এসব জানার পর ভাইকে বলেছিল যে আজ যেন কিছুতেই বাড়ি থেকে সে বের না হয়। ওরা যখন লাইনের কাছাকাছি তখন দেখতে পেল আগুন লেগেছে। দৌড়ে লাইনে গিয়ে মেয়েটি দেখে তাদের খড়ের ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। লাইনের লোকরা আগুন নিভিয়েছে কিন্তু কিছুই বাঁচেনি। ওদের মা ঘরের সামনে বসে মাথায় হাত দিয়ে

কাঁদছিল। কী করে আগুন লেগেছে কেউ বলতে পারল না। আর তার পরেই ওর খেয়াল হল ভাই কাছাকাছি নেই। সমস্ত লাইনে খুঁজেও ভাইকে পাওয়া গেল না। অথচ, সে মেয়েটির আগেই দৌড়ে গিয়েছিল লাইনে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত ছুটে এসেছে এখানে। এখন সাহেবই তার ভাইকে বাঁচাতে পারে। ওরা নিশ্চয়ই ভাইকে ধরে নিয়ে গেছে।

শিবাজী মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এখানে এসেছ ওরা টের পেয়েছে?'

'জানি না, আমি পাগলের মত ছুটে এসেছি।'

'ওই বাংলোয় কে থাকে?'

'দিনের বেলায় কোনো মানুষকে দেখা যায় না। কাঁটাতার দিয়ে জায়গাটা ঘেরা।'

'লাইনের লোকদের বললে না কেন ওখানে যাওয়ার জন্যে?'

সজোরে মাথা নাড়লো মেয়েটি, 'সর্দার বলে দিয়েছে কেউ যেন ওই বাংলোর কাছে না যায়। ওখানে ভূত আছে। তার ওপর আজ হাতি বেরিয়েছে জঙ্গল থেকে।'

এরকম একটা বাংলো লাভবার্ড চা-বাগানের গা ঘেঁষে রয়েছে অথচ সেখানে মানুষ থাকে না একথা পুলিস জানে? শিবাজীর মনে হল ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও গোলমাল আছে। কিন্তু এত রাত্রে একা খালি হাতে ওখানে যাওয়া কি উচিত হবে? অথচ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বোবা ছেলেটির কাছ থেকে যদি খবর বের করতে নাও পারে তবু নির্মম হতে পারে ওরা। ওকে বাঁচানোর জন্যে এক্ষুনি যাওয়া দরকার। সে মেয়েটিকে বলল, 'জলদি তোমার মেমসাহেবকে ডেকে আনো, আমি দেখছি।'

মেয়েটি ছুটে পাশের বাংলোর দিকে চলে যেতেই শিবাজী কিচেনের পাশে খানসামার ঘরে চলে এল। দরজায় শেকল টানা ছিল। অন্ধকারে যেটুকু জ্যোৎস্না ঢুকল তাতেই সে ঘরটাকে দেখতে লাগল। একটা তক্তপোষের ওপর চেপ্টে যাওয়া তোশক, কালো বালিশ আর কিছু টুকিটাকি জিনিস। কিন্তু প্রথম দিন খানাসামার কোমরে যেটাকে ঝুলতে দেখেছিল সেটা কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে শিবাজী তোশকটা তুলতেই ওটাকে দেখতে পেল। খাপসুদ্ধ ওখানে রেখেছিল খানসামা। যদি রান্না করার সময় ওর সঙ্গে থাকত তাহলে কি হত বলা যায় না। খাপ থেকে ভোজালিটাকে টেনে বের করতেই সেটা আধা অন্ধকারেও ঝিলিক দিয়ে উঠল। আঙুল আলতো করে বুলিয়ে শিবাজী বুঝল প্রচণ্ড ধার ভোজালিটায়। খাপসুদ্ধ অস্ত্রটাকে নিজের কোমরে ঢুকিয়ে মনে হল যদি এটার ব্যবহার সে করতে পারে তাহলে অন্তত খানসামার আত্মা সামান্য হলেও শান্তি পাবে।

লাবণ্য এলেন খানিক বাদেই। এক পলক দেখেই শিবাজী বুঝল ভদ্রমহিলা সন্ধে থেকে এক অবস্থাতেই আছেন। বোধহয় বিছানা ছেড়েও ওঠেননি। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'সব শুনেছেন নিশ্চয়ই। আপনাকে এক্ষুনি একটা কাজ করতে হবে। ওকে নিয়ে সামন্তবাবুর বাড়িতে চলে যান। ভদ্রলোককে বলুন এক্ষুনি থানায় গিয়ে পুলিসের সাহায্য চাইতে। আমি গেলে জানাজানি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যান, দেরি করবেন না।'

লাবণ্য বললেন, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'ওই বাংলোয়।' কথাটা বলে শিবাজী মেয়েটির কাছে বাংলোয় যাওয়ার পথটা জেনে নিল। এখান থেকে হাঁটা পথে মিনিট কুড়ি হবে। পুলিস যদি এক ঘণ্টার মধ্যে চলে আসে তাহলে—।

লাবণ্য বললেন, 'না। আপনার একা যাওয়া ঠিক হবে না। বরং পুলিস নিয়ে নিজে ওখানে চলে যান। তাছাড়া, ওর ভাই যে ওখানে আছে তাই বা বুঝবেন কী করে?

শিবাজী বলল, 'আমার মনে হয় আরও বেশি পাওয়া যাবে ওখানে। আপনি আর কথা বাড়াবেন

না। চা-বাগানের গরিব মানুষগুলোর চেয়ে আমার জীবন মোটেই দামী নয়। এদের বাঁচাতেই হবে। আপনারা সাঁকো পেরিয়ে চা-বাগানের ভেতর দিয়ে শর্টকাট করুন। সামন্তবাবুকে বলবেন এক ঘন্টার মধ্যে সব ব্যবস্থা করতে।'

ওদের সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে শিবাজী পেছনের জঙ্গলের দিকে পা বাড়াল। লাবণ্য অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এই মানুষটি সম্পর্কে কোনো ধারণায় আসতে পারছিলেন না তিনি। সন্ধে থেকে বুকের ভেতর যে যন্ত্রণাটা কুরে কুরে খাচ্ছিল সেটা এই মুহূর্তে চাপা পড়ল, কারণ তাঁকে একটা কাজ অবিলম্বে করতেই হবে। ওই জেদি মানুষটাকে সাহায্য করা দরকার।

এক টুকরো সাদা হাড় হয়ে চাঁদ আকাশে পড়েছিল। তার শরীর থেকে আর আলো ঝরছিল না বরং সেটা ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে আসছিল। শিবাজী জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সতর্ক পায়ে হাঁটছিল। বাংলো থেকে এই পথটুকু আসতে আধ ঘন্টা লেগে গেছে। প্রথমত রাত্রে অচেনা বুনো পথে দ্রুত হাঁটা অসম্ভব। নদীটা পার হতে বেশ ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তাকে আসতে হয়েছে নিঃশব্দে যাতে চট করে কারো নজরে না পড়ে যায়। এখন এই রাত্রে নির্জন বনভূমিতে কোনো মানুষের অস্তিত্ব যদিও কল্পনা করা যায় না তবু সাবধানের মার নেই। একপাশে চা-বাগান আর অন্য পাশে ফরেস্ট। চা-গাছগুলো এদিকে শুকিয়ে গেছে, ওর ভেতর দিয়ে হাঁটলে যে কেউ দেখতে পারে। জঙ্গলের গায়েই মাটির বড় রাস্তা আছে কিন্তু সেখানে পা রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। শিবাজীকে তাই জঙ্গলের ভেতরের সরু পায়ে চলা পথ ধরতে হয়েছিল। তারপর আচমকা সে দূরে বাংলোটাকে দেখতে পেল। চা-বাগানের সীমানার বাইরে জঙ্গলের মুখেই ওই কাঠের কালো বাংলোটা বেশ বড়। আবছা আলোয় রহস্যময় দেখাচ্ছিল জায়গাটাকে। খুব চুপচাপ, কোনো মানুষ জেগে আছে বলে মনে হল না।

গাছের আড়ালে আড়ালে শিবাজী জঙ্গলের কিনারে চলে এল। বাংলোটার চার পাশে অনেকটা খোলা জমি কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। মাটির চওড়া রাস্তাটার গায়েই কাঠের গেট। কাঁটাতারের বেড়া মাথা সমান উঁচু। এত গুছিয়ে লোকালয়ের বাইরে কোন উদ্দেশ্যে মানুষ বাড়ি করে? কিন্তু এখানে ঢুকতেই হবে। লাভবার্ডের সমস্ত রহস্য ওই বাড়িতেই রয়েছে, এখানে এসে শিবাজীর ওই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল। ঠিক সেই সময় বাংলোর ভেতর থেকে একটা লোককে সে এগিয়ে আসতে দেখল গেটের দিকে। হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরনে লোকটার হাতে ছোট্ট লাঠি। গেটের আড়ালে যে আর একজন দাঁড়িয়েছিল তা বুঝতে পারেনি শিবাজী। এই লোকটি কাছাকাছি হতেই সে বেরিয়ে এল। তারপর আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সে চলে গেল ভেতরে। নবাগত চারপাশ একবার চোখ বুলিয়ে গেটের গায়ে ঠেস দিয়ে বসল।

এরা তাহলে নিয়মিত পাহারার ব্যবস্থা করেছে। শিবাজী বুঝল বাংলোর কাছে যেতে হলে ওই লোকটিকে এড়ানো যাবে না। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে বাংলোর গেট বড় জোর কুড়ি গজ দূরে। হাফ-প্যান্ট পরা লোকটাকে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। মাটি থেকে একটা বড় পাথর কুড়িয়ে নিয়ে শিবাজী সামনের জঙ্গলে ছুড়ে মারল। বড় একটা ডালে শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক পাখি চিৎকার শুরু করে দিল। দুটো বাঁদর লাফালাফি শুরু করল এ ডালে ও ডালে। হাফপ্যান্ট পরা লোকটা চমকে উঠে দাঁড়াল লাঠি হাতে। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আওয়াজের কেন্দ্রটাকে দেখতে লাগল। শিবাজী আর দেরি না করে একটা পাথর দিয়ে কাছের একটা ডালকে আঘাত করতেই এদিকেও হইচই শুরু হল ঘুম-ভাঙা পাখিদের। লোকটা বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে একবার পেছন ফিরে বাংলোটাকে দেখল। তারপর গেট খুলে কারণ অনুসন্ধানের জন্যে খুব সতর্ক ভঙ্গিতে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। সেই সময় বিরক্ত হওয়া একটা বাঁদর বোধহয় ওকে ভয় দেখাতেই সামনে লাফিয়ে পড়ে এদিকে ছুটে এল। লোকটা শব্দ

করে হাসল। হয়তো নিজের বোকামির জন্য লজ্জা পেল। তারপর ঘুরে বাংলোর গেটের দিকে তাকাল। শিবাজী এটুকুর জন্যই অপেক্ষা করছিল। খুব দ্রুত বেরিয়ে সে লোকটির মাথায় ভোজালির উল্টো দিক দিয়ে আঘাত করল। লোকটার মুখ থেকে একটা শব্দ বের হল না, ধীরে ধীরে মাটিতে শুয়ে পড়ল। চটপট লোকটাকে জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে মাটিতে উপুড় করে দিল সে। তারপর এক দৌড়ে গেটের পাশে এসে দাঁড়াল। খোলা গেট বন্ধ করে চারপাশে তাকিয়ে দ্বিতীয় মানুষ দেখতে পেল না শিবাজী। বাংলোর চারপাশে খোলা জমি এবং সেখানে একটা আড়াল পর্যন্ত নেই। ওখানে পৌঁছাতে গেলে প্রকাশ্যেই যেতে হবে। যেহেতু এই বাংলো চা-বাগানের এক্তিয়ারের বাইরে তাই তার বেলায় যাওয়াটা অনধিকার প্রবেশ হবে। কিন্তু এছাড়া উপায় নেই।

শিবাজী একটু ব্যস্ত না হয়ে সামনের পথ দিয়ে সোজা হেঁটে বাংলোয় চলে এল। কেউ তাকে বাধা দিল না, কোনো চিৎকার শোনা গেল না। নাকি ওরা একজন পাহারাদার রেখেই নিশ্চিন্ত হয়েছে। ঠিক সেই সময় চাপা গলায় একটা গোঙানি উঠল। কেউ কাঁদতে চেষ্টা করেও পারছে না যেন। শিবাজী শব্দটা লক্ষ্য করে বাংলোর পেছনের সিঁড়িতে চলে এল। তারপর নিঃশব্দে ওপরে উঠে এসে দরজার কাচে চোখ রাখল। সেই লোকটা যে গেটে ছিল একটা চেয়ারে বসে বিড়ি ফুঁকছে। ঘরে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু শব্দটা আসছে ওখান থেকেই। শিবাজী পাশের ঘরটায় উঁকি মারল। ওঘরে হ্যারিকেন ছিল, এ-ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার পাশের ঘরটাও তাই। তার মানে কর্তারা কেউ বাংলোয় নেই। সে আর দেরি না করে প্রথম দরজায় টোকা দিল। তারপর দরজার একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ভোজালিটা বের করে তৈরি হল। ভেতরে পায়ের শব্দ হল। তারপরেই দরজা খুলে লোকটা বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে একটু বিস্মিত ভঙ্গিতে বাঁ দিকে তাকাতেই শিবাজী আবার ভোজালির উল্টো দিকটা দিয়ে সজোরে আঘাত করল। উত্তেজনা থাকায় বোধহয় আঘাতটা জোরে হয়ে গিয়েছিল কারণ ওর মনে হল ভোজালিটা বেশ বসে গিয়েছে মাথায়। লোকটার মুখ থেকে আর্তনাদ বের হতে নাহতেই তার শরীরটা মাটিতে আছড়ে পড়ল। শিবাজী ঘরে ঢুকে প্রথমে কাউকে দেখতে পেল না। গোঙানিটাও থেমে গেছে। সে হ্যারিকেন তুলে ধরে চারপাশে তাকাতে কাঠের বাক্সটা নড়ে উঠল। তাজ্জব হয়ে গেল সে। দ্রুত হাতে প্যাকিং খুলে এক মুহূর্ত বিস্মিত চোখে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থেকে ওকে কোনরকমে টেনে বাক্স থেকে বের করল শিবাজী। হাত পা দড়ি বেঁধে প্রায় গোল করে এই প্যাকিং বাক্সের মধ্যে পুরে রেখেছিল ওকে দড়ির গিট ভোজালি দিয়ে কেটে ছেলেটার শরীর থেকে খুলে নিয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'দাঁড়াতে পারবি?'

ছেলেটা তখনও মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছিল। শিবাজী ওকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল। অনেকক্ষণ ওই ভাবে পড়ে থেকে ওর বোধহয় সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু এইবার যেন ছেলেটা শিবাজীকে চিনতে পারল। পেরে চেষ্টা করতে লাগল সোজা হতে।

আর তখনি দূরে একটা গাড়ির শব্দ উঠল। শিবাজী দ্রুত সামনের বারান্দার জানলার এসে দাঁড়াল। জঙ্গলের ভেতরে কোথাও গাড়ির হেডলাইট দেখা যাচ্ছে না। এইসময়ের মধ্যে পুলিসের আসা উচিত ছিল। ওটা পুলিসের গাড়ি কি না দেখতে হবে তারপরেই অ্যাম্বাসাডারটা বেরিয়ে এল চোখের সামনে, এসে গেটের সামনে দাঁড়াল। গেট কেউ খুলছে না দেখে দুবার হর্ন বাজাল ড্রাইভার। তারপর চিৎকার করে কেউ গালাগাল দিয়ে দরজা খুলে মাটিতে নামল। গেট খুলে লোকটা যখন এপাশ ওপাশে কাউকে খুঁজছে তখনই সীতেশকে চিনতে পারল শিবাজী। গেটে দাঁড়িয়ে সীতেশ চিৎকার করল, 'বুধুয়া!' তারপর সাড়া না পেয়ে আবার গাড়িতে ফিরে গেল। শিবাজী দেখল গাড়িটা গেট পেরিয়ে বাংলোর দিকে আসছে। হেড লাইটের আলোটা থর থর কাঁপছে বাংলোর ওপরে পড়ে। ইঞ্জিন বন্ধ করে সীতেশ নামল গাড়ি থেকে। শিবাজী লক্ষ্য করল

সীতেশের সঙ্গে অন্য কেউ আসেনি। কাচের আড়াল থেকে শিবাজী দেখল সীতেশ বেশ মোটা হয়েছে, কিন্তু চলনে তৎপরতা এসেছে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে এমন ভাবে হিরা বলে ডাকল যেন এটা ওর নিজের বাংলো। দু-তিন বার ডাকাডাকি করার পর সীতেশ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশে চোখ বোলাতে লাগল। ওর ভঙ্গিতে এখন বেশ সতর্ক ভাব। তার মানে ওর মনে নিশ্চয়ই সন্দেহ জেগেছে। তরতর করে নেমে পেছনের দিকে চলে গেল সে। শিবাজী জানলা থেকে সরে এপাশে চলে এল। দরজাটা খোলা। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দার এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল দেওয়াল ঘেঁষে। পায়ের শব্দ হল না কিন্তু সীতেশ পেছনের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। বারান্দায় দাঁড়িয়েই আবছা অন্ধকারে পড়ে থাকা অজ্ঞান শরীরটির দিকে তার নজর গেল। দুটো হাত ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে লোকটা। সীতেশের ঠোঁট থেকে একটা শব্দ বের হল। তারপর চকিতে পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু একটা বের করে আনল। তারপর সেটাকে সামনে রেখে খোলা ঘরের দিকে পা বাড়াল। শিবাজীকে লক্ষ্য করেনি সীতেশ। ও যখন দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরটা সন্দেহের চোখে দেখছে তখন শিবাজী কথা বলল, 'আমি তোর জন্যে অপেক্ষা করছি সীতেশ।'

চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে সীতেশ, হাত সামান্য উঁচিয়ে ধরল 'কে?'

হাসল শিবাজী, 'আমার গলার স্বর তোর অচেনা হয়ে গেছে?'

'দাদা।' সীতেশের কণ্ঠ কাঁপল, 'তুমি এখানে?'

'বললাম তো তোর জন্যে অপেক্ষা করছি।' শিবাজীর গলায় কোনো তাপ নেই।

'একে তুমি মেরেছ?'

'মরেনি, অজ্ঞান হয়ে রয়েছে। গেটের বাইরেও একজন আছে।'

'তুমি—তুমি ভীমরুলের চাকে হাত দিয়েছ!' হিস হিস করে উঠল সীতেশ।

'আমার গ্লাভস পরা আছে। ওটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখ।'

'তোমাকে এখান থেকে জ্যান্ত ফিরতে দেব না।'

'কেন?'

'তুমি আমার জীবনে কালগ্রহ। মায়ের রক্তজলকরা টাকায় বড় হয়ে চাকরির লোভে মাকে ছেড়ে গিয়েছিলে তুমি, তোমার জন্যে আমার পড়াশুনা হয়নি।'

'আমার জন্যে?'

'হ্যাঁ তোমার জন্যে। মা সংসার চালাতে পারছিল না। দয়া দেখাতে মাঝে মাঝে চোরের মত আসতে আর মাকে এলোমেলো করে দিতে!'

'মাকে কে খুন করেছে সীতেশ?'

সীতেশ যেন একটু কেঁপে উঠল। তারপর চিৎকার করল, 'মাকে কেউ খুন করেনি, ওটা স্ট্রোক, মোটেই গায়ে বোমা লাগেনি।'

'কিন্তু মা তোর জন্যেই মারা গেছে।'

'না মোটেই না, আমি বিশ্বাস করি না।'

'গোল্ডেন টি-তে তুই আমার পেছনে লেগেছিলি কেন?'

'সে প্রশ্নের জবাব আমি তোমাকে দেব না।'

'সীতেশ, আমি তোকে কখনও ক্ষমা করতে পারব না। কিন্তু তুই এসব কী করছিস? তুই যে রাজনীতিতে বিশ্বাস করতিস তার সঙ্গে এই দালালি কী করে মেলে? তুই মানুষ?'

'দালালি? মুখ সামলে কথা বলো।'

শিবাজী হাসলো, 'চেঁচিয়ে সত্যি কথা ঢাকা যায় না সীতেশ। তুই আগরওয়ালের দালাল।

তোদের সঙ্গে অন্যান্য চা-বাগানের য়ুনিয়নগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। স্রেফ ভয় দেখিয়ে এখানকার গরিব শ্রমিকদের দাবিয়ে রেখেছিস তোরা। আমি বুঝতে পারছি না এতে তোদের কী স্বার্থ। আগরওয়াল তো কখনই এই বাগানের আর মালিক হতে পারবে না। তাহলে—'

'তুমি—তোমার আজ রাত্রে ক্লাবে থাকার কথা ছিল না?'

'ছিল।'

সীতেশ হাসল, 'তুমি দুবার ভাগ্যবান হয়েছ। এবার খেলা শেষ। যেচে এসে যখন কবরে পা দিয়েছ তখন আর নিস্তার নেই।'

'কবর?'

'এই বাংলোর তলায় আর একজন শুয়ে আছে যাকে টনসন এন্ড হিউস পাঠিয়েছিল পরিত্রাতা হিসেবে।'

'সোম!'

'হ্যাঁ। ওর সুন্দরী বউ-এর কাছে দেখছি এসেই ঘোরাফেরা শুরু করেছ।'

শিবাজী দাঁতে দাঁত চাপল, 'সীতেশ তুই কত নোংরা হয়ে গিয়েছিস। তুই আমার ভাই এটা ভাবতেও এখন ঘেন্না হচ্ছে।'

'রাখো! সোজা রেলিং ধরে এগিয়ে এস। বেচাল কিছু করলেই গুলি চালাব।'

'কেন?'

'শুধু এই লোকটাকে মারার অপরাধেই অন্য কেউ এতক্ষণে শেষ হয়ে যেত। তুমি তো অনেকদিন খরচের খাতায় রয়েছ। এসো।'

'কিন্তু কী লাভ, এসব করে তোদের কী লাভ!'

'শিবাজী চ্যাটার্জি যদি ফিরে না যায় তাহলে টমসন অ্যান্ড হিউস আর কাউকে পাঠাতে পারবে এখানে? তোমার কর্তা সেন সাহেবকে তখন বোর্ডের মেম্বাররা ছুড়ে ফেলে দেবে চেয়ার থেকে। নতুন চেয়ারম্যান বাধ্য হবে আমাদের সঙ্গে হাত মেলাতে। চা-বাগানে এত বছর কাটালাম, আমারও তো কম এক্সপেরিয়েন্স হল না। না হয় টোকনাই ট্রেনিংটাই যা নিইনি।' ঠিক সেই সময় তিরের মত কেউ ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়িটা লাফিয়ে নিচে নেমে গেল। সীতেশ চমকে উঠে ফিরে দাঁড়িয়ে চেঁচাল, ওফ ওকে ছেড়ে দিয়েছ তুমি? সর্বনাশ হয়ে গেল, কুলিরা জানতে পারলে সামলানো মুশকিল হবে।' বলতে বলতে সে রেলিং-এর ধারে ছুটে গেল।

শিবাজী দেখল ফাঁকা লনের ওপর ঘোলা জ্যোৎস্নায় ছেলেটা দৌড়ে যাচ্ছে। সীতেশ ওকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল। কিন্তু গুলি লাগেনি ছেলেটার গায়ে। শব্দটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই দেখা গেল ছেলেটা থমকে দাঁড়িয়েছে। কাঁটাতারের বেড়ার কথা বোধহয় বেচারার খেয়াল ছিল না। এদিকে যাওয়ার কোনো উপায় নেই দেখে পরক্ষণেই সে বেড়া ধরে দৌড়াতে লাগল গেটের দিকে। গেট খোলা। কিন্তু সেখানে পৌঁছতে শ দেড়েক গজ দৌড়াতে হবে। সীতেশ আবার গুলি করল। ছুটন্ত শরীর বলেই এবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। ঠিক সেই সময় আর একটি গাড়ি এসে ঠিক গেটের মুখে দাঁড়াতেই ছেলেটা পাথর হয়ে গেল। ওর বের হবার রাস্তা বন্ধ।

শিবাজী দেখল ওটা পুলিসের গাড়ি নয়। গাড়ি থেকে দুজন লোক নামল। তাদের একজন চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে? গুলি করছ কেন?'

'ছেলেটা পালাচ্ছে।' সীতেশ চেঁচিয়ে উত্তর দিল। তার অস্ত্র ছেলেটির দিকে তাক করা কিন্তু যেহেতু ছেলেটির পেছনেই নবাগতরা রয়েছে তাই সে ট্রিগার টিপতে পারছে না।

এতক্ষণে বাবুরাম আগরওয়ালকে চিনতে পারল শিবাজী। বাবুরাম চিৎকার করল, 'রিভলবার নামাও।' তারপর সঙ্গীকে কিছু বলতেই সে ছুটে গেল ছেলেটার দিকে। বেচারা এমন নার্ভাস

হয়ে পড়েছিল যে সামান্য নড়তে পারল না। ওকে টানতে টানতে নিয়ে গেল লোকটা গাড়ির কাছে, তারপর আগরওয়ালের নির্দেশে ঠেলে দিল ভেতরে।

সীতেশ হাত নামিয়ে এবার ঘুরে দাঁড়াল, 'এবার কী করবে?'

শিবাজী এতক্ষণে ধাতস্থ হল। 'এই ভাবে মানুষ শিকার—।'

ওকে থামিয়ে দিল সীতেশ, 'আঃ, জ্ঞান দিও না। মানুষের একমাত্র শিকার হল মানুষ। কিন্তু আগরওয়াল আসছে। দুবার ওকে অপমান করেছ তুমি।'

গাড়িটা নিচে এসে থামতেই সীতেশ ঝুঁকে বলল, 'এখানে আমাদের একজন গেস্ট এসেছে।'

'গেস্ট? কে?' বাবুরাম গাড়ি থেকে নামতে নামতে জিজ্ঞাসা করল। শিবাজী নড়ছিল না এতক্ষণ। কিন্তু তার মনে হল এক্ষুনি কিছু করা দরকার। সীতেশ এখন ওর দিকে মন দিচ্ছে না। একবার লাফিয়ে পড়লে ওকে কব্জা করতে সময় লাগবে না।

ততক্ষণে বাবুরাম উঠে এসেছে ওপরে। এবং উঠেই সে শিবাজীকে দেখতে পেয়ে হাসল, 'বাঃ, চমৎকার। আপনাকে এইমাত্র ক্লাবে পুড়িয়ে এসে ভাবলাম সব চুকে গেল আর আপনি এখানে হাওয়া খাচ্ছেন? সত্যি এলেমদার লোক আছেন আপনি। এরকম লোকের সঙ্গে লড়াই করেও সুখ পাওয়া যায়। সীতেশ, দুটো চেয়ার এনে দাও, আমরা বসে কথা বলব।'

সীতেশ অবাক হয়ে বাবুরামের দিকে তাকাল। তারপর খুব বিরক্তি নিয়ে ভেতর থেকে তিনটে চেয়ার বাইরে টেনে আনল। বাবুরাম বলল, 'তিনটে আনতে কে বলেছে তোমাকে? একটা ভেতরে রেখে এস।'

'তার মানে?'

'বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে কেন?' নির্বিকার মুখে কথাগুলো বলতে বলতে বাবুরাম একটা চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে ডাকলেন, 'আসুন চ্যাটার্জি সাহেব, আমরা কথাবার্তা বলি।'

সীতেশ খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল এরকম ব্যবহারে। সে একটু উত্তেজিত গলায় বলল, 'আপনি ওর সঙ্গে কী কথা বলবেন? আমাদের দুজন লোককে উন্ডেড করেছে ও, ওই দেখুন একজন পড়ে আছে।'

'তাই নাকি? বাঃ খুব সাহসী লোক তো।' বাবুরাম মাথা নাড়ল।

'আপনি আমার সঙ্গে এরকমভাবে কথা বলতে পারেন না।'

'কী রকম?'

'আপনি চাকরবাকরের মত ব্যবহার কেন করছেন বুঝতে পারছি না। আমাকে চটিয়ে আপনার কী লাভ হবে?'

'দ্যাখো আমি ব্যবসায়ী, কোনটে করলে লোকসান হবে তা আমি বুঝি। তাছাড়া আমরা ভারতীয়রা দাদাকে ভাই-এর চেয়ে বেশি সম্মান দিই। আসুন চ্যাটার্জি সাহেব, আপনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন।' কথা শেষ করে বাবুরাম সীতেশের দিকে হাতের ইশারা করল চলে যাওয়ার জন্যে।

সীতেশ চাপা গলায় কিছু বলে বারান্দা ছেড়ে নেমে যেতেই শিবাজী এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে নিল। বাবুরাম হাসল, 'খামোকা এইসব ঝঞ্ঝাট আসছে। লাভবার্ড চা-বাগানটাকে আমি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি। আমি চাই আপনি আমার সঙ্গে একটা বন্দোবস্তে আসুন।'

'কী বলতে চাইছেন?'

'আপনি রেগে আছেন! আরে মশাই বাগান বিক্রি করে দিয়েছি ঠিক কিন্তু মনটাকে তো বিক্রি করিনি। আপনি আপনার কোম্পানির হয়ে বাগান চালান কিন্তু আমাকে মুনাফা নিতে দিন। কিছু ভাববেন না, এই কুত্তাগুলোকে আমি ঠাণ্ডা করে দিতে জানি। আপনার মায়ের পেটের ভাই

আপনার বড় শত্রু।' বাবুরাম কথা শেষ করা মাত্র লনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সীতেশ চিৎকার করে বলল, 'তাড়াতাড়ি কথা শেষ করুন।'

বাবুরাম হাসল, 'তুমি মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছ সীতেশ। মাথা ঠাণ্ডা রাখো, বুদ্ধিটা খেলতে পারবে তাহলে। একটু কফি খাবেন চ্যাটার্জি সাহেব?'

শিবাজী মাথা নাড়ল, 'না ধন্যবাদ।' সে বুঝতে পারল অত্যন্ত ধুরন্ধর মানুষের সামনে বসে আছে। এই লোকটা ইচ্ছে করলেই তাকে সরিয়ে ফেলতে পারে অথচ সেটা না করে বিনীত ভঙ্গি করছে।

আগরওয়ালা মাথা নাড়ল, 'এত রাত্রে কফি অনেকের সহ্য হয় না। আপনার ভাই-এর পেটে ভুটানি হুইস্কি আছে তাই মাথা গরম। আজকালকার ইয়ং ছেলেদের কথা আর বলবেন না, মদ পেলেই হামলে পড়ে।' কথা শেষ করেই একহাত জিভ বের করল লোকটা, 'ছি ছি ছি খুব ভুল হয়ে গেল। আমি আপনাকে আঘাত করতে চাইনি। অবশ্য আপনি এখনকার ছেলেদের মত ফালতু নন।'

শিবাজী গায়ে মাখল না। তার চোখ এখন সীতেশের দিকে। ফুলের বেড়াটার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। তার ভাই, এক মায়ের পেটের সন্তান। অথচ ওর আজকের আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ অচেনা তার। ওর দাঁড়াবার ভঙ্গিটাও পাল্টে গিয়েছে। হঠাৎ মনটা নরম হয়ে আসছিল শিবাজীর, হঠাৎ যেন সে ঝাঁকুনি খেল। এই ছেলে তার মাকে হত্যা করেছে।

বাবুরাম আগরওয়াল তাকে লক্ষ্য করছিল। এবার বলল, 'জীবনটা বড় বিচিত্র জিনিস চ্যাটার্জি সাহেব। এক একটা দিন যায় তার চেহারা বদলায়। ছেড়ে দিন ভাই-এর চিন্তা। ও এখন আমার হাতের মুঠোয়। যা বলব তা শুনতে বাধ্য। আসুন, আপনার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করি।'

'কী কথা থাকতে পারে আপনার সঙ্গে?'

'মানুষের সঙ্গেই মানুষের কথা হয়। আপনি আবার সীতেশের মত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? আমি তো কোনো খারাপ ব্যবহার করছি না। যাক, আগে আমি আপনার বক্তব্য শুনি। কিছু বলার আছে?' বাবুরাম পকেট থেকে ছোট ডিবে বের করে সেটা হাতের ওপর উপুড় করে খানিকটা জর্দা মেশানো পানবাহার ঢেলে নিয়ে মুখে ফেলল।

শিবাজী লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখল। খুব তৃপ্ত দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে। সে একটু নড়েচড়ে বলল, 'শুনুন। আমি চাই চা-বাগান স্বাভাবিক হয়ে উঠুক।'

'আমিও চাই।'

কিন্তু আপনি সেটা করতে দিচ্ছেন না। আপনার ভয়ে এখানকার শ্রমিকরা কাঁটা হয়ে আছে। চা-বাগানটার সর্বনাশ করে ছেড়েছেন আপনি। মিঃ সোমকে খুন করে এই বাংলোর তলায় পুঁতে রেখেছেন আবার আমার খানসামাকে বিনা দোষে হত্যা করেছেন আমি জানতে চাই এসব আপনি করছেন কেন?' প্রশ্নগুলো করার সময় শিবাজীর উত্তেজনা চাপা থাকল না।

বাবুরাম আগরওয়ালা চোখ মেললেন। তারপর মাথা নাড়লেন, 'স্বীকার করছি বড় সাহস আপনার। আমার মুখের ওপর আমাকেই দোষী করছেন। কিন্তু সোমের খবরটা ভুল।'

'অস্বীকার করে লাভ নেই, আপনার দালাল আমাকে বলেছে।'

'তাই নাকি!' বাবুরাম চকিতে মাঠে দাঁড়ানো সীতেশকে দেখল, 'শালা হারামি।' তারপর মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ ঠিক, ওকে সরাতে হয়েছিল। আমি কখনও কাউকে কৈফিয়ত দিই না চ্যাটার্জি সাহেব। আপনার কপাল ভাল তাই এতক্ষণ এখানে কথা বলতে পারছেন।'

'এই অবস্থায় বাগান কী করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে?'

'ফিরবে, ফিরবে। এই জন্যেই তো আলাপ করতে বসেছি। আরে মশাই এইসব ঝামেলা

বেশিদিন চালাতে কার ইচ্ছে করে? আপনি বাগান চালাতে চান?'
'সেই জন্যেই আমি এসেছি।'
'গুড। তাহলে আপনি আমার সঙ্গে রফায় আসুন।'
'কী রকম?'
'না, কোনো বেআইনি কাজ করতে বলব না। শুধু বাগান চালাতে গেলে আপনাকে আমার সঙ্গে হাত মেলাতে হবে।'
শিবাজী শীতল হওয়ার চেষ্টা করল, 'কী ভাবে?'
বাবুরাম হাসল, 'বাগানে যা যা জিনিস লাগবে সেগুলো আমি সাপ্লাই দেব।'
'আপনি সাপ্লাই দেবেন?'
'হ্যাঁ। আর কেউ না। বাগানের তো এখন খুবই দুরবস্থা। ঢেলে সাজাতে গেলে প্রচুর মাল লাগবে। ভাল মাল দেব ন্যায্য দামে। অতএব কাউকে কোনো কৈফিয়ত দিতে হবে না আপনাকে। ডান?'
'তারপর?'
'আপনার কোম্পানির টাকা বাঁচাতে চাই। কুলিদের কোনো রকম এরিয়ার দিতে হবে না। শুধু ওদের এক মাসের মাইনেটা আমার হাতে দিয়ে দেবেন। বোনাসের দাবি মানবার কোনো দরকার নেই। সাড়ে আট পার্সেন্টি হিসেব করে দিয়ে দিলেই চলবে।' তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'যদি বাগানে কোনো প্রব্লেম কখনও হয় তাহলে চুপচাপ আমাকে জানিয়ে দেবেন, আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই সেটা সল্‌ভ করে দেব।'
শিবাজী লোকটির লোভী চোখ দুটোর দিকে তাকাল। তারপর একটু চিন্তিত এমন ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু কুলিদের সামলাবেন কী করে? ওরা এতদিন ধরে যে কষ্ট করল, এখন আন্দোলনের যদি এই পরিণতি হয় তাহলে ছেড়ে দেবে? ছিঁড়ে খাবে না আপনাদের?'
বাবুরাম হাত নাড়ল, 'কেউ শব্দ করার সাহস পাবে না। আন্দোলন ওরা করেনি, আমিই করিয়েছি। ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।'
'আপনি লেবার য়ুনিয়নের লিডার?'
'না। সে যোগ্যতা আমার কোথায়। তবে লিডার আমার চাকর। ওই যে ওখানে দাঁড়িয়ে ফুলের শোভা দেখছে লিডার। আপনাকে নিশ্চয়ই ও বলেছে সোম কোথায় শুয়ে আছে? থাক, সোমের কথা থাক। এবার, আপনি বলুন।'
শিবাজী ভেবে পাচ্ছিল না কী করা উচিত। এই লোকটা সাপের চেয়েও বেশি শয়তান এবং পিচ্ছিল। এর সঙ্গে ঝগড়া করে কোনো লাভ নেই। শঠের সঙ্গে শঠতাই মানানসই। বাবুরাম তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, 'বুঝলাম। কিন্তু এই যে দুটো মানুষ খুন হল তার জবাব কে দেবে?'
বাবুরাম এবার স্বস্তিতে শরীরটা চেয়ারে এলিয়ে দিল, 'চ্যাটার্জি সাহেব, মানুষের জীবন হল একটা পয়সার মতন। একটা পয়সার কোনো দাম আছে? নেই। অথচ তাতে সরকারি ছাপ থাকে, পয়সা বলে কথা। স্বার্থ না থাকলে ওই খুনের ব্যাপারে কেউ মাথা ঘামাবে না। সে বন্দোবস্ত করব।' তারপর হেসে বলল, 'ওই যে ফুলের গাছগুলো দেখছেন, ওরা আরও সুন্দর ফুল ফোটাবে, কেউ ওগুলোর তলা খুঁড়তে যাবে না। আপনি জানেন কি, মানুষের মাংসে চমৎকার সার হয়?'
শিবাজীর শরীরে একটা কনকনে স্রোত বয়ে গেল যেন। সে মুখে ফিরিয়ে দেখল সীতেশ দ্রুত পায়ে এদিকে আসছে। বাবুরাম আবার সোজা হয়ে গলা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার?'
'সারা রাত কি জেগেই কাটাব?' সীতেশ সিঁড়ির মুখে দাঁড়াল।

'ঘুমুতে চাও, ঘুমোও। যে ঘুমিয়ে থাকে তার ভাগ্যও ঘুমিয়ে থাকে।'

'জ্ঞান দেবেন না। এসব প্ল্যান আমাকে আগে বলেননি কেন?'

'কী সব প্ল্যান?'

'আপনি ওর সঙ্গে আঁতাত করতে চান?'

'বললে কী করতে?'

'আমি আপনার সঙ্গে থাকতাম না। শুনুন, হয় আমাকে বেছে নিন নয় ছেড়ে দিন।' সীতেশের মুখ কঠিন।

'ছেড়ে দিলে যাবে কোথা?'

'সেটা আমার চিন্তা।'

'আমারও। তোমাকে তো ছেড়ে দিতে পারি না সীতেশ। তুমি বরং এক কাজ করো। আমার গাড়িতে একজন রয়েছে অনেকক্ষণ, খুব কষ্ট হচ্ছে তার, তাকে নিয়ে এস। না, এখানে আনার দরকার নেই—।' বাবুরাম থামল, বোধহয় কি করা যায় চিন্তা করল, সেই সময় সীতেশ জিজ্ঞাসা করল, 'কে আছে?'

'অ্যাঁ? ওহো। চ্যাটার্জি সাহেব পুলিসের কাছে যাকে পাঠিয়েছিলেন আমাদের ধরিয়ে দিতে। সুন্দরী মহিলাটি আর সামন্তবাবুর কোয়ার্টার্স পর্যন্ত যেতে পারেননি, আমিই তুলে এনেছি। অবশ্য আনতে খুব বেগ পেতে হয়েছিল।' বাবুরাম হাসল।

শিবাজীর শরীর শিথিল হয়ে এল, 'ওঁর সঙ্গীকে কী করেছেন?'

'সঙ্গী? সঙ্গী ছিল নাকি? কে?' বাবুরামের চোখ বড় হয়ে উঠল।

শিবাজীর নার্ভাস ভাবটা সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেল। তাহলে লাবণ্যর সঙ্গে যে মদেশিয়া মেয়েটি ছিল তাকে দেখতে পায়নি এরা। সে যদি সামন্তবাবুকে খবরটা দেয়। শিবাজী বলল, 'বড় ভুল করে ফেললেন বাবুরামবাবু!'

'আমাকে ধোঁকা দিচ্ছেন না তো?

এবার সীতেশ মাথা নাড়ল, 'না বোধহয়। ওই মেয়েটা সব সময় লাবণ্যর সঙ্গে থাকে। আমি অনেক আগে আপনাকে বলেছিলাম সামন্তকে সরান, তখন দয়া দেখালেন। এখন যদি ও পুলিসকে—, এখনই থানায় যাওয়া উচিত।'

'ঠিক কথা। তুমি এখানে থাকো, আমি থানায় যাচ্ছি।'

'না, আপনি এদিকটা দেখুন, আমি যাচ্ছি।'

'নো!' চিৎকার করে উঠল বাবুরাম, 'তোমার যাওয়া চলবে না।'

'কেন? আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন?'

'ইয়েস।' তারপর হেসে ফেলল বাবুরাম, 'পুলিস এসে আমাদের কিছুই করতে পারবে না। ভয় পাচ্ছ কেন? চ্যাটার্জি সাহেবের সঙ্গে আমার রফা হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা পরস্পরকে দেখব। তাই না?'

শিবাজী উঠে দাঁড়াল। এই লোকটাকে সে বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ বাবুরামের গলার স্বর শীতল হয়ে গেল, 'চ্যাটার্জি সাহেব, আমি কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নই। আপনি বলুন আমার প্রস্তাবে রাজি আছেন কি না! নষ্ট করার মত সময় আমার নেই।'

'ভাবতে হবে।'

'নো। অন দি স্পট বলুন।'

'ঠিক আছে।' শিবাজী নিঃশ্বাস ফেলে বলল।

সীতেশ যেন খুব অবাক হয়ে গেল। তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল, 'বাঃ, চমৎকার! আদর্শবান লোক!'

'বুদ্ধিমান মানুষ।' বাবুরাম বলে উঠল,'সীতেশ, তুমি চটপট ওই বাচ্চা আর মহিলাকে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাও। সোজা সর্দারের ধাওড়ায় চলে গিয়ে জিম্মা করে দিয়ে আবার এখানে ফিরে আসবে। কুইক।'

সীতেশ যেন খুশি হল। তারপর বড় বড় পায়ে এগিয়ে গেল গাড়িটার দিকে। বাবুরাম হাত বাড়ালেন, 'আসুন, বন্ধুত্ব হোক। আরে মশাই কোম্পানি আপনাকে প্রয়োজনে চাকরি দিয়েছে। প্রয়োজন মিটে গেলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তা এই ফাঁকে আপনারও কিছু হোক আমারও হোক। নিন, হাত মেলান।' শিবাজী তখনও সীতেশকে দেখছিল। সে নিচু গলায় জিজ্ঞাসা কর, 'ও যদি পালিয়ে যায় তাহলে কী করবেন?'

'কে, সীতেশ! আরে মশাই ওর নাড়ী নক্ষত্র আমার জানা। তাছাড়া মিসেস সোমকে কব্জা না করে ও পালাবে না। বেচারা যত পাত্তা না পাচ্ছে তত লোভ বেড়ে যাচ্ছে। আপনার ভাইকে আপনি চেনেন না?'

সীতেশ ততক্ষণে গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে। তারপর জিপের পেছন দিকে চলে গিয়ে লাবণ্যকে নামিয়ে আনল। লাবণ্য দাঁড়াতে পারছেন না সোজা হয়ে। তাঁর হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে হেসে হেসে কিছু বলছে। বাবুরামের সঙ্গী ড্রাইভার দূরে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে। মাথা নাড়ছেন লাবণ্য। হাত নেড়ে তাঁকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে সীতেশ। একটু আগে আটক করা মদেসিয়া ছেলেটা জিপেই রয়ে গেছে। লাবণ্য চারপাশে তাকাচ্ছেন। সীতেশ হাসিমুখে তাঁর হাত ধরতে যেতেই তিনি এক ঝটকায় সরে গেলেন। বাবুরাম হেসে বলল, 'খেলা দেখুন! শালা এখন প্রেম প্রেম খেলছে।' সে চিৎকার করে উঠল, 'সীতেশ! কী হচ্ছে কী? জলদি!'

সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্য ঘাড় ফিরিয়ে এদিকে তাকালেন। দূরত্বটা বেশ তবু তাঁর মুখ চোখে ভয় ফুটে উঠেছে দেখা গেল। এবং তারপরেই লাবণ্য দিশেহারা হয়ে দৌড়াতে শুরু করলেন। শিবাজীর বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। লাবণ্য বাচ্চাটার মত ভুল করেননি। তিনি দৌড়াচ্ছেন গেটের দিকে মুখ করে। সীতেশ এবার পিছু নিয়েছে তাঁর।

বাবুরাম এখন উত্তেজিত। সিঁড়ির মুখে ছুটে গিয়ে চিৎকার করলেন, 'ফিনিশ হার, ফিনিশ হার।'

আর সঙ্গে সঙ্গে কথাটা অদ্ভুত ভাবে নাড়িয়ে দিল শিবাজীকে। এখন এদিকটা ফাঁকা। বাবুরাম উত্তেজিত হয়ে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। তার ঠিক পেছনে সে। শিবাজী আর দেরি করল না। আচম্বিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবুরামের ওপর। উত্তেজনায় এই ধরনের সম্ভাবনার কথা খেয়াল ছিল না বাবুরামের। হতভম্ব ভাবটা কাটবার আগেই শিবাজী তাকে বারান্দায় শুইয়ে ফেলল। প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বাবুরাম বলল, 'বেইমান, শালা বেইমান!' তার একটা হাত ওই অবস্থায় পকেটের দিকে যাচ্ছিল। শিবাজী সমস্ত শক্তি জড় করে বাবুরামের মুখে ঘুষি মারল। কেঁপে উঠল বাবুরামের শরীর, তার পরই মুখের একপাশ দিয়ে রক্ত চলকে উঠল। এবং তখনই শিবাজী দেখল বাবুরামের ডান হাত রিভলবারটাকে আঁকড়েছে। সে আর একটা আঘাত করতেই বাবুরাম অসাড় হয়ে গেল। সন্তর্পণে রিভলবার তুলে নিল শিবাজী। তারপর ঘর থেকে পড়ে থাকা দড়িটা তুলে নিয়ে জুত করে বাবুরামকে বেঁধে ফেলল সে। এই দড়ি দিয়ে ওরা ছেলেটাকে বেঁধেছিল।

জ্যোৎস্নার রঙ এখন ঘোলাটে। শিবাজী বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস ফেলল। বাবুরামের

গাড়িটার পাশে দাঁড়িয়ে তার ড্রাইভার দাঁত বের করে হাসছে। ওপাশে গেটের কাছে সীতেশ লাবণ্যকে টেনে নিয়ে আসছে। শাড়ি খুলে গেছে লাবণ্যর। শরীরের অর্ধেক মাটিতে লুটোচ্ছে। সীতেশ চিৎকার করে ড্রাইভারকে কিছু বলতেই ড্রাইভার তড়াক করে গাড়িতে উঠে বসে সেটাকে ঘুরিয়ে গেটের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। শিবাজী বুঝতে পারল এবার সীতেশ লাবণ্যকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাবে। শিবাজী রিভলবার গাড়িটার দিকে টিপ করতে গিয়ে একটু নার্ভাস হল। কারণ সে এর আগে কখনও এই অস্ত্র ছোঁড়েনি! তারপরই গুলির শব্দ হল। বাবুরাম যে এটাকে প্রস্তুত করে রেখেছিল এইটে আবিষ্কার করে খুশি হল শিবাজী।

গুলির শব্দ হওয়ামাত্র জিপটা থেমে গেল। শিবাজী বুঝতে পারল তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। কিন্তু ড্রাইভার সিট ছেড়ে নেমে এসে অবাক হয়ে বাংলোর দিকে তাকাতেই শিবাজী কাঠের বিমের আড়ালে সরে এল। সীতেশ চিৎকার করে ড্রাইভারকে কিছু বলতেই ড্রাইভার হাত নেড়ে বাংলোটাকে দেখাল। তারপর দৌড়ে গিয়ে লাবণ্যকে ধরল। সীতেশ এবার চূড়ান্ত ভুলটা করে বসল। সে লাবণ্যকে ড্রাইভারের ভরসায় রেখে সোজা এগিয়ে আসতে লাগল বাংলোর দিকে। যখন সে ফুলের বেড়ের কাছাকাছি তখন আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল শিবাজী, 'মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়া সীতেশ।'

সীতেশ যেন ভূত দেখল। সে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না বারান্দার সিঁড়িতে শিবাজী রিভলবার হাতে দাঁড়িয়ে আছে। শিবাজী আবার বলল, 'দ্বিতীয়বার গুলি করতে আমি দ্বিধা করব না, তুই আমার মাকে খুন করেছিস। হাত তোল।'

এবার সীতেশের হাত ধীরে ধীরে মাথার ওপর উঠল। ওর মুখ রক্তশূন্য। শিবাজী ধীরে ধীরে নিচে আসতেই ড্রাইভার দৃশ্যটাকে দেখতে পেল। বাবুরামকে দেখা যাচ্ছে না এবং সীতেশ ফাঁদে পড়েছে এটা বুঝতেই তার হাত শিথিল হয়ে গেল। এক মুহূর্ত দেরি করল না লোকটা। লাবণ্যকে সেখানেই ছেড়ে দিয়ে চোঁ চোঁ দৌড়াল গেট ছাড়িয়ে জঙ্গলের রাস্তায়।

শিবাজী রিভলবারটাকে সীতেশের বুকের দিকে লক্ষ্য করে বলল, 'এবার হাঁটু গেড়ে বস্। তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়্। চালাকির চেষ্টা করবি না।'

সীতেশ এতক্ষণে ধাতস্থ হয়েছে, 'দাদা!'

'আমি দ্বিতীয়বার অনুরোধ করব না।'

সীতেশ হাঁটু গেড়ে বসে ধীরে ধীরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তেই শিবাজী তার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর আড়চোখে লাবণ্যর দিকে তাকাল। লাবণ্য এগিয়ে আসছেন। সমস্ত দৃশ্যটা তাঁর চোখের সামনে ঘটেছে। কাছাকাছি হতেই শিবাজী বলল, 'একে বাঁধতে হবে! আপনি একটা কাজ করবেন? ওপরের ঘরে দড়ি আছে, নিয়ে আসবেন?'

লাবণ্য কোনো কথা বলল না। সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠে গেল ওপরে। উঠেই চিৎকার করে উঠল। শিবাজী বলল, 'ভয় পাবেন না, মরেনি, অজ্ঞান হয়ে গেছে।

সীতেশ মুখ তুলল, 'দাদা, আমি ক্ষমা চাইছি।'

শিবাজী উত্তর দিল না। তার রিভলবারটা স্থির।

দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়ে গেলে শিবাজী রিভলবারটাকে সরাল, 'মাফ করবেন, আপনাকে আমি ঝামেলায় ফেলেছি। কিন্তু এখন আর চিন্তার কিছু নেই। শুধু একটা স্বীকারোক্তি ওকে দিয়ে করাতে হবে?'

শিবাজী সীতেশের দিকে ঝুঁকে বলল, 'বাবুরাম বলেছে তুই মিস্টার সোমকে খুন করেছিস।'

'না, মিথ্যে কথা। ও-ই করিয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন লাবণ্য। তাঁর দু হাত মুখ ঢেকেছে।

শিবাজী বলল, 'না, বিশ্বাস করি না। বাবুরাম বলেছে তুই ওকে খুন করে জলে ফেলে দিয়েছিস। সত্যি কিনা বল্?'

'আমি খুন করিনি।'

'তাহলে .কোথায় আছে ওর ডেডবডি?'

'জানি না।'

'তুই তখন বলেছিলি এই বাংলোর মাটিতে আছে।'

সীতেশ মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'ওই ফুলের বেডের নিচে।'

লাবণ্য তখনও কাঁদছিলেন। কথাটা কানে যাওয়ামাত্র ছুটে গেলেন ফুলের গাছগুলোর দিকে। শিবাজী ওঁর পাশে দাঁড়াল, 'আপনি স্থির হন।'

লাবণ্যর মুখ সাদা, থর থর করে কাঁপছেন। কোনোরকমে বললেন, 'আমি জানি না, জানি না।' চূড়ান্ত সত্য আবিষ্কৃত হওয়ার পর এতদিনের লড়াই করা মনটা চুরমার হয়ে যাচ্ছিল তাঁর। তারপরেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, 'আমি কী করব! আমার যে কিছুই রইল না!'

কুঠির মাঠে জমায়েত হয়েছে। লাভবার্ডের মানুষ ভেঙে পড়েছে আজ। একটি মঞ্চ তৈরি হয়েছে, মাইক এসেছে। সামন্তবাবু উদ্যোগী হয়ে সব ব্যবস্থা পাকা করেছেন। আজ লাভবার্ড চা-বাগান আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হবে। টমসন অ্যান্ড হিউসের চেয়ারম্যান টি. কে. সেন সোজা কোলকাতা থেকে উড়ে এসেছেন শর্মাকে সঙ্গে নিয়ে এই দিন। শ্রমিকরা তাঁর বক্তৃতা শুনছিল, 'আমি কোম্পানির হয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে প্রতিটি শ্রমিকের সুস্থ জীবনযাত্রা যাতে সম্ভব হয় তার দিকে আমরা লক্ষ্য রাখব। আশা করি এই বাগানে আর কারো কালো হাত স্পর্শ করবে না। শ্রমিকের বাসস্থান সুনির্মিত হবে, তারা যাতে অন্য বাগানের শ্রমিকদের সমান হারে বেতন ও সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করা হবে। আজ এই চা-বাগানে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে আমি আমাদের ম্যানেজার শিবাজী চ্যাটার্জির কাছে কৃতজ্ঞ। নিজের জীবন বিপন্ন করে তিনি যেভাবে এখানে প্রাণ আনলেন তার জন্যে কোম্পানি তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমি আমাদের প্রাক্তন ম্যানেজার মনীশ সোমের বীরত্বের কথা স্মরণ করছি।'

ঠিক সেই সময় একজন শ্রমিক ছুটতে ছুটতে সামন্তবাবুর কাছে কিছু বলতেই সামন্তবাবু মঞ্চে উঠে এসে শিবাজীকে সেটা নিবেদন করলেন। শিবাজী সেন সাহেবের দিকে উঠে এল, 'স্যার!' মিসেস সোম বাগান ছেড়ে চলে যাচ্ছেন!'

'আই সি! কিন্তু আমরা কী করতে পারি!' মাইকে তাঁর গলা ভেসে গেল।

'আমাদের বাগানে একজন মানুষ দরকার যিনি শ্রমিকদের সুবিধে অসুবিধে দেখবেন, তাদের পাশে থাকবেন। আমরা প্রডাকশন নিয়ে ব্যস্ত থাকব। কিন্তু ভাল কাজ পেতে গেলে ওদের জন্যে একজনকে চাই।' শিবাজী বলল।

সেন সাহেবের চোখ ছোট হয়ে এল। তিনি হাসলেন, 'বেশ তো, এই প্রস্তাবটা ওঁকে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু উনি কিছুতেই শুনছেন না। আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন অথচ ওঁর যাওয়ার জায়গা নেই। মানবিকতার খাতিরেই—'।

হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে সেন সাহেব ঘুরে শর্মার দিকে তাকালেন, 'শর্মা, তুমি পারবে—'?

শর্মা মাথা নাড়ল, 'নো স্যার। আমি ঠিক মেয়েদের—!'

সেন সাহেব আবার মাইকটা টেনে নিলেন, 'এইমাত্র খবর পেলাম মিসেস্ সোম এই বাগান ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। যেহেতু তিনি মনে করেন এখানে আর তাঁর থাকার অধিকার নেই তাই

তিনি চলে যাচ্ছেন। কিন্তু কোম্পানি মনে করে যে তিনি যদি কোম্পানির হয়ে লেবার অফিসারের দায়িত্ব নেন তাহলে আপনাদের উপকার হবে আমরাও নিশ্চিন্ত হব। আপনারা কি তাঁকে চান?'

আকাশ ঝাঁপিয়ে চিৎকার উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' অজস্র হাত একসঙ্গে আন্দোলিত হতে লাগল। সেনসাহেব বললেন, 'কিন্তু আমাদের অনুরোধ উনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। আপনারা ওঁকে অনুরোধ করতে পারেন। আজকের মত সভা এখন শেষ করছি। দুপুর একটায় যে যার কাজে যোগ দেবেন।'

সঙ্গে সঙ্গে জনস্রোতের মত মানুষ ছুটল বাংলোর দিকে। তাদের উল্লসিত চিৎকার দেওয়াল হয়ে বাংলোটাকে ঘিরে ফেলেছিল। মঞ্চে দাঁড়িয়ে শিবাজী দেখল এত মানুষের ভালবাসার ঢেউ লাবণ্যকে চঞ্চল করে দিচ্ছে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে লাবণ্য স্তব্ধ হয়ে গেছে। শ্রমিকরা ওকে চলে যেতে দেবে না।

সেন সাহেবকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি খুশি স্যার?'

সেন সাহেব বললেন, 'কেন?'

শিবাজী বলল, 'এবার আমাকে ছুটি দিতে পারেন আপনি!'

সেন সাহেব বললেন, 'মাথা খারাপ! তোমার কাজ শেষ না হলে ছুটি পাবে কী করে। এই চা-বাগানকে ঢেলে সাজাতে হবে, অনেক কাজ তোমার। বাই দ্য বাই, তোমার পোলট্রি ফার্মের দাম কত?'

শিবাজী হাসল। তারপর ঘাড় ঘোরাতেই দেখল শ্রমিকদের উল্লাস-ধ্বনির মধ্যে লাবণ্য ধীরে ধীরে বাংলোর দিকে ফিরে যাচ্ছেন।

ডানায় রোদের গন্ধ

একুশের মেলা শেষ হতে চলেছে। দুপুর থেকেই মানুষের ঢল নামছে দোয়েল চত্বরের দিকে। ফেব্রুয়ারির এই কটা দিন মানুষের ভালবাসা আকাশ ছুঁয়ে যায়। শুধু একাত্তরের শহিদ? প্রথম ভাষা-আন্দোলনে শহিদ হয়ে যাঁরা বাঙালির ইতিহাস তৈরি করেছেন তাঁদের পায়ে সেই ভালবাসা পৌঁছে যায় প্রতিটি বছর।

কিন্তু তুষার হাঁটছিল সম্পূর্ণ আলাদা কারণে। ওর একমাত্র বন্ধু হানিফ বলেছে ঠিক তিনটের সময় মেলার বাংলা অ্যাকাডেমির সামনে হাজির হতে। ঠিক সেই সময় ওর মামা আলতাফ হোসেন মেলায় আসবেন।

আলতাফ হোসেন হানিফের নিজের মামা নন। তিনি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মী ছিলেন, সম্প্রতি অবসর নিয়ে বড় বড় ব্যবসায়ীদের উপদেশ দেন এবং তা-বাবদ প্রচুর অর্থ রোজগার করেন। হানিফ বলেছে তার মামার তিনটে জাপানি গাড়ি ছাড়াও একটা মাইক্রো বাস আছে। বাড়িতে গেলেই যে মামার দেখা পাওয়া যাবে এমন নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া তিনি বাড়িতে ফিরে যান বিশ্রাম করতে। সেখানে কাজের কথা বলা মোটেই পছন্দ করেন না। আজ সেই মামা অর্থাৎ আলতাফ হোসেন সাহেব মেলায় আসবেন। হুমায়ূন আহমেদের একটা নতুন বই-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি নাকি উপস্থিত থাকবেন। হানিফ বলেছে, এই সুযোগ যেন তুষার কিছুতেই না ছাড়ে।

দোয়েল চত্বরের কাছে কোনোরকমে পৌঁছে তুষার বিপাকে পড়ল। চওড়া রাস্তাটায় গিজগিজ করছে মানুষ। খুব ধীরে তারা এগোচ্ছে। দুপাশে নানান রকমের দোকান মেলা উপলক্ষে গজিয়েছে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা যেমন রেস্টুরেন্ট করেছে তেমনি ক্যাসেটের দোকানে সুমন চট্টোপাধ্যায়ের গান বাজাচ্ছে।

ঢেউ-এর ওপর মোচার খোলার মত শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেল মেলার গেটে। ভিড় সবে শুরু হয়েছে। তাই ভেতরে পা ফেলার জায়গার এখনও অভাব হয়নি। সার সার বই-এর দোকান। কত রকমেব বই। বাংলাদেশের বইগুলোর দাম আকাশছোঁয়া। ইন্ডিয়ার বাংলা বইগুলোর দাম কম। কিন্তু এই মেলায় বিদেশি বই বিক্রি করা নিষিদ্ধ। তাই তুষারকে ফ্যাল ফ্যাল করে বইগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। তাদের গ্রামেব বাড়িতে একটা লাইব্রেরি ছিল। কিন্তু সেই লাইব্রেরিতে শরৎচন্দ্রের বই বেশি ছিল। ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, স্বপনকুমার, মোহন সিরিজ আর বিমল মিত্রের বই কিছু কিছু। সেই লাইব্রেরিটা ছিল একজন হিন্দু মাস্টারমশাই-এর পরিশ্রমের ফসল। একাত্তরের যুদ্ধের পরেও সেটা টিকে ছিল। তুষার যখন দশ বছরের বালক তখনও সে সেখান থেকে বই এনেছে। একদিন দেখা গেল তালা ভেঙে সব বই চুরি হয়ে গেছে।

এখন পকেটে টাকা নেই। দু-বেলা খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা মেটানোই যার সমস্যা তার পক্ষে বই কেনার কথা ভাবা প্রায় দিবা-স্বপ্ন দেখা। আজ এই বইমেলায় এসে তুষারের বুক নিংড়ে নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। বই-এর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে সে এগোতে লাগল বাংলা অ্যাকাডেমির অফিসের দিকে।

হানিফ দাঁড়িয়েছিল উদ্বিগ্নমুখে। তুষারকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, 'তোকে বলেছিলাম ঠিক তিনটার মধ্যে আসতে, তবু লেট করলি?'

'কী করব বল্? এত ভিড়, বাপরে বাপ। পাবলিক যেন পিঁপড়ের মত হাঁটছে।' তুষারের খেয়াল হল, 'তোর মামা আসেনি?'

'কক্ষণ। চল, জলদি চল।'

হানিফের পেছন পেছন প্রায় দৌড়াল তুষার। মানুষের ভিড়ে পায়ের তলার মাটি যেন পাচ্ছে না। শুধু মাথা আর মাথা। ঠিক ওপাশে একটা ছোট মঞ্চের আভাস। তার ওপরে তিনজন মানুষ বসে আছেন। একজন মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'ওর লেখার আমি ভক্ত একথা বললে কিছুই বলা হবে না। হুমায়ূন বাঙালির গর্ব। ইন্ডিয়ায় তো অনেক বড় লেখক আছেন, কই কার বই হুমায়ূনের চেয়ে বেশি বিক্রি হয়? বাংলাদেশে বসে বাঙালিকে সাহিত্য এবং টিভির নাটকে তিনি যে আনন্দ দিচ্ছেন তার কোনো তুলনা নেই। আজ তাঁর নতুন বই প্রকাশিত হচ্ছে পার্ল পাবলিকেশনস্ থেকে। বই-এর নাম 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়।' আপনারা সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে হুমায়ূনের অটোগ্রাফ সমেত বইটি সংগ্রহ করতে পারেন। পরিশেষে অমি হুমায়ূনকে কিছু বলতে অনুরোধ করছি।'

তুষার একটা ইটের ওপর দাঁড়িয়ে দেখছিল। মঞ্চ এবং তাদের মধ্যে অন্তত এক হাজার মানুষ। সে দেখল একজন বেঁটে এবং রোগা মানুষ মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ইনিই হুমায়ূন আহমেদ নাকি? দেখলে তো স্কুলের টিচার অথবা কেরানি বলে মনে হয়। হুমায়ূন কথা শুরু করলেন, 'আপনারা আমার নমস্কার নেবেন। আমি একজন সাধারণ লেখক। আপনাদের ভালবাসা পেয়েছি এটাই আমার সমস্ত জীবনের পাথেয়। আপনারা আমার বই কেনেন, এটা তো ভাল লাগার কথা। কিন্তু বই বিক্রির ওপর সাহিত্যের মান নির্ভর করে না। বাংলা ভাষায় একজন মানুষ লিখতেন, তাঁর নাম সতীনাথ ভাদুড়ি, জাগরী, ঢোঁড়াই চরিত মানস তাঁর বই-এর নাম। সেসব বই বেশি বিক্রি হয়নি। সেরকম বই যদি আমি লিখতে পারতাম তাহলে ধন্য হয়ে যেতাম। তারাশংকর, সমরেশ বসু, বিমল কর আমার প্রিয় লেখক। বই বিক্রির হিসেব নিয়ে তাঁদের মান যাচাই করার কোনো অধিকার কারও নেই। এঁদের কাছে আমি অতি নগণ্য। তবু আপনারা আমার ওপর যে আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন, তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

হুমায়ূন আহমেদ সরে যেতেই পার্ল পাবলিকেশনস্ থেকে আবেদন করা হচ্ছিল সবাইকে সুশৃঙ্খল হয়ে লাইনে দাঁড়াতে। তুষার হানিফকে জিজ্ঞাসা করল, 'আগের মানুষটা মামা, না?'

হানিফ মাথা নাড়ল। 'দূর। মামা চুপ্‌চাপ বসে আছে মঞ্চে। ওই উঠল। উনি কথা কম বলেন, কাজ করেন বেশি। চল, ওইদিকে যাই।'

পাবলিক যখন হুমায়ূন আহমেদের অটোগ্রাফসমেত বই নেবে বলে লাইন দিচ্ছে তখন তুষার আর হানিফ এগিয়ে যেতে পারল। মঞ্চ থেকে যে ভদ্রলোক নেমে এলেন তাঁর বয়স হয়েছে। মাথায় টাক, শরীর বড়। চোস্ত পাজামা আর ঢোলা পাঞ্জাবি পরনে। ওটা যে আড়ং-এর পাঞ্জাবি তা দেখেই বোঝা যায়।

আলতাফ হোসেনের সঙ্গে আরও দুজন লোক ছিলেন। তাঁরা 'আসেন ছার, আসেন ছার' করে পথ করে দিচ্ছিলেন। হানিফ সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'মামা।'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন। এক মুহূর্ত। তারপরই বললেন, 'আরে, হানিফ না, কী খবর? সবাই ভাল আছে?'

'আছে। শুধু আব্বু একটু হাঁপানিতে ভুগছেন।'

'ওহো! তা মেলা দেখতে এসেছ বুঝি? বাঃ। ভাল।'

'মামা, এর নাম তুষার। আমার বন্ধু। ওকে নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।'

আলতাফ হোসেন চোখ ছোট করে তাকালেন, 'বাবার নাম কী?'

'নুরুদ্দিন আহমেদ।' কাঁপা গলায় বলল তুষার।

'হুম্। আমার কাছে কোনো প্রয়োজন আছে?'

'হ্যাঁ, আমার বড় অভাব। চাকরি চাই। যদি আপনি দয়া করেন।'

'ওহো! আরে ভাই চাকরি কি গাছের ফল যে পাড়ব আর পাবলিককে বিলিয়ে দেব। চেষ্টা করো, করতে করতে একদিন ঠিক পেয়ে যাবে।' আলতাফ হোসেন সঙ্গীকে নিয়ে এগোতে চাইলেন। হানিফ বলল, 'মামা, আমি ওকে নিয়ে খুব আশা করে এসেছি আপনার কাছে। যদি কিছু করে দেন তাহলে ও বেঁচে যায়।'

'কতদূর পড়েছ?'

'বি. এ. পরীক্ষার জন্যে বসে আছি। সেসন জ্যাম।'

'এনি এক্সট্রা কোয়ালিফিকেশন?'

তুষার অসহায় চোখে তাকাল হানিফের দিকে। সে গান গাইতে পারে না, কোনো খেলাধুলায় তার পারদর্শিতা নেই। আজকাল সবাই কম্প্যুটার শিখছে, পয়সার অভাবে সেটাও শেখা তার হয়ে ওঠেনি।

'সাঁতার জানো? ইংলিশ চ্যানেল পার হতে পারবে?' তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন আলতাফ হোসেন, 'পারলে কাল সকালে নাস্তার আগে আমার বাড়িতে এসো। আচ্ছা—!' আর দাঁড়ালেন না তিনি।

হানিফের পাশে দাঁড়িয়ে তুষার দেখল জনারণ্যে হারিয়ে গেলেন তিনি।

মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল তুষারের। হানিফের কথায় খুব আশা নিয়ে সে এই একুশের মেলায় এসেছিল। হানিফ বলেছিল উনি চেষ্টা করলে ঢাকার অনেক অফিসে তুষারের চাকরি হয়ে যাবে। তার বদলে—।

হানিফ মুখ ঘোরালো, 'এই, তোর গ্রামে নদী নেই?'

'না। বিল ছিল, এখন বিলে পানি নেই।'

'সাঁতার জানিস না?'

'জানি। কিন্তু তাকে জানা বলে না।'

'গ্রামের ছেলে হয়ে সাঁতার জানিস না? সাঁতার আর সাইকেল তো—!'

'সাইকেল পারি। খুব ভাল পারি। একবার একশো কিলোমিটার রাইড করেছি। দুই চাকার সাইকেলকে এক চাকায় চালাতে পারি।'

হানিফ বিড়বিড় করল, 'সাইকেলে কী হবে!' তারপরেই চেঁচিয়ে উঠল, 'হতে পারে। তুই একটানা কতক্ষণ সাইকেল চালাতে পারবি?'

'কতক্ষণ মানে?' তুষার অবাক।

'এই ধর, চব্বিশ, না-না, বাহাত্তর ঘণ্টা সাইকেল থেকে নামবি না। শুধু চালাবি আর চালাবি। জোরে নয়, ধীরে ধীরে, কিন্তু চাকা থামবে না। পারবি?'

'সেকি? ঘুমাবো কখন?' গলা শুকিয়ে গেল তুষারের।

'ঘুমাবি না। তিনরাত না ঘুমালে মানুষ মারা যায় না।'

'কিন্তু প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলো—'

'সলিড খাবার খাবি না। আর তেমন হলে আমরা কাপড় দিয়ে আড়াল করে দেব তুই সাইকেল চালাতে চালাতে বেডপ্যানে ওসব করে নিবি।'

'কিন্তু এসব করে কী লাভ হবে?'

'খুব লাভ হবে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তোর এই শো হবে। অবিরাম সাইকেল চালনা। সর্বকালের রেকর্ড ভাঙতে চলেছেন তুষার আহমেদ। পাবলিক ভিড় করে দেখতে আসবে। খবরের কাগজগুলো নিউজ করবে। লোকে তোকে পুরস্কার দেবে। তখন মামাকে বলা যাবে চাকরির কথা।'

'যদি না পারি?'

'পারতেই হবে। চাকরির জন্যে লোকে কত কি করে, তুই তিনদিন সাইকেল চালাতে পারবি না। দেখিস, ঠিক তোকে টিভিতে দেখাবে।' হানিফ চোখ বন্ধ করল, 'প্রথমে বাংলাদেশ টিভি তারপর স্টার, বিবিসি, সি এন এন, —উঃ।'

'কিন্তু এখানে তো আমার কোনো সাইকেল নেই।'

'ওটা কোনো প্রব্লেম না। আমাদের বাড়িতে একটা ভাল সাইকেল আছে। কাল থেকে তুই প্র্যাকটিশ শুরু করে দে। সাতদিন পর তোর অনুষ্ঠান।'

'কিন্তু তোর মামা যে আগামীকাল ওঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন।'

'কালকে যাওয়ার চেয়ে সাকসেসফুল হয়ে যাওয়াটাই ভাল। এই শোন, আমার একটু কাজ আছে, আমি এখন যাচ্ছি।' হানিফ চলে গেল।

চারপাশে বই আর বই। মানুষ এই একুশের মেলায় এসেছে নতুন বিষয় জানার জন্যে যা তারা বই-এর পাতায় পাতায় পাবে। তুষারের চোখের সামনে তখন একজন তরুণ যে তিনদিন ধরে সাইকেলে অবিরাম পাক খেয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ বোমা পড়ার শব্দ হল। একটা স্টলের ওপর আক্রমণ হচ্ছে। লোকজন ছুটছে। তুষার ছুটল। মেলার বাইরের রাস্তায় পৌঁছাতেই কানে এল, 'আমার ভাই-এর রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'?

তুষার শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। শহিদের রক্তে যদি এদেশের মানুষের ভাষা পৃথিবীর স্বীকৃতি পায় তাহলে সে কেন পারবে না? শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যদি একটা চাকরি পাওয়া যায়, তাহলে গ্রামে অপেক্ষায় থাকা বাবা মা ভাই বোনের মুখগুলো কী অপার খুশিতে ভরে যাবে! হ্যাঁ, তাকে পারতেই হবে।

সকালে ঘুম ভাঙার পর তুষার বিছানা ছাড়েনি অনেকক্ষণ। তার রুমমেট ছেলেটি ফরিদপুরের। খুব ভাল ছেলে। বাড়ি থেকে প্রচুর খাবার নিয়ে লোকজন আসে ওর কাছে। তুষার দেখল সিরাজ সাতসকালেই বেরিয়ে গিয়েছে। এই মেসে তার খোঁজখবর এখন কেউ নিচ্ছে না। গোছল করে চা বিস্কুট খেয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়। যেমন সে রোজই করে। কিন্তু আজ তার কিছুই ভাল লাগছিল না। ইউনিভার্সিটির দিকে সে যাবে না। রোজই এক কথা বলা। সূর্য সেন অথবা জহিরুল হক হলে আলমগীর অথবা জাহাঙ্গীরের ঘরে গিয়ে জুয়ো খেলা দেখা যায়। জুয়ো খেলে সাধারণত বড়লোকের ছেলেরা। প্রচণ্ড নেশা ওদের। ইউনিভার্সিটির ক্লাশ কখন হয় কখন হয় না, এ নিয়ে তাদের তেমন মাথাব্যথা নেই। তুষার ওদের খেলা, উল্লাস, চুপচাপ দেখতে যায়। কিন্তু আজ সেখানে যেতেও ভাল লাগছিল না। টি এস সি-সহ পাবলিক লাইব্রেরিতে যাওয়ার ইচ্ছেটাই হচ্ছে না। তার চোখের সামনে এখন একটা দু'চাকার সাইকেলের ছবি। যে সাইকেল তাকে ইঙ্গিত

লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। কিন্তু ছবিটা তার কল্পনা, বাস্তবে আনার ক্ষমতা তার নেই।

তবু তৈরি হল তুষার। দু'মাস মেসের টাকা দেওয়া হয়নি। ম্যানেজার গতকাল বলে দিয়েছিলেন দিন সাতেকের মধ্যে টাকা না দিলে তাঁর পক্ষে খাবার দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ গ্রাম থেকে চিঠি এসেছিল ওখানে কিছু টাকা পাঠালে ভাল হয়। ছাত্র পড়িয়ে সে যা রোজগার করে তা গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছে বলে তার হাত একদম খালি। এ জি অফিসের পেছনে দিকের রেস্টুরেন্টের দরজায় দাঁড়াতেই হানিফকে দেখতে পেল। জব্বর আড্ডা চলছে ওখানে। বেলাল, সাঈদ আর মতিন রয়েছে হানিফের সঙ্গে। সে টেবিলের কাছে পৌঁছাতেই মতিন বলল, 'চালিয়ে যাও গুরু, আমরা তোমার সঙ্গে আছি।'

চেয়ার টেনে বসল তুষার। বুঝতে পারল হানিফ ইতিমধ্যে বন্ধুদের ব্যাপারটা বলেছে। হানিফ জিজ্ঞাসা করল, 'নাস্তা করেছিস?'

মাথা নাড়ল তুষার। তাকে খুব হতাশ দেখাচ্ছিল।

হানিফ একটা মোগলাই পরোটার অর্ডার দিল।

বেলাল জিজ্ঞাসা করল, 'পাবলিসিটির কী ব্যবস্থা করবি?'

সাঈদ বলল, 'আমার এক দাদা ইত্তেফাকে কাজ করে। ওকে বললে খবরটা ছাপিয়ে দেবে। আর ওকে ধরলে আজকের কাগজ, ভোরের কাগজেও হয়ে যাবে।'

মতিন বলল, 'শোন তুষার, আমরা এতক্ষণ তোকে নিয়ে আলোচনা করছিলাম। ধানমণ্ডীতে সাত নম্বর রোডের কাছে লেকের ধারে জায়গা ঘিরে নিয়ে করলে কেমন হয়? এটা অবশ্য আমার সাজেশন। সঈদ বলছিল, ইউনিভার্সিটিব ছাত্র তাই ওখানেই হোক কিন্তু ওই সময়ে যদি হঠাৎ গোলমাল শুরু হয়ে যায় তাহলে?'

বেলাল বলল, 'আমি বলছি বেস্ট জায়গা হল বাংলা অ্যাকাডেমির চত্বর। তখন মেলা থাকবে না। পরিষ্কার জায়গায়, কোনো ঝামেলা নেই।'

অনেক তর্কের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বাংলা অ্যাকাডেমিতে গিয়ে অনুমতি চাওয়া হবে যাতে তাঁরা তুষারকে অবিরাম সাইকেল চালানোর অনুমতি দেন।

এইসব কথাবার্তা শুনে তুষারের মন একটু ভাল হল। বন্ধুরা যখন সাহায্য করছে তখন সাইকেল নিশ্চয়ই জোগাড় হয়ে যাবে। আর এখন তো বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা শুধু প্যাডেল ঘুরিয়ে সাইকেল চালিয়েই শেষ নয়, অনেক আয়োজন করতে হবে। দলে দলে লোক আসবে তাকে দেখতে। মুক্ত উদ্যানে যেরকম অনুষ্ঠান হয় সেরকম আর কী!

চা খাওয়া হয়ে গেলে মতিন দাম মিটিয়ে দিল। ওদের মধ্যে মতিনের অবস্থা সবচেয়ে ভাল। দেশে প্রচুর জমিজমা ছাড়াও ওর বাবার গার্মেন্টি ফ্যাক্টরি, চাচার এক্সপোর্টের ব্যবসা রমরমা করে চলছে। সাঈদ একবার ওকে বলেছিল তুষারের চাকরির ব্যবস্থা করতে। প্রস্তাবটা শুনে মতিন তুষারের হাত ধরেছিল, 'প্লিজ এই রিকোয়েস্ট করিস না, আমাদের ওখানে কাজ নিলে তুই আমারও চাকর হয়ে যাবি, বন্ধুত্ব থাকবে না।'

কথাটা তখন ভাল লাগলেও পরে মনে হয়েছিল মতিন বোধহয় এড়িয়ে গেল। চাকরি করতে গেলে তাকে কারও চাকর তো হতেই হবে। সেটা হলে যদি পেটভরে, বাড়ির লোকজন খেয়ে বাঁচে তাহলে বন্ধুত্ব গেলে কি ক্ষতি! কিন্তু প্রসঙ্গ আর তুলতে পারেনি সে।

হানিফ উঠে দাঁড়াল, 'চল!'

'কোথায়?'

'মামার ওখানে। আজ যাওয়ার কথা ছিল, না গেলে খেপে যেতে পারে।'

'তোর মামা বলেছিল সাঁতরে ইংলিশ চ্যানেল পার হতে পারলে নাস্তার আগে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। তোর মনে নেই?' তুষার বলল।

'হ্যাঁ। তোকে অত ভাবতে হবে না। তুই চল আমার সঙ্গে।' হানিফ বলল।

'কিন্তু তুই বলেছিলি সাকসেসফুল না হয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা না করতে।'

'তখন তো এই পরিস্থিতি ছিল না।'

তিনটে বিদেশি গাড়ি যার গ্যারেজে পাশাপাশি থাকে তাঁর বাড়ির আয়তন যে বড় হবে, তা তুষারের কল্পনায় ছিল। কিন্তু বাড়িটার চেহারা দেখে সে হকচকিয়ে গেল। বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই যুক্তিসঙ্গত। প্রাসাদ পাহারায় দারোয়ান আছে। সে গেটের ভেতর থেকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। হানিফ নিশ্চয়ই তার এই মামার কাছে নিয়মিত আসে না। নইলে দারোয়ানটা তাকে চিনতে পারবেন না কেন?

পরিচয় জেনে দারোয়ান যাচাই করতে ভেতরে চলে গেলে হানিফ বলল, 'এই হল ঝামেলা। মামা এক লোককে সাতদিনের বেশি দারোয়ানের কাজে রাখে না।'

'কেন?' তুষার জিজ্ঞাসা করল।

'মামার ধারণা বেশিদিন এক কাজ করলেই ফাঁকি দিতে শুরু করবে। তাছাড়া সুযোগ-সন্ধানীরা ভাব জমিয়ে নেবে ফলে নিরাপত্তা নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। এটা নতুন লোক, তাই আমাকে চিনতে পারছে না।'

তুষার দেখল দারোয়ান ফিরে আসছে, সঙ্গে পাজামা সার্টপরা একজন প্রৌঢ়। প্রৌঢ়টি লোহার গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখলেন, 'অ! তুমি? তা হঠাৎ কী মনে করে? তোমার বাবা কেমন আছেন?'

'ওই আর কি! আছেন।' হানিফ হাসল, 'আপনি ভাল আছেন?'

'ভাল না থাকলে, গেট পর্যন্ত এলাম কী করে? আলতাফের সঙ্গে দেখা করতে?'

'আজ্ঞে। উনি আজ আসতে বলেছিলেন।'

'ইনি কে?'

'আমার বন্ধু, তুষার। ওকে নিয়ে আসতে বলেছিলেন।'

'ওর সঙ্গে আর্মস নেই তো?'

'কি যে বলেন মামা!'

'দিনকাল খারাপ। মানুষ তো মানুষের ভাল সহ্য করতে পারে না। এই, খোল্।'

গেট খুলে গেল। ওরা প্রৌঢ়কে অনুসরণ করল। দুপাশে বাগান, মাঝখানে সিমেন্টের চওড়া রাস্তা যেটা গাড়ি বারান্দার নিচে পৌঁছেছে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে একটা চিৎকার কানে এল। মেয়েলি কণ্ঠে বিরক্তি ছিটকে উঠছে।

প্রৌঢ় বলল, 'একটু ওয়েট করো।'

'কে?' হানিফ জিজ্ঞাসা করল।

'বাপবেটিতে ঝগড়া হতে পারে। হলে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।'

তুষার বুঝতে পারছিল না এ কিরকম ঝগড়া! কারণ এখন শুধু মেয়েটার গলাই শোনা যাচ্ছে। দ্রুত বলে যাচ্ছে সে। কথার মধ্যে ইংরেজি শব্দ ঠাসা এবং তার উচ্চারণ তুষারের অ-শোনা।

ঝগড়া হলে অন্যপক্ষের গলাও শুনতে পাওয়া যাবে কিন্তু সেটা শোনা যাচ্ছে না। প্রৌঢ় পাশের দরজা দিয়ে ভেঁতরে চলে গেলেন।

হানিফ ফিসফিস করে বলল, 'মামার মেয়ে। নিউইয়র্কে পড়ে। খুব ভাল স্টুডেন্ট। ইংরেজি কী রকম বলছে শুনতে পাচ্ছিস?'

তুষার মাথা নাড়ল। নিউইয়র্ক তো আমেরিকায়। সেখানে তার পরিচিত কেউ কেউ চাকরি করে, দেশে টাকা পাঠায়। গ্রামের করিমচাচার ছেলে প্রতিমাসে দুশো ডলার পাঠায়। ওটা এখানে আসামাত্র দশ হাজার টাকা হয়ে যায়। তাই করিমচাচার অবস্থা এখন অনেক ভাল। অথচ করিমচাচার ছেলে কলেজেও পড়েনি। খেলাধুলা করত না। মা মাসিদের কাছে বসে থাকত, রান্না করতে পারত। নিন্দুকেরা বলে যে আমেরিকা গিয়ে রান্না করে বড়লোক হয়ে গিয়েছে নইলে মাসে দশ হাজার টাকা পাঠাতে পারে। ঘটনাটা মনে এলেই কষ্ট হয় তুষারের। সে যদি মন দিয়ে রান্নাটাও শিখতে পারত।

'এসো।' প্রৌঢ় ডাকতেই সচেতন হল তুষার। মেয়েটির কণ্ঠস্বর এখন শোনা যাচ্ছে না। হানিফের সঙ্গে সে এগোল।

কার্পেটে মোড়া বড় ঘরের একপাশে সাদা ধবধবে সোফার ওপর লাল স্কার্টব্লাউজ পরা যে মেয়েটি বসে আছে সে কি পরীর দেশ থেকে নেমে এসেছে। মোমের মত গায়ের রঙ, স্বপ্নের মত মুখ নিয়ে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।

হানিফ বলল, মামা, আমি তুষারকে নিয়ে এসেছি।

আলতাফ হোসেন আর একটি সোফায় বসেছিলেন। এখন তাঁর পরনে পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি। তিনি বললেন, 'বসো। হ্যাঁ, কী ব্যাপার বলো তো?'

ওরা বসল। হানিফ বলল, 'ওই যে মেলায় আপনার সঙ্গে কথা হল---!'

মাথা নাড়লেন আলতাফ হোসেন, 'মনে থাকে না ভাই। এত লোক কথা বলে যে মনে রাখতে গেলে পাগল হয়ে যাব। তুমি তো মমকে চেনো। ছোট দেখেছ বোধহয়।'

হানিফ মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। ও তখন ছোট ছিল।'

যার নাম মম সে কাঁধ নাচালো, 'সরি! আমি চিনতে পারছি না।'

আলতাফ হোসেন হানিফের পরিচয় দিলেন। দিয়ে বললেন, 'তোমার মাকে বলো, মেয়ে আমার খুব ভাল রেজাল্ট করেছে।' তারপরেই মেয়ের দিকে ঘুরে বললেন, 'মা, এদের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই? অ্যাঁ?'

'আমার পক্ষে যে না বলা সম্ভব নয় তা তুমি জানো।' মেয়ে ছাদের দিকে তাকাল। আলতাফ হোসেন হাসলেন, 'ইয়েস। বলো হানিফ।'

'আমার বন্ধুর চাকরির দরকার---।'

'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বলেছিলে তোমরা। সরি। আমি চাকরি দেব কোত্থেকে! নো চান্স। বিদেশি পারফিউম, সাবান বিক্রি করতে পারবে তাহলে একটা এজেন্সির সঙ্গে কথা বলিয়ে দিতে পারি। এক একটা পারফিউম দুহাজার, সাবান পাঁচশো, বিক্রি করতে পারলে ভাল কমিশন। আলতাফ হোসেন হাসলেন।

পেটের ভেতরটা শুকিয়ে গেল তুষারের। ওই দামে কিনতে পারে এমন কোনো মানুষ তার জানা নেই। ওসব জিনিসের কি অত দাম হয়? লোকটা নিশ্চয়ই ইয়ার্কি মারছে!

হানিফ বলল, 'ওটা তো ফিক্সড ইনকাম না মামা। আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার কেটে পার হতে পারবে কিনা!'

'ওটা কথার কথা বলেছিলাম। আসলে বলতে চেয়েছিলাম এমন কিছু করতে যা খবরের কাগজের নিউজ হবে, পাবলিসিটি পাবে। সেটা হলে তখন পুশ্ করতে আমার অসুবিধে হবে না।' আলতাফ হোসেন চোখ বন্ধ করলেন।

হানিফ বলল, 'আমরা সেইজন্যেই আপনার কাছে এসেছি।'

'কী রকম?' চোখ খুললেন আলতাফ হোসেন।

এই সময় মম উঠে দাঁড়াল, 'সরি। তোমার সঙ্গে আমি পরে কথা বলব।'

তুষার দেখল, রাজহংসীর মত মম ভেতরে চলে গেল।

আলতাফ হোসেন বললেন, 'উঃ। তোমরা ঠিক সময়ে এসে আমাকে বাঁচিয়েছ। হ্যাঁ, বলো, কী বলছিলে? কী মতলব?'

'তুষার খুব ভাল সাইকেল চালায়।'

'সাইকেল?' হতভম্ব হয়ে গেলে আলতাফ হোসেন।

'হ্যাঁ। বাংলা অ্যাকাডেমির চত্বরে ও অবিরাম সাইকেল চালাবে। ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ভাঙা পর্যন্ত থামবে না। এর ফলে বিশাল পাবলিসিটি পাবে। বুঝতে পারছেন?'

এক মুহূর্ত ভাবলেন ভদ্রলোক, 'বুদ্ধিটা কার?'

'আজ্ঞে আমার।' হানিফ বলল।

'এই জন্যে বলে যেমন মামা তেমন ভাগ্নে। গুড। চালিয়ে যাও। যা যা করার আমি নেপথ্যে থেকে করব। শুধু উদ্বোধন করব আমি আর রেকর্ড ভাঙার পর আমার হাত থেকে ফলের রস খেতে হবে। ঠিক আছে?' আলতাফ হোসেন উঠে দাঁড়ালেন, 'এখন তো টাকা লাগবে।'

ইত্তেফাক, ভোরের কাগজ, আজকের কাগজে খবরটা ছাপা হয়ে গেল। তরুণ বাঙালি যুবক তুষার আহমেদ আগামী শনিবার সকাল নটায় বাংলা অ্যাকাডেমির প্রাঙ্গণে অবিরাম সাইকেল চালিয়ে বিশ্বরেকর্ড করতে চলেছেন। প্রবীণ সমাজসেবী জনাব আলতাফ হোসেন অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করবেন।

হানিফরা দল বেঁধে গিয়েছিল বাংলা অ্যাকাডেমিতে। অবিরাম সাইকেল চালানোর জন্যে জায়গা দিতে কর্তৃপক্ষ প্রথমে সম্মতি দেননি। তাঁরা বলেছিলেন, এরপর যে কেউ এসে এখানে যা ইচ্ছে তাই করতে চাইবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছেলেদের উৎসাহের আধিক্য দেখে তাঁরা রাজি হয়েছেন। শর্ত রয়েছে, কোনো রকম গোলমাল হলে ওঁরা অনুষ্ঠান বন্ধ করতে পুলিশকে অনুরোধ করবেন।

খবরটা ছড়িয়ে গিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। যেহেতু তুষার কোনো রাজনীতি করে না, তার গায়ে বিশেষ কোনো ইউনিয়নের ছাপ নেই, তাই সবাই ওকে সাদরে গ্রহণ করেছে। ক্রমশ ব্যাপারটা এমন জায়গায় পৌঁছে গেল যে তুষার দিশেহারা। যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে সেই তাকে হাত চেপে বলছে, 'রেকর্ড ভাঙতেই হবে ভাই। এর সঙ্গে সমস্ত বাংলাদেশের যুবশক্তির সম্মান জড়িয়ে গেছে।'

রেকর্ড কী? অবিরাম সাইকেল চালনার শেষ সময়সীমা কত? কেউ বলছে, বাহাত্তর ঘণ্টা, কেউ বলছে নব্বুই। বেলাল খবর নিয়ে এল, 'ওটা একশো আট ঘণ্টা। নরওয়ের একটি ছেলে করেছে।'

একশো আট ঘণ্টা? সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল তুষারের। প্রায় সাড়ে চার দিন রাত তাকে সাইকেলের ওপর বসে প্যাডেল ঘোরাতে হবে। এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে সর্বনাশ। এই সাড়ে চার দিন রাত কোনো প্রাকৃতিক কাজ করা সম্ভব নয় কারণ চারপাশে দর্শক থাকবে। এটা কিছুতেই

সম্ভব নয়। একটা চাকরির জন্যে সে এসব করার চেষ্টা করে লোক হাসাতে পারবে না। সবাই তাকে দুয়ো দেবে।

তুষার ঠিক করল হানিফকে জানিয়ে গ্রামে চলে যাবে। এই চেষ্টা করাটাই বোকামি। হানিফকে একা পেয়ে কথাটা বলল সে।

আকাশ থেকে পড়ল হানিফ, 'তুই এই শেষ মুহূর্তে এসব কী বলছিস? এখন অনুষ্ঠান বন্ধ করলে আমরা কেউ ঢাকায় থাকতে পারব?'

'কিন্তু অসম্ভব। শুরু করে বন্ধ করলে আরও খারাপ হবে।'

'অসম্ভব বলে কোনো কথা নেই তুষার। এই যে মানুষ দশ সেকেন্ডের নিচে একশ মিটার দৌড়াচ্ছে সেটাও তো একসময় অসম্ভব ছিল। যারা দৌড়াচ্ছে তারা কতখানি পরিশ্রম করার পর এটা পারছে, বল? তোকে সেই পরিশ্রম করতে হবে, মনে জোব আনতে হবে বুঝলি? চল, মামা ডেকেছেন।'

'মামা?'

'হ্যাঁ। তোর জন্যে একটা নতুন সাইকেল কিনে রেখেছেন। বলছেন ট্রায়াল দিতে। পুরনো সাইকেলে রিস্ক থেকে যাবে। চল।'

আলতাফ হোসেনের বাড়ির দিকে যেতে যেতে তুষার শুনল, প্রচুর ডোনেশন পাওয়া যাচ্ছে। একজন বড় ব্যবসায়ী লোহার রড দিয়ে গোল করে জায়গাটা ঘিরে দিয়েছেন যেখানে তুষার সাইকেল চালাবে। ডাক্তার থাকবেন, তিনি ওর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন মাঝে মাঝেই।

তুষারের ইচ্ছে করছিল কি পরিমাণ ডোনেশন উঠেছে তা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু এখন সেটা করতে সঙ্কোচে হল। হানিফ ভাবতে পারে সে টাকার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। হানিফ জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে? শান্ত আছিস তো?'

তুষার নিঃশ্বাস ফেল, 'দেখি।'

'দেখি টেখি না। আর দুদিন আছে। এর মধ্যে অন্তত পঞ্চাশ হাজার ডোনেশন তুলতেই হবে।' হানিফ দৃঢ় গলায় বলল।

'পঞ্চাশ হাজার?' না বলে পারল না।

'দূর, পঞ্চাশে কী হবে। একটু আগে থেকে চেষ্টা করলে আরও বেশি উঠত। তুই শুধু রেকর্ডটা কর, তোকে এক লাখ পাইয়ে দেব।'

'এক লাখ?' গলার স্বর হঠাৎ বুজে গেল তুষারের।

হানিফ হেসে মাথা নাড়ল।

তাহলে কত টাকা উঠেছে এর মধ্যে? এক লাখ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে হানিফ? এক লাখ টাকা পেলে তার চাকরি করার কী দরকার? সে ব্যবসা করবে। গ্রামে যে সবজি দশ টাকা ঢাকায় সেটা আঠারো। গ্রাম থেকে কিনে এনে ঢাকায় সাপ্লাই দেবে। পুরনো একটা জিপ কিনে, ট্যাক্সি হিসেবে চালানো যায় গ্রামে। নগদ পয়সা। কিন্তু এসব করতে হলে তাকে সফল হতেই হবে।

এখন আলতাফ হোসেনের বাড়িতে ঢুকতে কোনো অসুবিধে হয় না। সত্যি এবাড়ির দারোয়ান প্রায়ই পাল্টায়। বাগানের ভেতর কয়েকজন অবাঙালি পাহারাদার রয়েছে। আলতাফ হোসেনের নিশ্চয়ই শত্রু আছে। তাদের ভয়ে এইসব নিরাপত্তার ব্যবস্থা রেখেছেন তিনি।

আলতাফ হোসেনের সামনে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁর পাশে একটা ব্যাগ। তাদের

দেখে আলতাফ হোসেন বললেন, 'দ্যাখো হানিফ, এর সঙ্গে আমার মান-মর্যাদা জড়িয়ে গেছে। আমি যতই নেপথ্যে থাকতে চাই তত লোকে জেনে যাচ্ছে। কাল ঢাকা ক্লাবের রাজুভাই ফোন করেছিল। বলল, ঠিক ঘোড়ায় বাজি ধরেছেন তো? আমার কিছু ভাল খবর হতে যাচ্ছে। তার আগে বদনাম হয়ে গেলে সব মাঠে মারা যাবে। আর এখন তো পিছিয়ে যাওয়ার কোনো চান্স নেই।'

হানিফ বলল, 'মামা আপনি চিন্তা করবেন না।'

'বাঙালি বলেই চিন্তা হচ্ছে। ও যদি জার্মান হত তাহলে ভাবতামই না। জার্মানরা মরার আগে পর্যন্ত হার মানে না।'

'বাংলাদেশের যুবকরাও তাই, এটা তুষার প্রমাণ করে দেবে।'

আলতাফ হোসেন উঠে এলেন তুষারের সামনে, 'শোনো, তোমাকে পারতেই হবে। যদি পারো তাহলে তোমাকে আমি মাসে এক লাখ টাকার চাকরি দেব। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটের একটা রেস্টুরেন্টের আমি মেজর পার্টনার। সেখানে তোমাকে সহকারী ম্যানেজার করে দেব। মাসে দুহাজার ডলারের ওপর মাইনে। তার মানে দেশের টাকায় এক লাখ টাকা। আন্ডারস্ট্যান্ড? আর যদি না পারো তাহলে আমার কী হবে বুঝতে পারছ?'

তুষারের কণ্ঠস্বর বের হল না।

'যদি দ্যাখো পারছ না, পড়ে যাবে সাইকেল থেকে তবু চেষ্টা করে যাবে। তুমি যদি সেটা করতে গিয়ে মারা যাও তাহলে শহিদের সম্মান পাবে। আমি কথা দিচ্ছি তোমার আব্বু আম্মার কাছে এক লাখ টাকা পাঠিয়ে দেব।'

'মারা যাব?'

'হ্যাঁ ভাই। এছাড়া কোনো উপায় নেই।'

'কিন্তু মরে যাওয়াটা তো আমার হাতে নেই। যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই, হাসপাতালে গিয়ে জ্ঞান ফিরে আসে, তাহলে?'

'হাসপাতালে তুমি যাবে না। তোমার ডেডবডি যাবে।'

'মানে?'

আলতাফ হোসেন হাসলেন, 'নাঃ। তোমাকে বলে দেওয়াই ভাল। যদি তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাও তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বোম চার্জ করা হবে। খুব শক্তিশালী বোম যাতে তোমার জ্ঞান আর না ফিরে আসে।'

'সে কি?' আঁতকে উঠল তুষার।

'এছাড়া কোন উপায় নেই ভাই। পাবলিক জানবে আততায়ীর আক্রমণে তুমি রেকর্ড ভাঙতে পারলে না। আমরা শোকসভা করব। তাতে কেউ আমার বদনাম দিতে পারবে না।' কথা বলতে বলতে আলতাফ হোসেন নিজের জায়গায় চলে গেলেন, 'ওখানে বোসো। উনি আমার বিশ্বাসী ডাক্তার। তোমাকে একটু পরীক্ষা করবেন।'

তুষারের শরীরে কোনো শক্তি ছিল না। ডাক্তার তার পালস দেখলেন, 'বাঃ। খুব ভাল। বাষট্টি। এটা যদি ষাটের নিচে থাকত তাহলে বলতাম কোনো দুশ্চিন্তা নেই। পৃথিবীর সেরা স্পোর্টসম্যানদের পালস কখনই ষাটের বেশি হয় না। ফলে খেলার সময় পরিশ্রমে সেটা বেড়ে বাহাত্তরে পৌঁছলেও ওরা বেদম হয় না। এই কারণেই নর্মাল পালসের মানুষ ভাল স্পোর্টসম্যান হতে পারে না।' পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে ডাক্তার বললেন, 'আজ পেট ভরে সলিড খাবার খাবে। কাল বিকেল

থেকে কোনো সলিড ফুড নয়। আমি তোমাকে কয়েকটা ক্যাপসুল লিখে দিচ্ছি। সাইকেল চালানোর সময় যা খাওয়ার আমি খাওয়াব।

আলতাফ হোসেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'হেলথ স্যুট করবে?'

'করা উচিত। একটু ডেফিসিয়ান্সি আছে। সেটা ঠিক হয়ে যাবে।' ডাক্তার ব্যাগ গুছিয়ে বললে, 'তাহলে আমি চলি?'

'পরশু সকালে চলে এসো।'

ডাক্তার ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

আলতাফ হোসেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুষার তুমি কোথায় থাকো?'

'মেসে।'

'ওখানে খাওয়াদাওয়া কিরকম?'

'যেমন হয়।'

'হুঁ। তুমি এখন থেকে এখানে থাকবে। এবাড়ি থেকে স্ট্রেট অ্যাকাডেমিতে যাবে। কী বলো হানিফ? আমি কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না। যারা চায় আমার বদনাম হোক তারা ওকে ইলোপ করতে পারে। তাছাড়া মেসের থেকে নিশ্চয়ই আমার বাড়ির খাবার একটু ভাল হবে।'

'সে তো ওর সৌভাগ্য। আপনি বলেছিলেন নতুন সাইকেল দেবেন।'

'হ্যাঁ। ওটা ছাদে আছে। আমার ছাদ তো ফুটবল মাঠের মত। তুমি সেখানে গিয়ে প্র্যাকটিশ করবে, কারও নজরে পড়বে না।'

হানিফ বলল, 'বি টিভিকে বলা হয়নি এখনও।'

'আরে। মূর্খ নাকি তোমরা? ওদের অফিসিয়াল চিঠি দাও। আমিও বলে দেব। হামিদভাই আছেন ওখানে। ও হ্যাঁ, তোমাদের ডোনেশন কেমন উঠল?'

'খুব বেশি নয়।' হানিফ কিন্তু কিন্তু করে বলল।

'কত?'

'লাখ দেড়েক।'

'খরচ কত হবে? বড় জোর হাজার দশেক। আরে না, না, আমি ওর ভাগ চাইছি না। তোমরা নিজেরাই ভাগাভাগি করে নিয়ে নিও। তবে হ্যাঁ, পুলিশের জন্য কিছু রেখো। ওদের তো সবক'টা দিন সব সময় দরকার।'

হানিফ বলল, 'তাহলে আমরা এখন যাই?'

'আমরা মানে? তুমি যাও। তুষার এখানে থাকবে।'

তুষার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল, 'আমি সঙ্গে কোনো জামাপ্যান্ট আনিনি। ওগুলো নিয়ে না হয় পরে আসব।'

'আর এর মধ্যে কেউ যদি তোমার ক্ষতি করে যায় তাহলে কী হবে? জবাব দাও।' হাত নাড়লেন ভদ্রলোক, 'একজন মানুষের যা যা প্রয়োজন তা এ বাড়িতে আছে। আর স্পেশ্যাল কিছুর দরকার থাকলে তুমি হানিফকে বলে দাও, সে নিয়ে এসে দেবে।'

তুষার কাতর গলায় হানিফকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী করব?'

হানিফ বলল, 'মামা তো ভাল কথাই বলছেন। তুই এখানে থাক। আরামে থাকতে পারবি। আমি তোর টুকিটাকি জিনিস এনে দিচ্ছি।'

হানিফ বেরিয়ে গেল। আলতাফ হোসেনের নির্দেশে একজন কাজের লোক তুষারকে নিয়ে এল তিনতলার পশ্চিমদিকের ঘরে। বড় ঘর, সঙ্গে টয়লেট বাথরুম। চমৎকার বিছানা। এমন ঘরে

কখনও শোয়নি তুষার। লোকটা বলল, 'কোনো কিছুর দরকার হলে বেল বাজাবেন। কক্ষনো একা বের হবেন না বাইরে। আপনি এলেন বলে বেঁধে রাখা হয়েছে, কিন্তু চারটে হিংস্র কুত্তা সবসময় ছাড়া থাকে। অচেনা লোক দেখলেই টুকরো করে ফেলবে।'

এরকম ঘরে তুষার আগে কখনও থাকেনি। পায়ের তলায় মোজায়েক করা মেঝে, দারুণ বিছানা, অ্যাটাচ্ড বাথ। বাথরুমে ঢুকে চোখ বড় হয়ে গেল তুষারের। বাথটব রয়েছে। সিনেমায় নায়িকাদের যে বাথটবে শুয়ে টেলিফোন করতে দেখেছে সে।

ঘরের একপাশে টেবিল চেয়ার। চেয়ারে বসল তুষার। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। সিগারেট সে খুব কম খায়। বাংলাদেশে তৈরি সস্তার সিগারেট একটা প্যাকেট কিনলে দিন তিনেক চলে যায়। তার অন্য বন্ধুরা বিদেশি দামি সিগারেট ছাড়া খায় না।

ব্যাপারটা যে এরকম দাঁড়াবে কল্পনা করেনি তুষার। একটা চাকরির জন্যে সে সব কিছু করতে তৈরি, কিন্তু মরতে নয়। এই অবিরাম সাইকেল চালিয়ে রেকর্ড না করতে পারলে তাকে মরতে হবে। আলতাফ হোসেন সাহেব বলেন তার রেকর্ড করা বা না করার সঙ্গে ওর সম্মান জড়িয়ে গেছে। সে যদি রেকর্ড না করতে পারে তাহলে নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্যে তিনি তাকে খুন করানোর ব্যবস্থা করেছেন যাতে সবাইকে বলতে পারেন খুন না হলে তুষার নিশ্চয়ই রেকর্ড করতে পারত। এটা জানার পর রেকর্ড না করে তার কোনো উপায় নেই। কিন্তু ইচ্ছে করলে যদি রেকর্ড করা যেত তাহলে যে কোনো ছেলেই সেটা করতে পারত। কয়েক ঘণ্টা সাইকেল চালালেই থাই ব্যথা করবে। নিঃশ্বাস ভারী হবে। একটা সময় আসবে যখন আর পা চলবে না, মাথা ঘুরবে এবং চোখে কিছু দেখতে পাবে না। এটা কারও দশ ঘণ্টা পরে হয় কারও পনের ঘণ্টা। তাহলে নরওয়ের যে ছেলেটি একশ আট ঘণ্টা সাইকেল চালিয়েছে সে কেমন করে সেটা পারল? নিশ্চয়ই দিনের পর দিন ট্রায়াল দিয়েছে। দীর্ঘ অনুশীলন না করলে কেউ এমন সাফল্য পায় না। যারা দশ সেকেন্ডের কমে একশ মিটার দৌড়ায় তারা দশ বছর অনুশীলন করে প্রচণ্ড চেষ্টা নিয়ে। অথচ সে সাইকেল চালাতো গ্রামে। তখন সাইকেলের কিছু খেলা শিখে সবাইকে অবাক করে দিত। পেছনের চাকায় ভর দিয়ে সামনের চাকা ওপরে তুলে দিতে পারত। চলন্ত সাইকেল সিট থেকে উঠে বা বাঁ পাশ থেকে ডান পাশে চলে যেতে পারত। কিন্তু এসব দিয়ে রেকর্ড করা যায় না।

বাঁচার একমাত্র পথ এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া। দরকার নেই তার টাকার। সে মরে গেলে মা-বাবা টাকা পাবে। তাতে তার কী লাভ? কিন্তু এই বাড়ি থেকে কী করে পালানো যায়? লোকটা বলে গেল ঘরের বাইরে না যেতে। চার চারটে হিংস্র কুত্তা সবসময় ছাড়া থাকে। কেন থাকে? যারা হিংস্র তাদের কেউ বাড়িতে ছেড়ে রাখে? ওদের একতলা দোতলায় না রেখে তিনতলায় রাখা হয়েছে কেন? তুষারের মনে পড়ল, তিনতলায় এই ঘরে আসার সময় সে কোনো কুকুরের আওয়াজ পায়নি। অবশ্য গল্পে পড়েছে, হিংস্র কুকুরেরা আওয়াজ করে না, নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে গলার নলি দু'টুকরো করে দেয়। তাহলে কি তাকে নিয়ে আসার সময় ওরা কুকুর দুটোকে কোনো ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল? তুষারের মনে হল ব্যাপারটা একদম ধাপ্পা। এ বাড়িতে কোনো কুকুর নেই, তাকে ভয় দেখানোর জন্যে কাজের লোকটা বানিয়ে বলে গেল। কিন্তু লোকটা বানিয়ে বলবে কেন? তাকে এই তিনতলায় নিয়ে আসার আগে আলতাফ হোসেন সাহেবের সঙ্গে কাজের লোকটার কোনো কথা হয়নি। সে কি রকমের মেহমান তা লোকটা জানে না। তাহলে অনর্থক

তাকে ভয় দেখাবে কেন? তবু তুষারের মনে হল, একবার পরীক্ষা করে দেখলে হয়।

সে বন্ধ দরজার সামনে গেল। দরজাটা ঠেলতেই বুঝতে পারল ওটা বাইরে থেকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ আলতাফ হোসেন সাহেব তাকে বন্দি করে রেখেছেন। খুব রাগ হচ্ছিল তার। সে জোরে জোরে লাথি মারল দরজায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেই লোকটা ছুটে এসে দরজা খুলল, 'আরে শব্দ করছেন কেন? ওখানে বেল আছে, বাজালেই তো পারতেন।'

তুষার রাগী গলায় বলল, 'আমি আলতাফ হোসেন সাহেবের সঙ্গে কথা বলব। তাঁকে ডেকে দাও।'

'তিনি বাসায় নেই।'

'নেই মানে? একটু আগে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন!'

'হ্যাঁ। তারপরেই বেরিয়ে গেছেন।'

'কখন আসবেন?'

'তা তো বলেননি।'

'ঠিক আছে, তাঁকে বলে দিও আমি এইরকম বন্দি হয়ে থাকতে পারব না। আমি কোনো অপরাধ করিনি যে তিনি আমাকে জেলখানায় বন্দি করে রাখতে পারেন। আমি চলে যাচ্ছি।'

'সাহেব ফিরে এলে বলব।' লোকটার বলার ভঙ্গিতে তুষার বুঝতে পারল সে তাকে যেতে দেবে না।

'ঠিক আছে, আমি ওয়েট করছি। কিন্তু তুমি বললে হিংস্র কুকুর ছাড়া আছে, তারা কোথায়?'

'দেখবেন?' বলে লোকটা সরে গেল সামনে থেকে। মিনিট খানেক পরে যে দৃশ্য দেখল তুষারের তাতে বুকের রক্ত জমে যাওয়ার মত অবস্থা হল। চারটে বিশাল সাইজের বিদেশি কুকুর এগিয়ে আসছে হাঁ করে। তাদের ধারালো দাঁত চকচক করছে। কুকুর চারটের গলায় বকলসের সঙ্গে চারটে চেন বাঁধা। চেনগুলোর শেষপ্রান্ত লোকটার হাতে। প্রাণপণে লোকটা চেন টেনে ধরে আছে আর কুকুরগুলো সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে টেনে ছুটে আসতে চাইছে তুষারের দিকে। ভয়ে দরজা বন্ধ করে দিল তুষার।

সে ঘরের অন্য দিকে তাকাল। দুটো জানলা রয়েছে, তাতে লোহার গ্রিল আটকানো। ওই পথে বের হওয়ার কোনো উপায় নেই। এই ঘরে কোন অ্যাসট্রে নেই। শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেট মেঝেতে ফেলে জুতোয় চেপে নেভাল তুষার। ইচ্ছে করেই করল। মনে রাগ এলে নিয়ম ভাঙতে ইচ্ছে করে।

খাটে শুয়ে পড়ল তুষার। আঃ! কী নরম বিছানা। জীবনে এমন বিছানায় শোয়নি সে। খাটে শুয়ে ওপরের দিকে তাকাল তুষার। সাদা ছাদ। কোনো দাগ নেই। ধীরে ধীরে তার উত্তেজনা কমে আসছিল। শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করল, মাথা গরম করে কোনো লাভ নেই। এখন তাকে সুযোগের অপেক্ষা করতে হবে। ততক্ষণ যা পাচ্ছে তাই আরাম করে উপভোগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। দরজায় শব্দ হল।

তুষার উঠে ছিটকিনি খুলে দিতে দেখল কাজের লোকটা একটা বড় ট্রে হাতে ঢুকছে। ট্রে টেবিলে নামিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনি সিগারেট খেয়েছেন নাকি? এখানে সিগারেট খাবেন না।'

'কেন?'

'দিদিমণি পছন্দ করেন না।'

'তোমার দিদিমণির পছন্দ অনুযায়ী আমাকে চলতে হবে নাকি?'

'এ বাড়িতে সেটাই নিয়ম।'

'আমি তো ইচ্ছে করে এ বাড়িতে থাকছি না অতএব তার পছন্দমত চলার কোনো বাসনা আমার নেই, একথা তাকে বলে দিও।'

লোকটা এক মুহূর্ত তাকিয়ে বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে দিল তুষার। টেবিলের কাছে এল সে। ট্রের ওপর অনেকগুলো চিনাবাসনে চমৎকার সব খাবার। মাংসের কারি, মাছের ঝাল, রুটি, ফল এবং দুধ। চেয়ার টেনে খেতে বসে গেল সে। দারুণ স্বাদ। পৃথিবীর সব ভাল ভাল খাবারগুলো বড়লোকদের জন্যে। তাদের মেসে এই ধরনের খাবারের কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। পরিতৃপ্ত হয়ে বাথরুমে ঢুকল সে। সুন্দর তোয়ালে রয়েছে সাজানো, দামি বিদেশি সাবান, কোলন। হঠাৎ খুব ইচ্ছে করল স্নান করতে। খাওয়ার আগে স্নান করার অভ্যেস তুষারের, খাওয়ার পরে কখনও করেনি। কিন্তু আজ করল। তাদের মেসের আধা অন্ধকার বাথরুমের বদলে এরকম স্বপ্নের বাথরুমে শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে বলল, তুষার, তুমি এখন ফাঁসির আসামী, শেষ আরাম ভোগ করে নাও।

ঘুমিয়ে পড়েছিল তুষার। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল। সে সাইকেল চালাচ্ছে। সমস্ত শক্তি নিঃশেষ। যে কোন মুহূর্তে পড়ে যাবে। হঠাৎ সে মুখ থুবড়ে পড়ল। সেইসঙ্গে প্রচণ্ড আওয়াজ। সবাই হৈহৈ করে ছুটে এল। রক্তে মুখ ভেসে যাচ্ছে। সামনে হানিফের মুখ। ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসল সে। ঘামে শরীর ভিজে গেছে। চারপাশে তাকিয়ে বুঝল ওটা স্বপ্নই ছিল। সে আহত হয়ে মরে যাচ্ছে না। দরজায় শব্দ হল।

দরজা খুলতেই কাজের লোকটা একটা প্যাকেট এগিয়ে দিল, 'এগুলো পরে নিন। কুকুরগুলোকে বেঁধে রাখা হয়েছে। ছাদে সাইকেল আছে, প্র্যাকটিশ করুন।

লোকটা চলে গেলে প্যাকেট খুলল তুষার। সাদা খাটো হাফ প্যান্ট, কলার তোলা গেঞ্জি. শার্ট, মোজা এবং কেডস। ওগুলো পরে নিয়ে দরজার বাইরে বেরিয়ে চারপাশে তাকাল। সামনেই একটা সিঁড়ি। সেটায় পা রেখে ওপরে উঠে আসতেই বিশাল ছাদ দেখতে পেল। ছাদের একপাশে একটা নতুন দামি সাইকেল; রাখা আছে। ছাদে কেউ নেই।

সাইকেলে উঠল তুষার। মাখনের মত মোলায়েম চলছে চাকা দুটো। যেন হাওয়ায় উড়ছে সে। ছাদের চারপাশে ঘুরে এল সে। এই সাইকেল তাকে অবিরাম চালিয়ে যেতে হবে। যদি চাকাগুলো বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলেই বিপদ। সে সাইকেল থেকে নেমে ভাল করে দেখল। দুরকমের ব্রেক রয়েছে। সামনে এবং পেছনে। সিট আর একটু নিচে নামানো দরকার। তাকে ঝড়ের মত চালাতে হবে না। যত ধীরে চালাতে পারবে তত শক্তি বাড়বে। এই ধীরে চালানোটা মোটেই সহজ নয়।

এখন আকাশে রোদ নেই। অনুশীলন শুরু করল সে। আধঘণ্টার চেষ্টায় সাইকেলটাকে যতটা সম্ভব ধীরে চালানো আয়ত্তে আনতে পারল। প্রায় শামুকের মত এগোচ্ছে সে। এতে পরিশ্রম কম হলেও গেঞ্জি ভিজে গেছে এর মধ্যে। সাইকেলটাকে একটু গতিতে তুলে দুটো পা রডের ওপর তুলে দিতে মনে হল, বাঃ, এটা তো বেশ আরামদায়ক। চালাতে চালাতে এইভাবে সে মাঝেমাঝেই বিশ্রাম নিতে পারে। তবে গতি কমে গেলেই সাইকেল পড়ে যাবে, তার আগেই পা নামাতে হবে প্যাডেলে।

দু'ঘণ্টা অনুশীলন করে হাঁপিয়ে উঠল তুষার। এর মধ্যেই তার পা ভারী হয়ে গিয়েছে। ছাদে নেমে সে দুশ্চিন্তায় পড়ল। মাত্র দুঘণ্টায় যদি তার এই অবস্থা হয় তাহলে একশ আট ঘণ্টা কী করে চালাবে। আজ যা চালালো তার চুয়ান্নগুণ বেশি চালাতে হবে। অসম্ভব। চোখে অন্ধকার দেখল সে। যদি সে আরও কিছুদিন অনুশীলন করতে পারত তাহলে হয়তো চব্বিশ ঘণ্টা টানতে

পারত। তখন হানিফের কথায় চাকরি পাওয়ার লোভে হ্যাঁ বলে দেওয়াটা চরম বোকামি হয়ে গিয়েছে।

সাইকেলের পেছনে ক্যারিয়ার রয়েছে। তার ওপরে উঠে বসল তুষার। দুটো পা ছাদে ঠেকছে। এবার প্যাডেলে সে দুটো তুলে দিয়ে সাইকেল চালাতে লাগল সে। অনেক আরাম লাগছে। মাথাটাকে নামিয়ে সিটের ওপর রাখল। বাঃ, চমৎকার। এখন সাইকেল ঠিক রেখে সিট থেকে ক্যারিয়ারে নেমে আসা প্র্যাকটিশ করতে হবে তাকে। তাহলে অনেকটা বিশ্রাম পাবে।

এই সময় হাততালির আওয়াজ কানে যেতে চমকে দুটো পা ছাদে রাখল তুষার। আলতাফ হোসেন সাহেবের মেয়ে হাততালি দিচ্ছে। তার হাতের একটি চেনের শেষপ্রান্তে হিংস্র কুকুর চারটের একটা।

মম বলল, 'দিস ইজ নট লিগ্যাল। এটা সাইকেল চালানো নয়।'

তুষার বলল, 'আমাকে সাইকেলের চাকা দুটো মাটির ওপর ঘোরাতে হবে। কোনটা লিগ্যাল আর কোনটা ইল্‌লিগ্যাল তা আমি আপনার কাছ থেকে শিখব না। আর হ্যাঁ, আমি সিগারেট খাই, এবং খেয়ে যাব। বুঝেছেন?'

সাইকেলটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে মম্‌-এর পাশ দিয়ে হনহন করে হেঁটে ছাদ থেকে নেমে গেল তুষার।

দরজায় শব্দ হল। চুপচাপ জানলায় দাঁড়িয়ে দূরের বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়েছিল তুষার। ধীরে সুস্থে হেঁটে এসে দরজাটা খুলতেই দেখল আলতাফ হোসেন এসেছেন। ঘরে ঢুকে আলতাফ হোসেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন প্র্যাকটিশ হল?'

'প্রথমদিন যেমন হয়।'

'সাইকেলটা কেমন?'

'ভাল। বেশ হালকা।'

'পরশু তোমার পরীক্ষা। মুখ রাখতে পারবে তো?'

'না পারলে আপনি তো আমাকে খুন করবেন বলেই দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ ভাই। এছাড়া কোনো উপায় নেই।' খুব আন্তরিক গলায় বললেন ভদ্রলোক, তুমি নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না। যত সময় যাচ্ছে তত লোকজনে জেনে যাচ্ছে এর সঙ্গে আমি জড়িত। একটু আগে হোম মিনিস্টার ফোন করেছিলেন। ইন্টারনেটে সমস্ত পৃথিবীতে খবরটা ছড়িয়ে গিয়েছে। বুঝতে পারলে?'

'কিন্তু দুদিন অনুশীলন করে রেকর্ড ভাঙাটা সম্ভব?' বেশ উঁচু গলায় প্রশ্ন করল তুষার। তাকে রাগী দেখাচ্ছিল।

খুব ঠাণ্ডা চোখে তাকালেন আলতাফ হোসেন। তারপর বললেন, 'চোরের মায়ের বড় গলা হয় বলে শুনেছি, কিন্তু সেটা বরদাস্ত করতে রাজি নই। তোমরা আমার কাছে ভিক্ষার পাত্র নিয়ে এসেছিলে। চাকরি চাই! হুঁ! তোমরাই বলেছিলে সাইকেল চালিয়ে বিশ্বরেকর্ড করবে। আমি বলিনি তোমাদের এসব করতে। বলেছি? নো। নিজে অক্ষম জেনেও যে বড় বড় কথা বলে তার জন্যে কোনো সহানুভূতি আমার নেই। তোমাদের ওপর বিশ্বাস করে আমি শেষ পর্যন্ত এগিয়েছি। এখন বলছো, দুদিন অনুশীলন করে রেকর্ড ভাঙা কি সম্ভব? যখন ভিক্ষে চাইতে এসেছিলে তখন এই কথাটা মনে ছিল না?'

ভিক্ষে শব্দটা খারাপ লাগলেও মাথা নিচু করল তুষার। আলতাফ হোসেনের বক্তব্যে মিথ্যে নেই। সে নিচু গলায় বলল, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে।'

'অন্যায় হয়ে গেছে! কাওয়ার্ড! চাকরি চাই! আরে বাংলাদেশের রাস্তায় রাস্তায় তোমার মত হাজার হাজার বেকার ফেউ ফেউ করে ঘুরছে। ক'জন চাকরি পাচ্ছে? পুরনো ঢাকায় গিয়ে দ্যাখো, ফুটপাতে ভিখিরি গিজগিজ করছে। একটা সময় আসবে যখন তোমাকেও ওদের দলে গিয়ে বসতে হবে। হানিফের কথায় আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিয়েছি। সেটা সদ্ব্যবহার করলে তুমি নিউইয়র্কে যেতে পারবে। ডলারে মাইনে পাবে। একটা ডলার মানে দেশের টাকায় প্রায় পঞ্চাশ টাকা। কল্পনা করতে পারো?' আলতাফ হোসেন জিজ্ঞাসা করলেন।

'এসব না করে আমি সেখানে যেতে পারি না?'

'তুমি আমার মুখে চুনকালি বোলাবে আর আমি তোমাকে আদর করে নিউইয়র্কে পাঠাব? বাঃ! চমৎকার। হয় সফল হও নয় মরো।'

'ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করব।'

'গুড। একসময় আমরা কেউ ভাবিনি খানসেনাদের হঠিয়ে স্বাধীনতা আনতে পারব। ভেবেছিলাম? নো। বঙ্গবন্ধু সেই স্বপ্নটা দেখিয়েছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত সেটা সম্ভব হয়েছে। অতএব অসম্ভব বলে কোনো শব্দ নেই, থাকলে সেটা মূর্খদেব অভিধানে আছে। আচ্ছা, চলি।'

তুষার দু'পা এগিয়ে গেল, 'আচ্ছা, একটা অনুরোধ করব?'

আলতাফ হোসেন দাঁড়ালেন, কিন্তু ফিরে তাকলেন না।

'কুকুরগুলোকে বেঁধে রাখা যায় না?'

'কেন?'

'তাহলে আমি ইচ্ছেমত সময়ে ছাদে গিয়ে প্র্যাকটিশ করতে পারি।'

'গুড। কিন্তু তুমি যে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে না তার কী গ্যারান্টি আছে? আর তুমি পালালে আমার সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে যাবে।'

'আমি কোথাও যাব না। চাকরিটা তো আমার দরকার।'

'প্রমিস্?'

'প্রমিস্।'

'ওয়েল, ওগুলোকে বেঁধে রাখা হবে কিন্তু এবাড়ি থেকে পালাবার চেষ্টা করলে আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব না।' আলতাফ হোসেন বেরিয়ে গেলেন।

এই ঘরে যে রেডিও আছে তা এতক্ষণ খেয়াল করেনি তুষার। দেখতে পেয়ে সেটা চালু করল। বন্যা'র রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে। চুপচাপ গান শুনল তুষার। গান শেষ হতেই ঘোষণা শুনল যে, আগামী পরশু বিকেল চারটের সময় বাংলা অ্যাকাডেমির প্রাঙ্গণে অবিরাম সাইকেল চালিয়ে বিশ্বরেকর্ড করার জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছেন তরুণ বাঙালি তুষার আহমেদ। আগামী পরশু বিকেল চারটে, মনে রাখবেন।' তারপর আবার গান আরম্ভ হল, এবার ফিরদোসি রহমানের।

হাঁ হয়ে গেল তুষার। তার নাম রেডিওতে বলছে? অর্থাৎ এই ঘোষণা সমস্ত বাংলাদেশের মানুষ শুনতে পাচ্ছে? তাহলে এতক্ষণে তার দেশের গ্রামে বসে মা বাবাও জেনে গেছেন সে কী করতে যাচ্ছে। অবশ্য ঢাকায় সে একাই যে তুষার আহমেদ তা তো নয়। বাবা মা হয়তো ভাববে অন্য কোনো তুষার, সে নয়।

কিন্তু ক্রমশ পুলকিত হল তুষার। কস্মিনকালেও তাকে কেউ চিনত না। যাকে বলে যে সে তাই ছিল। কিন্তু আজ লোকে তার নাম জানছে। ক্রিকেট অথবা ফুটবল খেলোয়াড়দের নিয়ে

সবাই যেমন আলোচনা করে, নিশ্চয়ই তার নাম নিয়েও করছে। তুষার উঠে দাঁড়াল। তাকে পারতেই হবে।

সন্ধে হয়ে গিয়েছিল আগেই। তুষার দরজা খুলল। আলতাফ হোসেন সাহেব যদিও আশ্বাস দিয়ে গেলেন কিন্তু বলা যায় না, ওরা হয়তো বেঁধে রাখেনি কুকুরগুলোকে। সে আওয়াজ করল কিন্তু কেউ ছুটে এল না। দরজা ভেজিয়ে চারপাশে তাকিয়ে সন্তর্পণে সে সিঁড়িতে পা দিল।

মাথার ওপর চমৎকার নীলাকাশ। যেসব নক্ষত্র এতকাল ঘুমিয়ে ছিল আজ তারাও চোখ মেলে তাকে দেখছে। এমন হিরেজ্বলা আকাশ কখনও দ্যাখেনি তুষার। সাইকেলে উঠে বসল সে। ছাদের চারপাশে একটার পর একটা পাক দিতে লাগল। ধীরে ধীরে তার মাথা থেকে অন্য চিন্তা বেরিয়ে গেল। চিন্তাশূন্য হয়ে গেলে শরীর কি হালকা হয়ে যায়? পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলে মনে হয় না। চোখ বন্ধ করে মায়ের মুখ ভাবার চেষ্টা করল তুষার। তার মা সুন্দরী নন। বাংলাদেশের শ্যামলা মেয়েরা যেমন হন তার মা-ও ঠিক তাই। কিন্তু মা যখন হাসেন তখন মনে হয় পৃথিবীতে কোথাও কোনো দুঃখী মানুষ নেই।

চোখের সামনে মায়ের মুখ এসে যেতে অদ্ভুত আরামে সাইকেল চালাতে লাগল তুষার। সে ঠিক করল বাংলা অ্যাকাডেমির চত্বরে এইভাবে সাইকেল চালাবে। এতে মনের জোর বাড়ে। তুষার ঘড়ি দেখল. তিন ঘণ্টা হয়ে গেছে। আকাশে যেন নক্ষত্রদের মারপিট শুরু হয়ে গেছে। এত আলো ওদের বুকে তবু ওরা কত দূরে!

তুষার সাইকেল চালাতে চালাতে উঠে দাঁড়াল। শরীরটাকে সিট থেকে তুলে পেছনের ক্যারিয়ারে বসাতে গিয়ে ব্যালেন্স হারিয়ে ছাদে পড়ে গেল। প্রায় চারবারের চেষ্টায় সফল হল তুষার। ক্যারিয়ারে বসে সাইকেল চালাতে এখন আর অসুবিধে হচ্ছে না। ক্যারিয়ার থেকে সিটে উঠতে গিয়েই পড়ে গেল আবার। ছাদের ওপর পড়ে মুখ ফেরাতেই তার রক্ত হিম হয়ে গেল।

ছাদের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সেই চারটে কুকুর। দূর থেকে তাকে দেখছে ওরা। প্রত্যেকের মুখ হাঁ করা, জিভ এবং দাঁত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তুষার। এইটুকু দূরত্বে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে ওদের একটুও সময় লাগবে না। তুষার স্থির হয়ে রইল। তার মনে হল একটু নড়াচড়া করলেই ওরা ছুটবে। যতটুকু সময় ওদের কাছ থেকে পাওয়া যায় ততটুকুই জীবন। তুষার আর পারছিল না। চিৎকার করে উঠেই সাইকেলে চেপে বসে প্যাডেল ঘোরাল। সঙ্গে সঙ্গে চার চারটে হিংস্র মৃত্যু একসঙ্গে ছুটে এল। ছুটন্ত সাইকেলের পেছনে দৌড়তে লাগল ওরা। ওদের গতির কাছে পেরে উঠছিল না তুষার। প্যাডল থেকে পা তুলে নিতেই একটা কুকুর প্যাডেল কামড়ে ধরল। আর তখনই নারীকণ্ঠে ডাক ভেসে এল, 'ম্যাক্স, স্টপ ইট, স্টপ ইট আই সে।'

কুকুরটা দাঁড়িয়ে গেল। অন্য তিনটে কুকুর গজরাতে গজরাতে পেছনে আসছিল। তাদের নাম ধরে ডাকতেই তারাও স্থির হয়ে গেল। সাইকেল থামিয়ে পেছনে তাকাতেই তুষার দেখতে পেল মম দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা ছোট বেত। পরনে জিনস আর গেঞ্জি। মম আবার ডাকতেই কুকুর চারটে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ফিরে গেল দরজার কাছে।

সাইকেল দাঁড় করিয়ে রেখে এগিয়ে গেল তুষার।

মম অদ্ভুত হাসল, 'আপনার উচিত আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া। আজ আমি না এলে এতক্ষণে আপনি টুকরো টুকরো হয়ে যেতেন।'

'সেটা মন্দ হত না।' তুষার গম্ভীর গলায় বলল।

'মানে?'

'আপনার বাবা কথা দিয়েছিলেন কুকুরগুলোকে বেঁধে রাখা হবে। অথচ ওগুলো ছাড়া ছিল।

সাইকেল চালিয়ে রেকর্ড করতে না পারলে আমাকে মরতে হবে। উনি বোধহয় ততক্ষণ অপেক্ষা করার ধৈর্য রাখতে পারেননি। আজ রাতেই আমাকে শেষ করে দিয়ে চেয়েছিলেন। মরতে যখন হবেই তখন তাড়াতাড়ি মরে যাওয়াই তো ভাল।'

'আপনি কী বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আপনাকে বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দয়া করে কুকুরগুলোকে নিয়ে নিচে গিয়ে বেঁধে রাখুন।'

'শুনুন, আমি জানতাম না আপনি ছাদে আছেন। কুকুরগুলো বাঁধাই ছিল। রোজ বাঁধা থাকে না। তাই অবাক হয়ে ওদের খুলে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি ঠিক সময়ে এসে যাওয়ায় ওরা আপনার ক্ষতি করতে পারেনি। এর জন্যে আমার বাবা দায়ী নন। কিন্তু রেকর্ড না করতে পারলে আপনাকে মরতে হবে কেন? কে মারবে আপনাকে?' মম জিজ্ঞাসা করল।

তুষার তাকাল। মেয়েটিকে প্রথম দেখায় যতটা উগ্র মনে হয়েছিল বোধহয় ততটা নয়। ওকে কী করে বলা যায়·আপনার বাবা আমাকে মেরে ফেলবেন!

সে হাসল, 'আপনার নামটা এখনও জানি না।'

মম বলল, 'মমতাজ, সবাই আমাকে মম বলে। কেউ কেউ মমতা। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি।'

'এত বড় একটা ব্যাপারে হেরে যাওয়া মানে মরে যাওয়া। তাই না?' পকেটে হাত ঢুকিয়ে সস্তার সিগারেট বের করল তুষার। সেটাকে ধরাতেই মমতাজ চিৎকার করল, 'কী করছেন? সিগারেট ফেলে দিন।'

'কেন?'

'সিগারেট খেলে ফুসফুস দুর্বল হয়। দুর্বল ফুসফুস নিয়ে আপনি সাইকেল চালাতে পারবেন না!'

'এতদিন খেয়েছি, দু'দিন না খেলে ফুসফুস সবল হয়ে যাবে এটা কোনো ডাক্তার বলবেন না। আসলে আপনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করছি বলে আপনি আপত্তি করছেন। প্লিজ, কুকুরগুলোকে সরিয়ে নিন, আমি নিচে যাব।'

'আপনি দেখছি খুব সাহসী, যান না নিচে।'

'ওরা যদি কিছু করে তাহলে ওদের একজনকে মেরে তবে আমি মরব। মনে রাখবেন।'

'তার মানে? আপনার সাহস কি? আমার কুকুরকে মেরে ফেলবেন?'

'বাঃ! আপনার কাছে একটা কুত্তার জান মানুষের চেয়েও দামি। শাবাশ। আপনাদের কথা সিনেমায় দেখতাম, আজ সামনা-সামনি দেখলাম।'

মমতাজ কাঁধ নাচিয়ে শিস্ দিয়ে কুকুর চারটেকে নিয়ে নিচে নেমে গেল। সিগারেট শেষ করল তুষার। এদের সঙ্গে তার কত পার্থক্য। অনেক রাত পর্যন্ত সে ছাদে বসে রইল। তারপর ঘুম পেতে নিচে নেমে এল। দরজা খুলে আলো জ্বালতেই দেখতে পেল টেবিলে এক প্যাকেট বেনসন-হেজেস সিগারেট আর চিরকুট রয়েছে। চিরকুটে লেখা আছে, 'সিগারেট না খাওয়াই ভাল। যদি খেতেই হয়, ভাল সিগারেট দু-একটা খাবেন।'

সকালে ঘুম ভাঙতেই বুকের ভেতরটা কিরকম করে উঠল। আজ সেইদিন। কথাটা মনে এল আপনা-আপনি। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরে অবসাদ। খাটে শুয়ে মাথার ওপরকার ছাদ দেখল তুষার।

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ যুবকের স্বপ্ন যেভাবে চুরমার হয়ে যায় তারও না হয় তাই হত। কী দরকার ছিল হানিফের কথায় মেতে ওঠার? আলতাফ হোসেন সাহেব মিথ্যে বলছেন বলে মনে হয় না। সাইকেল থেকে পড়ে যেতেই তাকে গুলি খেয়ে মরতে হবে। মৃত্যুটাকে এত আগে ডেকে আনার কোন প্রয়োজন ছিল না।

বাথরুমে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে বাইরে আসতেই দরজায় শব্দ হল। ওটা খুলতেই কাজের লোকটি চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকল। টেবিলে রেখে বলল, 'ঠিক নটার সময় তৈরি থাকবেন। সাহেব আপনার সঙ্গে নাস্তা করবেন।'

'আমার সঙ্গে কেন?'

'সাহেবের দয়া হয়েছে। আপনি ভাগ্যবান।'

ভাগ্যবান শব্দটা ব্যঙ্গের মত শোনাল তুষারের কানে। সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো, 'আচ্ছা ভাই, আপনার দেশ কোথায়?'

'ফরিদপুর।'

'কোন গ্রাম?'

'গাজীপুর।'

'দেশে আপনার সবাই আছেন?'

'থাকবে না কেন? সাহেব আমাকে দু'মাসে দুদিন ছুটি দেন, আমি তাদের সঙ্গে দেখা করে আসি।' লোকটা চলে গেল দরজা ভেজিয়ে।

মাথা নাড়ল তুষার। হায় সে কোনোদিন দেশে গিয়ে তার বাবা মায়ের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না।

চা-বিস্কুট খেয়ে জানলায় গেল তুষার। ওপাশে একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ। সেই গাছের একটা ডালে কাক বাসা বেঁধেছে। কাকের বাসায় কোনো শ্রীছাঁদ নেই। এলোমেলো ডালপাতা জড়ো করে গাছের ডালে যে বাসা বাঁধে তা বাবুই পাখির বাসার চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট। কিন্তু তার মধ্যে সে যখন ডিম পাড়ে এবং ডিমে তা দেয় সেগুলো নিচে পড়ে যায় না। অর্থাৎ সবচেয়ে কম পরিশ্রম করে কাক কাজ চালিয়ে নেয়। তুষারের চোখে পড়ল মা-কাক উড়ে এল বাসায়। সেখানে তিনটে ছানাকাক মুখ হাঁ করে রয়েছে। মা-কাক তাদের যত্ন করে খাওয়াল। তারপর উড়ে গেল আবার। এরা বোধহয় কয়েকদিনের বাচ্চা। এখনও ডানার জোর আসেনি। হঠাৎ একটা বাচ্চা লাফিয়ে বাসা থেকে ডালে উঠে এল। বাচ্চা কাকটা টলছে। সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ বসে থেকে সে আবার লাফাল। প্রায় পড়ে যেতে যেতে বাচ্চাটা কোনমতে নিজেকে সামলালো। সে সময় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অত উঁচু থেকে পড়ে গেলে ওর মৃত্যু অনিবার্য। কি দরকার ছিল ডানায় শক্তি আসার আগেই বাসা থেকে বেরিয়ে আসার! ওর এখনই ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু কাকটা এসব ভাবছে না। সে মুখ ঘুরিয়ে চারপাশের পৃথিবীটাকে দেখছে। এই সময় মা-কাক খাবার মুখে নিয়ে ফিরে এল বাসায়। বাকি দু'জন ঝটপটিয়ে মায়ের মুখ থেকে খাবার খেতে লাগল। সেটা দেখে বাচ্চা কাকটা বাসায় ফিরতে চেষ্টা করল। প্রায় সার্কাসের ট্র্যাপিজের খেলা খেলতে খেলতে সে কোনোমতে বাসায় ফিরে মায়ের মুখের শেষ খাবারের টুকরোটা খেয়ে নিল।

সমস্ত ঘটনাটা চোখের সামনে ঘটল তুষারের। সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। এই তো জীবন। আজকের এই বেরিয়ে আসা, পায়ের তলায় মৃত্যু আছে জেনেও চেষ্টা করে যাওয়া ওই বাচ্চা কাকটার অনেক উপকার করবে। ওই বাচ্চা কাক যদি ঝুঁকি নিয়ে সফল হয় তাহলে সে কেন

পারবে না? পারতেই হবে তাকে। পরশু রাত্রে ছাদে সে যতক্ষণ সাইকেল চালিয়েছিল গতকাল তার থেকে বেশি সময় চালিয়েছে। এখন সিট থেকে ক্যারিয়ারে, ক্যারিয়ার থেকে সিটে আসা-যাওয়া করতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরপরই পায়ে টান লাগছে। তখন পা ভারী হয়ে যাচ্ছে। হোক ভারী। সে কেয়ার করবে না।

সুন্দর খাওয়ার ঘরে সাদা পাথরের টেবিলে মূল্যবান নাস্তা সাজানো। কাজের লোকটা তাকে সেখানে নিয়ে আসামাত্র আলতাফ হোসেন সাহেব ঘরে ঢুকলেন। সম্ভাষণ করে বললেন, 'বসো। খাও। আজ তোমার পরীক্ষা।'

চেয়ারে বসতে গিয়ে তুষার দেখতে পেল মমতাজ ঢুকছে। সে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'জীবনটাই তো পরীক্ষা!'

'অ্যাঁ। ফিলজফি! তুমি ফিলজফার নাকি? মন্দ নয়। সাইকেল চালাতে চালাতে ফিলজফি করবে। বসো। পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন?' আলতাফ হোসেন মেয়ের দিকে তাকালেন। সে তাঁর পাশের চেয়ারে এসে বসল। সেটা দেখে বললেন, 'সৌজন্য? গুড গুড। তবে সৌজন্য দেখানো ভাল তবে তার বাড়াবাড়ি ভাল নয়।'

প্লেটে খাবার নিতে নিতে মমতাজ বলল, 'কোনো কিছুর বাড়াবাড়ি ভাল নয়। এক প্যাকেট বেনসন হেজেস একদিনে খাওয়াটা বাড়াবাড়ি।'

'অ্যাঁ। কে খেল? নো। তুমি আমার দিকে তাকিও না।' আলতাফ হোসেন মাথা নাড়লেন। তারপর খেয়াল হতেই তুষারকে বললেন, 'তুমি? বেনসন হেজেস তুমি খেয়েছ? অত দামী প্যাকেট কেনার ক্ষমতা কোথায় আছে? সেটা পেয়ে একদিনেই ফুঁকে দিলে? এতে কী লাভ হল? না, তোমার ফুসফুস আরও জখম হল। তার মানে তোমার দম থেমে গেল। দম কমে গেলে কী একশ আটঘণ্টা দূরে থাক, আটঘণ্টার মধ্যেই মর্গে যাবে।'

মমতাজ নিচু গলায় বলল, 'বাবা, ওকে খেতে দাও।'

আলতাফ হোসেন বললেন, 'খাও। ভাল করে খেয়ে নাও। তবে বেশি খেলে সাইকেল চালাতে যদি ইয়ে পেয়ে যায়—! বুঝতে পারছ তো! যাও। যখন ঘর থেকে বের হবে টয়লেট করে বেরুবে।'

.... অরেঞ্জ জুস খান, স্যান্ডুউইচ নিন আর আপেল খেতে পারেন।' মম খাবারগুলো দেখাল। ঠোঁট কামড়ালো তুষার। সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সুদৃশ্য পাত্রে মুরগির মাংস রয়েছে, পাশে তুলতুলে পরোটা। একটু ক্ষীর রয়েছে বড় কাচের বাটিতে। ওঃ, কতকাল তার ক্ষীর খাওয়া হয়নি। ঢাকায় মেসে কে তাকে ক্ষীর খাওয়াবে। এসব ছেড়ে তাকে জুস স্যান্ডউইচ আর ফল খেয়ে থাকতে হবে? কিন্তু সত্যি তো, বেশি খেলে তারই বিপদ। সে জুসের গ্লাস হাতে নিল।

এইসময় একটি বেয়ারা গোছের লোক তিনটে খবরের কাগজ দিয়ে গেল। তুষার দেখল, ইত্তেফাক, ভোরের কাগজ এবং বাংলাবাজার পত্রিকা। আলতাফ হোসেন সেগুলো দেখতে দেখতে খাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'মারছে!'

মমতাজ বলল, 'কী হল?'

'বাংলা বাজার আমার প্রেস্টিজ একদম বাজারে নামিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কী লিখেছে জানো? লিখেছে, বিশ্বরেকর্ড করা কি মুখের কথা? তুষার আহমেদ নামক এক যুবক আজ সাইকেলে উঠবেন বিশ্বরেকর্ড করতে। খুবই ভাল কথা। কিন্তু কে এই তুষার আহমেদ তা আমরা জানি না। গত দুদিন ধরে সাংবাদিকরা তাঁর সন্ধান করেও পাননি। জানা গেছে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাত্র ছিলেন, মেসে থাকতেন। মেসের লোকেরা তাঁর সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছে তাতে জানা গিয়েছে তিনি কখনও সাইকেল চালিয়েছেন বলে তাঁরা দ্যাখেননি। এই কর্মকাণ্ডের পেছনে উদ্যোক্তা হিসেবে আছেন বিশিষ্ট শিল্পপতি আলতাফ হোসেন। তাঁর মত একজন নামী মানুষ নিশ্চয়ই জনতাকে ভাঁওতা দেবেন না বলে আমরা আশা করি।' লেখাটা পড়ে আলতাফ হোসেন তাকালেন তুষারের দিকে, 'আমার নাম ওরা জানল কী করে?'

তুষার কাঁধ নাচাল, 'আমি কী করে বলব? আপনি তো আমাকে এ বাড়িতে বন্দি করে রেখেছেন। ঘরে ফোন পর্যন্ত নেই যে আমি জানাতে পারি।'

'হুম্।' আলতাফ হোসেন দ্বিতীয় কাগজটি তুললেন।

মমতাজ জিজ্ঞাসা করল, 'অন্যগুলো কি কিছু লিখেছে?'

আলতাফ হোসেন বললেন, 'নট মাচ। ওই, বাঙালি যুবকের অসাধারণ প্রয়াস। সাইকেলে বিশ্বরেকর্ড করার চেষ্টা আজ শুরু হবে অ্যাকাডেমির মাঠে। আমরা তার সাফল্য কামনা করছি।'

চুপচাপ খেয়ে নিল তুষার। এত সামান্য খাবারে তার পেট ভরল না। সে উঠে দাঁড়াল, 'আমাকে কখন রেডি থাকতে হবে?'

'তিনটের সময়। তার আগে আর প্র্যাকটিশ করার দরকার নেই। পড়ে গিয়ে চোট পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। যাচ্ছ কোথায়?'

'ঘরে।'

'মনে হচ্ছে এটা যেন তোমার বাড়ি? বাঁ দিকের দরজা দিয়ে ওঘরে যাও। ওখানে ডাক্তার বসে আছেন, যাও।' আলতাফ হোসেন হুকুম করলেন।

অগত্যা যেতে হল। সেই ডাক্তার সোফায় বসে বিচিত্রা পড়ছিলেন। ওকে ঢুকতে দেখে হাসলেন, 'পেট পরিষ্কার হয়েছে আজ?'

'তাতে আপনার কী দরকার?'

'আমার আর কী দরকার। সমস্যাটা তোমার হবে ভাই। এসো, সামনে বসো।' তুষার উল্টোদিকের সোফায় বসতেই ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করতে লাগলেন, করতে করতে জিজ্ঞসা করলেন, 'টেনসন হচ্ছে?'

'মোটেই না।'

'মিথ্যে বলছ?'

'দেখুন, পরিস্থিতি যখন দাঁড়ায়, হয় মরো নয় মারো, তখন টেনসন করার কিছু থাকে না। ভিখিরিদের পছন্দ করার অধিকার নেই।'

'তাহলে পাল্স রেট বাড়ল কেন? শোও। বুক দেখব।' স্টেথো চেপে চেপে পরীক্ষা করল ডাক্তার, 'সিগারেট খাও?'

'কেন?'

'অন্যরকম আওয়াজ পাচ্ছি, উঠে দাঁড়াও। শরীরে কোনো ব্যথা আছে?'

'বেশিক্ষণ চালালে পায়ে ব্যথা হয়। এখানে।' দেখাল তুষার।

'ব্যবস্থা হবে। তুমি কী নাস্তা করেছ?

'জুস, স্যান্ডউইচ আর আপেল।'

'তাই তো? এখন থেকে নো সলিড খাওয়া। লিকুইড খাবে আর তার সঙ্গে আমি কিছু ক্যাপসুল দেব।'

'ওগুলো খেয়ে কোনো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না।'

'যারা স্পেসে যায় তারা ডাল ভাত মাংস খায় নাকি? যাও, ঘরে যাও। যতক্ষণ একা থাকবে ততক্ষণ আল্লাকে ডাকবে। তাঁর কথা চিন্তা করলে মন হালকা হয়ে যাবে।'

কাজের লোক তুষারকে ঘরে ফিরিয়ে আনল। ডাক্তারের শেষ কথাটা শোনার পর খুব হাসি পাচ্ছিল তার। ফাঁসির আসামীকে মৃত্যুর আগে বোধহয় এইরকম কথাই বলা হয়।

ঠিক তিনটের সময় রেডি হয়ে কাজের লোকের সঙ্গে নিচে নেমে তুষার দেখল হানিফ এবং বেলাল তার জন্যে অপেক্ষা করছে। হানিফ এগিয়ে এসে ওর হাত ধরল, 'ঠিক আছিস তো?'

অভিমান হল আচমকা। ওরা বেশ আছে। ওদের কোন সমস্যা নেই অথচ তাকে— । বেলাল বলল, 'একটু আগে আমরা দেখে এসেছি। এর মধ্যে হাজারখানেক লোক এসে গেছে দেখতে। আলতাফ হোসেন সাহেব গিয়েছেন মিনিস্টারকে নিয়ে আসতে। আমাদের প্ল্যান সুপারহিট হয়ে গিয়েছে।'

ওরা গাড়ি বারান্দায় পৌঁছাতে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। ওরা সেটায় উঠে বসল। গাড়ি চলতে শুরু করলে তুষার বলল, 'একটু ড্রাইভারকে বল তো শহিদ মিনারের দিকে যেতে।'

হানিফ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'একটু দেওয়ালের লেখাগুলো দেখব। যদি আর কখনও দেখতে না পাই, শেষ দেখা দেখে যাওয়া।' তুষার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

হানিফ প্রতিবাদ করল, শহিদ মিনারে তো তুই বহুবার গিয়েছিল, নতুন করে দেখার কি আছে? আমাদের দেরি হয়ে গিয়েছে, মামা যদি মিনিস্টারকে নিয়ে ওখানে চলে আসেন তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ওখানেই সোজা চল।

বেলাল বলল, 'তোর মনে এখন দেশপ্রেম জেগে উঠল কেন?'

তুষার বলল, 'শহিদ হতে যাচ্ছি, দেশপ্রেম জাগবে না?'

'শহিদ হওয়া অত সোজা ব্যাপার?' বেলাল প্রশ্ন করল।

হানিফ হাত নাড়ল, 'ছেড়ে দে ওর কথা। দ্যাখ তুষার, তুই যদি লড়াই শুরু হওয়ার আগেই হেরে যাস তাহলে তো বিপদ। আমরা মুখ দেখাব কী করে? বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছেলেমেয়ে তোর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।'

বেলাল বলল, 'শুধু বিশ্ববিদ্যালয়? বাংলাদেশের তামাম যুবক তোকে তাদের প্রতিনিধি বলে ভাবছে। তুই হারলে তাদের হার হবে। আর এই যে এত মানুষ ডোনেশন দিয়েছে তাদের কথা ভাব।'

'অনেক ডোনেশন উঠেছে?' নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল তুষার।

তা তো উঠবেই। তুই চব্বিশ ঘন্টা যদি সাইকেলের ওপর থাকতে পারিস তাহলে এখন যা উঠেছে তার দ্বিগুণ উঠবে।'

'এখন কত উঠেছে?'

'হিসাব করা হয়নি।' হানিফ বলল।

হঠাৎ হানিফের হাত চেপে ধরল তুষার, 'আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার মাকে কিছু টাকা দিবি তো তোরা?'

'একশ বার। কিন্তু তুই কেন মারা যাবি?' হানিফ জিজ্ঞাসা করল।

'তোর মামা বলেছে না পারলে মেরে ফেলবে।'

বেলাল উত্তেজিত হল, 'ইয়ারকি নাকি? কীভাবে মারবে? গুলি করবে? আমরা নজর রাখব। আশেপাশে কাউকে বন্দুক হাতে দেখলেই ধরব।'

গাড়ি চলছিল। বেলালের ওপর ভরসা করতে ইচ্ছে করছিল তুষারের। ওর বাবা একাত্তরের স্বাধীনতা আনতে গিয়ে রাজাকারদের হাতে মারা গিয়েছিলেন। তখন বেলাল মায়ের পেটে। শহিদের ছেলে কখনও মিথ্যে কথা বলবে না।

দোয়েল চত্বরে পৌঁছে গেল ওরা। ফুটপাতে দু'চারজন লোক। তারা অ্যাকাডেমির দিকে যাচ্ছে। গাড়ি থেকে নামতেই অবাক হয়ে গেল তুষার। বেশ কিছু লোক তাকে দেখামাত্রই জয়ধ্বনি দিল। অনেকখানি জায়গা বাঁশ দিয়ে গোল করে ঘিরে রাখা হয়েছে। মানুষজন দাঁড়িয়ে আছে সেই বৃত্তের বাইরে। সবাই তাকে দেখছে, হাত নাড়ছে। হানিফরা তাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে গেল ওই বৃত্তের গায়ে তৈরি করা তাঁবুর ভেতরে। সেখানে চেয়ার টেবিল আছে।

হানিফ তাকে চেয়ারে বসিয়ে বলল, 'আরাম কর।'

তুষার খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। এতো বিশাল বড়লোকি ব্যাপার। এতে যা খরচ হচ্ছে তা যদি এরা তাকে দিয়ে দিত তবে তাই দিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে সে ভাল ব্যবসা করতে পারত। তুষার বলল, 'একটা সিগারেট দে।' লিটন একটা পাঁচশো পঞ্চান্ন এগিয়ে দিয়ে ধরিয়ে দিল। খুব বড় টান দিল তুষার। ধোঁয়াটা পেটে যাওয়া মাত্র যেন তার সমস্ত রক্তকণা চাঙা হয়ে উঠল। হানিফ বলল, 'এখন সিগারেট খাস না তুষার, দম পাবি না।'

তুষার ভ্রুক্ষেপ করল না। কামাল তাঁবুতে ঢুকে উত্তেজিত গলায় বলল, 'পুলিশের ভ্যান এসে গেছে, আর চিন্তা নেই।'

লিটন জিজ্ঞাসা করল, 'চিন্তার কী ছিল?'

'বাইরে গিয়ে দ্যাখ। এর মধ্যেই হাজার দুয়েক লোক এসে গিয়েছে। লোক আরও বাড়বে। তখন পুলিশ ছাড়া সামলাবে কে?'

'কেন? আমরা আছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আছে।'

'আমাদের বিরোধী পক্ষ নেই?'

এই সময় হইহই আওয়াজ উঠল। তুষারকে একা রেখে ছেলেরা সবাই ছুটল ব্যাপারটা কি তা দেখতে। তুষারের মনে হল এই সুযোগ। তাঁবুর পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে সে দৌড়ে যদি হাওয়া হয়ে যায় তাহলে বাঁচবার শেষ সুযোগটা পাওয়া যাবে। সে উঠল। মাটি থেকে তাঁবুর প্রান্ত এক ফুট ওপরে। চিত হয়ে শুয়ে শরীর ঘষটে বাইরে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু সেটা করার আগেই ছেলেরা দরজা দিয়ে তাঁবুতে ঢুকে পড়ল।

লিটন বলল, 'আয় তুষার, মিনিস্টার এসে গেছেন।'

'এসে গেছেন!' খসখসে গলায় উচ্চারণ করল তুষার।

'হ্যাঁ। সঙ্গে দুজন সাংসদ আর আলতাফ হোসেন সাহেব আছেন। তুই চল, তোকে এখন মালা দেওয়া হবে।' লিটন ওর ডান হাত ধরল। আর একজন বাঁ হাত। ওরা তাকে তাঁবুর বাইরে নিয়ে আসতেই জনতা চিৎকার করল। এই কিছুক্ষণের মধ্যে মানুষের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গেছে। ওরা গোল চত্বরে ঢুকল। ঠিক মাঝখানে আলতোফ হোসেন সাহেবকে দেখতে পেল তুষার।

হানিফ তাকে সেই দলের একপাশে দাঁড় করিয়ে মাইক হাতে নিল, 'ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাগণ, আজ একটু পরেই আমাদের বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তুষার আহমেদ অবিরাম

সাইকেল চালনা শুরু করবেন। বাঙালি কিছুই পারে না, বাঙালি অক্ষম এমন একটা ধারণা চালু আছে। কিন্তু এখন খেলাধুলার জগতে বাঙালি ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। আপনারা জানেন, এবারের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ মূল খেলায় পাকিস্তানকে হারানোর যোগ্যতা অর্জন করেছে। ফুটবলে ভারতের নামি দামি দলদের অনায়াসে হারিয়ে দিতে পারছে। তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের বন্ধু তুষার অবিরাম সাইকেল চালিয়ে এখানে বিশ্বরেকর্ড করতে যাচ্ছে। আপনারা যাঁরা জানেন না, তাদের জন্যে বলি, যতক্ষণ না বিশ্বরেকর্ড ভাঙছে ততক্ষণ তুষার সাইকেল থেকে নামবে না। তার পা মাটিতে পড়বে না, চাকা থেমে যাবে না। দিনের পর দিন তাকে সাইকেলেই থাকতে হবে এবং একটি মানুষের যা যা প্রয়োজনীয় কর্তব্য তা সাইকেলে বসেই করতে হবে। ব্যাপারটা যে কিরকম কঠিন, তা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে সম্মতি দিয়ে মাননীয় মন্ত্রীমশাই আমাদের ধন্য করেছেন। তিনি এবং যেসব সাংসদ এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবশেষে বলি, এইরকম উদ্যোগ নেওয়া সম্ভবই হত না যদি জনাব আলতাফ হোসেন এগিয়ে না আসতেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার কোনো জবাব নেই। আমি মাননীয় মন্ত্রীমশাইকে অনুরোধ করব কিছু বলার জন্যে। মাইক এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হল মন্ত্রীমশাই-এর সামনে। তিনি হাসলেন।

তুষার লোকটাকে দেখল। মোটাসোটা, কালো, মাথায় টাক, পরনে পাজামা পাঞ্জাবি। এই লোকটা একসময় বিরোধী দল করত। তাদের সঙ্গে ঝামেলা হওয়ায় নির্বাচনে টিকিট পায়নি। তখন বর্তমান শাসকদলে যোগ দিয়ে নির্বাচনে জিতে যায়।

মন্ত্রীমশাই বললেন, 'বাংলাদেশের যুবশক্তি একটা দারুণ কিছু করছে জেনে এখানে ছুটে এলাম। এটা সম্ভব হয়েছে আলতাফ ভাই-এর জন্যে। আপনারা জানেন আলতাফ ভাই-এর দেশপ্রেম কোনো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ভারতে চলে গিয়ে নীরবে সাহায্য করে গেছেন মুক্তিযুদ্ধের সৈনিকদের। তিনি ইচ্ছে করলেই নির্বাচনে জিতে সংসদে আসতে পারতেন। কিন্তু কোনো পদের কাঙাল তিনি নন। দেশে-বিদেশে তাঁর বৈধ ব্যবসা। সেই ব্যবসায় তিনি বাংলাদেশি কর্মীদের নিয়োগ করে আমাদের বেকার সমস্যার কিছুটা সমাধান করেছেন। সেই আলতাফ ভাই এই অনুষ্ঠানে আমাকে আসতে বলেছিলেন, আমার পক্ষে না বলা কি সম্ভব? আমি এই উদ্যোগের সাফল্য কামনা করছি।

এবার মাইক গেল আলতাফ হোসেনের সামনে। তিনি মাথা নাড়লেন, 'আমি আর কী বলব? বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা দলে দলে এগিয়ে আসুক। ইংলিশ চ্যানেল পার হোক, অলিম্পিকে মেডেল পাক। আমার আর কিছু বলার নেই। সারাজীবন কাজ করেছি। আমার জীবনই আমার বাণী।'

মন্ত্রীমশাই হাততালি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জনতা সোল্লাসে তালি দিয়ে উঠল। এবার তুষারকে নিয়ে যাওয়া হল মন্ত্রীমশাই-এর সামনে। মালা নিয়ে আসা হল। মন্ত্রীমশাই তুষারকে মালা পরাবেন।

সামনা-সামনি কখনও কোনো মন্ত্রীকে দ্যাখেনি তুষার, দাঁড়ানো তো দূরের কথা। একজন মন্ত্রীর হাতে অনেক ক্ষমতা। হঠাৎ ভেতরে তাগিদ এল। মালা আসবার আগে সে মন্ত্রীকে কিছু বলতে গেল। মন্ত্রী হাসি হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। সে বলল, 'স্যার আমার খুব বিপদ।'

মন্ত্রী বললেন, 'ভাল, ভাল।'

'স্যার আপনি আমাকে বাঁচান, আমাকে একটা চাকরি দিন।'

মন্ত্রীমশাই মিটিমিটি হাসলেন, 'বাঃ, ভাল ভাল।'

এই সময় মালা এসে গেল। বিরাট মোটা গাঁদা ফুলের মালা তুষারের গলায় পরিয়ে দিলেন মন্ত্রী। দর্শক হাততালি দিল জোরে।

এবার মাইকে ঘোষণা করা হল, 'এখন শুরু হচ্ছে অবিরাম সাইকেল চালনা। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তুষার আহমেদ সাইকেলে উঠে বসবেন।'

আলতাফ হোসেন এগিয়ে এসে তুষারের গলা থেকে মালাটা খুলে একটা ছেলের হাতে দিয়ে ওকে নিয়ে সাইকেলের সামনে চলে এলেন। ওরা এখন বৃত্তের মাঝখানে। নিচু গলায় আলতাফ হোসেন বললেন, 'রেকর্ড তোমাকে করতেই হবে। আমার সম্মান যেন নষ্ট না হয়। শেষবার মনে করিয়ে দিলাম।' কথাটা বলেই তিনি হাসলেন। কথা শোনার দূরত্বে কেউ নেই। এই সময় যদি আলতাফ হোসেন তাকে শালা শুয়োরের বাচ্চা বলে হাসি হাসি মুখ করতেন তাহলে দূরের মানুষরা মনে করত তিনি প্রশংসা করছেন।

ঢঙ আওয়াজটা হওয়ামাত্র সাইকেলে উঠে বসল তুষার। সঙ্গে সঙ্গে মাইকে ধারাবিবরণী দিতে লাগল বেলাল, 'শুরু হল বিশ্বরেকর্ড ভাঙার প্রচেষ্টা। এইমাত্র সাইকেলে উঠলেন তুষার আহমেদ। খুব স্বচ্ছন্দ দেখাচ্ছে তাঁকে। যেন মাখনের মধ্যে ছুরি চালানোর মত তাঁর সাইকেল পাক খেতে শুরু করেছে। তুষারের শরীরে কোনো মেদ নেই, হিলহিলে বেতের মত তার চেহারা। এই যে সাইকেলের চাকা ঘুরছে তা একশ আট ঘন্টা তিরিশ মিনিট না যাওয়া পর্যন্ত থামবে না। এর প্রতিটি পাকের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে আছে। আপনারা তুষারকে একটু উৎসাহ দিন। তুষার আপনাদের দিকে তাকাচ্ছে। এখন বেলা শেষ হয়ে আসছে। শেষ সূর্য তার নরম রঙিন রোদ ছড়িয়ে দিয়েছে তুষারকে অভিনন্দিত করতে। সাইকেল চালাতে চালাতে তুষার আমাদের দিকে তাকালেন। আমরা জানি আল্লা সব সময় সাহসীদের পক্ষে থাকেন।'

বেলালের গলা থেমে যেতেই মাইকে গান শোনা গেল, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।'

গান চলছে। মন্ত্রীমশাই সদলবলে বেরিয়ে গেলেন। পুলিশ তাঁদের গাড়িতে তুলে দিল। মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। তুষার সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। না, এখনও তার কষ্ট হচ্ছে না। তাদের গ্রামের বাড়ি থেকে সাইকেল চালিয়ে সে গঞ্জে যেত। যাওয়া আসায় দু ঘণ্টা লেগে যেত। সে যদি চুয়ান্নবার গঞ্জে যাতায়াত করতে পারে তাহলেই একশ আট ঘন্টা চালানো হয়ে যাবে। এইসময় একটা লোক বেড়ার ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। স্বেচ্ছাসেবকরা তেড়ে গেল তার দিকে। লোকটা হাত উঁচিয়ে দেখাল দশটাকার নোটের মালা সে পরাবে তুষারকে। স্বেচ্ছাসেবকরা আপত্তি করল না। সাইকেল নিয়ে তুষার সেখানে আসতেই টাকার মালা তাকে পরিয়ে দেওয়া হল। কত টাকা আছে? তুষার গুনতে চেষ্টা করল। সে মরে গেলে এই টাকাগুলো কি মায়ের কাছে পৌঁছবে?'

বাড়িতে দশটা টাকাই নেই। অথচ বাবার ওষুধ শেষ হয়ে এসেছে। রুগ্ণ শরীরটা বিছানায় প্রায় মিশে যাওয়ার মত অবস্থা। দিলারা ভেবে পাচ্ছিল না সে কি করবে? ছাত্রী পড়িয়ে যে কয়েকটা টাকা পায় তাতে চাল ডাল হয়তো কোনোমতে কেনা যায়। কিন্তু—। যা কিছু গয়না মা মরে যাওয়ার পর পাওয়া গিয়েছিল তা একটু একটু করে শেষ হয়ে গিয়েছে বাবার চিকিৎসার জন্যে। হার্টের অসুখে প্রায় পঙ্গু মানুষটা এখন দিনরাত নিজের ভাগ্যকে গালাগাল দেন।

যে করেই হোক কিছু টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। দিলারা কোনো মতে নিজেকে ভদ্রস্থ করে বের হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসেবে এখন তার কোনো গর্ব নেই। পড়াশুনাটা ছাড়তে হবেই।

তার শখ ছিল কবিতা লেখার। বন্ধুরা বলত ভাল লেখে। কিছু কবিতাও ছাপাও হয়েছে। কিন্তু কবিতা লিখে সংসার চালানো যায় না।

কিন্তু ঢাকা শহরের যে সমস্ত মানুষকে সে চেনে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে হাত পাততে কিছুতেই মন চাইল না। কী বলবে সে? আমি খুব গরিব, খেতে পাচ্ছি না, আমাকে কিছু টাকা দিন? অসম্ভব। এর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। কিন্তু মরবে কী করে? সে মরে গেলে বাবার কী হবে? তার কোনো ভাই কোনো চাচা নেই। সে না থাকলে বাবা বিছানায় শুকিয়ে তিল তিল করে মরবে। সেটা সে কক্ষনো চায় না।

হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনে চলে এল দিলারা। যাত্রীদের ব্যস্ততা, কুলিদের হাঁকাহাঁকি। এখানে কোনো অভাব নেই। হঠাৎ তার চোখে পড়ল দু'জন বৃদ্ধা অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের সামনে একটা বড় স্যুটকেশ। স্টেশনের কুলিদের তাঁরা অনুনয় করছেন, 'বাবা দশ টাকার বেশি দিতে পারব না। এটাকে রিকশায় তুলে দাও।' কিন্তু টাকার অঙ্ক শুনে কেউ রাজি হচ্ছে না। হঠাৎ মাথায় একটা আলো ঝলসে উঠল। এগিয়ে গিয়ে স্যুটকেশ তুলে দিলারা বলল, 'চলেন।' ভারী স্যুটকেশ কোনো মতে টেনে বাইরে এনে রিকশায় উঠিয়ে দিয়ে সে হাত পাতল, 'দিন। আপনারা দশ টাকা দেবেন বলছিলেন।'

খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন মহিলারা। ভদ্রমেয়েকে কুলি বলে ভাবতে পারছিলেন না। তবু টাকাটা দিলেন। আনন্দ হল দিলারার। পরিশ্রমের বিনিময়ে রোজগার এটা। এরকম যদি দশটা স্যুটকেশ পাওয়া যায় তাহলে দৈনিক একশ টাকা আয়। সে একটা ম্যাগাজিনের স্টলের সামনে দাঁড়াল। আর তখনই নজরে পড়ল, 'তরুণ বাঙালি তুষার আহমেদ বিশ্বরেকর্ড করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

ক্রমশ দৃষ্টি আবছা হয়ে আসছিল তুষারের। মাঝে মাঝে বাঁ হাত তুলে চোখ রগড়ে নিচ্ছিল সে। পায়ের আর শক্তি নেই। দু-তিনবার তার শরীর সাইকেলশুদ্ধ টলে উঠতেই হানিফ ছুটে এল পাশে। সিটের একধার ধরে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'স্টেডি হয়ে চালা তুষার। তোকে রেকর্ড ভাঙতেই হবে। তোর ওপর আমাদের সম্মান নির্ভর করছে। বি স্টেডি তুষার।

তুষার জড়ানো গলায় বলল, 'আমি আর পারছি না। মাঝেমাঝে অন্ধকার দেখছি। আমি আর পারছি না।'

বেলাল ছুটে এল একটা গ্লাস নিয়ে, 'হানিফ এটা ওকে খাইয়ে দে। ডাক্তারবাবু বলেছে এটা খেলে ও আবার জোর পাবে।'

হানিফ গ্লাসটা নিয়ে ওপরে তুলে ধরতে তুষার চুমুক দিল। কিন্তু তাতে ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সে বাঁ হাতে গ্লাস নিল। হানিফ সিট ধরে চলেছে বলে চালাতে অসুবিধে হচ্ছে না এখন। পানীয়টা খেয়ে নিল। ওটা গলা দিয়ে নামতেই শরীরটা বেশ গরম হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ক্লান্তি উধাও। বেশ চনমনে লাগছে এখন। পরিবর্তনটা চোখে পড়ার মত। সেটা দেখে দর্শকরা হাততালি দিল সজোরে। রিঙ-এর পাশ দিয়ে পাক খেতে লাগল তুষার ধীরগতিতে।

হানিফ, লিটন, বেলালরা অস্থায়ী তাঁবুতে বসে তুষারকে লক্ষ্য করছিল। ইতিমধ্যে চল্লিশ ঘণ্টা চলে গিয়েছে। আর আটষট্টি ঘণ্টা পার করতে পারলেই বিশ্বরেকর্ড হয়ে যাবে। হানিফ বলল, 'এই ওষুধটা কতক্ষণ কাজ করবে রে? ডাক্তার কিছু বলেছে?'

বেলাল বলল, 'আট ঘণ্টা অন্তর খাওয়াতে বলেছে। দরকার মনে করলে চার ঘণ্টা পর পর দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু—।'

'কিন্তু কী?' হানিফ জিজ্ঞাসা করল।

'সাইড এফেক্ট আছে।'

'সাইড এফেক্ট থাকুক। একশ আট ঘণ্টা চলে যাওয়ার পর যা ইচ্ছে তাই হোক তখন দেখা যাবে।' হানিফ হাত নাড়ল।

লিটন বলল, 'কিন্তু দ্যাখ ওষুধটা খাওয়ার পর থেকে ওকে দেখে মনে হচ্ছে যেন এই প্রথম শুরু করল।'

বেলাল বলল, 'তখন থেকে আমি একটা লোককে খুঁজছি কিন্তু পাচ্ছি না।'

হানিফ জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে খুঁজছিস?'

'তুষার বলেছিল বাঁচতে হলে ওকে রেকর্ড করতেই হবে নইলে আততায়ীর গুলিতে মরতে হবে। আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু একটু আগেও ও ওই কথা আমাকে বলেছে।' বেলাল চিন্তিত।

হানিফ বলল, 'দূর। মামা ওর সঙ্গে রসিকতা করেছেন। ভয় পেয়ে ও যাতে আরও সিরিয়াস হয় সেই চেষ্টা আর কি!'

লিটন বলল, 'এরকম রসিকতার কোনো মানে হয় না।'

এখন বিকেল। প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা হয়ে গেল। তুষার আর পারছিল না। ওষুধের প্রতিক্রিয়া শেষ হয়ে যেতে অবসাদ হাজার গুণ হয়ে ফিরে আসছিল। সাইকেল চালাতে চালাতে সে রিঙ-এর বাইরে ক্রমশ বেড়ে যাওয়া জনতার ওপর চোখ রেখেছিল। কোনো সন্দেহজনক মুখ যার কাছে সাইলেন্সার লাগানো আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে তাকে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু সব মুখই কৌতূহলী আবার সবমুখই সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছিল তার। শেষ পর্যন্ত মোটাসোটা কোটপরা একটা লোককে তার সেই খুনী বলে মনে হল। লোকটার কপালে বেশ বড় কাটা দাগ রয়েছে। ওর পকেটে অস্ত্র থাকা স্বাভাবিক। লোকটা তার ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না। মনে ভাবনাটা যেতেই দেখল একটা অল্পবয়সী মেয়ে ভিড় সরিয়ে লোকটির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটির দু'চোখে বিস্ময়।

দিলারা দেখছিল তুষারকে। দেখলেই বোঝা যায় ছেলেটার শরীর থেকে সমস্ত শক্তি চলে গিয়েছে। মুখ সাদা হয়ে গিয়েছে। পরের বার তুষার সামনে আসতেই দিলারা চিৎকার করল, 'মনে জোর আনুন। হেরে যাওয়া চলবে না।'

চিৎকার শুনে তুষার একবার তাকাল। দিলারা হাত মুঠো করে আকাশে ছুড়েছে। সমস্ত জনতা তাকে দেখল। তারাও চেঁচাল, 'হেরে যাওয়া চলবে না, চলবে না।'

হানিফরাও দেখল এবং শুনল। সে বলল, 'মেয়েটাকে চেনা লাগছে।'

বেলাল বলল, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। কবিতা লেখে বলে শুনেছি। নাম জানি না। ওকে এখানে ডেকে নিয়ে আসব?'

হানিফ মাথা নাড়ল, 'না' এটা পুরুষদের ব্যাপার। মহিলাদের এখানে থাকা ঠিক নয়।'

মাইকে গান বাজছে। রুণা লায়লার। দিলারা তুষারকে দেখছিল। আজকাল ঢাকার রাস্তায় কায়দাবাজ কিছু ছেলেকে দেখা যায়। তারা বাইক অথবা গাড়ি নিয়ে এমনভাবে চলে যে মনে হবে মাইকেল জ্যাকসনের ভাই। চুলে ঝুঁটি বাঁধছে, দুল পরছে কানে। জিনস আর ব্যাগি শার্ট সস্তার নয়। এদের বাপের টাকা আছে প্রচুর, ছেলেরা সেটা চালচলনের মধ্যে বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু এই যে ছেলেটা, যার নাম তুষার আহমেদ, তাকে সেই শ্রেণির বলে মনে হচ্ছে না। ছেলেটা সাধারণ বাড়ির ছেলে। ও নিশ্চয়ই বড় হবার স্বপ্ন দেখে।

দিলারা নিজের মনেই বলল, 'শেষ পর্যন্ত পারবে তো!'

পাশে দাঁড়ানো লোকটা গম্ভীর গলায় বলল, 'ওর সামনে অন্য রাস্তা খোলা নেই।'

এপাশে দাঁড়ানো একজন বলল, 'রেকর্ড করতে পারলে ও চাকরি পাবে। খবরের কাগজে পড়েছি। গ্রামের ছেলে মেসে থাকে।'

এই সময় ওপাশে চিৎকার শোনা গেল। সেই শব্দাবলী কানে আসতে জনতা ঘুরে দেখল কুড়ি-বাইশজন ছেলে মারমুখী হয়ে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে হানিফ লিটন বেলালরা ছুটে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল। উত্তেজিত ছেলেদের একজন চিৎকার করল, 'ড্রাগ খাইয়ে বিশ্বরেকর্ড করানো হচ্ছে। চলবে না এসব। বন্ধ কর, নইলে সব ভেঙে লাট করে দেব।'

হানিফ বলল, 'কে বলল ড্রাগ খাওয়ানো হচ্ছে?'

'গ্লাসে করে কী খাওয়াচ্ছিস তোরা? জানি না ভেবেছিস? ছেলেটি বলা মাত্র বোম ফাটল একটু দূরে। জনতা ভয়ে দৌড়াতে লাগল। এপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক পুলিশগুলোর এতক্ষণে যেন হুঁস হল। তারা লাঠি ঘুরিয়ে বীরত্ব দেখাতে আরম্ভ করল।

দিলারা দেখল তার পাশে দাঁড়ানো লোকটা কোটের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে কিছু বের করছে। জিনিসটা দেখতে পেয়েই সে চিৎকার করে উঠল প্রাণপণে, সেই চিৎকারে হতচকিয়ে গেল লোকটা। তারপর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে দৌড়াল রাস্তার দিকে। সেখানে একটা বাইক দাঁড় করানো ছিল। সেটায় উঠে স্টার্ট দিয়ে চলে গেল চোখের আড়লে।

তখন পুলিশ বিক্ষুব্ধদের সামলে নিয়েছে। হানিফের সঙ্গে ওদের বচসা হল কিছুক্ষণ। তর্কাতর্কি করে সিদ্ধান্ত নিল তুষারের ইউরিন পরীক্ষার জন্যে...খাওয়া হবে। পাথলজিস্ট যদি বলে ওকে ড্রাগ খাওয়ানো হচ্ছে তাহলে অনুষ্ঠান বাতিল করে দেওয়া হবে।

এবার দিলারা এসে দাঁড়াল ওদের সামনে, 'আমি কয়েকটা কথা বলব?'

হানিফ বলল, 'বলুন।'

দিলারা বলল, 'একটা বাঙালি ছেলে কোনো ভাল কিছু করতে চাইলে কেন অন্য বাঙালির চোখ টাটায় বলতে পারেন? কেন সবাই ছিদ্র খুঁজে বেড়ায়? আমরা কি কাঁকড়ার জাত?'

বিক্ষুব্ধ নেতা বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'কাঁকড়া মানে?'

'কাঁকড়া নামক উভচর প্রাণী যার মাংস আমরা খেয়ে থাকি। একটা বালতির মধ্যে কয়েকটা কাঁকড়াকে রাখলে দেখা যাবে একটা কাঁকড়া চেষ্টা করছে উপরে উঠে বালতি থেকে বেরিয়ে যেতে কিন্তু অন্য কাঁকড়াগুলো তার পা ধরে টেনে নিচের দিকে নামিয়ে দিচ্ছে।'

দিলারার কথায় হানিফ খুশি হল। কিন্তু ছেলেটি বলল, 'ওরা যদি স্বাভাবিক চেষ্টায় বিশ্বরেকর্ড করতে চাইত তাহলে আমরা সমর্থন করতাম। পাবলিককে ধাপ্পা দিয়ে ড্রাগ খাইয়ে যদি সেটা করতে চায় তাহলে প্রতিবাদ করা কর্তব্য বলে মনে করি।'

দিলারা বলল, 'একটু আগে কোটপরা যে লোকটা দৌড়ে বাইকে উঠে পালিয়ে গেল সে কি আপনাদের লোক?'

ছেলেটি মাথা নাড়ল, 'আমরা সবাই ছাত্র। আমাদের মধ্যে কোটপরা কোনো লোক নেই। এরকম প্রশ্ন কেন করছেন?'

'লোকটা একটা রিভলভার বের করেছিল গণ্ডগোলের সময়।'

দিলারা কথাটা বলতেই এ ওর মুখের দিকে তাকাল। বেলাল এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ঠিক দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। রিভলভার বের করার সময় ওর চোখ ছিল তুষার আহমেদের দিকে। অদ্ভুত শক্ত

মুখ। আমার খুব ভয় করল। আমি চিৎকার করে উঠতেই লোকটা দৌড়াতে লাগল,' দিলারা বর্ণনা দিল।

বেলাল বলল, 'তাহলে এই লোকটাই সেই লোক। তোর মামা রসিকতা করে ভয় দেখায়নি। কিন্তু ও রিভলভার বের করল কেন? তুষার তো এখনও পড়ে যায়নি।'

ঠিক এই সময় একটা পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল সামনে। একজন পুলিশ অফিসার সেটা থেকে নেমে এসে চিৎকার করলেন, 'উদ্যোক্তাদের নেতা কে? এগিয়ে আসুন।'

ছেলেরা দল বেঁধে এগিয়ে গেল।

পুলিশ অফিসার বললেন, 'আপনাদের এই সাইকেল চালানোর জন্যে শান্তি রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এখনই এটা বন্ধ করতে হবে।'

হানিফ বলল, সে কি? এখানে এমন কিছু হয়নি যে শান্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই যে এদের সঙ্গে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল, আমরা তার সমাধান করে নিয়েছি। বিনা কারণে বন্ধ করবো কেন?'

'এরা কারা?'

বিক্ষুব্ধ ছেলেটি বলল, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।'

বিশ্ববিদ্যালয়ে তো দশটা দল আছে। একটা দলের সঙ্গে সমাধান হচ্ছে কিন্তু এরপর বাকি ন'টা দল আসবে বোমা ফাটাবে, গুলি চলবে। আপনারা বোমা ফাটিয়েছেন?'

ছেলেটি বলল, 'না। আমরা কেন বোমা ফাটাতে যাব?'

'অথচ ফেটেছে। আমি কোনো চান্স নেব না। বন্ধ করুন নইলে আমাকে জোর খাটাতে হবে।' অফিসার ঘুরে দাঁড়ালেন।

হানিফ বলল, 'দেখুন, উনপঞ্চাশ ঘন্টা আগে মন্ত্রীমশাই নিজে এসে এর উদ্বোধন করে গেছেন। এটা আমাদের সম্মানের প্রশ্ন। মিস্টার আলতাফ হোসেন পুরো ব্যাপারটা স্পন্সর করছেন।'

অফিসার বললেন, 'ওইসব নাম বলে আমাকে ভয় দেখাতে চাইছেন বুঝি? আরে, আমার বাপের ক্ষমতা হত ওঁদের সম্মতি ছাড়া এখানে আসতে? বাচ্চা ছেলে?'

একজনের কাছ থেকে মোবাইল ফোন নিয়ে টেলিফোন করল হানিফ। আলতাফ হোসেন সাহেব বাড়িতে নেই। তাঁর মোবাইল নাম্বার চেয়ে নিয়ে সেখানে ফোন করতেই গলা শুনতে পেল, 'বলুন ভাই।'

'মামা আমি হানিফ। পুলিশ এসে বলছে অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে। উনপঞ্চাশ ঘন্টা হয়ে গিয়েছে। আর উনষাট ঘন্টা সাইকেল চালাতে পাবলেই বিশ্বরেকর্ড হয়ে যাবে। আপনি একটু অফিসারকে বলে দেবেন?'

'মেয়েছেলেটা কে? যে চিৎকার করেছিল?'

হানিফ মুখ ফিরিয়ে দূরে দাঁড়ানো দিলারার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'আমাদের কেউ না। আমরা চিনি না। দর্শক। কেন?'

আলতাফ হোসেন বললেন, 'তোমার বন্ধুর শরীরের যে অবস্থা তাতে সে কিছুই করতে পারবে না। তবে তোমরা বন্ধ কোরো না, পুলিশ জোর করে ভেঙে দিক।'

লাইন কেটে গেল। মোবাইলটা ফেরত দিতেই রাস্তায় বোমা ফাটল সশব্দে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসার দৌড়ে গেলেন জিপের কাছে। একটা চোঙা মাইক নিয়ে চিৎকার করলেন, 'তিন মিনিট

সময় দিচ্ছি, তার মধ্যে সবাই এখান থেকে চলে যান। যারা যাবেন না তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হবে।'

যে সমস্ত পুলিশ এতক্ষণ দর্শক হিসেবে ছিল তারা আক্রমণের জন্যে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। হানিফ চিৎকার করল, 'আমরা বন্ধ করব না। তুষার তুই চালিয়ে যা।'

হানিফের সঙ্গে গলা মেলাল বাকি সবাই, এমনকী সেই বিক্ষুব্ধ ছেলেটি এবং তার দলবলও। দিলারা দেখল তিন মিনিট শেষ হওয়ামাত্র পুলিশ এগিয়ে এসে অস্থায়ী বাঁশের রিঙ ভেঙে দিল। যারা তখনও দর্শক হিসেবে ছিল মারমুখী পুলিশ দেখে তারাও পালাল। কিছু ক্যামেরাম্যান এই সব ঘটনার ছবি তুলছিল, পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে ধেয়ে গেল তাদের দিকে। এবার পুলিশ এগিয়ে এল অস্থায়ী ক্যাম্পের সামনে, তাদের উগ্র চেহারা দেখে ছেলেরা দৌড়াল। পুলিশ ওদের সেই দোয়েল-চত্বর পর্যন্ত ছুটিয়ে নিয়ে গেল।

চারধার ফাঁকা, দিলারা একা দাঁড়িয়েছিল। ইতিমধ্যে মাইকের তার ছিঁড়ে দিয়েছে পুলিশ। অস্থায়ী ক্যাম্প মাটিতে লুটোচ্ছে। চারধারে ধ্বংসস্তূপ। শুধু তুষার আহমেদ নামক বাঙালি তরুণ তখনও সাইকেল চালিয়ে চলেছে শেষ শক্তি উজাড় করে।

পুলিশ অফিসার তেড়ে এল দিলারার সামনে, 'এই এখানে কেন?' তারপর কিছুটা দূরে সাইকেল চালানো তুষারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেউ হয়? অ্যাঁ?'

দিলারা কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'ওটা কি পাগল? না নেশা করে চালাচ্ছে? থামতে বলুন, বাড়ি নিয়ে যান ওকে। অবশ্য হাসপাতালে নিয়ে গেলেই ভাল হয়, অফিসার হাসল।

একজন জুনিয়র অফিসার বলল, 'স্যার, লাঠিটা ছুঁড়ব? চাকার স্পাইকে ঢুকে গেলেই আছাড় খেয়ে পড়বে।'

'ইডিয়ট।' অফিসার ঘুরে দাড়াল, 'দূর থেকে টেলিফোটোয় কেউ ছবিটা তুলে নিয়ে কাগজে ছাপিয়ে দিলে সংসদ আমাদের ছেড়ে দেবে ভেবেছ? তাছাড়া আমরা তো জনগণের শত্রু নই। এই যে, আপনি গিয়ে ওকে বলুন নেমে পড়তে। যেখানে যেতে চায় আমাদের গাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি।'

কথাগুলো অনুরোধ নয়, আদেশ। দিলারার তাই মনে হল। সে খানসেনাদের দেখেনি তবে বাবার কাছে তাদের কথা শুনেছে, সিনেমায় দেখেছে। কিছুদিন আগে শ্রদ্ধেয় লেখক শওকত ওসমান সাহেবের সান্নিধ্যে এসেছিল সে। কবিতা লেখে শুনে শওকত ওসমান খুব খুশি হয়েছিলেন। তাঁর মুখ থেকে সে শুনেছিল পৃথিবীর সমস্ত খুনীর মুখ এবং মুখোশটা আলাদা। কিন্তু পৃথিবীর সব দেশের পুলিশের মুখোশ একই।

এক পা এগিয়ে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল দিলারা। মানুষটাকে সে চেনে না। কোনো পরিচয় নেই। কিন্তু এখন যে ভাবে সাইকেল চালাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে না ওর চেতনা ঠিক আছে। পারিপার্শ্বিক সম্পূর্ণ ভুলে যেতে না পারলে ওভাবে চালানো যায় না। এই যে পুলিশ এসে এত ঝামেলা করছে, বেড়া ভেঙে দিয়েছে, তা তুষার যেন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছে না। সে মাথা গুঁজে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। ধীর গতিতে। একশ আটঘন্টা কেন হাজার ঘন্টা সে এভাবে চালিয়ে যেতে পারে। দিলারার খুব খারাপ লাগল ওকে বন্ধ করতে বলতে।

সে ঘুরে দাঁড়াল, 'স্যার, এখন তো এখানে কোনো অশান্তি নেই।'

অফিসার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, 'অশান্তি, তা থাকবে কেন? আমরা সেটা দূর করতেই তো এসেছি। নইলে মেরে হাড় ভেঙে দিতাম।'

'অশান্তি যখন নেই তখন আর ওকে বাধা দিয়ে লাভ কী!'

'তার মানে?' অফিসার অবাক হলেন।

'ও তো কোন অশান্তি করছে না। নিজের মনেই চালিয়ে যাচ্ছে। দেখুন। যতক্ষণ পারে ওকে চালাতে দিন। না পারলে নিজেই থেমে যাবে।' দিলারা আন্তরিক অনুরোধ জানাল।

'নো। দ্যাটস নট পসিবল। আমরা চলে গেলেই আবার মাইক বাজবে, মেলা বসবে। নো নো। তাছাড়া আমার ওপর অর্ডার আছে ওকে থামিয়ে দেওয়ার। আই মাস্ট স্টপ হিম।' অফিসার এগিয়ে এলেন।

'আপনাকে কে অর্ডার করেছেন?' হঠাৎ দিলারা ফুঁসে উঠল।

'আমি নিশ্চয়ই আপনাকে সেই কৈফিয়ৎ দেব না।'

'আপনি দিতে বাধ্য। বাংলাদেশের একজন তরুণ এমন একটা বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছেন আর আপনি সেটা বন্ধ করতে চাইছেন। আপনার বিরুদ্ধে আমরা জনমত একত্রিত করব।'

'কী করবেন হ্যা-হ্যা-হ্যা। জনমত? জনগণের আবার নিজস্ব মত আছে নাকি? কাঁঠালের আমসত্ব। এই, কেউ একজন ওটাকে নামিয়ে দাও।'

'দাঁড়ান। আমি প্রেসিডেন্টের কাছে আপনার নামে নালিশ করব।'

অফিসার ঘুরে দাঁড়ালেন, 'কী বললেন? প্রেসিডেন্টের কাছে?'

'নিশ্চয়ই। আমরা এক জায়গার মানুষ।'

অফিসার অদ্ভুত চোখে চারপাশে তাকালেন। কাছাকাছি কোনো মানুষ না থাকলেও দূরে কিছু ফটোগ্রাফার ক্যামেরা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি হাসলেন, 'সত্যি? আজকালকার ইয়ং জেনারেশন রসিকতা বোঝে না। আরে আমরা কি আপনাদের শত্রু? এই ছোকরা রেকর্ড করতে চলেছে আর আমি সেটা নষ্ট করে দেব? এই প্যাক আপ, ফিরে চলো।' অফিসার হুকুম দিয়ে জিপের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

এত দ্রুত লোকটির আচরণ বদলে যাওয়ায় হকচকিয়ে গেল দিলারা। সে দেখল সত্যি সত্যি পুলিশগুলো গাড়িতে উঠে পড়ল। পুলিশের গাড়ি বেরিয়ে গেল বাংলা অ্যাকাডেমির চত্বর থেকে। তারা চলে যেতে আশপাশের আড়াল থেকে হানিফ, বেলালরা হইহই করে বেরিয়ে এল। সবাই এসে দিলারাকে অভিনন্দন জানাল। তাদের ধারণা দিলারা একাই রুখে দাঁড়ানোয় পুলিশ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে। মাইকের তার আবার জোড়া হল। কেউ একজন মাউথপিস দিলারার হাতে এনে দিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আপনি স্লোগান দিন।'

অদ্ভুত উত্তেজনা তখন দিলারার মনে। কিছু ছেলে বাঁশের বেড়া ঠিক করার চেষ্টা করছে। তাদের মধ্যে সেই বিক্ষুব্ধ ছাত্রটিও রয়েছে। হানিফ এবং বেলাল তুষারের পাশে পাশে হাঁটছে। দিলারা চিৎকার করে উঠল, 'বাংলাদেশের দামাল ছেলে তুষার আহমেদ যুগ যুগ জিও।' সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা তার প্রতিধ্বনি তুলল। দিলারা বলল, 'বাংলাদেশের তরুণশক্তি মরছে না, মরবে না। বিশ্বরেকর্ড হবেই হবে, আশার প্রদীপ নিভবে না।' তার সরু গলা আকাশ ছুঁতে চাইছিল। সেই গলায় গলা মেলাচ্ছিল সবাই। এমন কি ঘামে ভেজা চোখ ফিরিয়ে তুষার সাইকেলে বসে দিলারাকে দেখতে চাইল। আর ঠিক তখনই একটা জিপ পাশের রাস্তা দিয়ে ছুটে এল। দিলারা দেখল ড্রাইভারের পাশে সেই কোট পরা লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। লোকটা তুষারের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য স্থির করছে চলন্ত জিপে দাঁড়িয়ে।

দিলারা পাগলের মত দৌড়াল। সাইকেলের পেছনের চাকায় হাত রাখতেই তুষার হুড়মুড় করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ঠিক তখনই গুলির শব্দ হল। দিলারা দেখল সাইকেলের হ্যান্ডেলে লেগে বুলেট ছিটকে গেল। তুষার পড়ে আছে সাইকেল থেকে তিন হাত দূরে মাটিতে, চিত হয়ে। মৃতদেহের মত দেখাচ্ছে তাকে। জিপটি ততক্ষণে চোখের আড়ালে চলে গিয়েছে।

হৈ হৈ করে ছুটে এল সবাই। বেলাল তুষারকে তুলতে চেষ্টা করল। গুলি তুষারের শরীরে লাগেনি কিন্তু বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া তার যে প্রাণ আছে বোঝা যাচ্ছিল না। হঠাৎ হানিফ রাগত গলায় চিৎকার করল দিলারার দিকে তাকিয়ে, 'এই যে, এটা কী হল? ওকে টেনে ফেলে দিয়ে সব চেষ্টা নষ্ট করে দিলেন কেন?'

দিলারা তখনও ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠেনি। ফ্যালফ্যাল করে তাকাল।

হানিফ আরও উত্তেজিত হল, 'কে আপনি? আমাদের চেষ্টা বানচাল করতে কে আপনাকে পাঠিয়েছে? নাম বলুন। আপনাকে আমরা পুলিশে দেব।'

বেলাল উঠে এল তুষারকে ছেড়ে, 'কী যা তা বলছিস হানিফ?'

'যা তা বলছি মানে? তুই দেখিসনি? ওর ধাক্কা খেয়ে তুষার সাইকেল থেকে পড়ে যায়নি? ইটস প্রিপ্ল্যানড।' হানিফ গর্জাতে লাগল, 'একটা ছেলে চাকরির জন্যে শরীরের সব রক্ত ঝরিয়ে রেকর্ড করতে যাচ্ছিল, ওঃ এ এই মহিলা তার বারোটা বাজিয়ে দিল।'

বেলাল বলল, 'কিন্তু উনি যদি তুষারকে না ফেলে দিতেন তাহলে কী হত? বল্? এতক্ষণে তুষার একটা লাস হয়ে যেত না?'

'আমি জানি না কী হত? একটা লোক গুলি করেছে কিন্তু গুলিটা সাইকেলের হ্যান্ডেলে লেগেছে। ওর গায়ে নাও লাগতে পারত। সেক্ষেত্রে রেকর্ডটা করতে পারত। এখন আমি মামাকে কী বলব? মুখ দেখাতে পারব না।' মাথা ঝাঁকালো হানিফ। তাকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল।'

তুষার ততক্ষণে উঠে বসেছে। কিন্তু একদম সাদা হয়ে গেছে চেহারা।

বেলাল এগিয়ে গিয়ে দিলারার সামনে দাঁড়াল, 'আপনি যা করেছেন তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। লোকটার হাতে আর্মস আছে দেখে আমরা কেউ ভয়ে এগোইনি। কিন্তু আপনি জানের পরোয়া না করে আমাদের বন্ধুকে বাঁচিয়েছেন। ধন্যবাদ দিয়ে আপনাকে ছোট করব না।'

দিলারা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, 'আমি সব নষ্ট করে দিলাম, না? আসলে এর আগেও লোকটাকে রিভলভার বের করে তুষারকে লক্ষ্য করতে দেখেছি। তাই এবার মনে হল ও মেরেই ফেলবে। মনে হচ্ছিল মাটিতে ফেলে দিলে তুষারের গায়ে গুলি লাগবে না।'

'ঠিকই ভেবেছেন। কিন্তু গুলি আপনার গায়েও লাগতে পারত।'

'আমি সেটা ভাবিনি। উনি কেমন আছেন?'

দেখা গেল হাঁটুতে মুখ রেখে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে তুষার। আর সবাই তাকে ঘিরে সান্ত্বনা দিচ্ছে। হঠাৎ বেলাল হানিফের হাত চেপে ধর, 'লোকটা কে?'

'কোন লোকটা?'

'যে তুষারকে মারতে চেয়েছিল!'

'আমি কি করে জানব?' হানিফ একটু মিইয়ে গেল।

'তোর মামা ওবে পাঠিয়েছিল তুষারকে খুন করতে।'

'আশ্চর্য! মামার এতে স্বার্থ কী? তুই এই অভিযোগ পাবলিকলি করছিস জানতে পারলে মামা তোর কাছে প্রমাণ চাইবে। পারবি দিতে?'

লিটন এসে মাঝখানে দাঁড়াল, 'যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে লাভ

নেই। তুষারকে নিয়ে এখনই হাসপাতালে যাওয়া উচিত।'

হানিফ বলল, 'হাসপাতালে কেন? ওর গায়ে তো গুলি লাগেনি?'

'কিন্তু ও খুব অসুস্থ। হাত পায়ে সাড় নেই।'

এই সময় বেশ কয়েকটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে সাংবাদিক এবং আলোকচিত্রীরা নেমে এল। তার মধ্যেই তুষারকে একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে হাসপাতালে গেল বেলাল এবং কয়েকজন। হানিফ এবং লিটন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল। দিলারা ধীরে ধীরে সরে এল। তার যাওয়াটা কেউ লক্ষ্য করল না কারণ সবাই চেষ্টা করছে কে সাংবাদিকদের সঙ্গে বেশি কথা বলতে পারে। রীতিমতো প্রতিযোগিতা হচ্ছে ওখানে।

অনেকটা হেঁটে দোয়েল চত্বরের সামনে এসে দাঁড়াল দিলারা। কী সুন্দর ভঙ্গিতে পাখি দুটো রয়েছে। এদের কাছাকাছি জায়গায় এমন ঘটনা ঘটল কী করে? একটি তরুণ মরীয়া হয়ে বিশ্বরেকর্ড করতে চেয়েছিল, হয়তো শারীরিক অক্ষমতা তাকে সেটা করতে দিত না কিন্তু কারা কোন স্বার্থে ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করেছিল? তুষারকে দেখে তার একবারও মনে হয়নি ছেলেটা জটিল। পৃথিবীর সমস্ত ভাড়াটে খুনীদের একসঙ্গে ফাঁসি দেওয়া যায় না?

যে রাস্তা দিয়ে রোজ পাড়ায় ঢোকে সেই রাস্তা হাতের তেলোর মত চেনা। আজও অন্যমনস্ক দিলারা অভ্যস্ত পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল। দশ টাকা রোজগার হয়েছে। এতেই যেটুকু চাল আর আলু কেনা সম্ভব কিনেছে সে। কিন্তু তার অনেক টাকার দরকার। সারা মাসের খাওয়া ছাড়া বাবার ওষুধের খরচ কম নয়। কবিতা দিয়ে সেই টাকা রোজগার করা যায় না। দুতিনটে পত্রিকার অফিসে চাকরির জন্যে গিয়েছিল সে, কিন্তু কেউ ভরসা দেয়নি।

হাঁটতে-হাঁটতে ডানদিকে তাকাতেই গেটটা চোখে পড়ল; রোজ যেমন পড়ে। কিন্তু আজ দাঁড়িয়ে গেল দিলারা। এখন বিকেল। একটা রিকশা তার পাশ দিয়ে গেটের ভেতরে ঢুকে গেল। কয়েক সেকেন্ডে মনস্থির করে নিল সে। তারপর এগিয়ে গেল।

পাঁচিল ঘেরা চত্বরে অন্তত তিরিশটা রিকশা দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে পেছন ফিরে। প্রতিটি রিকশার পেছনে চিত্রতারকাদেব ছবি আঁটা অথবা ঝরনা পাহাড় চিত্রিত। একসঙ্গে দেখলে ছবির একজিবিশন বলে মনে হয়। দিলারা চারপাশে তাকাল।

লুঙ্গির ওপরে পাঞ্জাবি পরা মোটাসোটা মানুষটি রিকশাওয়ালার কাছে হিসেব বুঝে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ দিলারাকে দেখে অবাক হলেন। চোখ কুঁচকে বললেন—'আরে! কী খবর? আপনি তো এ পাড়াতেই থাকেন!'

দিলারা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। আমার আব্বার নাম তাজউদ্দিন, আপনি বোধহয় চেনেন।'

'ওহো! হ্যাঁ। শুনেছি, আপনার বাবা খুব অসুস্থ?'

'হ্যাঁ। স্ট্রোক হয়েছিল, চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।'

'আচ্ছা খারাপ খবর। আজকাল ভাল খবর শুনতে পাই না। তা বলুন, কী জন্যে এসেছেন?' ভদ্রলোক অমায়িক গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'চাচা, আমাকে একটা সুযোগ দেবেন?'

'কী সুযোগ?'

'আমি রিক্সা চালাতে চাই।'

'অ্যাঁ? তোমার মাথা খারাপ নাকি? রিকশা চালানো কি মেয়েছেলেব কাজ? কত শক্তি দরকার জানো? কতদূর পড়েছ?'

'বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি।'

'তাহলে? শিক্ষিতা মহিলারা কি রিকশা চালায়? এ তো ছোটলোকদের লাইন। খিস্তি খেউড়, পুলিশের ঝামেলা, মান-সম্মান বলে কিছু থাকবে তোমার? পাগল।'

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন।

'দেখুন চাচা। আমার টাকার দরকার। কেউ আমাকে চাকরি দিচ্ছে না। কিন্তু কারও দয়ার টাকায় আমি বাঁচতে চাই না। যে কোনো রকম পরিশ্রম করে যদি অর্থ রোজগার করা যায় তাতে আমি কোনো দোষ দেখি না। এমন কোনো আইন আছে কি যে মেয়েরা সাইকেল চালাতে পারবে না?'

'না। তা অবশ্য নেই।'

'তাহলে সাইকেলরিকশাও তারা চালাতে পারে। তাই না?'

'দ্যাখো মা, রিকশা চালানো সোজা ব্যাপার নয়। অনেক ব্যালেন্স রাখতে হয়। তুমি আমার রিকশা নিয়ে যদি এ্যাকসিডেন্ট করো তাহলে আমার হেভি লস্ হয়ে যাবে। তাছাড়া লোকে বলবে কী? আমি একজন মেয়েছেলেকে দিয়ে রিক্সা চালাচ্ছি।'

'চাচা, যারা মেয়েদের মেয়েছেলে বলে তাদের কথার কোনো দাম নেই। আপনি অন্য রিকশাওয়ালার কাছ থেকে যে ভাড়া নেন আমি তাই দেব। আমাকে একবার সুযোগ দিয়ে দেখুন।' কাতর গলায় অনুরোধ করল দিলারা। ভদ্রলোক মাথা চুলকাতে লাগলেন। স্পষ্টতই বোঝা গেল এমন অভূতপূর্ব অনুরোধ তিনি জীবনে শোনেনি বলে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। তিনি চোখ বন্ধ করলেন।

দিলারা উৎসাহিত হল। 'আচ্ছা, এখানে তো অনেক জায়গা আছে। আমি আপনার সামনে এখানে দুদিন প্র্যাকটিশ করি। আপনি দেখে যদি সন্তুষ্ট হন তাহলেই না হয় অনুমতি দেবেন।'

আপাতত সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে দেখে ভদ্রলোক রাজি হলেন।

তৃতীয় দিনে ঢাকার রাস্তায় অভিনব দৃশ্যটি দেখা গেল। শালোয়ার কামিজ পরা একটি মেয়ে সাইকেল রিক্সা চালাচ্ছে। রাস্তার লোকজন হাঁ করে দেখছে তাকে। দূর থেকে রিকশা আসছে দেখে পুরুষরা হাত তুলেও কাছাকাছি হতেই মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। মেয়েরা ছাড়া তার রিকশায় কেউ উঠছে না। উঠেও মেয়েরা তাদের কৌতূহলের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে খবরের কাগজের লোকজন তার ছবি এবং ইন্টারভিউ নিয়ে গিয়েছে। বিকেলবেলায় যে যখন রিকশা জমা দিল তখন ভাড়া মিটিয়ে দেওয়ার পর হাতে রইল যাট টাকা। ঘরে ঢোকা মাত্র খাটে উঠে বসল দিলারার বাবা, !'ছি ছি ছি। লজ্জায় মরে যাচ্ছি আমি! রিক্সা চালিয়ে পয়সা আনছিস? এসব দেখার আগে আমার কেন মরণ হল না! আঃ।'

হতভম্ব হয়ে গেল দিলারা। নিজের বাবার এই চেহারা সে কখনও দ্যাখেনি। ভদ্রলোকের শরীরের একটি দিক অবশ হয়ে আছে। বেশির ভাগ সময় তিনি বিছানায় শুয়ে থাকেন চুপচাপ। মাঝে মাঝে অদৃষ্টকে গালাগাল করেন। সেই তিনি এত ক্ষিপ্ত চেহারা নিয়ে মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, তা দিলারা যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে কোনোমতে বলতে পারল, 'আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? আপনার শরীর খাবাপ। শুয়ে পড়ুন।' সে প্রৌঢ়কে দু'হাতে ধরতে গেল।

দিলারার বাবা চেষ্টা করলেন মেয়ের স্পর্শ এড়িয়ে যেতে কিন্তু তাঁর দুর্বল শরীর সক্ষম হল না। দিলারা তাঁকে শুইয়ে দিল খাটে। সেই অবস্থায় তিনি বলতে লাগলেন, 'অসুস্থ! আমার অসুখের কথা কে খেয়াল রাখে? ওষুধ নেই, পথ্য নেই, আমাকে হাসপাতাল থেকে আনলি কেন?'

দিলারা বলল, 'তুমি যেটুকু সুস্থ হয়েছিলে সেটুকু সুস্থ হলে হাসপাতাল আর রাখে না। তুমি যাতে ঠিকঠাক ওষুধ আর পথ্য পাও তাই আমি রিকশা চালিয়েছি। এতে তোমার অসম্মান হবে কেন?'

'হবে না? রিকশা চালায় কারা? কোন শিক্ষিত মানুষ রিকশা চালায়? তারা নিজেদের মধ্যে যেসব কথা বলে সেগুলো শুনেছিস কখন? ওদের কোনো স্ট্যান্ডার্ড আছে?'

'কোনো কাজই ছোট নয়। মানুষ তার ব্যবহারের জন্যে ছোট বা বড় হয়। তুমি এ নিয়ে চিন্তা কোরো না।' দিলারা চেয়ারে বসল। সারাদিন রিকশা চালিয়ে তার সমস্ত শরীর অবসন্ন, টনটন করছিল।

'আমাদের বংশের কোনো মেয়ে কখনও রিকশা চালায়নি। রিকশা চালানো মেয়েদের কাজ নয়। তুমি কাল থেকে রিকশা চালাবে না।'

'তাহলে চলবে কী করে?'

প্রশ্নটা শোনামাত্র প্রৌঢ় কাঁদতে লাগলেন। দিলারার খুব খারাপ লাগছিল। তার বাবার মনের অবস্থা সে বুঝতে পারছিল। কিন্তু সে কী করতে পারে? আর কোনোভাবে যদি রোজগার করা যেত! আজকে যখন সে বেইলি রোড দিয়ে রিকশা চালিয়ে যাচ্ছিল তখন দুটো ছেলে চেঁচিয়ে বলেছিল, 'দারুণ মাল রে, চল, চল, রিকশায় উঠি।' তার সঙ্গী বাধা দিয়েছিল, 'দূর। মেয়েছেলে রিকশাওয়ালির রিকশায় উঠলে প্রেস্টিজ যাবে না? তোর মাথা খারাপ হল নাকি?'

অর্থাৎ মেয়েছেলে রিকশাওয়ালি মাল ভাল না মন্দ তা নিয়ে ছেলেরা আলোচনা করেছে, কাল রিকশায় উঠে অশ্লীল কথা বলবে। অন্য রিকশাওয়ালা তো বটেই, পুলিশগুলো পর্যন্ত দাঁত বের করে তাকে দেখে হেসেছে। কিন্তু এসব দেখা সত্ত্বেও দিলারা মন শক্ত করেছিল। স্থির করেছিল সে রিকশা চালিয়ে যাবে। ক'দিন চালালেই এরা মেনে নিতে বাধ্য হবে। চোখে সয়ে গেলে মনে মেনে নেবে। সে হেরে সরে দাঁড়াবে না।

কিন্তু আজ বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল রিকশা চালালে এই মানুষটা আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে। চোখ বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে সে বন্ধ চোখের পাতায় দেখতে পেল সাইকেল থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে যাওয়া তুষার আহমেদের মুখ। শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি নেই অথচ স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার যন্ত্রণা তাকে নিরক্ত করেছে। দিলারার মনে হল তার সঙ্গে তুষার আহমেদের কোথাও মিল রয়েছে। সেদিনের পর থেকে ছেলেটার আর খোঁজ নেয়নি সে। পরের দিন খবরের কাগজে ওর সম্পর্কে কিছু লেখা হয়েছিল কি না তাও জানা নেই। খবরের কাগজ কেনাই তো এখন বিলাসিতা।

পাশের বাড়িতে ভোরের কাগজ রাখে। রান্না শেষ করে বাবাকে খাইয়ে গত কয়েকদিনের কাগজ চেয়ে নিয়ে এল দিলারা। এই কাগজ চাইতে গিয়েও কথা শুনতে হল। ভদ্রলোক বললেন, 'এসব কি শুনছি দিলারা? তুমি নাকি আজ ঢাকার রাস্তায় সাইকেল রিকশা চালিয়েছ?'

'হ্যাঁ চাচা।'

'ওম্যানস লিব্?' ভদ্রলোক ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন।

'না, পেটের জন্যে?'

'অ্যাঁ? পেটের জন্যে?' ভদ্রলোকের মুখের চেহারা পাল্টে গেল, 'পেটের জন্যে তুমি ওই নোংরা কাজ করতে গেলে?'

দিলরার মনে অনেক কথা এসেছিল। ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করা যেত আপনি কি রিক্সায় ওঠেন না? যদি রিক্সা চালানো নোংরা কাজ হয় তাহলে রিক্সায় ওঠাও তো নোংরামি। যে মানুষ রিক্সা চালায় তার মতন পরিশ্রম আপনি করতে পারবেন? শুনেছি যে সরকারি অফিসে আপনি চাকরি করেন সেখানে ঘুষ না দিলে কোনো কাজ হয় না। সেটা নোংরামি নয়? কিন্তু বন্ধু যেখানে নেই সেখানে খামোকা শত্রু বাড়িয়ে কী লাভ! দিলারা চুপচাপ কাগজ নিয়ে ফিরে এল।

গত কয়েকদিনের কাগজ খুঁটিয়ে পড়ল দিলারা। মাটিতে পড়ে থাকা তুষার আহমেদের ছবি দেখল সে। ছবিতে অনেকে আছে কিন্তু সে নেই। লেখা হয়েছে, বাঙালি কি বাঙালির শত্রু? তরুণ তুষার আহমেদ যখন বিশ্বরেকর্ড করতে মরিয়া তখন হামলার পর হামলা চালিয়ে বানচাল করে দিয়ে গেল কিছু সমাজবিরোধী। পুলিশ যদি ঠিক সময়ে ব্যবস্থা নিত তাহলে এই ঘটনা ঘটত না। তুষারের এই প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দিতে এগিয়ে এসেছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং সমাজসেবী আলতাফ হোসেন। তাঁর প্রতিপক্ষ গুণ্ডা লাগিয়ে এই জঘন্যতম কাজ করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। অসুস্থ তুষারকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এরপর দু'তিনদিন কোনো সংবাদ নেই। আজকের কাগজে আর একটা খবর ছাপা হয়েছে। তুষার আহমেদের এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সভার আয়োজন করা হয়েছে বাংলা অ্যাকাডেমির মাঠে, আগামীকাল বিকেল পাঁচটায়। ব্যস, এইটুকু।

অর্থাৎ তুষার এখন সুস্থ আছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা ছোট বিজ্ঞাপনে চোখ আটকে গেল দিলারার। বক্স করে দেওয়া বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, 'মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসী শিক্ষিত সম্পন্ন বাংলাদেশি পরিবারের দুটি শিশুর জন্যে গভর্নেস চাই। শিশুদুটির মা অসুস্থ, শয্যাশায়ী। শিক্ষিত, রুচিসম্পন্ন মহিলারা আবেদন করুন। বিজ্ঞাপনের পাশে ঢাকার একটা টেলিফোন নাম্বার দেওয়া হয়েছে। দু'বার বিজ্ঞাপনটা পড়ল দিলারা। তিনটে তথ্য নেই এই বিজ্ঞাপনে। এক নম্বর, মধ্যপ্রাচ্য মানে কোন দেশে? কোন শহরে? দুই, কত টাকা বেতন দেওয়া হবে বিদেশে গিয়ে থাকার জন্যে? তিন, গভর্নেসের শিক্ষাগত যোগ্যতা কী চাইছেন এঁরা? অবশ্য এই তিনটে প্রশ্নের উত্তর টেলিফোন করলেই জানা যাবে। টেলিফোন নাম্বার লিখে কাগজগুলো ফিরিয়ে দিয়ে এল দিলারা। সে লক্ষ্য করলে ওই বাড়ির মেয়েরা কেউ তার সঙ্গে আজ কথা বলল না। তাদের নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে হয়তো।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবছিল দিলারা। যদি খুব ভাল মাইনে দেয়, ঢাকায় যাতায়াতের সুবিধে থাকে তাহলে চাকরিটার জন্যে চেষ্টা করা উচিত। সে যদি বিদেশে চাকরি করতে যায় তাহলে বাবাকে নিয়ে সমস্যা হবে। কিন্তু সে যদি নিয়মিত ভাল টাকা দেশে পাঠাতে পারে তাহলে দূরসম্পর্কের অনেক আত্মীয়রা বাবার দায়িত্ব নিতে রাজি হবে। মেয়ের সান্নিধ্যের বদলে নিয়মিত ওষুধ এবং পথ্য বাবার কাছে বেশি জরুরি।

পরদিন সকালে রিকশার ডেরায় গিয়ে দিলারা জানিয়ে দিল সে আর রিকশা চালাবে না। মালিক অবাক হল, 'সেকি? আজকের কাগজ দেখেছ? এই দ্যাখো। তোমার ছবি বেরিয়েছে, রিকশা চালাচ্ছ। আজকে রিকশা নিয়ে বেরুলে এই পাবলিসিটির ফল বুঝতে পারবে। কাল তো ভালই চালিয়েছ, আজ হঠাৎ না বলছ কেন?'

খবরের কাগজে নিজের ছবি দেখল দিলারা। ছবিতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাকে, রিকশা চালিয়ে যাচ্ছে। ওপরে লেখা, 'শিক্ষিতা বাঙালি তরুণী বিচিত্র জীবিকার সন্ধানে।' সে মাথা নাড়ল।

না চাচা। আমি সিদ্ধান্ত বদলেছি। আপনি আমাকে সুযোগ দিয়েছেন বলে ধন্যবাদ।'

রাস্তায় পা দিয়ে অস্বস্তিতে পড়ল দিলারা। রাতারাতি সবাই যেন তাকে চিনে ফেলেছে। আওয়াজ শুনতে পেল, 'পায়ে হেঁটে কেন? রিকশা কোথায়?' 'রিকশা চালাই মোরা রিক্সাওয়ালা', 'হান্টারওয়ালি না রিকশাওয়ালি।'

প্রতিবাদ করার কোনো মানে হয় না। মাথা গুঁজে হাঁটতে লাগল সে যতক্ষণ না টেলিফোন বুথে পৌঁছাতে পারল। সেখানে লাইনে দাঁড়িয়েও তাকে শুনতে হল, 'আচ্ছা, আপনার ছবি আজ কাগজে ছাপা হয়েছে না?'

বুথে ঢুকে একবারেই লাইন পেয়ে গেল দিলারা। এক ভদ্রলোক ধরেছেন। দিলারা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কি বিজ্ঞাপন দিয়েছন?'

'জী।'

'আমি আবেদন করতে চাই। কিন্তু কয়েকটা প্রশ্ন আছে। মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশের কোন শহরে যেতে হবে?'

'পোর্ট সঈদ। জর্ডনে।'

'ও। কত মাইনে আর কি কোয়ালিফিকেশন চাইছেন?'

'সেটা সামনাসামনি বসে আলোচনা করে ঠিক করা হবে। আপনি যদি আগ্রহী হন তাহলে এসে দেখা করুন। আমাদের ঠিকানা লিখে নিন।' ভদ্রলোক ঠিকানা বললেন। তারপর নাম জিজ্ঞাসা করলেন। দিলারা তার নাম বলল। ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'বাঃ আপনার নামের একটি মেয়ের দুঃসাহসিক ছবি আজকের কাগজে ছাপা হয়েছে।'

দিলারা বলল, 'দুঃসাহসিক কি না জানি না তবে ছবিটা আমার।'

সার্কুলার রোডে আড়ং-এর দোকানের উল্টোদিকে চ্যাঙপাই রেস্টুরেন্ট। সেটা ছাড়িয়ে কিছুদূর যেতেই নাম্বারটা দেখতে পেল দিলারা। মিনিট খানেকের মধ্যেই ভদ্রলোকের মুখোমুখি হল সে।

ভদ্রলোক আপাদমস্তক দেখে বললেন, 'টেলিফোনে আপনার কথা শুনে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। হ্যাঁ, ছবিটা আপনার। আপনি রিকশা চালান?'

দিলারা বলল, চালাই না, 'গতকালই চালিয়েছিলাম। অর্থের প্রয়োজন, কোনো কাজকর্ম পাচ্ছি না, বাধ্য হয়ে রিকসা চালিয়েছিলাম।'

'তা এখন তো আপনার খুব পাবলিসিটি হয়ে গেল। রিকশা চালানো ছেড়ে গভর্নেস হতে চাইছেন কেন?'

'আমাদের দেশের সামাজিক পরিস্থিতি ওই কাজটা করতে দেবে না। আমি ঘরে বসে না খেয়ে মরে গেলে কেউ খাবার এগিয়ে দিয়ে বাঁচাতে আসবে না, কিন্তু রিকশা চালালে অশ্লীল ইঙ্গিতে ক্ষতবিক্ষত করবে। তাছাড়া আমার বাবাও ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারছেন না।'

'আপনার বাবা কী করেন?'

'তিনি খুব অসুস্থ। শয্যাশায়ী।'

'আপনার কোয়ালিফিকেশন?'

দিলারা তার কাপড়ের ঝোলা ব্যাগ থেকে সার্টিফিকেট বের করে দেখাল।

ভদ্রলোক পরীক্ষা করে বললেন, 'কলেজের পরীক্ষা দেবেন না?'

'না। ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই।'

'বাচ্চাদের কীভাবে মানুষ করতে হয় তার ট্রেনিং নেওয়া আছে?'

'না। নেওয়ার যে কখনও প্রয়োজন হবে ভাবিনি।'

'অভিজ্ঞতা আছে?'

'না।' মাথা নাড়ল দিলারা।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'সমস্যা হল। আমার বোন জর্ডনে থাকে। বিয়ের বছর ছয়েক বাদে দুটি বাচ্চাকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে চলে যায় সেখানে। বেচারা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওদের দরকার এমন একজনকে যে বাচ্চাদের দায়িত্ব নিতে পারবে। সে কারণেই ওরা ট্রেইনড গভর্নেস চাইছিল। আপনার কথা ওদের বলতে হবে।'

'বুঝতে পেরেছি। আমি এবার যেতে পারি?'

'কী বুঝেছেন জানি না, তবে কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন।'

'প্রশ্ন করে কী লাভ যখন কাজটা হচ্ছে না।'

'আমি আপনাকে একবারও বলিনি কাজটা হচ্ছে না। আমি বলেছি ওদের সঙ্গে ফোনে কথা বলব। সত্যি কথা বলতে কি বিজ্ঞাপনটা ছাপা হওয়ার পর আপনাকে নিয়ে পাঁচজন যোগাযোগ করেছেন। প্রত্যেকেই বয়স্কা এবং কারও না কারও ওপর অভিমান করে দেশের বাইরে যেতে চাইছেন। মুশকিল হল এই অভিমান যেদিন কমে যাবে সেদিনই এঁরা দেশে ফিরে আসতে চাইবেন। সে-অর্থে এঁরা প্রফেসন্যাল নয়। আপনার ট্রেনিং নেই ঠিক কথা কিন্তু জেদ আছে। নইলে রিকশা চালাতে যেতেন না। আপনার ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার লিখে দিন। প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করব।'

ঠিকানা লিখে দিলারা বলল, 'আমাদের বাড়িতে ফোন নেই। পাশের বাড়িতে আছে, ওরা ডেকে দিতে গেলে বিরক্ত হয় তবু লিখে দিচ্ছি।' কাগজটা এগিয়ে দিয়ে দিলারা জিজ্ঞাসা করল, 'এবার কয়েকটা প্রশ্ন করব?'

'নিশ্চয়ই।'

'কবে যেতে হবে?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'কীরকম মাইনে পাওয়া যাবে?'

'আপনি ওদেশে গভর্নেস হিসেবে যাচ্ছেন না। আমার বোনের শারীরিক অসুস্থতার জন্যে তার এক সম্পর্কিত বোন হয়ে যাচ্ছেন সাহায্য করতে। আপাতত বাংলাদেশি টাকায় নয় হাজার প্রতি মাসে আপনাকে দেওয়া হবে।'

'নয় হাজার?'

'আপনার খাওয়া পরা থাকার সমস্ত খরচ আমাদের। ইন ফ্যাক্ট আপনার কোনো খরচ নেই।'

'টাকাটা আমি ওখানে পাব?'

'আপনার যা ইচ্ছে। ওখানেও নিতে পারেন আবার এখানে যদি কাউকে দেওয়ার থাকে বললে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি।'

এক মুহূর্ত ভাবল দিলারা। নয় হাজার টাকা এখন তার কাছে স্বপ্ন। এই টাকা বাবার কাছে এলে তিনি ভাল থাকবেন। বিদেশে গভর্নেসের জন্যে কত দেওয়া হয় তার জানা নেই। যাই দেওয়া হোক, কেউ তো তাকে এখানে এসে নয় হাজার দেবে না!

দিলারা উঠে দাঁড়াল। ভদ্রলোক তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে বললেন, 'একটা কথা, আপনার পাশপোর্ট আছে?'

'না।' মাথা নাড়ল দিলারা।

'ঠিক আছে, আমি আপনাকে জানালে এখানে এসে একটা ফর্ম ফিল আপ করে যাবেন। আমি ওটা বের করে নেব।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

'ও হ্যাঁ, আর একটা কথা। বিজ্ঞাপনে ভুল ছাপা হয়েছে। ওরা আগে ছিল জর্ডনের আম্মানে। সেখান থেকে পোর্ট সঈদে যাওয়ার কথা ছিল। আমি যাকে বিজ্ঞাপনটা দিতে বলেছিলাম সে লিখেছে পোর্ট সঈদ, জর্ডন। ভুল করেছে।' ভদ্রলোক হাসলেন।

মাথা নাড়াল দিলারা। ভুল বা ঠিক যাই হোক তার কাছে একই ব্যাপার। ঢাকা থেকে যখন চলে যেতে হবে তখন পৃথিবীর সব জায়গাই তো বিদেশ।

পাঁচটার একটু আগেই বাংলা অ্যাকাডেমির চত্বরে চলে এল দিলারা, এসে অবাক হল! প্রচুর লোক হয়েছে। একপাশে একটা ডায়াসের ওপরে মাইক, টেবিল চেয়ার রয়েছে। ছেলের দল বাগানে ভিড় জমিয়েছে। দিলারা ভিড় ঠেলে যতটা পারে সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনটে গাড়ি ওপাশে এসে দাঁড়াল। এঁরা যে ভি আই পি সেটা বোঝা যাচ্ছিল। আগন্তুকরা মঞ্চে উঠে আসন গ্রহণ করতেই হানিফ মাইকের সামনে দাঁড়াল, 'আমাদের সভার কাজ শুরু হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রীমশাই প্রধান অতিথি হিসেবে আসায় আমরা কৃতজ্ঞ। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রদ্ধেয় আলতাফ হোসেন সাহেব। আপনারা জানেন আমাদের সভাপতির অনুপ্রেরণায় তরুণ বাঙালি তুষার আহমেদ বিশ্বরেকর্ড করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই অঙ্গনে কিছুদিন আগে অবিরাম সাইকেল চালাতে শুরু করেছিল। রেকর্ড করার পথে সে এখন এগিয়ে চলেছে তখন স্বার্থান্বেষী মানুষেরা গুলি এবং বোমা চালিয়ে সেই অনুষ্ঠান বানচাল করে দেয়। তুষারের আর বিশ্বরেকর্ড করা সম্ভব হয়নি। এই জঘন্য আক্রমণের বিরুদ্ধে আমরা ছাত্রসমাজ তীব্র প্রতিবাদ করেছি এবং করছি। আমি মাননীয় সভাপতি মহাশয়কে এ বিষয়ে বক্তব্য জানাতে অনুরোধ করছি।'

আলতাফ হোসেন সাহেব ইশারায় হানিফকে কাছে ডাকলেন, 'আগে সভাপতি নয়, প্রধান অতিথিকে আগে বলতে দিতে হয়।'

মন্ত্রীমশাই মৃদু হাসলেন, 'না, না, আপনি আগে বলুন।'

আলতাফ হোসেন উঠে মাইকের কাছে গিয়ে নমস্কার জানালেন। চারপাশে তাকালেন। তারপর বক্তৃতা শুরু করলেন, 'মাননীয় মন্ত্রীমশাই আমাকে কথা বলার অনুমতি দিয়েছেন বলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ এই অ্যাকাডেমির চত্বরে এসে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। এ কী হল? মানুষ কেন মানুষের শত্রু হবে? আমরা একই দেশের নাগরিক, একই ভাষায় কথা বলি, তাহলে কেন আমরা পরস্পরকে সহ্য করতে পারব না?

তরুণ ছাত্র তুষার আহমেদ স্বপ্ন দেখেছিল বিশ্বরেকর্ড করার। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কত দুরন্ত মানুষ অবিরাম চেষ্টা করে চলেছে; খেলাধুলার জগতে তো কেউ থেমে নেই। আমরা, এশিয়ার মানুষরা শুধু পিছিয়ে যাচ্ছি। ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলে আমরা খেলার অধিকার অর্জন করতে পারিনি। অলিম্পিকের অ্যাথলিটে কোয়ালিফাই করতে পারিনি। এই অবস্থায় তরুণ ছাত্র তুষার স্বপ্ন দেখেছিল অবিরাম সাইকেল চালিয়ে বিশ্বরেকর্ড করবে। বাংলাদেশের নাম গিনেস বুক অফ রেকর্ডে তুলবে। আমি একজন সামান্য মানুষ। বাংলাদেশ আমার জননী। এই দেশের জন্যে আমি জান দিয়ে দিতে পারি। যখন শুনলাম তুষারের স্বপ্ন শুধু টাকার অভাবে সম্ভব হচ্ছে না তখন আমি এগিয়ে গেলাম। এখন মনে হচ্ছে না গেলে হয়তো ভাল হত। ওরা যে কোনো উপায়ে টাকা জোগাড় করে রেকর্ডটা ঠিক করে ফেলত। কিন্তু সে সময় ওদের পাশে কেউ এসে দাঁড়ায়নি।

শুরু হল সাইকেল চালানো। প্রথম দিন সবাই হেসেছিল। সাইকেল চালানো আবার কি এমন ব্যাপার। দ্বিতীয় দিনে তারা অবাক হল। সত্যি তো! ছেলেটা তো মরিয়া। আর এই ছেলে যদি সফল হয় তাহলে পাঁচজনে বলবে আলতাফ হোসেন সাহেবের সাহায্যে হয়েছে। সব কৃতিত্ব লোকটা নিয়ে যাবে। আমি রাজনীতি করি না। ব্যবসা করি। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে জোরদার করার চেষ্টা করি। যারা বাংলাদেশের ক্ষতি চায়, ব্যক্তিগত লাভের লোভে দেশকে বিক্রি করতে চায় তারা আমার শত্রু। এই তারাই গুলি চালিয়ে বোমা মেরে তুষারের চেষ্টাকে থামিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ এদের কখনও ক্ষমা করবে না।

প্রচণ্ড হাততালি পড়ল। দিলারা দেখল মাথা নিচু করে তুষার ধীরে ধীরে মঞ্চের ওপাশ থেকে সরে যাচ্ছে। সে অবাক হল। কোনোমতে ভিড় থেকে বেরিয়ে জোরে হেঁটে তুষারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

তখন ঈষৎ অন্ধকার। বিমর্ষ তুষারের মুখে তবু আলো ফুটল, 'আপনি?'

দিলারা মাথা ঝাঁকাল, 'যাক, চিনতে পারলেন। আপনি তো এখন বিখ্যাত লোক।'

তুষার বলল, 'বাঃ! আপনি কি কম বিখ্যাত? আজ কাগজে আপনার ছবি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। সেদিন আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন বলে আমি কৃতজ্ঞ। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম। কিন্তু আপনি যে সব সংস্কার ভেঙে ছেলেদের কাজ করতে পারেন তা ভাবিনি।'

চুপচাপ শুনছিল দিলারা। 'পেটের দায়ে মানুষ মরিয়া হয়।'

'পেটের দায়ে?'

'যা হয়। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষকে যার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় তার নাম দারিদ্র। যাক গে, আপনাকে নিয়ে সভা হচ্ছে আর আপনি চুপচাপ কোথায় যাচ্ছিলেন?' দিলারা প্রশ্ন করল।

তুষার মঞ্চের দিকে তাকাল। এখনও আলতাফ হোসেন সাহেব জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে চলেছেন। সে বলল, 'এসব আমার ভাল লাগছে না।'

'কেন?'

'এসব সাজানো কথা, মিথ্যে, বানানো।'

'তার মানে?'

তুষার তাকাল। এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল, 'আপনাকে বন্ধু হিসেবে ভেবেছি। আর কাউকে বলতে পারিনি কথাটা। ভয়ে পারিনি।'

'কী কথা?'

'এই পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। আমি রেকর্ড কিছুতেই করতে পারতাম না। আমার শরীর থেকে সমস্ত শক্তি চলে গিয়েছিল। যারা আক্রমণ করেছিল তারা আলতাফ হোসেন সাহেবের শত্রু নয়। ওরা ওঁরই লোক। আমি না পারলে ওঁর মুখ নষ্ট হত বলে লোক পাঠিয়ে উনি প্রমাণ করে দিতে চাইলেন বিপক্ষের মানুষ আক্রমণ করেছে। এখন যে এত বড় বড় কথা বলছেন তার সবটাই সাজানো।'

তুষার বিমর্ষ গলায় বলল, 'এখানে থাকতে আমার ভাল লাগছে না।'

'তাই পালিয়ে যাচ্ছেন?'

'পালিয়ে?'

'নয় তো কি? কেউ আপনাকে সামনে রেখে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে চেয়েছিল, এই এত মানুষের সামনে তার মুখোশ খুলে দিন।'

'কীভাবে?'

'আমাকে যে কথাগুলো বললেন সেগুলো শ্রোতাদের বলুন। আপনি বিশ্বরেকর্ড করতে চেয়েছিলেন। আর উনি আপনাকে নিয়ে ব্যবসা করতে চেয়েছেন।'

'আমি বিশ্বরেকর্ড করতে চাইনি।'

'তার মানে?'

'আমার খুব অভাব। একটা চাকরি না পেলেই নয়। উনি বলেছিলেন যদি বিশ্বরেকর্ড করতে পারি তাহলে চাকরি দেবেন। আমি মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। কোনো অনুশীলন ছিল না। মনের জোরে যতটুকু পারা যায়—!'

'এই কথাগুলো বলুন।'

'কিন্তু এই কথা বললে উনি খেপে যাবেন।'

'আপনি ভয় পাচ্ছেন?'

'এরা খুব সাংঘাতিক মানুষ।'

'হয়তো। উনি কি এখন আপনাকে চাকরি দিচ্ছেন?'

'দেখাই করছেন না। একটু আগে মুখোমুখি হয়েছিলাম, একটাও কথা বললেন না। বড়লোকদের আমি বুঝতে পারি না।'

'তাহলে আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? আপনার তো হারাবার কোনো ভয় নেই। চাকরি যখন পাবেন না তখন ওঁর মুখোশ খুলে দিন।' খুব জোর দিয়ে কথাগুলো বলল দিলারা।

এই সময় আবার হাততালি উঠল। আলতাফ হোসেন সাহেব তাঁর বক্তৃতা শেষ করে বসতেই মন্ত্রীমহাশয়ের নাম ঘোষণা করল হানিফ। মন্ত্রী মহাশয় উঠলেন। মাইকের সামনে গিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা সত্যি খুব দুঃখজনক। তবে কবি বলেছেন একবার না পারিলে দেখো শতবার। রবার্ট ব্রুস বারংবার হেরে গিয়েও হতাশ হননি বলে শেষ পর্যন্ত সাফল্য পেয়েছিলেন। আমি তাই তুষার আহমেদকে বলব আবার চেষ্টা করতে। সে যেন হতাশায় ভেঙে না পড়ে। আপনারা নিশ্চয়ই তাকে দেখতে, তার কথা শুনতে আগ্রহী। আমি শ্রীমান তুষার আহমেদকে মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি। মন্ত্রীমহাশয় ঘোষণা করতেই আলতাফ হোসেন সাহেব উঠে তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কিছু বললেন।

দিলারা বলল, 'আপনি যান তুষার। এই সুযোগ।'

তুষার পা চালাল। মঞ্চের পাশে যেতেই আলতাফ হোসেন সাহেব তাকে ইশারায় ওপরে আসতে বললেন। তুষার মঞ্চে ওঠামাত্র হাততালি পড়ল।

আলতাফ হোসেন চাপা গলায় বললেন, 'বেশি বকবক করবে না। আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে যাও।'

তুষার ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে তার ভয় হল। এই মানুষ ইচ্ছে করলে সব কিছু করতে পারেন। সে মাইকের সামনে দাঁড়াল। কত মানুষ। এরা সবাই তার দিকে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ একটা হাত ওপরে উঠতেই সে দিলারাকে দেখতে পেল। দিলারা হাত নাড়ছে।

তুষার বলল, 'আমি বাঙলাদেশের একজন সাধারণ ছেলে। আমার বাবা-মা গ্রামে থাকেন। অনেক কষ্ট স্বীকার করে তাঁরা আমাকে ঢাকায় পড়তে পাঠিয়েছেন। আমি কোনোদিন স্বপ্ন দেখিনি

বিশ্বরেকর্ড করব। কদিন আগে পর্যন্ত তেমন কোনো বাসনা আমার ছিল না। জনাব আলতাফ হোসেন আমাকে সেই স্বপ্ন দেখতে বাধ্য করেছেন।'

এই পর্যন্ত বলামাত্রই আলতাফ হোসেন পেছন থেকে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল হাততালি পড়ল। আলতাফ হোসেন মাইকের সামনে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আমি স্বপ্নের জাদুকর নই। স্বপ্ন দেখাতে ভালবাসি। সেইসব স্বপ্ন যা বাংলাদেশকে এগিয়ে দেবে। এখানে আসার জন্যে সবাইকে ধন্যবাদ।'

এক হাত তুষারের কাঁধের ওপর এমনভাবে রেখেছিলেন যে সে আর এগিয়ে যেতে পারছিল না। মন্ত্রীমহাশয় নিচের দিকে এগোতেই সে কাতর ভঙ্গিতে নিচু গলায় বলল, 'আমার কথা শেষ হয়নি!'

'যা বলেছ তাই যথেষ্ট।' আলতাফ সাহেব নেমে গেলেন।

নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছিল তুষারের। এত ভূমিকা করার কী দরকার ছিল? সরাসরি বলে দিতে পারত সে। মুখোশ খুলে যেত লোকটার।

ভিড় হালকা হচ্ছে। নিচে নেমে আসা মাত্র বেলাল জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবি? মেসে?'

'জানি না।' বিরক্ত গলায় বলল তুষার।

'হানিফ না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।'

'ও কোথায়?'

'ভি আই পি-দের পৌঁছতে গিয়েছে।'

তুষার খুঁজছিল দিলারাকে। ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গিয়েছেন। সে এক কথা বলে এল আর করল ঠিক উল্টোটা। এতে যে তার কোনো ইচ্ছে ছিল না সেটাই বলা দরকার।

'আমি একটু আসছি।' বলে তুষার পা চালাল। দিলারা নেই। এই ভিড়ের মধ্যে মিশে ফিরে গেছে। নিশ্চয়ই তাকে মেরুদণ্ডহীন মানুষ বলে ভেবে নিয়েছে। তুষার জোরে হেঁটে দোয়েল পাখির কাছে এসে দিলারাকে দেখতে পেল। সন্ধের অন্ধকারে দিলারা একা মাথা নিচু করে হেঁটে চলেছে।

'দিলারা।' সে ডাকল।

দিলারা দাঁড়াল। দুটো বড় চোখে কয়েক মুহূর্ত তুষারকে দেখল। তারপর মুখ ফেরাল, 'বলুন!'

'আপনি বুঝতে পারলেন না দিলারা, উনি আমাকে বলতে দিলেন না? পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে মাইক নিয়ে নিলেন।' বোঝাতে চাইল তুষার, 'আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

'তাতে আপনার কী এসে যায়?'

'না গেলে এত দূরে ছুটে আসতাম না।'

'আপনাকে তো উনি স্বপ্ন দেখিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। আমি বলেছি উনি আমাকে স্বপ্ন দেখতে বাধ্য করেছেন। কেউ যদি বাধ্য করে তাহলে কি স্বপ্ন দেখা যায়?'

চট করে মুখ তুলল দিলারা, 'হ্যাঁ, আপনি বলেছেন। বাধ্য শব্দটা শুনতে পাইনি। মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমি লড়াই করছি, তাই যদি দেখি কেউ আত্মসমর্পণ করল তাহলে মন খারাপ হয়ে যায়।'

ওর কথা বলতে বলতে বাসস্টপে এল। দিলারার ঠিকানা লিখে নিল তুষার। বাসে ওঠার সময় দিলারা বলল, 'আমি একটা জায়গায় আবেদন করেছি। যদি চাকরিটা হয় তাহলে আমার জীবনযাত্রা বদলে যাবে। অবশ্য চাকরি না হওয়ারই সম্ভাবনা।'

কথাটার মানে ভাল বুঝতে পারেনি তুষার। মেসে ফিরে দেখল হানিফ বেলাল লিটনরা দাঁড়িয়ে

আছে। হানিফ বলল, 'কোথায় গিয়েছিলি তুই? কোথাও না পেয়ে এখানে এলাম।'

'কেন?' নিস্পৃহ জিজ্ঞাসা করল তুষার।

'তোকে মামা কাল সকালে দেখা করতে বলেছে। চাকরি পেয়ে গেছিস তুই।' হাসিমুখে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়াল হানিফ।

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না তুষারের। তার জন্যে একটা চাকরির কথা ভেবেছেন আলতাফ হোসেন? কি আশ্চর্য! অথচ মানুষটাকে সে কী খারাপই না ভেবেছিল। অবশ্য খারাপ না ভাবার তো কোনো কারণ নেই। গুপ্তঘাতক রেখেছিলেন সে সাইকেল থেকে পড়ে গেলে খুন করার জন্যে। সেই লোকটা গুলিও করেছিল এবং দিলারা না থাকলে তাকে অনেকদিন আগেই মাটির নিচে শুয়ে পড়তে হত।

দিলারার কথা মনে আসতেই সে আরও অস্বস্তিতে পড়ল। দিলারা তার মুখ থেকে সব শুনে বলেছিল লোকটার মুখোশ খুলে দিতে। সে মঞ্চে উঠে কাজটা করতে পারেনি। দিলারা বুঝেছে সে বাধ্য হয়েছে চুপ করে থাকতে। কিন্তু আজ যদি সে চাকরিটা নেয় তাহলে ও কী ভাববে? স্বার্থসর্বস্ব, সুবিধেবাদী যুবক?

ভাবুক? কে দিলারা? ক'দিন আগেও তো সে মেয়েটাকে চিনত না। দেশে তার মুখ চেয়ে বাবা-মা দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করছে। তাকে সামনের মাস থেকে মেস ছেড়ে দিতে হবে টাকা বাকি পড়ায়। তার সামনে কোনো ভবিষ্যত নেই। দিলারা পারবে তাকে বাঁচাতে? ওর নিজের পায়ের তলায় তো মাটি নেই। আদর্শ ফাদর্শ নয়, এই পৃথিবীতে সেই বেঁচে থাকতে পারে যে সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে। এখানে আত্মহত্যা করে মূর্খরা।

নিজেকে এভাবে বোঝালেও তার মনে পড়ল বেলালের কথা। হাসপাতালে গিয়ে বেলাল বলেছিল কীভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুষারকে সাইকেল থেকে ফেলে দিতে পেরেছিল দিলারা। সেটা পেরেছিল বলে খুনী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। তাকে নতুন জন্ম দিয়েছে দিলারা। কেন দিল? যাকে চেনে না জানে না, কোনো বন্ধুত্ব নেই, তার জীবন বাঁচাতে গেল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়নি তুষার। তাই অস্বস্তি হচ্ছিল চাকরির সুখবর পাওয়া সত্ত্বেও। কি চাকরি? আলতাফ হোসেন নামক ধূর্ত মানুষটা কি কোনো চাল চালছে তাকে চাকরির টোপ দিয়ে? রেকর্ড না ভাঙলে তাকে চাকরি দেবে না বলেছিল লোকটা। রেকর্ড ভাঙা হয়নি। তাহলে হঠাৎ এত উদারতার পেছনে কারণ কী? রাতটা আধো ঘুম আধো জাগরণে কাটল তুষার আহমেদের।

সকাল হতেই ছুটল তুষার। বাসে চেপে ঠিকানা মিলিয়ে যখন দিলারার বাড়িতে হাজির হল তখন সকাল সাতটা। এত সকালে কারো বাড়িতে প্রথমবার আসা শোভনীয় নয়। কিন্তু অপেক্ষা করতে পারছিল না সে।

এই বাড়িতে যে আরও ভাড়াটে আছে তা বুঝতে পারল তুষার। একজন প্রবীণ ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, 'কাকে চাই ভাই?'

'দিলারা এখানে থাকেন?'

'কোত্থেকে আসছেন? খবরের কাগজ?'

'না। দরকার আছে।'

'একটু আগে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। এখানে অপেক্ষা করুন অথবা ওই দরজায় গিয়ে শব্দ

করুন। ওর বাবা বিছানায় শুয়ে শুয়ে আপনার প্রশ্নের জবাব দেবে।' ভদ্রলোক চলে গেলেন।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল তুষার। আর তখনই দিলারাকে দেখতে পেল, দুধ নিয়ে আসছে দিলারা অবাক হয়ে বললো। 'আপনি? হঠাৎ?'

'একটু দরকার ছিল।' বলতে বলতে তুষার দেখল তাদের দিকে কৌতূহলী চোখে অনেকে তাকিয়ে আছে। ওদের চোখ দেখে মনে হচ্ছে যেন সিনেমা দেখছে।

'একটু দাঁড়ান।' ভেতরে চলে গেল দিলারা। ফিরে এল পাঁচ মিনিট বাদে। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'আপনাকে ঘরে নিয়ে গেলে বিপদ পড়তেন। বিছানায় শোওয়া আমার বাবা প্রশ্নে-প্রশ্নে আপনাকে জর্জরিত করতেন। চা খাবেন?'

'চা?'

'এখানে করিম চাচার ফুটপাতে দোকান আছে। খুব ভাল চা করে। চাচা, দুটো চা দাও, সঙ্গে বিস্কুট।'

'কি আশ্চর্য!' মিছিমিছি খরচ করছেন কেন?'

'সকালে চা খেয়েছেন?'

'না।'

'তাহলে ভণিতা না করে বলুন সমস্যাটা কী?'

'জনাব আলতাফ হোসেন সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমার জন্যে নাকি একটা চাকরি তিনি ঠিক করেছেন।' কথাটা বলে দিলারার মুখের দিকে ভাল করে তাকাল তুষার।

'কী চাকরি? কত মাইনে?'

'আমি কিছুই জানি না।'

'রেকর্ড না ভাঙলে তো চাকরি দেওয়ার কথা ছিল না।'

'না। আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে। রাত্রে ভাল করে ঘুমাতে পারিনি। যে লোক আমাকে খুন করতে চেয়েছিল তার দেওয়া চাকরি আমি নেব? যখন জানি লোকটার মধ্যে সততা নেই!'

'কী করবেন ভেবেছেন?'

'আপনার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করতে চাই।'

করিম চাচা চা আর বিস্কুট দিল। চায়ে চুমুক দিয়ে দিলারা বলল, 'আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাওয়া মানেই আপনি দোটানায় পড়বেন। গতকাল ধরলে মাত্র দু'বার আমাকে দেখেছেন আপনি। তার মধ্যে এত ভরসা করার তো কোনো যুক্তি নেই।'

'আপনার সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে আমরা একই প্ল্যাটফর্মের মানুষ। আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন বলে নয়, আপনি আমার নিস্তেজ হয়ে যাওয়া মনুষ্যত্বকে উসকে দিয়েছেন।' তুষার বলল।

'কিন্তু চাকরি দরকার। সুস্থভবে বেঁচে থাকতে হলে অর্থের প্রয়োজন। আপনি গিয়ে দেখুন কী চাকরি, কোথায় যেতে হবে, কত মাইনে? এসব জানার পর সিদ্ধান্ত নিন।'

'সেটা আপোষ হয়ে যাবে না?'

'আপোষ? কে আপোষ করছে না? যাঁরা রাজনীতি করেন তাঁরা তো হরবখৎ করছেন।' চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল দিলারার। সে তুষারের দিকে তাকাল, 'মন পরিষ্কার করে যান।'

মাথা নাড়ল তুষার, 'আমার একটা অনুভূতি হচ্ছে। বলব? আপনার সন্ধানে এখানে আসা ঠিক হবে না। তাই না?'

'আমার আপত্তি নেই। কিন্তু প্রতিবেশীরা হজম করতে পারবে না। ওরা জানে আমি কবিতা লিখি, রিকশা চালিয়েছি। কুলিগিরি করার কথা জানে না। এসব তো ওদের কাছে বদহজমের ব্যাপার। আপনি দুপুরে কী করছেন?'

'কিছু না।'

'আমি তিনটে নাগাদ 'সচিত্র সন্ধানী' অফিসে যাব। কাল বাড়িতে ফিরে কায়ুমভাই-এর একটা চিঠি পেয়েছি। আপনি ওদের অফিস চেনেন?'

'মনে হচ্ছে চিনি। গাজী সাহাবুদ্দিনের 'সচিত্র সন্ধানী' তো?'

'হ্যাঁ। ওখানে চলে আসতে পারেন।'

আলতাফ হোসেন সাহেব কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন, 'ওই মেয়েছেলেটা কে? বান্ধবী নাকি? বেকারদের শুনেছি খুব বান্ধবী জোটে।'

'কার কথা বলছেন?' তুষার জিজ্ঞাসা করল।

'আবে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমাকে যে সাইকেল থেকে ফেলে দিল।'

'ওঁকে আমি আগে দেখিনি।'

'ইন্টারেস্টিং। সত্যি কথা?'

'মিথ্যে কথা কেন বলব?'

'অ। মেয়েটার সঙ্গে আর দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। গতকাল সভায় এসেছিল।'

'ইন্টারেস্টিং। হুম্। তোমার তো কোয়ালিফিকেশন কিছু নেই। কিন্তু চাকরি দরকার। তাই তো? কী চাকরি চাই?'

'ভদ্রভাবে যে চাকরি করতে পারি।'

'ইন্টারেস্টিং। পাশপোর্ট তো নেই, তাই না?'

'না।'

'উচ্চাভিলাষী তো নও, থাকবে কেন? আমার অফিসে যাও। ওরা ফর্ম ভর্তি করে নেবে। তোমাকে নিউইয়র্ক যেতে হবে। ভাল চাকরি। রেস্টুরেন্টে। মন দিয়ে কাজ করবে। দু'বছর যদি কেউ কমপ্লেন না করে তাহলে উন্নতির ব্যবস্থা করে দেব।'

'কত মাইনে দেবেন?'

'দু' ডলার পার আওয়ার। বারো ঘণ্টা খাটো চব্বিশ ডলার। বারশো বাংলাদেশি টাকা। স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। থাকা-খাওয়া ফ্রি। রেস্টুরেন্টেই থাকবে। ইচ্ছে করলে মাসে কুড়ি হাজার টাকা বাপমাকে পাঠাতে পারো।'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না তুষার। এত টাকা। তাদের বাড়ির অবস্থা বদলে যাবে।

আলতাফ হোসেন বললেন, 'যাও। আমার অফিসে যাও। আর হ্যাঁ, ওই মেয়েছেলেটা তোমাকে যে বাঁচিয়েছে, আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো তো। ইন্টারেস্টিং।'

আচমকা পৃথিবীর চেহারা বদলে গেল। আলতাফ হোসেন সাহেবের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে তুষার আহমেদের মনে হচ্ছিল সে যেন রূপকথার জগতে পৌঁছে গেছে। গ্রাম থেকে ঢাকা শহরে এসেছিল

সে। এর বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে তার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। সেই তাকে এখন চাকরি করতে যেতে হবে নিউইয়র্কে। নিউইয়র্ক ইউনাইটেড স্টেট্স অফ আমেরিকার বৃহত্তম শহর। এটা স্বপ্ন ছাড়া আর কি!

আলতাফ হোসেন সাহেবের অফিস মাঝারি। সে যাওয়ামাত্র এক ভদ্রলোক ফর্ম বের করে লিখতে শুরু করল প্রশ্ন করে করে। তারপর বলল, তোমার বার্থ সার্টিফিকেট চাই। তুমি যে বাংলাদেশের নাগরিক তার প্রমাণপত্র চাই। আর তোমাকে চেনে এমন মানুষের রেফারেন্স। এইগুলো আজই দরকার।'

'আমি তো বাংলাদেশেই জন্মেছি। কিন্তু নাগরিক হিসেবে তো কোনো প্রমাণপত্র নেই।'

'সরকারের দেওয়া কোনো কার্ড নেই?'

'না।'

'নিশ্চয়ই আছে। তোমার গ্রামে গিয়ে খোঁজ করো।'

'এসব কি পাশপোর্টের জন্যে লাগবে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু অ্যাপ্লাই করলে শুনেছি পাশপোর্ট পেতে অনেক মাস লেগে যায়।'

'ও ব্যাপারটা আমাদের ওপর ছেড়ে দাও।'

মেসে ফিরে এসে বার্থ সার্টিফিকেট, কলেজের সার্টিফিকেট ইত্যাদির সঙ্গে একটা কার্ড খুঁজে পেল তুষার। লাইব্রেরির মেম্বারশিপ কার্ড। সেখানে ন্যাশনালিটির পাশে লেখা রয়েছে, বাংলাদেশি। তারপর মনে পড়ল এই জন্ম-সার্টিফিকেটই প্রমাণ করছে সে বাংলাদেশের নাগরিক। আর কি দরকার। সমস্ত কাগজপত্র ডুপ্লিকেট করে জমা দিয়ে এল সে। পরিচিত দুই বিখ্যাত মানুষের নাম হিসেবে মন্ত্রীমহাশয় এবং জনাব আলতাফ হোসেনের নাম দিয়ে দিল।

ভদ্রলোক কাগজপত্র নিয়ে বললেন, 'তোমার পাশপোর্ট কাল পেয়ে যাবে। পরশু সকালে আমেরিকান কনস্যুলেটে যেতে হবে ভিসার জন্যে। ওখানে গিয়ে কী বলতে হবে সেটা বলে দেব আগামিকাল।'

সকাল থেকে স্নান খাওয়া কিছুই হয়নি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওর মনে হল যাওয়ার আগে মেসের বাকি টাকা শোধ করবে কী করে? তাছাড়া তার তেমন ভাল জামাপ্যান্ট জুতো নেই। এগুলো পরে ঢাকার রাস্তায় ঘুরলে কেউ কিছু মনে করবে না, কিন্তু নিউইয়র্কে চাকরি করা কি চলবে? ওখানে তো বরফ পড়ে। তার তো তেমন শীতবস্ত্র নেই।

মেসে বলা যাবে না সে বিদেশে চলে যাচ্ছে। কার কাছে ধার চাওয়া যায়? আলতাফ হোসেন সাহেব নিশ্চয়ই তাকে ধার দেবেন না। এতটা চাইতে যাওয়া উচিত হবে না।

রাস্তার পাশের একটা দোকানের বেঞ্চিতে বসে পাউরুটি আর আলুর দম খেল সে। সস্তার খাবার, পেটও ভরে যায়। খেয়ে দেয়ে পয়সা দেওয়ার সময় হঠাৎই মনে পড়ে গেল যে তার অবিরাম সাইকেল চালানো উপলক্ষে ডোনেশন তুলেছিল হানিফরা। অনেক, অনেক টাকা উঠেছিল। সে যদি মারা যেত তাহলে বাবা-মা এক লাখ টাকা পেত। হানিফ আলতাফ হোসেনকে বলেছিল লাখ দেড়েক ডোনেশন পেয়েছে। তাকে উপলক্ষ করে ওরা টাকা তুলেছে অথচ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার পর ও-ব্যাপারে কোনো কথাই বলেনি। কিন্তু সে ছেড়ে দেবে কেন?

সেগুন বাগিচায় চলে এল তুষার। সেই রেস্টুরেন্টে ওরা আড্ডা মারছে। ওকে দেখামাত্র হইহই করে উঠল সবাই। হানিফ জিজ্ঞাসা করল, 'কীরে? মামার কাছে গিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ। উনি আমাকে নিউইয়র্কে পাঠাচ্ছেন চাকরি দিয়ে।'

'শাবাশ। তোর তো হয়ে গেল তুষার। রাতারাতি আমির হয়ে গেলি।' লিটন ওর হাত জড়িয়ে ধরল।

হানিফ বলল, 'এবার তুই আমাদের খাইয়ে দে। আমি তোকে মামার কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম বলেই তো তুই চাকরিটা পেলি!'

বেলাল 'শুনেছি আমেরিকার ভিসা পাওয়া খুব মুশকিল। আমার এক চাচার ছেলে গত পাঁচ বছর ধরে চেষ্টা করেও পায়নি।'

হানিফ ধমকাল, 'তোর চাচার নাম কি আলতাফ হোসেন?'

লিটন বলল, তুই কপাল করে এসেছিলি মাইরি। আমরা বিদেশে যেতে চাইলেও লাইনে দাঁড়িয়ে মিডল ইস্টের দেশগুলোতে গিয়ে কুলিগিরি করতে পারব, কিন্তু আমেরিকায় কেউ নিয়ে যাবে না।'

তুষার অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিল কী করে প্রসঙ্গটা তুলবে। সে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, 'হানিফ, আমার কিছু টাকা দরকার।'

'টাকা? হানিফ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

'তোরা তো ডোনেশন তুলেছিলি। দেড়লাখ টাকার ওপর।'

'তো কী হয়েছে?'

'আমাকে কেন্দ্র করেই তো টাকাটা তুলতে পেরেছিলি!'

'তোর বদলে লিটন যদি সাইকেল চালাত তাহলেও ওই একই টাকা উঠত। তুই কী বলতে চাইছিস তুষার?'

'আমার খুব টাকার দরকার। যদি বাইরে যাই তাহলে মেসের টাকা শোধ করতে হবেই। জামাপ্যান্ট কেনার দরকার।' কাতর গলায় বলল তুষার।

হানিফ বলল, 'তুই যে নিউইয়র্কে যাচ্ছিস তোর প্লেন ভাড়া কে দিচ্ছে?'

'সম্ভবত আলতাফ হোসেন সাহেব।'

'ওঁর কী দায় পড়েছে তোর প্লেন ভাড়া দিতে?'

জবাব দিতে পারল না তুষার।

'যা টাকা উঠেছিল তা থেকে উনি প্লেন ভাড়া কেটে নিয়েছিলেন। বাকিটা অনুষ্ঠানের পেছনে খরচ হয়েছে। আর সামান্য যা ছিল তা আমরা ভাগাভাগি করে নিয়েছি।' হানিফ বলল।

লিটন হাসল, 'আমরা বেকার, তুই চাকরি পেয়েছিস। তোর চেয়ে আমাদের টাকার বেশি দরকার। তুই ধার নে, মাইনে পেলে শোধ করে দিবি।'

'কে ধার দেবে আমাকে?'

'কত টাকা চাই হিসেব করে কাল বলিস।' লিটন বলল, 'আমরা না হয় সবাই মিলে তোকে ধার দেব।'

তুষার উঠে দাঁড়াল। বেলাল বলল, 'নিউইয়র্কের ভাড়া কত জানিস? আশি হাজার টাকার ওপরে। বুঝলি?'

কাল দেখা করবে বলে তুষার বেরিয়ে এল। সে বন্ধুদের দোষ দিতে পারছিল না। টাকাটা যদি সমান ভাগ করা হত তাহলে তো সে আশি হাজার টাকা পেত না। অথচ ওরা বলেছিল সেই সময় এক লাখ দেবে। আজ বলছে ধার নিতে। অবশ্য টাকার পরিমাণ ঠিক কত তাই সে জানে না। তুষার ঠিক করল এই নিয়ে সে আর ভাববে না।

সকালে তুষার চলে যাওয়ার পরই ফোনটা এসেছিল। যাদের বাড়িতে ফোন তারা বিরক্ত হয়ে ডেকে দিয়েছিল। দিলারা ফোন তুলতেই ওপাশ থেকে এক ভদ্রলোক বললেন, 'দিলারা?'

'জ্বী।'

'আপনি গতকাল আমার বাড়িতে এসেছিলেন। আমি আমার বোনের সঙ্গে কাল টেলিফোনে কথা বলেছি। আপনি যদি যেতে চান তাহলে ওঁদের আপত্তি নেই। চাকরিটা আপনাকে দেওয়া হল।' ভদ্রলোক হাসলেন।

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।' দিলারা নিচু গলায় বলল।

'আপনার পাশপোর্টের জন্যে আবেদন করতে হবে। দুপুরের মধ্যে আসতে পারবেন?'

'পারব।'

'তাহলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে আসবেন। কী কী লাগবে জানেন?'

'না।'

'বার্থ সার্টিফিকেট, রেশন কার্ড, এডুকেশন সার্টিফিকেট।'

'ঠিক আছে। রাখি?'

রিসিভার নামিয়ে রেখে সোজা নিজেদের ঘরে চলে এল সে। বাবা তখন দুধ খাচ্ছেন। সে চেয়ার টেনে ওঁর বিছানার পাশে বসল, 'বাবা আমি একটা চাকরি পেয়েছি।'

খাওয়া থামিয়ে পিটপিট করে তাকালেন শীর্ণ বৃদ্ধ, 'সত্যি?'

'হ্যাঁ। এখন দশ হাজার টাকা মাসে দেবে।'

'সে কিরে? আঃ আল্লা!' চোখ বন্ধ করলেন বৃদ্ধ।

'কিন্তু চাকরি করতে হলে আমাকে বিদেশে যেতে হবে।'

'বিদেশে?'

'হ্যাঁ। পোর্ট সঈদ। মাইনের টাকা ওরা প্রতি মাসের এক তারিখে তোমার হাতে নিয়ম করে দিয়ে যাবে।'

'যদি না দেয়?'

'দেবে। সেরকম চুক্তি হয়েছে। আমি ভাবছিলাম কি সোনাচাচিকে বলব এখানে এসে থাকতে। বিধবা হওয়ার পর সোনাচাচির অবস্থা খুব খারাপ। ছেলেরাও সাহায্য করে না।' উঠে দাঁড়াল দিলারা।

'যা ভাল বুঝিস কর।'

দুপুরের মধ্যে পাশপোর্টের দরখাস্ত শেষ করে কাগজপত্র দিয়ে দিলারা যাচ্ছিল 'সচিত্র সন্ধানী' অফিসে। যেতে যেতেও কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়ছিল। কি সহজে বাবা তার বিদেশে যাওয়া মেনে নিল। শুধু মাস গেলে দশ হাজার পাওয়ার জন্যে মেয়েকে বিসর্জন দিতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। পৃথিবীটা কি এইরকম নিষ্ঠুর? মা বেঁচে থাকলে কি এরকম করত?

'সচিত্র সন্ধানী' পত্রিকার অফিসে ঢুকে দিলারার মন ভাল হয়ে গেল। কায়ুমসাহেব বসে আছেন, সামনে দুজন তরুণ; মুগ্ধ হয়ে ওর কথা শুনছে। দরজায় তাকে দেখে কায়ুম সাহেব নির্মল হাসলেন, 'আরে! এসো এসো। তুমি বিপ্লব করে ফেলেছ!'

লজ্জা পেল দিলারা, 'কি যে বলে!'

'আরে খবরের কাগজে তোমার রিকশা চালানোর ছবি দেখে প্রথমে অবাক হয়েছিলাম, পরে

গর্বে বুক ভরে গেল। এরকম ডাকাবুকো না হলে বাঙালি মরে যাবে, তুমি কি রিকশা নিয়ে এখানে এসেছ?'

মাথা নাড়ল দিলারা, 'না। ওই একদিনই, তারপর ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি।'

'কেন?'

'প্রচণ্ড প্রতিরোধ। রাস্তায় টিটকিরি, অশ্লীল কথার বন্যা আর বাড়িতে বাবা প্রচণ্ড ক্ষেপে গেলেন। তাঁর সম্মান আমি নাকি ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছি।'

'বসো বসো। তোমার সমস্যা বুঝতে পারছি। এই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে আমাদের পৃথিবীটা এই রকম থাকবে। এদের সঙ্গে আলাপ আছে?'

বসে পড়ল দিলারা। ঘাড় নেড়ে জানাল আলাপ নেই।

'এরা সব তরুণ শিল্পী। খুব ভাল আঁকে। এখন স্বপ্ন দেখার আর লড়াই করার সময় এদের। এ হল দিলারা।' কায়ুমসাহেব বললেন।

ছেলে দুটো জানাল তারা কাগজে ছবি দেখেছে।

'দিলারা কবিতা লেখে।' কায়ুমসাহেব যোগ করলেন।

দিলারা প্রসঙ্গ ঘোরাতে চাইল, 'কায়ুমভাই, গাজীভাই নেই?'

'ছিল তো, বোধহয় কাছাকাছি কোথায় গিয়েছে, তোমার হাতে সময় আছে তো?'

'ঠিক আছে।'

কায়ুমভাই সব সময় হাসেন। বাংলাদেশের প্রথম সারির শিল্পী। গাজীভাইকে খুব ভালবাসেন বলে 'সচিত্র সন্ধানী' অফিসে এসে আড্ডা মারেন। এই পত্রিকার অনেক ছবিই ওঁর আঁকা। কিন্তু ভদ্রলোক একেবারেই প্রচারবিমুখ। নিজের মত থাকতে পছন্দ করেন। আর তরুণ শিল্পী কবিদের উৎসাহ দিয়ে যান।

'তোমার আর্থিক অবস্থা এত খারাপ আমি জানতাম না।'

'নিজের এসব কথা কি সব সময় বলা যায়?'

'এটাই হল পরিহাস। একজন কবি কবিতা নিয়ে নিজের সংসার চালাতে পারেন না এদেশে। শামসুর রহমানকেও চাকরি করতে হয়। গল্প-উপন্যাস লিখলে তবু একটা উপায় খুঁজে পাওয়া যায়। এই যে, গাজী এসে গিয়েছে।'

কায়ুমসাহেব যাঁকে দেখে কথাগুলো বললেন তিনি মধ্যবয়স্ক। শরীর ক্ষীণ, চোখে চশমা, মুখ দেখলেই বোঝা যায় সিরিয়াস প্রকৃতির মানুষ। দিলারাকে দেখে গাজী বললেন, 'কী ব্যাপার? তোমার যে এই অবস্থা তা মুখ ফুটে বলোনি কেন? যারা সাইকেলরিক্সা চালায় তারা কবিতা লিখতে পারে, কিন্তু যারা কবিতা লেখে তারা দু-একদিন ওটা চালিয়ে একটু বিদ্রোহ করতে পারে মাত্র।'

'আমার যে একটা চাকরির খুব প্রয়োজন তা সবাই জানে।'

'হুঁ'। ড্রয়ার থেকে একটা খাম বের করে এগিয়ে দিলেন, 'রাখো।'

'কি?'

'তোমার কবিতা ছাপা হয়েছিল, সামান্য সম্মান দক্ষিণা।'

'আগে তো কখনও পাইনি।'

'দেওয়ার মত ক্ষমতা আমার ছিল না তাই পাওনি।' গাজীভাই খুব নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিলেন। কায়ুমসাহেব হাসলেন, 'আরে নিয়ে নাও। কবিতার তো পারিশ্রমিক হয় না, দক্ষিণাই সঠিক কথা।'

গাজী সাহেব বললেন, 'শোন দিলারা। সুভাষ আমার এখানে কাজ করত। প্রেস সামলাত, অর্ডার নিত। ওর অভিজ্ঞতা অনেক। সেটা এখান থেকে সঞ্চয় করে ও আরও বড় জায়গায় বেশি মাইনের চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছে। তুমি যদি চাও এই চাকরিটা করতে পারো। দিন সাতেক দেখলেই শিখে নিতে পারবে।'

দিলারা উত্তেজিত হল। প্রেসের চাকরি মানে ঢাকায় থাকা। বই, পত্রিকা আর লেখালেখির জগতের মধ্যে ডুবে থাকা। আচমকা যদি স্বপ্ন বাস্তব হয়ে ওঠে তাহলে এত আনন্দ কি হয়?

গাজী সাহেব বললেন, 'তুমি জানো পত্রিকার যা খরচ সে-তুলনায় আয় হয় না। এটা আমার জেদ। তাই বন্ধ করছি না। প্রেসের অবস্থাও তেমন ভাল নয়। তাই আপাতত তোমাকে তিন হাজারের বেশি দিতে পারব না। সুভাষ পেত সাড়ে তিন। তোমার কাজকর্ম ভাল হলে না হয় ওই টাকা দেওয়া যাবে। সকাল ন'টায় আসবে। এখানেই দুপুরে খাবে। রাত আটটায় প্রেস বন্ধ করবে। এখন ভেবে দ্যাখো, রাজি আছ কি না!'

ঝট করে বাবার মুখ মনে পড়ে গেল। তিন হাজার টাকা পেলে কোনোমতে খেয়ে পরে বেঁচে থাকা যাবে। কবিতা লিখতে পারবে মন খুলে। কিন্তু বাবার চিকিৎসা হবে না ভালভাবে। কিন্তু তাকে বিদেশে যেতে হবে না। একজন অসুস্থ মায়ের বাচ্চাদের দেখাশোনা করে সময় নষ্ট করতে হবে না।

কিন্তু তিন হাজার টাকার মাইনের খবর পেয়ে বাবার কী প্রতিক্রিয়া হবে? মেয়ে দূর দেশে চলে যাবে না, পাশে থাকবে জেনে খুশি হবেন?

'কি, তোমাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?' কায়ুমসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

'টাকার পরিমাণ বোধহয় পছন্দ হয়নি।' গাজীভাই বললেন, 'রিকশা চালাতে গিয়েছিলে। তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কেউ চালাতে পারে না। মেয়েদের পক্ষে তা অসম্ভব। ওই পরিশ্রম করেও কি তুমি মাসে তিন হাজার হাতে পেতে?'

দিলারা নিঃশ্বাস ফেলল, 'এই চাকরিটা পেলে আমি ধন্য হয়ে যেতাম।'

'ধন্য হওয়ার দরকার নেই। তাহলে অসুবিধেটা কীসের?'

'বাবার সঙ্গে একটু কথা বলব।'

'যেখানে কোনো কাজ নেই তখন হাতে কিছু পেলে তো নেবে কি না, সেটা বাবার সঙ্গে কথা বলে ঠিক করতে হবে? আমি বুঝতে পারছি না।'

একটু শ্লেষ গাজীভাই-এর গলায়।

'গতকাল সকালে হলেও আলোচনার দরকার ছিল না। আমি বিজ্ঞাপন দেখে একটা চাকরির সন্ধানে গিয়েছিলাম। পোর্ট সঈদে এক বাংলাদেশি পরিবারে গভর্নেস দরকার। ওরা আমাকে চাকরিটা দিতে রাজি হয়েছে। মাসে দশ হাজার টাকা দেবে। টাকাটা ওরা আমার বাসায় পৌঁছে দেবে প্রতি মাসে। খবরটা শুনে আব্বা খুব খুশি হয়েছেন।' দিলারা নির্লিপ্ত গলায় বলল।

'সেকি? তুমি দেশ ছেড়ে পোর্ট সঈদে চলে যাবে বাচ্চা সামলাতে?'

'আমি টাকার জন্যে রিকশা চালিয়েছি, স্টেশনে কুলিগিরি করেছি। নিজের মানসম্মান বাঁচিয়ে এত টাকা তো রোজগার করতে পারতাম না।'

'কিন্তু সেখানে গিয়ে যদি দ্যাখো মানসম্মান রাখতে পারছ না।'

'তাহলে পালিয়ে আসার চেষ্টা করব না হয় আত্মহত্যা করব?'

দিলারা উঠে দাঁড়াল, 'কিন্তু আপনার এখানে কাজ করতে পারলে আমি শান্তি পাব গাজীভাই। আমাকে একটা দিন সময় দেবেন?'

গাজীভাই বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়লেন, 'দ্যাখো।'

পত্রিকার অফিস থেকে বেরিয়ে আসতেই তুষারকে দেখতে পেল দিলারা। চুপচাপ ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে।

'আপনি এখানে? ভেতরে গেলেন না কেন?'

'না, মানে—সবাই অপরিচিত তো!'

হাঁটা শুরু করল ওরা। পথচারীরা যেতে যেতে ওদের দিকে তাকাচ্ছে, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। চিনতে পেরে হাসাহাসি করছে। দিলারা বলল, 'আপনার সঙ্গে রাস্তার হাঁটা যাবে না। আপনি এখন বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন।'

'খবরের কাগজ আপনাকেও কম বিখ্যাত করে দেয়নি।'

'চলুন কোথাও গিয়ে বসি!'

'রেস্টুরেন্টে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু। খুলেই বলি. আমার কাছে খুব অল্প পয়সা আছে।'

'আমি আজ বড়লোক।'

'কী করে?'

'কবিতা ছাপা হয়েছিল। তার জন্যে টাকা পেয়েছি।

'কবিতার জন্য টাকা!'

'চলুন. ওখানে যাই।' মাঝারি একটা রেস্টুরেন্ট দেখাল দিলারা।

'একটা কবিতার জন্য টাকা দিয়েছে?'

'হ্যাঁ। দাঁড়ান দেখে নিই কত টাকা। সেই বুঝে অর্ডার দিতে হবে তো।' ব্যাগ থেকে খামটা বের করে দেখল দিলারা. 'সর্বনাশ! এ যে একশ টাকা।'

'বাঃ। আপনি যদি রোজ দুটো করে কবিতা লেখেন!'

খিলখিল করে হেসে উঠল দিলারা। অনেকদিন বাদে হাসল। সেটা সামলে বলল, 'কবিতা তো মেশিনে তৈরি হয় না যে রোজ দুটো করে লিখব। কবিতা আসে। মনে এসে জমে, তৈরি হয়। আর রোজ দুটো করে কবিতা ছাপবে এত কাগজ কোথায়? বলুন।'

টোস্ট, ওমলেট আর চায়ের অর্ডার দিল দিলারা। দিয়ে বলল, 'আপনার খবর কী বলুন?'

'ভাল খবর আছে। চাকরি পেয়েছি।'

'বাঃ কোথায়?' চিৎকার করে উঠল দিলারা।

'সাগর পারে। ঢাকা থেকে অনেক দূরে, নিউইয়র্কে। আলতাফ হোসেন সাহেব চাকরিটা দিলেন। রেস্টুরেন্টের চাকরি। ও হ্যাঁ, উনি আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।' মনে পড়ে গেল তুষারের।

'আমাকে? কেন?' দিলারা অবাক।

'তা তো জানি না।'

'লোকটাকে আমার ভাল লাগেনি।'

'হয়তো আপনাকে চাকরি দিতে পারেন উনি।'

'তার দরকার নেই। নিউইয়র্ক নয়, তার অর্ধেক দূরত্বের পোর্ট সঈদে আমি চাকরি পেয়েছি। ভালই হল, আমরা দুজনেই আর ঢাকায় থাকছি না।'

দিলারা বলল।

অনেক রাত পর্যন্ত তুষার সেদিন ঘুমাতে পারেনি। দিলারার সঙ্গে রেস্টুরেন্টে বসে তার যেমন ভাল লেগেছিল, আর দেখা হবে না বলে তেমনি খারাপ লেগেছিল। কোনো মেয়ে আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে এমন বন্ধুর মত কথা বলেনি। তার সহপাঠিনীদের প্রায় সবাই নাক উঁচু। মোমের পুতুলের মত দেখতে তারা। যাদের বাবার জাপানি গাড়ি আছে, সেটা রিডাকশনে কেনা হলেও জাপানি, পকেটে উপহার কিনে দেওয়ার মত পর্যাপ্ত টাকা এবং সঙ্গে বাবার সাফল্যের পাশপোর্ট সেইসব ছেলের সঙ্গেই ওদের বন্ধুত্ব। এই প্রথম একজন মেয়ে তার পরিবার, সমস্যা নিয়ে আন্তরিকভাবে কথা বলল। দিলারার কথা ভাবলেই একটা অদ্ভুত ধরনের ভাললাগা মনে জমছিল। কিন্তু দিলারা এই শহরে বেশিদিন নেই, তাকেও শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। হঠাৎ তুষারের মনে হল, যদি আগে তাদের দেখা হত তাহলে কি অবস্থাটা পাল্টাত? দু'জন মানুষ আর্থিক অনটনে কখনই কাছাকাছি আসতে পারত না। তবু দিলারা কবিতা লেখে। সে লিখতে পারে না। দিলারা বলেছে আজীবন লিখে যাবে। ছাপা হোক বা না হোক। আজ দিলারা যে কবিতা লিখে টাকা পেয়েছে তার লাইনগুলো বলেছিল, 'মাতৃদুগ্ধের কাল শেষ হয়ে গেলে মুখে বোল ফোটে, মায়ের ভাষায় আমৃত্যু সেই শব্দমালায় দুধের গন্ধ মিশে থাকে। বর্ণমালা তাই মা হয়ে যায়।'

সেগুন বাগিচায় পৌঁছে গেল তুষার সকাল সাড়ে দশটায়। সবাই আছে শুধু হানিফ নেই। লিটন তাকে চা টোস্ট খাওয়াল। শেষ পর্যন্ত কথাটা পাড়ল তুষার, 'তোরা কাল বললি, আমি হিসেব করে দেখলাম অন্তত দশ হাজার টাকা দরকার। আমি ধার নিচ্ছি, কয়েক মাসের মধ্যে শোধ করে দেব।'

বেলাল বলল, 'এত টাকা কেন দরকার?'

'মেসের ধার মেটাতে হবে। নিজের জামাজুতো ছাড়া গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার আগে কিছু পাঠানো দরকার।' তুষার বলল।

'তুই হাতে পাশপোর্ট ভিসা পেয়ে গেছিস?'

'না।'

'ধর, তুই ধার নিলি কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো বিদেশে যাওয়া হল না, চাকরিও পেলি না, তুই ধার শোধ করবি কী করে?'

'ওঁরা আমাকে দিয়ে পাশপোর্টের দরখাস্ত করিয়েছে।'

'ঠিক আছে। আগে পাশপোর্ট টিকিট হাতে আসুক তারপর ধার নিবি। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে না, চায়ের কাপ আর ঠোঁটের মধ্যে অনেক ফারাক থাকে।' বেলাল হাসল। তুষার যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'তোরা কি কিছু শুনেছিস? হানিফ কিছু বলেছে?'

লিটন ধমকাল, 'কেন ভয় দেখাচ্ছিস বেলাল। না রে তুষার, হানিফ কিছু বলেনি। শোন, আমরা কোনো মতে পাঁচ হাজার জোগাড় করতে পেরেছি।'

সে পকেট থেকে নোটের বান্ডিল বের করে টেবিলে রাখল, 'এর বেশি আমরা তোকে দিতে পারব না। কিন্তু বিদেশে গিয়ে ভুলে যাস না, শোধ করবি।'

'এতে কী করে হবে? মেসেই তো তিন হাজার দিতে হবে।'

লিটন বলল, 'তোকে আমি একটা চামড়ার জ্যাকেট দিয়ে দেব। ওটা একদম নতুনের মত দেখতে।'

সবাই কিছু না কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল যা কিনতে হলে অনেক টাকা লাগত। অগত্যা বাধ্য হয়ে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে উঠল তুষার। তার কেবলই মনে হচ্ছিল এই টাকা তার নাম করে তোলা অথচ ওরা ওকে ধার দিল। সেই চক্ষুলজ্জা এড়াতেই আজ এখানে হানিফ আসেনি।

আলতাফ হোসেনের অফিসে এসে অবাক হয়ে গেল তুষার। একদিনের মধ্যেই নাকি পাশপোর্ট হয়ে গিয়েছে। আজ কানাডার ভিসার জন্যে দরখাস্ত জমা পড়েছে। ভিসা হয়ে গেলেই টিকিট করা হবে।

তুষার অবাক হল, 'কানাডা কেন? আমার তো আমেরিকা যাওয়ার কথা, কানাডা নয়। আপনাদের ভুল হচ্ছে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'না। আমাদের ভুল হয়নি। সাহেব তাঁর চেম্বারে আছেন। গিয়ে দেখা করুন। উনি সেইরকম বলেছেন।'

আলতাফ হোসেন সাহেব তাঁর অফিসের চেম্বারে। কথাটা শোনার পর উনি না বললেও তাকে দেখা করতে যেতে হত। সে খবর দিল। একটু বাদে একজন পিওন তাকে ডেকে নিয়ে গেল।

কার্পেটে মোড়া শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরটি এত চমৎকার সাজানো যে দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল তুষারের। আলতাফ হোসেন সাহেব টেলিফোনে কথা বলছিলেন ইশারায় বসতে বললেন।

কথা শেষ হতে বললেন, 'শোনো, কালই তোমাকে যেতে হবে।'

'কাল?' হতভম্ব হয়ে গেল তুষার।

'হ্যাঁ। কাল একটা সিট পাওয়া গিয়েছে প্লেনে।'

'আমি যে একদম তৈরি হইনি।'

'আশ্চর্য! তোমাকে বলার পরও তৈরি হওনি কেন? এই বাঙালি ছেলেদের নিয়ে এই সমস্যা হয়। আরে তুমি পুরুষমানুষ, তোমার তৈরি হতে সময় লাগবে কেন? যদি কিছুর প্রয়োজন হয় তাহলে ওখানে গিয়ে কিনে নেবে। আমি বলে দেব যাতে কিছু অ্যাডভান্স দিয়ে দেয়।'

'একবার গ্রামে গিয়ে আব্বা-আম্মার সঙ্গে দেখা করব না?'

'এই জন্যেই বলে, রেখছ বাঙালি করে মানুষ করোনি। আরে ওনারা তো চিরকাল থাকবেন, চাকরি তো হাতের মোয়া নয়। যখন ছুটিতে আসবে তখন যত ইচ্ছে দেখা কোরো।' হাসলেন আলতাফ হোসেন সাহেব।

তুষার মুখ নিচু করল। ব্যাপারটা সে ভাবতেই পারছে না। খবর শুনলে আম্মা কেঁদে ভাসাবে। আজ এখনই রওনা হয়ে কাল ফিরে আসতে পারবে? অসম্ভব।

এই সময় আলতাফ হোসেন সাহেবের কর্মচারী ঘরে ঢুকল, 'একটা সমস্যা হয়েছে পাশপোর্টের আবেদনপত্রের সঙ্গে ওর যে ছবি দিয়েছিলাম, চার কপি ছিল, এখন আর হাতে নেই। ভিসার জন্যেও ছবি লাগবে।'

'তুমি কবে বুদ্ধিমান হবে হে? ছবি নেই, তুলিয়ে নাও। পাঁচ মিনিটের ব্যাপার।'

লোকটি মাথা নাড়ল, 'তাহলে চলুন।'

তুষার অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে তো আগের বার পাশপোর্টের জন্য ছবি দেয়নি। ওরা ছবি কোথায় পেল?

আলতাফ হোসেন সাহেব বললেন, 'ভিসা কাল দুপুরেই পেয়ে যাব। তোমার প্লেন রাত্রে। কিন্তু বিকেল চারটের মধ্যে এই অফিসে চলে আসবে।'

তুষারের মনে পড়ল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আমি কি নিউইয়র্কে যাচ্ছি না? আপনি বলেছিলেন কাজটা ওখানে।'

'কাজটা যে অন্য জায়গায় হয়েছে তা কি তোমাকে কেউ বলেছে?'

'না। উনি বললেন কানাডার ভিসা করতে হবে।'

'ঠিকই বলেছে। টরেন্টো যাবে প্রথমে, সেখান থেকে নিউইয়র্ক। যাও।'

বেরিয়ে এল তুষার। ইতিমধ্যে সে ম্যাপ দেখেছে। নিউইয়র্ক থেকে টরেন্টোর দূরত্ব অনেক। দুটো আলাদা দেশ। তার চাকরি যদি নিউইয়র্কে হয় তাহলে সরাসরি সেখানেই যাচ্ছে না কেন?

পাশের একটা স্টুডিও থেকে ছবি তোলানোর পর মিনিট দশেকের মধ্যে ডেলিভারি দিয়ে দিল। আলতাফ হোসেন সাহেবের কর্মচারী দাম মিটিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি খুব ভাগ্যবান। আমাদের সাহেবের নেকনজরে পড়েছেন বলে ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নিতে পারছেন।'

তুষার মোটেই খুশি হল না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা আমার ছবি এর আগে কীভাবে পেলেন?'

'কেন? ওই সাইকেল চালানোর সময় ফটোগ্রাফার তুলেছিল। নেগেটিভ দেয়নি।'

'উনি কি পাশপোর্ট সাইজ ছবি তুলেছিলেন?'

'ওইরকম আর কি!'

মেসে এসে টাকা মিটিয়ে দিতে ম্যানেজার অবাক, 'কি ব্যাপার, বড় রোজগার হয়েছে নাকি? খুব উপকার করলেন ভাই।'

তুষার বলল, 'আপনাকে অনেক জ্বালিয়েছি এতদিন। কাল থেকে বেঁচে যাবেন।'

'বেঁচে যাব? কেন?'

'আমি বাইরে চলে যাচ্ছি।'

'সেকি? কোথায়?' লোকটাকে সত্যি সত্যি উদ্বিগ্ন দেখাল।

'আমেরিকায়।'

'চাকরি পেয়েছেন বুঝি। বাঃ। আপনার সামনে তাহলে সোনার ভবিষ্যৎ। কিন্তু সেখানে গিয়ে এই দেশটার কথা ভুলে যাবেন না ভাই। আমি নিশ্চয়ই টাকার জন্যে আপনার সঙ্গে অনেক খারাপ ব্যবহার করেছি, কিন্তু সেটা মনে রাখবেন না।'

ম্যানেজার কথাগুলো বলল খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে।

খাওয়াদাওয়া করে তুষারের মনে পড়ল। ওদের গ্রামের একটি বাড়িতে টেলিফোন আছে। ওই বাড়ির ছেলে রাজু, রাজউদ্দিন তার সঙ্গে গ্রামের স্কুলে পড়ত। রাজুর বাড়িতে থেকে ওদের বাড়ি অন্তত মিনিট পাঁচেক দূরত্বে। এখন পকেটে টাকা রয়েছে। তুষার ছুটল। ঢাকা থেকে আজকাল জেলা শহরের টেলিফোনের লাইন সহজে পাওয়া যায়। গ্রাম পেতে অসুবিধে হয়। পনেরো মিনিট চেষ্টার পর টেলিফোনের কর্মী লাইনটা পেলেন। রাজুই ফোন ধরল। নিজের পরিচয় দিয়ে তুষার বলল সে পনেরো মিনিট পরে আবার ফোন করছে, রাজু যেন বাড়ির কাউকে ডেকে আনে।

পনের মিনিট বড় দীর্ঘ সময়। তারপর অনেক চেষ্টা করেও লাইন পাচ্ছিল না তুষার। শেষ পর্যন্ত টেলিফোন বাজল। ওপাশে আব্বার গলা, অস্পষ্ট, ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে না। তুষার চিৎকার করল, 'আমি তুষার। শুনতে পাচ্ছ?'

ওপাশ থেকে কি না বলল?

তুষার আবার চিৎকার করল, 'আমি একটা চাকরি পেয়েছি, নিউইয়র্কে। কালই যেতে হবে। ওখানে গিয়ে চিঠি দেব। প্রতি মাসে টাকা পাঠাব। শুনতে পাচ্ছ?'

টেলিফোনে ঝড় উঠল। সেই ঝড় সব কথা গিলে ফেলল।

রিসিভার নামিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না তুষার। বিদেশে যাওয়া আগে শেষবার আব্বার সঙ্গে তার কথা হল না। আব্বা যে তার কথাগুলো শুনতে পেয়েছেন সেটাও বোঝা গেল না।

বিল মিটিয়ে দিয়ে মনে হল রাত্রে আবার চেষ্টা করলে হয়। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল, প্রথমবার বলে রাজু পাঁচ মিনিট হেঁটে গিয়ে খবর দিয়েছে, রাতের বেলায় কি রাজি হবে? তুষার মাথা নাড়ল, তবু চেষ্টা করতে হবে।

বায়তুল মোকারম মসজিদের সামনে এসে তুষার দেখল প্রচুর মানুষ জড়ো হয়েছে। এখন বিকেলবেলা। এই সময়ে জড়ো হওয়া মানুষরা যে খুবই ক্ষুব্ধ তা তাদের চোখমুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। জায়গাটা দ্রুত পেরিয়ে পুরানা পল্টনে চলে এল তুষার। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে খুশি হল, দিলারা তখনও এসে পৌঁছয়নি। রেস্টুরেন্টটার সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছিল তুষার। পঙ্গপালের মত রিকশা ছুটে যাচ্ছে। ঢাকায় পড়তে এসে সে শুনেছে আগে নাকি এত রিকশা এই শহরে ছিল না। স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক সংকট বেড়ে যাওয়ায় গ্রামগঞ্জ থেকে গরিব মানুষেরা চাকরির আশায় ছুটে এসেছিল শহরে। বন্ধ দরজায় ধাক্কা খেতে খেতে তাদের একাংশ নেমে পড়ল রিকশা চালাতে। ঢাকায় বে-আইনি রিকশার সংখ্যা বেড়ে গেল হু হু করে।

'কখন এসেছেন?'

'এই তো।' তুষার দিলারার দিকে তাকাল। আজ দিলারাকে বেশ ছিমছাম দেখাচ্ছে। শাড়িটাও সুন্দর। ওর তাকানো দেখে ঈষৎ লজ্জা পেল দিলারা, 'ফটো তুলতে যেতে হয়েছিল। পাশপোর্ট আর ভিসার।'

'ও।' তুষার বলল, 'আজ আমি আপনাকে খাওয়াব।'

'কেন? এরকম তো কোনো নিয়ম নেই।' হাসল দিলারা।

'নেই। কিন্তু আজ আচমকা কিছু টাকা পেয়েছি। ধার শোধ করার পরও বেশ কিছু বেঁচে গেছে। একটা ভাল জুতো আর দুটো শার্ট কিনেও কিছু থাকবে। চলুন, ভেতরে গিয়ে কথা বলি।' তুষার এগোল।

রেস্টুরেন্টের যে টেবিলে ওরা গতকাল বসেছিল সেটা খালি ছিল। খাবারের অর্ডার দিয়ে তুষার জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার আব্বা কী বললেন?'

মুহূর্তেই উদাস হয়ে গেল দিলারা, নিঃশ্বাস ফেলল, 'গাজীভাই যে টাকা দেবেন তাতে অভাব তো মিটবে না। প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা হাতে পেলে আব্বার শরীর মন ভাল হয়ে যাবে।'

'কিন্তু সেটার বিনিময়ে তো আপনাকে উনি কাছে পাচ্ছেন না।'

'কাছে থেকেও তো আমি কিছু করতে পারছি না।'

'কিন্তু অমন অনিশ্চিত ভবিষ্যতে পাঠিয়ে ওঁর মনে কি চিন্তা হবে না?'

'সেটা আমাকে বলেননি। বলেছেন, হিরে হাতে পেলে কেউ তামার জন্যে সেটা ফেলে দেয় না। কথাটা শোনার পর আর আমার কোনো দ্বিধা নেই।'

'আপনার অন্য আত্মীয়স্বজনরা ওঁকে বুঝিয়ে বলতে পারছেন না?'

'প্রথম কথা আমার কোনো নিকট আত্মীয় নেই। একটু দূরের যাঁরা আছেন তাঁরা খবরটা শুনলে আমাকে জোর করবেন বিদেশে যাওয়ার জন্য।'

'কেন?'

'তাহলে আব্বাকে সেবা করার অছিলায় ওঁরা দশ হাজারের মজা পেতে পারেন।'

খাবার এসে গিয়েছিল। ওদের সামনে প্লেট সাজিয়ে দিয়ে গেল বয়।

দিলারা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার খবর কী?'

'আমি শেষ পর্যন্ত যাচ্ছি।'

'কত দেরি?'

'দেরি নেই। আগামিকাল রাত্রে প্লেনে উঠতে হবে।'

'আগামিকাল? এত তাড়াতাড়ি?'

'সেটা আজই জানলাম। প্লেনে নাকি পরে জায়গা নেই। কিন্তু—।'

'কিন্তু কী?'

'আমার যাওয়ার কথা নিউইয়র্কে, যাচ্ছি কানাডায়।'

'ও মা! কেন?'

'সেটা ওঁরা আমাকে খুলে বলছেন না।'

'আপনার ইউ এস ভিসা হয়ে গেছে?'

'না। কানাডার ভিসার জন্যে ফর্ম ফিল আপ করেছি।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ওঁরা আপনার চাকরি ঠিক করেছেন নিউইয়র্কে, তাহলে কানাডায় নিয়ে যাচ্ছে কেন?'

দিলারা মাথা নাড়ল, 'অবশ্য অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত্রি।'

'কিন্তু বিশ্বাস করুন, এখন আমার মোটেই যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'সে কি? কেন?'

'এই বাংলাদেশ, ঢাকা শহর, চেনা পথঘাট, মানুষজন, সব এখানে পড়ে থাকবে আর আমি এদের ছেড়ে সম্পূর্ণ অজানা একটা জায়গায় চলে যাব, ভাল লাগে?'

'আপনি যখন গ্রাম ছেড়ে এখানে এসেছিলেন তখন কী মনে হয়েছিল?'

'কষ্ট হয়েছিল খুব। কিন্তু জানতাম ইচ্ছে হলেই গ্রামে চলে আসতে পারি, ছুটিতে তো আসবই। কিন্তু বিদেশে গেলে তো সেটা সম্ভব হবে না।'

চুপচাপ খাবার খেয়ে নিল ওরা। দিলারা বলল, 'যাওয়ার আগে গ্রামে যাবেন না?'

'কী করে যাব? আজ গেলে কাল সন্ধের আগে যদি না ফিরতে পারি?'

'তাহলে যাওয়ার আগে আপনার মায়ের সঙ্গে দেখা করবেন না?'

আঁতকে উঠল দিলারা। কথাটা যেন সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না।

'সেইজন্যেও আমার মন চাইছে না যেতে।'

'টেলিফোন নেই?'

'বাড়িতে নেই। গ্রামে যাদের বাড়িতে আছে তাদের করেছিলাম। কিন্তু লাইন এত ডিসটার্বড যে ঝড় বইছিল রিসিভারে।'

'তাহলে আজই একটা চিঠি লিখে সব কথা জানান। আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানকার ঠিকানা জানেন?' দিলারা তাকাল।

'না। ওঁরা এখনও বলেননি।'

'চাকরি যখন ঠিক হয়েছে তখন নিশ্চয়ই ঠিকানাও আছে। ওদের কাছে চেয়ে নিন। কাল কখন আপনার প্লেন?'

'রাত্রে। আমাকে বিকেল চারটের সময় ওঁদের অফিসে যেতে বলা হয়েছে। ওখান থেকেই সোজা চলে যেতে হবে বোধহয়।'

দাম মিটিয়ে বাইরে চলে এল ওরা। সন্ধে হব, হব। চারপাশের মানুষ ব্যস্ত হয়েছে বাসায় ফিরতে। হঠাৎ চাপা গলায় আবৃত্তি করল দিলারা, সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের গন্ধের মত সন্ধ্যা নামে, ডানায় রোদের গন্ধ—মুছে ফেলে চিল—!' তারপরই বলে, 'কিন্তু আমাদের ডানায় রোদের গন্ধ এবার মাখামাখি হবে। কবে যে মুছে ফেলতে পারব সেটাই আমরা জানি না।'

'আপনি কবে যাচ্ছেন?' তুষার জিজ্ঞাসা করল।

'বেশি দেরি নয়। দিনটা জানি না।'

'পোর্ট সঈদে, তাই তো?'

'হ্যাঁ। নিউইয়র্কের অনেক দূরে।'

'আপনার ঠিকানাটা জানা আছে?'

'হ্যাঁ। আজ নিয়ে এসেছি। লাগবে?'

'দিন। খুব মন খারাপ হলে আপনাকে চিঠি লিখব।'

'কেন? মন ভাল থাকলে লিখবেন না?'

হাসল তুষার। 'লিখব। এর পরে হয়তো বলবেন আমি কি ডাক্তার যে অসুখ হলে তবেই আসবেন। দিন।'

কাগজটা ব্যাগ থেকে বের করে তুষারের হাতে তুলে দিল দিলারা। তুষার পড়ার চেষ্টা করল। ক্যাপিট্যাল লেটারে লেখা। অবোধ্য রাস্তার নাম না পড়ে নকল করে দিলেই চলবে।

দিলারা বলল, 'তাহলে এখন যোগাযোগের দায়িত্ব আপনার।'

'এক কাজ করুন না, আগামিকাল সাড়ে চারটের সময় আলতাফ হোসেন সাহেবের অফিসে চলে আসুন। আমি আগে নিয়ে নিউইয়র্কের ঠিকানা চেয়ে নেব।'

'ওই অফিসে?' দ্বিধায় পড়ল দিলারা।

'হ্যাঁ। উনি তো আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন।'

'ঠিক। কিন্তু আমার একটুও ইচ্ছে নেই ওঁর সঙ্গে দেখা করার। লোকটা যে কপট তা নিশ্চয়ই মানছেন! তার চেয়ে অফিসটা কোথায় বলুন, কাছাকাছি গিয়ে অপেক্ষা করতে পারি। আপনি পাঁচ মিনিটের জন্যে বেরিয়ে এলে ভাল হয়।'

'দেখুন, আপনি কত সহজে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন। অথচ আমি ওই কপট লোকের অনুগ্রহ নিয়ে চাকরি করতে যাচ্ছি।'

'সরি। আপনাকে আঘাত করতে কিন্তু আমি কথাটা বলিনি।'

দিলারা তুষারের কনুই স্পর্শ করে ছেড়ে দিল।

তুষার বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'বলুন।'

'একটু বোকা বোকা শোনাবে। শোনাক। আপনার মনে থাকবে আমাকে?'

দিলারা মাথা নামাল, 'আমি কাল সারারাত আপনার কথা ভেবেছি।'

তুষার অবাক হয়ে তাকাল, 'তাহলে আমরা দুজনে বিদেশে যাচ্ছি কেন?'

'তাও ভেবেছি। যাচ্ছি জীবনের কাছে যে দায় আছে তা মেটাতে।'

'কিন্তু আর যদি দেখা না হয়?' তুষারের গলায় বিষাদ।

'কেন হবে না। পৃথিবীটা মোটেই বড় নয়।'

'কিন্তু কী করে দেখা হবে? আপনি পোর্ট সঈদে আমি নিউইয়র্কে।'

'ছেলেবেলায় পড়তাম ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। কথাটাকে আমি মানি।'

ওরা দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে গেল অনেকটা। তারপর হঠাৎ তুষার একটা রিকশা থামাল, 'চলুন, আপনাকে আজ পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'কেন?' দিলারা জিজ্ঞাসা করল।

'মনে থাকবে বলে। লাস্ট রাইড টুগেদার।' তুষার বলল।

ঠিক চারটের সময় আলতাফ হোসেন সাহেবের অফিসে ঢুকল তুষার। তার পায়ে নতুন জুতো। চলতেই আওয়াজ হচ্ছে। সঙ্গে একটা স্যুটকেস। আজ সকালে বন্ধুরা এসেছিল মেসে। লিটন এনেছিল স্যুটকেসটাকে। বাকিরা গরম জামা। খুব হইহই করছিল সবাই মিলে।

পদস্থ কর্মচারিটি বললেন, 'এই নিন আপনার পাশপোর্ট আর প্লেনের টিকিট।'

পাতা উল্টে নিজের ছবি দেখল তুষার। কিরকম বোকা বোকা। পাশে তার পরিচয়। তুষার আহমেদ। ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার ফ্লাইট রাত দশটায়। কিন্তু সাতটার মধ্যে এয়ারপোর্টে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে। টিকিটটা বুঝে নিন। এটা হল ঢাকা থেকে লন্ডন, পরেরটা লন্ডন থেকে জেএফকে নিউইয়র্ক, আর সবশেষটা হল এখান থেকে টরেন্টো, কানাডা।'

'এটা কেন?'

'সাহেব যা বলেছেন তাই করা হয়েছে। সবই ও কে টিকিট।'

'তার মানে?'

'কনফার্মড টিকিট।'

'আমার ভিসা?'

'ওঃ। ওটা পাশপোর্টের পেছন দিকে ছাপ মেরে দিয়েছে।'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'ভিসা আলাদা দেওয়া হয় না।'

'আমি নিউইয়র্কে যেখানে চাকরি করব তার ঠিকানাটা দেবেন?'

'নিশ্চয়ই!' ভদ্রলোক একটা কাগজ বের করলেন, 'এতে ঠিকানা লেখা আছে হারিয়ে ফেলবেন না।'

কাগজটা চোখের সামনে ধরল তুষার। বাড়ির নম্বর 74th street, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক 11372 পাশে লেখা আছে, রেস্টুরেন্ট বাংলাদেশ। মিস্টার শাহীন।

'আপনি ভেতরে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করুন।'

তুষার ভেতরে গেল। চোখ বন্ধ করে কিছু ভাবছিলেন আলতাফ হোসেন সাহেব। শব্দ পেয়ে চোখ খুলে বললেন, 'বোসো।'

তুষার বসলো। আলতাফ হোসেন সাহেব বললেন, 'তুমি তোমার কথা রাখোনি, রেকর্ড করতে পারোনি কিন্তু আমি তোমাকে বিদেশে চাকরি দিয়ে পাঠাচ্ছি। কোথায় যাবে তার ঠিকানা পেয়েছ?'

তুষার মাথা নাড়ল, 'পেয়েছি।'

'রেস্টুরেন্ট বাংলাদেশ খুব নামকরা। কুইন্স, অ্যাস্টোরিয়া থেকে তো বটেই, লং-আইল্যান্ড থেকেও প্রচুর লোক ওখানে খেতে আসে। ওখানকার চার্জে আছে শাহীন। একটু বদমেজাজি কিন্তু অনেস্ট আর কাজ জানে। কাজে গলতি পেলে একবার ওয়ার্নিং দিয়ে বের করে দেবে। তখন কিন্তু আমার কিছু বলার থাকবে না। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

আবার মাথা নাড়ল তুষার।

'তোমার মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন এসেছে সোজা নিউইয়র্কে যাচ্ছ না কেন?' টিকিট দেখেছ? নিউইয়র্ক হয়ে টরেন্টো। ওখানেই তোমার যাত্রা শেষ। কেন?'

'আমি বুঝতে পারছি না।'

'তুমি যদি অবিরাম সাইকেল রেকর্ড করতে পারতে তাহলে তোমাকে সোজা নিউইয়র্কে পাঠাতে পারতাম।'

'তাহলে?'

'ওই তো, টরেন্টো যাও প্রথমে, ওখান থেকে নিউইয়র্ক যাবে, আর হ্যাঁ টরেন্টো এয়ারপোর্টে

একটা ছেলে আসবে তোমাকে রিসিভ করতে। ছেলেটির নাম মুর্শেদ, মুর্শেদ হাসান। ওই তোমাকে নিউইয়র্ক পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। এনি মোর কোয়েশ্চন?'

'আমার পাশপোর্টে তো আমেরিকার ভিসা নেই।'

'ওটা মুর্শেদের দুশ্চিন্তা, তোমার নয়।' ড্রয়ার খুলে নোট বের করলেন আলতাফ হোসেন সাহেব। 'এইটে রাখো। পরে তোমার মাইনে থেকে কেটে নেব। ঠিক আছে?'

তুষার দেখল, নোটটা ডলারের। জীবনে এই প্রথমবার ডলার দেখল সে। এক শ' ডলারের নোট। ওখানে যেটা একশ সেটা ঢাকা শহরে কত হাজার টাকা।

'সাবধানে রাখবে ওটা। তোমার পাশপোর্টে একশ ডলার এন্ট্রি করা আছে। নইলে কানাডিয়ান এম্বেসি ভিসা দিচ্ছিল না। একটু মিথ্যে কথা বলতে হয়েছে অবশ্য। তোমাকে যদি টরেন্টোর ইমিগ্রেশন প্রশ্ন করে কেন ওদেশে যাচ্ছ তাহলে বলবে তোমার ভাই-এর বিয়েতে ফ্যামিলির হয়ে অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছ। মুর্শেদ তোমার ভাই। তার বিয়ে ঠিক পরের দিন। বিয়ে অ্যাটেন্ড করেই তুমি ফিরে যাবে। তাই ওরা তোমাকে ঠিক দুদিনের ভিসা দিয়েছে। তুমি জোর দিয়ে বলবে যে তোমার ভাই তোমাকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে এসেছে। দরকার হলে ওরা মুর্শেদকে ডেকে কথা বলতে পারে। মুর্শেদ কানাডার নাগরিক।' আলতাফ হোসেন সাহেব থামলেন একটু তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে?'

'না।'

তিনি একটা কাগজে কিছু লিখে এগিয়ে দিলেন এটা মুর্শেদের টেলিফোন নাম্বার। যদি কোনো দুর্ঘটনার ফলে ও এয়ারপোর্টে পৌঁছতে না পারে তাহলে দয়া করে ফোন করবে।'

'কীভাবে?'

'ওই ডলার ভাঙিয়ে পাঁচ ডলার কানাডিয়ান ডলার করে নেবে। চারপাশে ফোন আছে, নো প্রব্লেম।' আলতাফ হোসেন সাহেব হাসলেন, 'জয়যাত্রায় যাও ভাই। আর হ্যাঁ, সেই মেয়েটি কোথায়?'

'কোন মেয়ে?'

'আঃ। রিকশাওয়ালি। তোমার সঙ্গে তো বেশ দহরম। আমি বুঝতে পারি না এই মেয়েগুলো কেন বেকার ছেলেগুলোর দিকে এত ঝুঁকে পড়ে। খবর দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'বাঃ, গুড। এখনও এল না কেন?'

'আমি বলতে পারব না।' তুষারের মনে হল একথায় উনি রেগে যেতে পারেন, তাই যোগ করল, 'হয়তো আজ-কালের মধ্যে আপনার বাড়িতে গিয়ে দেখা করবে।'

'বাড়িতে আবার কেন? বাড়িতে ওসব আমি পছন্দ করি না। অবশ্য আজ তোমার একই ফ্লাইটে আমার মেয়ে নিউইয়র্কে যাচ্ছে। তুমি তো ওকে আমার বাড়িতে দেখেছ। কিন্তু প্লেনে বা কোথাও ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা কোরো না। তুমি কর্মচারি আর সে হচ্ছে মালিক। বুঝলে। ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো।'

হাত নাড়লেন তিনি।

তুষার বেরিয়ে এল। এখন সাড়ে চারটে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের অফিস কখন বন্ধ হবে?'

'সাড়ে ছটায়।' ভদ্রলোক জানালেন।

'আমি একটু ঘুরে আসছি। এই স্যুটকেসটাকে রেখে যাব?'

'সাড়ে ছটার মধ্যে আসবেন ভাই।'

ঘাড় নেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল তুষার।

অফিস ছুটির ভিড় শুরু হয়ে গেছে। যেখানে দিলারার দাঁড়াবার কথা ছিল সেখানে সে নেই। দিলারা বলেছিল অবশ্যই আসবে। পাঁচটা বেজে গেল তবু দিলারার দেখা পাওয়া গেল না। তাকে সাতটার মধ্যে এয়ারপোর্টে গিয়ে রিপোর্ট করতে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে। এয়ারপোর্টে যেতেও তো সময় লাগবে।

কপালে ঘাম জমল তুষারের। বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করতে লাগল। কথা দিয়েও আসবে না দিলারা? তাহলে কাল রিকশায় বসে তার সঙ্গে অমন ভাল ব্যবহার করল কেন? নিজেকে বোঝাল তুষার, হয়তো ভেবেছে যে আর যখন কখনই দেখা হবে না তখন মায়া বাড়িয়ে কী লাভ! সাড়ে পাঁচটা যখন বাজল তখন ফিরে এল তুষার।

ভদ্রলোক তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে?'

'কিছু না।' তুষার মাথা নাড়ল।

'আপনার মুখ বলছে কিছু হয়েছে।'

তুষার তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনটা দেখতে পেল সে। বলল, 'আমাকে একবার টেলিফোনে কথা বলতে দেবেন। লং ডিসট্যান্স কল। আমার গ্রামে করব।'

'ও এই ব্যাপার। করুন।'

আজ একবারেই তাদের গ্রামের রাজুর বাড়ির লাইন পেয়ে গেল সে। রাজু বাড়িতে নেই। তার মা ফোন ধরেছিল। যতটা পারে সংক্ষেপে নিজের বিষয় জানিয়ে দিল সে। ভদ্রমহিলা বললেন খবরটা তার বাসায় দিয়ে দেবেন। এয়ারপোর্টে পৌঁছে ভেতরে ঢোকার মুখে তুষার অবাক। এখন প্রায় সাতটা। দিলারা দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে দৌড়ে কাছে এল, 'আমি খুব দুঃখিত। আব্বাকে ডাক্তার দেখাতে হয়েছিল। তাই যেতে পারিনি।'

'আমি ভাবতে পারিনি আপনি এখানে আসবেন!'

'ভালভাবে যান। ভাল থাকবেন।' তাকাল দিলারা।

'আমার ঠিকানাটা—' কাগজ এগিয়ে দিল তুষার। দিলারা দ্রুত ব্যাগ থেকে কাগজ কলম বের করে সেটা টুকে নিয়ে ফেরত দিল। তারপর বলল, 'আমি দু'বছর পরে ফিরে আসব ঢাকায়। আপনি?'

তুষার বলল, 'আমিও ওই একই সময়ে ফিরব।'

দিলারা ওর হাত স্পর্শ করল, 'যান, আর দেরি করবেন না।'

তুষার মুখ ঘুরিয়ে নিল একপাশে, যাতে তার চোখ না দেখা যায়।

কেউ কিছু বলল না। কোনো প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হল না তুষার আহমেদকে। না ইমিগ্রেশন, না কাস্টমস। শুধু ছাপ মেরে বলল, 'এগিয়ে যান।' যে হলঘরে তাকে অপেক্ষা করতে হল সেটা ভর্তি। একপাশে পরপর দোকান, ডিউটি ফ্রি শপ। এখানে যাঁরা অপেক্ষায় আছেন তাঁদের অধিকাংশই বাঙালি, বিদেশে যাচ্ছেন। তুষার লক্ষ্য করল, ছেলেদের বেশির ভাগই স্যুট টাই পরে এসেছে। বেশ গম্ভীর গম্ভীর ভাব চারপাশে।

জীবনে কখনও প্লেনে ওঠেনি তুষার আহমেদ। আজ সে প্রথমবার উঠবে কিন্তু তার কোনো রোমাঞ্চ হচ্ছিল না। তার চাকরি দরকার। ব্যবসা করার সামর্থ নেই। গ্রামের সবাই তার মুখের

দিকে তাকিয়ে আছে অথচ তার যা শিক্ষাগত যোগ্যতা তাতে বাংলাদেশে চাকরি পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সেক্ষেত্রে আলতাফ হোসেন বিশাল সুযোগ দিয়েছেন একথা মানতেই হবে। কিন্তু অদ্ভুত বিষাদ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

এই বাংলাদেশ ছেড়ে তাকে যেতে হচ্ছে অনিশ্চিতে। একটু পরেই বাংলাদেশের মাটি ছেড়ে বিমানটা আকাশে ডানা মেলবে। এখন আকাশ অন্ধকার। এই যতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে আছে, ততক্ষণ, বাংলাদেশের মাটি তাকে আশ্রয় দিচ্ছে। এ আশ্রয় থেকে সে যেচে মুক্ত হতে যাচ্ছে শুধু পেটের কারণে। যেভাবে সন্তান মায়ের আঁচল থেকে সরে যায় ঠিক সেইভাবে।

কিন্তু এই শেষ সময় দিলারা কেন এল তার জীবনে? দিলারা এখনও ঢাকায় আছে, কদিন পরে সেও হারিয়ে যাবে পৃথিবীর কোনো প্রান্তে। মনে মনে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল তুষার। দরকার নেই যাওয়ার। সে ফিরে যাবে। গিয়ে দিলারাকে বলবে, তুমিও বাংলাদেশ ছেড়ে যেও না, আমরা দু'জনে এখানেই পায়ের তলার মাটি খোঁজার লড়াই শুরু করব।

ঠিক এই সময় ঘোষণা হল—'যাত্রীদের অবিলম্বে বিমানে যেতে বলা হচ্ছে। বিমান তৈরি।'

অতএব বিমানে উঠতে হল। বেল্ট বাঁধতে হল কোমরে। প্রচণ্ড শব্দ করে রানওয়ের ওপর দিয়ে দৌড় শুরু করল বিমান। মাটি ছাড়া মানে দেশের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া?

তুষার মাথা নাড়ল, না, কক্ষনো নয়।

বাংলাদেশের মাটির ওপর দিয়ে কিছুটা ছুটে গিয়ে প্লেনটা যখন আকাশে উড়ল তখন কান্না পেয়ে গেল তুষারের। এয়ার হোস্টেসের নির্দেশে তার কোমর এখন বেল্টে বন্দি, পাশে কে বসে আছে ভাল করে দ্যাখেওনি সে। মাটি ছাড়া মানে দেশের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। চোখ মুছল তুষার। নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টা করল প্রাণপণে। দিলারা বলেছিল, ভাল থাকবে। ভাল থাকার চেষ্টা করবে। মাথা নাড়ল তুষার। কী করে ভাল থাকা যায় দিলারা? কেন এত দেরিতে দেখা হল আমাদের!

একটা প্রায় নির্ঘুম রাত কেটে যাওয়ার পর প্লেন নামল হিথরো এয়ারপোর্টে। লন্ডন শহরে শেক্সপিয়র থাকতেন। অথচ প্লেনের জানালা দিয়ে যেতটুকু দেখা গেল তাতে মনে হল চারপাশ ঝাপসা, স্যাঁতসেতে, মেঘ নেমে এসেছে অনেক নিচে, পৃথিবীকে প্রায় অন্ধকার করে।

অথচ হিথরো এয়ারপোর্ট বিল্ডিং এর ভেতরটা দিনের আলোর চেয়ে উজ্জ্বল। চারপাশে দোকান-পাট, সুবেশ মানুষের ভিড়। এঁরা সবাই যাত্রী, যাত্রা পথে কিছুক্ষণের বিরতি হওয়ায় এখানে এসেছেন। তুষারকেও অপেক্ষা করতে হবে প্রায় তিন ঘণ্টা। সে যাত্রীদের জন্যে সাজিয়ে রাখা চেয়ারগুলোর দিকে এগোল। হঠাৎ তার মনে হল এখানে যত মানুষ আছে তাদের পোশাক তার থেকে অনেক ভাল। খুব সাধারণ শার্ট প্যান্ট পরে এসেছে সে। এর চেয়ে ভাল নেই বলেই পরতে পারেনি। তার স্যুটকেশ এখন প্লেন কোম্পানির জিম্মায়। সেখানে তার শীতবস্ত্র রয়েছে। আলতাফ হোসেন সাহেবের কর্মচারি বলেছিলেন, 'সঙ্গে একটা হ্যান্ডব্যাগ রাখতে পারতেন। তাতে গরম জামা নেওয়া উচিত ছিল। যদি আপনার স্যুটকেশ একসঙ্গে না পৌঁছয় তাহলে ওখানে নেমে বিপদে পড়বেন। কিন্তু এয়ারপোর্ট' যাওয়ার মুহূর্তে কে তাকে একটা হ্যান্ডব্যাগ দেবে? এখন মনে হচ্ছে চট করে একটা কিনে নিলেই হত।

শীত লাগছে না কারণ হল জায়গাটাই শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত। তুষার কোনার দিকের একটা চেয়ারে বসল। আলোকিত দোকানগুলোর ওপর লেখা রয়েছে ডিউটি ফ্রি শপ। তার মানে কি দাম কম? কিন্তু এখন তার কোনো কিছুই কেনার দরকার নেই। হঠাৎ তার মনে হল এই জায়গাটা লন্ডন না হয়ে পৃথিবীর যে কোনো শহর হলে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না; লন্ডনের কোনো

বৈশিষ্ট্য এখানে নেই। পৃথিবীর সব বড় এয়ারপোর্টের অপেক্ষার জায়গাগুলো কি এক রকমের দেখতে?

হঠাৎ তুষারের চোখ পড়ল। চোখে রোদ চশমা যা এই আলোয় প্রায় অপ্রয়োজনীয়, পরনে জিনস আর গেঞ্জি, হাতে এক চাকাওয়ালা ছোট ব্যাগ, ভঙ্গিতে অনেকটা উদাস, হেঁটে আসছে একজন। এ রকম মেয়ে এখানে প্রচুর কিন্তু একে কি রকম চেনা চেনা মনে হচ্ছিল তুষারের। তারপরেই মনে পড়ল আলতাফ হোসেন সাহেবের মেয়ে, এর নাম মম। একই প্লেনে যাওয়ার কথা কিন্তু প্লেনে সে ওকে দেখতে পায়নি। হয়তো তখন নিজেকে নিয়ে এত মশগুল ছিল যে লক্ষ্যই করেনি। কিন্তু আলতাফ হোসেন সাহেব হুকুম করেছেন সে যেন ওঁর মেয়ের সাথে কথা বলার চেষ্টা না করে। অতএব তুষার বসেই রইল।

যেতে যেতে মম দুপাশে তাকাচ্ছিল। হঠাৎ কোনো কিছু দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে এগিয়ে গেল চেয়ারের দিকে। ব্যাগটাকে পাশে রেখে সে চেয়ারে শব্দ করে বসে পড়ল। তারপর পকেট থেকে প্যাকেট বের করে লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাল। ওর ধোঁয়া ছাড়াব ভঙ্গি বলে দিচ্ছিল যে ধূমপানে বেশ অভ্যস্ত। মুখে একটা আরামের ছাপ পড়ল। দ্বিতীয়বার ধোঁয়া ছেড়ে সে চারপাশে তাকাতেই তুষারকে দেখতে পেল। এক মুহূর্ত তার মুখ এদিকে স্থির হল। যেহেতু তার চোখ রোদচশমার আড়ালে তাই তার প্রতিক্রিয়া বোঝা যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পরে সে সিগারেট না ধরা হাত তুলে আঙুল নাড়ল। তুষার দেখছিল। ওই আঙ্গুলের আহ্বানে তার কি উঠে যাওয়া উচিত? বাংলাদেশের একটা অল্পবয়সী মেয়ে লন্ডনের এয়ারপোর্টে বসে সিগারেট খাচ্ছে, এটা তার ভাল লাগছিল না। আর এইভাবে আঙ্গুল নেড়ে মানুষ মানুষকে ডাকে? সে কি কুকুর বেড়াল? তুষার অন্যদিকে মুখ ঘোরাল।

'এই যে মিস্টার? আপনি নিজেকে কী ভাবেন?'

গলা শুনে পাশ ফিরল তুষার। মম একেবারে তার শরীরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। চশমা সত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছিল তার ক্রোধ সীমা ছাড়িয়েছে।

'আমি একজন মানুষ।' তুষার জবাব দিল।

'হোয়াট? আপনি উপেক্ষা করেছেন আমাকে। ডাকা সত্ত্বেও বসে আছেন এখানে?'

'আপনি যেভাবে ডেকেছেন সেভাবে কাউকে ডাকে না।'

'আ-চ-ছা।'

'আর কিছু বলবেন?'

'আমি আপনার বিরুদ্ধে আব্বাকে জানাব।'

'স্বচ্ছন্দে। কারণ আপনার আব্বা আমাকে হুকুম দিয়েছেন যাতে দেখা হলে কোনো কথা না বলি। আমি বলতে চাইনি, আপনিই বলাচ্ছেন।

'আব্বা একথা আপনাকে বলেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'সেটা আপনার ব্যাপার।'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আমি আপনার এমপ্লয়ার। আর আমাদের টাকায় আপনি বিদেশে যাচ্ছেন। এসব ক্ষেত্রে লোকে তো কৃতজ্ঞতার সাথে কথা বলে। আপনি গোঁয়ার তাই জানতাম কিন্তু এতটা তা বুঝিনি। যাক গে, আমার খুব বোর লাগছে, উঠে আসুন, কথা বলব।'

'কিন্তু আপনার আব্বা...'।

'এখানে তিনি নেই। আসুন।' মম ফিরে গেল নিজের জায়গায়।

তুষার বুঝতে পারছিল না তার কী করা উচিত। এই রকম উদ্ধত কথার মেয়েকে সহ্য করা মুশকিল। কিন্তু উপকার না করতে পারুক মম তার ক্ষতি করতে পারে। আলতাফ হোসেন সাহেব নিজের মেয়েকেই বেশি বিশ্বাস করবেন। সে উঠল। মম-এর উল্টোদিকের চেয়ারে গিয়ে বসল।

প্যাকেটটা এগিয়ে দিল মম।

'এই নো স্মোকিং এলাকা এত বেশি যে খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম। এখানে স্মোকিং লেখা না থাকলে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হত না। আপনার নাম তুষার আহমেদ?'

'জী'।

'আমি মম'।

'জানি। মমতাজ।'

কাঁধ বাঁকাল মম। তারপর বলল, 'আমি ঢাকায় যাই আব্বার জন্যে। ওখানে কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই। সময় কাটতে চায় না।'

'নিউইয়র্কে আপনার অনেক বন্ধু'?

'প্রচুর। উইক এন্ডে পাগল হয়ে যেতে হয়। সবাই ডেট চায়। একজনের সঙ্গে একটু স্টেডি যাচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ মনে হল ছেলেটার ধান্দা আমার বাবার টাকার দিকে বেশি। প্রায়ই বন্ধুদের নিয়ে রেস্টুরেন্টে-বাংলাদেশে গিয়ে ফুর্তি করে বিনা পয়সায়। তাই ওর সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে দিয়ে ভাবলাম কিছুদিন ঢাকার থেকে ঘুরে আসি। মন ফ্রেশ হয়ে যাবে।'

'গিয়েছে?'

'হ্যাঁ। যেটা ভুলে যেতে চাই, সেটা আর মনে রাখি না।'

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

সিগারেট নিভিয়ে দিল মম। বলল, 'করুন।'

'আমাকে রেস্টুরেন্টে কী চাকরি করতে হবে?'

'আপনি যখন রাঁধতে জানেন না তখন ওয়েটারের জব করবেন।'

'ওয়েটার?'

'তাতে কী হল? ওখানে কেউ ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। নিউইয়র্কে ডেইলি ওয়ার্কারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি টাকা পায় যারা ডাস্টবিন থেকে গাড়িতে নোংরা তোলে। প্রচুর টাকা। কিছুদিন এক্সপেরিয়েন্স হয়ে গেলে যাতে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার পোস্ট পান সেই চেষ্টা আমি করব।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

হাসলো মম, 'প্রথমবার যাচ্ছেন, আমি আপনাকে জেএফকে থেকে জ্যাকসন হাইটে নামিয়ে দিয়ে যাব। আমাদের ফ্ল্যাট কাছেই, কুইন্সে।'

'আমি এখন নিউইয়র্কে যাচ্ছি না। আমার টিকিট টরেন্টোর। সেখান থেকে এক ভদ্রলোক আমাকে নিউইয়র্কে পৌঁছবার ব্যবস্থা করে দেবেন।'

'কেন? আপনার আমেরিকার ভিসা নেই'?

'না।'

মম ঠোঁট কামড়াল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এতক্ষণে আপনার জন্যে আমার সত্যি খারাপ লাগছে। মে গড ব্লেস ইউ!'

নিউইয়র্কের জন. এফ. কেনেডি এয়ারপোর্টে যখন প্লেন নামল তখন বিকেল। এই যাত্রাপথে প্রায়ই ঘড়ির কাঁটা পেছনে ঘোরাচ্ছিল তুষার। যত এগোচ্ছে তত সময় কমে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে প্রায় এগার-বারো ঘন্টা পিছিয়ে গেল সে। অর্থাৎ এখানে যখন বিকেল তখন ঢাকায় সকাল হচ্ছে।

প্লেনে ওঠার পর, লন্ডনের আকাশ ছাড়লে, তুষার সিট থেকে উঠেছিল। বিশাল প্লেন। ঘুরে ঘুরে খুঁজেছিল মমকে। পায়নি। ট্যুরিস্ট ক্লাশ অথবা ইকনমি ক্লাশের কোথাও মম নেই। অথচ ও এই প্লেনেই নিউইয়র্ক যাচ্ছে। মেয়েটা কি মিথ্যে কথা বলল? ওর বাবাও একই কথা বলেছে।

একটি পর্দাঘেরা প্যাসেজের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই এয়ার হোস্টেস বলল, 'আপনার যদি ইকনমি ক্লাশের টিকিট তাকে তাহলে ওদিকে যাবেন না। এখানে একজিকিউটিভ টিকিট হোল্ডারেরা রয়েছেন।'

তুষার অনুমান করল, বেশি দামের টিকিট যাঁরা কেটেছেন তাদের জন্যে ওই পর্দাঘেরা এলাকা। মম যদি ওখানে থাকে তাহলে ওর সাথে দেখা করার কোনো উপায় নেই। সে ফিরে গেল নিজের সিটে।

তখনও বিকেলের রোদ সরেনি। জন. এফ. কেনেডি এয়ারপোর্টটাকে আকাশ থেকে দেখতে পেল তুষার। চারপাশ বেশ পরিষ্কার, উজ্জ্বল। লন্ডনের মত আবহাওয়া নয়। তাহলে আমেরিকায় চলে এল সে। এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। অথচ দেশে থাকতে মনে হত আমেরিকা অনেক দূরে, স্বপ্নের মত। কিন্তু কি সহজে উড়ে চলে এল সে।

তুষার ভেবেছিল এয়ারপোর্টে মম-এর সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু সে দেখল বেশির ভাগ যাত্রীরাই অন্যপথে চোখের আড়ালে চলে গেল। চার-পাঁচ জনকে নিয়ে যাওয়া হল যেখানে তার নাম ট্রানজিট লঞ্জ। এখান থেকে তাদের যেতে হবে আমেরিকার বাইরের দেশগুলোতে, তার গন্তব্য যেমন টরেন্টো।

এইবার অপেক্ষা করার সময় শরীর ম্যাজম্যাজ করতে লাগল তুষারের। মাথা টিপটিপ করছে। প্লেনে প্রচুর খাবার দেয়, একটু ঘনঘন এবং বেশিই দেয়। খিদের জন্যে হয়নি। তবে কি জ্বর আসছে?

টরেন্টো এয়ারপোর্টে যখন তুষার নামল তখন রাত আটটা। নিচে হিরের মত বিমানবন্দরের আলোগুলো জ্বলছে। অন্য যাত্রীদের অনুসরণ করে লাইনে দাঁড়াল সে। প্রায় আধঘণ্টা বাদে সে কাউন্টারের সামনে যেতে পারল। একটি কালো অফিসার হাত বাড়াল, 'পাশপোর্ট'!

দ্রুত পকেট থেকে বের করে এগিয়ে ধরল তুষার, অফিসার ছিনিয়ে নিয়ে পাতা ওল্টাল 'এই প্রথম আসছ?'

'হ্যাঁ'।

'নতুন পাশপোর্ট'?

'হ্যাঁ'।

অফিসার একটি যন্ত্রের সামনে পাশপোর্ট খুলে ধরতে শব্দ হল। সেটা দেখে নিয়ে অফিসার জিজ্ঞাসা করল, 'কবে ফিরবে?'

'পরশু'।

'টিকিট দেখি'।

তুষার টিকিট বের করে দিতে অফিসার রেগে গেল, 'এ কি! ফেরার টিকিট কোথায়? তুমি তো ফিরবে বলে আসোনি!'

'না স্যার'। আমি ফিরে যাব। আমার ভাই-এর বিয়ে উপলক্ষে এসেছি। কাল থেকে পরশু চলে যাব'। ইংরেজি বলতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল কিন্তু কোনো রকমে বলতে পারল সে।

'ইয়েস জেন্টলম্যান, কিন্তু তুমি রিটার্ন টিকিট নিয়ে আসোনি। এখানে এশিয়ানরা চাকরির ধান্দায় আসে, আর ফিরে যায় না। সরি, তোমাকে আমি অ্যালাউ করতে পারি না।' অফিসারের মুখ শক্ত।

তুষার খুব ঘাবড়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মরিয়া হল, 'আমি তো এখান থেকে আমেরিকায় যাব। বাসে যাব বলে প্লেনের টিকিট কাটিনি।'

'আমেরিকা'? অফিসার পাতা ওল্টালেন, 'আমেরিকার ভিসা কোথায়? কীভাবে যাবে তুমি'?

'এখান থেকে আমার ভাই ভিসা করে দেবে'।

'কী নাম তোমার ভাই-এর? ঠিকানা কী?'

'আমার ভাই আমাকে রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে এসেছে।' তুষার শুকনো গলায় বলল, 'মুর্শেদ হাসান, ও এখানকার সিটিজেন।'

অফিসের টেলিফোন তুলে জড়ানো ইংরেজিতে কিছু নির্দেশ দিয়ে বলল, 'তুমি সরে দাঁড়াও। নেক্সট!'

পরের লোকটি কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াতেই তুষার কয়েক পা সরে গেল। এখন কী হবে? যদি আলতাফ হোসেন সাহেবের লোক তাকে রিসিভ করতে না আসে তাহলে এরা তাকে নিয়ে কী করতে পারে? সে কানাডার ভিসা নিয়ে আইনসম্মতভাবে এসেছে। তবু এরা যদি তাকে ঢুকতে না দেয় তাহলে ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব এদেরই।

মিনিট দশেক বাদে একজন ইউনিফর্ম পরা লোকের সঙ্গে যে ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন তার বয়স বেশি নয়। কাছে এসে একগাল হেসে জিজ্ঞাসা করল 'কেমন আছ তুষার। সব ভাল?'

তুষার মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।' সে লোকটির ব্যবহারে অবাক হয়ে গেল।

'কী বলেছ?'

'বলেছি পরশু আমেরিকায় যাব।'

ইতিমধ্যে অফিসার চেঁচামেচি আরম্ভ করেছেন। মুর্শেদ হাসান এগিয়ে এলেন। মিনিট পাঁচেক ধরে দুজনের তর্ক চলল। ভদ্রলোক নিজের আইডেন্টিটি কার্ড দেখালেন। তারপর অফিসার তুষারের পাশপোর্টে ছাপ মেরে ফেরত দিলেন।

মুর্শেদ বললেন, 'আপনি গিয়ে লাগেজ কালেক্ট করে বাইরে বেরিয়ে আসুন। আমি ওখানে আছি।'

লাগেজ আনতে একটু সময় লাগল। নিজের স্যুটকেশ দেখতে পেয়ে বেল্ট থেকে খপ করে তুলে নিল তুষার। যাক, এসে গেছে। দেখে আত্মীয় বলে মনে হচ্ছে। সে দেখল লোকে ট্রলিতে মালপত্র তুলে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার স্যুটকেশ তেমন ভারি নয়।

বাইরে বের হতেই মুর্শেদ এগিয়ে এলেন, 'ট্রলি আনেননি?'

'না।'

'ও, এখানে দাঁড়ান, আমি গাড়ি নিয়ে আসছি।'

তুষার চারপাশে তাকাল। এখন বেশ শীত লাগছে। কানাডা দেশটা নিশ্চয়ই সুন্দর। চারপাশ বেশ পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। দামী দামী গাড়ি, দেখতে চমৎকার, প্যাসেঞ্জার নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কোনো বাঙালিকে চোখে পড়ছে না।

এখানে কি বাস নেই? যাদের গাড়ি থাকে না তারা কীসে যাতায়াত করে?

মুর্শেদের গাড়ি পাশে এসে দাঁড়াল, 'স্যুটকেস, ব্যাক সিটে তুলে দিন।'

আদেশ মান্য করে মুর্শেদের পাশে উঠে বসতেই আবার নির্দেশ এল, 'বেল্ট বাঁধুন। আপনার জন্যে ফাইন দিতে পারব না'।

'বেল্ট'। ঠিক হদিশ পাচ্ছিল না তুষার। ঢাকায় তো কেউ গাড়িতে উঠে বেল্ট বাঁধে না। মুর্শেদ তাকে সাহায্য করলেন।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করলে মুর্শেদ বললেন, 'মিস্টার আলতাফ হোসেন প্রায়ই আমাকে ঝামেলায় ফেলছেন। যাক গে! আপনার কাছে ডলার আছে না একদম খালি হাতে এসেছেন?'

'আছে। একশ ডলার।'

'তবু রক্ষে।'

গাড়ি চলছিল। কিছুক্ষণ পরেই বিশাল চওড়া রাস্তায় ওরা উঠে এল। মুর্শেদ কথা বলছে না। একদিক দিয়ে পাশাপাশি পাঁচটা গাড়ি ছুটছে, ওপাশেও একইভাবে বিপরীত দিকে যাচ্ছে। তুষার আড়চোখে তাকাল। মুর্শেদ যে তার আসা পছন্দ করছে না সেটা সরাসরি বলে দিয়েছে। হয়তো বাধ্য হয়ে তাকে এখন নিয়ে যাচ্ছে। কোথায়? ওর বাড়িতে?

মাথার ওপর অনেক সাইনবোর্ড। একের পর এক পেছনে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকে নেমে পড়লেন মুর্শেদ। জায়গাটা হঠাৎ খুব নির্জন হয়ে গেল। সামনেই একটা লেক। এখন অন্ধকার নেমে এলেও লেকের জল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গাড়ি পার্ক করে মুর্শেদ বলল, 'নেমে আসুন।'

তুষার নামল। চারপাশে ফিনফিনে অন্ধকার। দূরে আলো জ্বলছে মিটিমিটি। ডিকি খুললেন মুর্শেদ, 'উঠে পড়ুন। আপনার জন্যে বড় গাড়ি এনেছি।'

'তার মানে?'

'এই ডিকিতে আরাম করে শুয়ে পড়ুন, নিঃশ্বাস বন্ধ হবে না। এখন আপনার যদি কপাল ভাল হয় তাহলে আমেরিকায় ঢুকতে পারবেন। কপাল মন্দ হলে আমারও সর্বনাশ। আর গাড়ি যখন থামবে বা গতি কমবে তখন একটুও শব্দ করবেন না। কেউ দেখার আগে উঠে পড়ুন।' ধমকালেন মুর্শেদ।

অগত্যা তুষার উঠল। হাঁটুমুড়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়তেই অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ। গাড়ি আবার ছুটতে লাগল। ভাগ্যিস এখানকার রাস্তা খুব মসৃণ তাই ঝাঁকুনি লাগছে না। কিন্তু এইভাবে মালপত্রের মতো তাকে পাচার করা হচ্ছে আমেরিকায়? যদি ধরা পড়ে তাহলে জেল অনিবার্য। মনের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ জমছিল তুষারের। কিন্তু কী করতে পারে সে! প্রথমে মনে হচ্ছিল দম বন্ধ হয়ে যাবে; কিন্তু ক্রমশ ধাতস্থ হল।

ঘন্টাখানেক বাদে গাড়ির গতি কমে গেল। ধীরে গড়াতে গড়াতে থেমে গেল এক সময়। একটা গলা কানে এল, 'ইওর আইডি প্লিজ।'

দম বন্ধ করে পড়ে রইল তুষার। একটুও যেন শব্দ না হয়। সামান্য শব্দ তাকে নিয়ে যাবে জেলের অন্ধকারে।

ডিকির অন্ধকারে [illegible] পড়েছিল তুষার। তার নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় হচ্ছিল।

'গোয়িং কার?' কণ্ঠস্বর [illegible]।

'ইয়া। পিটসবার্গ। মাই ব্রা[illegible] [illegible]র্থডে। ওকে।'

'ওকে। হ্যাভ এ নাইস [illegible]'

'থ্যাঙ্ক ইউ। [illegible]

কী হল তা অনুমান করতে পারছিল না তুষার। মুর্শেদ হাসানের ইংরেজি সে বুঝতে পারলেও অন্য লোকটির উচ্চারণ তার কাছে স্পষ্ট নেয়। অনুমানে অর্থ বোঝার চেষ্ট করছিল সে। এই জায়গাটা কি বর্ডার? ভারত-বাংলাদেশের মাঝখানে যেমন ল্যান্ডবর্ডার আছে, চেকপোস্ট আছে এটাও কি তেমনি? কিন্তু তুষার শুনেছে সেইসব চেকপোস্টে ইমিগ্রেশন কাস্টমস নাকি খুব ঝামেলা করে, এখানে তো সেরকম কিছু ঘটল না। তুষার চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল।

অনেকক্ষণ ছোটার পর গাড়িটা ধীরে ধীরে থেমে গেল। তারপর ডিকিটা খুলে যেতেই মুর্শেদ হাসানের গলা পাওয়া গেল, 'নেমে আসুন।'

ডিকি থেকে নামতেই কানে বিকট শব্দ ভেসে এল। তুষার সোজা হয়ে দাঁড়াতেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। নিচে, খানিকটা দূরে পার্কিং এরিয়া ছাড়িয়ে আলোয় আলোকিত ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট। তার ওপাশে বিপুল জলরাশি প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে গর্জন করে নিচে নেমে যাচ্ছে। সেই জলরাশির ওপর রঙিন আলো পড়ায় তার চেহারা ভয়ঙ্কর সুন্দর হয়ে উঠেছে। মুর্শেদ হাসান বললেন, 'চিনতে পারছেন?'

মাথা নাড়ল তুষার। এত দূর থেকে দেখেও সে মোহিত।

'জলপ্রপাত। এর নাম নায়াগ্রা।' মুর্শেদ হাসান বললেন, 'নিশ্চয়ই নাম শুনেছেন। যাওয়ার পথে পড়ল বলে দেখিয়ে দিলাম।'

'আমি এখন কোথায়?'

'আমেরিকায়। কাছে গিয়ে নায়াগ্রা দেখার দরকার নেই। আপনি গাড়িতে উঠে বসুন।' মুর্শেদ আবার চালকের আসনে ফিরে যেতে তুষার তাঁর পাশে গিয়ে বসে সিটবেল্ট বেঁধে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'এটা আমেরিকা?'

'ইয়েস। ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। এই দেশে আপনি গাড়ির ডিকিতে শুয়ে কেমন ঢুকে পড়লেন। কেন বলুন তো? কারণ আমি কানাডিয়ান। কানাডার নাগরিক। পরিচয়পত্র দেখালে আমি আমেরিকায় ঢুকে যে কোনো জায়গায় যেতে পারি। দু-দেশের মধ্যে সেইরকম চুক্তি আছে। একজন কানাডিয়ান গাড়ি চালাচ্ছে দেখে ওরা আর বেশি কৌতূহলী হয়নি। হলে বেশ কয়েক বছরের জন্যে শ্রীঘরে গিয়ে থাকতে হত। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন এত বড় ঝুঁকি আমি কেন নিলাম! এর উত্তর হল, না নিয়ে আমার কোনো উপায় ছিল না। আলতাফ হোসেন আমার অনেকটাই কিনে রেখেছেন। এই যেমন এখন থেকে আপনাকে সারাজীবনের জন্যে কিনে রাখলেন।' মুর্শেদ হাসলেন।

'উনি আমাকে চাকরি দিয়েছেন।'

'কী চাকরি?'

'রেস্টুরেন্টে চাকরি?'

'কেন দিয়েছেন?'

'আমার খুব প্রয়োজন বলে।'

'ঠিক। ওঁরও প্রয়োজন কম নয়।' গাড়ি চালাতে চালাতে কথা বলছিল মুর্শেদ হাসান, 'আমেরিকায় বৈধ লোককে কাজে নিলে তাকে ন্যায্য পারিশ্রমিক দিতে হয়। এমনিতে এখানে বেকারি কম বলে কাজের লোক নিয়মিত পাওয়া মুশকিল। রেস্টুরেন্টে সামান্য বয়গিরি করার জন্য একজন আমেরিকান দশ ডলার ঘণ্টা পিছু চাইবে। একজন বৈধ এশিয়ান আট ডলারের নিচে করবে না। আপনার মত অনুপ্রবেশকারী দুই আড়াই ডলারে পাওয়া যাবে। আপনাকে কাজে নিলে মালিকের লাভ। আপনি ইউনিয়ন করতে পারবেন না, প্রতিবাদ করার মুখ আপনার

বন্ধ। মালিক যা বলবে তাই আপনাকে শুনতে হবে। এ বাবা আজব ভুলভুলাইয়া, একবার ঢুকলে আর বেরুতে পারবেন না।'

কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল তুষার। তার মনে পড়ল, আলতাফ হোসেন সাহেব বলেছেন তাকে ঘণ্টাপিছু দু'ডলার দেওয়া হবে। বারো ঘণ্টা কাজ করলে বাংলাদেশের টাকায় প্রায় এক হাজারের ওপরে। সে যদি বৈধভাবে আমেরিকায় আসত তাহলে সেটা কত হয়ে যেত? ভাবা যায়? আলতাফ হোসেন সাহেব হয়তো তাকে কম দিচ্ছেন কিন্তু এই যে তার প্লেনের খরচ তো তিনিই পকেট থেকে দিয়েছেন। সেটা তো সে কখনই জোগাড় করতে পারত না।

এত চওড়া রাস্তা কখনও দ্যাখেনি তুষার। এদিকে যেমন পাঁচটা গাড়ি পাশাপাশি যাচ্ছে ওপাশেও তেমনি উল্টো দিকে পাঁচখানা গাড়ি ছুটছে। অবশ্য রাস্তার দু'পাশে বাড়িঘর দোকানপাট নেই। অন্ধকারে চাষের খেত আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। তুষারের কিছুক্ষণ ধরে অস্বস্তি হচ্ছিল, জলবিয়োগ করা দরকার। কিন্তু কথাটা মুর্শেদ হাসানকে কীভাবে বলা যায়? সে নড়েচড়ে বসল। তারপর বলেই ফেলল, 'হাসান সাহাব, আমার একটু টয়লেট যাওয়া দরকার।'

মুর্শেদ হাসান তাকালেন, 'আমাকে আপনি মুন্নাভাই বলে ডাকতে পারেন।' তুষার খুশি হল। লোকটাকে প্রথম যেরকম কাঠখোট্টা বলে মনে হচ্ছিল এখন সেরকম লাগছে না। কিছুক্ষণ পরে গাড়ি হাইওয়ে ছেড়ে বাঁ দিকের রাস্তা ধরল। তুষার দেখল একটা সুন্দর রঙিন বাড়ি যার সামনে বেশ কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে পৌঁছে গাড়িটা দাঁড় করালেন মুর্শেদ হাসান। ম্যাকডোনাল্ড লেখা রেস্টুরেন্টে ঢুকে খুব ভাল লাগল তুষারের। এত ঝকঝকে পরিষ্কার রেস্টুরেন্টে সে কখনও ঢোকেনি। ছেলেদের টয়লেটে ঢুকে আবিষ্কার করল প্রায় শোওয়ার ঘরের মত পরিষ্কার।

বাইরে বেরিয়ে এসে সে দেখল মুর্শেদ হাসান একটা টেবিলে বসে আছেন। তাঁর সামনে দুটো কফি আর লম্বা লম্বা আলু ভাজা। ভদ্রালোক বললেন, 'নাও খেতে শুরু করো। যা টেনশন গেল তাতে কফি না খেলে হবে না।'

'টেনশন?'

'বাঃ। তোমাকে এদেশে লুকিয়ে আনতে হল না?'

'আচ্ছা, আমেরিকায় কি সরাসরি আসা যায় না?'

'যায়। তুমি যদি বিবাহিত হও, দেশে প্রচুর সম্পত্তি থাকে এবং ঢাকার আমেরিকান কনস্যুলেট যাবে, তাহলে ওরা ভিসা দেবে। অবিবাহিত হলে তো ওরা বিশ্বাসই করবে না। এছাড়া এখান থেকে যদি চাকরি বা স্কলারশিপের কাগজপত্র দেখতে পায় তাহলে অনুমতি পাবে। এই দ্যাখো, তোমাকে তুমি বলে ফেললাম।'

'ভাল করেছেন। কিন্তু আমি কি বে-আইনি অবস্থায় আছি।'

'হ্যাঁ। একেবারে বে-আইনি। পুলিশ যদি জানতে পারে তাহলে তোমার কাছে পাশপোর্ট দেখতে চাইবে। না দেখাতে পারলে ধরে নিয়ে যাবে।'

'তারপর?' তুষারের গলা শুকিয়ে গেল।

'তারপর অনুপ্রবেশ করছে বলে তোমার বিরুদ্ধে কেস শুরু হবে। আমেরিকায় অনেকগুলো স্টেট। এক একটি স্টেটের এক একরকম আইন। সেই আইন অনুযায়ী বিচার। হবে। জেল হওয়া স্বাভাবিক ঘটনা।'

'সর্বনাশ।' কফি মুখে তুলতে ভুলে গেল তুষার।

'অত নার্ভাস হয়ে লাভ নেই। আমেরিকায় অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা কম নয়। তাদের অনেকেই ধরা পড়েছে, কেস চলছে। ধরা না পড়ে যারা বেশ কিছুকাল এদেশে রয়েছে তারা থাকার অনুমতি

চেয়ে অ্যাপিল করেছে। তাদের সংখ্যা এত যে মাঝে মাঝেই লটারি করে কিছু লোককে অনুমতি দেওয়া হয়।'

'মুন্নাভাই, আমার কী হবে?'

'ধরা না পড়লে কোনো ভয় নেই।'

'যদি ধরা পড়ে যাই?'

'তুমি তো রেস্টুরেন্টে চাকরি করার জন্যে এখানে এসেছ! রেস্টুরেন্ট থেকে বেরুবে না। ওখানেই খাবে ঘুমাবে। পুলিশ যদি কখনও রেইড্ করে তার আগেই মালিক তোমাকে বের করে দেবে। রাস্তায় ঘোরাঘুরি না করলে আর তোমার রেস্টুরেন্টের মালিকের যদি কোনো শত্রু না থাকে তাহলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম।'

'আপনি কি করে কানাডার নাগরিক হলেন?'

'এখানে অনেক সংস্থা আছে যারা টাকা নিয়ে ব্যবস্থা করে দেয়। ওরা দরখাস্ত ফি নেয় তিনশো আটষট্টি ডলার, ডকুমেন্ট সংগ্রহের জন্যে আরও একশ ডলার, কনসালটেন্সি ফি দুশো ডলার। এই ছয়শো আটষট্টি ডলার দিলে ওরা পাঁচ মাসের মধ্যে চিরস্থায়ী ইমিগ্রেশনের ব্যবস্থা করে দেয়।'

'ওরে বাব্বা। আমার কাছে তো এত টাকা নেই। মুন্নাভাই, আমার খুব ভয় করছে। আলতাফ হোসেন সাহেব আমাকে এসব কথা বলেননি!' কাতর গলায় বলল তুষার। এই হালকা ঠাণ্ডাতেও তার ঘাম জমছিল।

'দ্যাখো, এখন কিছু করার নেই। তুমি কেন এখানে এসেছ?'

'টাকা রোজগার করার জন্যে।'

'বেশ। সেই চেষ্টাই চালিয়ে যাও। আমি তোমাকে আর একটু পরে বাফেলো শহরে নামিয়ে দেব। ওখান থেকে গ্রেহাউন্ড বাসে চেপে তুমি নিউইয়র্ক চলে যেতে পারবে। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটের কোন রেস্টুরেন্টে তোমার কাজ হয়েছে?'

হঠাৎ মাথার ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেল তুষারের। অনেক চেষ্টা করেও সে কিছুতেই রেস্টুরেন্টের অথবা ম্যানেজারের নাম মনে কবতে পারল না। তার মুখের চেহারা দেখে মুর্শেদ হাসান জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কাছে ঠিকানা লেখা নেই?'

তুষার মাথা নাড়ল প্রবলভাবে, 'না। উনি মুখে বলেছিলেন। তাড়াহুড়োতে আমি লিখে নিইনি। কিন্তু এখন যে কিছুতেই মনে পড়ছে না। কী যে করি!'

'আশ্চর্য!'

ঠিক তখনই তুষারের মনে পড়ল মম, মমতাজের কথা মমতাজ হোসেন। জনাব আলতাফ হোসেনের মেয়ে। সে এক বুকে উদ্বেগ নিয়ে মুর্শেদ হাসানকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি আলতাফ হোসেন, সাহেবের মেয়ে মমকে চেনেন?

মুর্শেদ হাসান অবাক হলেন, 'তুমি মমকে চেনো?'

আলতাফ হেসেন সাহেবের বাড়িতে গিয়েছিলাম। হিথরো এয়ারপোর্টে আলাপ হয়েছিল। ওঁর কাছে পৌছতে পারলে ঠিকানাটা—।' বলতে বলতে তুষারে মনে এল সে ঠিকানাটা লিখে রেখেছিল। জ্যাকসন হাইট বলে জায়গাটায় রেস্টুরেন্টটা।

তোমার জন্যে আমার খারাপ লাগছে। আমার ওপর দায়িত্ব ছিল তোমাকে টরেন্টা থেকে

তুলে বাফেলো শহরে পৌঁছে দেওয়া। এবং এটাই শেষ, আর আমি আলতাফ সাহেবের অনুরোধ রাখব না। তুমি খেয়ে নাও। মুর্শেদ শেষ চুমুক দিলেন।

পায়ের তলা যেন ঝিনঝিন করতে লাগল। তুষার বুঝতে পারছিল মুর্শেদ হাসান চলে গেলে তার অবস্থা কি হবে! গভীর জলে ডুবে গিয়ে হাঁকপাক করা ছাড়া কোনো উপায় থাকছে না। সে বলল, 'মুন্নাভাই, আমার অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন, আমাকে বাঁচান।'

'কীভাবে? তুমি যদি কানাডায় থাকতে আমি চেষ্টা করতে পারতাম। ওখানে আমার ব্যবসা, পাঁচজনকে চিনি। আর আলতাফ হোসেনকে অস্বীকার করে যদি অন্য কোনো কাজ করো তাহলে তিনি ছেড়ে দেবেন না। বিমান ভাড়ার ডাবল আদায় করে নেবেন। সেই টাকাও তো তোমার কাছে নেই।' মুন্নাভাই চোখ বন্ধ করলেন, 'আমি একটা কাজ করতে পারি। বাফেলো শহরে দু'জন বাংলাদেশি ছাত্র একটা রুম নিয়ে থাকে। ওরা আমাকে চেনে। তোমাকে ওদের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে দু'তিনদিন থাকো। আমি ইতিমধ্যে ঢাকায় যোগাযোগ করে নিউইয়র্কে কোন ঠিকানায় তুমি যাবে তা জেনে নিচ্ছি, চলো।'

গাড়ি এগিয়ে চলল। হাইওয়ে ছেড়ে শহরে ঢুকল। এখন বেশ রাত। তুষার দেখল পথ জনশূন্য। রাতের এমন সময়েও ঢাকা শহরের রাস্তা জমজমাট থাকে। এখানকার মানুষেরা এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যায় কেন?

শহরের একপ্রান্তে যে বাড়িটার সামনে গাড়িটা দাঁড়াল সেটা তিনতলা। একতলার বাঁ দিকের বোতাম টিপলেন মুন্নাভাই। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বারমুডা পরা একটা ছেলে দরজা খুলেই চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে মুন্নাভাই, আপনি?'

'কেমন আছ তোমরা?'

'ঠিক আছি।'

'এর নাম তুষার। দু'-তিন দিন এখানে থাকলে অসুবিধা হবে?'

'আপনি চাইলে কোনো অসুবিধে হবে না।' হাত বাড়াল ছেলেটি, 'আমার নাম শাহীন. ওয়েলকাম।'

'আমি তুষার আহমেদ।' হাত মেলাল তুষার।

'তাহলে ঠিক আছে। আমি এখন চলি । কালই ফোন করব।' মুন্নাভাই তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন। শাহীন বলল, 'আপনি বসবেন না?'

'না ভাই। আমাকে এখনই টরেন্টা ফিরে যেতে হবে। বাই।'

মুন্নাভাই চলে যেতে দরজা বন্ধ করল শাহীন। বলল, স্যুটকেশটা ওখানে রাখেন। আমাদের একটাই বেডরুম, এটা বসার জায়গা। আমার ফ্রেন্ড আজ রাত্রে কাজে গেছে, সকালে ফিরবে। আপনার কোনো প্রব্লেম নেই।'

'আপনার ফ্রেন্ড?'

'ওর নাম ফয়েজুর। ফরিদপুরে দেশ। আপনি কি ডিনার করেছেন?' শাহীন জিজ্ঞাসা করল।

ইতস্তত করল তুষার। শেষ খাবার খেয়েছিল প্লেনে। তারপর দীর্ঘসময় কেটে গেছে। আধকাপ কফি ছাড়া পেটে কিছু পড়েনি। কিন্তু খাওয়ার কথা বলতে লজ্জা লাগল তার। সে বলল, 'এক কাপ চা পেলেই হয়ে যাবে।'

'চা?' শাহীন পাশের প্যাসেজে চলে গেল। তারপর বলল, 'আপনি বসুন, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।'

'আপনি কি চা আনতে যাচ্ছেন, তাহলে দরকার নেই।'

'না-না। আমার মনে ছিল না ফয়েজভাই বলে গিয়েছিল আমি ভুলে গিয়েছিলাম।' শাহীন দরজার দিকে এলেন। তুষার বলল, 'আপনার সঙ্গে যাব?'

'আসুন।'

রাস্তা পেরিয়ে খানিকটা যাওয়ার পর একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ল শাহীন। তুষার দেখল এটা সেই জাতীয় রেস্টুরেন্ট যেখানে মুন্নাভাই তাকে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাউন্টারের দিকে গেল না শাহীন। বাঁ দিকে লম্বা টেবিলের ওপর রাখা বাস্কেট থেকে পটাপট কয়েকটা প্যাকেট তুলে নিয়ে এসে বলল, 'চলুন, হয়ে গিয়েছে।'

কী হয়ে গেছে বুঝতে সময় লাগল। গরম জল করে শাহীন চা বানালেন সেই প্যাকেট খুলে দুধ আর চিনি মিশিয়ে। সঙ্গে টি ব্যাগ। সে হাসল, 'আপনি অবাক হচ্ছেন, না? আসলে ওই রেস্টুরেন্টকে আমরা মাঝে মাঝে খাওয়ার জন্যে অনেক ডলার দিই। তাই না বলে এগুলো নিয়ে এলে খারাপ লাগে না।'

চায়ের কাপ ধরিয়ে দিয়ে শাহীন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আপনি স্টুডেন্ট?'

'না।' মাথা নাড়ল তুষার।'

'আমেরিকায় কবে এসেছেন?'

'আজই এসেছি।'

'আচ্ছা। চাকরি নিয়ে এসেছেন?'

'না। আমি বেকার। এখানে একজন চাকরি দেবেন বলেছেন।'

'সেকি! আপনি ভিসা পেলেন কী করে?'

তুষার মুখ নামাল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'আমার ভিসা নেই।'

শাহীন তাকাল, 'কানাডা থেকে এলেন?'

'হ্যাঁ। কানাডার ভিসা ছিল। এসব ব্যাপার আমি ভাল জানতাম না। মুন্নাভাইয়ের কাছে শোনার পর আমার খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে। আমি কী করব ভেবে পাচ্ছি না।'

শাহীন একটা সিগারেট ধরাল. 'ওকে! আপনি এদেশে চুরি ডাকাতি রেপ না করলে পুলিশ আপনার কাছে আসবে না। কিন্তু আপনি সোস্যাল সিকিউরিটি নাম্বার পাবেন না, হেলথ ইনসিওরেন্স করতে পারবেন না, লিগ্যালি চাকরি পাবেন না। মাথা উঁচু করে থাকতে হলে আপনাকে এগুলো পেতে হবে। এদেশে থাকার সরকারি স্বীকৃতি ছাড়া এগুলো পাওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে রোজগার করতে গেলে মালিক আপনাকে এক্সপ্লয়েট করবে।'

হাঁ করে শুনছিল তুষার। তার মুখের দিকে তাকিয়ে শাহীন বলল, 'এত চিন্তার কারণ নেই! লক্ষ লক্ষ লোক আপনার মত পরিচয়পত্রহীন অবস্থায় এদেশে আছে। সুযোগের অপেক্ষায় থাকবেন. ইউ এস এ গভর্নমেন্ট মাসে মাসে লটারি করে লিগলাইড করে নেয়। আমি স্টুডেন্ট ভিসায় এসেছি। সামনের বছর ভিসা শেষ হওয়ার কথা। আমারও তখন সমস্যা হবে। যাকগে, শুয়ে পড়েন।' সোফা টেনে বিছানা করে দিল শাহীন।

বিছানায় শুয়েও ঘুম আসছিল না তুষারের। দুশ্চিন্তা যত, খিদে তত বাড়ছিল। কিন্তু তার শরীর বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল। চোখ বন্ধ করে সে ঢাকার কথা ভাবতে লাগল। মা, বাবা, লিটন, হানিফ এবং দিলারা। দিলারাও বিদেশে যাচ্ছে। কিন্তু তাকে নিশ্চয়ই এমন সমস্যায় পড়তে হবে না। এখানে সে যত ভালভাবে থাকার চেষ্টা করুক না কেন যে কোনো মুহূর্তে পুলিশ এসে তাকে বলতে পারে, তোমাকে অ্যারেস্ট করা হল। এই একটা ভয় সবসময় তাকে পাগল করে ছাড়বে।

ঘুম যখন ভাঙল তখন সকাল এগারটা। সামনের ঘড়ি তাই বলছিল যদিও ঘরের বাইরে তেমন আলো নেই। জানালার পর্দা একটু সরে গেছে, কাচের বাইরে যে আকাশ দেখা যাচ্ছে সেটা ঘোলাটে। তুষার উঠল।

'গুড মর্নিং। ভাল ঘুম হল?'

গলা শুনে মুখ ফেরাল তুষার। শাহীন নয়, অন্য ছেলে, এরও পরনে বারমুডা।

ছেলেটি বলল, 'আমি ফয়েজ, শাহীনের রুমমেট। কাল রাতে আপনি যখন এখানে এসেছিলেন আমি তখন ডিউটিতে ছিলাম। শাহীন সব বলে গিয়েছে। সে ফিরবে বিকেলবেলা। আমরা অল্টারনেটিভ ডিউটি করি, তাতে প্রাইভেসি থাকে।' ফয়েজ হাসল, 'যান, টয়লেট থেকে ঘুরে আসুন ব্রেকফাস্ট রেডি।'

সোফা ঠিক করে টয়লেটে গেল তুষার। ঢাকার মেস বা গ্রামের বাড়িতে এমন টয়লেট দেখলে স্বপ্নের মত মনে হত। শাহীন বা ফয়েজ যে খুব ভাল মানুষ তা বোঝা যাচ্ছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত একজনকে বাড়িতে রেখে যত্ন করছে।

টোস্ট ডিম আর চা খেতে খেতে ফয়েজ বলল, 'মুন্নাভাই ফোন করেছিলেন ঢাকাতে যাকে দরকার তাকে লাইনে পাননি। আবার ফোন করবেন।'

'ওঃ।' তুষার ঠোঁট কামড়াল।

'আপনি তো কালই আমেরিকায় এসেছেন। বাফেলো শহরটা আজ দেখে আসুন না। এ বাড়ি থেকে বাঁ দিকে একটা ব্লক গেলেই বাস স্টপ পেয়ে যাবেন।'

'আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। আসলে—।'

'আরে ভাই মন হালকা করুন। এখানকার নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট লোক শিক্ষিত, কথা বলে ইংরেজিতে। কোনো সমস্যা হবে না।'

তুষার চুপ করে থাকল। তার মনে হচ্ছিল এই ফ্ল্যাটের বাইরে গেলেই সে বিপদে পড়বে। ফয়েজ বলল, 'আপনি আজ আমাদের এখানে থাকবেন তা তো জানতাম না। আসলে আমার এক বান্ধবীর এখন আসার কথা। এলে বেডরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে হবে। সেটা আপনার ভাল নাও লাগতে পারে। বলতে বলতে বেল বাজল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফয়েজ এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই একজন শ্যামলা চেহারার বিদেশিনী দরজা খুলল, 'হাই!'

'হাই এনা। ওয়েল, হিজ নেম ইজ তুষার, হি ইজ এ নিউকামার ফ্রম বাংলাদেশ। তুষার, এনা আমার বান্ধবী, ও স্প্যানিশ।'

ফয়েজ পরিচয় করিয়ে দিতে এনা মাথা নাড়ল, 'হাই।'

এই অবস্থায় কি বলতে হয় বুঝতে না পেরে তুষার হাসার চেষ্টা করল আর তখনই টেলিফোনটা বেজে উঠল আচমকা।

ফয়েজ রিসিভার তুলল, 'হ্যালো। হ্যাঁ মুন্নাভাই, উনি ভাল আছেন। ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়ে গিয়েছে।' দাঁড়ান। একটা কলম নিয়ে প্যাডে কিছু লিখল ফয়েজ, 'ঠিক আছে। উনি এখানেই আছেন। কথা বলেন।' ইশারায় তুষারকে ডাকল সে।

তুষার ফোন তুলে বলল, 'হ্যালো।'

'শোনো তুষার। আলতাফ হোসেনের সঙ্গে এইমাত্র কথা হল। তিনি অকারণে খুব রাগারাগি করলেন। তোমাকে ক্যালাস বললেন। যা হোক, রেস্টুরেন্টের ঠিকানা আমি ফয়েজকে বলেছি,

ও নিয়ে নিয়েছে। তুমি আমার ফোন নাম্বার লিখে নাও। কলম আছে? হ্যাঁ, ফোর ওয়ান সিক্স হল এরিয়া কোড, সেভেন সেভেন থ্রি, ওয়ান ওয়ান ওয়ান সিক্স জিরো। দরকার হলে ফোন কোরো। আর হ্যাঁ, মমতাজের টেলিফোন নাম্বার হল সেভেন ওয়ান এইট, থ্রি সিক্স ওয়ান, ওয়ান ফোর এইট এইট। তুমি আজ রাতের গ্রে-হাউন্ড ধরলে কাল ভোরে নিউইয়র্কে পৌঁছে যাবে। বাই।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল ফয়েজ জিজ্ঞাসা করল।

'বললেন আজকের রাতের গ্রে হাউন্ড ধরে নিউ ইয়র্ক যেতে।'

'ভাল। তাহলে আপনি এখানে রেস্ট নিন।' এনার হাত ধরে ফয়েজ ভেতরের ঘরে চলে গেল। বাইরের ঘরে বসে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছিল তুষারের। ভেতর থেকে হাসির শব্দ ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে এনার গলায় নো নো শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তুষার বুঝল এই কারণেই ফয়েজ তাকে বাইরে ঘুরতে যেতে বলছিল। তুষার টয়লেটে গিয়ে বাইরে বেরুবার পোশাক পরে নিল। তারপর ঘরে ফিরতেই ভেতরের ঘরের দরজা খুলে গেল। ফয়েজ এবং এনা একসঙ্গে বেরিয়ে এল। ফয়েজ বলল, 'একি! আপনি বাইরে যাচ্ছেন।'

'একটু ঘুরে আসি।'

'ঠিক চিনে আসতে পারবেন তো? ঠিকানা আছে?'

'আমি সামনের রাস্তাতেই থাকব।'

'ও। শুনুন এনাকে আপনার সমস্যার কথা বলতে ও একটা পরামর্শ দিল। আপনার কপালে থাকলে ব্যাপারটা ক্লিক করে যেতে পারে।'

তুষার অবাক হয়ে এনার দিকে তাকাল। এনা ইংরেজিতে যেটা বলল তার বাংলা তর্জমা করলে এমন দাঁড়ায়, দেখুন আমি আর ফয়েজ খুব ভাল বন্ধু। আপনি যখন ফয়েজের অতিথি তখন ধরে নিচ্ছি খারাপ লোক নন। নিউইয়র্কের এল্‌মহার স্ট্রিটে আমার এক বান্ধবী থাকে। ও খুব ভাল মেয়ে কিন্তু ভাল মেয়ে বলেই ওর কপাল খুব খারাপ। এর আগে দু-দুবার বিয়ে করেছিল ও। প্রথম স্বামী রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়, দ্বিতীয়জন ক্যানসারে। তারপর থেকে বেচারা খুব মনমরা হয়ে আছে। কোনো ছেলেবন্ধুর সঙ্গে মেশে না। আপনি যদি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাহলে হয়তো উপকৃত হতে পারেন।'

স্প্যানিশদের ইংরেজি বলার ধরন জড়ানো নয়। তুষার মন দিয়ে শোনায় অনেকটাই বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করল, 'কীভাবে?'

'ওর অনেক জানাশোনা আছে।'

'উনি কেন আমার উপকার করবেন?'

'কোনো কোনো মানুষের স্বভাব হল উপকার করা। আপনি দেখা করুন না।'

'উনি তো আমাকে চেনেন না।'

ফয়েজ বলল, 'এনা, তুমি কেন ওঁকে একটা ফোন করছ না?'

'লং ডিস্টেন্স কল, এখন তো হাই রেট।' এনা বলল।

'ওঃ ঠিক আছে। আমার দেশের ছেলের জন্যে ওট, মেনে নিচ্ছি!'

এনা ব্যাগ থেকে ইলেকট্রনিক ডায়েরি বের করে নাম্বার দেখল। তারপর টেলিফোনের বোতাম টিপলো, 'হাই! সুজান, আমি এনা। বাফেলো থেকে। ভাল আছি। কাজে যাসনি? হঠাৎ ছুটি? পাগল। শোন, আমার বয়ফ্রেন্ডের এক বন্ধু এসেছে বাংলাদেশ থেকে। আমেরিকায় এই প্রথম। কিছু চেনে না। নিউইয়র্ক যাচ্ছে, তোর সাহায্য চাইছে। কী বললি? ছেলেদের সঙ্গ তোকে কে

করতে বলছে? তাছাড়া এই ছেলেটি এদেশের নয়, ওর কাছে শুনতে পাবি কী ভয়ানক বিপদে আছে। কী বিপদ? না, আমি তোকে বলব না। তোর যদি উপকার করার ইচ্ছে হয় তো নিজের মুখে শুনিস। ও আমেরিকার কিছু চেনে না, আজ রাতের গ্রে-হাইন্ড বাসে নিউইয়র্ক যাচ্ছে। কী? ঠিক আছে। অনেক ধন্যবাদ।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে এনা ইংরেজিতে বলল, 'একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছে। অথচ একসময় ও ছিল আমাদের দলের সবচেয়ে প্রাণবন্ত মেয়ে। আপনাকে আমি সুজানের টেলিফোন নাম্বার দিচ্ছি। নিউইয়র্কে পৌঁছে ফোন করে দেখুন কী হয়।' টেলিফোন নাম্বারটা লিখে দিল এনা।

'উনি যখন চাইছেন না তখন বিরক্ত করার কী দরকার?'

'কী আশ্চর্য! উনি তো আপনাকে বলেননি যে বিরক্ত হচ্ছেন। সেটা বললে আপনি আর বিরক্ত করবেন না।' এনা বলল।

রাত ন'টার সময় কাজে যাওয়ার আগে ফয়েজ তুষারকে গ্রে-হাউন্ড বাস টার্মিনাসে পৌঁছে দিল। জানা গেল এখন থেকে এক ঘন্টা পরপর বাস যাবে নিউইয়র্কে। আসন খালি থাকলেই উঠে পড়তে পারে। ভাড়া আশি ডলার। ভাড়ার পরিমাণ শুনে মাথা খারাপ হয়ে গেল তুষারের। জানা গেল, আগে টিকিট কাটলে অথবা একমাসের জন্যে থোক টিকিট কাটলে ভাড়া অনেক কমে যাবে। সেসব করার কোনো অবকাশ নেই, টিকিট কাটার পর পকেটে মাত্র বিশ ডলার পড়ে রইল। যাওয়ার আগে ফয়েজ তাকে বেশ কিছু খুচরো কয়েন দিয়ে গেল।

সাড়ে ন'টার গ্রে-হাউন্ড বাসে উঠে বসার জায়গা পেয়ে গেল তুষার। এত সুন্দর বাসে সে কখনও ওঠেনি। বাসের ড্রাইভারই কন্ডাক্টর। সুন্দর রাস্তায় দ্রুত ছুটছিল বাস। গোটাদিন ফয়েজদের ওখানে কাটিয়ে এখন মনে হচ্ছিল যে আত্মীয়দের ছেড়ে অজানায় পাড়ি দিচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, যা হওয়ার হবে। এ নিয়ে ভেবে যখন কোনো লাভ নেই, তখন না ভাবাই ভাল।

মাঝে মাঝে এক একটা শহর আসছে, বাস দাঁড়াচ্ছে খানিকক্ষণ আর যাত্রীদের অধিকাংশ নেমে যাচ্ছে একঘেয়েমি কাটাতে। নতুন কিছু যাত্রীও উঠছে। তুষার নামল না। তার ঝিমুনি আসছিল। এবং এইভাবে এক সময় যে নিউইয়র্ক শহরের পোর্ট অথরিটি টার্মিনাসে পৌঁছে গেল।

এখন সবে ভোর হয়েছে। স্যুটকেশ নিয়ে বাস থেকে নেমে কয়েকজন যাত্রীকে অনুসরণ করে ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিটের মোড়ে চলে এল তুষার। বিশাল বিশাল বাড়ি, চওড়া রাস্তা, কিন্তু নির্জন। নিউইয়র্কের মানুষেরা বোধহয় এখনও ঘুমাচ্ছে। রাস্তায় গাড়ি কম। নাম্বার লেখা বাস ছুটে যাচ্ছে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে তুষার ঠিক করতে পারছিল না কি করবে! রেস্টুরেন্টের ঠিকানা এখন তার কাছে আছে। কিন্তু সেখানে পৌঁছাতে হলে কত নম্বর বাস ধরতে হবে তা জানা নেই। পকেটে মাত্র কুড়ি ডলার আছে। ট্যাক্সি নিলে তাতে কি কুলাবে? যদি বা কুলায় তাহলে তো তার পকেট তো খালি হয়ে যাবে।

কয়েক পা হাঁটতেই সে পাবলিক টেলিফোনগুলো দেখতে পেল। একটার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যবহার করার নিয়মগুলো পড়ল। তার পকেটে কিছু কয়েন আছে যা ফয়েজ দিয়েছিল। পঁচিশ সেন্টের কয়েন। মমতাজের ফোন নাম্বার বের করলো সে। ডায়াল করার পর ওপাশে রিং হল তারপররেই অদ্ভুত গলা কানে এল। খুব জড়ানো দ্রুত গলায় যা শোনানো হল তাতে তুষার অনুমান করল মমতাজ বাড়িতেই নেই। মিছিমিছি পয়সা নষ্ট হল।

দ্বিতীয় নাম্বারটির দিকে তাকাল সে। এটা এনার বান্ধবী সুজানের। এ-ও যদি ফোন না ধরে

তাহলে সাড়ে বারো টাকা নষ্ট হবে। ইতস্তত করে ফোন করলো সে। রিং হচ্ছে। তারপর মহিলার গলা পাওয়া গেল, 'হ্যালো!' কেটে কেটে ইংরেজি বলল তুষার, 'হ্যালো। মাই নেম ইজ তুষার। এনা টোল্ড মি টু কন্ট্যাক্ট হার ফ্রেন্ড সুজান।'

'ইয়েস। আই আম সুজান। হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?'

তুষার অস্বচ্ছন্দ ইংরেজিতে বলল, সে এইমাত্র বাফেলো থেকে বাসে এসেছে। রাস্তাঘাট চেনে না। তাকে একটা ঠিকানায় যেতে হবে কিন্তু কী করে যাবে বুঝতে পারছে না।

সুজান বলল, 'কি আশ্চর্য! আপনি একটা ট্যাক্সিওয়ালাকে বলুন, পৌঁছে দেবে।'

তুষার বলল, 'আমার কাছে বেশি ডলার নেই। অন্যভাবে যাওয়া যায় না?'

সুজান ঠিকানাটা জানতে চাইল। তুষার কাগজ দেখে সেটা বলতে সুজান জানাল কিভাবে পাতাল-ট্রেন ধরে জায়গাটায় পৌঁছতে হবে। তুষার বলল, সে সামনে কোনো রেল স্টেশন দেখতে পাচ্ছে না।

সুজান খুব রেগে গেল, 'আপনি কি জঙ্গল থেকে এসেছেন? আপনার বয়স কত? এভাবে তো শিশুরা কথা বলে।'

তুষার বলল, 'আমি খুব লজ্জিত। আমার বয়স এখন পঁচিশ। ঢাকা থেকে আসছি। আসলে খুব নার্ভাস হয়ে গেছি বলে আপনাকে বিরক্ত করলাম। ঠিক আছে।'

'আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন?'

'পোর্ট অথরিটি বাস টার্মিনাসের বাইরে।'

'আঃ। পোর্ট অথরিটি বিরাট জায়গা। কোন স্ট্রিট, সামনে কী আছে?'

সামনে যা দেখতে পেল বলল তুষার। সুজান বলল, 'বুঝেছি। ঠিক ওই জায়গায় আধঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকুন।' লাইন কেটে গেল।

আধঘণ্টার মধ্যে রাস্তাটার চরিত্র বদলে গেল তুষারের চোখের সামনে। গাড়ির সংখ্যা বাড়তে লাগল। সেইসঙ্গে মানুষের যাতায়াতও। বিশাল চেহারার একটা নিগ্রো এগিয়ে এল, জড়ানো গলায় যা বলল, বোধগম্য হল না তুষারের। লোকটা আঙুল ঠোঁটে ছুঁইয়ে সিগারেট টানার ভঙ্গি করতে সে মাথা নাড়ল, নেই। লোকটা হাত পাতল, 'গিভ মি এ ডলার।'

ঠিক তখনই পেছন থেকে একটা মেয়েলি গলার ধমক ভেসে আসতেই অতবড় চেহারার লোকটা কুঁকড়ে গিয়ে সরে পড়ল। তুষার দেখল একটি ঝকঝকে মেয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, 'আমি সুজান।'

এমন বিমর্ষ মনের মেয়ে এর আগে দ্যাখেনি তুষার। মেমসাহেব সে ঢাকার রাস্তায় দেখেছে। কি রকম গরিব গরিব পোশাক, ওদের হিপিনী বলে সবাই। ওদের বাবা-মায়ের নাকি অনেক অনেক টাকা কিন্তু ওই সাজানো জীবনে তৃষ্ণা মেটেনি বলে ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। সে সব হিপিনীদের কখনও সুন্দরী বলে মনে হয়নি। কিন্তু সুজানকে ওদের মতো দেখতে নয়। সেই গাম্ভীর্য এতটা বিষাদ মাখানো যে মনে হয় সামনে আড়াল রেখেছে।

পার্ক করা গাড়ির পাশে পৌঁছে সুজান বলল, 'শুনলাম ঠিকানাটা তোমার মনে নেই। কিন্তু ওটা জ্যাকসন হাইটে, তাই তো?'

জ্যাকসন হাইট! মনে পড়ল তুষারের। সে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

সুজানের ইংরেজি উচ্চারণ বুঝতে তার একটুও অসুবিধে হচ্ছে না। সুজানের পাশের সিটে

বসে বেল্ট বেঁধে নিল তুষার। সে বুঝতে পারছিল না সুজান তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। তার মনে হল নিশ্চয়ই ফ্ল্যাটে নিয়ে যাবে। সেখানে অন্য কোনো সমস্যা আছে কিন্তু তা জানা নেই। আমেরিকায় একটা মেয়ে কি উটকো লোককে বাড়িতে নিয়ে যায়? উটকো ছাড়া তো সে কিছু নয়। নেহাত বন্ধুর অনুরোধ ফেলতে না পেরে তাকে সাহায্য করতে এসেছে।

সুজান কথা বলছে না। গম্ভীর মুখে গাড়ি চালাচ্ছে। আচ্ছা, দিলারা কি এমন গম্ভীর থাকতে পারবে? কে জানে!

তুষার রাস্তা দেখতে লাগল। বিশাল বাড়ি, রাস্তায় মানুষ কম। কত রেস্টুরেন্ট আর বার। তারপর সেগুলো শেষ হয়ে গেলে শুধু রাস্তা আর রাস্তা। পাশাপাশি কত রাস্তা আর সেই রাস্তা জুড়ে গাড়ির মিছিল। এখনাকার মানুষ বোধহয় রাস্তায় হাঁটে না নইলে এত গাড়ি ছুটবে কেন?

সে সুজানের দিকে তাকাল। একই রকম নির্লিপ্তি ওই মুখে। পরিচয় দেওয়ার সময় নাম জিজ্ঞাসা করে নিজের শখ বলেছিল। সেটা মিলে যাওয়ায় ওকে অনুসরণ করার জন্যে অনুরোধ করেছিল। কথাবার্তা তখন এটুকুই। তারপর গাড়ির পাশে এসে ওই কথাগুলো। তুষারের মনে হল একজন রোবটকে যেন কাজে লাগানো হয়েছে। বড় রাস্তা ছেড়ে গাড়ি ভেতরে ঢুকল। এখানে বাড়িগুলো তিনতলার বেশি উঁচু না। মাথার ওপর দিয়ে রেললাইনটা চলে গিয়েছে। একটা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে সুজান বলল, 'এই হল জ্যাকসন হাইট। আমি এর প্রতিটি রাস্তা পাক খাব। সাইনবোর্ড দেখে যদি তোমার কিছু মনে পড়ে তাহলে বলবে।' গাড়ি খুব আস্তে চালাচ্ছিল সুজান। তুষার অবাক হল। দুপাশে শাড়ির দোকান এবং তার ওপর সাইনবোর্ডে পরিচিত নাম। মিষ্টির দোকানের ওপর আলাদীন দেখে চমকে উঠল সে। একটা বই-এর দোকানের ওপর বাংলায় নাম লেখা। সে কোথায় এসেছে। এখন জায়গাটাকে আমেরিকা বলে মনে হচ্ছে না। ইন্ডিয়ান স্টোর্স অনেকগুলো। বাংলাদেশের ইলিশ পাওয়া যায় বলে সাইনবোর্ডে জানানো হয়েছে। যত দেখছিল তত বিস্মিত হচ্ছিল তুষার।

হঠাৎ একটা সাইনবোর্ডে তার চোখ আটকালো। বিশাল দোকান, সাইনবোর্ডও তেমনি বড়। বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট। মাথার ভেতর কি যেন চমকে উঠতেই সে গাড়ি থামতে বলল। সুজান বলল, এখানে পার্কিং নেই। আমি একটু এগিয়ে যাচ্ছি।'

মিনিট দেড়েক পরে পার্কিং জোনে সুজান গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু দেখে চেনা বলে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। মনে হচ্ছে ওই দোকানটা।'

'তাহলে গিয়ে খোঁজ করো। তোমার স্যুটকেশ গাড়িতেই থাকুক।'

ফুটপাতে নামল তুষার। এখন ফুটপাতে কিছু মানুষ এবং তাদের সবাই যে এশিয়া থেকে এসেছে বোঝা যাচ্ছে। দুজন স্যুট পরা লোক বাংলায় কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেল। দোকানটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল তুষার।

এখনও দোকান খোলা হয়নি। ভেতরে দু'জন লোক কথা বলছে তা কাপড়ের আড়াল থেকেও বোঝা যাচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে দরজায় দাঁড়াতেই একজন বলে উঠল, 'ইটস নট ইয়েট ওপেন।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'আপনি বাঙালি তো? ঘুরে আসুন। দোকান খোলা হয়নি।'

তুষার ঠোঁট কামড়াল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা এই দোকানের যিনি ম্যানেজার তার নাম জানতে পারি?'

'শাহীনভাই। কেন?'

মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, সে ঠিক জায়গায় এসেছে। বুকে বল পেল তুষার। জিজ্ঞাসা করল, 'উনি নেই?'

'না তার আসার সময় হয়নি। কোনো দরকার আছে?'

'হ্যাঁ।'

'উনি আর আধঘন্টা পরে আসবেন। ঘুরে আসুন।'

'আমি এখানে অপেক্ষা করতে পারি?'

'করুন।'

পায়ে যেন ডানা জুড়ল। গাড়ির কাছে পৌঁছে সে সুজানকে বলল, 'হ্যাঁ, যেখানে আমার আসার কথা সেই জায়গাটা পেয়ে গেছি। আপনাকে আমার অনেক ধন্যবাদ। খুব উপকার করলেন আপনি।

সুজান হাত নাড়ল, তারপর ব্যাগ খুলে একটা কাগজে কিছু লিখে এগিয়ে দিল, এটা আমার টেলিফোন নাম্বার, যদি প্রয়োজন হয় ফোন করতে পারো।'

স্যুটকেশ নামিয়ে নিতে সুজান চলে গেল গাড়ি নিয়ে। কাগজটা যত্ন করে ভাঁজ করল তুষার। এটাকে হারালে চলবে না।

স্যুটকেশ সঙ্গে নিয়ে ফিরতে দেখে লোক দুটো অবাক হল। একজন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি বাইরে থেকে আসছেন?'

'হ্যাঁ।

'কোত্থেকে?'

'বাংলাদেশ।'

লোক দুটো মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। শেষ পর্যন্ত একজন বলল, 'বসুন।'

সামনের চেয়ারে বসে স্যুটকেশ নামাল তুষার। দ্বিতীয়জন জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কী করে এলেন? এ সময় তো কোনো প্লেন আসে না?'

'আমি বাসে এসেছি বাফেলো থেকে।'

ওরা মাথা নাড়ল কিন্তু আর কথা বাড়াল না। একটু একটু করে কর্মচারিরা আসতে লাগল। যারা আসছে তারাই তাকে একবার দেখে যাচ্ছে। দুজন মহিলাও এখানে কাজ করেন এবং সবাই বাংলাদেশের মানুষ।

ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে মধ্যবয়সী একজন দোকানে ঢুকলেন। স্যুট টাই পরা বেশ সাহেবি চেহারার মানুষ। প্রথম দুজনের একজন গিয়ে সেলাম করে তাঁকে কিছু বলতেই তিনি ঘুরে তুষারকে দেখলেন। তারপর এগিয়ে এলেন, 'কী চাই?'

'আমি মিস্টার শাহীনের সঙ্গে দেখা করব।'

'আমিই শাহীন।'

'আমাকে আলতাফ হোসেন সাহেব আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।'

'কী নাম?'

'তুষার আহমেদ।'

'ও। হ্যাঁ। পাশপোর্ট দেখি?

তুষার পাশপোর্ট বের করে দিল। ভদ্রলোক পাতা উল্টে বললেন, 'বাঃ। চমৎকার। এখানে তো কানাডার ভিসা দেখতে পাচ্ছি। তার তারিখও শেষ। এখানে এসে পৌঁছনো হল কী করে?'

তুষার সংক্ষেপে যা যা ঘটেছিল সব বলল।

শুনে শাহীন মাথা নাড়লেন, 'বুঝলাম। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জানো আমেরিকায় অনুপ্রবেশকারীদের সব সময় ভয়ের মধ্যে থাকতে হয়। পুলিশ জানতে পারলে জেলে যেতে হবে তোমাকে।'

তুষার মাথা নাড়ল, 'আলতাফ হোসেন সাহেব যা বলেছেন তাই করেছি আমি।'

'তুমি কী কাজ জানো?'

'মানে?'

'কুকিং জানো?'

'না।'

'ও। এই এক বিপদ। যত উটকো লোককে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। যাকগে, এসেছ যখন তখন চলে যেতে বলব না। সাতদিন দেখব। তার মধ্যে যদি কাজ শিখতে পারে তো থাকবে নইলে যেতে হবে।'

'আমি শিখে নেব।'

'কী শিখবে? সাতদিনে রান্না শিখতে পারবে?'

'না। অন্য কাজ।'

'এসো আমার সঙ্গে।'

রেস্টুরেন্টের শেষে একটা কাঠের সিঁড়ি ওপরে চলে গিয়েছে। সেটা দিয়ে ওপরে উঠে মাথা নিচু করে হাঁটতে হচ্ছিল। সেখানে খোপ খোপ ঘর করা আছে। তার একটা দেখিয়ে শাহীন বললেন, 'এখানে ঘুমাবে। ওপাশে টয়লেট বাথরুম আছে। একমাসের মধ্যে এই রেস্টুরেন্টের বাইরে যাবে না। অবশ্য সাতদিন পরে চলে যেতে হলে আলাদা কথা। তোমার কোনো আইনসম্মত অধিকার নেই এদেশে থাকার। তাই বাইরে গেলে তুমি নিজেই বিপদে পড়বে। এই সাতদিন তোমাকে কোনো ডলার দেওয়া হবে না। সাতদিনের কাজ দেখার পর দিনে দশঘন্টার জন্যে কুড়ি ডলার দেওয়া হবে। তা থেকে পাঁচ ডলার কেটে নেওয়া হবে তোমার প্লেনভাড়া যতদিন শোধ না হয়। বুঝেছ?

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, এখন তুমি বিশ্রাম নাও। তোমার ইউনিফর্ম পাঠিয়ে দিচ্ছি। দুপুরের খাওয়ার সময় যখন নিচে নামবে তখন ইউনিফর্ম পরে নামবে।' মিস্টার শাহীন চলে গেলেন। স্যুটকেশ নামিয়ে বেশ চওড়া বেঞ্চিতে বসল তুষার। এখানে আলো জ্বলছে। বাইরের পৃথিবীর রোদ হাওয়া এখানে ঢোকে না। এই রেস্টুরেন্ট থেকে বের হওয়া চলবে না। জেলখানার গল্প শুনেছে সে। এ যেন সেই রকম আর একটা জেলখানায় সে ঢুকে পড়েছে।

হঠাৎ কান্না পেল তুষারের। দু'হাতে মুখ ঢাকল সে।

বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট জমে ওঠে দুপুরের সময়। যত বেলা বাড়ে তত ভিড়ও। এই রেস্টুরেন্টে চিকেন ভর্তার খুব নাম আছে। একটি তথ্য জানতে একটু সময় লাগল তুষারের।

শাহীন নেমে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিল সে। কান্না থেমে যাওয়ার পরে অদ্ভুত শূন্যতা। তার কাছে বৈধ প্রবেশপত্র নেই বলে সে একরকম বন্দি হয়ে থাকবে এখানে। সেই সময় একজন নিচ থেকে উঠে এল, 'এই নিন, আপনার বিছানার চাদর আর কম্বল। আর এই হল ইউনিফর্ম। শাহীনভাই বলেছেন দুটোর মধ্যে রেডি হয়ে নিচে নামবেন।'

লোকটা জিনিসগুলো একপাশে রেখে একটু দাঁড়াল, 'ঢাকা থেকে কবে রওনা হয়েছেন? অনেকদিন নাকি?'

' না। ঢাকা থেকে টরেন্টো, টরেন্টো থেকে বাফেলো, সেখানে থেকে এখানে টানা আসছি।' তুষার জবাব দিয়েছিল।

'আপনার মুখের চেহারা বলছে তার চেয়ে বেশি খারাপ জার্নি করেছেন। এর মধ্যে ঘুম হয়নি নিশ্চয়ই। শুনুন, মুখে জল দিয়ে বাথরুম করে দু'ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিন। ওপরে খাবার নিয়ে আসা নিষেধ। নাহলে দিয়ে যেতাম।'

লোকটাকে ভাল লাগল তুষারের। সে হাসল।

'আমার নাম আজাদ। সরসন্দিতে থাকতাম।' আজাদ বলল, 'পরে কথা হবে। চলি।' সে চলে গেল।

পরিষ্কার হয়ে কম্বলে শরীর এলিয়ে দিয়ে কিন্তু ঘুম এল না। অথচ প্রচণ্ড ক্লান্তি শরীরে। এরকম অবস্থায় ঘুম আসাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তুষার তাকিয়ে থাকল। দিনে কুড়ি ডলার রোজগার করলেও এরা পাঁচ ডলার কেটে নেবে। ঢাকা টরেন্টোর বিমানভাড়া কত তার জানা নেই। হয়তো এক হাজার ডলার। রোজ পাঁচ ডলার করে কাটলে ছয় সাত মাসে শোধ হয়ে যাওয়া উচিত। আলতাফ সাহেব অবশ্য বলেননি যে প্লেন ভাড়া তিনি দিচ্ছেন তা বেতন থেকে কেটে নেবেন। তার কাগজপত্র নেই বলে যা প্রাপ্য তার চার ভাগের এক ভাগ এরা তাকে দিচ্ছেন। এটা অবশ্য অযৌক্তিক নয়। খামোকা পকেটের টাকায় তিনি তাকে টরেন্টোতে পাঠালেন কেন? কিন্তু সেটা যদি তাকে বলত তাহলে ভাল লাগত।

এখন দাঁড়াচ্ছে, প্রতিদিন সে পনেরো ডলার হাতে পাবে। তিরিশ দিন যদি তার কাজ থাকে তাহলে মাসে সাড়ে চারশো ডলার। তার নিজের তো কোনো খরচ নেই। সে যদি মাসে চারশো ডলার দেশে পাঠাতে পারে তাহলে ওটা কুড়ি হাজার টাকা হয়ে যাবে। আর অত টাকার কথা বাবা মা ভাবতেই পারবে না। কিন্তু ডলার সে পাঠাবে কী করে? আর, বাংলাদেশের মানুষ ডলার ভাঙায় কোথায়? তাদের গ্রামে তো ডলার ভাঙাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। তুষার ঠিক করল আজাদের কাছে ব্যাপারটা জেনে নেবে। লোকটাকে ভাল বলে মনে হয়েছে তার।

ঘুম আসেনি। দুটোর একটু আগে ইউনিফর্ম পরল সে। কালো প্যান্ট, সাদা ফুল শার্ট এবং তার গলায় একটা বো পিন দিয়ে লাগানো। এগুলো তার শরীরের সঙ্গে চমৎকার ফিট করে গেল। নিজের জুতো পরে নিচে নেমে সে অবাক। প্রতিটি টেবিল ভর্তি। মানুষজন খাবার খাচ্ছে। এই রেস্টুরেন্টে টেবিলের সংখ্যা তিরিশ। গুনল তুষার। এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে সে দেখছিল কাস্টমারদের মধ্যে যদিও বেশির ভাগ এশিয়ার লোক কিন্তু সাদা চামড়ারাও আছে। তার মত ইউনিফর্ম পরে ছেলেরা টেবিলে টেবিলে ঘুরে অর্ডার নিচ্ছে, খাবার পরিবেশন করছে। কি বিনীত ভঙ্গিতে ওরা কাজ করছে।

এই সময় শাহীনভাই তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাকে আপাদমস্তক দেখে বললেন, 'গুড। কিন্তু জুতোয় কালি করোনি কেন?'

'আজ্ঞে, কালি আমার কাছে ছিল না।'

'হুম্। কারো চেয়ে নেবে। শোনো, আজ তোমার প্রথম দিন। তাই আজ তুমি লক্ষ্য করে যাও, কীভাবে অন্য ওয়েটাররা কাজ করছে দ্যাখো। ট্রাই টু কপি দেম।' শাহীনভাই চলে গেলেন আর একজনের দিকে হাত নেড়ে।

ঘণ্টা তিনেক পুতুলের মত দাঁড়িয়েছিল তুষার। এর মধ্যে সে যে জ্ঞান সঞ্চয় করেছে তা এই রকম। নতুন কাস্টমার টেবিল এসে বসলে এগিয়ে গিয়ে বলতে হয়, 'গুড আফটারনুন স্যার। ওয়েল. ইউ ক্যান ট্রাই আওয়ার ডে'জ বেস্ট, চিকেন রেশমি কাবাব অ্যান্ড তন্দুরি।' যাকে বলা হয়েছিল সে বলল, 'ওঃ নো। আই ওয়ান্ট চিকেন ভর্তা। ও কে ? টু তন্দুরি রোটি অ্যান্ড চিকেন ভর্তা।

'চিকেন ভর্তা?'

'ইয়েস।'

অর্ডার শুনে হেসে বিনীতভাবে সেটা লিখে নিয়ে কাউন্টারে গিয়ে জানিয়ে দিলে কাউন্টার থেকে কিচেনে সেটা জানানো হয়। তারপর কিচেনের জানলা থেকে ট্রে-তে প্লেট চাপিয়ে পরিবেশন। এর মধ্যে জল পৌঁছে দিতে হয় টেবিলে। ড্রিংকসের অর্ডার নিতে হয়। যে ছেলেগুলো এই কাজ করছে তাদের খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে; তুষার লক্ষ্য করল এদের মধ্যে আজাদও রয়েছে।

তুষার চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওদের লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ দেখল একজন মেমসাহেব তার দিকে এগিয়ে আসছে। মেমসাহেব গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করল, 'লেডিস রুম?'

শব্দ দুটো বুঝতেই কয়েক সেকেন্ডে লাগল। তারপর মনে হল এখানে মেয়েদের জন্যে আলাদা ঘর থাকবে কেন? তাহলে কি আমেরিকায় মেয়েরা রেস্টুরেন্টে এসে আলাদা ঘরে খায়? ঢাকার রেস্টুরেন্টে পর্দা ঢাকা কেবিন আছে, এও কি সে-রকম? সে মাথা নাড়ল, 'আই ডোন্ট নো।'

'ইউ ডোন্ট নো! মাই গড।' ভদ্রমহিলা চেঁচিয়ে উঠতেই একজন ওয়েটার ছুটে এল। প্রশ্নটা জেনে দেখিয়ে দিল কোন করিডোর দিয়ে যেতে হবে। মহিলা চলে গেলে সে হেসে তুষারকে বলল, 'লেডিস রুম মানে মেয়েদের টয়লেট।' বলে চলে গেল।

লজ্জায় পড়ল তুষার। এটা তার অনুমান করা উচিত ছিল। সেদিনই আরও আধঘণ্টা বাদে তার নতুন অভিজ্ঞতা হল। একটি অল্পবয়সী মেয়ে, বছর আঠারো হবে. এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'লু?'

লু? মানে বুঝতে পারল না তুষার। সে জিজ্ঞাসা করল। 'লু?'

'ইয়া।'

'হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?'

মেয়েটা কাঁধ নাচাল। তারপর ফিরে গেল টেবিলে। সেখানে আরও দু'জন মেয়ে বসেছিল। ওরা অর্ডার দিয়েছে, খাবার পায়নি তখনও। মেয়েটি ফিরে গিয়ে বলতে তার বান্ধবীরা হেসে গড়িয়ে পড়ল। এই সময় আজাদ পাশ দিয়ে যেতে তুষার তাকে ডাকল, 'ভাই, লু মানে কী?'

'কোনো মহিলা জিজ্ঞাসা করেছে?' আজাদ দাঁড়াল।

'হ্যাঁ।'

'বাথরুমে যেতে চায়। ওটা চলতি কথা।' আজাদ চলে গেল। ফাঁপরে পড়ল তুষার। বাংলাদেশে ইংরেজি শেখানোর সময় এই শব্দটা কেউ তাদের শেখায়নি। লেডিস রুম তবু বোঝা যায় কিন্তু লু শুনলে সে কী করে বুঝবে? কিন্তু মেয়েটার নিশ্চয়ই খুব প্রয়োজন ছিল, ওকে বলা দরকার মেয়েদের টয়লেট কোথায়? সে তাকাল। এত বড় রেস্টুরেন্টের সর্বত্র ব্যস্ততা। তুষার এগোল টেবিলটার দিকে। ওকে এগোতে দেখে মেয়ে তিনটে গম্ভীর হয়ে গেল। তুষার বলল, 'আই অ্যাম সরি। আই অ্যাম নিউকামার হিয়ার। প্লিজ কাম, আই উইল শো ইউ লেডিস রুম।'

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'ইউ উইল শো মি লেডিস রুম?'

তুষার মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

মেয়েটি কাঁধ নাচিয়ে বান্ধবীদের দিকে তাকাল। একজন জিজ্ঞাসা করল, 'ডু ইউ ওয়ান্ট টু টেক হার ইনসাইড?'

তুষার বুঝতে পারল না। সে কেন মেয়েটাকে টয়লেটের মধ্যে নিয়ে যাবে? সে মাথা নাড়ল। 'নো। আই ক্যান শো হার দ্য ডোর।'

মেয়েটা উঠে দাঁড়াল, 'সো নাইস অফ ইউ।'

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে তুষার দেখল মেয়েটা আসছে না। সে জিজ্ঞাসা করল 'আর ইউ কামিং?'

সঙ্গে সঙ্গে একটা চিল-চিৎকার উঠল। তিনটে মেয়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। সমস্ত রেস্টুরেন্ট এখন এদিকে তাকিয়ে। তুষার বুঝতে পারছিল না সে কি অন্যায় করেছে। মেয়ে তিনটের মুখে এখন কাঠিন্য স্পষ্ট, চোখে ঘৃণা।

মিস্টার শাহীন ছুটে এলেন, 'এক্সকিউজ মি। কী হয়েছে বলুন!'

একটি মেয়ে আঙুল তুলল, 'এই লোকটা আপনাদের কর্মচারি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এখনও, ও কিছু বলেছে?'

'হ্যাঁ। ও আমার বান্ধবীকে ইনসাল্ট করেছে।'

'সেকি? কী করেছে ও?'

'প্রথমে আমাদের বান্ধবীকে ও টয়লেট দেখায়নি। তারপর একে বলেছে ও লেডিস রুম দেখাবে। অ্যান্ড দেন!' মেয়েটা থেমে গেল।

মিস্টার শাহীন জিজ্ঞাসা করলো, 'দেন—?'

তৃতীয়জন বলল, 'হি আসকড হার হোয়েদার সী ইজ কামিং অর নট? লুক, ইট মাস্ট অ্যাডমিট দ্যাট—!'

দু'হাত তুলে মেয়েটাকে থামিয়ে দিলেন মিস্টার শাহীন—সরি, আই বেগ ইউর এপোলজি। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন। আজাদ, কাম হিয়ার, অ্যান্ড শো হার দা লেডিস রুম।' আজাদ ছুটে এসে সম্ভ্রম দেখিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেল।

মিস্টার শাহীন ঘুরে দাঁড়ালেন। 'ইউ আর স্যাক্ড।'

স্যাক্ড মানে যে চাকরি চলে যাওয়া সেটা অনুমান করতে পারল তুষার। ঢাকায় যারা বাংলা স্কুলে পড়েছে তারা ইংরেজিটা কম বোঝে। বুঝলেও বলতে সঙ্কোচ হয়।

কাউন্টারের পাশে একটা ছোট ঘরে মিস্টার শাহীন তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'তোমাকে আমার দরকার নেই।'

তুষার করুণ গলায় জিজ্ঞাসা করল 'আমি কি অন্যায় করেছি বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারছ না? আশ্চর্য! তুমি ওই মহিলাকে অপমান করেছ!'

'আমি? এ আপনি কী বলছেন স্যার! আমি কেন অপমান করব?'

'তুমি ওঁকে কী জিজ্ঞাসা করেছ?'

'উনি যে বাথরুমে যাবেন আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। লু মানে যে ওই তা দেশে থাকতে কখনও শুনিনি। যখন বুঝতে পারলাম তখন বললাম, চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি। উনি আসছিলেন না, দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আর ইউ কামিং? বলুন, এর মধ্যে আমি ওঁকে অপমান কীভাবে করলাম?' বেশ উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল তুষার কথাগুলো বলায় সময়।

চোখ বড় বড় করে তুষারের কথা শুনে দুহাতে মাথা চেপে ধরলো মিস্টার শাহীন, 'সর্বনাশ! এরকম ইংরেজি তুমি কোথায় শিখলে?'

'কেন? আমি কি ভুল বলেছি?'

'তুমি আর ইউ কামিং বলেছ?'

'হ্যাঁ। আমি যাচ্ছি আই অ্যাম গোয়িং, আমি আসছি আই অ্যাম কামিং। তুমি কি যাচ্ছ? আর

ইউ গোয়িং? তুমি কি আসছ? আর ইউ কামিং? স্কুলে তো এইসব শেখানো হয়েছিল। আমি তো কোনো ভুল ইংরেজি বলিনি।' জোর দিয়ে বলল তুষার।

হতাশ হয়ে হাত নাড়লেন মিস্টার শাহীন, 'তোমাকে যে ইংরেজি শেখানো হয়েছিল তার যে অনেক মানে হয় সেটা বলা হয়নি। দয়া করে ওই শেখা ইংরেজি এখানে বলতে যেও না। আমার এমন কপাল যে তোমার মত গাঁইয়াকে এখানে মানুষ করতে হবে।'

তুষার মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। তার কথায় কেন মেয়েটি অপমানিত হয়েছে তা তখনও তার মাথায় ঢুকছিল না। মিস্টার শাহীন তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। আর একটা চান্স দিলাম। তুমি ওই কাউন্টারের পাশে গিয়ে দাঁড়াও। আজ ওইখানে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করো কীভাবে কাজকর্ম হয়। কিন্তু খবরদার, কারও সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলবে না।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল তুষার।

কাউন্টারটা বড়। তার পেছনের দেওয়ালে নানান রকমের মদ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কাউন্টারে দু'জন বসে আছেন। একজন টাকা-পয়সার হিসেব রাখছেন আর একজন ওয়েটারদের নিয়ে আসা অর্ডার কিচেনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন মিস্টার শাহীন একপাশে এসে দাঁড়ালেন। খদ্দের মিস্টার শাহীনের পরিচিত। কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে তারা মিস্টার শাহীনের সঙ্গে দুটো কথা বলে টেবিলে যাচ্ছে।

রাত বারোটায় শেষ খদ্দের চলে গেলে দোকান বন্ধ হল। যারা বাইরে থেকে কাজ করতে এসেছিল তারা চলে গেল। তুষার দেখল সে ছাড়া আর তিনজন থেকে গেল রেস্টুরেন্টে। যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে মিস্টার শাহীন তার সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'আজ সব দেখেশুনে নিলে?'

মাথা নাড়ল তুষার, হ্যাঁ।

'কাল থেকে কোন কাজটা করতে পারবে?'

'আমি ক্যাশিয়ারের কাজ করতে পারি।'

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলে মিস্টার শাহীন, 'তুমি কি কমার্সের ছাত্র?'

মাথা নাড়ল তুষার, 'না।'

'বুকস্ অফ অ্যাকাউন্টস, ব্যালান্স শিট বানাতে পারবে?'

তুষার জবাব দিল না। সে ভেবেছিল ক্যাশিয়ারের কাজ শুধু টাকা গোনা।

'তাছাড়া পুরো ব্যবসাটা নির্ভর করে ক্যাশিয়ারের সততার ওপর। তোমাকে তো আমি চিনিই না। মিস্টার হোসেন হুকুম দিয়েছেন তোমাকে যেন আমি রেস্টুরেন্ট ম্যানেজমেন্ট শেখাই। তুমি এক লাফে গাছে উঠতে চাও?' জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।

যে দুজনকে সকালবেলায় সে এখানে দেখেছিল তাদের একজন দোকানের শাটার নামিয়ে আলো নিভিয়ে দিল। খুব খিদে পেয়েছে তো?'

আধঘন্টা পরে ওরা খেতে গেল। কিচেনের ভেতর একটা টেবিলে তন্দুরি রুটি আর চিকেন। এত মুরগির মাংস একসঙ্গে তুষার কখনও খায়নি। আর ঠ্যাংগুলোর সাইজ যে এত বড় হয় তা ঢাকায় কখনও ভাবতে পারত না। অথচ রান্না হয়েছে অতি উপাদেয়, মাংস একেবারে তুলতুলে। তার খাওয়া দেখে একজন বলল, 'বাংলাদেশ থেকে পেট খালি করে এসেছ নাকি?'

তুষার লজ্জা পেল। কিন্তু সত্যি তার খিদে পেয়েছিল। আজাদ ছাড়া বাকি দু'জনের সঙ্গে আলাপ হল। একজন আবদুল আর একজন আনোয়ার। এদের বাড়ি চট্টগ্রামে। এরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল তখন কিছুই বুঝতে পারছিল না সে। সিলেট এবং চট্টগ্রামের যে সমস্ত ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত তাদের নিজস্ব কথাবার্তা এইরকম ছিল।

খাওয়া শেষ হয়ে ওরা সিগারেট ধরাল। আজাদের বাড়িয়ে দেওয়া সিগারেট সে নিতে অস্বীকার

করলে আনোয়ার বলল, 'বাঃ, আপনি তো দেখছি আমেরিকায় বেশ মানিয়ে যাবেন। এখানে বেশিরভাগ ছেলেরা সিগারেট খায় না।'

আবদুল বললল, 'শরীর ভাল রাখতে চায়।'

তুষার বলল, 'আমার বন্ধুরা খায়। আমার পয়সা ছিল না বলে খেতাম না।'

আজাদ বলল, 'তাহলে তো মদ খাওয়া হত না।'

'না-না। তাছাড়া আমরা ছাত্র ছিলাম।'

আনেয়ার বলল, 'কি বলো ভাই। কত ছাত্র এখানে এসে বোতলের পর বোতল ওড়ায়! বাপের পয়সায় মদ খেতে খুব আরাম পায়।'

আজাদ বলল, 'এখানে সোমবার রেস্টুরেন্ট বন্ধ থাকে। সেদিন আমরা মদ খাই। কাজ থাকে না বলে ওইটুকু আরাম করি।'

নিচের আলো নিভিয়ে ওরা ওপরে চলে এল। আনোয়ার আর আবদুল তাদের খোপে চলে গেলে আজাদ এসে বসল তুষারের পাশে। তুষার তাকে জিজ্ঞাসা কবল, 'তুমি এখানে কত বছর আছ?'

'তিন বছর।'

'বাইরে যাও না?'

'যাই। সোমবার। নিজের রিস্কে যেতে হয়। ধরা পড়লে শাহীনভাই কোনো হেল্প করবেন না। আমি অবশ্য এখানে বেশিদিন থাকব না।'

'কোথায় যাবে?'

'শিকাগো। ওখানকার স্টেটের নিয়ম আলাদা। ধরা পড়লে কেস হয়। যতদিন কেস চলে ততদিন ওয়ার্কিং পারমিট দেয়। ভাল উকিল ধরতে পারলে দশ বারো বছর পার করে দেওয়া যায়। কদ্দূর পড়েছ?'

'আমি ব্যাচেলার ডিগ্রি নিয়েছি।'

'আরে ব্বাস! তাহলে তো তুমি শিক্ষিত।'

তুষার শুনে হাসল, 'দেশে ওই শিক্ষার কোনো মূল্য নেই। তুমি কিভাবে এসেছ?'

'ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে এসেছিলাম, আর ফিরে যাইনি।'

'তোমাকে ট্যুরিস্ট ভিসা দিয়েছিল?'

'কেন দেবে না? আমার বউ ছেলেমেয়ে আছে।'

'ও।' তুষার ভাবতে পারছিল না এত অল্পবয়সে আজাদ কী করে ওইসব সম্পত্তি অর্জন করল।

আজাদ হাই তুলল, 'ওয়ার্কিং পারামিট থাকলে যা পেতাম এখন তার চার ভাগের একভাগ পাই। কী করা যাবে। শালা এই রেস্টুরেন্টের বাইরে যে জীবন আছে, তা সপ্তাহে একদিনের বেশি দেখতে পাই না।'

'আমরা যে এখানে আছি তা পুলিশ জানতে পারে না?'

'সব জানে। শাহীনভাই-এর সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে।'

'কিন্তু এই জায়গায় রাস্তাঘাট দোকানপাট সব চেনা বেশ। অনেককে বাংলায় কথা বলতে দেখলাম। আমেরিকা বলে মনে হয় না।'

'ঠিক। জায়গাটাকে বাংলাদেশি, ইন্ডিয়ান আর পাকিস্তানীরা একদম নিজেদের দেশ বানিয়ে ফেলেছে। বিয়ে করেছ?'

মাথা নাড়ল তুষার, 'না।'

'প্রেম?'

চট করে দিলারার মুখ মনে পড়ে গেল। দিলারা কি এখনও ঢাকায় আছে? সে জবাবে শুধুই হাসল।

'মেয়েমানুষের দরকার হলে আবদুলকে বলো।'

'কীরকম?'

'ওর প্রচুর জানাশোনা আছে। প্রত্যেক সোমবার যায়।'

'তুমি যাও না?'

'না।' আজাদ মাথা নাড়ল, 'বউটার কথা মনে পড়ে। খুব ভাল মেয়ে সে। তাছাড়া গেলেই তো খরচ। সেটা বাঁচিয়ে দেশে পাঠালে ওরা আর একটু আরামে থাকতে পারবে। বাচ্চাটা ভাববে তার আব্বু নেই কিন্তু আব্বুর পাঠানো টাকায় তারা খুব ভাল আছে। এটাই আমার শান্তি।' আজাদ উঠে দাঁড়াল, 'চলি। ঘুম পাচ্ছে। তুমি শুয়ে পড়।'

আজাদকে খুব ভাল লাগল তুষারের। কিন্তু মনের মধ্যে তখন দিলারার মুখ। হঠাৎ একটা কাঁপুনি এল শরীরে, দিলারাকে তার খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল।

দিন দশেকের মধ্যেই তুষার রেস্টুরেন্ট জীবনের আদবকায়দার সঙ্গে চমৎকার পরিচিত হয়ে গেল। এই দশদিন সে মনোযোগ দিয়ে প্রতিটি কাজকর্ম খুঁটিয়ে দেখেছে। কাস্টমার এলে কীভাবে তাকে সম্ভাষণ করতে হয়, সবিনয়ে খাবারের অর্ডার নিতে হয় এবং খাওয়ার সময় যাতে অসুবিধে না হয় সেদিকে নজর রাখার ব্যাপারটায় সে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠল। একমাত্র অসুবিধে হল ভাষা। এদের ইংরেজি বুঝতে তার খুব সমস্যা হচ্ছিল। তাই সে প্রথমে রেস্টুরেন্টের মেনুটা প্রায় মুখস্থ করে ফেলল। এর ফলে উচ্চারণ অস্পষ্ট হলেও সে বুঝতে পারছিল কাস্টমার ঠিক কী চাইছে। তার সহকর্মীরা মানুষ মন্দ নয়। তারাও তাদের শেখা ইংরেজির সঙ্গে ওকে পরিচয় করে দিয়েছে দিনের বেলায়।

সাতদিন হয়ে গেলে মিস্টার শাহীন তাকে ডেকে পাঠালেন। 'শোনো তুষার, তোমার প্রগ্রেস খারাপ নয়। কিন্তু আরও ইমপ্রুভ করতে হবে। যা হোক, তোমার সঙ্গে কথা হয়েছিল দিনে কুড়ি ডলার করে পাবে আর তা থেকে পাঁচ ডলার কেটে রাখা হবে তোমার প্লেনের টিকিটের দাম হিসেবে। এখন বলো, তুমি টাকাটা কীভাবে নিতে চাও?'

তুষার মাথা নাড়ল, 'আপনি যেমন বলবেন!'

মিস্টার শাহীন ওর মুখের দিকে তাকালেন, বোধহয় বুঝতে চেষ্টা করলেন মতলবখানা কী! তারপর বললেন, 'তুমি উইকলি পেমেন্ট নিও। তাতে একসঙ্গে একশ পাঁচ ডলার হাতে পাবে। কী করে দেশে টাকা পাঠাতে হয় অন্যদের কাছে জেনে নিও।'

তুষার মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

মিস্টার শাহীন আর একটু ভাবলেন, 'আমি তোমাকে একটা উপদেশ দিচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানকার ইংরেজিটা শিখে নাও। ইংরেজি ভাষাটা লেখার সময় মোটামুটি এক কিন্তু বলার সময় জায়গা বিশেষে বদলে যায়। যেমন ঢাকায় আমারা যে বাংলা বলি কলকাতায় তা বলে না। তুমি যখন এখানে কাজ করবে তখন এখানকার ভাষাটা তোমায় শিখতে হবে। এটা দু'-রকম ভাবে শেখা যায়। তোমাকে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে। তাদের সঙ্গে অনর্গল কথা

বলতে হবে, লজ্জা পেলে চলবে না। আর একটা উপায় হল, স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসে ভর্তি হওয়া। সকালে যখন তোমার কোনো কাজ থাকে না তখন যেতে পার। এই জ্যাকসন হাইটেই আছে। মাস তিনেক শিখতে কিছু ডলার দিতে হবে কিন্তু তাতে ভাল কাজ পাবে।'

তুষার আবার মাথা নাড়ল, 'আপনি যা বলবেন।'

'আমি কী বলব? তুমি কী করবে সেটা তুমিই ঠিক করবে।'

'এখান থেকে বাইরে বের হলে বিপদ হবে না তো?'

'বিপদ? কীসের বিপদ?' মিস্টার শাহীন অবাক হলেন।

'ভিসা ছাড়া আছি এদেশে—'

ও হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছি। সেদিন তোমাকে আমি পুলিশের কথা বলেছিলাম। আসলে পুলিশই তো সবসময় অপরাধীদের ধরে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটু অন্যরকম। তুমি রাস্তাঘাটে ভদ্রভাবে আইন মেনে চললে, পুলিশ তোমাকে কিছু বলবে না। এদেশে বেআইনিভাবে যারা থাকে তাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেয় অভিবাসন দপ্তর। ইংরেজিতে বলে ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট। জ্যাকসন হাইটে যে কিছু এমন লোক আছে তা তারা জানে। না জানলে লটারি করে গ্রিনকার্ড দিত না। ওরা ইচ্ছে করলে তোমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। কিন্তু সে কারণে আর ভয় পাওয়ার দরকার নেই।' মিস্টার শাহীন বললেন।

'ঠিক আছে। আপনিই ভেবে বলেন আমার কী করা উচিত, আমি তাই করব।' এই আত্মসমর্পণে মিস্টার শাহীন খুব খুশি হলেন। পরের দিন দোকানে এসেই তিনি ওর হাতে গত সপ্তাহের মজুরি বাবদ একশ পাঁচ ডলার দিয়ে দিলেন। দিয়ে বললেন, 'তুমি তো একেবারে অশিক্ষিত নও। আমাদের দেশের গ্র্যাজুয়েট। তোমাকে স্পোকিং ক্লাশে ভর্তি হতে হবে না। তুমি বরং সকালবেলায় রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াও।'

রেস্টুরেন্টের সহকর্মীরা তুষারকে সাবধান করল। মিস্টার শাহীন যখন গরম থাকেন তখন তাঁর চরিত্র বোঝা যায়। কিন্তু তিনি নরম হওয়া মানে যে কোনো পথে বিপদ আসতে পারে। তুষারের মনে হল ওরা একটু বেশি কথা বলছে। মিস্টার শাহীন যদি ক্ষতি করতে চান তো এখনই ক্ষতি করতে পারেন।

কিন্তু পরের দিন বিকেলে প্রথমবার অভিজ্ঞতাটা হল। কাস্টমারকে সে প্রথমে ইন্ডিয়ান বলে ভুল করেছিল। তিনি চেয়ারে বসার পর বিনয়ের সঙ্গে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনার সেবা আমি কীভাবে করতে পারি?'

ভদ্রলোক হেসে বললেন 'এখানে কত ডলার পাও?'

'মানে?'

'ঘন্টা পিছু এরা কত দেয় তোমাকে? তুমি তো তুষার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'প্রশ্নের জবাব দাও।'

'দু'ডলার স্যার।'

তোমার মত হ্যান্ডসাম স্মার্ট ছেলে আমার দরকার। আমি ম্যানহাটনে একটা রেস্টুরেন্ট কিনেছি। এখানে খেয়ে গিয়ে এক বন্ধু আমাকে তোমার কথা বলেছে। এই নাও কার্ড। টেলিফোন কোরো। কার্ডটা রেখে ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে রেস্টুরেন্টে থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এত অবাক হয়ে গিয়েছিল তুষার যে কার্ডটা তুলে নিয়ে পকেটে গোছাতেও ভুলে গিয়েছিল। এই সময় একজন এসে বলল, 'শাহীনভাই আপনাকে ডাকছে।'

কাউন্টারের কাছে যেতেই মিস্টার শাহীন জিজ্ঞাসা করলেন. 'কাস্টমার কিছু না খেয়ে বেরিয়ে গেল কেন? কী হয়েছে?'

'আমাকে উনি কিছু বলেননি!'

'তোমার হাতে ওটা কী?'

'কার্ড। উনি দিয়ে গেলেন।'

'দেখি ওটা।' হাত বাড়ালেন মিস্টার শাহীন। কার্ডখানা নিয়ে ভাল করে পড়ে বললেন, 'তোমাকে ঠিক কী বলেছে লোকটা?'

'তিন ডলার ঘণ্টায় কাজ করব কিনা জিজ্ঞাসা করছিল।'

'তুমি কী বলেছ?'

'আমি কোনো জবাব দিইনি।'

'গুড। এইসব লোক ডেঞ্জারাস। বেশি ডলার দেবার লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে কাজ ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বিপদে ফেলবে। শোনো, এরপর এমন কেউ এই প্রস্তাব দিলে সোজা আমাকে এসে বলবে। মিস্টার আলতাফ হোসেন তোমার প্লেনের টিকিটের দাম দিয়েছেন। তাঁর টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত তুমি কোথাও যেতে পারো না।'

মাথা নেড়ে চলে এসেছিল তুষার। পরে সহকর্মীরা বলেছিল এটা বাড়াবাড়ি। হ্যাঁ, টিকিটের দাম আলতাফ হোসেন দিয়েছেন বটে কিন্তু অন্য জায়গায় ভাল চাকরি করে সেটা তো শোধ করা যেতে পারে। এখানে ক্রীতদাসের মত পড়ে থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই।

সেদিন সন্ধের পর দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল। রেস্টুরেন্ট তখন জমজমাট। ইতিমধ্যে তুষার লক্ষ্য করেছে যে এখানে এসে অনেকেই মদ্যপান করে কিন্তু একজন লোক একা টেবিল বসে পরপর ছয় গ্লাস মদ খেয়ে গেল। শেষের দিকে তার কথা বেশ জড়িয়ে আসছিল। টয়লেটে যাওয়ার সময় পা টলছিল। লোকটা কথা বলছিল যে ইংরেজিতে সেটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি তুষারের। স্যুট এবং টুপি পরে বসেছিল লোকটা। রেস্টুরেন্টে ঢুকেও টুপি খোলেনি।

সপ্তম গ্লাসের অর্ডার দেওয়ার পর তুষার কাউন্টারে গিয়ে জানাল ঘটনাটা। মিস্টার শাহীন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আগের বিলগুলো কোথায়?'

'ওঁর সামনে একটা গ্লাসে রেখে দিয়েছি।'

'ওঁকে বলো আমাদের নিয়ম হল ছয় পেগ হুইস্কির পর বিল পেমেন্ট করতে হবে। করলে আবার সার্ভ করব।'

ঠিক তখনই খলখল শব্দ করে চারজন ঢুকল। তিনজন পুরুষ আর একজন মহিলা। মহিলার পরনে প্যান্ট এবং কায়দা করা শার্ট। রেস্টুরেন্টে ঢুকেই মহিলা কোমরে দুহাত রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন টেবিলে বসব? আমার টেবিল খালি নেই কেন?'

মিস্টার শাহীন দ্রুত বেরিয়ে এলেন, 'তুমি যে আসবে তা জানলে আমি ঠিক রিজার্ভ করে রাখতাম। আচ্ছা, আপাতত, ওই টেবিলে তোমার বসো, খালি হলেই আমি তোমার টেবিলের ব্যবস্থা করে দেব।'

ভদ্রলোক নিজে গিয়ে চেয়ার টেনে ওদের বসিয়ে দিলেন। ওই টেবিলে তুষার সার্ভ করছে না। প্রথমে ধন্দ লেখেছিল কিন্তু মমকে চিনতে সময় লাগেনি তার। মমতাজ। আলতাফ সাহেবের মেয়ে। এই রেস্টুরেন্টের মালিকান। কিন্তু এখানে আসার পর সে ওকে এই প্রথম দেখতে পেল। মম সম্ভবত তাকে চিনতে পারেনি। ইউনিফর্ম মানুষকে বোধহয় অনেকটাই বদলে দেয়।

তুষার সেই লোকটির কাছে ফিরে গিয়ে বলল, 'স্যার, আপনার ছয় পেগ হুইস্কি হয়ে গিয়েছে।

যদি কিছু মনে না করে পেমেন্ট করে দেন তাহলে সুবিধে হয়।' সে ইংরেজিতে কথাগুলো বলেছিল।

লোকটা মুখ তুলল। জড়ানো গলায় বাংলায় বলল, 'কেন? আমি টাকা মেরে দেব?'

তুষার দ্রুত মাথা নাড়ল। 'না না। এখানকার নিয়ম।'

'ও, নিয়ম হলে মানতেই হবে। কত হয়েছে গুনে বলো।'

বিলগুলো গ্লাস থেকে নিয়ে যোগ করে পরিমাণটা জানাতেই অতিরিক্ত কিছু ডলার টেবিলের ওপর ছুড়ে দিয়ে লোকটা বলল, 'বাকিটা তোমার। ওকে?'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

'আমার আর ড্রিঙ্ক লাগবে না। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।'

'বলুন স্যার।'

'ওই যে টেবিল যে মেয়েটি এই মাত্র এল তাকে গিয়ে বলবে সেলিম সাহেব আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাড়াতাড়ি যাও।'

সমস্যায় পড়ল তুষার। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ওনাকে চেনেন?'

'চিনি মানে? কেউ কাউকে কখনও চিনতে পারে? আমার ওর সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছে করছে। এ দেখি বেশি কথা বলে, যাও।' হাত নাড়ল লোকটা।

মমতাজের টেবিলে না গিয়ে সোজা মিস্টার শাহীনের কাছে এসে ঘটনাটা জানাল তুষার। মিস্টার শাহীন ডোর কিপারকে ডেকে নির্দেশ দিলেন। এই লোকটা রোজ সন্ধে থেকে রেস্টুরেন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত দরজায় থাকে। কারও সঙ্গে কথা বলে না। দেখলেই বোঝা যায় প্রচণ্ড শক্তি ধরে। পকেট থেকে কী একটা বের করতে করতে ডোরকিপার সোজা লোকটার পেছনে চলে গেল। তারপর ঝটপট ওর ঠোঁটের ওপর চওড়া টেপ লাগিয়ে দিয়ে শরীরটাকে অদ্ভুত কায়দায় তুলে নিল। লোকটাকে তুলতেই তার টুপি পড়ে গেল মাটিতে। কিন্তু ততক্ষণে ডোর-কিপার শরীরটাকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে বাইরে। যারা পেছন ফিরে বসেছিল তারা টের পেল না। যারা দেখতে পেল তারা মাথা নাড়ল। ভাবল মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছে।

শুধু একজন উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে হাততালি দিল।

তুষার তাকাতেই দেখল মমতাজ তাকে ইশারায় ডাকছে।

খুব বিনীত ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে তুষার জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়েস ম্যাডাম?'

হকচকিয়ে গেল মমতাজ, তারপরই সজোরে হেসে উঠল, 'মাই গড, এমনভাবে কথা বলছ যেন তুমি আমাকে কখনও দ্যাখোনি।'

তুষার আড়চোখে দূরে দাঁড়ানো মিস্টার শাহীনকে দেখল, 'ম্যাডাম আমি এখন এই রেস্টুরেন্টে চাকরি করছি, আপনি আমাদের কাস্টমার।'

সঙ্গে সঙ্গে মুখ শক্ত হয়ে গেল মমতাজের, 'না আমি কাস্টমার নই। আমি এই রেস্টুরেন্টের একজন মালিক।'

মিস্টার শাহীন এগিয়ে এলেন, 'কী হয়েছে? এনি প্রবলেম?'

'এই লোকটা জানে না আমি কে!' মমতাজ রুক্ষ গলায় বলল।

'ও নতুন এসেছে। তোমার আব্বু ওকে পাঠিয়েছে চাকরি দিয়ে।'

'কী রকম ইমপ্রুভ করছে ও?'

'ভাল, বেশ ভাল।'

'ওর টেবিলের কাস্টমারকে বের করে দিতে হল কেন?'

'এমন কিছু ব্যাপার নয়। লোকটা বেশি মদ খেয়ে ফেলেছিল!'

'ওকে বলুন বাইরে গিয়ে দেখতে লোকটা চলে গিয়েছে কি না! না গেলে একটা ট্যাক্সি ডেকে তুলে দিতে।' মমতাজ চেয়ারে বসল।

মিস্টার শাহীন তুষারকে ইশারা করলেন মান্য করতে।

রেস্টুরেন্টের বড় দরজা ঠেলে বেরিয়ে এসে তুষার দেখল চারপাশের আলো হিরে হয়ে জ্বলছে। কি সুন্দর লাগছে রাস্তাটা। এখন রাত হচ্ছে। কিন্তু রাস্তাটা বেশ ভিড়। একটা ছেলে তার সঙ্গিনীকে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, ভেতরে জায়গা পাওয়া যাবে?'

পরিষ্কার বাংলায় প্রশ্ন। তুষার বলল 'হ্যাঁ।'

ওরা খুশি হয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। তুষার চারপাশে তাকাল। কিন্তু সেই লোকটি কোথায়? সে নিশ্চিন্ত হল লোকটা চলে গেছে। ব্যাটা এতটাই মাতাল যে টুপির কথা খেয়াল নেই। সম্ভবত মমতাজকে দেখে ওর ভাল লেগেছিল। মদের ঘোরে সেটা সম্ভব। তুষারের খুব ইচ্ছে করছিল একটু হাঁটাহাঁটি করতে। সে যখন এই রেস্টুরেন্টের ভেতরে ঢুকেছিল তখন সকালবেলা। এই ক'দিন সে একটিবারের জন্যেও বাইরে বের হয়নি। এই হল আমেরিকা।

হঠাৎ উল্টো ফুটপাথে নজর গেল তুষারের। আরে! সেই লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কিন্তু লোকটার নজর রেস্টুরেন্টে দিকে। তুষার একটা কাজ খুঁজে পেল যা তাকে বাইরে থাকতে সাহায্য করবে। সে গাড়ি দেখে রাস্তা পার হয়ে লোকটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তুষার লক্ষ্য করল লোকটির যেটুকু ক্ষমতা তখনও রয়েছে তা সে রেস্টুরেন্টের দরজাব দিকে তাকিয়ে শেষ করল। সে যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তাও লোকটা লক্ষ্য করছে না।

তুষার জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দেব?'

লোকটা এবার ঘুরল। তাকে চিনতে পারল না। জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'আপনার এখন বাড়ি যাওয়া দরকার।'

একটা হেঁচকি তুলল লোকটা, 'নো। অনেকদিন পরে ওর দেখা পেয়েছি। কথা না বলে আমি বাড়ি যাব না।' গলার স্বর জড়ানো।

'কার দেখা পেয়েছেন?'

'আমার প্রেমিকা। গার্ল ফ্রেন্ড। মমতাজ।'

'উনি আপনার প্রেমিকা?'

'ইয়েস। আই লাভ হার।'

'আপনি তাহলে জানেন উনি কোথায় থাকেন!'

'জানি। কিন্তু সেখানে গেলে ও আমার সঙ্গে দেখা করবে না।'

লোকটি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারছিল না।

'আপনি এখন সুস্থ হন। সুস্থ অবস্থায় কথা বলবেন।'

'ভ্যাট! কে আপনি? যান এখান থেকে।' চিৎকার করে উঠল লোকটা।

'আমি আপনার উপকার করতে চাইছি।'

'আমার উপকার কেউ করতে পারবে না।'

এই সময় একটা গাড়ি মাথার ওপর আলো জ্বেলে ঠিক ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে একজন অফিসার নেমে এলেন, 'হে ম্যান, এনি প্রবলেম?'

প্রশ্নটা শোনামাত্র লোকটা হাঁটা শুরু করল। ওর পা ঠিকঠাক পড়ছিল না। পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসা করল। 'ইওর ফ্রেন্ড?'

মাথা নাড়ল তুষার, 'নো।'

তার খুব ভয় করছিল। এই অফিসার যদি তার পরিচয়পত্র দেখতে চায়? কিন্তু অফিসার কিছু না বলে আবার ড্রাইভিং সিটে ফিরে গেল। গাড়িটা এগিয়ে যেতে বুকের ধড়ফড়ানি কমল তুষারের। এই সময় সে দেখল মমতাজ এবং তার বন্ধুরা রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এসেছে। সামনেই পার্ক করা একটা গাড়িতে উঠে ওরা চলে যেতে রাস্তা পার হল তুষার। তার খুব মন খারাপ লাগছিল মাতাল লোকটার জন্যে। বেচারা কি প্রেম চেয়ে ব্যর্থ হয়ে দেবদাস হয়ে গেছে।

রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে চলে যাওয়ার আগে মিস্টার শাহীন তাকে ডেকে বললেন, 'কাল সকালবেলায় আমার বাসায় যাবে নাস্তা করতে।'

'আপনার বাসায়?'

'হ্যাঁ। হাঁটলে দশ মিনিট। সকাল সাড়ে আটটার সময় রেডি হয়ে রেস্টুরেন্টের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে, আমি এসে নিয়ে যাব। আর হ্যাঁ, এই দাওয়াতের কথা এখানকার কাউকে বলার দরকার নেই। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

'জ্বী।'

আরও আধঘন্টা বাদে অন্যদের সঙ্গে যখন তুষার খেতে বসেছে তখন টেলিফোন বাজল। তুষার খাওয়া ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল, 'হ্যালো। এখন রেস্টুরেন্ট বন্ধ। আপনি আগামী কাল ফোন করবেন।'

'তুষার আহমেদ আছে?' মেয়ের গলা।

খুব অবাক হয়ে গেল তুষার। কোনমতে বলল, 'হ্যাঁ। বলছি।'

'তুমি তুষার?'

'জী।'

'আমি মমতাজ বলছি।'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'কি বলুন বলুন করছ। তোমার মতবল কী? আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছ কেন? আমি কি তোমার কোনো ক্ষতি করেছি?'

'না-না।'

'তৈরি হয়ে নাও। আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি। তুমি রেস্টুরেন্টের বাইরে ওয়েট করবে।' টেলিফোন ছেড়ে দিল মমতাজ।

এরপর আর খাওয়া যায় না। সহকর্মীদের প্রশ্নের জবাব ভালভাবে দিতে পারছিল না তুষার, সে বাইরে যাবে শুনে সবাই রসিকতা করছিল। একজন বলল, 'খবরদার, আর যাই করো এইড্স নিয়ে এসো না।'

'আমি এইড্স আনতে যাব কেন?'

'মাঝরাতে টেলিফোন পেয়ে বের হচ্ছ। নিশ্চয়ই মেয়েমানুষের ফোন।'

'না না। আমার একজন পরিচিত।'

'তবু ভাল। মাস তিনেক আগে একটা মেয়ে ফোন করে এখানে আসতে চেয়েছিল। খুব সস্তায় সে আনন্দ দেবে। আমরা এইডসের ভয়ে রাজি হইনি।'

দশ মিনিট গেল। পায়চারি করতে করতে যখন সেটা আধঘন্টায় পৌঁছল তখন গাড়িটা পাশে এসে দাঁড়াল, 'উঠে পড়, জলদি।'

তুষার দেখল গাড়িটা ট্যাক্সি, পেছনের সিটে মমতাজ বসে আছে। তুষার দরজা খুলে পেছনে উঠে যেতেই ট্যাক্সি চলতে শুরু করল।

'কীরকম লাগছে আমেরিকা?'

'ভাল?'

'কী কী দেখলেন?'

'এখনও কিছু দেখিনি।'

'না দেখেই ভাল লাগল?' হাসল মমতাজ।

'আপনার ওই ভদ্রলোক ট্যাক্সিতে উঠল না!'

'ওর কথা কে জানতে চাইছে!'

'না মানে—!'

'শুনুন, আজ রাত্রে আপনার সঙ্গে আড্ডা মারতে এসেছি। অন্য কারও কথা শুনতে রাজি নই। ওই লোকটার সঙ্গে আমাব পরিচয় হয়েছিল বছরখানেক আগে। দু'দিন ঘুরতেই বুঝলাম ধান্দা খারাপ। সম্পর্ক রাখলাম না। সঙ্গে সঙ্গে ও মদ খেতে লাগল আর দাবি করল আমার প্রেমিক! ডিসগ্যাস্টিং।'

তুষার কিছু বলল না। মমতাজ একটা জায়গায় ট্যাক্সি দাঁড় করাল। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বলল, 'আসুন। এটা একটা সিঙ্গলস বার। এখানে আড্ডা মারতে ভাল লাগবে।'

ভেতরে এসে তুষার দেখল বেশি ভিড় নেই। কিন্তু যারা এসেছে তারা বসে আছে জোড়ায় জোড়ায়। মমতাজ একটা টেবিলে বসে বলল, 'এখানে যারা আসে তারা বন্ধুত্ব খোঁজে। কেউ কাউকে চেনে না। এখানে এসে বন্ধুত্ব হয়। প্রত্যেকেই অবিবাহিত অথবা ডিভোর্সি। সবাই চাকরি অথবা ব্যবসা করে। কী ভাবছেন?'

'কিছু না।'

'তুষার, রেস্টুরেন্টে চাকরি করতে ভাল লাগছে?'

'খারাপ কী!'

'কিন্তু কতদিন করবে?'

'জানি না।'

'অন্য কিছু করবে?'

'যেমন?'

'একটু ভাবতে হবে। আজ হঠাৎ আমার মনে হল তোমার সঙ্গে বুন্ধুত্ব করা যায়। এই আমেরিকার যেসব ছেলে আমার চারপাশে ঘোরে তাদের আর আমার ভাল লাগছে না। এদের সব আছে সারল্য নেই। তুমি আমার বন্ধু হবে?'

'কিন্তু—।'

'কোনো কিন্তু নয়। হাত মেলাও। আজ থেকে আমরা বন্ধু।' হাত বাড়িয়ে দিল মমতাজ।

এত রাতে মানুষ ঘর ছেড়ে আড্ডা মারতে বের হয়? ক্লাবের যা নিয়ম সেটা কি সবাই মানে? এইসব মহিলা এবং পুরুষেরা কি ব্যক্তিজীবনে একা? এখানে এসেছে বন্ধুত্বের খোঁজে? এরকম

জায়গায় মমতাজ তাকে নিয়ে এল কেন? ও কি এখানে আগেও এসেছে। ওকে নিশ্চয়ই বন্ধুত্ব খুঁজতে হয় না।

মমতাজ হাসল, 'আসলে এত রাত্রে গল্প করার জন্যে এই ধরনের ক্লাব খুব নিরাপদ। রাত তিনটে পর্যন্ত কেউ বিরক্ত করবে না। তুমি নিশ্চয়ই দেশে মদ খেতে না। এখানে বিয়ার খেতে পার, এরা বিয়ারকে মদ বলে না।'

না বলুক, তবু মমতাজের মত কোক নিল তুষার। মুখোমুখি বসে মমতাজ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার প্ল্যান কী?'

'বুঝলাম না।' তুষার জবাব দিল।

'সারাজীবন রেস্টুরেন্টের বেয়ারাগিরি করবে?'

'না।' মাথা নাড়ল তুষার, 'আমার তো কাগজপত্র নেই। সেগুলো না হওয়া পর্যন্ত। তাছাড়া আমাকে প্রতি মাসে বাড়িতে টাকা পাঠাতে হবে।'

'কীভাবে পাঠাবে?'

'আজাদরা যেভাবে পাঠায়।'

'আজাদ কে?'

'আমরা একসঙ্গে কাজ করি।'

সিগারেটের প্যাকেট বের করল মমতাজ, 'খাবে?'

মাথা পড়ল তুষার। এর আগে সে লন্ডন এয়ারপোর্টে মমতাজকে সিগারেট খেতে দেখেছে।

ধোঁয়া ছেড়ে মমতাজ বলল, 'আমি জানি আমাকে তোমার খুব খারাপ লেগেছে। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ যে আমি এই ছেলে কাল ওই ছেলের সঙ্গে প্রেম করে বেড়াচ্ছি।'

তুষার কথা বলল না। জবাব দেওয়ার দায় নেই কারণ মমতাজ প্রশ্ন করেনি।

'এখানকার কিছু ছেলে ঠিক এঁটুলির মত। কথা বললে ভাবে প্রেম করছি। দু'পা একসঙ্গে হাঁটলেই মনে করে বিছানায় শুতে রাজি আছি। এরা মেয়েদের সম্পত্তি ছাড়া কিছু মনে করে না। আজ যে ছেলেটাকে শাহীনভাই বের করে দিলেন সে ওদের একজন। আলাপ হতেই প্রেমে পড়ে গেল। আরে তুই একা প্রেমে পড়লে চলবে? যার প্রেমে পড়লি তার মনে প্রেম আসছে কিনা খোঁজ নিয়ে দ্যাখ? একেবারে টেক্ন অ্যাজ গ্রান্টেড। আমি সেটা বলায় জনাব মদ খাওয়ার পরিমাণ বাড়াল। যেন পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কোনো মেয়ে নেই।'

মমতাজ সিগারেট নেভাল। 'এখানে আমি একা। আমাকে সবরকম স্বাধীনতা বাবা দিয়েছেন। কেন দিয়েছেন তাও আমি জানি।'

'কেন?' প্রশ্ন না করে পারল না তুষার।

'নিজের কমপ্লেক্স থেকে। মা নেই। তিনি আমাকে স্বাধীনভাবে বড় করেছিলেন। আমার বাবা ব্যবসায়ী মানুষ। সেই সঙ্গে ডিকটেটার। তাঁর নানান রকমের সাধ আহ্লাদ আছে। আমার বাবা বলে তিনি নিজেকে সে সব থেকে গুটিয়ে নেননি। আপনি ওঁকে দেখেছেন। বাংলাদেশে যে দলই ক্ষমতায় আসে তাদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক একটুও খারাপ হয় না। মাঝে মাঝে নিউইয়র্কে আসেন। তিন দিন থেকেই চলে যান লাস ভেগাসে। সেখানে কী করেন তা জানতে চাই না আমি। আর এসবের জন্যেই উনি আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। তাঁর শুধু দাবি, আমার জন্যে তাঁকে যেন কোথাও কৈফিয়ত দিতে না হয়।' মমতাজ হাসল।

তুষার বলল, 'আপনি এখানে কী করেন?'

'কিছু না। নাথিং। কিন্তু একটা পরিকল্পনা আমার মাথায় এসেছে।'

'কীসের?'

'ব্যবসার!' মমতাজ বলল, 'দেশ থেকে এসে এখানে যারা ব্যবসায় নামে তারা হয় গ্রোসারি নয় একই নামের রেস্টুরেন্ট খোলে। কেউ কেউ একটু সাহসী হয়ে ট্রাভেল বিজনেসে নেমে যায়। সেখানে সবসময় অশুভ প্রতিযোগিতা। কত সস্তায় টিকিট দিতে পারছেন আর কতদিনের ক্রেডিট তার ওপর টিকে থাকা নির্ভর করবে। আমি এসবের মধ্যে নেই। আমি কান্ট্রি ক্লাব খুলতে চাই।

'কান্ট্রি ক্লাব কী ব্যাপার?'

'দেখুন, বাঙালিদের বারোমাসে তেরো পার্বণ আছে। তার জন্যে অনুষ্ঠান করতে হয়। কিন্তু ইদানীং আমেরিকানরা বাঙালিদের অনুষ্ঠানের জন্যে প্রেক্ষাগৃহ ভাড়া দিতে চাইছে না। ব্রুকলীন, কুইন্স, ম্যানহাটনের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান বাঙালিদের ভাড়া দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছে।'

'কেন?'

'প্রেক্ষাগৃহ নোংরা করার জন্যে। সিগারেটের টুকরোয় টয়লেট রেস্ট রুমকে নোংরা করা হয়, অডিটোরিয়ামে জঞ্জাল ফেলা হয়, তাছাড়া চেয়ার ছোঁড়াছুড়ি বা মারপিটের ঘটনা তো লেগেই আছে। কিছুদিনের মধ্যেই বাঙালিদের সমস্যা আরও বাড়বে। আমি একটা সুন্দর কান্ট্রি ক্লাব করতে চাই যেখানে নানান ধরনের অনুষ্ঠান ছাড়াও বাঙালি খাবার এবং বই পাওয়া যাবে।'

'কিন্তু সেটা করতে তো অনেক খরচ হবে!'

'তা হবে। কিন্তু ব্যবসা হিসেবে যদি নেওয়া যায় তাহলে সেই খরচ উঠিয়ে যে লাভ হবে সেটা কম নয়। তুমি আমার সঙ্গে আসবে?'

'আমি কোথায় যাব?'

'ওঃ, তুমি এখনও ভুত হয়ে আছ। আমি তোমাকে কোথাও যেতে বলেছি নাকি? আমি জিজ্ঞাসা করছি তুমি কি আমার সঙ্গে বিজনেসে যোগ দেবে?'

'ও! কীভাবে?'

'আমার ওয়ার্কিং পার্টনার হিসেবে।'

'আমি পারব?'

'কেন পারবে না? তুমি সৎ কি না জানি না তবে এখনও সরল আছ। যদি কখনও অসৎ না হয়ে আমার সঙ্গে পরিশ্রম কর তাহলে তুমি পারবে।'

'পরিশ্রম করতে আমি ভয় পাই না।'

'গুড। এখন কাউকে এসব কথা বলার দরকার নেই।'

'কিন্তু টাকা কোথায় পাবে তুমি? আলতাফ হোসেন সাহেব দেবেন?'

'সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

মমতাজ আবার একটা ট্যাক্সি নিয়ে তাকে বাংলাদেশ রেস্টুরেন্টের সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল। এখন রাস্তা সুনসান। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। এখানকার রাস্তায় সম্ভবত কুকুরেরা থাকে না। তুষারের আচমকা ভয় ভয় করতে লাগল। সে এগিয়ে গিয়ে দেখল রেস্টুরেন্টের সদর দরজা বন্ধ। পাশের গলি দিয়ে ঢুকে যে দরজাটা আছে সেটাও বন্ধ। জোরে জোরে সেই দরজায় ধাক্কা মারতে লাগল সে কিন্তু ওপর থেকে কেউ সাড়া দিল না। ভয়টা আরও বাড়ল তুষারের। এত জোরে শব্দ করা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু কী করে ভেতরে ঢুকবে সে। আজাদরা কি এত ঘুমে কাদা যে এমন শব্দও শুনতে পাচ্ছে না?

তুষার রেস্টুরেন্টের সামনে এল। এই সময় লোক হেঁটে আসছিল। লোকটা যে নেশা করেছে

তা তার হাঁটা দেখে বোঝা যাচ্ছিল। নিচু গলায় বেসুরো গান গাইছিল সে। তুষারের সামনে এসে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। আজাদের কাছে তুষার শুনেছে ম্যানহাটনের দিকে রাত নামলে কিছু কালো বদমাস ছিনতাই করতে নেমে পড়ে। তারা অবশ্য হাইটে বড় একটা আসে না। আর এই লোকটার গায়ের রঙ সাদা। কিন্তু অপরিষ্কার।

লোকটা বলল, 'হাই ম্যান!'

এই কয়েকদিনে এসব উচ্চারণের সঙ্গে কিছুটা অভ্যস্ত হলেও এখন ঠিক বুঝতে পারল না তুষার। সে চুপচাপ তাকাল।

'আই ডোন্ট হ্যাভ মানি। গিভ মি টেন বাক্স।'

তুষার দেখল লোকটা হাত পাতছে। অর্থাৎ ভিক্ষে চাইছে। সে মজা করে বলল, 'ওপেন দি ডোর দেন আই উইল গিভ ইয়ু মানি।'

লোকটা মাথা নাড়ল। তারপর দুবার ঘুষি মারল সদর দরজায়। শেষে দুমদাম লাথি মারতে লাগল। ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে এল। সম্ভবত আজাদই ঘুম থেকে উঠে গালাগাল দিচ্ছে। হঠাৎ দূরে মোড় ঘুরে একটা গাড়ি এদিকে ঘুরতেই মাতালটা দৌড়াতে লাগল। গাড়ির মাথায় আলো জ্বলছে। ওটা কি পুলিশের গাড়ি। তুষার এত ভয় পেয়ে গেল যে কোনোদিকে না তাকিয়ে লোকটাকে অনুসরণ করল। খানিকটা এগিয়ে লোকটা বাঁ দিকের একটা গলিতে ঢুকে পড়তেই তুষার তার পিছু নিল। ওর মনে হচ্ছিল এই সময় পুলিশের হাতে পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে। বরং এই লোকটা রাস্তাঘাট চেনে, ওকে অনুসরণ করলে সে পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে পারবে।

মিনিট পাঁচেক আধাদৌড় আধাহাঁটার পর লোকটা হাঁপাতে লাগল দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। এতক্ষণ সে বোধহয় তুষারের অস্তিত্ব টের পায়নি, এখন দেখতে পেয়ে খুব অবাক হল।

তুষার অস্বস্তিতে বলল, 'পুলিশ।'

লোকটা হাত নাড়ল। তার মানে অনেক কিছু হতে পারে। তুষার জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এখানে থাকো?'

লোকটি মাথা নাড়ল। তারপর দূরের একটা আটতলা বাড়ি আঙুল দিয়ে দেখাল। তুষার দেখল, বাড়িটা অন্ধকার। খানিকক্ষণ হাঁপিয়ে লোকটা বলল, 'ডু ইউ হ্যাভ মানি?'

'হাউ মাচ?'

লোকটা চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগল। জবাবটা কী দেবে তাই সে যেন ভেবে পাচ্ছি না। তারপর ধীরে ধীরে পা মুড়ে ফুটপাতের ওপর বসে পড়ল। তুষার পিছু হটল। যে পথ দিয়ে এসেছিল সে পথ দিয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেল রেস্টুরেন্টের দরজায়। দৌড়াবার সময় লক্ষ্য করেনি, এখন দেখতে পেল। আমেরিকায় ফুটপাতেও রাতে মানুষেরা ঘুমায়।

আজাদ তুষারকে সতর্ক করেছিল। বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়ালে বোকামি আর যদি হাত নাও বাড়াতে চায়, মেলামেশা করাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সেই রাতে আজাদই পাশের দরজা খুলে দিয়েছিল। অত রাতে দরজা খোলা নিয়মবিরুদ্ধ। মিস্টার শাহীন জানতে পারলে রেগে যাবেন। রেস্টুরেন্টের ওপরে আর যারা থাকে তারা ঘটনাটা টের পেলেও মুখ বন্ধ করে ছিল।

পরের দিন ঘুম থেকে ওঠার পর চা খেয়ে বন্ধ রেস্টুরেন্টে বসে আজাদ তুষারকে ওইসব কথা বলছিল। তুষার মাথা নাড়ল, 'তুমি যা ভাবছ তা নয়। আমি কেন ওর দিকে হাত বাড়াতে যাব?'

'তাহলে মাঝরাতে সে কেন তোমাকে তুলে নিয়ে যায় আড্ডা মারতে? নিশ্চয়ই তোমার দিক থেকে কোন ইঙ্গিত পেয়েছে। কই, এতদিন এখানে আছি, আমার দিকে তো কোনো দিন সে তাকায়নি!' আজাদ উষ্ণ গলায় বলেই বুঝতে পারল কথাটা ঠিক বলেনি।

সে বলল, 'দ্যাখো, ওদের তুলনায় আমরা হলাম হাতির কাছে পিঁপড়ে। পিঁপড়ে যদি হাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় বা উল্টোটাও যদি হয় তাহলে সেই বন্ধুত্ব টিকবে? হাতি জানবেই না কখন সে পায়ের চাপে পিঁপড়েকে মেরে ফেলেছে। আমাদের রেস্টুরেন্টে সে যতবার এসেছে ততবারই একটা না একটা ছেলেকে সঙ্গে এনেছে, অনেক মেয়ে থাকে যাদের একজন পুরুষে তৃপ্তি হয় না। সে হল ওই ধরনের। ওর বাপ যদি জানতে পারে তাহলে তোমার চাকরি যাবে। বুঝলে?'

তুষার বুঝেছিল। মমতাজের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না। সে যখন মমতাজের ট্যাক্সিতে উঠেছিল তখন আজাদরা দেখেছে। কৌতূহল মেটাতে সে যতটুকু বলেছিল যা বলা চলে। মমতাজের কান্ট্রি ক্লাব করার পরিকল্পনা এবং তাকে ওয়ার্কিং পার্টনার হবার প্রস্তাবের কথা সে আজাদ বলেনি। কিন্তু সিঙ্গলস বারের কথা বলেছিল।

আজাদ বলেছিল, 'সব্বনাশ! মেয়েটা ওই বারের খবর রাখে? রাখে মানে নিশ্চয়ই যাওয়া-আসা আছে। সিঙ্গলস বারে কারা যায় জানেন? যেসব পুরুষ এবং নারী সারা সপ্তাহ একা কাটায় তারা উইক-এন্ডে পার্টনার খুঁজতে ওখানে যায়। পছন্দ হলে একটা রাত ট্রাই দিয়ে দ্যাখে। ক্লিক করে গেলে প্রেমট্রেম করার কথা ভাবে। অর্থাৎ প্রথমেই সেক্স দিয়ে শুরু। এর ফলে প্রস্টিটিউটরা ওখানে যাচ্ছিল খদ্দের ধরতে সিঙ্গলস সেজে। সোজা ওখানেই এইডস ছড়াচ্ছিল বলে বেশির ভাগ সিঙ্গলস বার বন্ধ হয়ে গেছে। তুমি ভেবে দ্যাখো, আমাদের মেমসাহেবকে বন্ধু বদল করে ওখানে যেতে হয়েছে আরও মজার জন্যে। হি হি হি।'

তুষার কিন্তু আজাদের মত ভাবতে পারেনি। মমতাজের সঙ্গে সে গতরাতে অনেকক্ষণ কথা বলেছে। কখনই তাকে খেলো বা সস্তা বলে মনে হয়নি। বরং তার কথাবার্তায় বেশ সিরিয়াস বলে মনে হয়েছে। বাইরে থেকে দেখে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানুষ ভুল ধারণা করে নেয়।

মিস্টার শাহীন তাকে প্রায়ই বাড়িতে যেতে বলছেন। বেশির ভাগ দিনই নাস্তা করার নেমন্তন্ন। কিন্তু আজাদ তাকে নিষেধ করায় সে একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে। আজাদ বলেছে, 'খবরদার যেও না। গেলে তোমার চাকরি থাকবে না।'

'কি রকম?' অবাক হয়েছিল তুষার।

'গত তিনবছরে অন্তত দুজনকে উনি নাস্তায় নেমন্তন্ন করেছেন। ওরা আমার মত খারাপ ছিল না। তোমার মত হ্যান্ডসাম। তোমাকে অবশ্য দেখতে আলমগীরের মত। আলমগীরের সিনেমা দেখেছ?'

মাথা নাড়ল তুষার,'হ্যাঁ। কিন্তু ওদের চাকরি গেল কেন?'

'ওরা ওঁর মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী হয়নি, তাই।'

'তার মানে?'

'ওঁর একটা মেয়ে আছে। বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যাবে না, কথা বললেই ধরা পড়বে মেয়েটার মাথা ঠিক নেই। পাগল নয়, কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি, শিশুর মত রয়েছে মাথা কিন্তু শরীর বেড়েছে। এমন মেয়ে প্রেম করতে পারে না, সম্বন্ধ করে বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।' আজাদ জানাল।

'সর্বনাশ!' তুষার ঘাবড়ে গেল।

'তাই বলেছি। নাস্তায় যেও না। আচ্ছা, তুমি যে অবিবাহিত তা ওঁকে বলেছ? বলোনি? গুড।

আজ কথায় কথায় ওঁকে জানিয়ে দেবে যে দেশে তোমার বউ আছে। ওটা শুনলে উনি নেমন্তন্ন করবেন না।' আজাদ হাসল।

ঘটনাটা সত্যি হল। মিস্টার শাহীন সেই রাতে যাওয়ার সময় তাকে ডেকে বললেন, 'আগামী পরশু তোমার ছুটি। আমার স্ত্রী বলছিলেন নাস্তা নয় লাঞ্চে তোমাকে ডাকতে। ঠিকানা দিলে তুমি যেতে পারবে? আমি এখানকার কাউকে জানাতে চাই না। সবাইকে তো খাওয়ানো সম্ভব নয়।'

'তুষার মাথা চুলকাল, 'কী দরকার। ওঁর কষ্ট হবে।'

'কষ্ট আবার কী? আমরা যা খাই তাই তুমি খাবে।'

'আপনি আদেশ করলে আমি ঠিকানা চিনে পৌঁছে যাব।'

'গুড। ও হ্যাঁ, তোমার বাবামায়ের ঠিকানাটা দিও।'

'কেন?'

'আরে। তুমি আমার কাছে কেমন আছ তা তাঁদের জানাতে হবে না? নিশ্চয়ই তাঁরা খুব চিন্তা করছেন। তুমি এক কাজ করো, যে টাকা ওঁদের পাঠাতে চাও আমাকে দিয়ে দিও, আমি ঢাকায় ফোন করে বলে দেব তোমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিতে।'

'আজ্ঞে, এতো খুব ভাল কথা! আমার উপকার হবে। আপনি দুটো ঠিকানায় পাঠাতে বলবেন।' তুষার মাথা চুলকাল।

'দুটো ঠিকানা কেন?'

'একটা আমার বাবার আর একটা আমার স্ত্রী।'

'স্ত্রী?' চিৎকার করে উঠলেন মিস্টার শাহীন, 'তোমার স্ত্রী? তুমি কি বিবাহিত? একথা আগে বলোনি কেন?'

'আজ্ঞে আপনি জিজ্ঞাসা করেননি। স্ত্রী তার বাপের বাড়িতে থাকে।'

'মাই গড। যাও, নিজের কাজে যাও।'

আজও রাত্রে বন্ধ রেস্টুরেন্টে বসে আজাদ হো হো করে হেসেছিল। বিবাহিত শোনার পর মিস্টার শাহীনের মুখের চেহারা নকল করে দেখাচ্ছিল। কাজের মধ্যে ডুবেছিল তুষার। এই সময় চিঠিটা এল। তার নামে কেউ এই ঠিকানায় চিঠি পাঠাতে পারে কল্পনা করেনি সে। তখনও রেস্টুরেন্ট খোলেনি। খামটা হাতে নিজের বিছানায় ফিরে গিয়ে আলো জ্বেলে চিঠিটাকে বের করে সে কেঁপে উঠল। তারপর পড়া শুরু করল।

প্রিয় তুষার। এই চিঠি পেয়ে তুমি যে খুব অবাক হয়েছ তা আমি কল্পনা করতে পারি। আসলে তোমার কাছে পৌঁছাবার জন্যে এমন মরিয়া না হয়ে আমার উপায় ছিল না।

এই চিঠি লিখছি বাংলাদেশ থেকে নয়, মধ্য এশিয়ার পোর্ট সঈদ থেকে। দশ হাজার টাকার চাকরি নিয়ে এখানে এসেছি আমি। আমি আগে মরিয়া হয়ে ঢাকায় আলতাফ হোসেন সাহেবের অফিসে গিয়েছিলাম। তোমার আত্মীয় পরিচয় দিয়ে ওঁর সহকারীকে অনুরোধ করেছিলাম ঠিকানা দিতে। তিনি একদিন ঘুরিয়ে শেষ পর্যন্ত অনুগ্রহ করেছিলেন বলেই এই চিঠি লিখতে পারছি।

আমি জানি না তুমি নানান প্রতিকূলতা সামলে শেষ পর্যন্ত এই ঠিকানায় পৌঁছাতে পেরেছ কি না। আলতাফ হোসেনের সহকারী বললেন তুমি কানাডার ভিসা নিয়ে গিয়েছ। সেখান থেকে বেআইনি ভাবে আমেরিকায় ঢুকবে। ভদ্রলোক রহস্য করে বললেন, এভাবে ঢুকলে আর বেরিয়ে আসা যায় না। যদি তুমি এই চিঠি না পাও তাহলে কি করে যোগাযোগ হবে জানি না।

আগে আমার কথা বলি। দশ হাজার আমার কাছে অনেক কাছে অনেক, অনেক টাকা।

বিমানে ওড়ার অভিজ্ঞতা ছিল না। খুব কৌতূহলী ছিলাম। ওঠার পর সেই রোমাঞ্চটা চলে গেল। বিমানবন্দরে আমার চাকরিদাতা এসেছিলেন রিসিভ করতে। মোটাসোটা সুখী চেহারার মানুষ। বিশাল গাড়ি। আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছেন। ওঁর স্ত্রীর নামও দিলারা। ওরকম সুন্দরী মহিলা খুব কম দেখা যায়। কিন্তু ভদ্রমহিলা অত্যন্ত অসুস্থ। বিছানা থেকে নামতে পারেন না। দুটি শিশুকে সামলানো মুশকিল। কিন্তু ওদের সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গিয়েছে। এ বাড়িটাও খুব ভাল। এমন বাড়িতে আমি কখনও থাকিনি।

ভদ্রমহিলা আমাকে ডাকেন মিতা বলে। উনি যে বেশিদিন বাঁচবেন না তা জেনে গিয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্য করছি ভদ্রলোক ওঁর সঙ্গে দিনে এক মিনিটের বেশি দেখা করেন না। কোনো কথাও হয় না সেসময়। স্ত্রী অসুস্থ হয়ে বেশিদিন থাকলে কি সম্পর্ক এমন হয়ে যায়? জানি না। আমার চাকরিটার খুব প্রয়োজন ছিল। ভদ্রমহিলা যদ্দিন জীবিত থাকবেন তদ্দিন চাকরি থাকবে। তাই আমার স্বার্থেই ওঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তুমি নিশ্চিত থেকো, এরা আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন।

এই পর্যন্ত লিখেছিলাম গত রাতে। আজ একটু অন্যরকম ব্যাপার হল। সকালে বাচ্চাদের নিয়ে সামনের পার্কে গিয়েছিলাম। সেখানে এদেশীয় একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। মেয়েটা আমাকে ভদ্রলোক সম্পর্কে একটু সাবধান হতে বলল। কি ব্যাপার বুঝতে পারছি না। আমার ঠিকানা দিলাম। তুমি এই চিঠি পেয়েছ কিনা তা জানতে উদগ্রীব থাকব। দিলারা।'

নিউইয়র্ক থেকে পোর্ট সঈদ কতদূর? যতক্ষণ না এই চিঠির একটা উত্তর লিখতে পারছিল ততক্ষণ ছটফট করতে লাগল তুষার।

ক্রমশ মিস্টার শাহীনের ব্যবহার বদলে যাচ্ছিল। তিনি কারণে অকারণে তুষারের কাজে খুঁত আবিষ্কার করছিলেন। সেটা যে ইচ্ছাকৃত তা সবাই বুঝতে পারছিল। শেষ পর্যন্ত মিস্টার শাহীন বললেন, 'তোমাকে আমার দরকার নেই বলতে পারলে খুব খুশি হতাম তুষার। কিন্তু মুশকিল হল আলতাফ সাহেব চাইবেন তাঁর দেওয়া প্লেন ভাড়া ফেরত নিতে। তাই আরও কিছুদিন তোমাকে সহ্য করতে হবে। কিন্তু একটা কথা, তুমি ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেও না।'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'বেশ পারছ। মালিকের মেয়ের সঙ্গে তোমার এত ভাব কীসের? আমার কানে খবর আসে না ভেবেছ?'

'প্রশ্নটা আপনি তাকেই করতে পারেন।'

'পারি। নিশ্চয়ই পারি। আলতাফ সাহেব ক'দিনের মধ্যে নিউইয়র্কে আসছেন, তখনই তাঁকে করব। কর্মচারিকে মাথায় তুললে ব্যবসা চালানো যাবে না।'

যেদিন মিস্টার শাহীন এসব কথা বললেন সেদিম সন্ধেবেলায় ঘটনাটা ঘটল। এক ভদ্রলোক কোণার দিকের টেবিলে বসেছিলেন। স্যুট টাই পরা মানুষ। এঁকে এই রেস্টুরেন্টে কখনও দেখেনি তুষার। অর্ডার নিতে এগিয়ে এল তুষার। মাথা নিচু করে বলল, 'গুড ইভনিং স্যার। আপনার জন্যে নর্মাল না ঠাণ্ডা পানি নিয়ে আসব?' প্রশ্ন করে সে বিনীত হাসল।

'নর্মাল।'

ট্রে ওপর প্লেট চাপা দিয়ে এক গ্লাস জল নিয়ে এসে ভদ্রলোকের সামনে রাখল তুষার, 'আপনি কি কোনো ড্রিঙ্ক নেবেন স্যার?'

'তোমার নাম?'

'তুষার আহমেদ।'

'এখানে কত মাইনে পাও?'

'স্যার, এখানে আমি ঘণ্টা পিছু দু'ডলার পাই।'

'এত কম টাকায় কাজ করছ কেন?'

'আমার কোনো উপায় নেই। তাছাড়া এদেশের কাউকে আমি চিনি না।'

'বারো ঘণ্টা কাজ করলে চার ডলার পাবে প্রতি ঘন্টায়, রাজি আছ?'

'কী কাজ স্যার?'

'তুমি যে কাজ করছ! এই কাজটাই তো তুমি জানো।'

'এখানে আসার আগে কাজটা জানতাম না স্যার।'

'তুমি আমাকে একটা ভদকা উইথ টনিক এনে দাও।'

আচমকা কথা শেষ করলেন ভদ্রলোক। তুষার ভদ্রলোকের জন্যে ড্রিঙ্ক নিয়ে আসতে বার কাউন্টারে যেতেই মিস্টার শাহীন চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকটা এত কি কথা বলছিল?'

'এমনি, সাধারণ কথা।' ইচ্ছে করেই অসত্য বলল তুষার।

ভদ্রলোক খাওয়া শেষ করে দাম মিটিয়ে দেওয়ার সময় ডলারে সঙ্গে একটা কার্ড রাখলেন প্লেটে, 'আমার ঠিকানা, কাল ফোন করো।'

কাউন্টারে যাওয়ার সময় প্লেট থেকে কার্ড সরিয়ে ফেলল তুষার। ভদ্রলোক যা ডলার দিয়েছিলেন তা থেকে তিন ডলার ফেরত পেতেন। কিন্তু সেটা না নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে অনেক ভাবল তুষার। এই ভদ্রলোকের কাছে কাজ নিলে তার রোজগার দ্বিগুণ হয়ে যাবে। অর্থাৎ মাসে পনের শ ডলার। সে স্বচ্ছন্দে একশ ডলার করে প্রতি মাসে বিমানের ভাড়া কাটাতে পারে। হাজার ডলার দেশে পাঠিয়েও চারশো করে নিজের জন্যে জমাতে পারে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে মমতাজকে জানানো দরকার।

পরদিন রেস্টুরেন্ট বন্ধ। বছরের যে কটা দিন বিশেষ কারণে বন্ধ থাকে এটা ছিল সেদিন। সকালে মমতাজকে ফোন করল তুষার। ঘুমঘুম গলায় মমতাজ ফোন ধরল। ব্যাপারটা খুলে বলল তুষার। মমতাজ হাসল 'দ্যাখো তুষার তুমি কি সামান্য ওই ডলার রোজগার করার জন্যে জন্মেছ? তোমার লক্ষ্য হওয়া উচিত যত শিগগির সম্ভব একটা গোটা রেস্টুরেন্টের মালিক হয়ে যাওয়া। শোনা, বাবা আজ বিকেলে নিউইয়র্ক আসছে। দিন সাতেক থাকবে। তোমার সাথে তারপরে যোগাযোগ করব।'

মন তেতো হয়ে গেল তুষারের। আলতাফ হোসেন সাহেব আসছেন বলে যে মমতাজের ব্যবহার বদলে গেল সেটা বুঝতে অসুবিধে হল না।

দুপুরে তুষার বের হল। জ্যাকসন হাইটের রাস্তায় এখন প্রচুর বাংলাদেশির ভিড়। খুব ভাল লাগছিল ওদের দেখতে। হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তা পেরিয়ে স্টেশনের ওপর চলে এল। কিছু লোক একটা দরজা দিয়ে ঢুকছে বের হচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে দেখতে পেল অনেক লোক মাথা উঁচু করে কী যেন দেখছে। তুষার ভেতরে ঢুকল। বড় বড় টেলিভিশন সেট মাথার ওপর টাঙানো। সেখানে ঘোড়ার রেস দেখানো হচ্ছে। ঘোড়দৌড়ের ওপর বাজি নেওয়া হচ্ছে এখানে।

তুষারের খুব মজা লাগছিল। একটা দৌড় শুরু হতে যাচ্ছে। সে ঘোড়াগুলোর দিকে তাকাল। তিন নম্বর ঘোড়াটাকে খুব তেজি বলে মনে হল। এই সময় পাশে দাঁড়ানো লোকটা তার

সঙ্গিনীকে বলল, 'পাঁচ নম্বর জিতবে। সব কাগজ ওর কথাই বলেছে। খেলতে হলে ওকেই খেলো।'

তুষারের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'তিন নম্বর জিতবে।'

লোকটা বিরক্ত হয়ে তাকাল। বিশাল চেহারা। এদের হিস্প্যানিস বলা হয়, তা একদিনে জেনে গিয়েছে তুষার। লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাকে কে বলল?'

'আমার মনে হচ্ছে।'

লোকটা কাঁধ নাচিয়ে সঙ্গিনীকে নিয়ে সরে গেল। তুষার দেখল বড় হল ঘরে মানুষ গিজগিজ করছে। ওপাশের কাউন্টারে নিশ্চয়ই টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। এমন সময় রেস শুরু হল। বারোটা ঘোড়া একসঙ্গে দৌড়চ্ছে। গায়ে নাম্বার লেখা না থাকলে সবাই একই রকম দেখতে। অবশ্য যারা চালাচ্ছে তাদের জার্সির রঙ আলাদা। পাঁচ নম্বর ঘোড়া এখন এগিয়ে চলেছে। পেছনেই এক নম্বর। হঠাৎ তিন নম্বর ঘোড়া তিরের মত ছুটে এসে সবাইকে হারিয়ে দিল। পাঁচ নম্বর জিতবে ভেবে যারা চেঁচাচ্ছিল তারা আচমকা চুপ করে গেল। জয়ী ঘোড়াটাকে বারংবার টিভিতে দেখানো হচ্ছে। ওর গায়ে লেখা রয়েছে তিন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তুষার। সে ভাবল তার ঘোড়াটা জিতে গেল?

'হেই ম্যান!'

চমকে তাকাল তুষার। সেই স্বাস্থ্যবান লোকটি সঙ্গিনীকে নিয়ে আবার ফিরে এসেছে। লোকটি চওড়া হাত বাড়িয়ে দিল, 'কনগ্রাচুলেশন।'

সঙ্গিনী সপ্রশংস চোখে তাকে দেখছে।

লোকটা বলল, 'আমার নাম ম্যাক আর এ হল জেন।'

জেন বলল, 'ম্যাকের মাথায় বুদ্ধি কম। তোমার কথা শুনে খেললে আমার পকেটে তিনশো ডলার আসত, উল্টে পঞ্চাশ ডলার হারালাম।'

ম্যাক জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কী করে জেনেছিলে তিন নম্বর জিতবে।'

নার্ভাস লাগছিল খুব, তুষার বলল, 'আমার মনে হয়েছিল।'

'মাই গড। তোমার এমন প্রায়ই মনে হয়?' জেন জানতে চাইল।

'কাম অন, এর পরের রেসে কত নম্বর জিতবে বলে মনে হচ্ছে?' ম্যাক হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করল।

'আমার এখনও কিছু মনে হচ্ছে না।'

জেন বলল, 'হয়তো ঘোড়াগুলো দেখে বলতে পারবে।'

ম্যাক জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাকে তো আগে কখনও এখানে দেখিনি?'

'আমি আজ প্রথম এলাম।'

'আচ্ছা! কি করো তুমি?'

'রেস্টুরেন্টে কাজ করি।'

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় রেসের ঘোড়াগুলোকে টিভিতে দেখানো শুরু হয়ে গেছে। এক নম্বর ঘোড়াকে বেশির ভাগ লোক পছন্দ করায় তার ওপর টাকা রাখলে সেটা দ্বিগুণও হয়ে ফিরবে না। বারংবার লেখা হচ্ছিল, পাবলিক বলল নাম্বার ওয়ান। অর্থাৎ বেশির ভাগ লোকের পছন্দ এক নম্বরকেই। জন জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু মনে হচ্ছে?'

নিঃশ্বাস বন্ধ করে উত্তর দিল তুষার, 'নাম্বার ওয়ান।'

ম্যাক মাথা নাড়ল, 'দুর! ওকে খেলে তো সামান্যই পাওয়া যাবে। আমার তো মনে হচ্ছে দুই জিতবে। এক নম্বরই খেলব। জেন চলে গেল। ম্যাক তার পেছনে।

তুষারের মনে হল এই বেলা কেটে পড়া উচিত। সে যা নয় তা ওরা তাকে ভাবছে। সে সন্তর্পণে দরজার দিকে এগোল। সঙ্গে সঙ্গে রেস শুরু হয়ে গেল। দরজার দাঁড়িয়ে ভিড়ের আড়ালে থেকে তুষার দেখল এক নম্বর অবলীলায় জিতে গেল।

বাইরে বেরিয়ে এল তুষার। রাস্তায় পাশেই টেলিফোন বুথ। পয়সা ফেলে ফোন করল সে। কার্ডে ভদ্রলোক নাম রয়েছে, এ. এইচ. হক।

'হক্ সাহেব আছেন? আমার নাম তুষার আহমেদ।'

'ও হ্যাঁ। তুমি আজ জয়েন করতে পারবে?'

'আজই?'

'হ্যাঁ। দেরি করে লাভ নেই। মালপত্র নিয়ে চলে এসো।' লাইন কেটে দিলেন ভদ্রলোক। হঠাৎ কাঁধে হাত পড়তেই চমকে উঠল। তুষার। ম্যাক আর জেন দাঁড়িয়ে। জেন বলল, 'না বলে এলে যে? এই নাও কুড়ি ডলার। আমি একশ খেলে দুশো পেয়েছি। তোমার কমিশন কুড়ি পার্সেন্ট। অর্থাৎ কুড়ি ডলার।'

মাথা নাড়ল তুষার, 'আমি কমিশন নিই না। মাপ করবেন।'

দিলারার কাছ থেকে আর কোনো খবর পায়নি তুষার। ওর পাঠিয়ে পাওয়ার পর সে পরপর দুটো চিঠি লিখেছিল, জবাব আসেনি। এ এক অদ্ভুত অস্বস্তি। যে ঠিকানা দিলারা দিয়েছিল সেখানে সে আর আছে কি না সন্দেহ হচ্ছিল। দূরত্ব এতটাই যে যাচাই করার উপায় নেই। বাংলাদেশ ছেড়ে পোর্ট সঈদে গিয়ে একজন বাঙালি মেয়ে চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল কি না তা ভবিষ্যৎই বলতে পারবে। তুষারের কষ্ট হয়েছিল খুব। কিন্তু দৈনন্দিন সমস্যা প্রবল হলে মনের কষ্ট বেশিদিন তীব্র থাকে না। তুষারের শুধু অবসর সময়ে মনে পড়ত দিলারার কথা।

মিস্টার শাহীনের রেস্টুরেন্টের চাকরিটা তাকে ছাড়তে হয়েছিল। তাকে জামাই করতে না পেরে ভদ্রলোক এমন ব্যবহার করছিলেন যে কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না। এই সময় আলতাফ হোসেন নিউইয়র্কে এলেন। যেদিন তাকে চাকরি ছাড়তে হল, সেদিনটার কথা তুষার চিরকাল মনে রাখবে।

দুপুরের দিকে আলতাফ হোসেন সাহেব মিস্টার শাহীনের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে এলেন। কর্মচারিরা তাঁকে সেলাম জানাল। তিনি কাউন্টারের পেছনের গেট দিয়ে ঢুকেই তুষারকে ডেকে পাঠালেন।

তুষার দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল প্রধান চেয়ারে আলতাফ হোসেন সাহেব বসে আছেন, বাঁ দিকে মিস্টার শাহীন। তাকে দেখে আলতাফ হোসেন সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ফাদার রাজাকার ছিল?'

দ্রুত মাথা নেড়েছিল তুষার, 'না তো!'

'মিথ্যে কথা। মিথ্যে কথা বলা তোমার স্বভাব। লোকটা অলবৎ রাজাকার ছিল। আমার কাছে খবর আছে।' আলতাফ হোসেন সাহেব উত্তেজিত হলেন।

'বিশ্বাস করুন, বাবা খুব সরল মানুষ, গ্রামে থাকেন, কখনই কোনো রাজনীতির মধ্যে ছিলেন না। আপনাকে কেউ ভুল খবর দিয়েছে।'

আলতাফ হোসেন সাহেব মাথা নাড়লেন, তিনি বিশ্বাস করেননি।

এবার মিস্টার শাহীন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি জুয়া খেল?'

'একি বলছেন স্যার?'

মিস্টার শাহীন তাঁর মালিকের দিকে তাকালেন, 'দেখুন কিরকম মিথ্যেবাদী।'

তারপর তুষারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি ওটিভিতে গিয়ে ঘোড়ার ওপর বাজি ধরোনি? বাংলাদেশ থেকে এত ছেলে আসে, কই, কেউ তো তোমার মত এ কাজ করেনি। মিথ্যে কথা?'

আলতাফ হোসেন সাহেব বললেন, 'জ্যাকসন হাইটের কোথায় তুমি কী করে বেড়াচ্ছ তার সব খবর আমাদের কাছে এসে যায়। আমি তোমাকে এখানে দয়া করে পাঠিয়েছিলাম চাকরি করে দেশে টাকা পাঠাতে, জুয়ো খেলতে নয়। তাই তো?'

তুষার কাতর গলায় বলল, 'আমি জুয়ো খেলিনি স্যার।'

'খেলেছ। শুধু তাই নয় এখানকার হিস্‌প্যানিসদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছ। রেসের খবর জানতে তারা এই রেস্টুরেন্ট পর্যন্ত এসেছে। আমারই পয়সায় এদেশে এসে তুমি আমার মুখে কালি মাখাবে?'

'আমি আপনার ঋণ শোধ করে দেব স্যার।'

'আচ্ছা। খুব তেল হয়েছে দেখছি। আমার মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছ কেন?'

'কী বলছেন স্যার?'

'চুপ কর। বামন হয়ে চাঁদ ধরার শখ?'

মিস্টার শাহীন মন্তব্য করলেন, 'এ স্যার ম্যারেড। দেশ বউ আছে।'

'তাই নাকি? একথা তো হানিফ বলেনি।'

তুষার ঠোঁট কামড়াল। তারপর বলল, 'আপনি ঠিক বলছেন না স্যার। মমতাজের সঙ্গে আমি কোনো অভদ্র ব্যবহার করিনি। উনি আমার সঙ্গে কথা বলায় আমি বলেছি। কোনো অন্যায় করেছি বলে মনে হয়নি।'

'তুমি ওকে টুপি পরাতে চাওনি? ওর টাকায় ব্যবসা করার ফন্দি আঁটোনি? আমি তোমাকে এখানকার জেলে ঢুকিয়ে দিতে পারি তা জনো?'

মিস্টার শাহীন বললেন, 'তাই দিন স্যার। একটা উদাহরণ সামনে থাকলে পরে কেউ এমন আচরণ করতে সাহস পাবে না।'

'ইডিয়ট। ওকে জেলে ঢোকালে ওর প্লেনভাড়া কে দেবে আমাকে? তুমি? না, জেলফেল নয়, প্রয়োজন হলে হানিফের ডাস্টবিনে ওর লাশ পড়ে থাকবে। শোনো তুষার, আমি তোমার কোন ক্ষতি করবো না কিন্তু কয়েকটা শর্তে।'

আলতাফ হোসেন সাহেব একটু থামলেন। তুষার করুণ চোখে তাকাল।

'প্রথম শর্ত। মমতাজের সঙ্গে দেখা করা দূরের কথা, টেলিফোনেও কথা বলবে না। শর্ত অমান্য করলে তুমি একটা লাস হয়ে যাবে। দ্বিতীয় শর্ত হল, ঠিক তিন মাসের মধ্যে আমি তোমার কাছ থেকে দুহাজার ডলার চাই। এক হাজার প্লেন ভাড়া বাবদ, আর এক হাজার তার সুদ। এই ডলার দিতে না পারলে তোমার বেঁচে থাকার অধিকার থাকবে না। তুমি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। আর তিন নম্বর হল, আজ এই মুহূর্ত থেকে তুমি আর এখানে চাকরি করছ না। গেট লস্ট।'

তুষার এমনটাই আশংকা করছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কোথায় যাব?'

'সেটা তোমার সমস্যা।'

'কিন্তু এর মধ্যে বিমানভাড়া বাবদ কিছু কেটে নেওয়া হয়েছে।'

'হয়েছিল। তুমি যদি ভদ্রভাবে এখানে কাজ করতে তাহলে ডলারগুলো ওই খাতে ধরা হত।

কিন্তু তুমি তা করোনি বলে তোমার খাওয়া-থাকার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করা হল। ওয়েল, আজ থেকে তিন মাসের মধ্যে এই রেস্টুরেন্টে এসে দু'হাজার ডলার দিয়ে রসিদ নিয়ে যাবে। আসতে পার। রেস্টুরেন্টের কেউ প্রতিবাদ করতে পারল না। অথচ ওদের মুখ দেখে তুষার বুঝতে পারছিল সবাই খুব দুঃখিত হয়েছে। জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সে আবার ছোটঘরের দরজার গিয়ে দাঁড়াল, 'যদি অনুমতি দেন তাহলে আমার জিনিসপত্র কিছুক্ষণের জন্যে রেখে যেতে পারি?'

'কিছুক্ষণের জন্যে মানে?' মিস্টার শাহীন বিরক্ত হলেন।

'থাকার একটা জায়গা পেলেই এসে নিয়ে যাব।'

'ওগুলোর দোহাই দিয়ে এখানে ঘুরঘুর করতে চাও?'

'আজ্ঞে না স্যার—'

আলতাফ হোসেন সাহেব বললেন, 'ঠিক আছে। কাল এই সময়ের মধ্যে ওগুলো তুমি যদি না নিয়ে যাও তাহলে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হবে।'

আজাদের কাছে ওগুলো রেখে বেরিয়ে এল তুষার। জ্যাকসন হাইটে খোলা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে মনে হল তার আর কেউ নেই। মাত্র তিনমাস সময় হাতে। ঘন্টায় চার ডলার রোজগার করলে দশ ঘন্টায় চল্লিশ। সারা মাস কাজ করে বারো 'শ। নিজের খরচের জন্যে অন্তত চারশো যেখানে তিন মাসে আলতাফ হোসেন সাহেবের ধার শোধ করা সম্ভব। কিন্তু কাগজপত্র না থাকায় কে তাকে ঘন্টায় চার ডলার দেবে?

জুয়ো খেলবে? অফ ট্র্যাক জেটি. সেন্টারটা সে দেখে এসেছে। সেখানে গিয়ে ঘোড়ার বাজি খেলবে? যদি সেই ঘোড়া না জেতে? না, কোনো ঝুঁকি নিতে পারে না সে! এই কয়েক দিন ধরে যে কার্ডটাকে সে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিল সেটা বের করে রাস্তার পাশের টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করল। রিঙ হচ্ছে। তারপর সেই ভদ্রলোক গলা পেতেই সে নিজের পরিচয় দিল। একটু সময় নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ ভাই তোমাকে আমি যোগাযোগ করতে বলেছিলাম। কিন্তু ভাই, আই অ্যাম সরি। তোমাকে পেলে আমার খুব উপকার হত কিন্তু আমি নিতে পারছি না।'

'কেন?'

'আমি কোনো ঝামেলায় জড়াতে চাই না।' কেটে দিলেন ভদ্রলোক তুষার বুঝল ওরা এই ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। সেদিন উনি তার সঙ্গে রেস্টুরেন্টে কথা বলেছেন সেটা লক্ষ্য করেছিলেন মিস্টার শাহীন। আলতাফ হোসেন সাহেবকে চটিয়ে ব্যবসা করতে চাননি এই ভদ্রলোক।

অগত্যা? অনেক সাহস সঞ্চয় করে মমতাজকে টেলিফোন করল তুষার। দ্রুত ঘটনাগুলো বলে গেল সে। মমতাজ চুপচাপ শুনল তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কাছে কত ডলার আছে?'

'আছে। দেশ থেকে যা এনেছিলাম আর এখানে মাইনে বাঁচিয়ে যা রেখেছি তার সবটাই পকেটে আছে।'

'তুমি পোর্ট অথরিটিতে চলে যাও। ওখান থেকে গ্রে-হাউন্ড বাস ছাড়ে। সেই বাসে চলে যাও শিকাগো শহরে। গ্রে-হাউন্ডের মেইন স্টেশনের পাশে গেন্ডি নামে একটা মোটেল আছে। ওখানে একটা ঘর ভাড়া করে অপেক্ষা কর।'

'কিন্তু ওরা যদি পাশপোর্ট দেখতে চায়?'

'দেখাবে। ওটা তো আছে। ভিসার ব্যাপারে মোটেলওয়ালারা মাথা ঘামায় না। কুইক।' রেখে দিল মমতাজ।

তিনশো বছর ধরে পৃথিবীর মানুষ ভাগ্যান্বেষণে কলম্বাসের ভুল করে আবিষ্কার করা আমেরিকায় পৌঁছে গেছে। আমেরিকা তাদের দিয়েছে আশ্রয় এবং আর যা কিছু দরকার। এদের ভাষা আলাদা ছিল, সংস্কৃতিও। এরা যখন ইংরেজি বলতে শুরু করল অথচ তার উচ্চারণও হয়ে গেল আলাদা। কথিত আছে, একবার আমেরিকায় ঢুকতে পারলে ওই দেশ তাকে নিজের করে নেয়।

তুষার সেই স্রোতের নবীন যাত্রী। মমতাজ তার কাছে পৌঁছেছিল কি না সেটা অবান্তর প্রশ্ন। কিন্তু নাগরিকত্ব না পেলেও বাংলাদেশের গ্রামের একটি পরিবার নিয়মিত অর্থসাহায্য পেয়ে গেছে। আলতাফ হোসেন পেয়েছেন তাঁর লগ্নীকরা অর্থ। একটি অদৃশ্য সোনার চেন যেচে পরতে চেয়েছিল তুষার। বেঁচে থাকার জন্যে। জনারণ্যে মিশে গিয়ে সে যখন ধরাছোঁয়ার বাইরে তখন ভেবে নিতে পারি সে চমৎকার বেঁচে আছে।

দিলারাকে না পেয়েও।

মনের মত মন

তখনও কলকাতার নব্বুই ভাগ মানুষ বিছানায়, ঘন ছায়া নেতিয়ে রয়েছে উত্তর কলকাতার পুরনো বাড়ির শরীরে, গলিতে। স্বপ্নাশিস আলতো দৌড়ের ভঙ্গিতে দেশবন্ধু পার্কের দিকে যেতে যেতে বুঝতে পারল তার কেড্‌সের আয়ু বেশিদিন নেই। আজকেই যদি আবার সেলাই ছিঁড়ে যায় তা হলে বেকায়দায় পড়তে হবে। পকেটে মাত্র দশটা টাকা পড়ে আছে, মাস শেষ হতে আট দিন বাকি।

দৌড় বন্ধ করে সাবধানে হাঁটতে লাগল সে। পিতৃদেব হুকুম জারি করেছেন, আঠারো বছর বয়স হয়ে যাওয়ার পর হাতখরচ বাবদ মাসে ষাট টাকা দেবেন তিনি। এ ছাড়া কলেজের মাইনে, চারবেলা খাবার আর বছরে দুটো শার্ট আর প্যান্ট। স্বপ্নাশিসের দাদা দেবাশিস খুব নরম প্রকৃতির, এবার এম বি দিচ্ছে, নিরীহ গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কিন্তু আন্ডার গার্মেন্টস ছাড়া বাইরে বের হওয়া যাবে না যে!'

পিতৃদেব তাঁর প্রথম সন্তানকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। দেবাশিস স্কুলে বরাবর প্রথম হত, জয়েন্টে ভাল নম্বর পেয়ে মেডিক্যালে ভর্তি হয়েছিল। মায়ের ইচ্ছে ছিল তাঁব একছেলে ডাক্তার হবে। সেই ইচ্ছে পূর্ণ হতে চলেছে দেবাশিসকে ঘিরে। তাই পিতৃদেব কোনও কথায় আপত্তি থাকলেও বাধ্য হয়ে মেনে নেন। সেটা বোঝা যায় তাঁর পা নাচানোর ভঙ্গিতে। স্বপ্নাশিস বললে হুঙ্কার দিতেন, 'কেন? তোমাকে কড়কড়ে ষাট টাকা দেওয়া হচ্ছে না?' কিন্তু বড় ছেলে বলে কথা। অবশ্য দেবাশিস এমন নরম গলায় কথা বলে যে চমৎকার সারল্য ফুটে ওঠে।

দেশবন্ধু পার্কে ঢুকে স্বপ্নাশিস চারপাশে তাকাল। এরমধ্যে দলে দলে লোক মাঠের চারপাশে চক্কর মারছে। বেশির ভাগ হয় রোগা নয় বেশ মোটা। আর চল্লিশ পার হওয়াদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। মেয়েদের একটা দল হাঁটছে যাদের সম্পর্কে সুব্রত বলেছিল একেবারে কালনাগিনী। কাছাকাছি কাউকে ওদের দিকে তাকাতে দেখলেই বলে, 'চোখ গেলে দেব।'

স্বপ্নাশিসের বাড়িতে মহিলা বলতে কেলোর মা। জ্ঞান হবার পর থেকে সে ওকে একই চেহারায় দেখে আসছে। ভোরবেলায় খুটহাট শব্দ করতে করতে বাড়িতে ঢোকে চ্যালাকাঠের মতো শরীর নিয়ে, সকাল দশটার মধ্যে কাজ শেষ করে ফিরে যায়। আবার বিকেলে আসে ঘণ্টা তিনেকের জন্যে। শীতবর্ষায় কামাই করতে দেখেনি কোনওদিন। একটু রেগে গেলেই চিৎকার শুরু করে এই বলে, 'তোদের জন্মাতে দেখলাম—'

অতএব মহিলারা কেন চোখ গেলে দেবার ভয় দেখান তা স্বপ্নাশিসের জানা নেই। তবে মাঝে মাঝে জানতে খুব ইচ্ছে হয়। আচ্ছা খুব বিনীত ভঙ্গিতে সামনে গিয়ে ওদের নমস্কার করে যদি কারণটা জিজ্ঞাসা করে তা হলে কী খুব খারাপ ঘটনা ঘটবে?

স্বপ্নাশিসের যেহেতু সাহস কম তাই সে চুপচাপ মাঠে নেমে পড়ল। দেশবন্ধু পার্কের ভেতরে তখন বেশ কয়েকটা দল অনুশীলন শুরু করেছে। দৌড় থেকে শুরু করে ক্রিকেট, কি নেই। দূর থেকেই দেখতে পেল হরিমাধবদা ব্যাট করছে। চারজন বোলারের মধ্যে সুব্রতও আছে। তাকে দেখতে পেয়ে হরিমাধবদা খিঁচিয়ে উঠলেন, 'এই যে নবাবপুত্তুর, এতক্ষণে আসার সময় হল? জীবনে বড় ক্রিকেটার হতে পারবি না!'

স্বপ্নাশিস জবাব না দিয়ে মুখ নিচু করল। হরিমাধব আবার চিৎকার করলেন, 'কৈফিয়ত না

দিলে আজ তোকে আমি ব্যাট ধরতে দেব না। তোদের জন্যে আমি এখানে পাঁচটা থেকে অপেক্ষা করছি আর তোরা বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছিস। এইজন্যে বাঙালি কখনও শচীন হতে পারবে না, বড়জোর সৌরভ হয়েই ফুটে যাবে।

হরিমাধব যে কথাগুলো বলছিলেন তা মাঠের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া প্রাতঃভ্রমণকারীদের কানে যাচ্ছিল। সকৌতুকে স্বপ্নাশিসকে দেখছিল তারা। স্বপ্নাশিস কোনওমতো বলতে পারল, 'আর কখনও দেরি হবে না। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে আসব।'

হরিমাধব জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন কটা বাজে?'

স্বপ্নাশিসের হাতে ঘড়ি নেই, সুব্রত ঘড়ি দেখে বলল, 'পাঁচটা একত্রিশ মিনিট পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড। তুই একটা ইডিয়ট স্বপ্ন।'

'ইয়েস। তুমি একটি গর্দভ। তোমার অপনেন্ট তোমাকে ব্লাফ দেবে আর তুমি বোকা হয়ে সেটা গিলবে। কেন আমার মুখের ওপর বলতে পারলি না আপনি ভুল করছেন, আমি ঠিক সময়ে এসেছি। প্রটেস্ট করতে শিখবি কবে?'

স্বপ্নাশিসের আফসোস হচ্ছিল। হরিমাধবদা তাকে এমন বোকা বানাবেন আগে তা সে ভাবতে পারেনি। বাড়ি থেকে বের হবার সময় সে ঘড়ি দেখেনি। ধমক শুনে সে বিশ্বাস করেছিল সত্যি সত্যি তার দেরি হয়ে গেছে। কী কাণ্ড!

হরিমাধবদা ডাকলেন, 'ধর। সুব্রত আজ মাপা লেংথে বল ফেলছে। কিন্তু ওই বল থেকে তোকে রান তুলতে হবে। ধর বারো বলে কুড়ি রান। ফেস্ কর।'

স্বপ্নাশিস ভাবল প্যাড পরার অনুমতি নেবে কি না। নেটে প্যাড পরতে বলেন হরিমাধবদা কিন্তু ভোরবেলার এই প্র্যাকটিসে সেটা পছন্দ করেন না। বলেন, 'বলটা ব্যাট দিয়ে মারার জন্যে। যদি তোর পায়ে বোলার বল ঠোকে তা হলে এল বি ডব্লু হয়ে যাচ্ছিস তুই। না না, ফ্রন্ট ফুট থিওরি আমি ভোরবেলায় মানব না। পা দিয়ে লোকে ফুটবল খেলে, ক্রিকেট নয়। প্যাড না পরার জন্যে যদি উন্ডেড্ হও সেটাই তোমার পাওনা।' অতএব স্বপ্নাশিস ব্যাট হাতে তৈরি হল।

হরিমাধবদা চলে গেছেন বোলার এন্ডে। চারজন বোলার আর একজন উইকেট কিপার ছাড়া এই সময় কোনও ফিল্ডার নেই। বাঁ দিকের পাঁচিলটায় বল লাগানো চার, ওটা ডিঙোলে ছয়। ডানদিকের গাছটা বাউন্ডারি। এসব মুখস্থ। প্রথম বলটা করল সুব্রত। গুড লেংথ বল। মাটিতে পড়ে নিচু হয়ে অফ স্ট্যাম্পের দিকে যাচ্ছিল। মারতে গিয়ে সামনে নিয়ে ডিফেন্স করল স্বপ্নাশিস। হরিমাধবদা চিৎকার করলেন এগারো বল, কুড়ি রান। ইডিয়ট, তুই পাঁচদিনের টেস্ট ওপেন করতে আসিসনি!'

স্বপ্নাশিস বলল, 'এই বল মারব কী করে?'

'গুডলেংথটাকে ওভারপিচ বানিয়ে নে। থ্রো দেখে পায়ের কাজ করতে পারছিস্ না?'

'মিস করলে বোল্ড বা স্ট্যাম্পড হয়ে যেতে পারি।'

'হলে হবি। আমি তো তোকে বলিনি আউট হলে বারো বল পাবি না।'

স্বপ্নাশিস আবার বোকা বনল। হরিমাধবদার স্বভাব হল কথার প্যাঁচে ফেলে জব্দ করা। সুব্রত দ্বিতীয় বলটি ডেলিভারি দেবার মুহূর্তে সে দুপা এগিয়ে গেল। এবার বলটা গুডলেংথে স্পটে না পড়ে ফুলটস হয়ে গেল। স্বপ্নাশিস এগিয়ে যাওয়ায় বল মারার পজিশনে পেল না। কোনোমতে বুকের কাছে ব্যাট তুলে শেষ মুহূর্তে সে বলে ছোঁয়াতে পারল। কিন্তু ততক্ষণে বল উঠে গেছে ওপরে। সুব্রত দৌড়ে এসে ক্যাচ লুফে নিয়ে চিৎকার করল, 'আউট।'

সাড়ে সাতটায় হরিমাধবদা তাদের ছাড়লেন। এখান থেকে সোজা শ্যামবাজারে গিয়ে বাজার

করে বাড়ি ফিরবেন তিনি। ভদ্রলোক বিয়ে করেননি। ভাইয়ের সঙ্গে থাকেন। ক্রিকেটই তাঁর ধ্যানজ্ঞান, জীবন। বাংলার হয়ে রনজি খেলেছেন দু বছর। সেইসময় ক্লিকে পড়ে বাদ যান দল থেকে। কিন্তু এখন পর্যন্ত অন্তত বাইশজন রনজি প্লেয়ার তৈরি করেছেন এই মাঠ থেকে। প্রায়ই বলেন, 'পরিশ্রম কর রে। পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই। যারা ইন্ডিয়া খেলে তাদের যে কত পরিশ্রম করতে হয়েছে সেটা ভেবে দেখ। পড়াশুনা, খাওয়াদাওয়ার সময় ছাড়া যখন বাড়িতে থাকবি তখনই ক্রিকেটের কথা ভাববি। একজন বোলার তোকে ফাঁসাতে চাইছে কিন্তু তুই কখনও তার ফাঁদে পা দিবি না। অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল আর মুখ কুটকুট করা কচু তোর কাছে এক জিনিস বলে মনে করবি। এমনিতে তোরা বেশি বয়সে শুরু করেছিস। এবার যদি বেঙ্গলে ডাক পাস তা হলে পারফরমেন্স দেখাতে হবে।'

হরিমাধবদা যে টিমকে কোচ করেন সেই টিমেই ওরা খেলে। গতবছর প্রথম সুযোগ পেয়েছিল সে। মোট চারটে ম্যাচ খেলে অ্যাভারেজ তিরিশ। এবার প্রতিটি ম্যাচে খেলাচ্ছেন হরিমাধবদা। ঠিক এবার লিগে তিন নম্বরে। চারটে সেঞ্চুরি হয়ে গেছে এর মধ্যে। খবরের কাগজে ছবি বেরিয়েছিল চারবার।

পিতৃদেব সেই ছবি দেখতে পেয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, ' তোমার নাম লিখেছে, একই নামের হাজার লোক থাকতে পারে, ছবিটা তোমার কিনা দেখো।'

মাথা নিচু করেছিল স্বপ্নাশিস, 'হ্যাঁ।'

'ছেলের ছবি খবরের কাগজে ছাপা হলে বাবা খুশি হয় কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আমার কী করা উচিত। কলেজের পর ক্রিকেট খেলো বলে তোমার দাদা আমাকে জানিয়েছিল। কিন্তু এ তো পেশাদার খেলা, সারাদিন পড়াশুনা জলাঞ্জলি দিয়ে মাঠে পড়ে থাকতে হয়। এ সব যদি কর তা হলে ধরে নেব ভাল পয়সা পাচ্ছ, সামনের মাস থেকে হাতখরচা দেবার দরকার নেই।'

আশঙ্কিত স্বপ্নাশিস বলে উঠেছিল, 'আমি কোনও টাকা পাই না।'

'তা হলে সময় নষ্ট করছ কেন? তোমার খবর খবরের কাগজ যখন ছেপেছে তখন বুঝতে হবে পেছনে মোটা টাকার লেনদেন আছে। সারাদিন ধরে তোমাদের ওরা খাটিয়ে পয়সা দেবে না এটা অন্যায়। কাল থেকে আর মাঠে যাওয়ার দরকার নেই। মন দিয়ে পড়াশুনা করো যাতে কলেজ থেকে বেরিয়ে একটা কাজকর্ম জোটাতে পারো।' পিতৃদেবের এই নির্দেশের ওপর কথা বলার সাহস স্বপ্নাশিসের ছিল না। তার ক্রিকেট জীবন ওখানেই শেষ হয়ে যেত যদি দাদা দেবাশিস এগিয়ে না আসত। বড় ছেলের কথা পিতৃদেব সাধারণত অর্ধেক মেনে নেন, এবারও তাই হল। ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে খেলা চলবে না। রেজাল্ট খারাপ হলে খেলা বন্ধ করতে হবে। শেষমেশ তাঁর বক্তব্য, 'হতচ্ছাড়া ব্যাপার। একটা লোক দৌড়ে এসে বল ছুঁড়ছেন আর একজন ব্যাট হাতে সেটা হাঁকড়াচ্ছেন। কী বাহাদুরি। শরীরের কোনও কসরত নেই, শক্তি দেখাবার সুযোগ নেই, শুধু কয়েক গজের মধ্যে ছোটাছুটি করা। এই জন্যেই আমেরিকান, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, জাপানিরা, পৃথিবীতে যারা সভ্য বলে স্বীকৃত তারা ক্রিকেট খেলে না।'

কথাটা মনে ঢুকেছিল স্বপ্নাশিসের। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনাও করেছিল। ক্রিকেট খেলে ইংলন্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজ অস্ট্রেলিয়া ভারত পাকিস্তান শ্রীলংকা। কিছু কিছু দেশ এখন আসছে খেলতে। সাউথ আফ্রিকা একসময় খেলত, মাঝখানে অচ্ছ্যুৎ ছিল, আবার খেলছে। বাকি পৃথিবীতে কেউ গাওস্করের নাম দূরের কথা ডন ব্র্যাডম্যানের নাম জানে না।

সুব্রত একদিন কথাচ্ছলে হরিমাধবদের কাছে প্রসঙ্গটা তুলেছিল। হরিমাধবদাকে এক মুহূর্তের

জন্যে উদাস দেখাল। তারপর মাথা নাড়লেন তিনি, 'এই যে দেশগুলোর নাম বললে তাদের সবার ক্ষেত্রে একটা মিল আছে, কী বলো তো?'

স্বপ্নাশিস শুনেছিল ফরাসিরা ইংরেজি বলে না। জার্মানরাও প্রায় তাই। কিন্তু এই দেশগুলোতেও ইংরেজির চল আছে। আর ক্রিকেটের ভাষা ইংরেজি। সে এই উত্তর দিল।

হরিমাধবদা বললেন, 'কিছুটা হল। আসলে এইসব দেশই একসময় ইংরেজদের অধীনে ছিল। কলোনি বলতে পারো। ব্রিটিশরা ক্রিকেট খেলত, তারা তাদের কলোনির মানুষদের খেলাটা শিখিয়েছে বলে সেখানে ক্রিকেটের চল হয়েছে।'

সুব্রত বলল, 'সেই ইংল্যান্ডকেই তো অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়া হরদম হারাচ্ছে।'

'সেটাই তো স্বাভাবিক।'

স্বপ্নাশিস জিজ্ঞাসা করল, 'আমেরিকানরাও তো ইংরেজি বলে, সেখানেও ইংরেজরা গিয়েছিল তিনশো বছর আগে, তা হলে আমেরিকায় ক্রিকেট জনপ্রিয় নয় কেন?'

'আমেরিকায় ইংরেজরা গিয়েছিল সোনার লোভে। গিয়ে থেকে গিয়েছিল। তেমনি স্পেনিশ, ডাচরাও ও দেশে যায় আগুপিছু। আমেরিকা কখনই ব্রিটিশদের কলোনি ছিল না যে তাদের ইচ্ছেমত সবকিছু ওদেশে হবে। এখন তো শুনেছি ব্রিটিশরা যা করে ঠিক তার উল্টো আমেরিকানরা করে। এমন কি ইংরেজিটাকেও নিজেদের মত করে নিয়েছে। যাক, হঠাৎ এ-সব প্রশ্ন কেন? ভাল জিনিস সবসময় গ্রহণ করব আমরা। ব্রিটিশরা শিখিয়েছিল বলে যখন টেবিল চেয়ার কাপ প্লেট ফেলে দিচ্ছি না তখন ক্রিকেট ও আমাদের জীবন থেকে বাদ হয়ে যাচ্ছে না।'

সাড়ে সাতটা বাজা মাত্র হরিমাধবদা উইকেট তুলে নিলেন, 'কাল এরিয়ানের সঙ্গে খেলা। বিকেলে সবাই এসো। কিছু কথা বলব।'

সুব্রত বলল, 'এখনই বলুন না। বিকেলে একটা ঝামেলা আছে।'

'আমি তোমাদের বলিনি ম্যাচের আগের দিন নিজেকে ফ্রি রাখতে?'

'কী করব বলুন! আমার মাসিমা খুব অসুস্থ। স্বপ্নাশিসের একজন পরিচিত ডাক্তারকে নিয়ে যাওয়ার কথা ওঁর বাড়িতে। সিরিয়াস কেস।'

হরিমাধবদার গলার স্বপ্নর নরম হল, 'কী হয়েছে তাঁর?'

'নার্ভের ব্যাপার।'

'ও। স্বপ্ন, তুই কাল ওপেন করবি।'

'আমি? কেন?'

'যা বলছি শোন। বেঙ্গল টিমে কোনও ভাল ওপেনার নেই। দুতিনটে ম্যাচে যদি ক্লিক করে যাস তা হলে কপাল খুলে যেতে পারে।'

'কিন্তু আমি যে অত ডিফেন্সিভ খেলতে পারি না।'

'তোকে কে বলেছে ওপেনারদের ডিফেন্সিভ খেলতে হবে? ননসেন্স। অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল ছেড়ে দিবি, মারার বল যেমন মারিস তেমনি মারবি। প্রথম চারটে ওভার রিস্কি শট নিবি না। ব্যাস। বিকেলে এলে তোকে নিয়ে কিছুক্ষণ—। যাক গেল, ওর মাসিমা যখন অসুস্থ তখন—। আর হ্যাঁ, সুব্রত, তুই শুধু মনে রাখবি তোকে অফ স্ট্যাম্পের ওপর বল রাখতে হবে। তিনকাঠির ওই একটি ছাড়া আর কিছু তুই চিনবি না। আজ যেমন গুড লেংথে বল ফেলছিলি ঠিক তাই চাই। আচ্ছা, গুড লেংথে বল ফেলছিস দেখে স্বপ্ন যখন এগিয়ে গেল তখন হঠাৎ ফুলটস করে দিলি কেন? ওকে বোকা বানাতে?'

সুব্রত হেসে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'ইডিয়ট! ওটা না করে বলটা আর একটু স্লো ছাড়বি। ব্যাটসম্যান স্পেস বুঝতে না পেরে ফসকাবে আর অবধারিত স্ট্যাম্পড হবে।'

হরিমাধবদা চলে গেলেন। সুব্রত বাকিদের কাছ থেকে স্বপ্নাশিসকে কিছুটা দূরে সরিয়ে আনতেই স্বপ্নাশিস তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই ওরকম গুল মারলি কেন?'

'কারণ আজ বিকেলে আমরা আসতে পারব না, তাই।'

'আমরা আসতে পারব না কেন? তোর কোন মাসি—!'

'আমার কোনও মাসি নেই। শ্যামনগরে যেতে হবে। তিরিশ ওভারের খেলা। দুজনের জন্যে পাঁচশো চেয়েছি। আজ কোয়ার্টার ফাইনাল। চটপট বাড়ি গিয়ে তৈরি হয়ে উল্টোডাঙা স্টেশনে চলে আয় সাড়ে নটার মধ্যে।'

'তুই খেপ খেলতে যাচ্ছিস!'

'আমি একা নই, তুইও যাচ্ছিস। যাঃ, আর দেরি করিস না।' সুব্রত উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল। স্বপ্নাশিস হতভম্ব। সুব্রত প্রায়ই কলকাতার আশেপাশে খেপ খেলে বেড়ায় কিন্তু এখন পর্যন্ত স্বপ্নাশিস ও পথে যায়নি। হরিমাধবদার কড়া নির্দেশ আছে খেপ না খেলার। শ্যামনগরটা কোথায় চট করে মাথায় এল না। সেখানকার কোন টিমে তাদের খেলতে হবে তাও বলল না সুব্রত। ক্রিকেট এমন খেলা কোথাও কেউ একটু ভাল খেললেই খবর ছড়িয়ে যায়। বিপক্ষ দলেও পরিচিত খেলোয়াড় থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে হরিমাধবদার কানে খবর পৌঁছতে দু-একদিন লাগবে মাত্র। আর তা হলে একদম ছিঁড়ে খাবেন উনি। বেঙ্গল খেলার কোনও চান্স থাকবে না। স্বপ্নাশিষ্ দোটানায় পড়ল। তা ছাড়া আজ কলেজ আছে। এমনিতেই লিগ খেলার জন্যে ভাল কামাই হবে। কী করবে ভাবতে ভাবতে সে বাড়িতে ফিরে এসে শুনল পিতৃদেব তারস্বরে চিৎকার করছেন। এ বাড়িতে ঢোকার দুটো পথ আছে। জমাদার যে পথে ঢোকে সেই পথে ঢুকবে বলে স্বপ্নাশিস মৃদু শব্দ করতে লাগল। এর পরিণতি হল উল্টো। কেলোর মায়ে গলা পাওয়া গেল ভেতরে থেকে, 'সময় অসময় নেই হুট করে এলেই হল মুখপোড়া। এখন আমার নিশ্বাস ফেলার সময় নেই যে তোকে জল দিতে যাব। একঘণ্টা বাদে ঘুরে এসো।'

কেলোর মায়ের গলা কানে যাওয়ামাত্র পিতৃদেব আচমকা চুপ করে গিয়েছিলেন। এবার তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'আশ্চর্য! একটু আস্তে কথা বলতে পারো না!'

'বলে কী হবে? শুনতে পাবে না তো। আপনি এত জোরে জোরে কথা কইছেন—।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে। সাত সকালে লোক এসেছে বাবুর খোঁজে আর তিনি মর্নিং ওয়াকে গিয়ে এখনও ফেরেননি! আমাকে বলে কিনা যেমন করেই হোক ওকে আজ দুপুরে ক্লাবে পাঠিয়ে দেবেন। কেন? দুপুরে ক্লাবে গিয়ে আড্ডা মারবেন কলেজে ক্লাসে করার বদলে? আসুক ওর দাদা, হেস্তনেস্ত করব।'

'মা মরা ছেলেটাকে বাবু বড্ড শাসন করেন!' কেলোর মায়ের গলা শোনা গেল।

'মা তো আমারও মরে গিয়েছে কবে, মা মরা মা মরা বলে আদিখ্যেতা করো না তো! এই করেই বাঙালির বারোটা বেজে গেল।'

এইভাবে চললে সাড়ে নটা এখানেই বেজে যাবে। স্বপ্নাশিস ধীরে ধীরে সামনের দরজায় চলে এল। পিতৃদেব বসে আছেন বাইরের ঘরের ইজিচেয়ারে। কেলোর মা অবশ্যই ভেতরে দাওয়ায়। দুজনের কথাবার্তা চলছে পরস্পরের মুখ না দেখে। এ সব এ বাড়িতেই সম্ভব। পিতৃদেব খুব শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'বসো।'

এই গলা অনেককাল শোনেনি স্বপ্নাশিস, থতমত হয়ে বলল, 'আজ্ঞে।'

'আমি তোমাকে বসতে বলেছি তবে ইচ্ছে করলে দাঁড়িয়েও থাকতে পারো। হ্যাঁ, শোনো তোমার সমস্ত বন্ধুবান্ধবদের বলে দেবে বাড়িতে এসে আমাকে যেন হুকুম না করে। হুকুম সহ্য করতে পারি না বলে জীবনে চাকরি করিনি। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

স্বপ্নাশিস কিছু না বুঝেই মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। কে তাকে কোথায় কোন ক্লাবে যেতে বলেছে সেই প্রশ্ন করার সাহস হল না। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে গেল, যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

এই বাড়ির ভেতরটা অদ্ভুত ধরনের। একটা ছোট্ট বাঁধানো উঠোন আছে। তার একপাশে রান্নার ঘর। বাথরুমটা উল্টোদিকে। ওপরে পিতৃদেবের শোওয়ার ঘর। পাশের ঘরটি তালা দেওয়া থাকে। ও ঘরে কোনও মূল্যবান জিনিস আছে কি না জানা নেই। জ্ঞান হবার পর থেকেই স্বপ্নাশিস ওই তালা দেখে আসছে। নীচের পাশাপাশি দুটো ঘরে ওরা দুই ভাই থাকে। পিতৃদেবের ঘরের জানলা থেকে তাদের ঘরদুটোর দরজা দেখা যায়।

এ বাড়িতে রেডিও ছিল, এখন টিভি এসেছে। টিভি চলে যখন খবর হয়। কলকাতা দিল্লির খবরের পর চ্যানেল ঘুরিয়ে বি বি সি ধরা হয়। বি বি সি তো সারাক্ষণ পৃথিবীর খবর সাপ্লাই করছে। টিভির অপারেটার স্বয়ং পিতৃদেব। সিরিয়াল দূরের কথা কোনও ফিল্ম আজ অবধি ওই টিভিতে দেখার সুযোগ হয়নি। টিভিটা আছে বাইরের ঘরে। শুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত পিতৃদেব ওখানে বসে থাকেন। ওয়ার্ল্ড কাপ বা ওই জাতীয় মধ্যরাতের খেলা স্বপ্নাশিস ওই টিভিতে চুরি করে দেখেছে। শব্দ একেবারে বন্ধ করে খেলা দেখা যে কী বিরক্তিকর সেই অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে।

জুতো খুলে উল্টেপাল্টে দেখছিল সে। আজ সুব্রতর কথামত গেলে নিশ্চয়ই কিছু টাকা পাওয়া যাবে। সিজনে ওরা তো ভালই রোজগার করে। সেই টাকায় কি এক জোড়া কেডস হবে? হরিমাধবদা জানলে অবশ্য বারোটা বেজে যাবে। স্বপ্নাশিস হঠাৎ দরজায় ছায়া দেখে চমকে তাকাল। কেলোর মা দাঁড়িয়ে আছে অদ্ভুত মুখ করে।

'কী ব্যাপার?'

'তোমার সঙ্গে খুব দরকারি কথা আছে খোকা।' কেলোর মা ঘরে ঢুকে পড়ে বলল, 'কথাটা যেন কারও কানে না যায়।'

'কী কথা?'

'কেলোর সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।'

'সে কী? কী ব্যাপার?'

'ওকে পেত্নীতে ধরেছে।'

'যাঃ। তোমাদের যত কুসংস্কার। বস্তির লোক বলেছে বুঝি?'

'অ্যাই দেখো, চিঠি। ওর প্যান্টের পকেটে পেয়েছি। আজ যখন ঘুমোচ্ছিল তখন বের করে নিয়ে এসেছি। পড়ে শোনাও তো কী মন্তর দিয়েছে।' কেলোর মা একটা ভাঁজ করা কাগজ এগিয়ে দিল। কাঁপা হাত থেকে সেটা নিয়ে খুলল স্বপ্নাশিস। মাই ডারলিং। আই লাভ ইউ। তোকে ছাড়া আমার দিল দেওয়ানা।

মনে মনে পড়ছিল স্বপ্নাশিস, কেলোর মা ফিসফিস করে বলল, 'আঃ, আমি শুনব বললাম না, জোরে জোরে পড়ো।'

স্বপ্নাশিস বলল, 'প্রচুর বানান ভুল।'

'ঠিকঠাক করে নাও না। লেখাপড়া শিখেছ কী করতে। মেয়েটা তো চার ক্লাশের ওপর পড়েনি যে ঠিকঠাক লিখবে। বিয়ে হয়েছিল যে গ্রামে সেখানে সিনেমা হল নেই বলে ছাড়ান করে দিয়ে ফিরে এসেছে। পড়ো।'

স্বপ্নাশিস গড়গড় করে পড়তে লাগল, 'মাই ডার্লিং। আই লাভ ইউ। তোকে ছাড়া আমার দিল দেওয়ানা। গত শনিবার তুই আমাকে গ্রেসে সিনেমা দেখালি। মনে হচ্ছিল আমি মাধুরী আর তুই অজয়। আ গলে লাগ্ যা। কিন্তু ডার্লিং, এভাবে কতদিন চলবে? মাইরি বলছি, মরে যাব। তোর মা—।' স্বপ্নাশিস থেমে গেল। কেলোর মা সম্পর্কে খুব খারাপ কথা লিখেছে। সে নীচে তাকাল, 'তুমারা মাধুরী।'

'কী হল? থামলে কেন?' কেলোর মা জানতে চাইল।

'ওই আর কী।'

'আমাকে গালি দিয়েছে?'

'না না। লিখেছে, তোমার মাকে আমার খুব ভাল লাগে, খুব ভালমানুষ। আমার বাবা তোমার মায়ের প্রশংসা করত।' বানিয়ে বানিয়ে বলল স্বপ্নাশিস।

'তা করবে না। যৌবনে আমার পেছনে ঘুরঘুর করত সে। ব্যস?'

'হ্যাঁ। এটুকুই।'

'কী করা যায় বলো তো খোকা।'

'কী আর করবে?'

'কেলোর সপ্তাহে দুতিনদিন কাজ, নিজেরই চলে না। তা ছাড়া ওই পেত্নী ঘাড়ে চেপে সব শুষে নিচ্ছে। এবার ঘরে ঢুকলে আর দেখতে হবে না। এর আগে কত ছেলের ঘাড় মটকেছে তা কী বলব। আজই আমি কুরুক্ষেত্র করব।'

'খবরদার ওপথে যেও না। তা হলে কেলোও তোমার শত্রু হয়ে যাবে।'

'তাই বলে এ-সব আমি মেনে নেব?'

'ছেলেকে বোঝাও না। আচ্ছা, মেয়েটা কেমন দেখতে?'

'যৌবনে কুকুরীকেও দেখতে ভাল লাগে। আ মরণ, কার সঙ্গে এ-সব কথা বলছি। বাবু জানতে পারলে আমার ছাল ছাড়িয়ে নেবে।'তা তুমি আমার ছেলের মতো। একটা পরামর্শ দাও। আমার বুকে আগুন জ্বলছে গো।' কাঁদো কাঁদো মুখে বলল কেলোর মা। স্বপ্নাশিসের খুব মায়া হল। সে বলল, 'আমাকে ক'দিন ভাবতে দাও। তদ্দিন চুপ করে থেকো। খুব সিরিয়াস ব্যাপার। অনেকে শুনেছি বাধা পেলে আত্মহত্যা করে। কেলো ছাড়া তোমার তো কেউ নেই। আচ্ছা, ওকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। আর এখনও যাও, চটপট ভাত দাও। চিঠিটা আমার কাছে থাকল।'

বাথরুমে ঢুকে গেল স্বপ্নাশিস। কিন্তু তার মাথার ভেতর চিঠির লাইনগুলো প্রবলভাবে থেকে গেল। কেলো সম্ভবত তারই বয়সী। শৈশবে ওর মায়ের সঙ্গে এ বাড়িতে আসত। একটু আধটু খেলাধুলাও যে করেনি তা নয়। তারপর কেলোর মা ওকে কর্পোরেশনের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। সেসময় বইপত্তরের জন্যে আসত। কেলোর গায়ের রঙ কালো, স্বাস্থ্য ভাল, মাথায় মিঠুনের ছাঁট. একটু বড় হওয়া মাত্র এ বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিল কেলো। জিজ্ঞাসা করলে ওর মা বলত, 'দুঃখের কথা কী বলব খোকা, বলে যে বাড়িতে ঝিগিরি করো সে-বাড়িতে আমাকে যেতে বলবে না। পাড়ায় আমার প্রিস্টিজ আছে।'

কিন্তু স্বপ্নাশিসের সঙ্গে মাঝে-মাঝেই রাস্তাঘাটে দেখা হত। ছেলেবেলার তুই তোকারি তুমিতে উঠে গিয়েছে ততদিনে। একদিন দেশবন্ধু পার্কে সে ব্যাট করে ফিরছে, কেলো এসে বলল, 'তুমি মাইরি দারুণ খেলো তো!'

'তুই কী করছিস?'

'ড্রাইভিং শিখছি। ট্যাক্সি চালাব।'

'পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছিস।'

'ধ্যুত। ওসব ভদ্রলোকের জন্যে। আমাকে এখন মালের ধান্দা দেখতে হবে।'

এর কিছুদিন বাদে কেলোকে পুলিশ ধরেছিল সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করার অপরাধে। কেলোর মায়ের তখন কী কান্না, 'আমার ছেলে এরকম করতেই পারে না। ওর বন্ধুরা টিকিট রাখতে দিয়েছিল বলে রেখেছিল।' পিতৃদেবের শরণাপন্ন হয়েছিল কেলোর মা। তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন, 'তোমার ছেলে বলে আমি কিছু বলছি না, আমার ছেলে এরকম করলে ত্যাজ্যপুত্র করতাম।'

সেই কেলো শেয়ারে ট্যাক্সি চালায়। রোজ গাড়ি পায় না বলে রোজগার কম। তবু তাতেই খুশি ছিল ওর মা। কিন্তু এই চিঠি বলছে কেলো প্রেম করছে। স্বপ্নাশিসের মজা লাগল। মেয়েটা যে ভাবে লিখেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে সিনেমার পোকা। কিন্তু চিঠি পড়লে গা কিরকম শিরশির করে। গায়ে জল ঢালল সে। পরিচিত কোনও মেয়ের মুখ মনে করার চেষ্টা করল যে তাকে এই ভাষায় চিঠি লিখতে পারে। নাঃ কাউকে মনে পড়ল না। এ বাড়িতে কেলোর মা ছাড়া কোনও মহিলা নেই। মা মারা যাওয়া পর পিতৃদেব আবার বিয়ের করতে পারতেন। তখন তো সে একেবারে শিশু। তিনি তা না করে বিবেকানন্দের বাণী মুখস্থ করেছেন। স্বপ্নাশিস বিবেকানন্দের কোনও লেখা পড়েনি। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় পিতৃদেব যা বলেন তার সবই বিবেকানন্দের লেখা কিনা! নারীবর্জিত জীবন যাপন করেছিলেন বলে এই সংসারে আর কোনও মহিলা আসেনি। স্বপ্নাশিসের মনে হচ্ছিল কেলো বেশ ভাগ্যবান।

খাওয়াদাওয়া সেরে খেলার পোশাক, জুতো ব্যাগে ভরে গম্ভীর মুখে সে পিতৃদেবের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। তিনি সম্ভবত চোখ তুলে দেখেছিলেন নইলে স্বপ্নাশিস তার পিঠে অস্বস্তি অনুভব করল কেন? ওই সময় যদি তিনি ব্যাগ নিয়ে বের হবার কারণ জিজ্ঞাসা করতেন তা হলেই হয়ে গিয়েছিল।

উল্টোডাঙা স্টেশনের এনক্যুয়ারির সামনে সুব্রত দাঁড়িয়েছিল। ওকে দেখে হেসে বলল, 'যাক, এসে গেছিস! ওদের একজন বোলার আর ব্যাটসম্যান দরকার। তোকে তো বলেছি পাঁচ চেয়েছি, কত দেবে জানি না। যাই দিক ফিফটি ফিফটি।'

'কম দেয় নাকি?'

'কম? খেপ খেলতে গিয়ে আক্ষেপে পড়তে হয় অনেকসময়। পুরোটাই মেরে দেয়।'

'তা হলে যাচ্ছিস কেন?'

'এখানে মারবে না। আমার মামাতো ভাই আছে ওই ক্লাবে। চল, টিকিট হয়ে গেছে।' ওভারব্রিজে উঠতে উঠতে সুব্রত বলল, 'হরিমাধবদাকে একদম বলবি না।'

'কিন্তু যদি জানতে পারে।'

'দূর। কোথায় শ্যামনগর আর কোথায় দেশবন্ধু পার্ক। তোর তো আজ হাতেখড়ি।'

'হ্যাঁ। ভয় লাগছে খুব।'

'শোন, মিনিমাম ফিফটি করতে হবে তোকে। তা হলেই আরও খেপ পাবি। আর বেঙ্গল খেলে ফেললে দেখবি দর উঠে গেছে হু হু করে।'

'আমার চাই না।'

'গাড়লের মত কথা বলিস না। সেদিন বলছিলি কেড্স কেনার টাকা নেই। আজই একটা হয়ে যাবে। তা হলে? হরিমাধবদা যদ্দিন আছে তদ্দিন তুই ক্লাবের কাছে টাকা চাইতে পারবি না। অন্য ক্লাবে যাওয়াও সম্ভব নয়। বেঙ্গল খেলে মাল বানাবি কী করে? বছরে এরকম কুড়িটা খেললে তবু ইজ্জত বাঁচবে।'

নৈহাটি লোকালে উঠে বসল ওরা। সকালের ট্রেন ভিড়ের উল্টো দিকে যাচ্ছে বলে কামরায় বেশি লোক নেই। বসামাত্র নজর গেল যার দিকে তার চোখে রোদচশমা, পরনো সালোয়ার কামিজ, হাতে মোটা বাঁধানো খাতা। উদাস ভঙ্গিতে জানলার ধারে বসে প্রকৃতি দেখছে চলন্ত ট্রেনে বসে: ওর চোখ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু নাক, ঠোঁট, চিবুকের গড়ন জানিয়ে দিচ্ছে সৌন্দর্য কাকে বলে। গায়ের রঙের সকাল বেলার প্রথম রোদ মাখামাখি।

সুব্রত চাপা গলায় ডাকল, 'অ্যাই।'

সে মুখ ফেরাতে বলল, 'ওভাবে দেখতে নেই।'

'কী সুন্দর, না?'

'বেল পাকলে কাকের কী? আমরা কাক। বুঝলি। ওহো, তুই আজ ওপন করবি।'

সঙ্গে সঙ্গে চটকা কেটে গেল, 'মাথা খারাপ।'

'তোকে হরিমাধবদা তো তাই বলেছে। ওরা ওপেনার চাইছিল। এমনি টাকা দিচ্ছে নাকি? অফের বল ছেড়ে দিবি, ব্যাস।'

'বেশি জ্ঞান দিস না। কী টিমে খেলব, কাদের বিরুদ্ধে খেলব, কিছুই জানি না।'

'জানতে হবে না। শোন, তোকে আর একটা কথা বলি। এই যে আমাদের টাকা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার জন্যে তো দলের দুটো রেগুলার প্লেয়ারকে তো বসতে হয়েছে। এই ব্যাপারটা অনেকের ভাল নাও লাগতে পারে। ওরা চেষ্টা করবে তোকে বেকায়দায় ফেলতে। যে বলে রান নেই সেই বলে রান নিয়ে তোকে রানআউট করে দেবে।'

'এতে তো ওদের টিমের ক্ষতি।'

'হোক। বোঝাতে চেষ্টা করবে বাইরে থেকে ভূষিমাল এনেছে টাকা খরচ করে। আমার বেলায় ক্যাচ ছাড়বে না তবে দু-চারটে বেশি বাউন্ডারি হয়ে যেতে পারে। এরকম অভিজ্ঞতা আমার এর আগেও হয়েছে। চুরি করে সিঙ্গল নিতে যাবি না।' সুব্রত সিরিয়াস হয়ে বোঝাল।'

স্বপ্নাশিসের চোখ বারংবার তার দিকে চলে যাচ্ছিল। আচ্ছা, এই মেয়ে কি কাউকে চিঠি লেখে মাই ডার্লিং বলে! মেয়েরা বেশি সুন্দর হলে অল্প বয়সেই প্রেমিক তৈরি হয়ে যায়। নিশ্চয়ই এই মেয়ের কেউ না কেউ আছে। ভাবতেই মন খারাপ হয়ে গেল।

সুব্রত বলল, 'দমদম এসেছে।'

'কতক্ষণ লাগবে?'

'পঁয়তাল্লিশ মিনিট।'

'আমরা যেখানে নামব তার পরেও ট্রেন যাবে?'

'হ্যাঁ। নৈহাটিতে গিয়ে থামবে। তুই আজ ওপেন কর দেখবি বেঙ্গল টিমে চান্স পেয়ে যাচ্ছিস। হরিমাধবদা খুব আশা করছে তুই বেঙ্গল টিমে থাকবি।'

সুব্রতর কথা শেষ হওয়ামাত্র স্বপ্নাশিস দেখল রোদচশমা এদিকে ফিরল। কী কাণ্ড! মেয়েটা তাকে দেখছে। সেটা লক্ষ্য করে সুব্রত বলল, 'রনজিতে যদি কয়েকটা সেঞ্চুরি করতে পারিস তা হলে ইন্ডিয়া টিমে ঢুকে যেতে পারবি। কে বলতে পারে দুবছর বাদে লোকে শচীনের মতো তোর নাম করবে কিনা!'

'ভ্যাট।' স্বপ্নাশিসের মুখ থেকে শব্দটা ছিটকে বের হল। সেইসঙ্গে মুখে রক্ত জমল। মাঝেমাঝেই কল্পনায় সে এমন ছবি আঁকে, একদিন স্বপ্নও দেখেছিল, কিন্তু সুব্রতর মুখে শোনা মাত্রই অসম্ভব বলে মনে হল। অনেকদিন একা হাঁটতে হাঁটতে সে যে ছবিটা এঁকেছে তা এইরকম, রনজিতে কয়েকটা সেঞ্চুরি করে ফেলার সুবাদে সে ইন্ডিয়া টিমে চান্স পেয়েছে। ইন্ডিয়া ভার্সেস

অস্ট্রেলিয়া। প্রথমে ব্যাট করে অস্ট্রেলিয়া দুশো ষাট তুলেছে পঞ্চাশ ওভারে। স্বপ্নাশিস ওপন করেছিল। কিন্তু মাত্র পনেরো ওভারে পাঁচ উইকেট চলে গিয়ে ইন্ডিয়ার ত্রিশ রান। সবাই বুঝে গিয়েছে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। হঠাৎ তার মন শক্ত হল। মনে মনে বলল, জাগো বাঙালি। ওয়ার্ন বল করতে আসছে, সোজা মাথার ওপর দিয়ে ছয়। লেগ অফ দিয়ে পর পর চারটে চার, শেষ বলে এক নিয়ে উল্টোদিকের উইকেটে গিয়ে নেক্সট ওভার ফেস করল সে। এক ওভারে তেইশ রান। বাইশ ওভার বাকি থাকতে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়ে সে বেরিয়ে আসছে মাঠ থেকে ব্যাট উঁচু করে। সে জানে এ সবই স্বপ্ন, কিন্তু স্বপ্নটাকে দেখতে ভারি ভাল লাগে।

একটার পর একটা স্টেশন পেরিয়ে যাচ্ছে ট্রেনটা। ব্যারাকপুরে এসে থামতেই মেয়েটা নড়েচড়ে উঠল। স্বপ্নাশিসের খুব খারাপ লাগছিল, মেয়েটা নিশ্চয়ই নেমে যাবে এখানে। কিন্তু ও নামল না। মাঝে মাঝে বাইরের প্রকৃতি দেখছে, আবার ভেতরেও নজর রাখছে। রোদ চশমার জন্যে ওর চোখ দেখা যাচ্ছে না, এই মুশকিল।

হঠাৎ উল্টোদিকে বসা এক বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ক্রিকেট খেলো?'

সুব্রত মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

'শ্যামনগরে যাচ্ছ?'

'আপনি জানেন ওখানে খেলা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। খুব পুরনো টুর্নামেন্ট। আমরা যখন রনজি খেলতাম তখন অবশ্য এতসব টুর্নামেন্ট ছিল না। কলকাতার বাইরে খেলতে গেলে তো তোমরা টাকা নাও?'

'দিলেই নিই।' সুব্রত বলল, 'ও অবশ্য এই প্রথম যাচ্ছে। কোনওদিন টাকা নেয়নি। আপনি কবে রনজি খেলতেন? পঙ্কজ রায়ের সময়ে?'

'না না। তারও আগে। লিগে খেলো?'

'হ্যাঁ। ওর এবার বেঙ্গল খেলার সম্ভাবনা আছে।'

বৃদ্ধ তাকালেন স্বপ্নাশিসের দিকে, 'তা হলে আরও পরিশ্রম করো। এই যে উৎপল চ্যাটার্জি, কত পরিশ্রম করেছে বলেই তো তিরিশ বছর বয়সে সুযোগ পেল, আমি ওর কাছে বেশি আশা করি না। এখন ষোলো-সতেরোতে একটা প্লেয়ার তৈরি হয়ে যায়। তোমাদের বয়সে তো চুটিয়ে খেলা উচিত।'

এমন সময় মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। চলন্ত ট্রেনে ব্যালান্স রাখতে রাখতে এগোল দরজার দিকে। বৃদ্ধ বললেন, 'তোমরা বসে আছ কেন? শ্যামনগর এল বলে।'

ওরা ঝটপটিয়ে উঠে দাঁড়াল। স্বপ্নাশিস দেখল মেয়েটি গম্ভীর ভঙ্গিতে নেমে গেল প্ল্যাটফর্মে। ওরা নামতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কত দূরে মাঠ?'

সুব্রত বলল, 'আমি জানি না। ভেবেছিলাম বাবলু আসবে আমাদের নিতে। প্রথমে মামার বাড়িতেই যেতে হচ্ছে।'

'বাবলুটা কে?'

'আমার মামাতো ভাই।'

কিন্তু বাবলুর দর্শন পাওয়া গেল। সে তার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে এসেছে স্টেশনে। সুব্রত পরিচয় করিয়ে দেবার পর বাবলু তাকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল। স্বপ্নাশিস দেখল বাবলুর কথা শুনে সুব্রত মাথা নাড়ছে খুব। শেষপর্যন্ত অনুরোধে ঢেঁকি গিলল।

রিকশায় বসে সুব্রত বলল, 'নিজের মামাতো ভাইকেও বিশ্বাস করা যায় না।'

'কেন? কী করেছে?'

'বলছে চারশো টাকার বেশি দিতে পারবে না। ভেবেছিলাম ফিরে যাব, তারপরে মনে হল তাতে কী লাভ হবে। দিনটা নষ্ট করার চেয়ে যা পাওয়া যাচ্ছে তাই নেওয়া যাক। তুই আড়াই নিস আমি দেড় নেব। ঠিক আছে?' সুব্রত বলল।

'যা দেবে ফিফটি ফিফটি হবে।'

সাইকেলে চেপে বাবলুরা আগে আগে যাচ্ছিল। হঠাৎ স্বপ্নাশিস মেয়েটাকে দেখতে পেল। রাজেন্দ্রাণীর মতো রাস্তার ধার ঘেঁষে চলেছে। পাশ দিয়ে রিকশাটা যখন যাচ্ছিল তখন সে মুখ ফিরিয়ে তাকাতে মেয়েটি মুখ তুলল। এখন ওর চোখে রোদ চশমা নেই, চোখ দুটো আশ্চর্য সুন্দর। ওই চোখের দিকে তাকালে আয়ু এক কোটি বছর বেড়ে যায় অনায়াসে। কিন্তু এই মেয়ে কি হাসতে জানে না। মুখে কোনও ভাঁজ পড়ল না স্বপ্নাশিসকে দেখেও। রিকশাটাও বেশ কিছুটা পথ চলে এলে সুব্রত বলল, 'তোর এই দোষ ছিল না।'

'কী দোষ?'

'পটেটোর।'

'ভাগ্।'

'মফস্বল শহরের মেয়েদের দিকে ওভাবে তাকাস না। এখানকার লোক বাইরের মানুষকে মনে মনে অপছন্দ করে। অন্তত নিজেদের মেয়েদের ব্যাপারে—!'

'তুই চুপ কর।'

স্বপ্নাশিস যা ভেবেছিল তা নয়। কাজের দিন হলেও প্রচুর দর্শক মাঠে। দুদিকে সামিয়ানা টাঙিয়ে টেন্ট হয়েছে। বেশ কিছু বয়স্ক মানুষ খেলা নিয়ে রীতিমতো সিরিয়াস। আলাপটালাপ হওয়ার পর সে তার দলের ক্যাপ্টেনকে লক্ষ করছিল। গাওস্কর গাওস্কর ভাব। টসে হেরে ফিল্ডিং নিতে বাধ্য হতে ওরা মাঠে নামল। মাঠের দুপাশ দিয়ে রাস্তা, বাড়ি। সুব্রত ভাল বল করেছে। তবু তিরিশ ওভারে একশ আশি রান তুলে ফেলল বিপক্ষদল। ওরা নাকি তিনজন সিনিয়র ডিভিশনের খেলোয়াড় এনেছে।

লাঞ্চে সুব্রত বলল, 'কী রে, পারবি তো?'

স্বপ্নাশিস খিঁচিয়ে উঠল, 'ক্রিকেট কি একজনের খেলা? তুই তো ভাল বল করলি, পারলি ওদের রান রুখতে! কম করে পঞ্চাশ রান বেরিয়ে গেছে ফিল্ডিং-এর দোষে।'

গাওস্কর একজন প্রৌঢ়র সঙ্গে এগিয়ে এল, 'আমাদের আস্কিং রেট ছয়। অর্থাৎ পার বল এক রান। একদম ঠুকে খেলা চলবে না। প্রথম থেকেই অলআউট যান। আপনি তো ওপন করবেন? কথাটা খেয়াল রাখবেন।'

ইনিংস শুরু করতে নামল স্বপ্নাশিস। ব্যাট হাতে যেতে যেতে সঙ্গীকে বলল, 'আমি কল না দিলে আপনি রান নেবেন না। অন্তত প্রথম কয়েকটা ওভার ধরে খেলতে চাই।'

'ক্যাপ্টেন বলেছে অলআউট যেতে। কথা না শুনলে পরের ম্যাচে বসিয়ে দেবে।'

ছেলেটির কথা শুনে কাঁধ নাচাল স্বপ্নাশিস। কিছু বলার নেই। ছেলেটাই শুরু করল। প্রথমেই দুই রান। দ্বিতীয় বলে এল বি ডব্লু। সমস্ত মাঠ চুপচাপ, শুধু ফিল্ডাররা নাচছে। প্রথম ডাউন এসেই একটা রান নিল। চতুর্থ বল ফেস করার আগে মাঠ দেখে নিল স্বপ্নাশিস। এবং তখনই চোখে পড়ল তাকে। বোলারের পেছন দিকে বাড়ির ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে। এতক্ষণ সে ফিল্ড করেছে কিন্তু ওই বাড়ির দিকে তাকায়নি। গুড লেংথ বল মাঝ ব্যাটে রাখল সে।

বাকি দুটো চমৎকার ঠেকিয়ে দিল। মনে মনে ঠিক করল অটুট হবে না এবং যতক্ষণ পারে উইকেটের এই এন্ডেই থাকবে। এদিকে থাকলে ওকে দেখা যাবে।

তিন ওভারে দশ রান উঠতেই চিৎকার শুরু হল। দর্শকরা চেঁচাচ্ছে, গাওস্করও। আট রান করে ছয় মারতে গিয়ে লোপ্পা ক্যাচ দিয়ে ওয়ান ডাউন ফিরে যেতে নতুন ব্যাটসম্যান এসে তাকে বলল, 'দেবীদা বলছেন মেরে খেলতে। এ ভাবে খেললে টিম হেরে যাবে।'

'তাই বলে সুইসাইড করতে হবে নাকি।'

'দেখুন! টিম না জিতলে আপনাদের পেমেন্ট নিয়ে ঝামেলা হবে।'

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল স্বপ্নাশিসের। ইচ্ছে করছিল এখনই মাঠ ছেড়ে চলে যেতে। হরিমাধবদা কেন খেপ খেলার বিরোধী তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু মাঠ ছেড়ে গেলে বিশেষ একজন দর্শক কী ভাববে তাকে? স্বপ্নাশিস মুখ তুলল। যাঃ, মেয়েটা ব্যালকনিতে নেই।

ফুলটস বল দেখে সজোরে ব্যাট চালাল স্বপ্নাশিস। মিড অন দিয়ে সোজা ছয়। হাততালি পড়ছে খুব। এবার গুড লেংথ পড়ছে দেখে এগিয়ে গেল সে। ঠিক যেভাবে হরিমাধবদা বলেছিলেন সেইভাবে বলটাকে ফুলটস করে নিয়ে মারতেই আবার ছয়। এবার উল্লাস ছড়িয়ে পড়ল। স্বপ্নাশিস দেখল, সম্ভবত, চিৎকার শুনেই মেয়েটি ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে। দুটো ছয় খেয়ে বোলার সম্ভবত ক্ষিপ্ত হয়েছিল। শট পিচে প্রচণ্ড জোরে ঠুকল বলটাকে। পিচে পড়েই তীব্র গতিতে বলটা উঠে এল মাথা লক্ষ্য করে। পা মুড়ে শরীর ছোট করে হুক করল স্বপ্নাশিস। বলটা আকাশে উঠে যাচ্ছে। ফিল্ডাররা ছুটে যাচ্ছে ক্যাচের আশায়। সে ব্যালকনির দিকে তাকাতেই দেখল মেয়েটি বল দেখছে। যেন তার চোখের আকর্ষণে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে বলটা বাউন্ডারির বাইরে চলে গেল। তিন বলে আঠারো রান। সমস্ত চিৎকার ছাপিয়ে দেবুদা নামক প্রৌঢ়টির গলা ভেসে এল, 'চালিয়ে যাও ব্রাদার।'

হঠাৎ মনে পড়ল রবি শাস্ত্রী এক ওভারে ছটা ছক্কা মেরেছিল। তার চেষ্টা করতে দোষ কী! চতুর্থ বলটা বাউন্ডারি হয়ে গেল। এক ওভারে বাইশ। বোলারের সঙ্গে ওদের ক্যাপ্টেন আলোচনা করছে। ফিল্ডারদের ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে মাঠের চারপাশে। স্বপ্নাশিস প্রচণ্ড জোরে ব্যাট চালাতে বল বোলারের মাথার ওপর দিয়ে বুলেটের মতো ছুটে গেল। মাঠ পেরিয়ে সোজা নির্দিষ্ট বাড়ির দোতলার ব্যালকনিতে আছড়ে পড়ল সেটা। হই হই চিৎকারের মধ্যে সে মেয়েটিকে মুখে হাত চেপে বসে পড়তে দেখল। পাঁচ বলে আঠাশ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোলমাল শুরু হয়ে গেল।

বেশ কিছু লোক মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কয়েকজন বাড়িটার সামনে গিয়ে জানতে চাইল মেয়েটা কতখানি আহত। স্বপ্নাশিস ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। বিপক্ষ দলের কয়েকজন তেড়ে এল, 'জেনেশুনে মেরেছে। তখন থেকে লক্ষ্য করছিলাম বারবার ওই দিকে তাকাচ্ছে। ওর যদি কিছু হয় তা হলে জ্যান্ত কবরে যেতে হবে তোমাকে।'

এইসময় আর একটা দল দেখা গেল। দেবীদা চিৎকার করছিলেন, 'হচ্ছেটা কী? অ্যাঁ? হেরে যাবে বুঝে খেলা ভণ্ডুল করে দেবার মতলব। এ আমি হতে দেব না। আম্পায়ার কোথায়? এই যে মশাই, খেলা আরম্ভ করুন। আপনাদের কোনও ভয়েস নেই?'

আম্পায়ার দুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তাণ্ডব দেখছিলেন, 'পুলিশের অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই, ভিড় সরাবে কে? আপনারা মাঠ থেকে পাবলিক বের করে দিন আমরা খেলা শুরু করছি।'

সুব্রত চলে এসেছিল পাশে। চেঁচিয়ে বলল, 'ভয় পাস না।'

'আশ্চর্য! আমার কী দোষ বল তো?'

'দোষ নেই, তবে অত জোরে না মারলেই পারতিস। মেয়েটা বোধহয় এ পাড়ার নায়িকা

তাই কিছু পাবলিক খেপে গিয়েছে।' সুব্রত মন্তব্য করল।

ইতিমধ্যে জনতার কেউ উইকেট তুলে নিয়েছে। তার পেছনে একদল ধাওয়া করল। আর তারপরেই ঢিল পড়তে লাগল। দেবুদা ওদের সরিয়ে নিয়ে গেল সামিয়ানার নীচে। এবং তখনই পুলিশের জিপ এসে হাজির হল। সঙ্গে সঙ্গে জিপটাকে ঘিরে এইসব শব্দাবলী বর্ষিত হতে লাগল, 'মেরে ফেলেছে, অ্যাটেম্প টু মার্ডার, ইচ্ছে করে মেরেছে, ওদের সাপোর্টার না বলে প্ল্যান করে মেরেছে। কক্ষনও নয়। অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। বাউন্ডারির বাইরে বা ভেতরে বল কারও শরীরে লাগলে ব্যাটসম্যান দায়ী নয়।

স্বপ্নাশিস নার্ভাস হয়ে গেল। পুলিশ আসার আগে পর্যন্ত সে শক্ত ছিল। এখন পুলিশ যদি তাকে অ্যারেস্ট করে তা হলে বেঙ্গল টিমে চান্স পাওয়া তো দূরের কথা তাকে পিতৃদেব বাড়িতে ঢুকতে দেবেন কি না সন্দেহ। এমন ঘটনার কথা কাগজে বের হবেই এবং হরিমাধবদা জানতে পারলে তার ক্রিকেট-জীবন খতম।

স্বপ্নাশিস ভাবল এই ভিড়ভাট্টার সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু যদি ওরা দেখতে পায় তা হলে পিছু ধাওয়া করে গণধোলাই দেবে। এখানকার রাস্তাঘাটও তো সে ভাল করে চেনে না। ট্রেন ছাড়া ফেরার কি অন্য কোনও উপায় আছে? এইসময় একজন এস আই জিপ থেকে নেমে সামিয়ানার নীচে এলেন, 'ব্যাটসম্যান কে ছিলেন?'

স্বপ্নাশিস জবাব দেবার আগেই দেবুদা বললেন, 'কেন? কে ব্যাটসম্যান সেটা কোনও কথা নয়। খেলাটা ক্রিকেট। একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে খেলতে হয়। আর সেটা করতে গিয়ে বল মাঠের বাইরে গিয়ে কাউকে আঘাত করেছে। এজন্যে দায়ী ওই ক্রিকেট খেলাটাই, কোনও ব্যাটসম্যান নয়।'

এস আই বললেন, 'সেটা বেশ বুঝতে পারছি তবে এই যুক্তি টিকবে না যদি উন্ডেড পার্সেনের কেউ আমাদের কাছে ডেফিনিট কমপ্লেন করে। আপনার কেউ এখান থেকে যাবেন না, আমি যতক্ষণ ওই বাড়ি থেকে ঘুরে না আসছি।' এস আই এগিয়ে গেলেন।

সুব্রত দেবীদাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার টিম কি লোকাল টিম নয়?'

'তাতে কী হয়েছে? ওরাও বিদেশি নয়। ঝামেলা পাকিয়ে দিলে সবাই মজা পায়। যারা মজা পেতে চেয়েছে তারা খেলা ভণ্ডুল করে ওদের বাঁচিয়ে দিল।'

গাওস্কর বলল, 'কিন্তু আমাদের তো কোনও দোষ নেই। আম্পায়ার রিপোর্ট দিলে টুর্নামেন্ট কমিটি নিশ্চয়ই আমাদের উইনার ডিক্লেয়ার করবে।'

দেবুদা মাথা নাড়ল, 'না। খেলা ভণ্ডুল হলে রিপ্লে হবে যদি কোনও দল অন্তত পনেরো ওভার খেলার সুযোগ না পায়। কিন্তু ভাই, কী নাম যেন—!'

সুব্রত মনে করিয়ে দিল, 'স্বপ্নাশিস।'

'হ্যাঁ, স্বপ্নাশিস! আমি লক্ষ্য করছিলাম তুমি ওই বোলার এন্ডে থাকাটা পছন্দ করছ আর প্রতিটি বলে হিট করার আগে ওপরের দিকে তাকাচ্ছিলে। কারণটা কী?'

পাশ থেকে সুব্রত ঝটপট জবাব দিল, 'ওটাই ওর মুদ্রাদোষ।'

'হরিমাধব শুধরে দেয়নি? ওর মতো লোক এটা অ্যালাউ করছে? আশ্চর্য!'

স্বপ্নাশিসের বুকের ভেতরটা নড়ে উঠল। এই উদ্যোক্তাটিও জানে সে কার শিষ্য? হয়ে গেল। সুব্রতর ওপর বেজায় রাগ হচ্ছিল তার। এইসময় দুজন মধ্যবয়স্ক মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল এদিকে। তাঁদের দেখেই গম্ভীর হয়ে গেল এদের সবাই।

কাছে এসে ওঁদের একজন বললেন, 'ব্লাড দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি বাচ্চারা, বুঝতেই

পারছ। যা হবার তা তো হয়েছে। দেবু, ব্যাপারটা ভুলে যাও।'

দেবুদা চিৎকার করলেন, 'ব্লাড দেখে? মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ব্যালকনির কোনো মেয়ের শরীর থেকে ব্লাড বের হচ্ছে তা বুঝল কী করে তোমাদের প্লেয়াররা? ইয়ার্কি মারতে এসেছ? এর নাম ক্রিকেট?'

একজন বলল, 'দেখো ভাই, বল গিয়ে ডাইরেক্ট হিট করেনি। দেওয়ালে ধাক্কা লেগে গায়ে লেগেছে। নইলে মার্ডার কেসে পড়ে যেতে।'

'মার্ডার কেস আমাকে দেখিও না। ব্যাটসম্যানের হিটে কেউ মারা গেলেও কেস হবে না।'

'বাঃ। ব্যাটসম্যান যদি তার শত্রুকে আহত করবে প্ল্যান নিয়ে হিট করে তা হলে ক্রিকেটের দোহাই দিয়ে বেঁচে যাবে?' লোকটি প্রতিবাদ করল।

' দেখো, কোনও ব্যাটসম্যান যদি মাঠের বাইরে ব্যালকনিতে বসে থাকা কাউকে খেলা চলার সময় প্ল্যান করে হিট করতে পারে তা হলে তাকে আমি মাথায় তুলে নাচব। পৃথিবীতে এমন ব্যাটসম্যান খুব কমই আছে। যাক গে, কী বলতে এসেছ?'

'আজ আর খেলা আরম্ভ করা যাবে না। এসো আমরা একসঙ্গে রিপ্লের জন্যে বলি। তবে ওই ভাড়াটে প্লেয়ারকে দলে রেখো না।'

'কাকে রাখব সেটা আমি বুঝব। কেন, তোমার দলে ভাড়াটে নেই?'

'কিন্তু ওকে দেখলেই পাবলিক সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাবে।'

'না। তুমি ভয় পাচ্ছ ও খেললে তোমার টিম হেরে যাবে।'

এইসময় এস আই ফিরে এলেন, 'কোনও কারণ ছাড়াই আপনারা দক্ষযজ্ঞ বাধালেন। মেয়েটি সামান্য আহত হয়েছে এবং কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করেনি। অতএব—। যাক গে, খেলা তো আজ হচ্ছে না, তা হলে ভিড় হঠান। যান, যে যার কাজে চলে যান।' শেষের কথাগুলো জনতার উদ্দেশে বলে জিপের দিকে এগিয়ে গেলেন এস আই।

দেবুদার ক্লাব তাদের সরঞ্জাম প্যাক করছিল। খেলোয়াড়রা চলে যাচ্ছে যে যার বাড়ি। সুব্রত বাবলুকে ফিসফিস করে কিছু বলতেই বাবলু দেবুদার কাছে গেল। দেবুদা কী ভেবে পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে সুব্রতর দিকে এগিয়ে গেলেন, 'অন্য কেউ হলে এক পয়সাও দিত না। আমি দিচ্ছি। হাজার হোক তোমরা নিজের পয়সায় ট্রেনের টিকিট কেটে এখানে এসেছ। তাই যা খরচ করেছ তার অনেক বেশি দিচ্ছি।'

সুব্রত বলল, 'সে কী! প্রথমে কথা হয়েছিল আপনারা পাঁচ দেবেন। পরে বাবলু বলল এক কম হবে। চারশোর বদলে পঞ্চাশ দিচ্ছেন?'

'চারশোই দিতাম যদি খেলাটা শেষ হত। রিপ্লে হবে, আবার এই ম্যাচের জন্যে আমাকে খরচ করতে হবে। এক জিনিসের দাম দুবার দেওয়া যায় না।'

'খেলা বন্ধ হবার জন্য আমরা দায়ী নই। আমাদের যা দেবেন বলে এনেছেন তা দিতে হবে। পেমেন্ট নিয়ে ঝামেলা করবেন না।'

দেবুদা হাসলেন, 'খেলা বন্ধ হবার জন্যে তোমার বন্ধু দায়ী। আমি ছিলাম বলে ও প্রাণে বেঁচে গেল। কোথায় সেই কারণে কৃতজ্ঞ হবে তা নয় আবার চোখ রাঙাচ্ছ। কী, বাবলু, ওদের একটু বুঝিয়ে বল।' দেবুদা সামনে থেকে সরে গেলেন।

সুব্রত আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু স্বপ্নাশিস তাকে বাধা দিল, 'ছেড়ে দে।'

'ছেড়ে দেব মানে? তুই জানিস না, কোনও না কোনও অজুহাত দেখিয়ে টাকা মেরে দেওয়া হয়।'

'তা হলে ডাকলে আসিস কেন? চল, ফিরে যাই।'

বাবলু বলল, 'সুব্রতদা, বাবা তোমাকে বাড়ি ঘুরে যেতে বলেছে।'

'আজ সম্ভব নয়। মেজাজ ভাল নেই।'

অনেকক্ষণ ধরে সাহস হচ্ছিল না বলে স্বপ্নাশিস ব্যালকনির দিকে তাকায়নি। মাঠ ছেড়ে আসার সময় সে আড়চোখে তাকাল। ব্যালকনি ফাঁকা, বাড়ির সামনেও ভিড় নেই।

বাবলুরা ওদের স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গেল। নৈহাটি লোকালে বসে স্বপ্নাশিসের মনে হল এ-ভাবে চলে আসা ঠিক হল না। ট্রেন তখন কাঁকিনাড়া ছাড়িয়েছে। সে বলল, 'আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল, ইস্‌।'

সুব্রত অবাক হল, 'কার কাছে ক্ষমা চাইবি?'

'ওই যে, যে আহত হয়েছে আমার জন্যে। এটা তো মিনিমাম ভদ্রতা।'

'রাখ। চিনি না জানি না, ক্ষমা চাইতে গেলে অপমান করতে পারত।'

'না। আমার তা মনে হয় না। দেখে খুব মার্জিত ভদ্র বলে মনে হয়েছে।'

'তুই পিচে দাঁড়িয়ে দূরের ব্যালকনির একটা মেয়ের মধ্যে অত গুণ আবিষ্কার করলি?'

'বাঃ, পিচে দাঁড়িয়ে কেন হবে? আমরা তো একসঙ্গে ট্রেনে ফিরেছিলাম।'

'অ্যাঁ? মাই গড।' লাফিয়ে উঠল সুব্রত, 'সেই মেয়েটা নাকি?'

স্বপ্নাশিস বিমর্ষ মুখে তাকাল। সেটা লক্ষ্য করে সুব্রত বলল, 'কথাটা আগে বললি না কেন, তা হলে না হয় একটা চেষ্টা করা যেত। ভুলে যা, এরকম কত কেস আসছে যাবে, কোথায় কলকাতা আর কোথায় শ্যামনগর। ছোঃ।'

সুব্রত তার বাড়িতে চলে গিয়েছিল কিন্তু স্বপ্নাশিস মাঠে চলে এল। এখনও সন্ধে হয়নি। প্র্যাকটিস শেষ করে হরিমাধবদা কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ওকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি চলে এলে?'

'এলাম'। স্বপ্নাশিস কোনওমতে বলল। কথাটা কী করে জানাবে ভেবে পাচ্ছিল না সে, অথচ না জানিয়ে উপায় নেই এটা বুঝতে পারছিল।

'কেমন আছেন সুব্রতর মাসি?'

স্বপ্নাশিস হাসার চেষ্টা করল। যে হাসির কোনও অর্থ নেই।

অন্যদের সঙ্গে কথা শেষ করার আগে ক্লাবের এক কর্তা এসে বললেন, 'স্বপ্ন আজ তোমার বাড়িতে খবর পাঠিয়েছিলাম। পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। আমাকে একটু কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল—।'

'ও। কিন্তু তোমার বাবা কি চান না যে তুমি খেলাধুলা কর?'

'ঠিক তা নয়—।'

'যাক গে, তোমার জন্যে কিছু জিনিস রয়েছে, ক্লাব থেকে নিয়ে যেয়ো।'

'কী জিনিস?'

'খুব সামান্য। নিজেই দেখো।' ভদ্রলোক চলে গেলেন।

অন্যদের সঙ্গে কথা শেষ করে হরিমাধবদা সামনে এলেন, 'কিছু বলবি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি রাগ করতে পারবেন না।'

'আশ্চর্য! রাগ করার মত কিছু হলে আমি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকব? কী ব্যাপার?'

'আমি সুব্রতর মাসিকে দেখতে যাইনি। ওর কোনও মাসি নেই।'

'তা হলে?' হরিমাধবদা অবাক।

'সুব্রতর সঙ্গে শ্যামনগরে গিয়েছিলাম। সুব্রত ওর মামাতো ভাইকে কথা দিয়েছিল বলে আমাকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল তিরিশ ওভারের ম্যাচ খেলতে।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন হরিমাধবদা। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত টাকা পেলি?'

'টাকা পাইনি। ম্যাচ ভণ্ডুল হয়ে গিয়েছিল।' কোচের মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না। সে কিন্তু কথাটা বলে ফেলে যেন বেঁচে গেল।

'তুই আমার সঙ্গে মিথ্যাচার করলি স্বপ্ন?'

'বিশ্বাস করুন, আজ সকালের আগে আমি জানতাম না।'

'আমি তোদের বলিনি ওসব খেপ খেলতে কখনও যাবি না?'

'আমি কখনও খেলিনি। কখনও খেলব না।'

'কী করে বিশ্বাস করি। আগামীকাল ম্যাচ। আজ খেপ খেলতে গিয়ে তুই আহত হতে পারতিস। বিকেলে টিমের সবাই এল শুধু তোরা দুজন এলি না। কী ভেবেছিস? তোদের ছাড়া টিম চলবে না? সি এ বি-তে একটু আধটু তোদের কথা হচ্ছে শুনেই ধরাকে সরা ভেবেছিস? না, তোদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কোনও লাভ নেই।' হরিমাধবদা ঘুরে দাঁড়ালেন।

ছুটে এসে ওঁর হাত ধরল স্বপ্নাশিস, 'মাপ করে দিন, প্লিজ। আমি জানতাম ও মাসিকে দেখতে যাবে। সকালে আপনি চলে যাওয়ার পর ম্যাচের কথা জানতে পারলাম।'

'নিজে দোষ করে এখন বন্ধুকে ফাঁসাচ্ছিস?'

ঢোক গিলল স্বপ্নাশিস। ব্যাপারটা তো তাই। কিন্তু সে তো মিথ্যে বলছে না।

হরিমাধবদা হাঁটছিলেন মাঠের মাঝখান দিয়ে। স্বপ্নাশিস পাশে চলছিল। বিড়বিড় করছিলেন হরিমাধবদা, 'সিনসিয়ারিটি নেই, এখন থেকেই তোরা ডিজঅনেস্ট! এত টাকার দরকার? তোর তো অবস্থা খারাপ নয়। তবু খেপ খেলতে গেলি! একজন প্লেয়ারের অহঙ্কারবোধ থাকা দরকার। খেলা ভণ্ডুল হল কেন?'

শেষ প্রশ্ন এমন আচমকা যে উত্তর দিতে গিয়ে কথা খুঁজতে হল, 'মানে, আমি ছয় মেরেছিলাম, বলটা উঠে গেল ওপরে, গিয়ে একটি মেয়ের গায়ে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই হই হই করে মাঠে ঢুকে পড়ল।'

'আশ্চর্য! ছয় কেউ দেখেশুনে উন্ডেড করবে বলে মারতে পারে না। তোর টিমের অন্য সবাই প্রতিবাদ করল না? নাকি টিম হারছিল?'

'আমরাই ভাল পজিশনে ছিলাম। দেবুদা, মানে টিমের ম্যানেজার প্রতিবাদ করেছিলেন কিন্তু তবু খেলা হয়নি।'

'দেবুদা? শ্যামনগরের দেবু দত্ত?'

'টাইটেল জানি না তবে আপনাকে চেনে।'

'বাঃ। সুনাম বাড়িয়ে এসেছ। মেয়েটা কেমন আছে?'

'দেখিনি।'

'দেখিসনি? তোর হিটে যে মেয়েটা উন্ডেড হল সে কেমন আছে তা না দেখে চলে এসেছিস? তোদের কি সৌজন্যবোধও নেই? ছি ছি।' হরিমাধবদা খেপে গেলেন, 'পশুর মতো কাজ করেছিস। কালই গিয়ে খোঁজ নিবি।'

'কাল তো ম্যাচ।'

'নো। এই ম্যাচে তুমি খেলছ না। পানিশমেন্ট। তোমার কথা যদি সত্যি হয় তা হলে সুব্রত দুটো ম্যাচে বসবে।' হনহন করে এগিয়ে গেলেন হরিমাধবদা।

ক্ষোভে দুঃখে চোখ উপচে জল গড়িয়ে এল। প্রথমে সুব্রত তার পরে হরিমাধবদার ওপর রাগ হল ওর। সুব্রত অহেতুক ঝুঁকি নিয়েছিল কিন্তু হরিমাধবদার কাছে সব কথা খুলে বলার পরও তিনি তাকে শাস্তি দিলেন। অন্যায় করে স্বীকার করলে ক্ষমা করতে পারা যায় না? সে যদি না বলত তা হলে আগামিকালের ম্যাচে অনায়াসেই খেলতে পারত। বড় ক্লাবের সঙ্গে ম্যাচ, একটা সেঞ্চুরি করতে পারলেই সি এ বি-র ভাল নজর পড়ত। এইসব ম্যাচের দিকেই ওরা তাকিয়ে থাকে। সুযোগটা হাতছাড়া হওয়া মানে অনেক পিছিয়ে যাওয়া।

ক্লাবে প্লেয়ার লিস্ট তৈরির ব্যাপারে হরিমাধবদাই শেষ কথা। তিনি অন্য কিছুতে নাক গলান না, ক্লাব রাজনীতিতে থাকেন না। কিন্তু কাকে কোন ম্যাচে খেলাবেন সে ব্যাপারে কোনও অনুরোধ কান দেন না। কী করা যায়। মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল স্বপ্নাশিস, এমন সময় কেউ তার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকল। সে দেখল ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে মালি হাত নাড়ছে। কাছে যাওয়া মাত্র মালি বলল, 'তোমাকে সেকেটারিবাবু ডাকছে।'

স্বপ্নাশিসের খেয়াল হল। বাড়ির যাওয়ার আগে তাকে দেখা করে যেতে বলা হয়েছিল। ওদের ক্লাবের সেক্রেটারির নাম সুনীল চ্যাটার্জি। এককালে ক্রিকেট খেলতেন, এখন নামকরা উকিল। ভেতরে গিয়ে সামনে দাঁড়ালে সুনীলবাবু বললেন, 'ওই প্যাকেটটা তোমার জন্যে।'

'কী আছে?'

'বাড়িতে গিয়ে দেখো।' সুনীলবাবু হাসলেন।

স্বপ্নাশিস প্যাকেটটা নিল, বেশ ভারী। তারপর বেরিয়ে পড়ল।

তখন সন্ধে হয়ে গেছে। দ্রুত পা চালিয়ে বাড়িতে পৌঁছাতেই চারপাশে আলো জ্বলে উঠল। পিতৃদেব বসে আছেন বাইরের ঘরে। দেখামাত্র প্রশ্ন ছুটে এল, 'রাজকার্য শেষ হল?'

স্বপ্নাশিস দাঁড়াল। এর উত্তর তার জানা নেই।

'কোথায় ছিলে সারাদিন?'

'খেলা ছিল।'

'শোনো। তোমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। খেলবে না পড়বে?'

'দুটোই।'

'দুই নৌকোয় পা রাখলে কি হয় তা জানো না? খেলে কি হাতিঘোড়া হবে? কলকাতায় খেলে কেউ তেণ্ডুলকার হয় না। চাকরি বাকরি পাবে?'

'পেতে পারি।'

'হাতে ওটা কী?'

'ক্লাব থেকে দিয়েছে। খুলে দেখিনি।'

'খোলো।'

অতএব প্যাকেট খুলতে হল। প্রথমেই বের হল একজোড়া জুতো। তার মাপের। বেশ হালকা এবং দামি, দৌড়াতে আরাম লাগে। সেইসঙ্গে দুজোড়া মোজা।

'হোয়াট ইজ দিস?'

'স্পোর্টস স্যু।'

'ক্লাব তোমাকে জুতো দিল কেন?'

'জানি না। আমি দিতে বলিনি।'

'তোমার খেলার জুতো নেই?'

'আছে। তবে অবস্থা ভাল নয়।'

'জুতো দান নেওয়া কখনও উচিত নয়। তবে নিয়ে নিয়েছ যখন তখন আর কী করা যাবে। যাও তোমার দাদাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।'

ভেতরে ঢুকে যেন বেঁচে গেল স্বপ্নাশিস। দেবাশিসের ঘরের দরজায় পৌঁছে দেখল সে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ছে। কোনও কোনও ছেলেকে দেখলেই বোঝা যায় ভাল ছাত্র, দেবাশিস ঠিক সেই ধরনের। স্বপ্নাশিস বলল, 'দাদা, তোকে বাবা ডাকছেন।'

দেবাশিস ঘাড় ফিরিয়ে ভাইকে দেখল, 'ওগুলো কী? কিনলি?'

'টাকা কোথায় পাব? ষাট টাকায় চলে যে এগুলো কিনব। ক্লাব থেকে দিয়েছে আর তাতেই বাবা খেপে গিয়েছেন।' স্বপ্নাশিস বিরক্ত হয়ে বলল।'

দেবাশিস উঠে এল, 'ঘাবড়াস না। তুই একবারে রনজি খেললেই দেখবি সবকিছু বদলে যাবে। ছেলের নাম হলে সব বাবাই খুশি হয়। কী মনে হয়, এবার ডাক পাবি?'

'জানি না।' হঠাৎ মন খারাপ হয়ে যাওয়াতে স্বপ্নাশিস নিজের ঘরে চলে এল। হরিমাধবদা কালকের ম্যাচে খেলাবেন না অথচ ক্লাব তাকে এ-সব দিল! সুনীলদা নিশ্চয়ই জানেন না তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আবার জুতোর কথা নিশ্চয়ই সুনীলদার কানে হরিমাধবদাই তুলেছেন। অন্যায় সে নিশ্চয়ই করেছে কিন্তু শাস্তিটা একটু বেশি হয়ে গেল না? এই কারণে সে সামনের বার ক্লাব ছেড়ে অন্য ক্লাবে জয়েন করতে পারে। ব্যাপারটা ভাবামাত্রই সে মাথা নাড়ল। তাতে কোনও লাভ নেই। অবস্থা একই থাকবে। বড় ক্লাবে গেলে বছরে তিন-চারটের বেশি ম্যাচে চান্স পাবে না। ছোট ক্লাবগুলোতে হরিমাধবদা নেই যে লড়াই হবে। কালকের ম্যাচটায় যদি চান্স পাওয়া যেত!

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল জামাকাপড় ছেড়ে। খুব টায়ার্ড লাগছে। খিদেও পাচ্ছে। কিন্তু এ বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কয়েকটা সময় বাঁধা আছে। সকাল সাড়ে ছটার মধ্যে চা অথবা কমপ্লান, সঙ্গে বিস্কুট। সাতটার সময় সেটা পাওয়া যাবে না। নটা থেকে বারোটার মধ্যে ভাত। বিকেল পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে মুড়ি চিড়ে শসা এবং চা। রাত নটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে রুটিতরকারি এবং একটি আমিষ। খেতে হলে এই সময়ের মধ্যে বাড়িতে থাকতে হবে নইলে লবডঙ্কা। পিতৃদেবের আদেশ অমান্য করার সাধ্য কেলোর মায়ের নেই।

'কাল মোহনবাগান মাঠে তোদের খেলা?' দেবাশিস অন্ধকার ঘরে ঢুকল।

'কে বলল?' বুকের ভেতর থম্ ধরল স্বপ্নাশিসের।

'বাবা। বললেন তোমার ভাই কিরকম খেলে দেখে আসতে পারবে?'

'কী বললি?'

'আমার হাসপাতাল আছে, যাব কী করে?' দেবাশিস হাসল, 'পরশুর কাগজে যেন তোর ছবি দেখি। এ-সব ম্যাচে সেঞ্চুরি করলে কাগজে ছবি ওঠে।'

'আমি কাল খেলছি না।'

'সেকি? কেন?'

'সবাইকে সব ম্যাচে খেলতে হবে তার কোনও মানে আছে?' খিঁচিয়ে উঠল স্বপ্নাশিস। তার কথা বলতে একটুও ভাল লাগছিল না। দেবাশিস বুঝল ভাই-এর মেজাজ কোনও কারণে খুব খারাপ। সে সস্নেহে বলল, 'বাবার ওপর রাগ করিস না। ওঁর কথা বলার ধরন ওইরকম কিন্তু তোকে খুব ভালবাসেন। নইলে কোন মাঠে তোর খেলা সেই খবর রাখতে যাবেন কেন? বুঝলি।'

স্বপ্নাশিস সাড়া দিল না।

ভোরবেলায় অভ্যেসে ঘুম ভেঙেছিল। পুরনো জুতো পরেই বেরিয়ে পড়েছিল স্বপ্নাশিস। মাঠে পৌঁছে খেয়াল হল। সবাই যখন জানবে খেপ খেলার জন্যে সে আজ চান্স পাচ্ছে না তখন জোর হাসাহাসি হবে। কিন্তু মাঠে না যাওয়াটাও তার খুব খারাপ দেখাবে। মাঠের ছবিটা প্রতিটি ভোরের থেকে আলাদা নয়। সে লক্ষ্য করল, সুব্রত পাক দিচ্ছে। বল করার বদলে দৌড়াচ্ছে ও। ম্যাচের দিন ভারী প্র্যাকটিস করা পছন্দ করেন না হরিমাধবদা। স্বপন ব্যাট করছে। দুতিনটে বল কিন্তু করল স্বপ্নাশিস। সুব্রত তখনও দৌড়ে চলেছে। অর্থাৎ হরিমাধবদা ওকে জানিয়ে দিয়েছেন আজ দলে নেই। অত দৌড়ালে কেউ সারাদিন মাঠে থাকতে পারবে না।

সাতটা নাগাদ সবাইকে কাছে ডেকে সাড়ে আটটার মধ্যে ক্লাবে চলে আসতে বললেন হরিমাধবদা। মালিকে কয়েকটা জরুরি আদেশ দিয়ে যেন বাধ্য হয়েই তিনি স্বপ্নাশিসকে দেখতে পেলেন, 'তোমার বন্ধু স্বীকার করেছে। দশটা পাক দিতে বলেছি। আজকের জন্যে ওই যথেষ্ট।'

স্বপ্নাশিস কোনও কথা বলল না।

'তুমি এখানে সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'এমনি।'

'টিম থেকে বাদ পড়ে কীরকম লাগছে?'

'খারাপ। খুব খারাপ।'

'কথাটা মন থেকে বলছ কি?'

'হ্যাঁ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। টিমে না থাকলেও ম্যাচ দেখতে আসবে। কে কী ভুল করছে নোট করবে। ক্রিকেটের সঙ্গে ইনভলভড না হলে ক্রিকেট কিছু দেবে না তোমাকে। আর হ্যাঁ, জুতোটা পরে আসোনি কেন?'

'এমনি।'

'এই সময় সুব্রত এল হাঁপাতে হাঁপাতে। এসে বলল, 'সরি স্বপ্ন। আমার জন্যে তুই শাস্তি পেলি। আমার খুব খারাপ লাগছে।'

হঠাৎ হরিমাধবদার গলার স্বর বদলে গেল, 'তোরা কী করলি বল তো! ভেবেছিলাম আজ খুব ফাইট দেব। বড় টিমকে সহজে জিততে দেব না। তোদের দুজনের ওপর খুব ভরসা করেছিলাম আমি আর তোরাই—।' চোখ বন্ধ করে মাথা ঝাঁকালেন হরিমাধবদা, 'কী করা যাবে!'

সুব্রত বলল, 'আমার তো শাস্তি পাওয়া হয়ে গিয়েছে।'

হরিমাধবদা কোনও উত্তর না দিয়ে হাঁটছিলেন। সুব্রত ওঁর পেছন পেছন ছুটছিল। দৃশ্যটা দেখতে একটুও ভাল লাগছিল না স্বপ্নাশিসের। শাস্তি হয়ে গেছে বলে সুব্রত যদি আজ সুযোগ পায় তাহলে তাকেও হরিমাধবদা বলতে পারতেন দশ কিংবা পনেরো পাক দৌড়াতে। মরিয়া হয়ে দৌড়াত সে। তারপরেই খেয়াল হল, হরিমাধবদা কখনও আপোস করেন না। সুব্রতকে কখনও খেলাবেন না তিনি।

চুপচাপ মাঠ থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। পিতৃদেব যদি জিজ্ঞাসা করেন তা হলে স্পষ্ট মিথ্যেকথা বলতে হবে, শরীর ভাল নেই বলে আজ খেলছে না সে। সত্যি কথা বললে আর বাড়িতে থাকা যাবে না।

পাড়াতে ঢুকতেই স্বপ্নশিস দেখলে রকে কেলো বসে আছে। তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল, 'কেমন আছ?'

'আছি। তুমি?'

'চলে যাচ্ছে। ট্যাক্সি চালাই, একটু আধটুকু ইনকাম হচ্ছে।' কেলো হাসল 'তোমার মতো কপাল করে জন্মাইনি তো! যাক, মা কীসব বলছিল।'

খোঁচাটা হজম করল স্বপ্নশিস, 'আজকে আমার মেজাজ ভাল নেই, পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

কেলো মাথা নাড়ল, 'মা তোমাকে কী বলেছে?'

স্বপ্নাশিস ছেলেটার দিকে তাকাল। স্কয়াটে চেহারা, পোড়খাওয়া মুখ। ঘাড়ের অনেক নীচে চুল। গায়ের রঙ ঘন কালো। কিন্তু জামা প্যান্টে কায়দা আছে।

স্বপ্নাশিস বলল, 'তুমি কী কারও সঙ্গে প্রেমট্রেম করছ?'

'আমি কি বাচ্চা না বুড়ো যে প্রেম করব না?'

'কিন্তু কার সঙ্গে করছ, তাকে তোমার মায়ের পছন্দ হয় না। ওঁকে আমি জ্ঞান হবার পর থেকে চিনি। তোমার মা কষ্ট পাবে এমন কাজ করছ কেন?'

'যাঃ শালা। প্রেমটা আমি করছি মা তো করছে না। মায়ের কী প্রব্লেম?'

'ওকে তো তুমি বিয়ে করবে।'

'কে বলেছে?'

'মেয়েটা তোমাকে বিয়ে করতে চাইছে না?'

'চাইলেই করব তেমন মাল আমি নই। বাইরের গরুর কাছে যখন দুধ মিলছে তখন কোন বুদ্ধু বাড়িতে গরু পোষে? আর প্রেম আমি একজনের সঙ্গে করছি না, অন্তত ছয়জন লাইনে আছে বস্। এ সব নিয়ে মাকে চিন্তা করতে নিষেধ করো।' কেলো দাঁত বের করে হাসল, 'তুমি তো ক্রিকেট খেলো। তোমার খেলার মাঠ কি একটাই, নাকি যে মাঠে ম্যাচ পড়বে সেখানে গিয়ে খেলো, বলো।'

স্বপ্নাশিস কথা না বাড়িয়ে হাঁটতে লাগল। তার মনে হল কেলোর মায়ের অন্তত ওই মেয়েটাকে নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। তার ছেলে ইতিমধ্যে গভীর জল চিনে ফেলেছে বেচারা শুধু এই খবরটুকু জানে না। হঠাৎ পেছন থেকে তার নাম ধরে কেউ চিৎকার করে ডাকছে শুনতে পেয়ে মুখ ফেরাল স্বপ্নাশিষ। সুব্রত দৌড়ে আসছে। কাছে এসে হাঁপাতে লাগল সুব্রত। ওর মুখ লাল, চোখ বড়, ঘনঘন নিশ্বাস নিচ্ছে। ওই অবস্থাতেই কথা বলতে চেষ্টা করল কিন্তু স্বপ্নাশিস বাধা দিল, 'দাঁড়া, আগে ঠিক হয়ে নে। কী হয়েছে তোর? দৌড়ে এলি কেন?'

ততক্ষণে বুকে বাতাস নিয়েছে সুব্রত। হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল, 'তোকে রেডি হয়ে মাঠে চলে যেতে বলেছে হরিমাধবদা, তুই আজ খেলবি।'

হঠাৎ যেন পৃথিবীটা কি রকম হয়ে গেল, দুহাতে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে স্বপ্নাশিস চেঁচিয়ে উঠল, 'সত্যি বলছিস?' সুব্রত মাথা নাড়ল। ওর ঘেমে যাওয়া শরীরের কাঁপুনি তখন স্বপ্নাশিসের দুই হাতের মধ্যে।

'কী করে হল?'

'হয়ে গেল। দোষ তো আমার, তোর নয়।'

'তুই?'

'না। আমাকে দুটো ম্যাচ বসতে হবে।'

সুব্রতর দিকে তাকাল স্বপ্নাশিস। নিজের সুযোগ পাওয়া নিয়ে বিন্দুমাত্র না ভেবে তার খবর দিতে এ ভাবে ছুটে এসেছে ও। হয়তো সে যাতে সুযোগ পায় তার জন্যে এতক্ষণ ধরে

হরিমাধবদাকে বুঝিয়ে রাজি করিয়েছে। অথচ তখন সে ভেবেছিল নিজের জন্যে সুব্রত হরিমাধবদার পেছনে ছুটছিল।

'একই অন্যায়ের দুরকম ফল হবে কেন?' স্বপ্নাশিস আপত্তি করল।

'বাজে কথা বলিস না। তোকে প্রচণ্ড ভালবাসে হরিমাধবদা। যা, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। আমি মাঠে থাকব। জলদি যা।' সুব্রত ফিরে গেল।

টিম হারল। কিন্তু বিরাশি রানে স্বপ্নাশিস আউট হবার আগে পর্যন্ত মনে হচ্ছিল বড় দলের কপালে দুর্ভাগ্য আছে। প্রথম তিনটে ওভার একটু ঝামেলা হয়েছিল। বল বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল। সেই সঙ্গে টেনসন ছিল খুব। তিন ওভারের সময় বোলারের মাথার ওপর দিকে তাকিয়ে মাঠের বাইরে যেন ব্যালকনি দেখতে পেল সে। অথচ ময়দানের খেলায় গাছগুলোকে ব্যালকনি ভাবার কোনও কারণ নেই। সঙ্গে সঙ্গে জড়তা কেটে গেল। ব্যালকনি গাছ হয়ে গেল বটে কিন্তু ব্যাট থেকে রান আসতে লাগল। ইতিমধ্যে ছটা উইকেট পড়ে গেছে, কিন্তু বাকি পঞ্চাশ রান করতে কোনও অসুবিধে হবে না বুঝতে পারছিল স্বপ্নাশিস। ওভারের আগে নতুন ব্যাটসম্যানকে সে বলেছিল শেষ বলে সিঙ্গল নেবে, তা চুরি করে হলেও। বেশি বল খেলতে চায় এখন থেকে। দুটো দুই-এর পর শেষ বল এল। লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে বল ছিল, ঘোরাতে চেয়েছিল স্বপ্নাশিস, ঠিক ব্যাটে বলে হল না। উইকেট কিপারের পাশ দিয়ে যে বলের যাওয়ার কথা সেটা যে কী করে মিড অনে যায় তা বুঝতে পারার আগে দেখল পার্টনার ছুটে আসছে রান নিতে। অতএব স্বপ্নাশিসকেও ছুটতে হল। ক্রিজে পৌঁছাবার আগেই ছোড়া বল উইকেট উড়িয়ে দিল।

স্বপ্নাশিস দেখল বিপক্ষ উল্লাসে লাফাচ্ছে। যে বলে রান নেই সেই বলে পার্টনার কেন রান নিল ভাবতেই মনে হল দোষ তার। সে-ই ওকে নির্দেশ দিয়েছিল চুরি করেও রান নিতে। মাথা নিচু করে যখন বেরিয়ে আসছে তখন প্রচুর হাততালি কিন্তু সেটাই অসহ্য মনে হচ্ছিল।

বেঞ্চিতে গিয়ে বসে চোখ বন্ধ করল স্বপ্নাশিস। প্যাড খুলতেও ইচ্ছে করছিল না। অনেকেই কাছে এসে 'ওয়েল ডান' বলে গেল। কিন্তু সে জানে যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গিয়েছে। একসময় হরিমাধবদা সামনে এলেন, 'দোষটা কার?'

মুখ থেকে হাত সরাল না সে, 'আমার।'

'তোকে কতবার বলেছি যে বলে রান নেই সেই বলে রান নিতে চাওয়া মানে, সুইসাইড করা।'

স্বপ্নাশিস চোখ খুলল না, জবাবও দিল না।

হরিমাধবদা ধমকালেন, 'চোখ খোল। প্রব্লেম ফেস করতে শেখ। চোখ বন্ধ করলেই সবকিছুই এড়িয়ে যেতে পারবি?'

চোখ খুলল স্বপ্নাশিস, 'কিন্তু আমার জন্যে তো টিম—।'

'নেক্সট টাইম, নেক্সটাইম দেখা যাবে। আজই কলকাতার ক্রিকেট শেষ হয়ে যাচ্ছে না। শুধু আজকের অভিজ্ঞতাটা মনে রাখিস।' হরিমাধবদা কথাগুলো বলতেই পাশ থেকে একজন বলল, 'স্বপ্ন তো অসীমের কল-এ রেসপন্স করেছে। ওর কী দোষ?'

হরিমাধব দাঁড়িয়ে গেলেন, 'এক্ষেত্রে ওর উচিত ছিল দাঁড়িয়ে থেকে অসীমকে আউট করে দেওয়া। নতুন ব্যাটসম্যানের চেয়ে সেট হয়ে যাওয়া ব্যাটসম্যানের ক্রিজে থাকা টিমের পক্ষে অনেক জরুরি।' হরিমাধবদা দাঁড়ালেন না।

তুমি যদি জিততে চাও তা হলে তোমাকে নির্মম হতে হবে। অভিযানে বেরিয়ে দলের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে অভিযান বাতিল হয় না, অসুস্থকে ফেরত পাঠানোর ব্যাবস্থা করা হয়। সেই উপায় না থাকলে তাকে ফেলে রেখেই এগোতে হবে। এক্ষেত্রে দয়া মায়া ইত্যাদি ব্যাপারগুলো শুধুই প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। কোনও কোনও মানুষ জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার সময় এমনই কঠোর হন। তাদের নিষ্ঠুর বলা হয়। ইতিহাস ওইসব মানুষের জন্যে শেষপর্যন্ত জায়গা রাখে।

ঠোঙার কাগজে ওইটুকুনি পড়তে পারল স্বপ্ন। আজকাল কলকাতায় ঠোঙার ব্যবহার হয় না বললেই চলে। কেলোর মা কোনও জিনিস আনতে হলে কী করে ঠোঙায় নিয়ে আসে সে-ই জানে। লেখাটা কার, কী বিষয়ে তা জানার উপায় নেই কিন্তু মাথার মধ্যে ঢুকে গেল হুড়মুড় করে। চোখের সামনের নিষ্ঠুর মানুষগুলোর মুখ ভেসে উঠল। হিটলার, মুসোলিনি, হিন্দি ফিল্মের ভিলেন যে অর্থে নিষ্ঠুর, লক্ষ্য ছাড়া আর কিছুতেই যাদের মন ছিল না বা নেই সেই অর্থে অবশ্য চৈতন্য বা বুদ্ধদেবকে ভাবা যায় না। যদিও তাঁরা লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে সংসার ত্যাগ করেছিলেন, মায়া সরিয়ে দিয়েছিলেন মন থেকে। হঠাৎই পিতৃদেবের মুখ মনে এল। জন্মাবধি সে এমন নিষ্ঠুর মানুষ আর দেখেনি। কোথায় লাগে হিটলার! তেমন ক্ষমতা পেলে তিনি সমস্ত পৃথিবীজুড়ে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বানাতেন, সাইবেরিয়া তো পুঁচকে জায়গা। কোনও দয়ামায়ার নাম নেই ওঁর অভিধানে। অথচ মানুষটিকে কেউ হিটলার বলবে না। পরিবারের বাইরের কাউকে আগ বাড়িয়ে আঘাত করেন না। আবার রামমোহনের বিদ্যাসাগরের মতো আদর্শ অথবা বিবেকানন্দ কিংবা বুদ্ধদেবের মতো বিশালতা যে তাঁর আছে এমন প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তিনি শুধু নিষ্ঠুর মনে এগিয়ে চলেছেন যদিও তাঁর লক্ষ্য কী সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

সেই বড় ম্যাচের পরের সকালে প্র্যাকটিস থেকে ফেরামাত্র তিনি বাঘের মতো গর্জন করলেন, 'এটা কী হচ্ছে? একে কি খেলা বলে? আর মাত্র আঠারো রান করার ধৈর্য তোমার রইল না! মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় তুমি আমার ছেলে নও, হাসপাতালে পাল্টাপাল্টি হয়ে গিয়েছে। ওয়ার্থলেশ।'

পিতৃদেব তার ক্রিকেট নিয়ে এই যে মাথা ঘামাচ্ছেন এটাই স্বপ্নাশিষের কাছে এমন বিস্ময়কর যে সে কথা বলতে পারল না। কিন্তু তিনি বাঘের মতো তার দিকে তাকিয়ে আছেন, 'অ্যানসার মি! বলো, তুমি ওয়ার্থলেশ কি না?'

'আপনিই তো বললেন।'

'হ্যাঁ। আমি বলেছি এবং সেটাই শেষ কথা। তোমার পরম পূজনীয় বড়দাদা বললেন ও তো কলেজের পরীক্ষায় এইট্টি টু কখনও পাবে না, ক্রিকেটে পেয়েছে। আর একটি দৃষ্টান্ত। বই-এর পোকা হয়ে থাকলেই যে পন্ডিত হওয়া যায় না তার প্রমাণ ঈশ্বর এ বাড়িতে চালান করেছেন। যাকগে, যে ছোঁড়াটা তোমার কাছে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করতে আসে সে খেলেনি কেন?'

মিথ্যে কথা বলতে পারল না সে, 'সুযোগ পায়নি।'

'তাই নাকি? যাকগে, তোমাদের টিম যিনি করেন তিনি দেখছি কিছুটা বুদ্ধিমান লোক। তোমাকেও বাদ দিলে পুরোটা বলতাম। গেট লস্ট।'

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় পিতৃদেবকে জিজ্ঞসা করবে তিনি তার সঙ্গে সব সময় ওই ভঙ্গি এবং ভাষায় কথা বলেন কেন? দাদার সঙ্গে কথা বলার সময় তাপ অবশ্যই থাকে কিন্তু ঝাঁজ থাকে না, ভাষাও এ দেয়ালে ও দেয়ালে ঠোক্কর খায় না। ব্যঙ্গ করতে হলে তিনি বড়জোর ডাক্তারবাবু শব্দটি ব্যবহার করেন। ইচ্ছে হলেও স্বপ্নাশিস সাহসী হয়নি। এই মুহূর্তে সে পৃথিবীর অনেকেরই

মুখোমুখি হতে পারে, এনি ফাস্ট বোলার কিন্তু পিতৃদেবকে নয়।

খেয়েদেয়ে কলেজে বের হবার সময় পিতৃদেবের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে আড়চোখে দেখল খবরের কাগজটা তখনও খোলা। অর্থাৎ ওই কাগজে নিশ্চয়ই তার সম্পর্কে কিছু খবর বেরিয়েছে। প্র্যাকটিসে গিয়ে শুনেছিল দু'তিনটে কাগজে খুব লেখালেখি হয়েছে। একটা ইংরেজি কাগজ লিখেছে স্বপ্নাশিষ আর আধঘন্টা ক্রিজে থাকলে বড় টিমকে প্রথম হারের স্বাদ পেতে হত; ওর পার্টনারের দোষে ছেলেটাকে প্যাভিলিয়ানে ফিরতে হয়েছে। সি এ বি-র উচিত এই ছেলেটার ওপর নজর রাখা। পিতৃদেব যে কাগজ পড়েন সেটিও ইংরেজি এবং ঐতিহ্যবহনকারী। ওখানে কী লেখা হয়েছে জানতে হবে। এখন ওঁর সামনে গিয়ে কাগজ দেখতে চাওয়া মানে হ্যাংলামি সেটা বুঝে গিয়েছে সে।

কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে বাসটা পৌঁছাতেই স্বপ্নাশিস তাকে দেখতে পেল। হ্যারিসন রোডে দাঁড়িয়ে আছে বাস বা ট্রাম ধরবে বলে। দেখামাত্র সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে গেল। সেই অনুভূতি ঠিক হতে না হতেই বাস অনেকটা এগিয়ে গেছে। পড়ি কি মরি করে কিছু লোককে রাগিয়ে দিয়ে সে বাস থেকে প্রায় লাফিয়ে নামল।

বেশ কিছুটা পথ দৌড়ে ফিরে এসে বাস স্টপের দিকে তাকাতেই বুকটা কেমন হয়ে উঠল। সে নেই। সে কি ভুল দেখেছিল? জোরে জোরে মাথা নাড়ল সে।

'কী হয়েছে?'

প্রশ্ন শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখল একজন প্রৌঢ় তাকে প্রশ্ন করছে।

'কেন? কী হয়েছে মানে?'

'মাথা নাড়ছ একা একা, তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

'আপনি এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন?'

'মিনিট পাঁচেক।'

'ওই স্টপে একটি মেয়ে সালোয়ার কামিজ পরে দাঁড়িয়েছিল, দেখেছেন?'

'কী আশ্চর্য! আমি পথেঘাটে মেয়ে দেখে বেড়াই নাকি?'

'দুর্গাঠাকুর দেখেন না? সরস্বতী?' স্বপ্নাশিস দৌড়ে হাওড়া থেকে আসা একটা বাসের উঠে পড়ল। এখানে যখন দাঁড়িয়েছিল তখন নিশ্চয়ই শেয়ালদা স্টেশনে গিয়েছে ট্রেন ধরতে। বাসটা যদি তাড়াতাড়ি যায় তা হলে হয়তো প্ল্যাটফর্মে ঢোকার আগেই ওকে ধরতে পারবে। কিন্তু বাস ড্রাইভারের সম্ভবত কোনও তাড়া ছিল না। আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে অহেতুক দাঁড়াল। পূরবী সিনেমার সামনে যখন গড়াচ্ছে তখন স্বপ্নাশিস চেঁচাল, 'এটা কী হচ্ছে? বাস না গরুর গাড়ি?'

সিটে বসা একজন মন্তব্য করলেন, 'গরুর গাড়িই ভাল, আজকাল স্টেটবাস যা অ্যাকসিডেন্ট করছে! তাড়া থাকলে ট্যাক্সি নিলেই হত!'

ঝগড়া করতে পারত কিন্তু একটুও ইচ্ছে হল না। ছবিঘরের সামনে বাস থামতেই সে নেমে পড়ল। ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে এগিয়ে যাওয়া মানুষের দঙ্গল দেখতে দেখতে সে একসময় স্টেশনের সামনে চলে এল। না, মেয়েটি কোথাও নেই। নিশ্চয়ই প্ল্যাটফর্মে ঢুকে গেছে। একটা প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে সে ভেতরে ঢুকে বোর্ডের দিকে তাকাল। নৈহাটি লোকাল ছাড়া কোন ট্রেন শ্যামনগরে যায়?

একজন কালো কোটধারীকে প্রশ্নটা করতে সে জানতে পারল মিনিট কুড়ি পরে রানাঘাট লোকাল ছাড়বে দু নম্বর থেকে। শ্যামনগরে যাওয়ার শেষ গাড়ি গিয়েছে আধঘন্টা আগে। খবরটা জানার পর একটু স্বস্তি হল। না, কোনও ভাবেই সে ট্রেন ধরে ফিরে যায়নি আজ। দু নম্বর

প্ল্যাটফর্মটা হেঁটেই দেখল স্বপ্নাশিস। না, মেয়েটি কোথাও নেই। কিন্তু গেল কোথায়? সে ট্রেনের নাম লেখা বোর্ডের নীচে চলে এল।

'আরে আপনি? কোথায় যাচ্ছেন?'

স্বপ্নাশিস দেখল তার কাছাকাছি বয়সের একটি ছেলে প্রশ্নটা করছে হাসিমুখে।

'কোথাও যাচ্ছি না।'

'তা হলে এখানে? কাউকে সি অফ করতে এসেছেন বুঝি?'

না বলতে গিয়ে সামলে নিল স্বপ্নাশিস। তা হলে স্টেশনে আসার আর কী কৈফিয়ত থাকতে পারে? সে মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়ল।

'আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না। আপনার খেলা আমি দেখেছি।'

'কোথায়?'

'শ্যামনগরে। আপনাকে হায়ার করে নিয়ে গিয়েছিল বাবলুদা। কালকেও তো আপনি দারুণ খেলেছেন।' ছেলেটি অনাবশ্যক হাসল।

এবং তখনই স্বপ্নাশিসের মনে হল অবিলম্বে এর সঙ্গ এড়ানো দরকার। শ্যামনগরের ছেলে যখন তখন মেয়েটিকে নিশ্চয়ই চেনে। ও সঙ্গে থাকলে সে এগিয়ে গিয়ে কথা বলবে কী করে? ছেলেটি বলল, 'সেদিন আহির বেশি কিছু আহত হয়নি। কিন্তু ওরা ওটাকেই ইস্যু বানিয়ে গোলমাল করল খেলা বন্ধ করতে। হেরে তো যেতই।'

আহির! তবে কি মেয়েটি নাম আহির। এরকম নাম তো সে কখনও শোনেনি।

'তা হলে উনি কেন প্রতিবাদ করলেন না?'

'ও প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল। ওর কপালে দেওয়ালে ধাক্কা লেগে বলটা এসেছিল, এটা যে নেহাতই অ্যাকসিডেন্ট তা সবাই জানে। কিন্তু ওর মা রাজি হননি, উনিই নিষেধ করেছিলেন ওকে বাইরে বের হতে। পরে আহির আমাদের বলেছে।'

'আপনার সঙ্গে ওঁর পরিচয় আছে?'

'বাঃ, আমরা তো ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হচ্ছি। ও রোজ কলকাতায় পড়তে আসে। পড়াশুনায় খুব ভাল।' স্বপ্নাশিস কথাগুলো শুনে এমন ভঙ্গি করল যেন সে ওখানেই কথা শেষ করতে চাইছে। কিন্তু ছেলেটি সেটা বুঝল না। স্বপ্নাশিসের পাশে হাঁটতে লাগল।

ঠিক তখনই আহির প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। স্বপ্নাশিসের পাশে মনে হল ঠিক সেদিনের মতোই তাজা দেখাচ্ছে ওকে। আর তারপরেই কপালে লাগানো ছোট্ট ব্যান্ড-এইড নজরে এল। সেটা খুব খারাপ লাগত যদি আহির একা থাকত। ওর পাশে একটি লম্বা ছেলে গল্প করতে করতে আসছে। ছেলেটিকে দেখতে অনেকটা অক্ষয়কুমারের মতো।

আহির মুখ তুলে বোর্ড দেখে কিছু বলল ছেলেটিকে। ছেলেটি হাসল।

স্বপ্নাশিস ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে। এই অক্ষয়কুমারও কি শ্যামনগরের ছেলে? আহিরের সঙ্গে কী সম্পর্ক ওর? এখান থেকে চুপচাপ চলে যাওয়াই বোধহয় ভাল।

'এই আহির।' পাশ থেকে চিৎকারটা ছুটে যেতে অবাক হয়ে তাকাল সে। তার সঙ্গে লেগে থাকা ছেলেটা হাত নেড়ে আহিরকে ডাকছে। আহির তাকাল। ওর চোখে বেশ খুশি ফুটে উঠল যেন। দ্রুত এগিয়ে আসছিল ও। সঙ্গের ছেলেটা কী করবে বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইল একই জায়গায়।

'কী রে বাপী, তুই এখানে?'

'এমনি বেড়াতে এলাম।'

'টিটি ধরলে বুঝতে পারবি!'

'ধ্যাত, সমীরের মাস্থলি নিয়ে এসেছি। এঁকে দ্যাখ, চিনতে পারছিস?'

আহির যে আগে লক্ষ্যই করেননি এমন ভঙ্গিতে দেখল। দেখে ঘাড় নেড়ে না বলল। সঙ্গে সঙ্গে মনটা কি রকম নিস্তেজ হয়ে গেল স্বপ্নাশিসের।

'তোর কপালে ব্যান্ড-এইড লাগাতে হয়েছে কেন?'

'ও। বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ওভাবে বলছিস কেন? অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। আমি যদি অসতর্ক হয়ে না দাঁড়াতাম তা হলে বলটা লাগত না।'

কথাটা শেষ করে স্বপ্নাশিসের দিকে আহির এমন ভাবে তাকাল যেন দোষটা তারই। স্বপ্নাশিস কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। বাপী জিজ্ঞাসা করল, 'তোর সঙ্গে কে এসেছে?'

'চিনি না।' হাসল আহির।

'চিনিস না মানে?'

'ট্রাম থেকে নেমে হেঁটে আসছি সঙ্গে এসে জুটল। গায়ে পড়ে আলাপ করল।'

'তুই অ্যালাউ করলি?'

'বাঃ,যতক্ষণ না আমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করছে ততক্ষণ আপত্তি করব কেন? তাছাড়া কেউ একজন সঙ্গে থাকলে আর কেউ বিরক্ত করতে আসে না। প্ল্যাটফর্মে ঢুকে বললাম, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে যা শিখেছি সব ভুলে যাব। ও বোকার মতো হাসল আর তখনই তুই ডাকলি।' ঘড়ি দেখল আহির, 'এখনও ট্রেনটা আসেনি কেন?'

'এসে যাবে। আমার খুব খিদে পেয়েছে, খাওযাবি?' বাপী জিজ্ঞসা করল।

'আমাকে দেখলেই তোর খিদে পায়, না?' মাথা নাড়ল আহির, 'আমি এই ট্রেন মিস করব না। কলেজ স্ট্রিটে গিয়েছিলাম বলে আগের ট্রেনটা ধরতে পারিনি।'

'তুই মাইরি ভীষণ নিষ্ঠুর। ওপারের রেস্টুরেন্টে গেলে সিগারেট খেতে পারতাম।'

'এখানে খা।'

'দূর। কে না কে দেখবে ঠিক খবর পৌঁছে যাবে পাড়ায়।'

'উঃ। ঠিক আছে। এর পরের নৈহাটিটা ধরব কিন্তু। চল।'

সঙ্গে সঙ্গে বাপী পা বাড়াল। স্বপ্নাশিস দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ। ঘাড় ঘুরিয়ে আহির জিজ্ঞসা করল, 'আপনি যাবেন না?'

'আমি খানিক আগে ভাত খেয়ে বেরিয়েছি।'

'ও। কোনও কাজ না থাকলে চা খেতে তো আসতে পারেন।'

আগ বাড়িয়ে যেতে পারছিল না স্বপ্নাশিস, আমন্ত্রণ পেয়ে আনন্দিত হল। ওরা প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে দোতালার সিঁড়ির মুখে পৌঁছানো মাত্র বাপী বলল, 'তোরা এগো, আমি সিগারেট নিয়ে আসছি '

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আহির জিজ্ঞসা করল, 'আপনি কি কোথাও যাচ্ছেন?'

'না তো। কেন?'

'বাঃ, লোকে শুধু শুধু প্ল্যাটফর্মের দাঁড়িয়ে থাকে নাকি?'

স্বপ্নাশিস অস্বস্তিতে পড়ল। সত্যি কথা কি এ অবস্থায় বলা যায়?

'আমি ভাবলাম আবার কোনও বন্ধুর সঙ্গে খেলতে যাচ্ছেন কোথাও!'

'না। আমি ওই খেপ খেলতে আর যাব না।'

'খেপ মানে?

'একটা চালু কথা। পয়সা নিয়ে অন্য টিমে এক আধবার খেলে দেওয়াকে খেপ খেলা বলা হয়। পয়সা না পেলে আক্ষেপ।'

'সেদিন শ্যামনগরে খেপ খেলছিলেন?'

'না আক্ষেপ। টাকা পাইনি। খেলা ভণ্ডুল হয়ে গিয়েছিল বলে ওরা টাকা দেয়নি।'

'আপনি কি শুধুই ক্রিকেট খেলেন?'

'না। কলেজে পড়ি।'

'সেদিন আপনার বন্ধু বলছিল আপনি বেঙ্গলে খেলবেন, তাই?'

চমকে তাকাল স্বপ্নাশিস। ওরা ততক্ষণে রেস্টুরেন্টে পৌঁছে গিয়েছিল। সে অবাক হয়ে বলল, 'শ্যামনগরে যাওয়ার সময় আমরা যে একট কামরায় ছিলাম সেটা মনে আছে আপনার?'

'কেন থাকবে না! আপনারা তো সবাইকে শুনিয়ে কথা বলেছিলেন।'

এখন রেস্টুরেন্ট মোটেই ফাঁকা নয়। প্রতিটি টেবিলেই অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের ভিড়। তাদের ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছিল না ওঠার ইচ্ছে আছে। আহির বলল, 'যাঃ, বাপীর আর বসে খাওয়া হল না। একটা কথা বলব?'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনি তো আগে কখনও আমাকে দেখেননি, নামও জানেন কি না জানি না। ট্রেনে খানিকটা সময় এক কামরায় ছিলাম, শুধু তার জন্যে আমার ওপর অতটা রেগে গিয়েছিলেন কেন?' আহির স্পষ্ট চোখে তাকাল।

'রেগে গিয়েছিলাম?'

'হ্যাঁ। না হলে প্রতিটি বলকে আমাদের ব্যালকনিতে পাঠাবার চেষ্টা করতেন না। শুধু ওই চেষ্টার জন্যে অন্যদিকে পাঠালে যে বলে রান পেতেন সেই বল আমার দিকে পাঠাতে চেষ্টা করে পাননি। আপনি অস্বীকার করতে পারেন?'

শরীর বরফ হয়ে যাচ্ছিল স্বপ্নাশিসের। কোনওমতে বলল, 'বিশ্বাস করুন, আপনার ওপর আমার কোনও রাগ নেই। রাগ থাকার কোনও কারণ নেই।'

'আমারও তো তাই বক্তব্য।'

বাপী এল, 'কী রে, জায়গা নেই?'

'না। হাউজ ফুল।'

বাপী তাকাল। কোনার এক টেবিলে দুটো ছেলেমেয়ে মগ্ন হয়ে কথা বলে চলেছে। সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'কী এত গল্প করছে ওরা?'

'তোর কী?'

'পাশে তিনটে চেয়ার খালি রয়েছে। চল গিয়ে জিজ্ঞাসা করি।'

'কী জিজ্ঞাসা করবি?'

'আমরা বসতে পরি কিনা! দাঁড়িয়ে তো খাওয়া যায় না তাই আপনারা যদি গভীর ষড়যন্ত্রের প্ল্যান না করেন তা হলে এই টেবিলে বসতে পারি, ব্যস। আয় তোরা।'

স্বপ্নাশিস দেখল বাপী জায়গা দখল করল। ছেলেটাকে প্রথম প্রথম যত বোকা বোকা লেগেছিল ও আদৌ তা নয়। আলাপ করার সময় নিশ্চয়ই একটু ভান করেছিল। বাপী হাত নেড়ে ডাকতেই ওরা এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসল। বসতেই বাপী আহিরকে জিজ্ঞাসা করল, 'এই, তুই কখনও প্রেমে পড়েছিস?'

'তার মানে?'

'আমি তো পড়িনি তাই পড়লে কেমন লাগে জানতে খুব ইচ্ছে হয়।' খুব সরল গলায় বলল বাপী, মুখে এক ফোঁটা কৌতুক নেই। টেবিলটা যাদের দখলে ছিল সেই ছেলেমেয়ে দুটো খুব অস্বস্তিতে পড়েছে প্রশ্নটা শুনে বুঝতে পারল স্বপ্নাশিস। আহির বলল, 'তোর মতো একটা উল্লুকের প্রেমে কোনও মেয়ে পড়বে না এটাই তো স্বাভাবিক।'

'তুই আমাকে উল্লুক বললি?' রেগে গেল বাপী।

'ঠিক বলেছি। তুই কখনও উল্লুক দেখেছিস?'

জবাব দিতে গিয়ে ভাবতে লাগল বাপী, তারপর স্বপ্নাশিসকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আপনি উল্লুক দেখেছেন? কী রকম দেখতে? ভাল্লুকের মত?'

আহির হাসল শব্দ করে, 'আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়া, দেখতে পাবি।'

'এটা জমা থাকল, বদলা একসময় নেব। কিন্তু পাবলিক অর্ডার নিতে আসছে না কেন? কী খাবি তুই? এখন সব পাওয়া যাবে।'

'টোস্ট আর চা।'

'আমি শুধু চা।' স্বপ্নাশিস বলল।

বাপী চলে গেল কাউন্টারে অর্ডার দিতে। আহির বলল, 'ও একটু বেশি কথা বলে কিন্তু মন খুব ভাল। আপনাদের আগে থেকেই পরিচয় ছিল?'

'না। আজই আলাপ হল। ও-ই এসে আলাপ করল।'

'কী বলল?'

'ওই সেদিন খেলার কথা, আপনাকে আমি মেরেছিলাম—।'

'আপনি আমাকে মারেননি।'

'একটু আগে আপনি বললেন আপনাকে লক্ষ্য করে বল হিট করেছি।'

'আপনি দেখছি খুব ঝগড়ুটে।'

বাপী ফিরে এল। যতক্ষণ ওরা রেস্টুরেন্টে ছিল ততক্ষণ বাপীই কথা বলে গিয়েছে। আহির তাকে থামাবার চেষ্টা করেও পারেনি। খাবার এসেছে, শেষ হয়েছে, তারপরে বিল। পকেটে হাত দিয়েছিল স্বপ্নাশিস এবং তখনই মনে পড়েছিল মাত্র দশ টাকা রয়েছে। ওই টাকায় হয়তো এখনকার বিল মেটানো যাবে কিন্তু তারপর? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাপী বাধা দিল, 'না দাদা, আপনি নয়। আপনাকে অন্য একদিন বধ করব। আজ আহির দাম দেবে, তাই কথা হয়ে আছে।'

স্বস্তি পেল স্বপ্নাশিস। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে নিচে নামতেই আহির বলল, 'তাড়াতাড়ি পা চালা, ট্রেন ছেড়ে দেবে।' ওরা খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। ওদের সঙ্গে খানিকটা হেঁটে থেমে গেল স্বপ্নাশিস। সে কেন যাচ্ছে? তার তো যাওয়ার কথা নয়। তাকে থামতে দেখে আহির দাঁড়াল, 'আমি বিদ্যাসাগর মর্নিং-এ পড়ি। ইচ্ছে হলে ওখানে আসতে পারেন।' বলেই ছুট লাগাল।

ট্রেনটাকে ওদের তুলে নিয়ে চলে যেতে দেখল স্বপ্নাশিস। গার্ডের কামরা মিলিয়ে গেলেই মনে হল পুরো স্টেশন ফাঁকা। এতক্ষণ যে জীবনটা টগবগিয়ে উঠেছিল তা চলে যাচ্ছে শ্যামনগরে। চারপাশের মানুষজন, মাইকের আওয়াজ সব যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেল তার কাছে। অথচ তার ভাল লাগছিল। আহির। আহির মানে কী? শব্দটা খুব চেনা চেনা অথচ অর্থটা তার জানা নেই। কিন্তু তার মনে হল আজ এখন থেকে তার জীবনটা অন্যরকম হয়ে গেল। খানিকটা প্ল্যাটফর্ম দৌড়ের ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে সে হাত চালাল। ছিমছাম একটা স্কোয়ার কাট।

বিকেলে বেশ কিছুটা সময় ফ্রিহ্যান্ড এক্সারসাইজ করার পর হরিমাধবদা বললেন, 'কাল থেকে তোদের কয়েকজনকে একটা নতুন জায়গায় নিয়ে যাব। ম্যাচ না থাকলে চারজন করে সপ্তাহে দুদিন যাবি। মোহনবাগান লেনের অশোক গাঙ্গুলির বাড়িতে একটা ভাল জিমন্যাসিয়াম করেছে। ও আমাকে কথা দিয়েছে তোদের দু ঘণ্টা করে ব্যবহার করতে দেবে। ঠিক আছে?'

একটা ভাল জিমের অভাব এদিকে অনেকদিনের। হরিমাধবদা প্রায়ই সেকথা বলেন। বিদেশে, এমন কি বোম্বাইতেও প্লেয়াররা নিয়মিত জিমে যায়। খবরটা শুনে ওদের প্রত্যেকেই খুশি হল। আজকাল ক্রিকেট আর দুধু-ভাতু খেলা নয়। একজন ব্যাটসম্যান কত রান করল সেটাও যেমন লক্ষ্য করা হয় কত রান বাঁচাল সেটাও হিসেবে আনা হয়। তাই একজন ভাল ফিল্ডারের শরীর ফুটবলার বা হকি প্লেয়ারের মত গতিশীল হতেই হবে। শরীরের কোনও অংশেই জড়তা থাকলে চলবে না। পঙ্কজ রায়, ভিনু মানকড় ব্যাটে যত রান পেয়েছেন তার সিকি রান বিপক্ষকে দিয়েছেন ফিল্ডিং-এ দুর্বলতার জন্যে। পঞ্চাশ রান করা ব্যাটসম্যানের হাতে গলে দুবার বল বেরিয়ে গেলে টিম থেকে বাদ হয়ে যাওয়া আজ খুব স্বাভাবিক ঘটনা যা তিরিশ বছর আগে ভাবা যেত না। প্র্যাকটিস শেষ করে সুব্রতর পাশে বসেছিল স্বপ্নাশিস। আজ খুব খিদে পাচ্ছে। এখনও ছুটে বাড়িতে গেলে বিকেলের জলখাবার পেলেও পাওয়া যেতে পারে।

সে সুব্রতকে বলল, 'অ্যাই, তোর কাছে টাকা আছে?'

'কেন?'

'খিদে পেয়েছে, খেতাম।'

'কী খাবি?'

'রোল। ফড়েপুকুরের মোড়ে সেই দোকানটায় চল।'

পেছন থেকে হরিমাধবদার গলা পাওয়া গেল, 'না না। ওসব খেতে যাস না। খিদে পেয়েছে যখন তখন আমার ওখানে চল। আয়।'

ওরা একটু অবাক হল। সাধারণত কাউকে বাড়িতে ডাকেন না হরিমাধবদা।

ভাই-এর সঙ্গে থাকেন জানা ছিল কিন্তু হরিমাধবদার দুটো ঘর একদম আলাদা। ওদের বসতে বলে পাশের ঘরে চলে গেলেন। ঘরের তিনটে আলমারি জুড়ে বই আর বই এবং সবগুলোই ক্রিকেট নিয়ে। বাংলা এবং ইংরেজি বইগুলোতে ক্রিকেট জীবন ঠাসাঠাসি হয়ে রয়েছে। ওপাশে একটা রেকর্ড প্লেয়ার। স্বপ্নাশিস এগিয়ে গেল। টেপ রেকর্ডার এসে রেকর্ড প্লেয়ারের জায়গা দখল করে নিয়েছে। আজকাল আর কাউকে রেকর্ড বাজাতে দেখা যায় না। কৌতূহলী হয়ে রেকর্ড-এর স্টক দেখছিল সে। সুব্রত পেছন থেকে বলল, 'হাত দিস না, দেখলে রেগে যাবে। আমাদের বাড়িতেও ওসব আছে। হেমন্ত সন্ধ্যা মানবেন্দ্র, বাবা এখনও শোনে। তোদের বাড়িতে নেই?'

'বাবা সঙ্গীত ভালবাসেন এমন প্রমাণ এখনও পাইনি।'

'তোর বাবা ফুল বা শিশুকে ভালবাসেন?'

'সেরকম কিছু দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।'

'তাহলে তো ভদ্রলোক মানুষ খুন করতে পারেন।' বলেই খুক খুক করে কাশল সুব্রত।

কথাটা শুনতে ভাল না লাগলেও প্রতিবাদ করল না স্বপ্নাশিস কারণ ওই বিখ্যাত লাইনটা তার জানা। রেকর্ড দেখতে দেখতে সে আবিষ্কার করল ওগুলোর সবকটাই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের। হয় খেয়াল নয় সেতার কিংবা সরোদের। এই ব্যাপারটা সে বিন্দুবিসর্গ বোঝে না।'

এইসময় হরিমাধবদা ঘরে এলেন, 'রেকর্ড দেখছ? ক্লাসিক্যালে ইন্টারেস্ট আছে?'

'ওরে বাব্বা।' সুব্রত বলল, 'ওসব বুঝতেই পারি না।'

'বুঝতে চেষ্টা করো না বলো। ধরো খুব ভোরে কেউ ভাঁয়রো বাজাচ্ছে সানাই-এ, প্রকৃতির দিকে তাকালে তোমার মনে আনন্দ আসবে। দেখবে কানে যা শুনছ আর চোখে যা দেখছ তা কী করে একাকার হয়ে যাচ্ছে। দিনরাতের বিভিন্ন সময় অনুযায়ী এক এক রকমের রাগ রাগিনী। তা ছাড়া ঋতু অনুযায়ী রাগ, মনের অনুভূতি অনুযায়ী রাগ, এ-সব বিশ্বাস সমুদ্রের মতো। একবার ইন্টারেস্ট পেলে সাঁতার না কেটে উপায় নেই। এই রেকর্ডটা শোনো—।' হরিমাধবদা একটা রেকর্ড চালু করলেন। বাজনা শুরু হল।

'তোমাদের কোনও অস্বস্তি হচ্ছে?'

স্বপ্নাশিস অবাক হল, 'কী রকম?'

'এটা এখন বাজার কথা নয়। এখন কেউ আহিরভাঁয়রো বাজাবে না। ভোরের সুর সন্ধ্যায় বাজলে অস্বস্তি হবেই।'

চমকে তাকাল স্বপ্নাশিস, 'কী বাজাবে না বললেন?'

'আহিরভাঁয়রো।'

'আহির, মানে কী?' কি রকম রিমঝিম সুর বাজতে লাগল স্বপ্নাশিসের রক্তে।

'আমার যতদূর মনে হয় আরম্ভ বা প্রথম এইরকম কিছু হবে নান্দীমুখ।

স্বপ্নাশিসের মনে সেই ঝকমকে মুখটি চলকে উঠল। এখন এই মুহূর্তে সে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বাড়ির সামনের মাঠ দেখছে? এখন কি শ্যামনগরের সঙ্গে নেমে গেছে? আজ সে এমন কোনও ব্যবহার করেনি যাতে মনে হয় স্বপ্নাশিস সম্পর্কে আলাদা কোনও ভাবনা ভাবতে পারে! তাই কি? যে ছেলেটা ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছিল তাকে নিশ্চয়ই কলেজে দেখা করতে বলেনি! কাজের লোক এইসময় চিকেন চাউমেন নিয়ে এলে সাগ্রহে হাত বাড়াল স্বপ্নাশিস।

বাড়িতে ফিরে স্বপ্নাশিস দেখল বাইরের দরজা বন্ধ। এরকম সচরাচর হয় না। পিতৃদেব এইসময়ে বাইরের ঘরের ইজিচেয়ার দখল করে শ্যেন চোখে জগৎ দেখেন। আজ হঠাৎ কোথায় গেলেন তিনি বুঝতে না পেরে কড়া নাড়ল সে। এ বাড়িতে কলিং বেল নেই। কেন নেই সেই প্রশ্ন কেউ কখনও তোলেনি।

খানিকবাদে কেলোর মা দরজা খুলে বলল, 'কানের মাথা খাবে নাকি? অত জোরে বাজাচ্ছ?'

'বাবা কোথায়?'

'তোমার মাসি এসেছিল তাকে পাতাল রেলে পৌঁছতে গিয়েছেন।'

'মাসি? আমার আবার মাসি আছে নাকি?'

'আমি তো এ বাড়িতে ঢোকার পর দেখিনি।'

'তুমি না দেখলে আমি দেখব কী করে? কোথায় থাকে?'

'তা জানি না। এঘরে বসে বাবুর সঙ্গে কত কথা! এমনিতে গলা থেকে হাঁড়ির আওয়াজ বের হয় আর আজ কত সুর বাজল। বাবুর গলা বলে চেনাই যাচ্ছিল না। চা বিস্কুট দিতে হল। যাওয়ার সময় বাবা বলে গেলেন, 'কেলোর মা, ছেলেদের মাসি এদিকের পথঘাট ঠিক চেনে না, পাতালরেলে নামিয়ে দিয়ে আসি।' কেলোর মা কথা শেষ করে দুমদাম পা ফেলে ভেতরে চলে গেল। ব্যাপারটা যে সে পছন্দ করেনি তা পরিষ্কার।

কোনও মহিলা আত্মীয়া জ্ঞান হবার পর এ বাড়িতে পা দেয়নি। তা হলে এই মাসি কোত্থেকে এলেন? তিনি নিশ্চয়ই এমন কেউ যাকে দেখে পিতৃদেবের চরিত্র বদলে গেল! তিনি নিজে না

বললে উত্তরটা জানা যাবে না যখন তখন এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই।

ভেতরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই চোখে পড়ল খবরের কাগজটা টেবিলে রয়ে গেছে। আজ তালেগোলে ভুলে গিয়েছিল ওটার কথা। কাগজটাকে তুলে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল স্বপ্নাশিষ। পেছনের পাতা জুড়ে খেলার খবর। তন্নতন্ন করে খুঁজে সে কোনও খবরই দেখতে পেল না। শুধু এক জায়গায় কলকাতার ক্রিকেট বলে গতকাল কারা জিতেছে কারা হেরেছে তাদের নাম দেওয়া আছে। খেলা সম্পর্কে বা কোনও খেলোয়াড় সম্পর্কে একটাও লাইন নেই।

কাগজের অন্য পাতাগুলো দেখল স্বপ্নাশিস। আশ্চর্য! তাহলে পিতৃদেব আজ সকালে অত ডিটেলস বললেন কী করে? বাড়িতে এটা ছাড়া অন্য কাগজ আসে না যে তিনি তাতে পড়বেন অথবা বাড়ির বাইরেও পা দেননি? কাল কেউ নিশ্চয়ই তাঁকে বলে যায়নি খেলার বিবরণ? সে কেলোর মাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা কি কাল সারাদিন বাড়িতে ছিল?'

'না। সকালে খেয়েদেয়ে বেরিয়েছিল, বিকেলে ফিরেছে।'

'কোথায় গিয়েছিল কিছু বলেছে?'

'না তো। হয়তো ওই মাসির বাড়িতে গিয়েছিল। পঞ্চাশ বছরের মেয়েছেলে রঙিন শাড়ি পড়ে মুখে রঙ মেখে বিবিটি সেজে এসেছে, ছিঃ।'

'বাজে বকো না তো। জিজ্ঞাসা করছি এক, বলছ আর এক।'

'কী জিজ্ঞাসা করছ?'

'কিছু না যাও।' স্বপ্নাশিস ভাবতে পারছিল না। হতেই পারে না। পিতৃদেব তার খেলা দেখতে মাঠে যেতে পারেন না। জীবনে যাননি। তা হলে অতসব জানলেন কী করে?

শরীর ক্লান্ত ছিল। বালিশে মাথা রেখে একটু বিশ্রাম নিয়ে পড়তে বসবে বলে ভেবেছিল সে, দেবাশিসের ঠেলায় ঘুম ভাঙল। দেবাশিস বলল, 'চল, খেতে দিয়েছে।'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করল স্বপ্নাশিস, 'বাবা?'

উত্তরটা পাওয়ার আগে বিদ্যাসাগরী চটির আওয়াজ শোনা গেল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই সময়টাই সবচেয়ে খারাপ। তিনজনকে একসঙ্গে খেতে বসতে হয়। খাওয়ার সময় জিভে শব্দ করা সম্পূর্ণ নিষেধ। প্রতিটি গ্রাস ভাল করে চিবিয়ে খেতে হবে। পছন্দ হচ্ছে না বলে কোনও খাবার না খাওয়া চলবে না। বইপত্র নিয়ে খাবার টেবিলে বসা আইনবিরুদ্ধ। প্রয়োজন হলে পিতৃদেব কথা বলবেন সবাইকে শুনতে হবে। খাওয়া শেষ হলেই চেয়ার ছেড়ে চলে আসা ঘোরতর অন্যায়। তাই গোগ্রাসে গিলেও ওই সময়টা শেষ হবার জন্যে হা পিত্যেশ করে বসে থাকা ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। স্বপ্নাশিস দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

পিতৃদেব ইতিমধ্যেই তাঁর জায়গায় পৌঁছে গিয়েছেন। দুই ভাই দুদিকে বসামাত্র আজ কেলোর মা খাবার পরিবেশন করতে লাগল। এত রাত পর্যন্ত তার থাকার কথা নয়। অন্যদিন দাদা খাবার পরিবেশন করে ভক্তিভরে। আজ কেলোর মায়ের কী হল?

খাবার মুখে দিয়ে পিতৃদেব বললেন, 'বড্ড একঘেয়ে রান্না। এই জন্যে লোকে মাঝেমাঝে রাঁধুনি চেঞ্জ করে। কেলোর মাকে দিয়ে আর চলে না।'

কেলোর মা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার চোখ বড় হয়ে গেল। এবং তারপরই তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'হঠাৎ আমার রান্না খারাপ হয়ে গেল কেন? এতদিন বলেননি আজ বলছেন, এ আমি মানব না? এই বাহানা দেখিয়ে আমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলে আমি গঙ্গায় ডুবে মরব। মা মরার আগে বলেছিল, কেলোর মা, এ বাড়ি ছেড়ে যাস না কোথাও। কত লোক বেশি মাইনে দিয়ে টানতে চেয়েছিল, আমি এ বাড়ির কাজ ছেড়েছি?'

'কাজ ছাড়ার কথা কেউ বলেনি। যেমন আছ থাকবে, আমি না হয় আর একটা রান্নার লোক রেখে দেব। এতে তো কোনও অসুবিধে নেই?'

'আমার কোন রান্নাটা খারাপ হয়েছে, অ্যাঁ? ছেলেরা বলুক, তারাও তো খাচ্ছে, কী গো, আমার রান্না খারাপ লাগছে?' দু'পা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল কেলোর মা।

দেবাশিসের মাথা প্রায় টেবিলের কাছে নেমে গেল, স্বপ্নাশিস চোখ বন্ধ করল। পিতৃদেবের মতের বিরুদ্ধে কিছু বললে বিপদে পড়লে হবে এটা জানা কথা।

বাঁ হাতটা অবহেলায় নাড়লেন পিতৃদেব, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমাকে ছাড়াচ্ছি না। যা পারো রেঁধে যাও! আর শোনো, কথায় কথায় এদের মরা মায়ের কথা তুলো না। তিনি তোমার কানে কানে এত কথা বলে গিয়েছেন যে আমি হিসেব রাখতে পারছি না।'

কেলোর মা চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে খাওয়া চলল। হঠাৎ পিতৃদেব বললেন, 'আজ তোমাদের মাসিমা এসেছিলেন। দিল্লিতে থাকতেন ওঁরা। তোমার মায়ের মাসতুতো বোন। আমার বিয়ের সময় তাকে একটিবার দেখেছিলাম। স্বামী বড় চাকুরে ছিলেন। তিনি গত হওয়ায় কলকাতায় চলে এসেছিলেন। তোমাদের মামার বাড়ির সঙ্গে তো আমাদের যোগাযোগ নেই, তবু ইনি এলেন।'

দেবাশিসের সম্ভবত মুখ ফসকেই বেরিয়ে এল, 'মাসিমা? আমাদের?'

সঙ্গে সঙ্গে পিতৃদেবের মুখ হিটলারের মতো হয়ে গেল, 'আমি কি কেলোর মাসির কথা বলছি? এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ডাক্তারি করবে কী করে?'

সঙ্গে সঙ্গে দেবাশিস গুটিয়ে গেল, 'আই অ্যাম সরি।'

পিতৃদেব আজ সহজেই সহজ হয়ে গেলেন। এটা ব্যতিক্রমী ঘটনা।

'তোমাদের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। সন্তান হয়নি তাই অন্তর সাহারা হয়ে আছে।'

স্বপ্নাশিস চুপচাপ শুনছিল, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, 'আবার আসবেন?'

'দক্ষিণে থাকে তো! তবে এখন পাতাল রেল হয়ে গিয়েছে, সময় কম লাগবে। তবে এবার আমাদের উচিত রিটার্ন ভিজিট দেওয়া। তোমরা দুই ভাই গিয়ে প্রণাম করে এসো একদিন।'

এরপর আর কথাবার্তা নেই।

খাওয়া শেষ হলে দেবাশিস ভাই-এর ঘরে এল, 'কেলোর মা সত্যি বাজে রাঁধে।'

'তা হোক। এই বয়সে কাজ চলে গেলে বেচারা কী করবে?'

'বাবা তো বললেন কাজ ছাড়াবেন না।'

'ওর অনেক সমস্যা। ওর ছেলে প্রেম করে বেড়াচ্ছে।'

'তুই জানলি কী করে?'

'কেলোর মা আমাকে মেয়েটার চিঠি দেখিয়েছে।'

'সর্বনাশ! তুই ওসব দেখিস না স্বপ্ন' বাবা শুনলে খুব রাগ করবেন! ওরা নিচু ক্লাসের লোক, প্রেমট্রেম যা করার ওরা করুক।'

'তার মানে? প্রেম কি নিচু ক্লাসের লোক করে? রোমিও জুলিয়েট, লায়লা মজনু, রাধাকৃষ্ণ, সুভাষচন্দ্র এমিলি শেঙ্কল কি নিচু ক্লাসের মানুষ?'

'ওঃ, তুই ভীষণ আরগুমেন্ট করিস। বিবেকানন্দের জীবনীটা ভাল করে পড়িস? ব্রহ্মচর্যই হচ্ছে শেষ কথা। মেয়েদের সবসময় মাতৃরূপে চিন্তা করবি।'

'মা তো বাবার স্ত্রী, প্রেমিকা।'

'ইডিয়ট। আমি সেই মায়ের কথা বলছি না। জগজ্জননীরূপ জানিস? তোরা একটা মেয়ের কথা মনে এলেই তার শরীরের কথা ভাবিস। কিন্তু কোনও মেয়ের শরীর ওপেন করলে দেখতে

পেতিস রক্তমাংস চর্বি আর হাড় ছাড়া কিছু নেই। আর সেগুলোর অবস্থান ছেলেদের চেয়ে অনেক জটিল। না না, তোর কথাবার্তা আমার ভাল লাগছে না। বাবার কথা মনে রাখ। মা চলে যাওয়ার সময় তুই এইটুকু ছিলি। নিজের সব সুখ বিসর্জন দিয়ে তোকে মানুষ করেছেন ব্রহ্মচারীর মতো। যে কোনও সন্তানের কাছে পিতাই স্বর্গ পিতাই ধর্ম। তিনি চান আমরা ব্রহ্মচারীর মতো বাস করি, তাই করব। সত্যিকারের সুখী জীবন, শান্তির জীবন যদি চাস তা হলে বন্ধনমুক্ত হয়ে থাকতে হবে।'

'আশ্চর্য! তুই আমাকে এত জ্ঞান দিচ্ছিস কেন?'

'তোর মধ্যে দুর্বলতা ঢুকছে। আমি পড়েছি ক্রিকেটারদের চারপাশে মেয়েরা ঘুরঘুর করে। একদম পাত্তা দিবি না। কেলোরা প্রেম করুক, উচ্ছন্নে যাক।' দেবাশিস কথা শেষ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

পরের ম্যাচে আবার সেঞ্চুরি। একশ বত্রিশ নট আউট, একটা চান্সলেস ইনিংস। ওপেন করতে এসে সাত উইকেট পর্যন্ত আশি বলে ওই রান। দল জিতল তেইশ রানে। হরিমাধবদা জড়িয়ে ধরেছিলেন। সেঞ্চুরির জন্যে নয়, থার্ড স্লিপে ফিল্ড করে তিনটে চমৎকার ক্যাচ ধরার জন্যে তিনি এতটাই উৎফুল্ল যে সাগরে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিলেন স্বপ্নাশিসকে। খেতে খেতে বললেন, 'জানিস স্বপ্ন, আমার জীবনেও একটা স্বপ্ন আছে। অনেক অপমান, কষ্ট, দুঃখ, মুছে ফেলার স্বপ্ন। এই এত বছর ধরে আমি চেষ্টা করে চলেছি, পূর্ণ হয়নি। হ্যাঁ, আমি অনেক রনজি প্লেয়ার তৈরি করে দিয়েছি কিন্তু তারা সুযোগ পাওয়ামাত্র আমাকে ছেড়ে গিয়েছে।'

হরিমাধবদার মুখ দেখে কষ্ট হল স্বপ্নাশিসের, 'কী স্বপ্ন আপনার?'

'একই সঙ্গে লিগ এবং নকআউট জিতব। যে দুটো টিম কলকাতায় রাজত্ব করে, তাদের ওপরে আমাদের ক্লাবকে তুলে দেব। এই দুটো ক্লাব ছাড়া আর একটা ক্লাব রাজত্ব করত আমাদের সময়ে। ওদের ক্লিকবাজিতে আমাকে দল থেকে বাদ পড়তে হয়েছিল। যাকগে, আজ জেতার পর আমরা এখন দু নম্বরে। বাকি দুটো ম্যাচ যদি জিততে পারি তখন একটা সুযোগ আসবে। লিগ পেতেই হবে আমাদের। আজ যে ম্যাচ তুই খেললি ঠিক সেই খেলা খেলতে হবে।'

'সুব্রতকে আজ খেলালেন না কেন?'

'দুটো ম্যাচের জন্যে ওকে সাসপেন্ড করেছিলাম। ও কখনও সিরিয়াস নয়, বেশিদিন টিকতে পারবে না। সুব্রতর বদলে হিমাদ্রি কি খারাপ খেলেছে? খেলেনি। তবে পরের ম্যাচে ওকে নামাব। স্বপ্ন, টাকার জন্যে খেপ খেলিস না।'

'আমি কথা দিয়েছি আপনাকে।'

সেই সন্ধেবেলায় ঘটনাটা ঘটল। পিতৃদেবের ডাক আসতে তাঁর বসার ঘরে গিয়ে দেখল দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন। ঘরে ঢোকামাত্র একজন বললেন, 'এসো এসো। আমরা তোমার সঙ্গে ফাইনাল করতে এলাম ভাই।'

'কী ব্যাপারে?' মিনমিন করল স্বপ্নাশিস।

নিজেদের টিমের নাম করল একজন। এই টিম এখন এক নম্বরে। বললেন, 'সামনের সিজনে তুমি আমাদের টিমে খেলবে। দশ হাজার টাকা পাবে আর চাকরির ব্যবস্থা হবে। তোমার ভবিষ্যতের দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি।'

পিতৃদেব বললেন, 'সেকি? এই খেলা খেলে এত পাওয়া যায়?'

'আমরা দিচ্ছি! কিন্তু তার বদলে আমাদের অনুরোধ আছে।'

'অনুরোধ?' পিতৃদেব জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ। ওদের আর দুটো ম্যাচ বাকি। ও যেন দুটো ম্যাচে কুড়ির বেশি রান না করে, ব্যাস। ও না দাঁড়ালে দল ভেঙে পড়বে। হরিমাধবকে আর চ্যাম্পিয়ন হবার স্বপ্ন দেখতে হবে না। এটুকু করলেই চলবে।'

'আমি ইচ্ছে করে আউট হব?' হাঁ হয়ে গেল স্বপ্নাশিস।

'ওই আর কী! তোমার পারফরমেন্স খারাপ হলে আমাদের চ্যাম্পিয়ন হওয়া আটকাবে না। ওহো, বুঝতে পারোনি, তুমি ভাবছ স্কোর না করতে পারলে বেঙ্গল টিমে তোমার কথা ভাবা হবে না। নো, নট অ্যাট অল। আজ সন্ধেয় ঠিক হয়ে গেছে কাদের ডাকা হবে। লিস্টে তুমিও আছ। অবশ্য লিস্টে থাকলেই ফাইনাল সিলেকশনে যে থাকবে তার কোনও মানে নেই। কিন্তু আমরা কথা দিচ্ছি তোমাকে এবছর রনজি খেলাবই। কি, বলো, রাজি আছ? তা হলে অ্যাডভান্স দিয়ে যাই।'

'আমি একটু ভেবে দেখি।'

'এ নিয়ে ভাবার কী আছে?'

স্বপ্নাশিস অন্যদিকে তাকাল। তার মন কিছুতেই প্রস্তাব মেনে নিতে পারছিল না।

এবার পিতৃদেব বললেন, 'অল্প বয়স। আপনারা বললেন আর ও হ্যাঁ বলে দেবে এমনটা আশা করা ঠিক নয়। ভাবুক, ওকে ভাবতে দিন।'

'ওকে! আপনার বাড়িতে ফোন আছে?'

'না।'

'ও। তাহলে আমরাই যোগাযোগ করব। নমস্কার।'

লোকদুটো চলে গেলে সে ভেতরে ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু পিতৃদেব তাকে ডাকলেন, 'ওরা দশহাজার টাকা এবং চাকরি দিতে চাইছিল। তোমার কি মনেই হয় এর চেয়ে বেশি পাওয়ার যোগ্যতা তোমার আছে?'

স্বপ্নাশিস মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

'কী হল? আমি বোধহয় তোমার কাছে কিছু জানতে চাইছি!'

'আমি জানি না।'

'ওরা তোমাকে বেঙ্গল টিমে খেলানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, শুনেছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে রাজি হলে না কেন?'

'আমাকে হরিমাধবদার সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'কেন?'

'তিনি আমার কোচ। তাঁর কাছে আমি খেলা শিখেছি।'

'মনে হল এঁরা তোমার কোচের শত্রু।'

'তা হলে এঁরা আমার বন্ধু নয়।'

'বাঃ, এই কারণে তুমি টাকা এবং সুযোগ হারাবে, তা ভেবেছ?'

'আমি তো এখনও ছাত্র, টাকার কী দরকার! আর যদি ভাল খেলি তা হলে একদিন না একদিন সুযোগ পাব। আমার থেকে দশ বছরের বড় হয়েও উৎপলদা এবার প্রথম ইন্ডিয়া খেলেছে। আমার তো অনেক সময় আছে।'

'এ সব ভাবছ কেন? হোয়াই?'

'আপনি বলতেন, প্রতিটি সন্তানের উচিত পিতা যেখানে থাকতে বাধ্য হয়েছেন সেখান থেকে এগিয়ে যাওয়া। দাদার কাছে শুনেছি যিনি শিক্ষা দেন তিনিও এক ধরনের পিতা। তা হলে হরিমাধবদার স্বপ্ন সার্থক করা আমার কর্তব্য।'

পিতৃদেব কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'জুতোটা তোমার পায়ে ঠিক হয়েছে? তোমাকে তো পরতে দেখি না। রোজ না পরলে অভ্যস্ত হবে কী করে? আর হ্যাঁ, হরিমাধবকে বলবে আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। যাও।'

পরের ম্যাচেও সেঞ্চুরি। টিম জিতল। খবরের কাগজগুলো উচ্ছ্বসিত। তারা লিখল বেঙ্গল টিমে নতুন রক্ত চাই। আর এইজন্যে স্বপ্নাশিসের সুযোগ পাওয়া দরকার। স্বপ্নাশিস প্রমাণ করেছে নিজেকে। শেষ ম্যাচে জিতলে শ্যামবাজারের দল কলকাতার লিগ চ্যাম্পিয়ন হবে। এবং এটা সম্ভব হচ্ছে স্বপ্নাশিসের জন্য। স্বপ্নাশিস নিশ্চয়ই আগামী বছর শ্যামবাজারে খেলবে না কিন্তু বেঙ্গল টিম অরুণ লালের পর একটি নির্ভরযোগ্য প্রারম্ভিক ব্যাটসম্যান পেল।

রনজিট্রফির জোনাল ম্যাচে যাদের নেটে ডাকা হয়েছে, তাদের মধ্যে স্বপ্নাশিসও রয়েছে। ময়দানে এখন ক্রিকেট নিয়ে বেশ উত্তেজনা রয়েছে। শেষ ম্যাচে শ্যামবাজার স্পোর্টিং-কে হারাতে পারলেই চ্যাম্পিয়ন হবার শেষ ধাপে মুখোমুখি হবে এক নম্বরের। একরকম ঘটনা অনেকদিন পর ঘটতে যাচ্ছে। খেলার দিন সকালে কাউকে প্র্যাকটিস করালেন না হরিমাধবদা। শুধু বললেন, 'যে বল মারার নয় তা মারতে যাবি না। অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বলকে খোঁচা দেওয়া মানে আমার মাথায় আঘাত করা, এটা মনে রাখবি। একটা বলও যেন ফিল্ডিং-এর সময় হাত গলে বেরিয়ে না যায় এইভাবে লড়বি।'

বাড়িতে ফিরতেই পিতৃদেবের সামনে ওঁদের দেখতে পেল স্বপ্নাশিস।

একজন বললেন, 'তুমি বেঙ্গল টিমে খেলছই, ভেতরের খবর দিলাম।'

দ্বিতীয়জন হাসলেন, 'আজ তা হলে অ্যাডভান্স নাও।'

পিতৃদেব বললেন, 'আপনাদের তো বলেছি হরিমাধবের সঙ্গে কথা না বলে ও কিছুই করবে না। আর এই সময় হরিমাধবকে ও বলতে পারছে না কিছু।'

'আশ্চর্য! আপনি ওর গার্জেন, হরিমাধব নয়। আমরা ওকে যেভাবে ব্যাক করতে পারব হরিমাধব কখনও তা পারবে? নেভার! তা ছাড়া আজ ও না খেললেই ভাল হয়।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'না ভজুদা, সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হবে। বরং সেকেন্ড ওভারেই এল বি হয়ে গেলে ভাল হয়।'

'বেশ তাই হোক। তোমাদের টিম আজ না জিতলে আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাব। তোমার বন্ধুদের দুজন আমাদের সাহায্য করবে। বুঝতেই পারছ আমরা কোনও ঝুঁকিতে যেতে চাইছি না। তুমি আমাদের দলে খেললে দেখবে ইন্ডিয়া খেলার চান্স পেলেও পেতে পারো। শ্যামবাজারের থাকলে ডুবে যাবে।'

স্বপ্নাশিস চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। মাঠের বাইরে এই খেলার কথা সে এতকাল শুনে এসেছে আজ সরাসরি দেখতে পেল। হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'আমাকে আমার মতো খেলতে দিন।'

'তার মানে?' প্রথমজন চমকে উঠল।

পিতৃদেব বললেন, 'ও বলতে চাইছে সামনের বছর আপনারা ওর সঙ্গে কথা বলবেন। আমি বুঝতে পারছি না আপনারা এত ভয় পাচ্ছেন কেন? ও ভাল খেললেও আজ ওর টিম হারতে পারে। যদি না হারে শেষ ম্যাচে আপনারা ওদের হারাবেন কারণ আপনারা বড় টিম। যাও, ভেতরে

যাও। তোমার আর এখানে থাকার দরকার নেই।'

মাঠে ভিড় হয়েছিল। বড় দলের অনেকেই খেলা দেখতে এসেছে। নামার আগে সুব্রত বলল, 'স্বপ্ন, তোমার কাছে কেউ গড়াপেটা করার প্রস্তাব দিয়েছে।'

সুব্রত আজ খেলছে। স্বপ্নাশিস মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'রাজি হয়েছিস?'

'মাথা খারাপ। তুই জানলি কী করে?'

'আমার কাছেও গিয়েছিল। টিমের কেউ কেউ টোপ গিললেও গিলতে পারে। আমরা আজ অলআউট যাব। হরিমাধবদার প্রেস্টিজ মানে আমাদেরও প্রেস্টিজ।'

প্রথমে ব্যাট করতে নামল প্রতিপক্ষ টসে জিতে। স্লিপ ছেড়ে গালিতে গিয়ে দাঁড়াল স্বপ্নাশিস। যে বলই তার কাছে যাচ্ছে তাকেই তালুবন্দি করে ফেলছে সে। সুব্রত আজ দারুণ বল করছিল। কিন্তু দলের এক মিডিয়াম ফাস্ট বোলারের বল খুব প্যাঁদাচ্ছিল ওরা। ছেলেটা আজ কেন লেংথে বল রাখতে পারছে না আর লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে বল করছে এটা ভেবে পাচ্ছিল না ওরা। সুব্রত গিয়ে কয়েকবার উপদেশ দিয়ে এল। ক্যাপ্টেন নির্লিপ্ত।

দুশো রানের টার্গেট নিয়ে ব্যাট করতে নামল স্বপ্নাশিসরা। প্রথম বল, গুড লেংথ, অফ্-এর দিকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। উইকেটের বাইরে পা রেখে প্যাড করতে চাইল স্বপ্নাশিস। সঙ্গে সঙ্গে আবেদন উঠল। আর সে অবাক হয়ে দেখল আম্পায়ার হাত তুলে দিয়েছেন। অসম্ভব। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। বল উইকেটে ছিল না। কোনও ভাবেই এল বি ডব্লু হবার কথা নয়। প্রতিবাদ করা অর্থহীন, মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল সে। মনে হচ্ছিল পায়ের তলা থেকে মাটির সরে গেল।

মাঠের বাইরে আসামাত্র বড় ক্লাবের সেই প্রথমজন হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন, 'ওয়েল ডান। খুব খুশি হয়েছি আমরা।'

স্বপ্নাশিস কোনও কথা না বলে নিজের জায়গায় পৌঁছে দুহাতে মুখ ঢেকে বসে পড়তেই হরিমাধবদা কাছে এলেন, 'তুই আউট হোসনি। আম্পায়ার যদি ভুল করে তা হলে তোর কিছু করার নেই। তবে তোকে কতবার বলেছি, ক্রিকেট হচ্ছে ব্যাট দিয়ে বল মারার খেলা। একমাত্র লেগ স্ট্যাম্পের বাইরের বল ছাড়া প্যাড করার চেষ্টা করবি না। যাক গে।'

সেদিন খেলাটা খেলল সুব্রত। বোলার হিসেব তিনটে উইকেট নিয়েছিল কিন্তু ছয় নম্বরে ব্যাট করে একাই টিমকে জিতিয়ে দিয়ে শ্যামবাজারকে শেষ ধাপে তুলে দিল সে। সবাই যখন তাকে জড়িয়ে ধরে উল্লাস করছে তখন সুব্রত বলল, 'দূর, আমি তো মরিয়া হয়ে ব্যাট চালিয়েছি। ঠিকঠাক লেগে গিয়ে রানগুলো চলে এল, আমার কোনও ক্রেডিট নেই।'

স্বপ্নাশিসের খুব লজ্জা করছিল। একদম অবিবেচকের খেলা খেলেছে। দশটা ভাল খেলার পর এরকম একটা খেলা খেলোয়াড়ের বারোটা বাজিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

বড় টিম আজ গটআপ করাব চেষ্টা করেছিল এই খবরটা চাপা থাকেনি। হরিমাধবদা তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ, তোর সঙ্গে ভজুরা কি যোগাযোগ করেছিল?'

সত্যি কথা বলল স্বপ্নাশিস, 'হ্যাঁ।'

'কোনও অফার দিয়েছে?'

'হ্যাঁ। বেঙ্গলে খেলার সুযোগ করে দেবে বলেছে।'

'বাঃ। খুব ভাল। তা খবরটা আমাকে জানাসনি কেন?'

'আমি গুরুত্ব দিইনি তাই আপনাকে বলিনি।'

'গুরুত্ব দিসনি? ওরা তোকে সামনের বছর নিতে চায়নি?'

'হ্যাঁ। দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছে কিন্তু আমি রাজি হইনি।'

'তুই যে সত্যি কথা বলছিস তার কোনও প্রমাণ আছে? আজ যদি দলের কেউ সন্দেহ করে তুই গটআপ করে আউট হয়েছিস, একজন ইচ্ছে করে মারার বল দিয়ে রান বাড়িয়েছে তা হলে সেটা মিথ্যে প্রমাণ করতে পারবি?'

'অন্য কেউ কী করেছে আমি জানি না তবে ওরা বাড়িতে এসেছিল, আমার বাবার সামনে কথা হয়েছে। আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বললে জানতে পারবেন না।'

'তোর বাবা তো শুনেছি ক্রিকেটের এগেইনস্টে, তা হলে কথাবার্তা বললেন কী করে?'

'বাবা কিছুই বলেননি, কিন্তু শুনেছেন।'

'তোর উচিত ছিল আমাকে এসে জানানো। সেটাই ঠিক কাজ হত। তোর অনেস্টি নিয়ে কেউ সন্দেহ করত না।' হরিমাধবদা মাথা নাড়লেন।

'আপনি কি আমাকে সন্দেহ করছেন?'

'না। সেটা করতে রুচিতে বাধে। কিন্তু আমরা কেউ জানলাম না—।'

'সুব্রত জানে। ওর সঙ্গে আজ ম্যাচের আগে আমার কথা হয়েছে। আমরা কিছুতেই গটআপের শিকার হব না বলে স্থির করেছিলাম।'

'তাই?'

'আপনি সুব্রতকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন।'

'দরকার নেই। তুই এত কাঁচা মিথ্যে বলবি না। তা কী ঠিক করলি?'

'কিসের?'

'সামনের বছর ওদের টিমে জয়েন করবি?'

'আমি ওদের বলছি আপনার সঙ্গে কথা বলার পর ভেবে বলব।'

হরিমাধবদা চেয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ, তারপর কোনও কথা না বলে ফিরে গেলেন। মন খুব খারাপ হয়ে গেল স্বপ্নাশিসের। আউট না হয়েও আউট হবার চেয়ে এই মন খারাপ বেশি খারাপ।

সকাল সাড়ে নটায় বিদ্যাসাগর কলেজের সামনে পৌঁছে স্বপ্নাশিস দেখল কয়েকটা ছেলে উল্টোদিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছে। ছেলেগুলো যে লপেটা ধরনের তা এক নজরেই বোঝা যায়। আহির কলেজ থেকে বেরিয়ে নিশ্চয়ই হ্যারিসন রোড পর্যন্ত হেঁটে যায় এবং ওখান থেকেই স্টেশনে যাওয়ার ট্রাম বাস ধরে। তা হলে কলেজের সামনে না দাঁড়িয়ে একটু এগিয়ে দাঁড়ানোই ভাল।

বীণা সিনেমা ছাড়াতেই ঠনঠনের কালীবাড়ির সামনে পৌঁছে গেল। দাঁড়িয়ে নজর রাখছিল সে। কিছু কিছু মেয়ে গলিটা থেকে বেরিয়ে এপাশ ওপাশ চলে যাচ্ছে কিন্তু তাদের মধ্যে আহির নেই। তার মনে বলল দশ মাইল দূরে দশহাজার লোকের মধ্যে থাকলেও সে আহিরকে এক পলকেই চিনতে পারবে।

ঘড়িতে যখন দশটা তখন চিন্তায় পড়ল সে। আহির কি আজ কলেজে আসেনি? ওর শরীর কি খারাপ? মাথার আঘাত থেকে কোনও গোলমাল হল না তো? সে মুখ ফিরিয়ে কালীবাড়ির দিকে তাকাল। তারপর মাথা নাড়ল।

এবং তখনই সে আহিরকে দেখতে পেল। গলি দিয়ে বেরিয়ে একাই দ্রুত হেঁটে আসছে।

একটা হলুদ স্বপ্নের মতো এই হেঁটে আসা। ধীরে ধীরে আবিষ্ট স্বপ্নাশিস রাস্তা পেরিয়ে দাঁড়াল মুখোমুখি হবার জন্যে।'

'আরে! একেই বলে কাকতালীয় ব্যাপার।' সুন্দর হাসল আহির।

'কেন?'

'আজ সকালে মনে হচ্ছিল আপনার সঙ্গে দেখা হলে ভাল হয়। এখন কলেজ থেকে বেরিয়ে ভাবলাম আপনার হয়তো আমাকে মনেই নেই।'

'আমি দেখা করতেই এখানে দাঁড়িয়ে আছি।'

'এখানে কেন? কলেজে গেলেন না কেন?'

'ওখানে—, অস্বস্তি হচ্ছিল।'

'চলুন।'

ওরা পাশাপাশি হাঁটছিল। রাস্তার লোকজন তাদের দেখছে। দেখুক। পৃথিবী তার সবকটা চোখ মেলে দেখে নিক। নিজেকে এখন সম্রাট বলে মনে হচ্ছে।

'খেলা কেমন চলছে?'

'ভাল না।'

'কেন?'

'কাল একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাচে রান করতে পারিনি কিন্তু টিম জিতেছে।'

'এরকম তো হয়ই।'

'আমি খুব সমস্যায় পড়েছি।'

'কী?'

স্বপ্নাশিস দাঁড়াল, 'আমরা কি কোথাও বসতে পারি? আপনার হাতে সময় আছে?'

'ঘড়ি দেখল আহির। একটু ভাবল। তারপর বলল, 'আধঘণ্টা পরে গেলেও চলবে।'

বসার জায়গার খোঁজে হ্যারিসন রোডের মোড়ে পৌঁছে কফিহাউসের কথা খেয়াল হল। দোতলায় উঠে দেখল এখন কফিহাউস প্রায় ফাঁকা। টেবিলে বসে আহির বলল, 'এবার বলুন।'

স্বপ্নাশিস বলল। হরিমাধবদার সঙ্গে তার সম্পর্ক, শ্যামবাজারের ক্লাবে খেলা এবং হঠাৎই নতুন প্রস্তাবগুলোর কথা বলে গেল।

সব শুনে আহির জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু এটাকে সমস্যা বলছেন কেন?'

'সমস্যা না? আমি খেলতে না পারলে সবাই সন্দেহ করছে গট আপ করেছি বলে। বড় টিমে যাওয়ার কথা যদি না দিই তা হলে বেঙ্গলে চান্স পাব কি না সন্দেহ।'

'আপনি কোনটা বড় বলে মনে করেন? সততা না ক্যারিয়ার?'

'দুটোই।'

'তা হলে আপনার কোচের সঙ্গে থেকে ভাল খেলার চেষ্টা করুন। আপনার মধ্যে যদি ক্ষমতা থাকে তা হলে কাল সুযোগ পাবেনই।'

স্বপ্নাশিস তাকাল। পিতৃদেব প্রায়ই বলতেন, তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, চাকরি বাকরি কোনওদিন পাবে না। বড় ক্লাবে গেলে চাকরি পাওয়া অনেক সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু—। সে মনে মনে স্থির করল আহিরের কথাই মেনে নেবে।

'ঠিক বলেছেন।'

কফি এল। ওরা চুপচাপ কফি খাচ্ছিল।

আহির বলল, 'চুপ করে আছেন যে, কথা বলুন।'

'হ্যাঁ মানে, আপনিও তো বলছেন না।'

'বুঝলাম। সমস্যা বলা হয়ে গেলে আপনারও কথা ফুরিয়ে গেল।'

'তা নয়। আসলে আমি কখনও কোনও মহিলার সঙ্গে কথা বলিনি।'

'মহিলা? এমা, আপনি আমাকে মহিলা বলছেন?'

'তা হলে কী বলব?'

'মেয়ে। মহিলা শুনলে বয়স্কা মনে হয়। আপনার বাড়ি কোথায়?'

স্বপ্নাশিস জানাল।

'মা?'

'আমাকে জন্ম দিয়ে মারা গেছেন।'

'ও। তা হলে আপনাদের বাড়িতে কোনও মহিলা নেই?'

'না। এক কেলোর মা আছে, কাজকর্ম করে।'

'আপনার দাদা কী করেন?'

'ডাক্তারি পড়ছে। ও বাবার আদর্শে মানুষ। সারাজীবন ব্রহ্মচারী হয়ে থাকবে।'

'আশ্চর্য! আপনার বাবা তো ব্রহ্মচারী নন। উনি তো বিয়ে করেছিলেন।'

স্বপ্নাশিস জবাব দিল না। বাবাকে নিয়ে এ সব কথা ভাবতেও কেমন ভয় হয়।

'আপনার বাবা কী রকম মানুষ?'

'বাব্বা। প্রচণ্ড রাগী, পান থেকে চুন খসার যো নেই।'

'আপনি ভয় পান?'

'ভয় পায় না এমন কাউকে আমি চিনি না।'

'আপনার খেলাধুলাকে সাপোর্ট করেন?'

'এতদিন করতেন না, বাধাও দিতেন না। এখন যেন মনে হচ্ছে মেনে নিয়েছেন।'

'তা হলে আর আপনার সমস্যা কোথায়?'

কদিন ধরে মনে ওপর যে চাপটা জন্মে ছিল মুহূর্তেই সেটা উধাও হয়ে গেল। স্বপ্নাশিস হাসল, 'ঠিক আছে। ছেড়ে দিন এ-সব কথা।'

'খেলাটা কবে?'

'আগামিকাল।'

'কোথায়?'

মাঠের নাম বলল স্বপ্নাশিস। আহির বলল, 'কাল আমাদের ক্লাস নেই। বাপীকে নিয়ে আপনার খেলা দেখতে যেতে পারি। সেঞ্চুরি করা চাই কিন্তু।'

'ইচ্ছে করলেই কেউ কি সেঞ্চুরি করতে পারে। তবে কাল একদম ধরে খেলতে হবে। আপনি মাঠে থাকলে আমার খুব ভাল লাগবে।'

'কেন?'

হকচকিয়ে গেল স্বপ্নাশিস। ছোট্ট প্রশ্নটার উত্তর দেবার মতো কোনও শব্দ তার জানা নেই! শুধু মনের ভেতরটা বলছে ভাল লাগবে তাই মুখে বলেছে। কিন্তু সেটা তো উত্তর হতে পারে না। আহির তাকিয়ে ছিল ওর মুখের দিকে। উত্তরটা শোনার জন্যে উৎসুক।

'আমি জানি না।' মাথা নাড়ল স্বপ্নাশিস। তারপরেই খেয়াল হতে বলল, 'বাড়ি ফিরতে আপনার কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

'আমি তো বলেই আসব।'

'আপনার বাড়ির লোক বোধহয় আমাকে ভিলেন ভাবেন, তাই না?'

'কেন? ও, মাথায় বল লেগেছে বলে? না। ওখানে ক্রিকেট ফুটবল হয় বলে প্রায়ই আমাদের জানলার কাচ ভাঙত। সেগুলো পাল্টে এখন কাঠের করে নেওয়া হয়েছে। আমার মাথাটাকে তো পাল্টানো যাবে না। আমি ব্যালকনিতে না দাঁড়ালে অ্যাকসিডেন্টটা হত না। দোষটা তো আমার। আপনাকে কেউ দোষী করেনি। এবার উঠতে হবে।'

দাম মিটিয়ে ওরা শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে নামল। বই-এর দোকানগুলো সবে খুলতে আরম্ভ করেছে। আহির হঠাৎ একটা দোকানে ঢুকে পড়তে স্বপ্নাশিস সঙ্গী হল। জীবনানন্দ দাসের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' কিনল আহির। দোকানদার যখন ক্যাশমেমো করছে তখন বই-এর পাতা উল্টে সূচিপত্রে নরম আঙুল রেখে সে জিজ্ঞাসা করল, 'পড়েছেন?'

মাথা নাড়ল স্বপ্নাশিস, না।

দু চোখ বড় হয়ে গেল আহিরের, 'সেকী?'

স্বপ্নাশিস বুঝল, উত্তরটা ঠিক হয়নি। কিন্তু যা সত্যি তাই বলেছে। সে রেগে গেল, আচ্ছা, আপনি 'সানি ডে-জ' পড়েছেন? পড়েননি? বিটুইন দ্য উইকেট পড়েছেন? তাও পড়েননি?'

'ওগুলো নিশ্চয়ই ক্রিকেট সংক্রান্ত বই?'

'হ্যাঁ।'

'এরপর নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবেন ওয়াটার পোলোর ওপর লেখা কোনও বই পড়েছি কিনা? আরে ওগুলো হচ্ছে একটা বিশেষ শাখার বই। স্পেশ্যালাইজড্। ওই লাইনে যার ইন্টারেস্ট আছে তার জন্যে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়দের যে কোনও বাঙালির নিজস্ব অস্তিত্বের জন্যে পড়া উচিত। আমার কাছে বেশি টাকা নেই নইলে আপনাকে একটা কিনে দিতাম। এগুলো না পড়লে অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যায়।'

পড়েনি বলে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল। সে কী করে বলবে বাড়িতে গল্পের বই পড়ার রেওয়াজ নেই। মায়ের আমলে যে কটি বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় বই কেনা হয়েছিল তা পিতৃদেব আলমারিবন্দি করে রেখেছেন। মায়ের স্মৃতিতে হাত দেওয়ার সাহস কারও নেই। ক্লাশ সিক্সে পড়ার সময় সে কালো ভ্রমর বাড়িতে এনেছিল বলে কুড়িবার ওঠবোস করতে বাধ্য হয়েছিল।

স্টেশনে পৌঁছে আহির খুব স্বাভাবিকভাবেই বিদায় নিয়ে চলে গেল ট্রেন ধরতে। এই এতটা রাস্তা আসার সময় তাদের কথা হয়েছে খুব কম। জীবনানন্দ দাশকে শত্রু বলে মনে হচ্ছিল স্বপ্নাশিসের। তিনি কী লিখেছেন সে জানে না, কিন্তু লেখার কী দরকার ছিল? একটা সেঞ্চুরি করার আনন্দ ম্লান হয়ে যাবে তাঁর লেখা না পড়লে?

আজ ঘেরা মাঠে খেলা। খবরের কাগজগুলো কল্যাণে যে উত্তেজনা শুধু দুটো দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যেও। প্রায় হাজার আটেক লোক হয়েছে মাঠে। টস জিতে বড় টিম ব্যাট নিল।

মাঠে নামার আগে হরিমাধবদা প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেছেন কারও বিশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছে আছে কি না। এই প্রশ্নের জবাবে কেউ হ্যাঁ বলবে না তিনি জানেন কিন্তু প্রশ্নটা শোনার পর ছেলেরা যেন একটু বেশি চনমনে হয়ে উঠল। শ্যামবাজারের বোলিং-এর বিরুদ্ধে বড় ক্লাবের কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। মাঝে মাঝে উইকেট পড়লেও ওরা পঁয়তাল্লিশ ওভারে দুশো পঁয়ষট্টি তুলে যখন প্যাভেলিয়ানে ফিরল তখন বিজয় উল্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে। এই রানের পাহাড়ের

কাছে শ্যামবাজারের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

ব্যাট করার আগে হরিমাধবদা স্বপ্নাশিসের সামনে এলেন, 'প্রতিটা বল মানে একটা রান। একটা বল মিস হওয়া মানে পরের বলে দুটো রান নিতে হবে। কিন্তু প্রথম পাঁচটা ওভারে টেনশন করবি না। ঝুঁকি না নিয়ে খেলবি। চোখ সেট হবার পর ওই ফর্মুলায় যাবি।'

মাথা নেড়ে মাঠে নেমেছিল স্বপ্নাশিস। ফিল্ডিং করার সময় সে অনেকবার মাঠের বাইরে গ্যালারির দিকে তাকিয়েছে। কয়েকজন মহিলা আজ মাঠে এসেছেন খেলা দেখতে, আহির তাদের মধ্যে নেই। শব্দটা মনে আসতেই হেসে ফেলল সে হাঁটতে হাঁটতে। আহির তো নিজেকে মহিলা বলে ভাবতে রাজি নয়। হয়তো সঙ্গী পায়নি কিংবা বাড়িতে অসুবিধে হয়েছে বলেই সে আসেনি।

প্রথম ওভারে কোনও রান হল না। অফ স্ট্যাম্পের বাইরে মাপা লেংথে বল করে গেল অভিষেক। বেঙ্গলে মিডিয়াম পেস বোলার। গতবার ইন্ডিয়া টিমের সঙ্গে শ্রীলঙ্কা ঘুরে এসেছে, খেলার সুযোগ পায়নি। দুটো বল স্ট্যাম্পের মধ্যে ছিল, ডিফেনসিভ খেলেছে স্বপ্নাশিস। মেডেনের হাততালি পড়ল। দ্বিতীয় ওভারের তৃতীয় বলে কাট করতে গিয়ে কট আউট হয়ে গেল স্বপ্নাশিসের পার্টনার। কোনও রান না করে এক উইকেট। দ্বিতীয় ওভারের শেষেও স্কোর বোর্ড শূন্য।

বারোটা বল চলে গিয়েছে, এখনও রান নেই। যদিও হরিমাধবদা বলেছেন ধীরে খেলতে তবু—। স্বপ্নাশিস দেখল অভিষেক রাউন্ড দ্য উইকেট বল করতে এসেছে। পিচে পড়ে বল এতটা বাইরে দিয়ে গেল যে উইকেট কিপারকে ঝাঁপাতে হল সেটাকে ধরতে। আম্পায়ার ওয়াইড দিতে শ্যামবাজারের প্রথম রান হল। দ্বিতীয় বল ফুলটস, সঙ্গে সঙ্গে ঘোরাল স্বপ্নাশিস। বিদ্যুৎবেগে চার। এই মারের পরই ছন্দ পেয়ে গেল সে। অভিষেকের ওই ওভারে পনেরো রান নিয়ে অ্যাভারেজ পাঁচ তুলল সে। বিপরীতদিকে গিয়ে ফিল্ডারদের দেখে নেওয়ার সময় গ্যালারিতে নজর যেতেই সমস্ত শরীরের বিদ্যুৎ খেলে গেল। আহির। আহির আজ শাড়ি পরেনি। জিনসের ওপর লাল টপ। সমস্ত মাঠ যেন আলোয় ভরে গেল।

ক্রিকেটের বলকে যখন কোনও ব্যাটসম্যান ফুটবলের আকারে দেখে তখন তাকে আটকানো মুশকিল হয়। দশ ওভারে যখন নব্বুই এবং স্বপ্নাশিসের ব্যক্তিগত স্কোর বিরাশি তখন স্পিনার বল করতে এল। ভাগ্যলক্ষ্মী যখন সাহসীদের পাশে এসে দাঁড়ান তখন বিপক্ষের কিছুই করার থাকে না। উইকেট ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে চারটে বলে ছয় মারল স্বপ্নাশিস। পঞ্চম বলটা ব্যাটে না লাগায় ঘুরে দেখল সেটা উইকেট কিপারের হাতে চলে গেছে। ক্রিজ ছেড়ে সে এতটা এগিয়ে আছে যে ফিরে যাওয়ার সময় নেই। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল উইকেট কিপার বল ধরেই পা পিছলে পড়ে গেল। মুহূর্তেই ড্রাইভ দিয়ে লাইনের ওপাশে ব্যাট রাখতে পারল স্বপ্নাশিস। দ্বিতীয় চেষ্টায় উইকেট কিপার বল তুলে উইকেট ভাঙার আগেই ঘটনাটা ঘটাতে পারল সে।

সেঞ্চুরি হয়ে গেছে বলে এত ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। এখন অনেক পথ বাকি। একটা চার আর দুটো করে রান প্রতি ওভারে নিলেই চলবে। পঁচিশ ওভারের মাথায় যখন স্বপ্নাশিস আউট হল তখন দলের রান একশ নব্বই এবং তার একশো বাষট্টি। তৃতীয় রান নিতে গিয়ে রান আউট হয়ে যখন সে বেরিয়ে আসছে তখন সমস্ত মাঠজুড়ে পায়রার ডানার শব্দ। হরিমাধবদা তাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'শাবাশ। তোর যা করার তার চেয়ে অনেক বেশি করেছিস। একশ কুড়ি বলে পঁচাত্তর রান যদি বাকিরা না তুলতে পারে তা হলে ওদের ক্রিকেট ছেড়ে দেওয়া উচিত। তবে—।'

স্বপ্নাশিস তাকাল। ওকে ঘিরে এখন বেশ বড় ভিড়। সে-সব গ্রাহ্য না করে হরিমাধবদা বললেন, 'ক্রিকেট খেলছিস আর এটা ভুলে গেলি যে তুই দলের জন্যে খেলছিস। ওইভাবে মেরে খেললে

হাততালি পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডেথ সার্টিফিকেট লেখাও হয়ে যেতে পারে। ওই সময় উইকেট কিপার যদি পড়ে না যেত তা হলে মুখ চুন করে ফিরে আসতে হত তোকে। সবসময় মনে রাখিস অতি বাড় বাড়লে ঝড়ে পড়ে যেতে হয়।'

'আপনি তো বলেন কী খেললি কেমন খেললি এ-সব কেউ মনে রাখবে না, স্কোরবুকে যা লেখা থাকবে সেটাই শেষ কথা।'

'সেই লেখাটা যাতে ভবিষ্যতে ঠিকঠাক লেখাতে পারিস তাই এইসব বলা। যাঃ, আর একজন গেল!' হরিমাধবদা ছুটে গেলেন খেলোয়াড়দের দিকে।

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে এক উইকেট হাতে থাকতে ম্যাচ জিতে গেল শ্যামবাজার। বড় টিমের সমর্থকরা জানতেন তাঁরাই জিতছেন, তাই মাঠে আসার প্রয়োজন বোধ করেননি। আজকের দর্শকদের মধ্যে বেশির ভাগই যে শ্যামবাজারে-র সমর্থক তা ম্যাচের শেষে বোঝা গেল। শ্যামবাজারের কর্মকর্তারা জড়িয়ে ধরেছেন খেলোয়াড়দের। সেক্রেটারি সুনীলদা হরিমাধবদাকে জড়িয়ে কেঁদে ফেললেন, 'ভাবতে পারিনি, অসম্ভব আপনার জন্যে সম্ভব হল।'

হরিমাধবদা স্থির। যাঁর সবচেয়ে বেশি হইচই করার কথা তাঁর মুখে কোনও কথা নেই। সুব্রত সহখেলোয়াড়দের নিয়ে দৌড়ে এসে তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে চিৎকার করল, 'থ্রি চিয়ার্স ফর হরিমাধবদা, হিপ হিপ হুররে। সুনীলদা কিছু বলতেই কয়েকজন স্বপ্নাশিসকে মাথায় তুলে নিল, 'থ্রি চিয়ার্স ফর স্বপ্নাশিস, হিপ হিপ হুররে।'

মানুষের মাথার ওপর উঠলে আকাশটা একটু নীচে নেমে আসে। তখন পৃথিবীটাকে অন্যরকম দেখায়। ওই অবস্থায় স্বপ্নাশিস দেখল জিনস আর লাল টপ তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে ছটফটিয়ে উঠল নীচে নামবার জন্যে কিন্তু ওরা সেটাকে পাত্তা না দিয়ে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। সুনীলদা তার মধ্যে ঘোষণা করলেন, 'টিমের সবাইকে অনুরোধ করছি এখান থেকে সোজা দেশবন্ধু পার্কে চলে আসতে। এত বড় আনন্দের দিনে আমরা ওখানেই উৎসব করব।'

স্বপ্নাশিস যখন মাটিতে পা দিল তখন একটা হাত তার দিকে এগিয়ে এসেছে। বাপী। করমর্দন করল ওরা। বাপী বলল, 'দারুণ, দারুণ খেললে গুরু।'

বাপীর পাশে যে দাঁড়িয়ে তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে স্বপ্নাশিস জিজ্ঞাসা করল, 'কখন এসেছ তোমরা? আমি ভেবেছিলাম আসোনি।'

'একটু দেরিতে। আমরা যখন এসেছি তখন ওদের দুটো উইকেট পড়েছে।'

'সে তো অনেকক্ষণ।' এবার আহিরের দিকে তাকাল সে।

আহির হাসল। তারপর একটা প্যাকেট এগিয়ে ধরল, 'অভিনন্দন।'

'কী এটা?'

'বাড়িতে গিয়ে দেখবেন। আপনি বলেছিলেন ইচ্ছে করলেই কেউ সেঞ্চুরি করতে পারে না। কিন্তু হল তো! সততা আর ক্যারিয়ার তা হলে পরস্পরের শত্রু নয়।'

প্যাকেটটা হাতে নিতেই অন্যদের অভিনন্দন ঢেউ হয়ে ফিরে এল। তার মধ্যে বাপী বলল, 'আমরা যাই। অনেকদূরে ফিরতে হবে।' স্বপ্নাশিস কথা বলতে পারল না। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল আহিরকে আর একটু থাকতে বলতে। কিন্তু এত লোক, এত উত্তাপ, সে কথা বলার সুযোগই পেল না।

সাংবাদিকরা এবার ছেঁকে ধরলেন তাকে। প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাবে সে খুব সরল ভঙ্গিতে বলল, 'হরিমাধবদা ঠিক যেভাবে শিখিয়েছেন সেইভাবে খেলার চেষ্টা করেছি, তার বেশি আমি কিছু জানি না।'

'আপনি কি জানেন হরিমাধববাবু দীর্ঘদিন ধরে চ্যাম্পিয়ান হবার চেষ্টা করছিলেন একটা প্রতিশোধ নিতে। এবং সেজন্যেই আপনাদের তৈরি করেছেন!'

'আমাকে উনি খেলা শিখিয়েছেন এর বেশি কিছু জানি না।'

'আজকের সেঞ্চুরি হয়তো আপনাকে বেঙ্গল টিমে জায়গা দিয়ে দেবে। শুনেছি বড় ক্লাবগুলো আপনার সম্পর্কে আগ্রহী। ওরা অফার দিলে যাবেন?'

'সেটা হরিমাধবদাই ঠিক করবেন।'

ওরা যখন ট্যাক্সিতে চেপে দেশবন্ধু পার্কে ফিরছে তখন সুব্রত পাশে বসেছিল। হঠাৎ উরুতে চিমটি কাটল সুব্রত। হকচকিয়ে প্রশ্ন করল স্বপ্নাশিস, 'কীরে?'

'কেসটা কী?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল সুব্রত।

'কীসের কেস?' মাথায় ঢুকল না স্বপ্নাশিসের।

'যার মাথা ফাটালি সে তোর খেলা দেখতে এসে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছে। নিশ্চয়ই তোর সঙ্গে ওর এর মধ্যে দেখা হয়েছিল। আমার কাছে চেপে গিয়েছিস?'

'মাঠে তো অনেকেই খেলা দেখতে এসেছিল, আমি কি সবাইকে আসতে বলেছি?'

'সবাইকে নয়, ওই একজনকে বলেছিস। বলিসনি?'

'না। ওরা নিজেরাই এসেছে।'

'দারুণ দেখতে কিন্তু।'

'তাতে তোর কী?'

'ঠিকই। বেল পাকলে কাকের কী? তবে গুরু একটু বুঝেসুঝে এগিও। শ্যামনগর খুব খতরনাক জায়গা। লাস্ট কবে দেখা হয়েছিল? ওখানে গিয়েছিলি?'

'বিশ্বাস কর, সেই খেলার পর আর আমি শ্যামনগরে যাইনি।'

'তোর কপালটা মাইরি দারুণ।'

দেশবন্ধু পার্কে মিষ্টিমুখ হইচই হবার পর হরিমাধবদা দু হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে বললেন। সবাই শান্ত হলে তিনি বক্তৃতা দেবার ঢঙে বললেন, 'আজ ক্লাবের তো বটেই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধ পূর্ণ হল। কজন মানুষ এ কথা বলতে পারে? আমি পারলাম ছেলেদের জন্যে। কিন্তু সেইসঙ্গে নিজেকে খুব ছোট লাগছে। গত দুতিনটে ম্যাচ হবার আগে থেকে খবর পাচ্ছিলাম বড় দল লোভ দেখাচ্ছে আর আমার ছেলেদের কেউ কেউ তাতে সাড়া দেবে বলে ঠিক করেছে। অর্থাৎ যাদের নিয়ে আমি লড়াই করব তাদের কেউ কেউ আমাকে হারাতে চায়। আমি সন্দেহ করতে বাধ্য হয়েছি, শেষপর্যন্ত ছেলেদের বলেছি। আমি আমার নিজের হাতে গড়া ছেলেদের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিলাম। অথচ ওরাই আজকে আমার সাধ পূর্ণ করল। নিজেকে তাই ছোট লাগছে খুব। আমি সুনীলের কাছে অনুরোধ করব সিনিয়ারদের কোচিং থেকে আমাকে অব্যাহতি দিতে। যে সব শিশুরা প্রথম ব্যাট বল ধরতে মাঠে আসবে তাদের জন্যে কিছু করতে পারলে খুশি হব। কারণ শিশুদের এখনও জটিল জীবন যাপন করতে হয় না। একবার ভেবেছিলাম যেহেতু আমার আর কোনও ব্যক্তিগত চাওয়া নেই তাই মাঠে আসা ছেড়ে দেব। কিন্তু না। ক্রিকেট আমাকে যা দিয়েছে তার ঋণশোধ এ জীবনে হবে না। তাই শিশুদের জন্যে আমি রইলাম। নমস্কার।'

হইচই পড়ে গেল। প্রতিবাদ, আব্দার, অনুনয়। জয়ের আনন্দ যেন মুহূর্তেই উধাও। কিন্তু কোনও কিছুতেই হরিমাধবদাকে সিদ্ধান্ত থেকে টলানো যাচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত সুনীলদা বললেন, 'ঠিক আছে। আমি ওর সঙ্গে আলাদা কথা বলব। আগামিকাল কোনও প্র্যাকটিস হবে না?'

সঙ্গে সঙ্গে হরিমাধবদা বললেন, 'সেকি! প্র্যাকটিস হবে না কেন?'

'কোচ নেই বলে।' সুনীলদা চট করে জবাব দিল।

'কোচ নেই বলে প্র্যাকটিস হবে না? এ কী কথা! তা হলে এতদিন ধরে এরা কী শিখল?'

সুনীলদা মাথা নাড়লেন, 'বেশ। হবে। প্র্যাকটিস হবে।'

স্বপ্নাশিস একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। এখন চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সবাই হরিমাধবদার কথা বলছে। তাঁর সিদ্ধান্ত ঠিক না বেঠিক এই নিয়ে আলোচনা। একটু বাদে হরিমাধবদা টেন্ট থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরতে সে ওঁর সঙ্গী হল।

হরিমাধবদা বললেন, 'আজ তোর কোন খেলাটা আমার ভাল লেগেছে জানিস? ওই নিশ্চিত আউট হওয়া থেকে বেঁচে যাওয়ার পর যে খেলাটা খেললি ওইটেই খেলা উচিত। তোর সেই বেপরোয়া ভাব চলে গেল, তুই দলের জন্যে খেললি।'

স্বপ্নাশিস চুপচাপ হাঁটছিল। একটু পরে হরিমাধবদা বললেন, 'তোর বয়স অল্প। কিন্তু তোর থেকে আরও কম বয়সে শচীন ইন্ডিয়া খেলেছে। আবার ডেভিডের কথা ভাব। তিরিশ বছরে ইন্ডিয়া ক্যাপ পেল। আমার বিশ্বাস তুই এবার বেঙ্গলে চান্স পাবি। বেঙ্গল টিমে যেমন ইন্ডিয়া টিমেও ঠিক তেমনই কোনও ওপেনার নেই। বিহার ওড়িশা অসমের সঙ্গে খেলাগুলোকে যদি কাজে লাগাতে পারিস তা হলেই অনেকটা এগিয়ে যাবি।'

স্বপ্নাশিসের এ সব ভাল লাগছিল না। সে বলল, হরিমাধবদা—।'

'হ্যাঁ, বল।'

'আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না।'

'ছেড়ে যাচ্ছি কোথায়? কোনও সমস্যায় পড়লেই এসে কথা বলবি।' হরিমাধবদা বললেন, 'তা তুই শ্যামবাজারে না খেলে বড় ক্লাবগুলোতে খেললেও আমার দরজা খোলা থাকবে।'

'আমি দলবদল করলে আপনি খুশি হবেন?'

'যদি তোর মনে হয় যা চাইছিস তা শ্যামবাজার দিতে পারছে না তা হলে জোর করে পড়ে থাকলে মনের ওপর চাপ বাড়বে, সহজ খেলা খেলতে পারবি না। সে ক্ষেত্রে যারা তোর সাহায্যে আসবে তাদের কাছে যাওয়াই ভাল। তবে যেখানেই যাবি সৎ থাকবি। মাঠে নেমে কখনও ক্রিকেটের সঙ্গে বেইমানি করিস না। মনে রাখিস বেইমানদের ইতিহাস কখনও ক্ষমা করে না।' হরিমাধবদা আবার হাঁটা শুরু করলেন।

আজ রাত হয়ে গিয়েছে বাড়ি ফিরতে। সে-কথা খেয়ালে এল বাড়ির সামনে এসে।

বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে, দরজা খোলা। পা বাড়াতেই পিতৃদেব মুখ ফেরালেন, 'দাঁড়াও।'

স্বপ্নাশিস স্থির হল। আজ যখন সবাই তাকে নিয়ে মাতামাতি করছে তখন পিতৃদেব গলার স্বর একটুও পাল্টাননি। গম্ভীর গলায় বললেন, 'এবাড়ির নিয়মগুলো জানা আছে?'

হ্যাঁ। আজ ফাইনাল ছিল—!'

'খেলা ভেঙেছে সন্ধের অনেক আগেই। তুমি যত বড় খেলোয়াড় হও না কেন যদি ভাবো তোমার জন্যে নিয়মগুলো বদলাবে তা হলে ভীষণ ভুল করেছ। এই শেষবার, এরপর আর আমি টলারেট করব না। কথাটা মনে থাকে যেন!'

'আচ্ছা!' স্বপ্নাশিস পা বাড়াচ্ছিল ভেতরের দিকে, পিতৃদেব হাত তুলে তাকে থামালেন, 'ভদ্রতাবোধ, সৌজন্য এ সব কি নতুন করে শেখাতে হবে তোমাকে? আজ কী হল?'

'আমরা জিতেছি।'

'হুঁ! চ্যাম্পিয়ন হয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'ভজুবাবুরা নিশ্চয়ই তোমার ওপর খুব রেগে গেছেন?'

'আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।'

'হাতে ওটা কী?'

'বোধহয় বই।' উত্তর দেওয়ামাত্র বুক ধক্‌ করে উঠল।

'কী বই?'

'খুলে দেখিনি। একজন দিয়েছে।'

'যাও।'

ঘরে ঢুকে অন্ধকারে একটু সময় দাঁড়িয়ে থাকল সে। তার মনে হচ্ছিল এ বার পিতৃদেবের মুখের ওপর বলা দরকার এরকম ব্যবহার আর আপনার করা উচিত নয়। তার খুব রাগ হচ্ছিল কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা প্রকাশ করার কোনও উপায় ছিল না। আপনাকে আমি আগ বাড়িয়ে খেলার খবর দিইনি কারণ সে রকম সম্পর্ক বাল্যকাল থেকে আপনি রাখেননি। আমার যথেষ্ট সৌজন্যবোধ আছে কিন্তু আপনার কাছে সেটা দেখানোর আবহাওয়া আপনিই তৈরি করেননি।

আলো জ্বালল সে। তারপর প্যাকেটটা খুলতেই বইটা বেরিয়ে এল। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা। 'কবিতা কী এ জিজ্ঞাসার কোনও আবছা উত্তর দেওয়ার আগে এ টুকু অন্তত স্পষ্টভাবে বলতে পারা যায় যে কবিতা অনেক রকম।' প্রথম লাইনটা পড়ল সে। তারপরে সূচিপত্রের ডানদিকে সুন্দর হস্তাক্ষর, 'আজ যে সফল হবে কাল তাকে শুদ্ধ করবে এই কবিতাগুলো। আহির, সকাল সাড়ে দশটা।' পাতা ওল্টাল স্বপ্নাশিস। কবিতা পড়ার অভ্যেস তার নেই। কোনওদিন পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সে কবিতা পড়েনি। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎই নজর গেল আটকে। 'সারাদিন মিছে কেটে গেল/সারারাত বড্ডো খারাপ/'। সঙ্গে সঙ্গে মন কি রকম হয়ে গেল। সযত্নে বইটা রেখে ঠিক করল আগাগোড়া পড়ে ফেলতে হবে। যদি ভাল নাও লাগে তবু পড়বে। আহির তাকে শুদ্ধ করার জন্যে এই বই দিয়েছে, শুদ্ধ হবে সে।

রাত্রে খেতে বসে তিনজনই একই নিয়মে খাচ্ছিল।

হঠাৎ পিতৃদেব বললেন, 'দেবু, তোমার ভাই-এর দল আজ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, কাল খবরের কাগজে নিশ্চয়ই ছবি বের হবে। তোমাদের মা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই খুশি হতেন কারণ তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট হতেন।'

খাওয়া থামিয়ে দেবাশিস জিজ্ঞাসা করল, 'আরে, তুই বলিসনি কেন?'

'তুই পড়ছিলি তাই ডিস্টার্ব করিনি।'

'খুব ভাল খবর।' দেবাশিস আবার খাওয়া শুরু করল।

'একজন ভাল খেলোয়াড় আর একজন ভাল ডাক্তারের মধ্যে কাকে মানুষের বেশি দরকার?' পিতৃদেব প্রশ্নটা করলেন।

মনে মনে তেতে গেল স্বপ্নাশিস। জবাবটা সে-ই দিল, 'ডাক্তার।'

দেবাশিস মাথা নাড়ল, 'প্রতিবছর সারা দেশ জুড়ে হাজার হাজার ডাক্তার তৈরি হচ্ছে। তাদের মধ্যে ভালদের সংখ্যাও অনেক। কিন্তু প্রতি বছর একজন গাভাসকার বা শচীন বের হয় না যাদের খেলা মানুষকে আনন্দ দিতে পারে। একলক্ষ স্কিলড পার্সেনের চেয়ে একজন জিনিয়াস অনেক বেশি সম্মান দাবি করতে পারেন।'

তর্কে পেয়ে গেল স্বপ্নাশিসকে। পিতৃদেবের সঙ্গে খাবার টেবিলে বসে এত কথা কখনও বলেনি

তারা। সে বলল, 'যে গ্রামে মানুষ চিকিৎসার অভাবে মারা যায় তারা একজন ডাক্তারকে যে ভাবে চাইবে একজন খেলোয়াড়কে কখনও নয়।'

এ বার পিতৃদেব বললেন, 'ঠিক আছে।'

অর্থাৎ তোমরা চুপ করো। অনেক হয়েছে।

তিনি আজ বেশ আস্তে খাচ্ছেন, 'প্যাকেটে কী বই ছিল?'

দেবাশিস তাকাল। পিতৃদেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'শুনতে পাওনি?'

স্বপ্নাশিষ জবাব দিল, 'একটা কবিতার বই।'

'অ্যাঁ? তুমি আজকাল কবিতাও পড়ো নাকি?'

'কবিতা পড়া কি খারাপ?'

'পাল্টা প্রশ্ন করছ দেখছি! হুঁ। মেয়েটি কে?'

চমকে উঠল স্বপ্নাশিস, 'কার কথা জিজ্ঞাসা করছেন?'

'আজ একাধিক মেয়ের সঙ্গে মিশেছ মনে হচ্ছে। খেলার শেষে ট্যাস সাজে যে মেয়েটা তোমাকে বই দিয়ে গেল তার কথা জিজ্ঞাসা করছি।'

'আপনি, আপনি কী করে জানলেন?'

'শাট আপ! আবার প্রশ্ন।'

'আমি, আমি চিনি না।'

'শোনো, খেলোয়াড়দের চারপাশে সবসময় লোভের হাতছানি থাকে। বিশেষ করে যারা ক্রিকেট খেলে তাদের সম্পর্কে তো কত গুজব রটে। তুমি যখন মেয়েটিকে চেনো না তখন আর ওকে প্রশ্রয় দেবে না। ওর ভাবনাচিন্তা আমার ভাল লাগেনি।'

মনের মধ্যে তোলপাড় হচ্ছিল স্বপ্নাশিসের। আহির যে মাঠে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছিল সে খবর পিতৃদেব পেলেন কী করে? কেউ কি দেখে এসে ওঁকে জানিয়েছে? সে দেবাশিসের দিকে তাকাল। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে খেয়ে চলেছে। দাদাকে কি বাবা পাঠিয়েছিলেন? তার মনে পড়ল এর আগের দিন এ বাড়িতে আসা কাগজে খবর না থাকা সত্ত্বেও পিতৃদেব ঠিকঠাক খেলার কথা বলেছিলেন। তবে কি উনি নিজেই আজ মাঠে গিয়েছিলেন? অসম্ভব।

'কী ব্যাপার? তোমার ভাবসমাধি হয়ে গেল নাকি?'

'অ্যাঁ?'

'এমন কী ভাবছ যে জগৎ বিস্মরিত? তুমি আমার কাছে মিথ্যে বলছ না তো?'

'কী ব্যাপারে?'

'ওই মেয়েটির ব্যাপারে?'

'আজ্ঞে না।'

'তা হলে এত চিন্তার কী আছে! আর যদি প্রমাণিত হয় তুমি মিথ্যেবাদী তা হলে এ বাড়িতে তোমার স্থান নেই, মনে রেখো।'

দেবাশিস এতক্ষণ খেয়ে যাচ্ছিল, এবার বলল, 'স্বপ্ন সে রকম নয় বাবা।'

'কিরকম?'

'আমরা দুজনে প্রায়ই আলোচনা করি ব্রহ্মচারী হয়ে থাকার ব্যাপারে।'

'তোমার কথা আলাদা। ডাক্তারি পড়ার সময় বলে দিয়েছিলাম, খবরদার, গাইনি হওয়ার চেষ্টা করো না, মেয়েদের সংস্পর্শে আসতে হবে, তুমি কথা শুনেছ! কিন্তু একে আমি সে রকম বিশ্বাস করতে পারছি না।' পিতৃদেব উঠে গেলেন।

ঘরে ফিরে মনে মনে খানিকটা সময় যুদ্ধ করল সে পিতৃদেবের সঙ্গে। হিটলারের সঙ্গে এবার তাকে যে লড়াই করতে হবে তার রিহার্সাল দিল। দাদার ওপর যত ইচ্ছে রোলার ঘোরাক ক্ষতি নেই কিন্তু সে এবার প্রতিবাদ করবে। মুশকিল হচ্ছে ওই মুখ সামনে এলে কথাগুলো কেমন তাল পাকিয়ে ভেতরে ঢুকে যায়। সে শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল তাকে তাড়াতাড়ি বড় হতে হবে। ক্রিকেট খেলে নাম এবং অর্থ উপার্জন করতে হবে। একমাত্র রাস্তা এটা। তা হলেই তার পক্ষে পিতৃদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব।

মনে মনে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে সে জীবনানন্দের বই-এর পাতা ওল্টাল। আজ যে সফল হল কাল তাকে শুদ্ধ করবে এই কবিতাগুলো। শুদ্ধ বলতে আহির কী বুঝিয়েছে সে জানে না কিন্তু তাকে কবিতাগুলো পড়তে হবে। প্রথম কবিতাটা পড়তে পড়তে সে থমকে গেল। এ তো তারই কথা—'অগণন যাত্রিকের প্রাণ/খুঁজে মরে অনিবার, পায়নাকো পথের সন্ধান :/চরণে জড়ায়ে গেছে শাসনের কঠিন শৃঙ্খল।' আর এ থেকে মুক্তির উপায় কবি লিখেছেন, 'ভেঙে যায় কীট প্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক/তোমার চকিত স্পর্শে।' নির্মোক মানে কী? কবিতার বই সরিয়ে অভিধান দেখল সে। খোলস, বর্ম। চোখ বন্ধ করল স্বপ্নাশিস। সত্যি তো। পিতৃদেবের শাসনের ফলে সে একধরনের বর্ম পরে রয়েছে। নিজের মুখ প্রকাশ করতে পারছে না। একমাত্র আহিরই পারে তাকে মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে। জীবনানন্দকে খুব পছন্দ হল তার।

বেঙ্গল টিমে নির্বাচিত হল স্বপ্নাশিস। খবর পেয়েই সে ছুটল হরিমাধবদের কাছে। তিনি জড়িয়ে ধরলেন, 'গুড। প্রথম খেলা কার সঙ্গে?'

'ওড়িশার সঙ্গে কটকে।'

'বাঃ। এখন থেকে প্রত্যেকটা ম্যাচই তোর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তুই যত ভাল খেলোয়াড়ই হোস না কেন রান করতে না পারলে তোর কোনও মূল্য নেই।'

পিতৃদেব খবরটা শুনে বললেন, 'পড়াশুনা যাও বা এতদিন হচ্ছিল এখন সেটা শিকেয় উঠল। বাড়ির বাইরে গিয়ে রাত কাটাতে হবে, সাপের পাঁচ পা দেখো না।'

'আপনি আমাকে অবিশ্বাস করেন?' সাহস করে জিজ্ঞাসা করল সে।

'করি।'

মুখের ওপর জবাব পেয়ে অবাক হয়ে তাকাল স্বপ্নাশিস, 'কেন?'

'বিকজ তুমি সাবলাক হয়ে গেছ, নোংরা মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করছ। ভাবতেই আমার শরীর গুলিয়ে ওঠে। কথাটা তোমাকে বলতেও আমার সঙ্কোচ হচ্ছিল। কিন্তু আজ যখন প্রশ্ন করলে তখন জিজ্ঞাসা করছি মেয়েটা কে?'

বুকের ভেতর ভূমিকম্প শুরু হল, 'কার কথা বলছেন?'

সঙ্গে সঙ্গে পাশের টেবিল থেকে একটা বই তুলে কাগজটা বের করলেন তিনি, 'পড়ো, জোরে জোরে পড়ো। দেবু, দেবু! এ দিকে এসো, কুইক।'

দেবাশিস ভেতরের দরজায় এসে দাঁড়ানোর পর কাগজটা হাতে দিলেন 'নাউ, স্টার্ট।'

কাগজটার দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল স্বপ্নাশিস। এটা পিতৃদেবের হাতে পৌঁছাল কী করে? সে এটাকে নিজের ঘরে অভিধানের মধ্যে রেখেছিল।

'বোবা হয়ে থেকো না। পড়ো!' শব্দটা আছড়ে পড়ল।

'এটা আমার নয়।'

'আবার আর্গুমেন্ট। পড়তে বলছি, পড়ো।'

'এ চিঠি আমার নয়, আমি পড়তে পারব না।'
ছোঁ মেরে চিঠিটা নিয়ে পিতৃদেব দেবাশিসকে দিলেন, 'তুমি পড়ো।'
দেবাশিস পড়ল 'মাই ডার্লিং। আই লাভ ইউ! তোকে ছাড়া আমার দিল দেওয়ানা। গত শনিবার তুই আমাকে গ্রেসে সিনেমা দেখালি। মনে হচ্ছিল আমি মাধুরী আর তুই অজয়। আ গলে লাগ যা। কিন্তু ডার্লিং—।'
'শাট আপ। উঃ। কী ইতর ভাষা, ছি ছি ছি।'
'প্রচুর বানান ভুল।' দেবাশিস পিতৃদেবের বাড়ানো হাতে চিঠি ধরিয়ে দিল।
'অশিক্ষিত! আনকালচার্ড! এই সব নোংরা মেয়ের সঙ্গে তুমি মিশছ? লুকিয়ে লুকিয়ে গ্রেসে সিনেমা দেখতে যাওয়া হচ্ছে! পাপ কখনও চাপা থাকে না। পাপী ভুল করবেই। তাই ডিকশনারিতে রেখেছিলে এটা, হুঁ হুঁ, আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া?'
'এ চিঠি আমার নয়।'
'আবার মিথ্যে কথা। লায়ার!'
'আমার কথা বিশ্বাস না করলে আপনি কেলোর মাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।'
'কেলোর মা?' তাকে কেন জিজ্ঞাসা করব?'
'ওই চিঠি কেলোর মা-ই আমাকে দিয়েছে।'
'আই সি। স্যাক হার। আজই ওকে তাড়াব। দূতীর কাজ করছে বুড়ি। কেলোর মা!' বজ্র-কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়লেন পিতৃদেব।
কেলোর মা যে কাছাকাছি ছিল তা বোঝা গেল তার দ্রুত প্রবেশে।
'গেট আউট। নিকালো হিঁয়াসে। ওদের মা চলে যাওয়ার পর থেকে তোমার ওপর ছেড়ে দিয়ে কী ভুল করেছি। ওই ছেলেটার মাথা খাচ্ছ তুমি?'
'আমি আবার কী করলাম?'
'এই চিঠি এ বাড়িতে আনেনি তুমি?'
'ওটা কী চিঠি?'
'মাই ডার্লিং, আ গলে লাগ যা। কে লিখেছে, নাম কী তার?'
'বিন্দু।'
'বাঙালি? এই নাম? ছি, ছি, তার চিঠি এ বাড়িতে বয়ে এনেছ তুমি?'
'অন্যায় হয়ে গিয়েছে। আমার মাথা ঠিক ছিল না তখন।'
'আমার মাথা এখন ঠিক নেই। তোমাকে কাল থেকে আর কাজে আসতে হবে না।'
'সেকী? কেন? আমি তো বললাম আমার মাথা ঠিক ছিল না।'
'ওটা কোনও কৈফিয়ত নয়। ব্রিং দ্যাট গার্ল। ওই বিন্দুকে নিয়ে এসো এখানে।'
'সে তো নেই।'
'নেই মানে?'
'কেলো ওর সঙ্গে সম্পর্ক কাটান দেবার পর কোন মাসির বাড়ি চলে গেছে।'
'এর মধ্যে কেলো আসছে কোত্থেকে?'
'তার মানে? কেলোর সঙ্গে ভাব হচ্ছিল বলে তো আমার মাথা—'
'দাঁড়াও। এচিঠি বিন্দু কাকে লিখেছিল?'
'কেলোকে।'
'হুম। তা হলে চিঠিটা এ বাড়িতে এল কেন?'

'দাদাবাবুকে দিয়ে পড়াতে এনেছিলাম। কেলোর পকেটে পেয়েছিলাম ওটা। দাদাবাবু কাছে পরামর্শ চেয়েছিলাম কেলোকে ফেরাতে। তা বলতে নেই, কদিন পরে কেলো আমার সামনে বিন্দুকে বলে দিল কোনও সম্পর্ক নেই।'

পিতৃদেব এ বার স্বপ্নাশিসের দিকে ফিরলেন, 'বাঃ। অনেক গুণ হয়েছে দেখছি। অ্যাডভাইসার হয়েছ! এ সব ব্যাপার সমাধান করছ। তলে তলে এত উন্নতি হয়েছে ভাবতে পারিনি। নো মোর, এ সব ব্যাপারে একদম থাকবে না, দ্যাটস মাই অর্ডার। আমার ব্লাড প্রেসার বেড়ে গিয়েছে তোমার ব্যাপার দেখে। যাও, যাও তোমরা।'

হঠাৎ স্বপ্নাশিস নিজেকে বলতে শুনল, 'আপনি অকারণে উত্তেজিত হন।'

'হোয়াট?' পিতৃদেবের গলার স্বর ফ্যাসফেসে হয়ে গেল।

আর ফেরার পথ নেই। তির ধনুক থেকে বেরিয়ে গেলে সেটা এগিয়ে যাবেই যতক্ষণ জোর থাকে।

'আপনি নিজে যা ভাবেন সেটাকেই ঠিক মনে করেন। আমরা বড় হয়েছি, আমাদের কিছু বলার থাকতে পারে তা আপনি চিন্তাও করেন না। সে জন্যেই আপনার প্রেসার বাড়ে!'

'তুমি তু-মি আমার মুখের ওপর এ সব কথা বলছ?'

'আমি আপনাকে একটুও অশ্রদ্ধা করছি না। এই দেখুন না, আপনি ওই চিঠিটাকে আমাকে লেখা ভেবে উত্তেজিত হয়ে শরীর খারাপ করছিলেন। ঠিক কি না!'

'এ বাড়ির একটা ডিসিপ্লিন আছে—।'

'নিশ্চয়ই। আমরা সবাই সেটা মেনে চলি। কিন্তু আপনি যখনই আমাদের সঙ্গে কথা বলেন তখনই রেগে রেগে বলেন কেন? কেলোর মা বলছিল মায়ের সেই বোন যেদিন এসেছিল সেদিন আপনি স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিলেন। তা হলে আপনি সেটা হতে পারেন।

'তার মানে আমি ইচ্ছে করে অস্বাভাবিক হই?'

'সেটা আপনি জানেন। আমার খেলা দেখতে গিয়েছেন অথচ এমন ভান করেছেন নিজে যাননি। বলুন, সত্যি কিনা?' পায়ের তলায় যেন মাটি পাচ্ছিল স্বপ্নাশিস।

'অদ্ভুত! অদ্ভুত! তোমাদের বলেছিলাম মাসির সঙ্গে দেখা করে আসতে। গিয়েছ? কোনও কথা শোনো? আবার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শোনানো হচ্ছে! যাও, আমাকে একা থাকতে দাও।' হাত নাড়ালেন পিতৃদেব। দুপায়ে ডানা বেঁধে যেন ঘরে ঢুকল সে। আনন্দে লাফাতে ইচ্ছে করছিল, লাফিয়ে নিল। উঃ, অনেকদিন ধরে মনে যে ইচ্ছেটা বড় হচ্ছিল আজ সেটা পূর্ণ করতে পেরেছে। কোনও প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারেননি উনি। যেন একটা বিরাট যুদ্ধ জয় করে ফেলেছে সে এমন ভঙ্গিতে দরজার দিকে তাকাতেই সে দেবাশিসকে দেখতে পেল। দেবাশিসের মুখ দেখার মতো।

দেবাশিস বলল, 'তুই, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে?'

'না তো। মনে হচ্ছে নাকি?'

'তুই বাবার সঙ্গে ওইভাবে কথা বললি?'

'খারাপভাবে বলিনি। যা ন্যায় তাই বলেছি।'

'ন্যায়-অন্যায় বিচার করার তুই কে? এমনিতেই মাথা গরম থাকে, তোর কথা শুনে যদি কিছু হয়ে যায় তা হলে?'

'এখন থেকে শান্ত হয়ে যাবে। কখনও কখনও একজনকে এগিয়ে গিয়ে বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে হয়। যাক গে, কালই তুই সেই মাসির বাড়িতে যাবি।'

'কেন?'

'বাঃ। তুই বাবার বাধ্য ছেলে। পিতৃ আদেশ লঙ্ঘন করা অপরাধ!'

'তুই যাবি না?'

'আমি কী করে যাব? কাল থেকে কড়া প্র্যাকটিশ।' জীবনানন্দ দাশের বইটা টেনে নিল সে, 'একটা কবিতা শুনবি দাদা!'

দেবাশিস বিরক্ত হয়ে দ্রুত ঘর ছেড়ে গেল।

আহির বললে, 'কেমন আছেন?'

কফি হাউদের টেবিলে বসে স্বপ্নাশিষ মাথা নাড়ল, 'ভাল'।

'বইটা খুলেছিলেন?'

'পুরোটা পড়া হয়ে গেছে কিন্তু মনে হচ্ছে আরও কয়েকবার পড়তে হবে।'

'সেকী? কেন?'

'আচ্ছা, আপনি যখন প্রথম পড়েছিলেন একবারেই সব বুঝেছিলেন?'

'না। যতবার পড়ি ততবার বুকের ভেতরটা অন্যরকম হয়ে যায়।'

'তা হলে? আমার মত মূর্খ একবারে কি বুঝবে?'

'নিজেকে মূর্খ ভাবছেন কেন?'

'মানুষ যতক্ষণ শুদ্ধ না হচ্ছে ততক্ষণ মূর্খ থাকে।'

এবার চোখ তুলল আহির, 'আপনি ঝগড়া করতে ভালবাসেন, না?'

স্বপ্নশিস হেসে ফেলল, 'একদম না।'

আহির হাসল, 'আজকের কাগজ দেখে আপনার বাবা কিছু বলেননি?'

'না। ওঁর স্বভাব ভাল দেখলে হজম করে যাওয়া, খারাপ দেখলে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়া' আপনি তো দেখে নি। একেবারে রয়েল বেঙ্গল টাইগার। তবু কাল আমি প্রথম মুখ খুলেছি। সাহস করে তো বলে ফেললাম।'

'কী?'

স্বপ্নশিস ঘটনাটা বলতেই আহির হেসে উঠল, 'মজার মানুষ তো!'

'মজা! আপনার সঙ্গে আলাপ হলে বুঝতে পারবেন।'

'বেশ। আপনার বাড়ির ঠিকানা দিন, একদিন গিয়ে আলাপ করে আসব।'

'সর্বনাশ।'

'সর্বনাশ কেন?'

'আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন।'

'আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে বাড়ি থেকে আপনাকে বেরিয়ে যেতে হবে?'

'প্রায় তাই।'

'তা হলে সম্পর্ক না রাখাই আপনার পক্ষে মঙ্গল।' আহিরের মুখে মেঘ ঘনাল।

'অসম্ভব।'

'বুঝতে পারলাম না।' আহির বলল, 'আমার কোনও বন্ধুর ক্ষতি আমি চাই না।'

স্বপ্নশিস মুখ তুলে তাকাল। আহিরের চোখে চোখ রাখল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'আমি কোনও কিছুর বিনিময়ে এই বন্ধুত্ব হারাতে চাই না।'

'আমি কীভাবে বিশ্বাস করব?'

বিশ্বাস! কি ভাবে কাউকে করানো যায়? স্বপ্নশিস অসহায় চোখে তাকাল। চিৎকার করে বললেও তো মানুষকে বিশ্বাস করানো যায় না। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেয়ে লিলি টমসন আক্রমের বলের মুখোমুখি হওয়া ঢের সোজা।

স্বপ্নশিসকে ভাবতে দেখে আহির বলল, 'তোমার বাবা যদি জানতে পারেন তা হলে নিশ্চয়ই তুমি বিপদে পড়বে। তখন, তখন তো তুমি সম্পর্ক ছিন্ন করতেও পারো।'

দু-দুটো বিশ্বরেকর্ড পকেটে নিয়ে ভারতবর্ষে এসে লারা ব্যাটে রান পায়নি। কবে কখন কী হবে এটা কখনওই আগ বাড়িয়ে বলা যায় না। পাকিস্তান যে শারজায় শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে যাবে তা কি কেউ জানত? কিন্তু স্বপ্নাশিস নিজে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করল, 'তুমি আমাকে ত্যাগ করলেও আমি তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করব না।'

'প্রমিস?'

'প্রমিস।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করলাম।'

'কী করে?'

'জানি না। কখনও কখনও বিশ্বাস করতে ভাল লাগে। তাই।'

সে রাতে ঘুম এল না। কখন যে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে কথাবার্তা বিছানায় শুয়ে সেটাই মনে করতে পারছিল না স্বপ্নশিস। এখন বুক জুড়ে অসম্ভব এক ভাললাগা পাহাড়ি ঝরনার মতো তরতরিয়ে ছুটে চলেছে। যার কোনও অন্ত নেই। একেই কি প্রেম বলে! এখন যদি আহির তার কাছে একটা বিন্দু চায় তা হলে সমুদ্র দিয়ে দিতে পারে। জানালার বাইরে রাতে আকাশটাকে দেখল সে। শ্যামনগরের আকাশটা কি এখন এই রকম দেখাচ্ছে? আহির কি ঘুমাচ্ছে? 'ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে/ বসন্তের রাতে/ বিছানায় শুয়ে আছি/ এখন সে কত রাত!'

বন্ধ চোখে আহিরের মুখ, ওর উজ্জ্বল চোখের আলো, চিবুকের ভাঁজে শৈশব, চুল—। হঠাৎ মনে হল সে বিদিশার নিশা শব্দ দুটোর অর্থ ধরতে পেরেছে। আর মনে হওয়া মাত্র বিছানায় উঠে বসল সে। জীবানানন্দের বইটা খুলল টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে। বনলতা সেন কবিতাটা প্রথম পড়ার সময় ভাল লেগেছিল সব উপমার সঠিক ব্যাখ্যা পায়নি। এখন যেন একটু একটু করে পেতে লাগল। তার মনে হল জটিল অঙ্ক সমাধান করার জন্যে যেমন ফর্মুলা দরকার হয় তার নাম অনুভূতি, বোধ। জীবনানন্দ যেন আহিরকে দেখেছিলেন। এই বই-এর অনেক কবিতাই তাই আহিরকে লক্ষ্য করে, তাকে ভেবে লেখা। আজ সেই লাইনগুলো পড়ার সময় সে আহিরকে স্পর্শ করতে পারছে। কবি আর পাঠক এখন একাকার হয়ে এক সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে যার নাম আহির।

একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মারা যাওয়াতে আজ সব ছুটি। আহির তাই কলকাতায় আসবে না, ময়দানে খেলাও বন্ধ। দুপুরে খেতে বসে পিতৃদেব বললেন, 'ধ্যাষ্টামো। রাষ্ট্রপতির চাকরি চলে যাওয়ার পর যে লোকটার কথাবার্তা সরকারকে বিব্রত করত, যাকে কেউ পাত্তা দিত না, সে পটল তুলতেই চারধারে প্যাঁ পোঁ শুরু হয়ে গেল। শোক উথলে উঠছে যেন।'

ছেলেরা চুপচাপ খাচ্ছিল। এই ধরনের উক্তিতে তাদের কিছু এসে যায় না। দেশ আছে বলে একটা রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী থাকবেন, যাবেন, আর একজন আসবেন। এর সঙ্গে তাদের কোনও

সংযোগ নেই। পিতৃদেবের উষ্মার সঙ্গে তাই তারা যোগ দিল না। অবশ্য যোগ দিতে গেলে কথা বলতে হয়। সেই ঝুঁকি নিতে ওরা কেউ চায় না।

'বাবু।' কেলোর মা একটু দুরে এসে দাঁড়াল।

পিতৃদেব মুখ ফেরালেন।

'আমাকে দুদিন ছুটি দিতে হবে' কেলোর মা নিচু গলায় বলল।

'ছুটি? হোয়াই? কেন?'

'আমি একটু তারাপীঠে যাব।'

'সেকী? ওখানে কে আছে তোমার?'

'মা আছেন। মায়ের কাছে যাব।'

'তোমার মা? সে রকম কেউ আছে বলে জানতাম না তো!'

'আমার মা কেন হবে? মা কালী।'

'মাই গড? তাকে পুজো দেবার কী হল?'

'আমাকে যেতে হবে বাবু। তিনি বড় জাগ্রত।' কেলোর মা বলল, 'ছেলেটার ঘাড়ে আর একটা পেত্নী চেপেছে। তারাপীঠে পুজো না দিলে যোগ কাটবে না।'

পিতৃদেব গম্ভীর হয়ে গেলেন, 'হুঁ। তা আমরা কি হাওয়া খেয়ে থাকব?'

'আমার উপায় নেই বাবু। এত বছর ধরে আমি তো কখনও ছুটি নিইনি। জ্বর গায়ে এসে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রান্না করেছি। মা বলে গিয়েছিল, কেলোর মা, এদের দেখিস, দেখনি?'

'কিন্তু আমাদের কী হবে? এই বয়েসে হোটেলের রান্না খেতে পারব না।'

'তা তো জানি। আমি দুদিনের জন্যে বনলতাকে দিয়ে যাচ্ছি, সে রেঁধে দেবে। চট করে তো বদলি পাওয়া যায় না। বনলতা সামনের মাস থেকে মল্লিক বাড়িতে লাগবে, এখন বসে আছে বলে রাজি হল। যাব?'

'চোর-ছ্যাঁচোড় নয় তো? বয়স কত?'

'চোর না। বয়স একটু কম, বাইশ তেইশ।'

'নো। নেভার।' পিতৃদেব চমকে উঠলেন।

'মানে?'

পিতৃদেব সরাসরি জিজ্ঞসা করলেন, 'অল্পবয়সী মেয়ে রাখব না তা তুমি জানো না?'

'দুদিন তো। আর কাউকে পাব না আমি। তা ছাড়া বনলতার চরিত্র ভাল।'

কবে যাবে?'

'কাল।'

'একেবার ঘোড়ার জিন দিয়ে কথা বলতে এসেছ। অ্যালাউ না করলে বদনাম করবে। ঠিক আছে, বিকেলে নিয়ে এসো তাকে, কথা বলে দেখি।'

বিকেল চারটের সময় হঠাৎ উদয় হওয়া কিছু ভাবনাকে কাগজে লিখে ফেলল স্বপ্নাশিস। এবং তখনই কড়া নাড়ার আওয়াজ হল। কেলোর মায়ের ফিরে আসার সময় এখনও হয়নি। দরজা খোলার শব্দ কানে এল, পিতৃদেবই খুললেন।

মিনিট পাঁচেক পরে হাঁকটা এল। পিতৃদেব তাকে ডাকছেন। লেখা বন্ধ করে খাতাটাকে অন্য বইপত্তরের আড়ালে ঢুকিয়ে স্বপ্নাশিস পিতৃদেবের ঘরের দিকে যেতে যেতে একটি মহিলাকণ্ঠ শুনতে পেল, 'অত জোরে চিৎকার করে কথা বলবেন না, শরীর খারাপ হবে।'

'হেঁ হেঁ। তা অবশ্য। তা অবশ্য। সম্পূর্ণ অচেনা গলায় পিতৃদেব কথা বলছেন। বিস্ময়ের

অস্ত রইল না। স্বপ্নাশিস পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল।

'এই যে! ইনি আমার কনিষ্ঠ পুত্র।'

স্বপ্নাশিস দেখল একজন প্রায় প্রৌঢ় মহিলা চেয়ারে বসে আছেন। মোটাসোটা, চোখে চশমা, একসময় সুন্দরী ছিলেন, হালকা নীল শাড়িতে কাজ।

'তোমার মাসিমা। কতবার বললাম গিয়ে দেখা করে এসো। অবাধ্য।'

'ওভাবে বলছেন কেন? ব্যস্ত থাকে বলে যেতে পারেনি। তুমি তো ক্রিকেট খেলো?' চুপচাপ মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল স্বপ্নাশিস।

'আজকাল তো শুনেছি ক্রিকেট খেলে অনেক টাকা পাওয়া যায়।'

'খেলে টাকা রোজগার করে গলফ প্লেয়ার আর টেনিস প্লেয়ার।' পিতৃদেব জানালেন।

'এ কিন্তু দিদির মতো দেখতে হয়েছে।'

'সেই জন্যে আমার দুশ্চিন্তা বেড়েছে।'

'কেন?'

'আমি যা পছন্দ করি না তাই ইনি করেন।'

'সেকী! বাবা তোমাদের কত কষ্ট করে বড় করেছেন তাঁকে দুঃখ দিচ্ছ কেন?'

'আমরা দুঃখ দিচ্ছি তা আপনি জানলেন কী করে?' সরাসরি প্রশ্ন করল সে।

'এই তো উনি বললেন।'

'উনি ওরকম ভাবতে ভালবাসেন!'

'হোয়াট? আমাকে, আমাকে অপমান করার সাহস পেয়েছ তুমি?' চিৎকার করে উঠলেন পিতৃদেব। তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা হাত তুললেন, 'আপনি উত্তেজিত হবেন না। উত্তেজিত হলে আপনার প্রেসার বেড়ে যাবে।'

'বাড়ুক প্রেসার। আজ একটা হেস্তনেস্ত করবই।'

'বেশ, তা হলে তাই করুন। আমি যাচ্ছি।'

'না না, তুমি বুঝতে পারছ না, ভুবন, ডিসিপ্লিন ইজ লাস্ট ওয়ার্ড—।'

'ঠিক আছে। আগে আপনি শান্ত হোন—।'

'বেশ। তুমি কথা বলো। জবাবদিহি চাও।' পিতৃদেব মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। এই পিতৃদেবকে স্বপ্নাশিস প্রথম দেখল। ভদ্রমহিলা তার দিকে তাকাতেই সে বলল, 'আমি অন্যায় কথা কিছু বলিনি।'

'উনি কি ভুল বললেন?'

'ভাবছেন যা তাই বলছেন।'

'ঠিক আছে। তোমার দাদা কোথায়?'

'হাসপাতালে গিয়েছে।'

'তা হলে তোমরা ওঁকে দুঃখ দাও না।'

'না।'

'ব্যস চুকে গেল। এখন ওরা বড় হয়েছে, ওদের কথা শুনতে হবে আপনাকে!'

পিতৃদেব ঝাঁকুনি দিয়ে মুখ ফেরালেন।

'যাই বলুন, আপনি বড্ড রাগী।'

'মোটেই না।'

'মানব না। দিদির কাছে শুনেছি চায়ে চিনি বেশি হয়েছিল বলে আপনি কাপ ছুঁড়ে ভেঙে ফেলেছিলেন। কি ঠিক কি না?'

'তোমার দিদি তিলকে তাল করত।'

দরজায় শব্দ হল। পিতৃদেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে ?'

'আমি বনলতা।'

'কে?'

'বনলতা।'

'বনলতা? ও। এসো, ভেতরে ঢোকো।'

যে মেয়েটিকে ওরা দেখতে পেল তাকে আর যাই হোক বাড়ির কাজের লোক বলে মনে হয় না। কায়দা করে শাড়ি পরা, সংক্ষিপ্ত জামা, চুল ফাঁপানো, হাতে ছোট ব্যাগ।

'তোমাকে কেলোর মা পঠিয়েছে? সে কোথায়?'

'সে আমাকে ছটার সময় আসতে বলেছিল, তখন টাইম হবে না বলে এখন এলাম। কেলোর মা আমাকে কী কী করতে হবে বলেছে। আমার কোনও অসুবিধে হবে না।'

'তুমি কি ম্যারেড? মানে বিয়ে-থা হয়েছে?'

'আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। কাল সকালেই আসতে হবে?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পিতৃদেব ভদ্রমহিলাকে বললেন, 'আমার বাড়িতে যে পার্মানেন্টলি আছে, সেই তোমার দিদির আমল থেকে, সে দুদিনের জন্যে ছুটিতে যাচ্ছে। তার বদলি একে পাঠিয়েছে। হাত পুড়িয়ে বাবুরা কেউ তো রান্না করতে পারে না।'

ভদ্রমহিলা বনলতাকে দেখলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি এখন যাও। আজই তোমাকে খবর দেব। আমরা একটু কথা বলে দেখি।'

বনলতা যেখন এসেছিল তেমন চলে গেল।

'কী সাজগোজ! এ কাজ করবে কখন?'

'দুদিন তো।'

'দুর্নাম দিতে তো এক মিনিট লাগে। এ বাড়িতে যদি আর কোনও মহিলা থাকত তা হলে তো প্রশ্ন ছিল না। নাঃ, এ মেয়েকে দিয়ে চলবে না। হোটেলের খাবার খেতে হবে।'

'কী আশ্চর্য। হোটেলের খাবার খাবেন কেন?'

'একে রাখলে আমার প্রেসার আরও বেড়ে যাবে?'

ভদ্রমহিলা একটু ভাবলেন, 'আপনার এখানে এক্সট্রা ঘর আছে?'

'এক্সট্রা ঘর কী হবে?'

'আমার তো কোনও ঝামেলা নেই, দুদিন আমি এখানেই থেকে যেতে পারি।'

'তুমি?'

'হ্যাঁ, অসুবিধে আছে?'

'আরে, আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। কিন্তু ভেবে দেখো, তোমার আত্মীয়স্বজন—।'

'আপনিও তো আমার আত্মীয়।'

'তা বটে। তা হলে বনলতাকে রেখে দেওয়া যেতে পারে, কী বলো?' শেষ প্রশ্নটা তিনি স্বপ্নাশিষের দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করলেন। স্বপ্নাশিস বলল, 'আমি যেতে পারি!'

'মানে? তোমরা বড় হয়েছে, তোমাদের মতামত জানতে চাইছি!'

'আমার কোনও মতামত নেই।' ভেতরে পা বাড়াল সে।

'দেখলে ভুবন, কী নিয়ে আছি। আমার বড় ছেলেকে নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। একেবারে মাটির মানুষ। এই হতচ্ছাড়া ক্রিকেট খেলে এ রকম হয়েছে।'

'হয় তো আমাকে পছন্দ করছে না।'

'অপছন্দ করার মতো কিছু করোনি তুমি। তা হলে তো নিজের মাকেই ও অপছন্দ করত। মাসি আফটার অল মায়ের বোন।'

'আহা, নিজের মাসি তো নই।' হাসলেন মহিলা, 'যাই বলুন, দিল্লি থেকে এখানে এসে হাঁপিয়ে উঠছিলাম। এই দুদিন একটু অন্যরকম লাগবে। চলুন, আপনার বাড়ির ভেতরটা দেখে আসি।'

'যাও না। কেউ তো নেই। থাকবে যখন তখন ভাল করে নিজেই দেখে নাও।'

স্বপ্নাশিস দ্রুত পা চালিয়ে নিজের ঘরে চলে এল।

ভদ্রমহিলার আগ বাড়িয়ে উপকার করাটা সে পছন্দ করতে পারছে না কেন? ওই বয়েসেই এক মহিলা হুট করে এত স্বল্পপরিচিত বাড়িতে থেকে যেতে কী করে রাজি হলেন? যে পিতৃদেব মহিলাদের ছায়া মাড়াতে নিষেধ করতেন তিনি কী করে সম্মতি দিলেন। তার কেলোর কথা মনে হল। বনলতাকে দেখে মনে হয়েছে খুবই আধুনিকা। ওদের মধ্যে এমন মেয়ে খুব কম দেখা যায়। কেলো যে রেটে প্রেম করে তার হাত থেকে বনলতা কী করে রক্ষা পেল? বনলতাকে সমর্থন করছে যখন কেলোর মা তখন তার ছেলে সম্পর্কে কোনও ভয় নেই। কেলোকে অন্য প্রেম করা থেকে বিরত করতেই সে তারাপীঠে পুজো দিতে যাচ্ছে। পুজো দিলে এ সব করা যায়? যে দেশের মানুষ সূর্য চন্দ্র গ্রহণে খাবারে তুলসী পাতা খোঁজে সে দেশে কেলোর মায়েরা এ রকম ভাবতেই পারে।

'এইটে তোমার ঘর?'

মুখ ফিরিয়ে সে মহিলাকে দেখল, দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।

'ইস, কী আগোছালো করে রেখেছ। দুদিন আছি তো, সাজিয়ে দেব। তোমার ছবি নাকি কাগজে ছাপা হয়েছে? খুব খেলো বুঝি?'

'এখানে থাকলে আপনার অসুবিধে হবে।' স্বপ্নাশিস বলল।

'কেন?' ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে তাকালেন।

'আমার বাবা কতগুলো আইন এ বাড়িতে চালু করেছেন। যেমন বিশেষ নির্দিষ্ট সময়ের খাবার সেই সময়ে না এলে পাওয়া যাবে না। জোরে কথা বলা যাবে না। কেলোর মাকে মহিলা মনে করা হয় না, তাই মহিলাদের ছায়া এড়িয়ে যেতে হবে। আমার দাদা ব্রহ্মচারী, ও আপনার ছায়া মাড়াতে চাইবে না। সেটা কি আপনার ভাল লাগবে?'

'ও মা! তাই নাকি?'

'তাই। কয়েক মিনিটের জন্যে শ্বশুরবাড়ির লোক হিসেবে এসেছেন বলে বাবা আপনার সঙ্গে মিষ্টি কথা বলছেন, একটু পুরনো হলেই দেখতে পাবেন।' খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল স্বপ্নাশিস।

'তা তো হবেই। আসলে দিদি মারা যাওয়ার শোকে পাথর হয়ে গেছে মানুষটা। এ বেশিদিন থাকবে না। তোমাদের বিয়ে-থা হয়ে গেলে বদলে যাবে।'

'আমাদের তো বিয়েই হবে না।'

'ওমা! কেন?'

'দাদা পিতৃ-আদেশে ব্রহ্মচারী থাকবে। আর আমি ও সব ভাঙলে বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে।'

মহিলা শব্দ করে হাসলেন, 'এ সব শুনেছি সিনেমায় হয়। তোমাদের বাড়িটা দেখছি বেশ

মজার। ওটা কী বই?' উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজেই তুলে নিলেন ভদ্রমহিলা।

'ও, কবিতার বই। আমি আবার কবিতা বুঝি না। আজ যে সফল হবে কাল তাকে শুদ্ধ করবে এই কবিতাগুলো। আহির। আহির কে?' মুখ তুললেন মহিলা।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিল স্বপ্নাশিস। কোনওমতে বলল, 'বন্ধু'।

'এ রকম নাম কখনও শুনিনি। হাতের লেখা মেয়েলি। অবাঙালি?'

'না।'

'এই কবিতাগুলো পড়লে শুদ্ধ হওয়া যায় বুঝি?'

'হ্যাঁ। মন পবিত্র হয়। গীতা বা উপনিষদের চেয়ে ভাল।'

'তুমি গীতা পড়েছ?'

'না পড়লে বলছি কী করে? ছেলেবেলায় ও সব বাবা আমাদের পড়িয়েছেন।'

তা হলে তো এই বইটা পড়তে হবে। দেবে আমাকে।'

'এ বাড়িতে যতক্ষণ আছেন পড়ুন, নিয়ে যাওয়া চলবে না।'

'তুবি বড্ড কাঠ কাঠ কথা বলো।'

'বাবা বলেছেন সত্যি কথা স্পষ্টভাবে বলা ভাল।'

ভদ্রমহিলা মিষ্টি হেসে বইটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আজ বিকেলের জলখাবার মুড়ি আর শশা। কেলোর মা বাটিটা ঘরে পৌঁছে দিয়ে বলল, 'তিনি কি এখন থেকে এখানে থাকবেন?'

'কেন?'

'তোমার দাদা বাড়ি ফিরতেই তাকে কোথায় পাঠানো হল ওঁর জিনিসপত্র আনতে। তোমরা বড় হয়েছ, এখনই প্রতিবাদ করো। বাবুর বয়সটা ভাল নয়।'

'তার মানে?'

'ওঃ, তোমাকে কী করে বোঝাব! ওই শয়তানীর মতলব ভাল নয়।'

'তুমি কী করে বুঝলে?'

'বুঝব না? আমাকে বলছে বাড়ি চলে যেতে, আজ রাত্রের রান্না নাকি সে-ই রাঁধবে। কেন? আমার কাল থেকে ছুটি, আমি আজই বাড়িতে যাব কেন?'

'মায়ের বোন বলে কথা।'

'ছাই। কোনওদিন দেখিনি। এ আমার ভাল লাগছে না বাপু।'

'বাবাকে গিয়ে বলো।'

'তিনি কি কানে শুনবেন? বাবুর নাম ধাম গোত্র একটা কাগজে লিখে দাও তো!'

'কী হবে?'

'তারাপীঠে গিয়ে বাবুর নামেও একটা পুজো দিয়ে দেব।'

হোহো করে হেসে উঠল স্বপ্নাশিস। কেলোর মা বোকা বোকা মুখ করে তাকিয়ে থাকল। হাসি থামিয়ে স্বপ্নাশিস বলল, 'তোমার বনলতা এসেছিল। ওর সঙ্গে কেলোর বিয়ে দাও না।'

'তোমাকে সত্যি কথা বলব?'

'নিশ্চয়।'

'আমি প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। আমাকে খুব মান্যি করে, হয় তো একবার বিয়ে হয়েছিল কিন্তু তাতে কী! কিন্তু কেলোর কাঁধে অন্য পেত্নী চেপেছে।'

'তা হলে তো মুশকিল। সেই পেত্নী কি সুন্দরী?'

'দুর। বাঁশের মতো দেখতে। যার তরে মজে মন কিবা হাঁড়ি কিবা ডোম। মাঝে মাঝে মনে হয় কেলোকে মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে মারি আচ্ছাসে। কিন্তু তারকেশ্বরে মানত করে যে ছেলেকে পেয়েছিলাম তার গায়ে ঝাঁটা তুলি কী করে?'

'তারকেশ্বরে শুরু করেছিলে এখন যাচ্ছ তারাপীঠে, এরপর কোথায়?'

খোঁচাটা বুঝতে পারলে কেলোর মা। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খাওয়া শেষ করে স্বপ্নাশিস ভাবল একবার দেশবন্ধু পার্ক থেকে ঘুরে আসবে। পোশাক বদলে বাইরের ঘরের দিকে যেতে সে থমকে দাঁড়াল। ভদ্রমহিলা কবিতা পাঠ করছেন—: বলিলাম—'একদিন এমন সময়/আবার আসিও তুমি—আসিবার ইচ্ছা যদি হয়—/পঁচিশ বছর পরে।' পড়ব?'

'ইন্টারেস্টিং। কিন্তু আহিরটা কে?'

'আপনার কী দরকার? বড্ড সন্দেহবাতিক আপনি।'

'তা নয়। হঠাৎ এই বই দিতে গেল কেন?'

'দোষ কী?'

'না। পঁচিশ বছব আগের ঘটনা যে বলছে তাব তো বয়স হয়েছে।'

'কী আর বয়স! আমার মতো। দিদির চেয়ে কয়েক বছরের ছোট।'

'আর দিদি। তিনি চলে গিয়ে আমাকে ডুবিয়ে দিয়ে গেছেন।'

'কখনও ডোবা কখনও ভাসা—এই তো জীবন!'

'হুঁ। কিন্তু কুড়ি বছর আগের ওই সব ব্যাপারের কবিতা পড়ছে কেন ছোকরা। না, এটা বন্ধ করা দরকার। কথা বলতে হবে!' পিতৃদেবের কণ্ঠস্বর বদলে গেল।

'ও। স্বপ্নাশিস যদি ওর বয়সী প্রেমের কবিতা পড়ত তা হলে খুশি হতেন?'

'আঃ। ভুবন!'

'দেখুন, যে বয়সের যা। ওদের স্বাভাবিকভাবে বড় হতে দিন তো! কিছু বলবেন না। আমার কিন্তু ভারি ভাল লাগছে কবিতাগুলো। এতদিন যে কেন পড়িনি!'

স্বপ্নাশিস আর দাঁড়াল না। পর্দা সরিয়ে দুজনের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ভদ্রলোকের নাম সুঁটে সেন। রোগা লম্বা, অনেকটা শকুনের মতো ভঙ্গি। বড় ক্লাব কোহিনুরের সেক্রেটারি। ময়দানের সবাই জানে সুঁটে সেন মানেই কোহিনুর, কোহিনুর মানেই সুঁটে সেন। বিশাল ব্যবসা তাঁর, দু'হাতে টাকা ঢালেন ক্লাবে, বিরোধীপক্ষ বলে কাউকে তৈরি হতে দেননি। রোজ বিকেলে ক্লাবের লনে বসে থাকেন ইজি চেয়ারে। তাঁবেদাররা চারপাশে ভিড় করে তাঁর বাণী শোনে। সেই সুঁটে সেন ডেকে পাঠিয়েছেন স্বপ্নাশিসকে।

স্বপ্নাশিস প্রথমে ভেবেছিল যাবে না। কেউ ডেকে পাঠালেই যেতে হবে এমন কোনও কথা নেই। কিন্তু সুব্রত তাকে বলল যাওয়ার জন্যে। সি এ বি-তে সুঁটে সেন নেই কিন্তু তাঁর অদৃশ্য হাত কোথায় নেই তাই কেউ বলতে পারে না। জলে নেমে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়া বোকামি। অতএব বিকেলবেলা সে হাজির হল কোহিনুরের টেন্টে।

সুঁটে সেন বসেছিলেন চামচে পরিবৃত হয়ে। ওঁদের ক্লাবের বাবুল বোস বেঙ্গলের উইকেট কিপার। সে বিনীত গলায় কিছু বলছিল। সুঁটে বললেন, 'দ্যাখ বাবুল, তুই উইকেট কিপার, উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে বল ধরবি, ব্যাটসম্যান ভুল করলে তবে স্ট্যাম্প ওড়াবি। তুই চেষ্টা করলেও উইকেট নিতে পারবি না, আট নম্বরে নামিস, রানও কুড়ির বেশি করতে পারবি না।

দলকে জেতানোর ব্যাপারে তোর যা ভূমিকা অন্য উইকেট কিপারেরও তাই। লিলি, ইমরান, রিচার্ড, শ্যেন, আমাদের শচীন টিমকে জেতাতে পারে। কিন্তু কুন্দরাম, মোরে, মোঙ্গিয়া কি সে সম্মান পায়? তবু তুই যখন বলছিস আমি দেখি কী করা যায়। তোর ভাইকে পাঠিয়ে দিস, দেখব।'

কথা বলতে বলতেই স্বপ্নাশিসকে দেখেছিলেন তিনি, 'কী চাই?'

'আপনি আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন!'

'আপনার পরিচয়?'

'আমি স্বপ্নাশিস!'

সঙ্গে সঙ্গে চামচেদের একজন আগ বাড়িয়ে স্বপ্নাশিসের বিবরণ শুনিয়ে দিল। সুঁটে সেন সোজা হয়ে বসলেন, 'ও! তুমি আমার টিমকে হারিয়েছ?'

বলার ভঙ্গিতে স্বপ্নাশিষের মনে হল সে বিশাল অন্যায় করে ফেলেছে। তার কোনও কৈফিয়ত দেবার নেই। সে চুপ করে রইল।

সুঁটে সেন বললেন, 'কিন্তু মনে রেখো, ক্রিকেট একজনের খেলা নয়। হরিমাধবের টিম ভাল না খেললে তুমি একা কিছুই করতে পারতে না। ভজুকে তুমি ঝুলিয়েছ কেন?'

'আমি তো কিছু করিনি। উনি যা করতে বলেছিলেন তা খেলোয়াড় হিসেবে আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়।'

'হুম। নেক্সট সিজনে আমার টিমে আসছ?'

'আমি ভেবে দেখব।'

'ভাবার কী আছে? টিমে এসো। যতদিন ফর্ম থাকবে বেঙ্গলে জায়গা পাকা। কলেজে পড়ো তো, টাকা-পয়সার প্রমিস করছি না, চাকরির ব্যবস্থা হতে পারে।'

'আমাকে ভাবতে দিন।'

'ভাববার আছেটা কী? হরিমাধব তো ক্লাব কোচিং ছেড়ে দিয়েছে। যেন লঙ্কা জয় হয়ে গেছে তাঁর। ফালতু! আমি দেখতে চাই সামনের বছরে ওই শ্যামবাজারের বিরুদ্ধে তুমি সেঞ্চুরি করছ। বুঝতে পেরেছ?' সুঁটে সেন চোখ ছোট করলেন, 'ইউনিয়নের সন্তোষ টোপ দিয়েছে নাকি? শুনছি সামনের বছর ওরা ভাল টিম করার চেষ্টা করছে। কি, সন্তোষ গিয়েছিল?

'না, ইউনিয়ন থেকে কেউ আসেনি। আমাকে কয়েকটা দিন সময় দিতে হবে। আমি যাই!' স্বপ্নাশিস আর দাঁড়ায়নি।

কটকে যাওয়ার আগের দিন আহিরের সঙ্গে দেখা হবার কথা ছিল কলেজের পর, কিন্তু আহির এল না। এমনিতে চারপাশের আবহাওয়া বেশ ভাল। সেই মাসি দুদিন থেকে যাওয়ার পর পিতৃদেবের আচরণের প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে। তিনি আর কথায় কথায় চেঁচাচ্ছেন না। বেশিরভাগ সময় চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন। বনলতা নামের সেই মেয়েটি কিন্তু কেলোর মায়ের অনুপস্থিতিতে কাজ করতে আসেনি। মাসি তখন একা সামলেছেন। ফিরে এসে কেলোর মা জানিয়েছে বনলতা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। পুজো দিয়ে আসার পর কেলো নাকি বেশিরভাগ সময় ঘরেই থাকে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর অসহিষ্ণু হয়ে উঠল স্বপ্নাশিস। কাল ধৌলি এক্সপ্রেসে তাদের কটকে যাওয়ার কথা। যাওয়ার আগে আহিরের সঙ্গে না দেখা করে যাওয়ার কথা সে ভাবতেই পারে না। আজ পর্যন্ত কখনও আহির কথা দিয়ে আসেনি এমন হয়নি। বারোটা পর্যন্ত সে চাতকের

মত পথ চেয়ে রইল। কফি হাউসের দিকে যে মেয়েই আসছে তাকেই দূর থেকে আহির বলে ভাবতে গিয়ে ঠোক্কর খাচ্ছিল।

শেষপর্যন্ত সেই সময়টা এল যখন কোনও আশা আঁকড়ে থাকা যাচ্ছে না। অনেক রকম ভাবনা ভাবার পর স্বপ্নাশিস স্থির করল সে শ্যামনগরে যাবে। সোজা শেয়ালদায় গিয়ে ট্রেন ধরল সে। এর আগেরবার সঙ্গে সুব্রত ছিল, স্টেশনগুলোকে পেছনে ফেলে ফেলে ট্রেনটা যখন শ্যামনগর পৌঁছাল তখন স্বপ্নাশিষের বুকের ভেতর দ্রিদিম দ্রিদিম শুরু হয়ে গিয়েছিল। কেউ কিছু বলবে না? সুব্রত প্রায়ই তাকে শুনিয়েছে শ্যামনগরের ছেলেরা এ সব ব্যাপার প্রশ্রয় দেয় না। কথাটা আহিরকে অবশ্য কখনও জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

স্টেশন থেকে একটা রিকশা নিয়ে সে চেনা পথ ধরে চলে এল খেলার মাঠের কাছে, এসে রিকশা ছেড়ে দিল। একবার যাওয়া-আসা করেই মনে হচ্ছে সব চেনা। দূর থেকে আহিরদের বাড়িটা নজরে এল। ব্যালকনিতে কেউ নেই। তার মনে হল আহির নিশ্চয়ই অসুস্থ। কোনও কারণে সে কলকাতায় যেতে না পারলে স্বপ্নাশিস যে আসবেই এটা নিশ্চয়ই অনুমান করবে আর তা হলে ওকে ব্যালকনিতে দেখা যেতই। মাঠের পাশ দিয়ে আড়ষ্ট পায়ে এগোচ্ছিল সে। সোজা বাড়িতে গিয়ে ডাকলে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে কে জানে! কিন্তু এ ছাড়া আর কি উপায় আছে! যদিও এখন ভরদুপুর, কারও বাড়িতে যাওয়ার সময় নয় কিন্তু এসে যখন পড়েছে—।

'আরে! আপনি এখানে?'

গলাটা শুনে মুখ ফেরাতেই দুজন ছেলেকে দেখতে পেল সে। একটা বাড়ির বারান্দায় বসে কথা বলছিল ওরা, এ বার উঠে এল। স্বপ্নাশিস দাঁড়াল। ছেলে দুটোর একজন বলল, 'কার কাছে এসেছেন?'

একদম সরাসরি প্রশ্ন, কী জবাব দেবে? হঠাৎ বাপীর নাম মনে পড়ে গেল। আর সে নামটাকে খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরল, 'বাপীদের বাড়িটা কোথায় ?'

'কোন বাপী? এ পাড়ার দুজন বাপী আছে।'

ফাঁপরে পড়ল সে। বাপীর উপাধি অথবা ভাল নাম জানতে চাওয়ার প্রয়োজন সে কখনও বোধ করেনি। স্বপ্নাশিস চেহারার বিবরণ দিতে দ্বিতীয়জন বলল, 'ও, আসুন।' ছেলেদুটো হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি তো বেঙ্গল টিমে খেলছেন?'

স্বপ্নাশিষের মনে হল এই ব্যাপারটা তার গুরুত্ব নিশ্চয়ই বাড়িয়ে দিয়েছে। সে মাথা নাড়ল।

'বেঙ্গল জোনাল ম্যাচে ভাল খেলে কিন্তু তারপরেই ধেড়ায়।' একজন বলল।

দ্বিতীয়জন বলল, 'আর কোশেন্টে ম্যাচ জেতে।'

'কিন্তু আপনি আর খেলতে এলেন না কেন এখানে?'

'আমাকে কেউ ডাকেনি।'

'বাপীর সঙ্গে আপনার অনেকদিনের আলাপ?'

'না, বেশিদিন নয়।'

ভাগ্য ভাল। বাপী বাড়িতে ছিল। তাকে দেখে সে হইহই করে উঠতেই ছেলে দুটো বিদায় নিল। এখানে কোথায় এসেছে, হঠাৎ তার কাছে কেন এই সব প্রশ্ন প্রায় একসঙ্গে করায় স্বপ্নাশিসের সুবিধে হল। সে উত্তর দিল ভাসা ভাসা।

বাপীদের বাড়িতে এসে বসে মিষ্টি খেতে হল। তাকে বলতে হল সে এক বন্ধুর বাড়িতে এসেছিল। ফেরার পথে মনে হল দেখা করে গেলে কেমন হয় তাই এসেছে। বাপী অনেক কথা

বলছিল কিন্তু আহিরের প্রসঙ্গ তুলছিল না। যখন কথা প্রায় ফুরিয়ে যাচ্ছে তখন স্বপ্নাশিস উঠল। বাপী তাকে এগিয়ে দিতে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আহিরের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'না।' মাথা নাড়ল স্বপ্নাশিস।

'যাবেন ওদের বাড়িতে?'

'এই সময়ে যাওয়া কি ঠিক হবে?'

'আমার বাড়িতে এসে ওর সঙ্গে দেখা না করে চলে গেলে আহির আমার মাথা ফাটাবে। সত্যি বলুন তো আপনি আমার কাছে এসেছিলেন না অন্য প্ল্যান ছিল?'

'প্ল্যান আবার কিসের! ঠিক আছে, ওদের বাড়িতে গেলেই বোঝা যাবে সেরকম কিছু আছে কি না।'

স্বপ্নাশিস হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু নিজেই বুঝতে পারল হাসিটা জোর করে হাসতে হল।

বেল টিপতেই সুন্দর আওয়াজ হল কিন্তু কেউ দরজা খুলল না। দ্বিতীয়বার বোতামে চাপ দেবার পর ওপরের ব্যালকনিত দাঁড়িয়ে পুরুষকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

রাস্তায় নেমে বাপী জবাব দিল ওপরের দিকে তাকিয়ে, 'আমি।'

'কী ব্যাপার?'

'আহিরকে একটু ডেকে দেবেন, বলুন, কলকাতা থেকে স্বপ্নাশিস এসেছে।'

'কে স্বপ্নাশিস?'

'ক্রিকেট খেলে। এবার বেঙ্গলের হয়ে খেলবে।'

ওধার থেকে আর কোনও প্রশ্ন ভেসে এল না। বাপী স্বপ্নাশিসের দিকে তাকাল, 'আহিরের বাবা।' সে উঠে এল দরজার সামনে।

একটু বাদেই যিনি দরজা খুললেন তিনি প্রৌঢ়, ফর্সা, মাথায় টাক, 'কী চাই?'

বাপী বলল, 'আহিরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

'কেন?'

'ওদের পরিচয় আছে। আমার কাছে এসেছিল, তাই—।'

'এখন দেখা হবে না।'

'ও বাড়িতে নেই?'

'এত প্রশ্ন কেন করছ! আমি যখন বলেছি দেখা হবে না তখন সেইটে মেনে নাও।'

'ও তো অনেকদূর থেকে এসেছে—।'

'কোনও জরুরি কাজ বা কথা বলতে আসেনি তো।'

'আহির কি অসুস্থ?' স্বপ্নাশিস প্রথম কথা বলল।

'না না অসুস্থ হবে কেন? আচ্ছা, এসো।'

ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন। বাপী স্বপ্নাশিসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে কোনও গোলমেলে কেস আছে। এ বাড়িতে এলে আমি সোজা দোতলায় উঠে যাই, আর আজ আমাকেও ঢুকতে দিল না!'

স্বপ্নাশিসের খুব রাগ হচ্ছিল। বাপী যে গলায় কথা বলেছে তা আহিরের শোনা উচিত অথচ সে নিজে একবারও বেরিয়ে এল না। স্বপ্নাশিস বলল, 'চলো।'

ওরা মাঠের মাঝখান দিয়ে হাঁটছিল। একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে শূন্য ব্যালকনির দিকে তাকিয়ে স্বপ্নাশিস বলল, 'ওকে বোলো, আমি কাল ভোরে কটক চলে যাচ্ছি। এ রকম ব্যবহার না করলেও পারত।'

বাপী বলল, 'আমার মনে হচ্ছে কোনও বড় গোলমাল হয়েছে। আহিরের মতো মেয়ে এ রকম কখনওই করবে না। কী যে হল!'

বাপীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রিকশায় বসে স্বপ্নাশিস আবিষ্কার করল তার মনে আর রাগ নেই, বদলে অদ্ভুত এক হতাশা শূন্যতা তৈরি করেছে। কীরকম ব্যথায় টাটিয়ে যাচ্ছে বুকের ভেতরটা। সে চোখ বন্ধ করল। আহির কি তাকে এড়িয়ে যেতে চাইল? তা হলে এতদিন আহির তাকে যা যা বলেছে, সে স্বপ্ন দেখিয়েছে তার সবই মিথ্যে? ক্রমশ বুকের যাবতীয় টনটনানি ওপরে উঠে আসতে লাগল। নিজেকে কী ভীষণ অসহায় লাগছিল তাব।

বিছানায় শুয়েছিল সে। কেলোর মা খেতে ডাকতে এলে বলল, 'শরীর ভাল নেই, খাব না।'

একটু বাদেই দেবাশিস এল, 'কী রে, কী হয়েছে?'

'এমনি, শরীর খারাপ!'

দেবাশিস কপালে হাত রেখে বলল, 'জ্বর তো নয়। তা হলে?'

'আমাকে একা থাকতে দে দাদা।'

দেবাশিস কী বুঝল সেই জানে, বেরিয়ে গেল। খাওয়া শেষ হলে পিতৃদেব এলেন, দরজা দাঁড়িয়ে বললেন, 'শরীর যখন খারাপ তখন আর কাল কোথাও যেতে হবে না।'

স্বপ্নাশিস উঠে বসল, 'কিন্তু কাল তো কটক যেতে হবে।'

'অসুস্থ শরীর নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই।'

'আমি ঠিক হয়ে যাব।'

পিতৃদেব আর দাঁড়ালেন না। স্বপ্নাশিসের মনে হল, কটকে না গেলেই ভাল হয়। সে মোটেই ভাল খেলতে পারবে না। আজ দুপুরের ঘটনার পর সে আর মনস্থির করে ব্যাট করতেই পারবে না। তার আর কিছুই ভাল লাগছে না। এই ক্রিকেট-জীবন, বাড়ি, কলেজ সব ছেড়ে যদি অন্য কোথাও চলে যাওয়া যেত।

কটকে ট্রেন পৌঁছেছিল একটু দেরিতে। হোটেলে ঢোকার পর দেখা গেল সেদিন আর প্র্যাকটিসের সময় নেই। ওর রুমমেট বাবুল বোস। ম্যানেজার আর ক্যাপ্টেন উইকেট দেখতে বেরিয়ে গেল বিকেলবেলায়। সঙ্গে সঙ্গে তাসের আসর বসে গেল ওদের ঘরে বাবুল বোসের ব্যবস্থাপনায়। রামি খেলা হচ্ছে পাঁচজনে মিলে। তাসের কিছুই বোঝে না সে। দুটো খাট কাছাকাছি এনে সবাই বসেছে।

বাবুল তাকে বলল, 'বেড়াতে এসেছ, যাও চারপাশে একটু ঘুরে এসো।'

স্বপ্নাশিস প্রতিবাদ করল, 'বেড়াতে এসেছি মানে?'

'তা ছাড়া কী!' টি কে রায় বলল, 'প্রতিবছর হয় কটক নয় জামশেদপুর অথবা গৌহাটি ফ্রিতে বেড়াতে যাওয়া এখন বাঁধা। তুমি বোর হচ্ছ বলে বাবুল ওই কথা বলল।'

স্বপ্নাশিস বেরিয়ে এল। হোটেলের লবিতে যে বসার জায়গা সেখানে বসে মানুষের যাতায়াত দেখতে লাগল। ওড়িশার কিছু প্লেয়ার এসেছে দেখা করতে। একসঙ্গে রনজি এবং ইস্টার্ন জোনে খেলে দুই রাজ্যের প্লেয়ারদের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছে। জীবনে এই প্রথমবার বাড়ির বাইরে সে যেখানে পিতৃদেবের কোনও শাসন নেই। জীবনে প্রথমবার এতবড় হোটেলে সে থাকছে। বাবুল বোস বলছিল বোম্বেতে খেলতে গেলে এর চেয়ে অনেক বড় হোটেলে থাকার সুযোগ

হয়। স্বপ্নাশিসের হঠাৎই আহিরের কথা মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু তেতো হয়ে উঠল। আহির, তুমি আমার সঙ্গে অমন করলে কেন?

....'তোমার কোনও মেয়ে বন্ধু নেই, না?'

'না।'

'অল্প বয়সের কোনও মেয়ের সঙ্গে আলাপও নেই?'

'না।'

'মেয়েদের সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে হত না?'

'সত্যি কথা বললে হত, কিন্তু সাহস পেতাম না।'

'কেন?'

'তেমন কাউকে দেখিনি যার কাছে সাহস করে এগিয়ে যাওয়া যায়!'

'তা হলে আমার জন্যে স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন?'

তবু, আহির, সব জেনেও তুমি আবার সঙ্গে এমন করলে কেন?

সকালে মাঠে গিয়ে স্বপাশিস জানতে পারল প্রথম এগারোজনে তার নাম নেই। সে দ্বাদশব্যক্তি। জল নিয়ে যাওয়া আর কারও বদলে ফিল্ডিং করাই তার কাজ হবে। ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলাল স্বপ্নাশিস। এটা সে মোটেই ভাবতে পারেনি।

দল মাঠে নেমে যাওয়ার সময় বাবুল বোস বলে গেল, 'হেসে খেলে কাটিয়ে দাও, দুদিন বই তো নয়।' কাটা ঘায়ে নুনের মতো অনুভূতি হল। গতরাত্রে বাবুল তাকে বলেছিল বেড়াতে আসার কথা। অর্থাৎ জানত সে দলে থাকছে না। এই অবস্থায় তার কী করা উচিত? যারা তার বদলে ইনিংস শুরু করবে তাদের গত বছরের পারফরমেন্স যথেষ্ট খারাপ। তবু তাকে বাদ দেওয়া হল। স্বপ্নাশিস নিজেকে বোঝাতে চাইল, এই ম্যাচই জীবনের শেষ ম্যাচ নয়। যারা আজ আমাকে বাদ দিল তারা কাল গ্রহণ করতে বাধ্য হবেই। পৃথিবীতে ক্রিকেটের ইতিহাসে এমন ঘটনা আজই প্রথম ঘটল না।

বাংলা জিতল। যদিও প্রথম তিনটে উইকেট পড়ে গিয়েছিল মাত্র বাইশ রানে কিন্তু ওড়িশা প্রথম ইনিংসে একশ আশিও করতে পারল না। কটক থেকে বাংলা বেশি পয়েন্ট নিয়ে ফিরল। এর মধ্যে একজন সাংবাদিক ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করেছিল ওপেনার হিসেবে দলে স্বপ্নাশিস থাকা সত্ত্বেও তাকে কেন খেলানো হয়নি? ম্যানেজার বলেছেন, 'প্রথমবার দলে এসেছে, ম্যাচ টেম্পারমেন্ট নেই, ধাতস্থ হবার জন্যে ওকে দ্বাদশব্যক্তি করা হয়েছে। মাঠে যাওয়া আসা করতে করতে নার্ভ পেয়ে যাবে।' বাবুল বোস তাকে সাবধান করে দিয়েছিল সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে, তাই তাকে যখন সাংবাদিকটি প্রশ্ন করছিল সে মুখ খোলেনি।

হাওড়া স্টেশন থেকে সোজা বাড়িতে ফিরতেই সে পিতৃদেবের মুখোমুখি হল।

'কেমন বেড়ানো হল?'

'আমি বেড়াতে যাইনি।'

'কই, খেলেছ বলে তো কাগজে কোনও খবর বের হয়নি।'

'আমি টুয়েলভথ্ ম্যান ছিলাম।'

'এই পোস্টটা মন্দ নয়। শোনো, ভজুবাবু এসেছিলেন। তুমি যেদিন যাও সেদিন সকালেই এ বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন। তাঁর কাছেই জানলাম তুমি খেলছ না যদিও তখনও তুমি কটকে পৌঁছাওনি। অতএব বুঝতে পারছ তুমি যত বড় প্লেয়ারই নিজেকে ভাবো না কেন পেছনে যারা আছে তারা না চাইলে কোনওদিন সুযোগ পাবে না।'

'উনি কেন এসেছিলেন?'

'তোমাকে দেখা করতে বলেছেন।'

নিজের ঘরে চলে এল সে। ভজুবাবু মানে সুঁটে সেন। তার মানে সুঁটে সেনই তাকে খেলতে দেয়নি। আর বাবুল বোস যেহেতু কোহিনুরে খেলে তাই খবরটা আগেই জানত। মনে মনে প্রচণ্ড খেপে গেল সে। কিছুতেই সুঁটে সেনের কাছে মাথা নামাবে না সে। তাতে যদি কোনওদিন বেঙ্গল টিমে জায়গা না হয় না হোক।

বিকেল হতেই সে দেশবন্ধু পার্কে ছুটল। হরিমাধবদা দশ বছরের নীচের বাচ্চাদের নিয়ে প্র্যাকটিস করছেন। ওকে দেখে হাত নেড়ে অপেক্ষা করতে বললেন। চারপাশে বেশ ভিড়। মাঠের বাইরে যে পাকা রাস্তাটা পাক খেয়ে আছে সেখানে জোড়া জোড়ায় ছেলেমেয়ে। বিকেলের পরই দেশবন্ধু পার্ক প্রেম করার জায়গা হয়ে যায়। এ রকম এক জোড়াকে দেখা মাত্র আহিরের কথা মনে এল। আহির নিশ্চয়ই খবরের কাগজ দেখেছে এবং জানে সে কটকে খেলার সুযোগ পায়নি। তারপরেও আহির চুপ করে আছে? মেয়েরা এত নিষ্ঠুর হয়?

'আজ ফিরলি?' হরিমাধবদা সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'হ্যাঁ।'

'ভেঙে পড়েছিস?'

'না। কিন্তু এ সব আমার ভাল লাগছে না।'

'ওরা তোকে কিছু বলেছে?'

'না। তবে অনেকেই যাওয়ার সময় জানত আমাকে খেলানো হবে না। সুঁটে সেন ভজুবাবুকে বাড়িতে পাঠিয়ে খবরটা বাবাকে দিয়েছিল আমরা হাওড়া থেকে রওনা হবার পর। উনি চান আমি ওঁর টিমে খেলি। যতক্ষণ না রাজি হচ্ছি ততক্ষণ আমার পেছনে লাগবেন উনি। কিন্তু এই ঘটনার পর আর আমি কোহিনুরে খেলব না।'

'শ্যামবাজারে থাকবি?'

'হ্যাঁ।'

'তাতে তোর কী লাভ হবে। সামনের বছর আশিষ কোচ করবে। কিন্তু শ্যামবাজার তোকে কিছু দিতে পারবে না। এর মধ্যে কানে আসছে কয়েকজন প্লেয়ার বেরিয়ে যাচ্ছে, এদের মধ্যে সুব্রতও আছে। এটা তোর খুব গুরুত্বপূর্ণ বছর। চট করে কিছু করে বসিস না।'

'আমি তাই বলে অন্যায়কে মেনে নেব?'

'না। জীবনে আমিও তা কখনও করিনি। সেটা জীবনে একদম বিফল হয় না। দাঁড়া, আমি একটু ভাবি। তুই ইউনিয়নে যাবি?'

'ইউনিয়ন?'

'হ্যাঁ, সন্তোষ বাজপেয়ির দল। এ বার সুঁটে একমাত্র ওদের ভয় পাচ্ছে। আমার সঙ্গে সন্তোষের আলাপ আছে। তুই রাজি থাকলে আমি কথা বলতে পারি।'

'কিন্তু খামোকা আমি দলবদল করব কেন?'

'যুদ্ধ করতে হলে শুধু সমরবিদ্যা জানা থাকলেই চলে না, ভাল অস্ত্রও দরকার হয়। এখন শ্যামবাজারে তুই সেটা পাবি না। সন্তোষের সি এ বি-তে ভয়েস আছে। সুঁটে সেন যে লাঠি ঘোরায় তা একমাত্র সন্তোষের এলাকা বাদ দিয়ে। নাথিং ইজ রঙ ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার। এটা তোর কাছে যুদ্ধ। 'স্বপ্ন, আমি যে ভুল করে ক্রিকেট খেলা থেকে আউট হয়ে গিয়েছিলাম সেই একই ভুল তুই করিস না। শঠতার সঙ্গে লড়াই করতে হলে শঠের সাহায্য নিতে হয়।'

হরিমাধবদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাঠ পেরিয়ে আসার সময় কথাটা মনে মনে সে আওড়াচ্ছিল, 'নাথিং ইজ রঙ ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার।' ভালবাসা এবং যুদ্ধ কোনও পথ অন্যায় নয়। এই যে কাজটা আহির করল সেটাও কি তা হলে অন্যায় নয়।

'আরে! উঃ, শেষপর্যন্ত দেখা পেলাম।'

স্বপ্নাশিস অবাক হয়ে দেখল বাপী তার সামনে দাঁড়িয়ে।

'আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। শুনলাম আপনি আজ এসেছেন এবং বেরিয়েছেন। সেখানে থেকে এখানে আসছি যদি ক্লাবে থাকেন।'

'কী ব্যাপার?'

'ব্যাপার গুরুতর। এই নিন।'

একটা খাম পকেট থেকে বের করে এগিয়ে দিল বাপী। দিয়ে বলল, 'বাড়িতে একদম বন্দি হয়ে আছে। ওদের বাড়িতে যে মেয়েটা কাজ করে তার হাত দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছে আপনাকে দেবার জন্যে। পড়ে বলুন কিছু বলতে হবে কি না!'

উত্তেজনায় খাম ছিঁড়ে সময় লাগল। সাদা কাগজে মুক্তোর মতো অক্ষরগুলো পাশাপাশি শুয়ে আছে। 'স্বপ্ন, জানি এ চিঠি পেয়ে বিব্রত হবে। কখন কেমন করে যে তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি বুঝিনি, বুঝলাম যে দিন তোমরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেও ফিরে গেলে! তারপর থেকে অসহ্য যন্ত্রণা আমাকে কুরে খাচ্ছে! বাবা আমার বিয়ে দিতে চান। ইচ্ছেটা আগেও ছিল কিন্তু ইদানীং প্রবল হয়েছে তোমার আমার মেলামেশার খবর পেয়ে। যেদিন তোমরা এলে সেদিনই পাত্রপক্ষের আসার কথা ছিল। কিন্তু আমি (স্বেচ্ছায়) ঘরবন্দি (গৃহবন্দি বাবার আদেশে) বলে সেটি আরও দশদিন পিছিয়েছে। আমি এটা মেনে নিতে পারব না। আমি তোমার কাছে যেতে চাই যে কোনও উপায়ে। তুমি কি আমার সঙ্গে বাকি জীবন থাকবে? যদি রাজি থাকো তা হলে বাপীকে জানিয়ে দাও। যদি না ইচ্ছে হয় তা হলেও জানাতে দ্বিধা কোরো না। আহির।'

দ্বিতীয়বার চিঠিটা পড়ল সে। তারপর বাপীর দিকে তাকাল।

বাপী গম্ভীরমুখে বলল, 'বলুন।'

'আমি রাজি। রাজি। কিন্তু কী ভাবে দেখা হবে?'

'আমার সঙ্গে তো ওর কথা হয়নি। আগে ফিরে গিয়ে কথাটা জানিয়ে দিই।

বাপী চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ ফিরে এসে ওর হাত ধরে ঝাঁকাল, 'অভিনন্দন।' তারপর দ্রুত চলে গেল স্টেশনের বাস ধরতে। শেষ বিকেলের মাঠে স্বপ্নাশিস একা দাঁড়িয়ে রইল।

সামনে যুদ্ধ। কিন্তু কী করে সেই যুদ্ধ জয় করা যায় তার কায়দাটা তার জানা নেই। স্বপ্নাশিসের ইচ্ছে করছিল এখনই শ্যামনগরের সেই বাড়িতে গিয়ে আহিরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। আহির যে তাকে এত ভালবাসে, এ তো সে ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি। কিন্তু উদ্ধার করে এনে কোথায় রাখবে সে আহিরকে? তার নিজস্ব টাকা-পয়সা নেই! এ বাড়িতে তোলার কথা ভাবতেই পিতৃদেবের মুখ মনে পড়লে। অসম্ভব। তাকে জুতোপেটা করে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন।

কিন্তু সমাধান তো একটা চাই। না, তাকে টাকা রোজগার করতে হবে। মনে পড়ল ভজুবাবুরা দশ হাজার টাকা দেবে বলেছিল। দশ হাজার তো অনেক টাকা। তাহলে? সুঁটে সেনের কাছে গিয়ে সে কি এখন টাকাটা চাইবে? ছ্যাঁকা লাগল মনে। তার মানে তো আত্মসমর্পণ করা। হরিমাধবদার কাছে তো বটেই, নিজের কাছে সারাজীবন ছোট হয়ে থাকতে হবে। আচ্ছা, হরিমাধবদাকে বললে হয় না? উনি নিশ্চয়ই একটা বিহিত করতে পারবেন। না, হরিমাধবদা নিজেই বিয়ে করেননি, এ সব ব্যাপারের মর্ম বুঝতেই পারবেন না। ছটফট করছিল সে। চিঠিটা আবার

সে পড়ল। পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেবে তা আহির জানায়নি। শুধু তার বক্তব্য জানতে চেয়েছে।

ঘরের দরজায় শব্দ হতে চমকে তাকাল স্বপ্নাশিস। কেলোর মা এসে দাঁড়িয়েছে। চাপা গলায় কেলোর মা বলল, 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'বলো।'

'কালীঘাটের বিয়ে কি আইন মানে?'

'কালীঘাটের বিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'হঠাৎ কী হল?'

'না, কিছু হয়নি। বনলতার বিয়ে হয়েছিল কালীঘাটে মালাবদল করে। কেউ কেউ বলছে স্বামী থাকতে আর বিয়ে করতে পারে না। কেউ বলছে কালীঘাটের বিয়ে বিয়েই না। তাই বলছি।'

'কেন? বনলতা কি আবার বিয়ে করবে?'

'হ্যাঁ। আমার ইচ্ছে কেলোর সঙ্গে ওর বিয়ে হোক। ভাল মানাবে।'

'সেকী? একটা বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ের সঙ্গে কেলোর বিয়ে দেবে তুমি?'

'তাতে কী? মেয়েটা তো ভাল। অমন ভাল মেয়ে কি আমি পাব। তা যদি বলো আমাব কেলোও তো ধোওয়া তুলসিপাতা নয়।'

'কেলো রাজি হয়েছে?'

'মুখে বলছে না, কিন্তু আমি বুঝতে পারি। তুমি একটা খোঁজ নাও তো!' কেলোর মা চলে গেল। স্বপ্নাশিস ফাঁপরে পড়ল। কালীঘাটের বিয়ের কথা সে অনেক শুনেছে। সাধারণত বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে অথবা গরিব মানুষেরা ওখানে বিয়ে করে। সেটা আইনসিদ্ধ কি না তা নিয়ে কখনও ভাবেনি। হঠাৎ মনে হল, সে আর আহির যদি কালীঘাটে গিয়ে মালা বদল করে তা হলে সেটা কী বেআইনি হবে? সে সবাইকে বলতে পারবে আহির আমার বউ! একটা কিছু করা দরকার। দাদাকে ডেকে বলবে ব্যাপারটা? সে সোজা দেবাশিসের ঘরে চলে এল। বিছানায় শুয়ে দেবাশিস তখন ডাক্তারি বই পড়ছে। স্বপ্নাশিস গম্ভীর গলায় বলল, 'দাদা, তোর সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

'বল।'

'বলছি। কিন্তু তোকে প্রমিজ করতে হবে আপত্তি থাকলে বাবাকে ব্যাপারটা বলবি না।'

'বাবাকে বলব না? জিজ্ঞাসা করলেও নয়?'

'না। তুই কিছু শুনিসনি এটাই বলবি।'

'সেটা কি ঠিক হবে? আচ্ছা, বল।'

'দেখ দাদা, আমি একটা মেয়েকে খুব ভালবাসি। সে-ও আমাকে। কিন্তু তার বাবা রাবণের মতো তাকে আটকে রেখেছে। যন্ত্রণা দিচ্ছে। আমাদের প্রেম ধ্বংস করে দিতে চাইছে।'

'সেকী! স্বপ্ন? তুই এ সব করেছিস?'

'হ্যাঁ। করেছি।'

'তুই করতে পারলি?'

'আমি ইচ্ছে করে করিনি। হয়ে গেছে প্রাকৃতিক নিয়মে। যেমন করে রাত দূর হয়ে সকাল আসে, যেমন করে বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়, তেমনি।'

'ছি ছি ছি। বাবা শুনলে কী বলবে?

'বাবা হনুমানের মতো সূর্যকে বেশিদিন বগলদাবা করে রাখতে পারেন না!'

'তুই বাবাকে হনুমান বললি?' শিউরে উঠল দেবাশিস।

'বাবাকে বলিনি, উপমাটা দিয়েছি। তুই আমাকে হেল্প করবি?'

'আমি?'

'হ্যাঁ। ওকে উদ্ধার করে বিয়ে করতে চাই আমি।'

'অ্যাঁ? সেকী? তুই বিয়ে করবি? বাবার কথা মনে নেই তোর? অসম্ভব। স্বপ্ন, তুই এ সব চিন্তা ছেড়ে দে। মেয়েদের সঙ্গে মিশলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'তোর মাথা!'

'তুই ব্রহ্মচারী থাকবি না?'

'না।'

'বাবা তোকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। আমি বললেও শুনবে না।'

'দিক বের করে। আমি গাছতলায় থাকব সেও ভি আচ্ছা!'

'না। আমি তোকে সাহায্য করতে পারব না।' দেবাশিস মাথা নাড়ল।

পরদিন প্র্যাকটিসে কেটে গেল। বাংলা দল অসমের সঙ্গে খেলবে ইডেনে। প্রথম চৌদ্দজনে স্বপ্নাশিস রয়েছে। প্র্যাকটিসের শেষে ভজুবাবু এলেন, 'কি ভেবেছ?'

'এখনও ভাবিনি।'

'নিজের কবর খুঁড়ো না হে। সুঁটেদা বেশিদিন ধৈর্য রাখতে পারেন না।'

জবাব দিতে গিয়েও সামলে নিল স্বপ্নাশিস। তার টাকার দরকার। ভবিষ্যতে কী করতে হবে কেউ জানে না। মিছিমিছি শত্রু বাড়িয়ে লাভ নেই।

মাঠ থেকে বেরিয়ে ট্রাম ধরবে বলে এগোচ্ছিল এমন সময় একজন এসে বলল, 'একটু আসবেন!'

লোকটা দূরে দাঁড়ানো একটা অ্যাম্বাসাডার দেখাল। আজকাল বয়স্করাও তাকে আপনি বলে সম্বোধন করে। স্বপ্নাশিস জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'সন্তোষদা আছেন গাড়িতে। সন্তোষ বাজপেয়ী।'

আজকাল কথায় কথায় এত অবাক হতে হচ্ছে যে স্বপ্নাশিস অবাক হওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। তার জন্যে সন্তোষ বাজপেয়ী এখানে অপেক্ষা করছে মানে হরিমাধবদার সঙ্গে কথা হয়েছে।

গাড়িতে উঠে বসতেই সন্তোষবাবু বললেন, 'হরিদা কাল সকালে দেশবন্ধু পার্কে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি অপেক্ষা করার মানুষ নই। শুনেছিলাম সুঁটে সেন তোমাকে তুলে নিয়েছে তাই আমি তোমার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করিনি। যা হোক, সামনের সিজনে স্পোর্টিং-এ খেলবে?'

'আবার আপত্তি নেই, কিন্তু—।'

'বলে ফেলো।'

'সুঁটে সেন কটকে আমাকে খেলতে দেননি।'

'জানি। ইডেনে তুমি খেলবে। আর কিছু?'

'আমার একটা চাকরি দরকার।'

সন্তোষ বাজপেয়ী পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে স্বপ্নাশিসের হাতে দিল, 'কাল বিকেল তিনটের সময় আমার সঙ্গে দেখা করো।'

'কাল তো প্র্যাকটিস আছে।'

'না। দুটোর পর থাকবে না।' সন্তোষবাবু হাসলেন, 'কোথায় যাবে?'

'আমি নেমে যাচ্ছি। কোনও অসুবিধে হবে না।'

ট্রামে বসে মনে হচ্ছিল সে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে একসঙ্গে। সে যদি চাকরি পায় তা হলে পিতৃদেব তাড়িয়ে দিলেও কোনও পরোয়া নেই। সুঁটে সেন যতই বিপক্ষে যাক সন্তোষ বাজপেয়ী তো বলল সে খেলতে পারবে। হঠাৎ এক ধরনের বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হল সে। কেন তাকে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে দু দলের মাঝখানে পড়তে হচ্ছে। কেন সে স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে যেতে পারছে না!

ট্রাম থেকে নেমে স্বপ্নাশিস ভূত অথবা দেবতা দেখল। বাপী দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাতে এবং তার পাশে আহির। গলির মুখেই অপেক্ষা করছে ওরা। আহিরকে কি রকম বিমর্ষ দেখাচ্ছে। সে দ্রুত ছুটে গেল কাছে, 'তোমরা?'

বাপী বলল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেছে। তিনঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি।'

'ও।' স্বপ্নাশিস ভেবে পাচ্ছিল না সে কী করবে। কোথায় নিয়ে গিয়ে বসাবে ওদের।

আহির বলল, 'আমি চলে এলাম।'

'ভাল করেছ।'

বাপী বলল, 'আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। শুনলাম আপনি মাঠে গিয়েছেন। দেশবন্ধু পার্কে গিয়ে খুঁজে পাইনি। তারপর থেকে দাঁড়িয়ে আছি এখানে।'

'আজ ইডেনে প্র্যাকটিস ছিল। এসো।' স্বপ্নাশিসের মনে পড়ল রেস্টুরেন্টটার কথা। পাড়ার ছোট রেস্টুরেন্ট। চেয়ারে ছারপোকা আছে, থাকগে।

বসেই বাপী বলল, 'খুব খিদে পেয়েছে। খাওয়ান। সেদিন শেয়ালদায় বলেছিলাম আর একদিন আপনাকে বধ করব। আজ সেদিন।'

আহির চাপা গলায় বলল, 'বাপী—!'

'চুপ কর। হেভি রিস্ক নিয়েছি, যে কোনও মুহূর্তে পুলিশ আমাকে ধরতে পারে।'

'সেকী! কেন?'

'আহির তো পালিয়ে এসেছে। ট্রেনে না এসে শ্যামনগর থেকে অটোয় ব্যারাকপুরে, সেখান থেকে বাসে এখানে। ওই ব্যাগে কয়েকটা শাড়ি জামা ছাড়া কিছুই আনতে পারেনি। ওর বাবা এতক্ষণে পুলিশে খবর দিয়েছে নিশ্চয়ই।'

আহির বলল, 'আমি বলছি বাবা সেটা করবে না। ওঁর প্রেস্টিজ যাবে এমন কাজ কখনও করতে পারেন না। এতক্ষণে আমাকে মৃত ডিক্লেয়ার করে বসে আছেন।'

খাবারের অর্ডার দিল স্বপ্নাশিস। পকেটে যা আছে তাতে টেনেটুনে হয়ে যাবে।

আহির বলল, 'আমি তোমার ওপর চাপ তৈরি করলাম। কিন্তু এ ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

বাপী বলল, 'শুনুন। আমার এক দিদি থাকে গোয়াবাগানে। আহির আজ ওখানে থাকবে। কিন্তু কাল আপনারা বিয়ে করে নিন।'

আহির জিজ্ঞাসা করল, 'একদিনে সেটা সম্ভব?'

'তা হলে টাইম দিয়ে বেরিয়ে এলি না কেন?'

'বললাম তো, কাল সকালে পাকা দেখা ছিল।'

স্বপ্নাশিস বলল, 'কালীঘাটে গিয়ে—।'

'কালীঘাট?' আহির আঁতকে উঠল।

বাপী জিজ্ঞাসা করল, 'কোনও এক্সপেরিয়েন্স আছে?'

'না না। শুনেছি ওখানে ও সব হয়।'

'ঠিক আছে।' বাপী বলল, 'দিদিকে গিয়ে বলি। ও তো প্রেম করে বিয়ে করেছিল, লাইন

জানে। কিন্তু কাল বিয়ের পর ওকে আপনার বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। এটা ওর সম্মানের জন্যে।'

'কালই? মানে আমি কাল বিকেলে চাকরির জন্যে যাব। হয় তো সামনের মাস থেকে চাকরি পাব। ততদিন অপেক্ষা করা যায় না?'

'না যায় না। আমার দিদি অতদিন ওকে রাখবে কেন আর ওই বা ওখানে থাকবে কোন ভিত্তিতে? আপনার বাবাকে ম্যানেজ করুন।'

খাওয়া শেষ করে ওরা গোয়াবাগানে এল। বাপীর দিদির বাড়ি দেখে চলে এল স্বপ্নাশিস। আসবার সময় আহির হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি খুশি?'

'খুব।'

'সত্যি বলছ? আমি তোমাকে বিপদে ফেললাম না তো?'

'বিপদ তো আমার একার নয়, তোমারও। স্বপ্নাশিস পূর্ণ বিশ্বাসে বলেছিল।

বাড়িতে ফিরে এসে স্বপ্নাশিস দেখল আবহাওয়া খুব ভাল। মাসি এসেছেন, পিতৃদেব বেশ তরল গলায় তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। তাকে দেখতে পেয়ে পিতৃদেব গম্ভীর হলেন, 'কোথায় থাকো? পড়াশুনা তো ডকে তুলেছ। যাকগে, হরিমাধব এসেছিল। সে তোমাকে দেখা করতে বলেছে।'

'আচ্ছা।'

মাসি বললেন, 'আচ্ছা, আপনি ওকে দেখামাত্র খেঁকিয়ে কথা বলেন কেন বলুন তো!'

পিতৃদেব জবাব দিলেন না, সে ভেতরে চলে গেল। দেবাশিস তখনও বাড়ি ফেরেনি। হাসপাতালে ডিউটি থাকলে ওর সাতখুন মাপ। চেয়ারে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছিল স্বপ্নাশিস। কী করা যায় মাথায় ঢুকছিল না। কাল তাকে বিয়ে করতে হবে, কিন্তু কী ভাবে?

'কেমন আছ?' দরজায় শব্দ হল।

'ভাল না।' মুখ থেকে সঠিক উত্তর বেরিয়ে এল।

'কেন? কী হয়েছে?' মাসি পাশে এসে দাঁড়াল।

কথা না বলে মাথা নাড়ল সে। তার খেয়াল হল, এর বেশি বলা ঠিক হবে না।

'বাবার কথায় মেজাজ খারাপ হয়েছে?'

'দূর! ওতে তো আমরা অভ্যস্ত। গায়েই মাখি না।'

'তা হলে? আমাকে খুলে বলতে পারো। নিজের মা থাকলে কি তাকে বলতে না?'

হঠাৎ এত বছর পরে স্বপ্নাশিস সেই মহিলার অভাব বোধ করল। শৈশবে প্রতিটি বন্ধুর মাকে দেখে একধরনের কষ্ট হত কিন্তু সেটা নিয়ে বেশি ভাবার সুযোগ হয়নি। আজ মনে হল সেই ভদ্রমহিলা যদি থাকতেন তা হলে তার সমস্যার সমাধান না হোক সাহায্যে এগিয়ে আসতেন।

'আপনি আমার মা নন, আপনাকে বলে লাভ কী!'

'লোকে তো দুধের সাধ ঘোলেও মেটায়, তাই না?'

স্বপ্নাশিস মহিলার দিকে তাকাল। না, মোটেই ভিলেনের মতো দেখতে নয়। কিন্তু এই বয়সে তাদের বাড়িতে প্রায়শ আসাযাওয়াও খুব স্বাভাবিক নয়। একে সে যা বলবে তা পিতৃদেবের কানে পৌঁছে যাবে। অবশ্য সেটা একটা ভাল ব্যাপার, তাকে নিজের মুখে বলতে হবে না। পিতৃদেবকে বলার ব্যাপারটা আজ না হোক, কাল তো অবশ্যই আসবে।

স্বপ্নাশিস বলল, 'আমি একটা মেয়েকে ভালবাসি।'

বলার সময় সে সোজা হয়ে বসল। মুখচোখ শক্ত। যেন কোনওরকম অন্যায় করছে না।

'বেশ তো। মেয়েটি কী করে?'

'কলেজে পড়ে। ওর বাবা জোর করে বিয়ে দিতে চাইছে।'

'তাই? সে-ও মেনে নিয়েছে?'

'মোটেই না। প্রতিবাদ করেছে, বোঝাতে চেষ্টা করেছে, শেষপর্যন্ত না পেরে বাড়ি থেকে না বলে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে।'

'সেকী? কোথায় আছে সে?'

'ওর বন্ধুর দিদির বাড়িতে। কিন্তু সেখানে একদিনের বেশির থাকা যাবে না। কী যে করি! ও চাইছে কালকেই আমরা বিয়ে করে ফেলি। একবার বিয়ে করে ফেললে ওর বাবা আর কিছুই করতে পারবেন না। কিন্তু কালকেই কী ভাবে বিয়ে করা যায় তাই তো আমি জানি না। তারপর বিয়ে যদি হয়েও যায় ওকে কোথায় আনব? সামনের মাস থেকে আমি চাকরি পাচ্ছি। দিনের বদলে রাতের কলেজে ভর্তি হব। তারপর মাইনে পেলে না হয় বাড়ি ভাড়া নেওয়া যেতে পারে। তদ্দিন কোথায় থাকবে ও?'

মাসি গম্ভীর মুখে শুনছিলেন, বললেন, 'কেন? এই বাড়িতে।'

'আপনি আমার বাবাকে চেনেন না!'

'তা অবশ্য। এক কাজ করো, তোমরা দিল্লি চলে যাও।'

'দিল্লি?'

'হ্যাঁ। ওখানে থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'অসম্ভব। আমার ক্রিকেট-জীবন শেষ হয়ে যাবে।'

'ও। মেয়েটির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দাও। ও আমার কাছে থাকবে। যতদিন না তুমি চাকরি পাচ্ছ, বাড়ি ভাড়া করছ ততদিন থাকবে। আর এর মধ্যে নোটিস দিয়ে তুমি বিয়েটা রেজেস্ট্রি করে ফেল। ওর বয়স কত?'

'জানি না। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে কলেজে পড়ছে।'

'তা হলে তো আঠারো পেরিয়ে গেছে।' স্বপ্নাশিসের মনে হল সে যেন শেষপর্যন্ত সবুজ দ্বীপ দেখতে পাচ্ছে। ভদ্রমহিলা এতটা সাহায্য করবেন সে ভাবতেও পারেনি।

'তা হলে কখন আলাপ করাবে?'

'বাবা জানলে কিন্তু আপনার ওপর খুব রেগে যাবে।'

'ওঁকে এখনই কিছু বলার দরকার নেই।'

'ঠিক আছে। আহির গোয়াবাগানে আছে। কাল সকালে আমাদের দেখা হবে।'

'ও আজই আমার সঙ্গে যেতে পারে না?'

'আজ?'

'ঠিক আছে। তুমি বরং কালই ওকে আমার ওখানে নিয়ে এসো। আমার ঠিকানাটা জানো। জানো না, লিখে নাও।'

মাসিকে সে প্রথম থেকেই ভালভাবে নিতে পারেনি। মনে হত ভদ্রমহিলা কোনও মতলব নিয়ে এ বাড়িতে আসাযাওয়া করছেন। কিন্তু এখন ওঁকে দেবদূত বলে মনে হচ্ছিল। সকালে দেখা হতেই আহিরকে সব কথা খুলে বলেছে সে। আহিরের মুখ চোখ বেশ ফোলা। কাল রাত্রে খুব কেঁদেছে বোঝাই যাচ্ছে। সেই কান্না সেই নিজের বাড়ির জন্যে তা বুঝতে অসুবিধে হবার নয়। স্বপ্নাশিস বলল, 'তুমি কি শ্যামনগরে ফিরে যাবে?'

'না।'

'ভেবে দেখো। তোমার যদি খুব মন খারাপ হয়—।'

'হলেও কিছু করার নেই। তোমার নিজের মাসি?'

ঠিক নিজের নয় তবে মায়ের সম্পর্কিত বোন। এতদিন দিল্লিতে থাকতেন। এখন কলকাতায় চলে এসেছেন। তুমি চলো, তোমার কোনও অসুবিধে হবে না।'

আহির আপত্তি করেনি। কারণ তার আপত্তি জানানোর কোনও উপায় ছিল না।

দক্ষিণ কলকাতায় মাসির বাড়িতে যাওয়ামাত্র তিনি যেভাবে আহিরকে জড়িয়ে ধরলেন সে ভাবেই সম্ভবত স্বপ্নাশিসের মা আহিরকে গ্রহণ করতেন। আহিরের হাত ধরে তিনি বললেন, 'বাঃ, কী সুন্দর মেয়ে। এসো, এসো। দেখো, দুদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

হঠাৎ আহির কেঁদে ফেলল। যে আহিরকে আগে দেখেছে সে যে এ ভাবে কাঁদবে তা ভাবতে পারেনি স্বপ্নাশিস। মেয়েরা কী দ্রুত বদলে যায়! মাসি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, 'কে বেশি আপত্তি করেছে, বাবা না মা?'

'দুজনেই।'

'ঠিক করেছেন।'

আহির মুখ তুলে মাসির দিকে তাকাল।

'আচ্ছা বল তো, তোর মেয়ে যদি কলেজে পড়ে আর ক্রিকেট খেলে বেড়ায় এমন একটা ছেলেকে পছন্দ করে বিয়ে করতে চায়, তুই রাজি হতিস?'

'আমি তো এখনই বিয়ে করতে চাইনি।'

'ও। কিন্তু ভবিষ্যতে তো করবি অথচ ছেলেটা ভাল রোজগার করবে কি না তা জানিস না। তোর বাবা-মা কোন ভরসায় অপেক্ষা করবেন?'

'বাঃ, আমিও তো চাকরি করব।'

'এখন তুই বুঝবি না! সব বাবা-মা-ই সন্তানকে নিরাপদে রাখতে চায়। যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে। তুই এখন এখানেই থাক আর ওঁদের একটা চিঠি লেখ যাতে চিন্তা না করে, তুই জলে পড়ে নেই।'

'এখানকার ঠিকানা জানিয়ে দেবে?' আঁতকে উঠল স্বপ্নাশিস।

'ঠিকানা জানাতে না চাইলে জানাবি না, খবরটা তো দিবি। মনে রাখিস ওঁরা তোদের শত্রু নন। আয়, এই ঘর তোর। নিজের মতো থাকবি। আমি তো এখনও ভাল করে গুছিয়ে বসিনি। বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না বলে এ দিক ও দিকে বেরিয়ে পড়ি। তোরা বোস, আমি একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।' মাসি বেরিয়ে গেলেন।

নির্জন ঘরে আহিরের সঙ্গে কখনও থাকেনি স্বপ্নাশিস। আহির মাথা নিচু করে বসে আছে। স্বপ্নাশিস বলল, 'তোমাকে ওঁর পছন্দ হয়েছে।'

'কী করে বুঝলে?'

'ওই যে একবারেই তুইতে নেমে গেলেন।'

আহির ম্লান হাসল। স্বপ্নাশিস বলল, 'সামনের বছর যে ক্লাবে যাব তাদের প্রেসিডেন্ট আজ বিকেলে আমাকে দেখা করতে বলেছেন। চাকরি দেবেন।'

'পড়াশুনা?'

'ইভনিং কলেজে পড়ব।' স্বপ্নাশিস প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, 'তোমার পক্ষে এখান থেকে কলেজ করা বেশ কষ্টকর হবে।'

'আমি কি এখানে অনেকদিন থাকব?' আঁতকে উঠল আহির।

'না না। বেশিদিন নয়।'

'তা হলে অসুবিধে হবে না।'

স্বপ্নাশিস আর কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। স্বাভাবিক অবস্থায় যেসব বিষয় নিয়ে কথা বলা যায় এখন সেটা সম্ভব নয়। আহিরও চুপ করে আছে। শেষপর্যন্ত স্বপ্নাশিস বলল, 'কি রকম দ্রুত সব হয়ে গেল!'

'হ্যাঁ। আমিও ভাবিনি।' আহির চোখ তুলল।

'ঠিক আছে, কোঙ্গ পরোয়া নেই।'

আহির ওর দিকে তাকাল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আই লাভ ইউ স্বপ্ন!'

সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীটা টলে উঠল। ঈশ্বর যেন স্বর্গের চাবি তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, যা ইচ্ছে তাই করো। সে কী করবে?

সন্তোষ বাজপেয়ী তাঁর ডালহৌসির অফিসে চাকরিটা দিলেন। এখন টেম্পোরারি। যেদিন খেলা থাকবে সেদিন অফিসে আসতে হবে না। বছর দুয়েক আগে যে সিগারেট কোম্পানি সন্তোষবাবু কিনেছেন তার ডিলার্স সেলে চাকরি করতে হবে ওকে। ডিলার্সদের কমপ্লেনগুলো নোট করে সঠিক ডিপার্টমেন্টে পাঠাতে হবে। মাইনে বাইশশো টাকা। সেইসঙ্গে তাকে কন্ট্রাক্ট ফর্মে সই করতে হল। আগামী বছর স্পোর্টিং-এ খেলতে সে বাধ্য থাকবে।

বাইশশো টাকা। রাস্তায় নেমে লাফাতে ইচ্ছে করছিল স্বপ্নাশিসের। লাফালেই যেন সে আকাশের নাগাল পেয়ে যাবে এখন। আর তার কোনও চিন্তা নেই। বাইশশো টাকায় একটা মাথা গোঁজার জায়গা আর দু বেলার খাওয়া কি হবে না? তা হলে কে কী বলল শোনার দরকার কী। একবার ইচ্ছে হল সোজা মাসির বাড়িতে গিয়ে আহিরকে ভাল খবরটা শুনিয়ে আসতে। কিন্তু তার বদলে সে কলেজে এল। রাতের কলেজে নাম লেখাবার জন্যে এর ওর কাছে দরবার করতে ভরসা পেল। তাকে আবেদন করতে হবে একজন ক্রিকেটার হিসেবে। স্টেট রিপ্রেজেন্ট করা ক্রিকেটারদের আবেদন কলেজ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে।

বাড়িতে ফিরতেই সে দূর থেকে দেখতে পেল বাইরের ঘরের দরজা খোলা এবং পিতৃদেব খুব দরাজ গলায় কথা বলছেন। এই গলা একমাত্র মাসি বাড়িতে এলেই বেরিয়ে আসে। দরজায় পৌঁছে স্বপ্নাশিসের পা-দুটো পাথর হয়ে গেল। পিতৃদেবের উল্টোদিকে মাসির পাশে বসে আছে আহির। পিতৃদেবের মুখের হাসি তাকে দেখামাত্র উবে গেল।

'কোথায় ছিলে?'

'চাকরি পেয়েছি।'

'চাকরি, সে কি? পড়া ছেড়ে চাকরি নিতে কে বলেছে?'

'ক্রিকেট খেলার জন্যে চাকরি। পড়ব রাতের কলেজে।'

'রাতের কলেজ? তার মানে বাড়ি ফিরতে রাত বারোটায়?'

'না। সাড়ে নটার মধ্যেই চলে আসব।'

'নিজে যা ভাল বুঝছ তাই করছ। আমার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছ না?'

'চাকরিটা আমার দরকার ছিল?'

'দরকার? কেন? এ বাড়ির বিনি পয়সার হোটেলটা কি বন্ধ হয়ে গিয়েছে?'

স্বপ্নাশিস জবাব না দিয়ে আড়চোখে আহিরের দিকে তাকাল। আহির মাথা নিচু করে বসে আছে। পিতৃদেব মাসিকে বললেন, 'একটু আগে তুমি ওর প্রশংসা করছিলে। দেখলে তো?'

'আমি তো কোনও খারাপ দেখতে পাচ্ছি না। ও পড়াশুনো করেও যদি কিছু রোজগার করে

আপনার হাতে তুলে দেয় তার চেয়ে আনন্দ আর কী আছে! কত মাইনে পাবে তুমি?'

'বাইশশো।'

'এত? বাঃ। দেখুন, আপনি তো এখন অবসরে আছেন। টাকাটা কত কাজে দেবে।'

'আই ডোন্ট ওয়ান্ট।' পিতৃদেব চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ছেলের পয়সায় আমি কোনও দিন খাব আমার বড় ছেলে এবার ডাক্তার হবে, তাকেও তাই বলেছি।'

মাসি বললেন, 'উঃ, আপনি আবার চেঁচাচ্ছেন? এই মেয়েটা কী ভাবছে বলুন তো?'

সঙ্গে সঙ্গে পিতৃদেব গলা নামালেন, 'কিছু মনে করো না মা, অন্যায় দেখলে আমি মাথা ক রাখতে পারি না। কখনও অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করিনি।'

'আমার ঠাকুর্দা এ রকম ছিলেন।' নিচু গলায় আহির বলল।

'তাই? নিশ্চয়ই আদর্শবান মানুষ ছিলেন?'

'আমি তাঁকে চোখে দেখিনি।'

'অ। তোমার বাবা?'

'বাবা—।' আহির থমকে গেল।

মাসি বললেন, 'একদম কসাই। ওইটুকুনি মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।'

'সে কী? কেন? তোমার দেওরের মেয়ে বললে তো!'

'তাই তো। দেওর বলে কসাইকে কসাই বলব। না? তিনি চান ওর বিয়ে দিতে। এই পড়াশুনা টড়াশুনা জলে যাক। অথচ ওর ইচ্ছে পড়ার। তাই বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন।'

'তা বিয়ে করেও তো পড়া যায়।'

'যায় আবার যায়ও না। বিয়ে হলেই তো সংসারের ঝামেলা ঘাড়ে পড়বে। তা ছাড়া ওর ব্রহ্মচারিণী হয়ে থাকার খুব ইচ্ছে। বিবেকানন্দ মুখস্থ।'

'সেটা অবশ্য মন্দ নয়। উনি এটা ঠিক করেননি। আফটার অল মেয়ে। আরে আমার তো মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় এটাকে বাড়ি থেকে দূর করে দিই। পেরেছি? তবে আরও অসহ্য হয়ে উঠলে হয় তো পেরে যাব। ছেলে তো, রাস্তায় ঘুরুক।'

'আহা। অমন করে বলবেন না। অত নামকরা ক্রিকেট প্লেয়ারকে তার বাবা এ সব বলছে শুনলে লোকে আপনাকেই দোষ দেবে।' মাসি প্রতিবাদ করলেন।

'তা ওকে কদিন নিজের কাছে রাখবে?'

'যদ্দিন ওর বাবা এসে না নিয়ে যায় থাকবে। আমি একা থাকি, আমারও ভাল লাগছে ও আসায়।' মাসি কথা শেষ করামাত্রই একটা জিপ এসে দাঁড়াল। একজন পুলিশ অফিসার দরজায় এলেন, 'স্বপ্নাশিসবাবু আছেন?'

স্বপ্নাশিস বলল, 'আমিই স্বপ্নাশিস।'

'ও, আচ্ছা আচ্ছা।' অফিসারের মুখে হাসি ফুটল, 'আপনি তো ক্রিকেট খেলেন?'

'হ্যাঁ।' স্বপ্নাশিস নিজের বুকের ধুকধুকুনি শুনতে পাচ্ছিল।

'আপনাকে ডিস্টার্ব করছি বলে দুঃখিত। আপনি আহির বলে কোনও মেয়েকে চেনেন?'

'আহির?'

'হ্যাঁ! শ্যামনগরে থাকে।'

'আলাপ আছে।'

'ব্যাপারটা হল আহিরকে পাওয়া যাচ্ছে না। ওর ব্যাপারে কিছু জানেন?'

'না।'

এবার পিতৃদেব গলা খুললেন, 'কী নাম বললেন? আহির?'

'হ্যাঁ।' অফিসার মাথা নাড়লেন।

'এই নামটা আমি শুনেছি। ইয়েস, ওর মুখেই শুনেছি। কবিতার বই প্রেজেন্ট করেছে ওকে। তখনই বুঝেছিলাম একটা গোলমাল হতে চলেছে।' পিতৃদেব হুঙ্কার দিলেন।'

'কবিতাগুলো কিন্তু সুন্দর।' মাসি মাথা নাড়লেন।

পিতৃদেব চিৎকার করে বললেন, 'আঃ।'

অফিসার বললেন, 'যাদের সঙ্গে কানেকশন থাকতে পারে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আপনি তা হলে জানেন না?'

'না।'

পিতৃদেব বললেন, 'সত্যি কথা বলছে কি না জানা যাচ্ছে না। ওকে কি অ্যারেস্ট করবেন?'

'না, এখনই নয়। তা ছাড়া আহিরের সঙ্গে ওদের পাড়ার একটি ছেলেকেও পাওয়া যাচ্ছে না।'

মাসি বললেন, 'তাই বলুন। আপনার ছেলে কোনও দোষ করেনি।'

'মাইট বি ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছে' পিতৃদেব বললেন।

এবার অফিসার খুশি হলেন, 'আপনার মত সৎ মানুষ কম দেখেছি। আপনি ওর বাবা?'

'খুব দুঃখজনক হলেও উত্তরটা হ্যাঁ।'

'তা হলে কোনও চিন্তা নেই। প্রয়োজন হলে আমি ডেকে পাঠাব। ছেলেকে থানায় পাঠিয়ে দেবেন।' অফিসার চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই আহিরের মুখ দেখতে পেলেন। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। পকেট থেকে একটা ছবি বের করে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। তারপর সামনে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম কী ভাই?'

আহির তাকাল, 'আহির।'

'সর্বনাশ।' অফিসার পিতৃদেবের দিকে ঘুরলেন, 'আপনাকে আমি সৎলোক বলে প্রশংসা করছিলাম। অথচ নিজের বাড়িতে ওকে শেল্টার দিয়ে আপনি আমার সঙ্গে অভিনয় করলেন? ছি ছি! আপনাকে, আপনাদের আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।'

'আমি, আমি অভিনয় করেছি?'

'করেননি? এমনভাবে কথা বলছিলেন যেন জানেন না মেয়েটা আপনার নাকের ডগায় বসে আছে।'

'বিশ্বাস করুন আমি জানতাম না।'

এবার মাসি বললেন, 'বাঃ, জামাইবাবু, আপনাকে আমি বলিনি ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমার কাছে উঠেছে? ওর বাবা ওকে জোর করে বিয়ে দিতে চেয়েছিল?'

'নো। তুমি বলেছ ওর বাবা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'ওই একই হল।' মাসি বললেন, 'শুনুন অফিসার। আহিরের বয়স এখন কুড়ি। ওর আইডেন্টিটি কার্ড আছে, বয়সটা দেখে নিতে পারেন। একটা অ্যাডাল্ট মেয়ে যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারে। আপনি কি তাতে বাধা দিতে পারেন?'

'না, তা পারি না। কিন্তু বয়সটা প্রমাণিত হোক।'

'ও। তা হলে আমাকেও প্রমাণ দিতে হবে আমি অ্যাডাল্ট কি না!'

'এ কী বলছেন। আপনি আর উনি?'

'কেন? উনি কি অপরাধ করলেন? ছয় বছর বয়সে ওয়ানে পড়লে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ

করে আঠারোতে। তার ওপর দু বছর কলেজে যাচ্ছে! কুড়ি হয়নি?'

'তা অবশ্য। ঠিক আছে, আমি রিপোর্ট পাঠাচ্ছি, উনি এ বাড়িতে আছেন।'

'নো। নেভার।' পিতৃদেব আবার হুঙ্কার ছাড়লেন, 'এ বাড়িতে নেই।'

'আশ্চর্য! আপনি কথায় কথায় এমন হুঙ্কার দিয়ে মিথ্যে কথা বলেন কেন বলুন তো? উনি এখানে আছেন, আর বলছেন নেই?'

'এসেছিল, চলে যাবে। এরপর যে ছোকরা উধাও হয়েছে সে-ও এখানে হাজির হবে।'

মাসি বললেন, 'যে উধাও হয়েছে তার সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্কে নেই।'

পিতৃদেব বললেন, 'তুমি দেখছি সব নাড়িনক্ষত্র জানো। তা হলে সম্পর্কটা কার সঙ্গে, অ্যাঁ। ধোঁয়া যখন উঠছে তখন পেছনে তো আগুন আছেই।'

'সম্পর্ক আপনার সঙ্গে হবে।'

'তার মানে?' পিতৃদেবের চোয়াল ঝুলে পড়ল।

'ও আপনার পুত্রবধূ হবে।'

'সেকি? অসম্ভব। আমি বেঁচে থাকতে অসম্ভব।' পিতৃদেব স্বপ্নাশিসের দিকে তাকালেন, 'তোমার দাদাকে বলে দিয়ো সে যেন এ বাড়িতে না ঢোকে। দাঁড়াও, দেবু, দেবু, কাম হিয়ার। কুইক!'

দেবাশিস বোধহয় কাছেই ছিল, দ্রুত ঘরে ঢুকল।

পিতৃদেব বললেন, 'গেট আউট। অভি নিকালো। আমাকে ব্লাফ দেওয়া! ব্রহ্মচারী হবার এই নমুনা? ডাক্তারি পড়তে গিয়ে তলে তলে এই?'

'আমি কিছু করিনি বাবা।' দেবাশিস মিনমিন করল।

'করোনি? ওকে তুমি চেনো না? ভাই-এর সঙ্গে প্যাক্ট করনি?'

'না। স্বপ্নকে জিজ্ঞাসা করুন। ও আমাকে বলেছিল এ সব করেছে।'

'অ্যাঁ?' পিতৃদেব ঘুরে দাঁড়ালেন, 'তুমি? গেট আউট।'

'বেশ যাচ্ছি। কয়েক মিনিট সময় দিন।' স্বপ্নাশিস দ্রুত ভেতরে ঢুকে গেল। পিতৃদেব এবার অফিসারের দিকে তাকালেন, 'কী: এখনও মনে হচ্ছে আমি অভিনয় করছি?'

অফিসার সেটাকে আমল না দিয়ে আহিরকে বললেন, 'আপনি একবার থানায় আসুন। একটা স্টেটমেন্ট দিতে হবে এই বলে যে আপনি প্রাপ্তবয়স্ক এবং স্ব ইচ্ছায় বাড়ি থেকে চলে এসেছেন। কেউ আপনাকে বাধ্য করেনি।'

'সেটি ঠিক নয়। বাবা আমাকে বাধ্য করেছেন।' আহির বলল।

'অ্যাঁ!' অফিসার হকচকিয়ে গেলেন।

'হ্যাঁ। আমি প্রাপ্তবয়স্কও, উনি আমায় জোর করে বিয়ে দিচ্ছিলেন। বাড়ি থেকে চলে আসা ছাড়া আমার কাছে অন্য পথ খোলা ছিল না।'

অফিসার বললেন, 'বেশ, এই স্টেটমেন্টটাই দিন।'

মাসি এবার পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করবেন?'

'কী করব মানে?'

'আপনি ওকে গ্রহণ করুন।'

'ইম্পসিবল। আমি এ সব প্রশ্রয় দিতে পারি না। যে মেয়ে নিজের বাবার সঙ্গে একটা বাইরের ছেলের জন্যে সংঘাতে যেতে পারে সে তো কাল আমাকেও নস্যাৎ করতে পারে। আর উনি তো দু মিনিট সময় চেয়েছেন।'

মাসি বললেন, 'কিন্তু ও যদি এখান থেকে না যায়?'

আহির প্রতিবাদ করল, 'মাসিমা—।'

'চুপ কর। শুনুন, ও যদি বলে আপনার ছেলের জন্যে ও বাড়ি থেকে চলে এসেছে আর তাই ও এখানেই থাকবে তা হলে আপনি কি ঘাড় ধরে বের করে দেবেন?'

'ও কি আমার পারমিশন নিয়ে বাড়ি ছেড়েছে?'

'আপনার ছেলেকে জানিয়ে এসেছে।'

'ও আমার ছেলে নয়, নো মোর।'

'বাঃ, বললেই দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে পারবেন না।'

পিতৃদেবের গলা পাল্টালেন, 'তুমি, তুমি এর মধ্যে জড়াচ্ছ কেন?'

'কারণ আপনি ঠিক কাজ করছেন না।'

এই সময় একটা ব্যাগ নিয়ে স্বপ্নাশিস বেরিয়ে এল, 'চলুন।'

আহির তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মাসি বললেন, 'চিন্তা করে দেখুন। যদ্দিন না বিয়ে হচ্ছে মেয়েটা আমার ওখানেই থাকবে। স্বপ্ন কোথায় থাকবে আমি জানি না।'

পিতৃদেব একটি কথাও বললেন না। পুলিশের জিপে উঠল ওরা। থানায় গিয়ে আহিরের স্টেটমেন্ট দেওয়া চুকে গেলে মাসি জিজ্ঞাসা করলেন. 'তোকে অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে হবে এই কটা দিন। এক বাড়িতে থাকা শোভন নয়।'

'আমি কোথায় থাকব?'

'ভেবে ঠিক কর। তবে রোজ আসিস। তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।' ওদের পাতাল রেলে তুলে দেবার আগে আহির জিজ্ঞাসা করল, 'কী করবে?'

'বুঝতে পারছি না। ভাবছি একবার হরিমাধবদার কাছে যাব।'

'আমার জন্যে, আমার জন্যে এমন বিপদে পড়লে তুমি।' আহিরের চোখ জলে জলাকার। মাসি ডাকলেন, 'কী রে, আয়!'

সব শুনে হরিমাধবদা বললেন, 'এখনই প্রেম না করলে কি চলছিল না?'

'আমি ইচ্ছে করে করিনি।'

'ইচ্ছে করে করিনি! বলটা নিজে এসে আমার ব্যাটের কোণে লাগায় ক্যাচ উঠল আর আমি আউট হলাম। ওয়ার্থলেস।

'আমাকে কয়েকটা দিন এখানে থাকতে দেবেন?'

'কেন?'

'আমার এই মুহূর্তে কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।'

'সেটা আমার সমস্যা নয়। উঃ, আমি ভাবতেই পারছি না। এখন তোর ক্যারিয়ার তৈরি করার সময়। মন ঠিক করে রনজি খেলবি, দিলীপ খেলবি, চেষ্টা করবি ইন্ডিয়ায় ঢুকতে তা না করে প্রেম করে বসলি। চমৎকার। নিজের কফিনে নিজেই পেরেক ঠুকছিস। শোন, মেয়েটাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দে।'

'অসম্ভব। আমি ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না।'

'ক্রিকেটের চেয়ে একটা মেয়ে তোর কাছে বড় হল?'

'না। কেউ কারও চেয়ে বড় নয়। ও থাকলে আমি আরও ভাল খেলতে পারব।'

'হয় না। বাড়িতে শান্তি না থাকলে কোনও লেখক শিল্পী খেলোয়াড় সফল হতে পারে না। এটা কেরানিগিরি নয়।'

'আপনি আহিরকে দেখলে এই সব কথা বলতেন না।'

'কেন?'

'ওকে দেখলেই মন ভাল হয়ে যায়!'

'যা ব্বাব্বা! তুই আমার সামনে প্রেমের ডায়ালগ বলছিস?'

'আমি সত্যি কথা বলছি।'

'বেশ, তুই যখন মরতে চাস আমি তোকে বাঁচাতে পারব না। আমি নিজে বিয়ে-থা করিনি, এ সব বুঝি না। তবে দয়া করে এখানে তাকে এনো না।'

'আমি তা হলে এখানে থাকতে পারি?'

'কী আর করা যাবে? ছাত্র পুত্রের সমান। তোর নিজের বাবা যা দুদিন বাদে করবেন আজ তা আমি করলাম। তবে একটাই কন্ডিশন, ভাল খেলতে হবে। মাঠে বদনাম হলে এ বাড়ি ছাড়তে হবে তোমাকে, মনে রেখো কথাটা।'

অসমের বিরুদ্ধে রঞ্জি ম্যাচে প্রথম এগারো জনের মধ্যে স্বপ্নাশিসের নাম দেখা গেল। বাবুল বোস বলল, 'অনেক ফাটাফাটির পর টিমে ঢুকলে। কিন্তু ব্যাপারটা কী বলো তো? কটকে কেউ তোমার জন্যে কিছু বলেনি, এ বার এত প্রেসার যে সুঁটেদাকে হাত গোটাতে হল। সন্তোষদার সঙ্গে আলাপ হয়েছে নাকি?'

স্বপ্নাশিস বলল, 'আমি খেলতে না পারলে কোনও দাদা তো খেলে দেবে না। অতএব উত্তরটা ম্যাচের শেষে দেওয়া ভাল। তাই না?'

স্বপ্নাশিস ঠিক করেছিল প্রতিটি বল বুঝেসুঝে খেলবে. রিস্কি শট নেবে না। হরিমাধবদা মাঠে এসেছেন। অসমের বোলিং তেমন শক্তিশালী নয়। তবু প্রথম ঘণ্টায় দুটো উইকেট পড়ে গেল। বেশি ধরে খেলায় ক্রিজে দাঁড়িয়ে থাকতে অসুবিধে হচ্ছিল না কিন্তু রান পাচ্ছিল না স্বপ্নাশিস। ব্যাপারটা ক্রমশ বিরক্তিকর হয়ে পড়ছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল সে তার নিজের খেলা খেলছে না অন্যের ভূমিকায় অভিনয় করছে। আজ মাঠে আহির এসেছে। কথা হয়নি কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়েছে মাঠে ঢোকার সময়। হঠাৎ স্বপ্নাশিস মত পাল্টাল। সে তার নিজের খেলা খেলবে শুধু অফ-এর বল ছেড়ে দেবে। ইনিংস শেষেও নট আউট থেকে তিরিশ করার চেয়ে স্বাভাবিক খেলাই খেলা ভাল। এবার মারতে লাগল সে। দ্রুত রান উঠছে। লাঞ্চেই তার রান সত্তর হয়ে গেল। মাঠের বাইরে আসতেই হরিমাধবদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রথম ঘণ্টায় ইঁদুর হয়ে ছিলি কেন? এই বোলিং-এর বিরুদ্ধে ওই খেলা? এখন যা খেলছিস তাই খেলে যা।'

স্বপ্নাশিস বলল, 'একটা কথা বলব?'

'বল'

'ওই যে মেয়েটি বসে আছে, ও আহির।'

'আহির?'

'হ্যাঁ। আমার পক্ষে তো যাওয়ার উপায় নেই, আপনি একটু কথা বলবেন।'

'আমি? আমি কী কথা বলব?'

স্বপ্নাশিসকে একজন ডাকতেই সে বাধ্য হল চলে যেতে।

দিনের শেষে স্বপ্নাশিস দুশো দুই নট আউট। মাঠ থেকে বেরিয়ে আসতেই তাকে নিয়ে এমন মাতামাতি শুরু হল যে দমবন্ধ হবার জোগাড়। যেন বাংলা আজই ম্যাচ জিতে ফেলেছে। একটু ফাঁকা হতেই ভজুবাবু এলেন, 'শুনলাম সন্তোষ নাকি টোপ ফেলেছে। কত মাইনে দিচ্ছে?'

'কেন?'

'সুঁটেদা এখন সাড়ে তিন হাজার দেবে। স্টেট ব্যাঙ্কে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করবে।'

'কিন্তু আমি যে কন্ট্রাক্ট সই করে ফেলেছি।'

'সি এ বিতে অ্যাপ্লাই করলে ওটা বাতিল করে দেবে ল'ইয়ার।'

'কিন্তু তাতে আমার কথার দাম থাকবে না ভজুদা। তা ছাড়া আমার পক্ষে ভোলা মুশকিল আপনারা কটকে নিয়ে গিয়ে আমাকে মাঠের বাইরে বসিয়ে রেখেছেন।'

'আমরা করেছি কে বলল?'

'এর উত্তর আপনিই ভাল জানেন।'

তিনটে দিন ঘোরের মধ্যে কেটে গেল। বাংলা ইনিংসে জিতল। প্রত্যেকটা কাগজ স্বপ্নাশিসের ছবি ছেপেছে। প্রাক্তন ক্রিকেটাররা কলম লিখেছে ওর প্রশংসা করে। একজন লিখেছেন, অমল মজুমদার বা নিখিল হলদিপুরকে নিয়ে যে নাচানাচি হয়েছে তার থেকে অনেক গুণ ভরসা করা যায় স্বপ্নাশিসের ওপর।'

বিয়ের আগের দিন মাসি গিয়েছিলেন শ্যামনগরে। স্বপ্নাশিসের অনুরোধে সুব্রত নিয়ে গিয়েছিল তাঁকে। গিয়েছিলেন সকালবেলায়, আহিব যখন কলেজে। কিছুদিন থেকে আহির রোজ কলেজে যাচ্ছে। কেউ তাকে বাধা দেয়নি, জিজ্ঞাসা করার জন্যেও মুখোমুখি হয়নি। মাসির শ্যামনগরে যাওয়া নিয়ে তার আপত্তি ছিল। পুলিশের কাছ থেকে জানার পরও যারা তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি তাদের জানানোর কী দরকার। মাসি শোনেননি ওর কথা। বলেছেন, 'হাজার হোক ওঁরা তোকে পৃথিবীতে এনেছেন, বড় করেছেন। আমাদের কর্তব্য তোর এমন সুখবর ওঁদের জানানো। তারপর ওঁরা যা করবেন সেটা ওঁদের ব্যাপার।'

সন্ধেবেলায় মাসির বাড়িতে প্রায় মিটিং বসে গিয়েছিল। স্বপ্নাশিস ছাড়া হরিমাধবদা ছিলেন, সুব্রতও এসেছিল। আহির বলেছিল, 'আমার খবরটা ওদের কাছে তো সুখবর নয়।'

কিন্তু হরিমাধবদা মাসিকে সমর্থন করেছিলেন। জানানো দরকার। শুধু শ্যামনগব নয়, স্বপ্নাশিসের বাবাকেও এবং সেই দায়িত্ব তিনি নেবেন। এর মধ্যে বিহারের বিরুদ্ধেও স্বপ্নাশিস একশো দশ করায় হরিমাধবদা এখন আকাশের মতো হৃদয় নিয়ে কথা বলছেন। মোহনলাল মিশ্র স্ট্রিটে তাঁর দিদির বাড়ির তিনতলায় দুখানা ঘরের এক ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করেছেন স্বপ্নাশিসদের জন্যে। দিদির বয়স হয়েছে, জামাইবাবুরও। ছেলেমেয়ে নেই। ভাড়া দেবার কথা ওঁরা কখনও ভাবেনি। হরিমাধবদাই অনেক বলে রাজি করিয়েছেন। সেই ফ্ল্যাটে খাট টেবিল আলমারি সবই রয়েছে। পুরনো দিনের ভারী আসবাব, সরানোও যাবে না। সরিয়ে রাখারও জায়গা নেই। অতএব স্বপ্নাশিসদের সুবিধেই হবে।

এগারোটার মধ্যে ফিরে এলেন মাসি। ঠিক ছিল আহিরকে নিয়ে মাসি আসবেন ধর্মতলায় রেজিস্ট্রারের অফিস, হরিমাধবদা যাবেন স্বপ্নাশিস এবং সুব্রতকে নিয়ে। অতএব সুব্রতর মুখে শুনতে পেল স্বপ্নাশিস। আহিরের বাবা বলেছেন, মেয়ে নিজে বিয়ে করছে করুক, তার কিছু বলার নেই। তিনি এই বিয়েতে নেই।' মাসি অনেক অনুরোধ করেছেন কিন্তু তিনি শোনেননি। উল্টে বলেছেন, 'ছেলের বাবাও নাকি ওদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তা তিনি যদি এসে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাহলেই আমি বিবেচনা করতে পারি। ছেলে যে অন্যায় করেছে তার জন্যে তাঁকেই তো ফলভোগ করতে হবে।'

অতএব তিনটে একত্রিশ মিনিটে সইসাবুদ হয়ে গেল। নবদম্পতিকে দুজন বয়স্ক আশীর্বাদ

করল, একজন অভিনন্দন। মাসির ইচ্ছে ছিল সেই রাতটা তাঁর বাড়িতেই ওরা কাটাক। হরিমাধবদা আপত্তি করলেন। এখন থেকে জীবনযুদ্ধে ওদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করতে হবে। সমস্যা যা আসবে তা ওদেরই সমাধান করতে হবে। ঠোক্কর খেতে খেতে শিখবে ওরা। আর সেটা আজকের রাত থেকেই শুরু হোক।

সবাই মিলে ওদের নিয়ে এল মোহনলাল মিশ্র স্ট্রিটে! হরিমাধবদার দিদি বরণ করলেন, শাঁখ বাজালেন, মিষ্টি মুখ হল! হরিমাধবদা ভাল হোটেল থেকে খাবার আনালেন। সবাই যখন ওদের একা রেখে বিদায় নিল তখন রাত নটা।

ঘরের দরজা খোলা, জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। স্বপ্নাশিস দেখল আহির চোখ বন্ধ করে বসে আছে। সে কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে তোমার?'

'বাবার কথা মনে পড়ছে!'

'বাবা?'

'হ্যাঁ।' আহির চোখ খুলল, 'মনে এলে কী করব!'

'ঠিক আছে।' স্বপ্নাশিস অস্বস্তি নিয়ে বলল। যে বাবার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে আহির সেই বাবার কথা এই মুহূর্তে মনে আসছে কেন, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায় না।

ঘরের দরজা বন্ধ করে সে জিজ্ঞাসা করল, 'থাকার জায়গা কেমন হয়েছে?'

'অ্যাঁ? ভাল। এত ভাল হবে আশা করিনি।'

'হরিমাধবদার দিদি কিন্তু গার্জেনগিরি করবে।'

'করুক। মাথার ওপর কেউ থাকলে তো ভাল।' আহির উঠে দাঁড়াল।

স্বপ্নাশিস আহিরের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি খুশি?'

আহির স্বপ্নাশিসের বুকে মাথা রাখল। একটা নরম উত্তাপ পলকেই সঞ্চারিত হয়ে গেল স্বপ্নাশিসের সমস্ত শরীরে। আহিরের শরীরের স্পর্শ, গন্ধ এবং এ-সব মিলেমিশে আর এক অনুভূতি তীব্র গতিতে তাকে নিয়ে ছুটে যাচ্ছিল দূরে কোথাও, বহুদূরে যেখানে সে কোনওদিন যায়নি। দুহাতে জড়িয়ে ধরল সে আহিরকে। আহির মুখ তুলল, 'আই লাভ ইউ।'

এ এক স্বপ্নের জীবন। ঘুম ভাঙলেই আহিরের মুখ, ঘুমোতে যাওয়ার আগে সেই মুখে ছড়ানো শান্তি মেখে নেওয়া। এতদিন বাইরে দেখা হত, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই সাজগোজ করা আহিরকে দেখতে হত। এখন আটপৌরে আহিরও আর এক ধরনের ভাললাগা তৈরি করছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই চা তৈরি করে দুজনে বের হয়। আহির যায় কলেজ, স্বপ্নাশিস মাঠে। আহির কলেজ থেকে ফেরার আগেই স্বপ্নাশিসকে বেরিয়ে যেতে হয় মাঠে কিংবা অফিসে। সকালের রান্নাখাওয়ার কোনোটাই সম্ভব হয় না তার পক্ষে। এ নিয়ে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা আহিরের। স্বপ্নাশিসের ক্যান্টিনে খাওয়া সে পছন্দ করে না কিন্তু কোনও উপাও তো নেই।

এক রবিবার সকালে সে বলল, 'আজ আমি যা বলব তা করতে হবে তোমাকে।'

'যেমন?'

'তোমাকে মিনিমাম কয়েকটা রান্না শিখতে হবে।'

'কী দরকার?'

'দরকার আছে। ধরো, আমি অসুস্থ, বিছানা থেকে নামতে পারছি না। তুমি যদি সামান্য কিছু রাঁধতে শিখে নাও তাহলে খাওয়ার কোনও প্রব্লেম হবে না।'

'তা ঠিক। কিন্তু তুমি অসুস্থ হবে কেন?'

'আশ্চর্য! শরীরের কথা কেউ বলতে পারে?'

'তুমি অসুস্থ হলে আমি মরে যাব।'

'বাঃ। চমৎকার। উনি আমাকে অসুস্থ অবস্থায় ফেলে রেখে মরে যাবেন আর আমার কী হবে তা একবারও চিন্তা করলেন না।' আহির স্বপ্নাশিসের ঠোঁটে আঙুল রাখল, 'কক্ষনো ওসব কথা বলবে না। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। তোমার কিছু হলে আমি আত্মহত্যা করব। বুঝলে? খারাপ কথা একদম উচ্চারণ করবে না।'

স্বপ্নাশিস আহিরকে জড়িয়ে ধরল। যেন দুহাত দিয়ে মুছে ফেলার চেষ্টা করল শব্দগুলো। কিছুক্ষণ চুপচাপ জড়িয়ে রইল আহির।

রান্নাঘরে ঢুকে স্বপ্নাশিস জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এ-সব শিখলে কখন?'

'ইচ্ছে থাকলেই শেখা যায়। যারা খাওয়াতে ভালবাসে তাদের মধ্যে আপনা থেকেই একটা ইন্টারেস্ট গ্রো করে মশাই। আপনাকে শুধু ভাত ডাল আর মাছের ঝোল তৈরি করা শিখতে হবে। শিখলে আমি কৃতার্থ হব। বলো তো দুজনের জন্যে তুমি কতখানি চাল নেবে?' আহির কোমরে শাড়ি জড়াল।

'হাফ কিলো।'

'হাফ কিলো চালের ভাত আমরা দুজনে খাই?' মাথা নাড়ল আহির, 'নিজে তো মোটা হয়ে যাওয়ার ভয়ে খেতে চাও না। ম্যাক্সিমামা তিনশো গ্রাম। এই যে কৌটো দেখছ তার দেড় কৌটো।'

কিন্তু আহিরের ক্লাস নেওয়া হল না। সুব্রত এল, 'ম্যাডাম, চা খাওয়াবেন।'

'আপনারা প্লেয়াররা যখন তখন চা খান?'

'এই রে! স্টকে বুঝি চা নেই?'

'থাকবে না কেন?'

'তা হলে ঠিক আছে। চাকে লোকে আর নেশার জিনিস মনে করে না। এই যেমন ধরুন শালা শব্দটা। আগে গালাগালি হিসেবে ব্যবহৃত হত। বড়দের সামনে উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ ছিল। এখন জলভাত। কলকাতার বেশিরভাগ ছেলেকে দেখবেন একটা অশ্লীল শব্দ কথার ফাঁকে অসাড়ে গুঁজে উচ্চারণ করে চলেছে। কোনও বিকার নেই! কাল বাদে পরশু দেখবেন সেটা শুনতে তেমন খারাপ লাগবে না।'

'আপনি বড্ড বকেন।' আহির হেসে ফেলল।

'তুই রান্নাঘরে কী করছিলি?'

'রান্না শিখছিলাম।'

'সর্বনাশ। তোর বারোটা বেজে গেছে।'

রান্নাঘর থেকে আহিরের গলা ভেসে এল, 'সর্বনাশ কেন?'

'বাড়িতে খাবার না থাকলে দোকান আছে, পরিশ্রম করার কী দরকার? যাকগে, তুই নিশ্চয়ই যাবি না, আমি যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

'শ্যামনগরে। সেই মাঠে আবার টুর্নামেন্ট হচ্ছে। খেপ।'

'তুই এখনও খেপ খেলে যাচ্ছিস?'

'সবাই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে চাকরির, কেউ দিচ্ছে না। ওটা পেয়ে গেলে খেপ খেলা ছেড়ে দেব। আগে টাকা না পেলে যাব না বলে দিয়েছি।'

হঠাৎ স্বপ্নাশিস জিজ্ঞাসা করল, 'তুই রনজি খেলার স্বপ্ন দেখিস না?'

'নো। আমি আমার ক্ষমতা জানি। তুই সোবার্স রিচার্ড কিংবা জাভেদ মিঁয়াদাদ হবার স্বপ্ন দেখিস? তবে?' সুব্রত হাসল।

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আহির বলল, 'কিন্তু পরের প্রজন্মের কেউ স্বপ্নাশিস হবার স্বপ্ন দেখবে সেই চেষ্টা তো ওকে করতে হবে।'

'বাঃ চমৎকার বলেছেন। আঃ, এরকম বউ পেলে রনজি কেন,ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার স্বপ্ন দেখতাম আমি। গ্র্যান্ড।' হইহই করে উঠল সুব্রত।

চায়ের কাপ নিয়ে এসে আহির জিজ্ঞাসা করল, 'শ্যামনগরে খেলা কবে?'

'শনিবার।'

আহির স্বপ্নাশিসের দিকে তাকাল, 'এ বাড়ির ঠিকানাটা ওঁদের জানাবে?'

স্বপ্নাশিস মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। এই কিছুদিনে সে অনুভব করেছে শ্যামনগরের প্রিয়জনেরা আহিরকে খুব টানে। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে কিন্তু অস্বীকার করতে পারেনি। ব্যাপারটা তার ভাল লেগেছে। একদা যাদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক, ভালবাসার সম্পর্ক ছিল একটা ঝড়ে তার সমস্তটা যারা মুছে দেয় তাদের কখনই বিশ্বাস করা চলে না।

সুব্রত বলল, 'ঠিক আছে। আমি সোজা কড়া নেড়ে ঠিকানাটা দিয়ে আসব।'

বলার ধরনের হেসে ফেলল আহির, 'ঠিক আছে। আর বাপীকে এখানে আসতে বলবেন।'

'কে বাপী?' সুব্রত জানতে চাইল।

স্বপ্নাশিস বলল, 'শ্যামনগরের ওই মাঠটার পাশেই থাকে। ওর বন্ধু।'

'ক্যান্ডিডেট ছিল নাকি?'

আহির চেঁচিয়ে উঠল, 'ফাজলামি করবেন না। ও আমার খুব ভাল বন্ধু।'

বাপীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে পুলিশ অফিসার স্বপ্নাশিসের বাড়িতে এসে জানিয়েছিলেন। সেই যে বাপী আহিরকে তার দিদির বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে চলে গিয়েছিল তারপর থেকে একবার আসেনি। মাসির বাড়িটা ও না চিনতে পারে কিন্তু খেলার মাঠে গিয়ে দেখা করতে পারত কিন্তু করেনি। স্বপ্নাশিসের মনে হল আহির বাপীর খোঁজ নিতে বলে ভালই করেছে। বাপী না থাকলে তার পক্ষে আহিরের কাছে পৌঁছানো সহজ হত না।

ওদের জীবন ওদের মতনই চলছিল। সেই ভোরবেলায় দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়, আবার দেখা হতে হতে রাত দশটা। অফিস বা খেলার মাঠ থেকে কলেজ করে বাড়ি ফেরে স্বপ্নাশিস। তখন ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। আর সকাল সাড়ে দশটায় বাড়িতে ফিরে ততক্ষণ একদম একা থাকতে হয় আহিরকে। হবিমাধবদার দিদির কাছে কয়েকবার গিয়েছে সে। তিনি বেশি কথা বলার মানুষ নন। অতএব সময় কাটতেই চায় না আহিরের। এর মধ্যে সে একটা অ্যাডভেঞ্চার করেছিল। কলেজ থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়িতে না ফিরে স্টেশনে চলে গিয়েছিল। খালি ট্রেন ধরে নেমেছিল ইছাপুরে। তারপর সেখান থেকে শেয়ারের অটোয় চেপে শ্যামনগরে। মাথায় ঘোমটা টেনে একটা রিকশায় চেপে ঘুরে এসেছিল বাড়ির সামনে দিয়ে। সেই ভরদুপুরে রাস্তায় লোকজন ছিল না। পাড়ার দু-একজন পরিচিত মানুষকে দেখতে পেয়েছিল। তারা লক্ষ্য করেনি কেউ ঘোমটা মাথায় রিকশায় বসে তাকে দেখছে কিনা। বাড়ির কেউ অথবা বাপীকে দেখতে পাওয়া যায়নি। বিকেল তিনটের মধ্যে ফিরে এসে খাটে শুয়ে অনেকক্ষণ কেঁদেছিল সে। তারপর নিজের কাছেই পুরো ব্যাপারটা বোকা বোকা বলে মনে হয়েছিল। রাত্রে স্বপ্নাশিস ফেরামাত্র সব কথা বলে দিল সে।

স্বপ্নাশিস অবাক, 'কী হয়েছিল?'

'মানে?'

'হঠাৎ গেলে কেন?'

'জানি না। আগে ভেবে যাইনি। হঠাৎ মনে হল, তুমি রাগ করলে?'

'না। তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও?'

'না।'

'চলো না। প্রথমে বাপীর বাড়িতে যাব। ওকে দিয়ে খবর পাঠাব। ওঁদের যদি আপত্তি না থাকে তা হলে তুমি দেখা করে আসবে।'

'তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করেছ এর মধ্যে?'

'না। মিছিমিছি অপমানিত হবার কোনও মানে হয় না।'

'আমারও একই কথা। আজ আমাকে নিশ্চয়ই পেত্নীতে ভর করেছিল। কথা দিচ্ছি আর কখনও এমন কাণ্ড ঘটবে না।'

রবিবার সকালে সুব্রত এল। সপ্তাহে ওই একদিন প্র্যাকটিসে যায় না। সুব্রত এসে বলল, 'স্বপ্ন, তোকে কিরকম লোক লোক দেখাচ্ছে।'

'মানে?'

'বেশ বয়স্ক। বিয়ে-থা করলে বোধহয় এমন হয়।'

'গিয়েছিলি?'

'ইয়েস।' আহিরের দিকে তাকাল সুব্রত, 'তোমার বাবা বাড়িতে ছিলেন না। সম্ভবত তোমার মা দরজা খুলেছিলেন। তাঁর হাতে তোমাদের ঠিকানা লেখা কাগজটা দিলাম। উনি দেখলেন, কিছু বললেন না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিছু বলতে হবে?' উনি বললেন, 'না।' আমি চলে এলাম।'

'বাপীর দেখা পেয়েছেন?' আহির জানতে চাইল।

'হ্যাঁ। আপনি ওকে আপনার বন্ধু বলেছিলেন?'

'নিশ্চয়ইই।'

'সে কী বলল জানেন? আমি যদি ইচ্ছে করতাম তাহলে নিজেই ওদের সঙ্গে দেখা করে আসতাম। সেটা যখন করিনি তখন ওদের বোঝা উচিত ছিল আমার কোনও ইচ্ছে নেই। ওরা ভাল থাকুক, ব্যস।'

'এ কথা বলল বাপী?' আহির বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'ইয়েস ম্যাডাম।'

'এত সাজিয়ে এইসব কথা বাপী বলতেই পারে না। ও হইহই করা ছেলে।'

'আমি মিথ্যে বলব কেন?'

'না না তা বলছি না। ওর আবার কী হল?' আহিরকে চিন্তিত দেখাল।

হঠাৎ স্বপ্নাশিস বলল, 'যেদিন তোমার চিঠি নিয়ে ও এসেছিল সেদিনও ওকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। যেন ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করছে।'

সুব্রত বলল, 'ম্যাডাম, আপনি ওকে নিশ্চয়ই বন্ধু বলে মনে করেন কিন্তু ও হয়তো মনে মনে আপনার সম্পর্কে অন্য কিছু ভাবত।'

আহির তীব্র প্রতিবাদ করল, 'অসম্ভব।'

সুব্রত প্রসঙ্গ ঘোরালো। স্বপ্নাশিস দেখল প্রসঙ্গান্তরে গিয়েও আহির খুব সহজ হতে পারছে না। সুব্রত চলে যাওয়ার পর আবার কথা তুলল আহির, 'আমি ভাবতেই পারছি না, জানো।'

'ছেড়ে দাও তো, সুব্রত কী শুনতে কী শুনেছে!'

'কিন্তু কখনও বাপী সামনে এলে আমি আগের মতো কথা বলতে পারব না।'

বাংলা পূর্বাঞ্চল চ্যাম্পিয়ান হল। পরের খেলার জন্যে দিল্লিতে যেতে হবে। চিন্তায় পড়ে গেল স্বপ্নাশিস। হরিমাধবদার দিদির বাড়িটায় যথেষ্ট নিরাপদে আছে ওরা কিন্তু সে কলকাতার বাইরে গেলে এতবড় শহরে আহিরকে একা থাকতে হবে। তখন যদি কিছু হয়? রাস্তাঘাটে অ্যাকসিডেন্ট হলে—! স্বপ্নাশিস আহিরকে বলেছিল ওই কয়েকদিন মাসির বাড়িতে থাকতে। মাসির সঙ্গে যদিও এখন নিয়মিত যোগাযোগ নেই, সময়ের অভাবেই সেটা হয়েছে তবু ওদের ওই একটা দরজা খোলা রয়েছে। আহির রাজি হয়নি। মাসির বাড়িতে এমনি যেতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু স্বপ্নাশিস নেই বলে প্রয়োজন হয়ে পড়ায় তাঁর বাড়িতে গিয়ে থাকতে ওর একটু ভাল লাগবে না। আহির জেদ করে বসে আছে, সে একাই থাকবে। পরীক্ষা এসে যাচ্ছে। একা থাকতে তার কোনও অসুবিধে হবে না।

দিল্লি রওনা হওনা তিনদিন আগে মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল স্বপ্নাশিসের। সে দেখল আহির বিছানায় বসে কাঁদছে। মাঝে মাঝে ককিয়ে উঠছে। ধড়মড়িয়ে উঠল স্বপ্নাশিস। দুহাতে আহিরের কাঁধ আঁকড়ে ধরে প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে? এই?'

'কিছু না।' কান্না চাপতে চেষ্টা করল আহির।

'কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে।'

হঠাৎ স্বপ্নাশিসের কাঁধে মাথা গুঁজে শব্দ করে কেঁদে উঠল আহির, 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না।' স্বপ্নাশিস শক্ত হয়ে গেল। এতদিন, এতদিন পর ভেঙে পড়ল আহির? বাবামাকে ছেড়ে এইভাবে একা থাকার লড়াইতে হেরে গেল? সে নিচু গলায় বলল, 'তুমি কি শ্যামনগরে যেতে চাও?'

'না।' ত্রস্তে বলে উঠল আহির।

'তা হলে শক্ত হও। এভাবে ভেঙে পড়ছ কেন?'

'তোমার শ্যামনগরের কথা মনে হচ্ছে কেন' দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞাসা করল আহির। এবং তখনই স্বপ্নাশিসের খেয়াল হল। আহির কোনও শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পারার কথা বলছে। সে ওকে শুইয়ে দিতে চাইল কিন্তু আহির আপত্তি করল, 'শুতে পারছি না। শুলে যন্ত্রণা বেড়ে যাচ্ছে।'

'কোথায় হচ্ছে যন্ত্রণা? পেটে?'

'হ্যাঁ। উঃ, মাগো।'

বাড়িতে ডিসপিরিন আছে। সেটা মাথার যন্ত্রণা সারায়, পেটের বেলায় কাজ করে কিনা জানা নেই। কিন্তু স্বপ্নাশিসের মনে হল কিছুটা কাজ হলেও হতে পারে। এত রাত্রে কোথায় ডাক্তার পাবে? সে ডিসপিরিন আর জল এনে দিল। আহির সেটা খেল। কিন্তু তার যন্ত্রণা কমছিল না। আহিরের মুখ নীল হয়ে গেছে। অথচ সে কিছুই করতে পারবে না। আহির তার জীবন, তার সব। আহিরের সুখে তার সুখ কষ্টে—। হঠাৎ মনে হল এই কথাগুলো ভাবা যত সহজ বাস্তবে তা নয়। যে কষ্ট এখন আহির পাচ্ছে তার দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া সে কিছুই করতে পারছে না। আহির বাথরুমে যাবে। ধরে ধরে তাকে দরজা পর্যন্ত নিয়ে যেতেই আহির বলল, 'তুমি ছেড়ে দাও।'

'দরজা বন্ধ করতে হবে না।'

'অসম্ভব।'

'না। তুমি পড়ে যেতে পারো।'

'ওঃ। দোহাই, আমাকে চেঞ্জ করতে হবে।'

শিথিল হয়ে গেল স্বপ্নাশিস। আহির দরজা বন্ধ করল। এটা তা হলে মেয়েলি ব্যাপার। মাসের কয়েকটা দিন আহির নিজেকে গুটিয়ে রাখে। তখন গায়ে হাত দিতেও দেয় না। স্বপ্নাশিস মেনে নিয়েছিল। মেয়েলি ব্যাপারটা সম্পর্কে তার কোনও ধারণা ছিল না, আগ্রহও নেই। গত মাসে ওই চারদিন কলেজে যায়নি সে। জিজ্ঞাসা করলে বলেছিল, ব্লিডিং বেশি হচ্ছে। সে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা বললে আহির হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল, 'যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না তো!' জন্মাবধি বাড়িতে কোনও মহিলাকে সে দেখেনি। কেলোর মা শুধু দুবেলা আসাযাওয়া করেছে। মহিলাদের এই সমস্যা তার অজানা। স্বপ্নাশিস একবার ভাবল হরিমাধবদার দিদিকে ডেকে নিয়ে আসবে কিনা। এত রাত্রে ওঁকে বিব্রত করতে সঙ্কোচ হল। তা ছাড়া এতে আহিরও অসন্তুষ্ট হতে পারে।

সারারাত যন্ত্রণা আর জেগে থাকায় কাটল। সকালে আলো ফুটতেই ডাক্তারের কাছে ছুটে যাচ্ছিল স্বপ্নাশিস, আহির বাধা দিল, 'কোন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছ?'

'মোড়ের মাথায় একজন বসেন, খুব ভিড় হয় দেখেছি। ওই বাড়িতেই থাকেন উনি।'

'না না। যাওয়ার দরকার নেই, আপনিই ঠিক হয়ে যাবে।'

'অসম্ভব। আমি তোমার আপত্তি আর শুনছি না।'

'তা হলে কোনও গাইনির কাছে যাও।'

'গাইনি?' হকচকিয়ে গেল স্বপ্নাশিস।

'এই অসুখ সম্পর্কে ওঁরাই ভাল জানেন।'

সকালবেলায় কিছুটা খোঁজাখুজির পর একজন গাইনোকালজিস্টের কাছে পৌঁছাতে পারল সে। স্বপ্নাশিষের মুখে যতটা সে জানে শোনার পর ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'এর আগে যখন এমন হয়েছে তখন কী ওষুধ খেতেন উনি?'

'আমি জানি না। কখনও এমন কষ্ট পেতে দেখেনি আমি। আপনি একবার চলুন।'

স্বপ্নাশিস পরে বুঝেছে সে সেদিন অকস্মাৎই একজন ভাল মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। ডাক্তার হিসেবে কল্যাণ দত্তের নাম যতটা ঠিক ততটাই বদনাম চোখা চোখা কথা বলার জন্যে। পান থেকে চুন খসলে সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু মানুষ হিসেবে লোকটা খুবই ভাল।

আহিরকে দেখেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাড়ির আর সব কোথায়?'

আহির শুয়েছিল বিছানায়। চোখ বন্ধ করল। স্বপ্নাশিস বলল, 'আমরাই থাকি এখানে।'

'তোমাদের যা বয়স তাতে তো একসঙ্গে থাকার কথা নয়, বিয়ে করেও নয়। কী করো তুমি?'

'চাকরি করি আর পড়ি। ক্রিকেট খেলি।'

'বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে আছ?'

'না। বাড়িকে জানিয়েই বিয়ে করেছি।'

'হুম্। কি জানো।' আহিরের পাশে গিয়ে বসলেন তিনি।

কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর ডাক্তার দত্ত ভাবলেন, 'এখন ও অসুস্থ। আগে যন্ত্রণা কমুক, ব্লিডিং বন্ধ হোক। আমি ওষুধ লিখে দিচ্ছি, ঠিকঠাক খাওয়াবে। আর একদম বেড রেস্ট। কিন্তু এতেও যন্ত্রণা না কমে ইঞ্জেকশন দিতে হবে। বাড়িতে আর কেউ নেই?'

'না।'

'দেখো আজকের দিনটা।' ডাক্তার উঠলেন, 'একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি করানো দরকার।'

অফিসে যাওয়ার প্রশ্নই নেই যদিও আহির খুব জেদ করেছিল, সে একাই থাকতে পারবে। খবর পেয়ে হরিমাধবদার দিদি এলেন। তাঁকে কিছু না জানানোর জন্যে অনুযোগ করলেন। স্বপ্নাশিস ওষুধ আনল কিন্তু সারাদিনেও তেমন পরিবর্তন দেখা গেল না। চারটের সময় সে ডাক্তারের বাড়িতে গিয়ে খবরটা দিতেই তিনি সোজা গাড়ি নিয়ে চলে এলেন স্বপ্নাশিসকে পাশে বসিয়ে। বললেন, 'তুমি কী রোজগার করো জানি না কিন্তু ওকে আমি এখনই নার্সিং হোমে নিয়ে যাচ্ছি। তেমন বুঝলে কাল ছেড়ে দেব কিন্তু আজ সারারাত তোমার মত আনাড়ির সামনে শুয়ে মেয়েটা কষ্ট পাক আমি চাই না।'

আহিরের প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও তাকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হল। রাত দশটায় বাড়ি ফেরার সময় স্বপ্নাশিস জানতে পারল আহির ঘুমোচ্ছে। ঘুম যখন এসেছে তখন শরীরের যন্ত্রণা নিশ্চয়ই তীব্র নেই। হরিমাধবদা খবর পেয়ে এসেছিলেন নার্সিং হোমে। কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'নার্ভাস হবার কিছু নেই। শরীর থাকলেই অসুস্থ হবে। চল, আমার ওখানে থেকে রাতের খাওয়া খেয়ে বাড়ি ফিরবি।'

যেতে যেতে হরিমাধদা বললেন, ' শোন স্বপ্ন, কাল যদি সব ঠিক হয়ে যায় তা হলে অন্য কথা নইলে ওর বাবা-মাকে খবর দিবি।'

স্বপ্নাশিস চুপ করে রইল। হরিমাধবদা বললন, 'ব্যাপারটা তোর একার পক্ষে সামলে নেওয়া হয়তো সম্ভব হবে না। তা ছাড়া কদিন পরেই দিল্লি যাবি। আজ প্র্যাকটিস হল না তোর। এরকম করলে দিল্লি যেতেই পারবি না।'

'আহির সুস্থ না হলে আমি কোথাও যাব না।' শক্ত গলায় বলল স্বপ্নাশিস।

'তার মানে? ওর যদি সুস্থ হতে দশদিন লাগে তুই দিল্লির ম্যাচ খেলবি না?'

'আমি খেলতে পারব না।'

'ওহো, স্বপ্ন! তুই নিজেকে শক্ত কর। দিল্লিতে তোকেই খেলতেই হবে। জোনাল ম্যাচে যত ভালই খেলিস নির্বাচকদের নজরে পড়বি না। এখন থেকে প্রতিটি খেলা তোর কাছে ইম্পর্ট্যান্ট।'

'আমি সব জানি। কিন্তু তার থেকে ইম্পর্ট্যান্ট ওর পাশে থাকা।'

রাত এগারোটায় ঘরে ফিরে প্রচণ্ড কান্না পেল স্বপ্নাশিসের। চারধার নিস্তব্ধ, এই ঘরে আহির নেই অথচ আহিরের ব্যবহৃত সব জিনিষ চারপাশে ছড়িয়ে আছে। জীবনে প্রথমবার তার নিজেকে একদম একা বলে মনে হতেই কান্নাটা তীব্র হল।

পরদিন সকালে আহির অনেকটা সহজ। দেখা হতেই বলল, 'বাড়ি যাব।'

মন ভাল হয়ে গেল স্বপ্নাশিসের। পাশে বসে বলল, 'কষ্ট আর নেই?'

'না। একদম না। এখানে আর থাকার দরকার নেই। তুমি আজ প্র্যাকটিসে যাওনি কেন? এটা খুব অন্যায়।' চোখ পাকাল আহির।

নার্সিং হোম থেকে সোজা ইডেনে চলে গেল সে। ম্যানেজারকে আহিরের অসুস্থতার কথা জানাল। ভদ্রলোক বললেন, 'মুশকিলে ফেললে। কাল থেকে প্রাকটিসে আসছ না। বিকেলে এসো। নইলে এ নিয়ে কথা উঠবে।'

মাঠ থেকে সোজা ডাক্তারের চেম্বারে। বেলা একটায় তিনি ভেতরে ডাকলেন। দেখা হওয়া মাত্র বললেন, 'তেমন কোনও ভয় নেই। আমি সমস্ত রিপোর্ট পেয়ে গেছি। কতদিন বিয়ে হয়েছে?'

'চারমাস।'

'মাইগড! শোন, আহিরের ইউটেরাসে দুটো বড় টিউমার রয়েছে। পিরিয়ডের সময় বেশি ব্লিডিং এবং যন্ত্রণা ওর আগেও হত, হয়তো এবারের মতো মারাত্মক হয়নি। মোটের ওপর, ও ব্যাপারটাকে এতদিন আমল দেয়নি। এই টিউমার রিমুভ করা দরকার, এখনই।'

'তাতে কোনও ভয় নেই।'

'না। জলের মতো সহজ ব্যাপার। অপারেশনের পর সপ্তাহ তিনেক বিশ্রাম নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ওর জীবন বাঁচবে।' ডাক্তার দত্ত হঠাৎ গলা নামালেন।

'কীরকম খরচ হবে?'

'খরচ? তুমি এখন খরচের কথা চিন্তা করছ? খরচ যাই হোক, ধার করেও ওকে তুমি বাঁচাতে চেষ্টা করবে না? কি? জবাব দাও?' খেপে গেলেন ডাক্তার দত্ত।

'নিশ্চয়ই।'

'গুড। সমস্যা হল, তোমাদের কোনও সন্তান হয়নি। ইউটেরাস বাঁচিয়ে ওই টিউমার দুটো রিমুভ করা যায়। কিন্তু বায়োপসি রিপোর্টে খারাপ কিছু পেলে দ্বিতীয়বার অপারেশন করতে হবে। সেই ধকল মেয়েটা সামলাতে পারবে কি না জানি না, খরচও দ্বিগুণ হয়ে যাবে।' ডাক্তার দত্তকে আবার চিন্তিত দেখাল।'

'বায়োপসি রিপোর্টে খারাপ মানে কী?'

ডাক্তার দত্ত বললেন, 'আমাদের শরীরে ক্যানসারের আশ্রয়স্থল হল টিউমার। সব টিউমারই যে ক্যানসারের বাসা তা নয়। নিরীহ টিউমারের সংখ্যাই বেশি। মেয়েদের ইউটেরাস এবং কিছুটা ব্রেস্টে টিউমার হলে এবং তাতে যদি ক্যানসারের বাসা থাকেও, বাদ দিলে বাকি শরীরটা বেঁচে যায় কারণ ওগুলোকে সহজেই আলাদা করা সম্ভব। গলা বুক পেটের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়। ইউটেরাসে ক্যানসার হলেও প্রাথমিক অবস্থায় অপারেশন করায় অনেকেই দীর্ঘজীবী সুস্থ থাকেন। কিন্তু এর ফলে মেয়েদের বাচ্চাধারণ করার ক্ষমতা থাকে না। যদি দেখি ওকে বাঁচাতে এ ছাড়া উপায় নেই তা হলে সেজন্যে তোমাকে তৈরি থাকতে হবে।'

'আমার বাচ্চার কোনও দরকার নেই। ওকে বাঁচিয়ে দিন।'

'শাবাশ।'

বিকেলে নার্সিং হোমে ঢুকতেই মাসির সঙ্গে দেখা। তিনি স্বপ্নাশিসের বাড়িতে গিয়েছিলেন অনেকদিন কোনও খবর না পেয়ে। সেখানে হরিমাধবদার দিদির কাছে জেনে ছুটে এসেছেন নার্সিং হোমে। স্বপ্নাশিস কেন তাঁকে কিছু জানায়নি এই প্রশ্ন করে রাগারাগি করলেন। স্বপ্নাশিস বলল, 'আমার মাথার ঠিক নেই মাসি।'

'কেন? ডাক্তার কী বলেছে?'

স্বপ্নাশিস জানাল। মাসি ওর হাত ধরলেন, 'কেন লোকে ভগবানকে দয়ালু বলে জানি না, আমি তো সারাজীবন ধরে তাঁকে নির্মম হয়ে থাকতে দেখলাম। আহির জানে?'

'না।'

'ওর বাবা-মা?'

'আহির খবর দিতে নিষেধ করেছে।'

'ঠিক আছে, সেটা আমি বুঝব। দ্যাখ স্বপ্ন, আমার তো বাচ্চা নেই, তাই না?'

'মাসি, আমি বলেছি শুধু আহিরকে সুস্থ করে দিতে, আর কিছু চাই না।'

ওরা দুজনে আহিরের কাছে গেল। আহির বিছানায় বসেছিল। এখন ওকে অনেক তাজা দেখাচ্ছে। মাসিকে দেখে বলল, 'ওমা, আপনাকেও টেনে এনেছে। দেখুন না, সামান্য ব্যাপার নিয়ে কিরকম ঝামেলা পাকাল। আমি এখন ঠিক হয়ে গেছি।'

ডাক্তারবাবু এলেন সন্ধে নাগাদ। বললেন, 'মা, একটা ছোট্ট অপারেশন করতে হবে। একটুও কষ্ট পাবে না। তবে তার আগে আরও কয়েকটা টেস্ট করতে চাই।'

'অপারেশন?' মুখ গম্ভীর হয়ে গেল আহিরের।

'হ্যাঁ। টিউমার তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে। ওটা বাদ দিতে হবে।'

'না বাদ দিলে হয় না?'

'না। তুমি আজ বাড়ি চলে যাও। কী কী টেস্ট করাতে হবে লিখে দিচ্ছি। দিন দশেক বাদে আবার এখানে আসবে।'

'একটু পরে করলে হয় না? ও দিল্লিতে যাবে রনজি ট্রফি খেলতে?'

'তাই নাকি?' ডাক্তার দত্ত স্বপ্নাশিসের দিকে তাকালেন, 'তুমি ক্রিকেট খেলো বলেছিলে কিন্তু ওই লেভেলে খেলো তা তো বলোনি। ঠিক আছে, তুমি ফিরে এলেই হবে তবে এর মধ্যে টেস্টগুলো করাতে হবে। ইনি?'

স্বপ্নাশিস বলল, 'আমার মাসি।'

'নমস্কার। আমি ভেবেছিলাম দুকুল বিসর্জন দিয়ে তোমরা স্বয়ম্ভু হয়ে আছ। আপনি যখন আছেন তখন চিন্তা নেই।'

'আপনি লিখে দিন কী করতে হবে। তবে আমি সাউথে থাকি, ওখানে করাব। তাতে আমায় সুবিধে। ওকে আমার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

'না-না।' আহির আপত্তি জানাল।'

'চুপ কর। আর পাকামো করতে হবে না। এতদিন ধরে রোগটা পুষে রেখেছিস কেন? তখন মনে ছিল না।' মাসি ধমকে উঠলেন।

স্বপ্নাশিস স্বস্তি পেল। মাসি জোর করেই আহিরকে নিয়ে গেলেন। নার্সিং হোম থেকে ছাড়ার আগে ডাক্তার দত্ত ওকে পরীক্ষা করলেন। বেরিয়ে এসে বললেন, 'আর দেরি করা উচিত হবে না। ভেবেছিলাম ইউটেরাস বাঁচাতে পারব, কিন্তু মনে হচ্ছে সেটা সম্ভব নয়। তাছাড়া—।' মাসির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও তো থাকছে না। আপনি একবার সরোজ গুপ্তর সঙ্গে দেখা করবেন। ডাক্তার গুপ্ত খুব ভাল মানুষ। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। ওঁকে একবার দেখিয়ে নিন।' তারপর স্বপ্নাশিসের কাঁধ চাপড়ে বললেন, 'যাও হে, খবরের কাগজে তোমার খবর পড়তে চাই। সেটাই হবে আমাদের ইন্সপিরেশন।'

যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু আহিরের চাপে রাজি হতে হল। মাসির বাড়িতে যাওয়ার আগের রাত্রে আহির বলল, 'এই তোমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাতে দেবে?'

বুক কেমন টাটিয়ে উঠল স্বপ্নাশিসের। এ ভাবে কখনও বলে না আহির।

চার দেওয়ালের মধ্যে আলো তেমন নেই। বিছানায় ওরা পাশাপাশি শুয়ে। স্বপ্নাশিস হাত বাড়াল। আহির মাথা রাখল তার বুকে, 'তুমি আমাকে খুব ভালবাস, না?'

স্বপ্নাশিস জবাব দিল না। আহির বলল, 'উত্তর দিচ্ছ না যে!'

'তুমি তো জানো।'

'তোমাকে তা হলে দিল্লিতে গিয়ে সেঞ্চুরি করতে হবে। করবে তো?'

'কেউ ইচ্ছে করলেই করতে পারে?'

'তুমি পারো। আমার কথা ভাবলেই পারবে।'

স্বপ্নাশিস দুহাতে মুখটা আঁকড়ে ধরতেই ভেতরটা কেঁপে উঠল।

আহির বলল, 'আমার কিছু হবে না। দেখো। কত মানুষের তো সন্তান হয় না, আমার না হলে তুমি কি খুব কষ্ট পাবে?'

'মোটেই না। আমার কিছুই চাই না, শুধু তুমি ভাল থাকো।'

'আমি ভাল থাকবই।'

সেই রাত্রে দুটো শরীর একত্রিত অথচ শরীর উত্তাপহীন। শরীর থেকে উঠে আসা অনুভূতি একাকার হয়ে আনন্দ, শঙ্কায় মিলেমিশে এক অন্য জগৎ তৈরি করে দিয়েছিল। স্বপ্নাশিসের মনে হচ্ছিল যে যদি কোনও জাদুতে আহিরের রক্তে মিশে গিয়ে ওর শরীরটাকে সমস্ত রোগমুক্ত করতে পারত। আর আহিরের চোখ বন্ধ করে দেখছিল হাজার হাজার মানুষের হাততালির জবাবে স্বপ্নাশিস ব্যাট তুলে মাথা নোয়াচ্ছে।

খবরের কাগজে বেরিয়েছিল স্ত্রীর কঠিন অসুখের জন্যে প্র্যাকটিসে না আসতে পারা সত্ত্বেও স্বপ্নাশিসকে দিল্লিতে যেতে দেওয়া হল। সন্তোষ বাজপেয়ী যে এ ব্যাপারে প্রভাব খাটিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে এরকম হলে দল থেকে বাতিল করে দেওয়া হবে বলে সতর্ক করা হল।

খবরের কাগজ নামিয়ে রেখে পিতৃদেব দেবাশিসকে ডাকলেন, 'তোমার ভাই-এর স্ত্রীর নাকি কঠিন অসুখ হয়েছে। তুমি জানো?'

'না। আপনি নিষেধ করেছেন যোগাযোগ রাখতে।'

'হুম্। বিয়ে করতে না করতে ঠেলা টের পাচ্ছে। বিয়ে করে আলাদা সংসার পেতেছে, কত ধানে কত চাল নিশ্চয়ই বুঝে গেছে এতদিনে। আমার কী?'

'মাসি হয়তো খবর জানেন।'

'আমার জানার দরকার নেই।'

কিন্তু সেই সকালেই একটা ট্যাক্সি এসে থামল বাড়ির সামনে। একজন প্রৌঢ়া মহিলা ঘোমটা মাথায় নামলেন ট্যাক্সি থেকে। সঙ্গে একটি যুবক।

দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি স্বপ্নাশিসের বাবা?'

'ছিলাম। আপনি?'

'আমি আহিরের মা। ওর কী হয়েছে?'

'উত্তরটা আপনি যেমন জানেন না আমারও জানা নেই।'

'ওরা কোথায় আছে?'

'বসুন। হ্যাঁ, সেটাও আমি জানি না।'

'আপনার ছেলে—?'

'মেয়ে তো আপনারও।'

'কাগজে দেখলাম আহির খুব অসুস্থ।'

'ওর বাবা খবরটা দেখেননি?'

'তিনি এখন শয্যাশায়ী।'

'ও। দেখুন, আমার ছেলে আমাকে অস্বীকার করে আপনার মেয়েকে বিয়ে করেছে। আমি তারপর থেকে তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।'

'আপনারা, পুরুষরা, একই ধাতুতে গড়া। আপনার স্ত্রী বেঁচে থাকলে—! ঠিক আছে, আপনি জানেন না, সে কোথায় আছে?'

'না।'

'আপনার ছেলের এক মাসি আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তাঁর ঠিকানাটা জানতে পারি কি?' আহিরের মা উঠে দাঁড়াল।

'তিনি যখন গিয়েছিলেন তখন তাঁর প্রস্তাব মেনে নেননি কেন?'

'কারণ আমাদের বাড়িতে আপনার ডুপ্লিকেট আছে।'

'ইমপসিব্‌ল। আমার ডুপ্লিকেট? ফাজলামি!'

'আপনি অনুগ্রহ করে একটু ভদ্রভাবে কথা বলুন। ওঁর ঠিকানা পাওয়া যাবে?'

এইসময় পাশে দাঁড়ানো যুবক বলল, 'ছেড়ে দিন কাকিমা। স্বপ্নাশিসের কোচ হরিমাধববাবুর কাছে চলুন। দেশপ্রিয় পার্কে গেলে ওঁর খবর পাব।'

মাথা নাড়লেন মহিলা, 'আমার মেয়ে অসুস্থ, সত্যি তো, আপনার কী!'

'এতদিন যেন মেয়ে সম্পর্কে আপনার কত আগ্রহী ছিলেন। ঠিক আছে, ওর মাসির ঠিকানা দিচ্ছি কিন্তু তাই বলে তাবা যেন মনে না করে আমি খুব পুলকিত হয়ে দিলাম।'

দিল্লির কোটলাতে টসে জিতে বাংলা ব্যাট নিল। প্রথম বলটার মুখোমুখি হয়েই স্বপ্নাশিস বুঝতে পারল আজ তার দিন নয়। বল যেভাবে বাঁক নিল সে ধরতেই পারে নি। মনের উপর যে গভীর চাপ তা কিছুতেই সরাতে পারছিল না। দুটো বল সে কোনওমতে ঠেকাল। চতুর্থ বলটার গতি সে বুঝতেই পারেনি। কপালেজোরে আধ ইঞ্চির জন্যে উইকেট ভাঙল না তার। পঞ্চম বলটা তার ব্যাটের কোণে লেগে থার্ড স্লিপে ক্যাচ উঠল কিন্তু তার আগেই আম্পায়ার নো ডেকেছিলেন বলে আর একটা ফাঁড়া গেল। নো ডাকটা তার কানে পৌঁছয়নি। শেষ বলের আগে সোজা হয়ে দাঁড়াল। না, এ ভাবে সে হারবে না। পাঁচবার তাকে যেমন ইচ্ছে নাচিয়েছে বোলার। দিল্লির খেলোয়াড়রা বুঝতে পেরে গেছে যে কোনও মুহূর্তে সে উইকেট ছুড়ে দিয়ে যাবে। কিন্তু সে হার মানবে না। আহির তাকে বলেছে সেঞ্চুরি করতে। পারুক না পারুক চেষ্টা তো করা উচিত। অপারেশন থিয়েটারে যাওয়ার আগে ওইটেই আহিরের একমাত্র ইচ্ছে। ষষ্ঠ বলটা প্রচণ্ড জোরে মারল সে। মিড অফ-এর উপর দিয়ে সোজা চার। এরকম একটা মার আশা করেনি বোলার। কোমরে হাত রেখে স্বপ্নাশিসকে দেখে নিল।

একটা মারকুটে ইনিংস খেলল স্বপ্নাশিস। চল্লিশ বলে ষাট রান। মোট ওভার তখন আট। ষাট রানের মাথায় তার মনে হল ডক্টর সরোজ গুপ্তের কাছে মাসির যাওয়ার কথা ছিল, তিনি কী বললেন না জানা পর্যন্ত স্বস্তি হবে না। এল বি ডব্লু হয়ে গেল স্বপ্নাশিস। মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল সে ক্রিজ থেকে। দিল্লির খেলোয়াড়রা হাততালি দিচ্ছে। ম্যানেজার বলল, 'ওয়েল ডান।' স্বপ্নাশিস মনে মনে বলল, 'হেরে গেলাম আহির, তোমার অনুরোধ রাখতে পারলাম না।'

বাংলা অল আউট হল দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের আগে দুশো সত্তর রানে। দিল্লির পক্ষে এ রান তোলা জলভাত। সেদিনের কাগজগুলো লিখেছেন, 'বাংলার নবীন ওপেনার স্বপ্নাশিস নড়বড়ে শুরু করার পর রাজত্ব করেছেন। এটা যদি তাঁর ধরন হয় তা হলে প্রতিবার ভাগ্য তাকে দ্বিতীয় ওভার শুরু করতে সাহায্য করবে না।' দ্বিতীয় দিন শেষ হল দিল্লির চার উইকেটে একশো সত্তর

রানে। সেই রাত্রে বৃষ্টি নামল। পরের দিনও তুমুল বৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত কোশেন্টে বাংলা জিতে গেল। রাজধানী এক্সপ্রেসে ওরা হাওড়ায় পৌঁছাতেই প্রচুর অভিনন্দন, মালা। সন্তোষ বাজপেয়ী বললেন, 'শুনেছি তুমি খুব অন্যমনস্ক হয়ে ব্যাট করেছ। তোমার স্ত্রী কেমন আছেন?'

'জানি না। আমি এখনই যেতে চাই ওর কাছে।'

'তোমার কি টাকাপয়সা লাগবে?'

'দেবেন আমাকে? ওর অপারেশন হবে। আপনার কাছে যেতাম আমি!'

'বিকেলে এসে হাজার দশেক নিয়ে যেয়ো।'

মাসির বাড়িতে পৌঁছে দরজা বন্ধ দেখে বুক ছ্যাঁত করে উঠল। পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলা বললেন, 'উনি নার্সিং হোমে গিয়েছেন। শ্যামবাজারে।'

'জিনিসপত্র ভদ্রমহিলার কাছে রেখে সে ছুটল পাতাল রেল ধরতে। ডাক্তার দত্তের নার্সিং হোমে পৌঁছে স্বপ্নাশিস দেখল মাসি আর একজন প্রবীণার সঙ্গে কথা বলছেন। তাকে দেখে এগিয়ে এলেন তিনি. 'কখন এলে?'

'এইমাত্র। আহির কেমন আছে?'

'ভালই। এঁকে প্রণাম করো, আহিরের মা।'

স্বপ্নাশিস স্থির হল। আহির জানে? শেষপর্যন্ত দ্বিধা কাটিয়ে প্রণাম করল। ভদ্রমহিলা ঠোঁট কামড়ালেন, 'কী বলব! এ ভাবে কেউ যেন তার জামাইয়ের দেখা না পায়!'

স্বপ্নাশিস বুঝল ভদ্রমহিলা একাই এসেছেন। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আহির কী করছে?'

'শুয়ে আছে। তোমার সঙ্গে কথা আছে বাবা।' ভদ্রমহিলা বললেন।

স্বপ্নাশিস তাকাল।

'আমার মেয়েকে তুমি খুব ভালবাস, না? যে কদিন ও আছে, সেই কদিন ওর মন আনন্দে ভরিয়ে দিতে পারবে?' ভদ্রমহিলা কেঁদে ফেললেন।

মাসি বললেন, 'ছিঃ। একী বলছেন?'

স্বপ্নাশিস বিড়বিড় করল, 'যে ক'দিন আছে মানে?'

মাসি বলল, 'কিছু না রে! উনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন। আহিরের ইউটেরাসে টিউমার হয়েছিল। সেটা তুই জানিস। কিন্তু ডক্টর গুপ্ত পরীক্ষা করে দেখেছেন ওর ব্রেস্টেও টিউমার আছে। এক্সরেতে ধরা পড়েছে!'

'সেকী!' নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল যেন। স্বপ্নাশিস টলছিল।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'ক্যানসার একবার হলে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। উঃ।'

'আপনি আবার ভুল করছেন। আহিরের ইউটেরাসের টিউমারের সঙ্গে ব্রেস্টের টিউমারের কোনও সম্পর্ক নেই। দুটো আলাদা আর জায়গার বাইরে স্প্রেড করেনি। অপারেশন করলেই বিপদ চলে যাবে।'

'অপারেশন কবে হবে?'

'আজ বিকেল তিনটেয়। ডাক্তার দত্ত আর অপেক্ষা করতে রাজি নন। আমি তোর কথা বলেছিলাম। তিনি খোঁজ নিয়ে জেনেছেন আজই তোর ফেরার কথা। বললেন তুই যদি আহিরের ভাল চাস তা হলে আপত্তি করবি না।' মাসি বললেন।

'সবাই খবর পেয়েছে?' ঘসঘসে গলায় জিজ্ঞাসা করল স্বপ্নাশিস।

মাসি বললেন, 'হ্যাঁ। ইচ্ছে হয় আসবে, আমাদের বলা উচিত, বলেছি।'

স্বপ্নাশিস বলল, 'মাসি দশ হাজার টাকার ব্যবস্থা হয়েছে।'

'কী করে পেলি?'

'যে ক্লাবে সামনের বছর খেলব তারাই দিচ্ছে।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'না বাবা। এটা আমাকে করতে দাও। আহিরের বিয়ের জন্যে যত গহনা আমি গড়িয়েছিলাম সেগুলো এনেছি।'

স্বপ্নাশিস কোনও কথা না বলে ভেতরে চলে এল। এখন যাওয়ার সময়ও। কিন্তু আজ আহিরের অপারেশন হবে বলে যাওয়ার অনুমতি পাওয় গেল। আহির শুয়ে বই পড়ছিল। পায়ের শব্দ শুনে মুখ ফেরাল, 'তুমি।'

একশো পদ্মের বিভা ফুটে উঠল সেই মুখে, স্বপ্নাশিষের মনে হল বোধনের দুর্গাঠাকুর দেখছে। এত সুখ পৃথিবীর কোনও মানুষের মুখে দিতে পারেননি ঈশ্বর!

স্বপ্নাশিস শব্দ খুঁজে পেল না। পাশে দিয়ে দাঁড়াল। আহির ওর হাত ধরল, 'স্টেশন থেকে?'

'হ্যাঁ। আমি সেঞ্চুরি করতে পারিনি।'

'কিন্তু তোমার জন্যে টিম জিতেছে।'

'এত খবর রাখো?'

'হুঁ। তোমার জন্যে।'

'কী বই ওটা?'

'জীবনানন্দ দাশ।'

'কোন কবিতা?'

'আমার মনে অনেক জন্ম ধরে ছিল ব্যথা
বুকে তুমি এই জন্মে হয়েছে পদ্মপাতা,
হয়েছ তুমি রাতের শিশির
শিশির ঝরার স্বর
সারাটি রাত পদ্মপাতার পর;
তবুও পদ্মপত্রে এ জল আটকে রাখা দায়। কোন কবিতা বলতে পারো?'

'তোমাকে ভালবেসে?'

'উঃ। দারুণ। কী আনন্দ! আমাকে একটু চুমু দিতে দেবে?'

স্বপ্নাশিস মুখ নামাল। আহির তার গালে ঠোঁট রেখে বলল, 'ভাল কী ভাল। একদিন খুব খারাপ কথা বলেছিলাম। তোমার প্রিয় কয়েকটা লাইন বলবে?'

স্বপ্নাশিস মনে করে বলল, 'একদিন মনে হত জলের মত তুমি!
সকালে রোদে তোমার মুখের থেকে বিভা—'

বাধা দিল আহির, 'তোমাকে।'

স্বপ্নাসিসের মনে হল আহির একটা খেলায় মেতেছে। যে খেলায় মাতলে কিছুক্ষণ সময় ভুলে থাকা যায়। সে গম্ভীর হল, 'আহির তোমার আজ অপারেশন!'

'শুনেছ? আমার সব বাদ দেবেন ডাক্তার।'

'সব। সব কি বাদ দেওয়া যায়?'

'পুরুষরা তো মেয়েদের সর্বস্ব বলতে এই বোঝে?'

'সেসব পুরুষের ছায়া খুব কালো।'

'কী দারুণ বললে। তুমি ক্রিকেট ছেড়ে কবিতা লেখো।'

'ক্রিকেটের বর্ণনায় অনেকে কবিতা লেখে।'

'যাকগে। আমি যদি মরে যাই?'

'সূর্য যদি পশ্চিমে ওঠে!' হাসল স্বপ্নাশিস।

'এত জোর কী করে পাও?' আহির বলল, 'আমি ডাক্তার দত্তকে জিজ্ঞাসা করেছি। উনি বলেছেন অপারেশন ঠিক হলে অন্তত পাঁচ সাত বছরের জন্যে নিশ্চিত। স্বপ্ন, আমি আরও পাঁচ বছর তোমাকে পেতে চাই। পাঁচ বছর আমার পাঁচজন্মের আনন্দ। তুমি আমাকে ভালবাসবে?'

'হঠাৎ এই প্রশ্ন?'

'আমি তো আর নারী থাকব না!' চোখ উপচে জল গড়িয়ে এল। স্বপ্নাশিসের মনে হল অনেক রক্ত জলের ফোঁটা হয়ে যাচ্ছে।

'অঙ্গ যেখান থাকবে সেখানে প্রত্যঙ্গ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?' আমি তোমাকে চাই। এই মুখ, এই হাসি, এই কথা, ব্যস এইটুকু। পৃথিবীর কোটি কোটি নারীর ইউটেরাস অথবা বুকের সঙ্গে তোমার পার্থক্য আমি করতে পারব না কিন্তু পৃথিবীর কোনও মানুষীর মুখ তোমার মুখকে আড়াল করতে পারবে না।'

'তুমি ঠিক বলছ।'

'ঠিক।'

'তিনবার বলো।'

'ঠিক ঠিক ঠিক।'

অপারেশন থিয়েটারের দরজায় লাল বাতি জ্বলছে।

সময় দীর্ঘতর হচ্ছে। মাসি এবং আহিরের মা পাশাপাশি বসে সেই দরজার দিকে তাকিয়ে। নার্সিং হোমের এই ঘরে এখন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো কিছু মানুষ। এঁদের কেউ হয়তো আহিরের বাবা কিংবা তার পিতৃদেব অথবা দাদা। কেউ কোনও কথা বলছে না। শুধু সময় চলে যাচ্ছে। নিঃশব্দে। যেভাবে আজ আগামিকাল হয়, কাল মহাকালে পৌঁছে যায়।

স্বপ্নাশিস মনে মনে দৌড়ে যাচ্ছিল। এই উইকেট থেকে ওই উইকেট। তার সঙ্গী আহির। ক্রিকেট যেটা নির্দিষ্ট মাপের দূরত্ব, জীবনে তা নয়। তবু দৌড়ে যেতে হয়। দুই ক্রিকেটার পরস্পরকে অতিক্রম করার সময় কথা বলে না কিন্তু আহির তাকে প্রতিবার বলে যাচ্ছে, বলে যাবে যে শব্দটা তাই তার গায়ত্রীমন্ত্র, পাঁচ কিংবা সাত বছরের স্বপ্ন নিয়ে যে মেয়ে বেরিয়ে আসবে অপারেশন থিয়েটার থেকে তাকে দুহাতে আগলে রাখার শপথ নিচ্ছিল স্বপ্নাশিস, সমস্ত বেদনা একত্রিত করে।

অহংকার

আজকাল টালিগঞ্জ পাড়ায় যেতে একদম ইচ্ছে করে না সুব্রতর। অথচ টালিগঞ্জের স্টুডিওগুলোর একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। বেলা বাড়লেই চুম্বকের মতো টানে তাকে ওরা। যৌবনের প্রথম দশটা বছর তার ওখানেই কেটেছে। কিন্তু এখন সেখানে যাওয়ার কথা হলেই বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটু কষ্ট পাক খায়। ভ্যাগাবন্ডের মতো আর স্টুডিওর রাস্তায় ঘুরতে একদম ভালো লাগে না। প্রথম প্রথম যার সঙ্গে দেখা হতো সেই জিজ্ঞাসা করত, 'নেকস্ট ছবি কী?'

মাথা নাড়ত সুব্রত, 'নট ইয়েট সেটলড্।' লোকে হাসত। এখন আর শুধোয় না। আর হাসেও না। সবাই বুঝে গেছে সুব্রত রায় খতম হয়ে গিয়েছে। এখন আড়চোখে কেউ কেউ তাকায়। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, টেকনিসিয়ানরা তাকে দেখতে পেলেই সরে দাঁড়ায়। এমনকি আর্টিস্টরাও। সুতরাং ফালতু ও-পাড়ায় গিয়ে কোনো লাভ আছে?

অথচ ওপাড়ায় যেতেই হবে। এম. এ. পাশ করার পর আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো সে চাকরি খোঁজেনি। চলচ্চিত্র শিল্পকে ভালবেসেছিল তার অনেক আগে থেকেই। দেশ-বিদেশের ফিল্ম সংক্রান্ত বইপত্র যা পেয়েছে, পড়েছে। তারপর যোগাযোগ হয়েছে বিখ্যাত পরিচালক অনীশ ঘটকের সঙ্গে। প্রথাবিরোধী চলচ্চিত্র তৈরি করে অনীশবাবু তখন ভারতীয় চলচ্চিত্রে যুগান্তর এনেছেন। তাঁর দুটো ছবি খুব ভালো চলেছিল। সুব্রতকে পছন্দ হয়েছিল অনীশের। ফলে সহকারী হিসাবে কাজে যোগ দিয়েছিল সে। বইপড়া বিদ্যের সঙ্গে হাতেকলমে শিক্ষা তাকে উজ্জীবিত করেছিল। ছবির জন্যে গল্প নির্বাচন করা থেকে সেটাকে রূপান্তরিত করে শট নেওয়ার মধ্যে অনীশ ঘটকের যে নৈপুণ্য সেটা মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্য করত সুব্রত। কিন্তু বড় খামখেয়ালি ছিলেন ভদ্রলোক। শেষের দিকে কোনো কাজে নিজেকে স্থির রাখতে পারতেন না। অত নাম অত সম্মান সত্ত্বেও কী একটা হতাশা বোধের শিকার ছিলেন তিনি। মানুষটি চট করে মারা যাওয়ার পর সুব্রত বুঝেছিল এই পৃথিবীতে কোনো মানুষ সন্তুষ্ট হয় না, অন্তত যার মধ্যে সামান্য শিল্পীসত্তা আছে সে হতে পারে না। অনীশ ঘটক প্রায়ই বলতেন, 'ছবি করবে মানুষের জন্যে। ছবির বিষয় হবে মানুষের গল্প। যে মানুষ মাটিতে হাঁটে।'

অনীশবাবুকে পছন্দ করতেন একজন প্রযোজক। সুব্রতর প্রথম ছবি তাঁর টাকায় তৈরি। দেশ বিভাগের শিকার এক উদ্বাস্তু পরিবারের গল্প নিয়ে সে ছবি তৈরি। মানুষের কষ্ট, লড়াই-এর ছবি প্রতিটি ফ্রেমে যেন বাঁধাই করেছিল সে। অনীশ ঘটককে যাঁরা ভালবাসতেন তাঁদের হাতে বেশি টাকা থাকত না। ফলে টেকনিসিয়ান বন্ধুদের রাজি করাতে হয়েছিল অনুরোধ করে তার ছবিতে অল্প পয়সায় কাজ করতে। এমন কি বিখ্যাত দুজন শিল্পীকেও সে বেশি পয়সা দিতে পারেনি। পরিচালক হিসেবে সে সামান্য যা পেয়েছিল তাতে কোনো রকমে পেট চলে। প্রযোজকের সঙ্গে চুক্তি ছিল ছবি চললে প্রত্যেককে পাইপয়সা মিটিয়ে দেবেন। কিন্তু ছবি চলল না।

মুক্তি পাওয়ার দিন মোটামুটি ভিড় খারাপ হয়নি। ব্যস. শনিবার থেকে হল ফাঁকা। উদ্গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত সুব্রত হলগুলোর সামনে, কাউন্টারে মাছি তাড়াত। যারা দেখতে যেত তারা বেরিয়ে এসে বলত, 'শালা শুধু অভাব আর অভাব। মাঝে মাঝে কী যে বলল কিছুই মাথায় ঢুকল না, ফালতু পয়সা নষ্ট।' এক সপ্তাহের শেষে ছবিটা উঠে গেল। হলের ভাড়া পর্যন্ত পকেট থেকে মেটাতে হলো। আর বিধ্বস্ত প্রযোজক সেই যে হারিয়ে গেলেন, সুব্রত তাঁর দেখা পায়নি

কোনোদিন। অথচ প্রতিটি খবরের কাগজে প্রশংসা বেরুতো পঞ্চমুখে। অনীশ ঘটকের যোগ্য উত্তরসূরি সে। ছবির কাজের প্রশংসা হয়েছিল অনেকখানি জায়গা জুড়ে। ফিল্ম সোসাইটিগুলো সেই ছবি দেখাতে লাগল তাদের সদস্যদের। কাগজে কাগজে সুব্রত রায়ের নাম বারংবার লেখালেখি হতো। এমন কি, যে কোনো পরিচালকের যা স্বপ্ন, রাষ্ট্রপতি তাঁর ছবিটিকে সেরা ছবি হিসেবে ঘোষণা করলেন।

কিন্তু এত আনন্দ এত সম্মান সত্ত্বেও বুকের মধ্যে সর্বদা রক্তক্ষরণ হতো। জন-সাধারণ তাকে সরাসরি খারিজ করেছে। পুরস্কারের পর প্রদর্শক ছবিটির পুনর্মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন পরিবেশক। কিন্তু তাতেও কাজ হলো না। তার বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাভাবনা বুদ্ধিজীবী মহলেই কদর পেল কিন্তু সাধারণ মানুষকে স্পর্শ করল না।

সুব্রত ভেবেছিল পরের ছবিতে সে এমন বিষয় নির্বাচন করবে যাতে সাধারণ মানুষের পছন্দ হয়। তার নিজেরও মনে হয় এটা আমার বিষয়। কিন্তু চলচ্চিত্র এমন একটা শিল্প, অভিজ্ঞতা কিংবা প্রতিভা থাকলেই ফলপ্রসূ হয় না, লক্ষ লক্ষ টাকার শক্তি পেছনে না থাকলে তুমি শিল্পী হতে পারবে না। একজন লেখক কিংবা ছবি-আঁকিয়ের সঙ্গে একজন চলচ্চিত্র পরিচালকের তফাত এখানেই। অন্যের কৃপায় তার শিল্পীসত্তার বিকাশ ঘটে। সুব্রতর 'স্বপ্ন'-এ কলকাতা তো বটেই মফস্বলের বুকাররাও হাত বাড়ায়নি। বুদ্ধিজীবীরা দেখা হলে প্রশ্ন করেন, 'পরের ছবির বিষয় কী সুব্রতবাবু?' সে ঘাড় নেড়ে জানায় 'দেখি।'

ততদিনে সুব্রত বুঝেছে বুদ্ধিজীবীরা পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে ছবি দেখেন না। বিশেষ শো, প্রেস শো-তে তাঁদের যাতায়াত। যারা ছবির জন্যে পয়সা দেয় সেই জনসাধারণের থেকে তাদেব ফারাক আকাশ পাতাল। সে আশা করেছিল, এত প্রশংসার পর নিশ্চয়ই প্রযোজকরা এগিয়ে আসবেন তার কাছে। সে এবার এমন একটা ছবি করবে যা পৃথিবীর মানুষ বিস্মিত হয়ে দেখবে! বার্লিন থেকে কান, সব কটা ফেস্টিভ্যালের আলোচ্য বিষয় হবে সেই ছবি। কিন্তু তারপরে একটি বছর ঘুরে গেল, কেউ এল না। সে জানে টালিগঞ্জের বেশিরভাগ পরিচালকরা প্রযোজক ধরতে কী রকম আচরণ করেন। নিজেকে অত নিচুতে নামাবার প্রবৃত্তি তার হয়নি কখনো। মাঝে মাঝে বিখ্যাত প্রযোজকদের কাছে সে অনুরোধ জানিয়েছে তাকে ছবি করতে সুযোগ দেবার জন্যে। কিন্তু কেউ রাজি হয়নি।

একটার পর একটা দিন কেটেছে, শেষে বছরও। ক্রমশ প্রশংসার ফুলের মালা শুকিয়েছে। হতাশায় মন ভেঙে পড়েছে। তার উপব আছে আর্থিক দুশ্চিন্তা! দেশের বাড়িতে মা ভাইদের আশ্রয়ে। ভাইরা সাধারণ চাকরি করে সুখে-দুঃখে দিন কাটায়। মায়ের অস্বস্তি তাঁর বড় ছেলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলো না। 'স্বপ্ন' ছবিটার কথা সবাই এখন ভুলে গিয়েছে। তাঁদের ধারণা চলচ্চিত্রের গ্ল্যামারের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে সুব্রত জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। এখনও সময় আছে, চেষ্টা করলে কি একটা মাস্টারি সে জোটাতে পারে না?

মাস্টারি না পাক, কমার্সিয়াল ফার্মে কিংবা খবরের কাগজে ফিল্ম সংক্রান্ত চাকরির চেষ্টা করলে হয়তো পেত সুব্রত। কিন্তু তাতে এতদিনের পরিশ্রম সব বৃথা হয়ে যাবে না? সে পরাজিত হয়ে যদি ফিরেই যায় তাহলে এম. এ. পাশ করেই কেন চাকরি করেনি? তাছাড়া আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো খেয়ে-পরে চাকরি করে মরে যেতে কি সে পৃথিবীতে এসেছে? না; তা আর সম্ভব নয়। তার বুকের ভেতরে, মস্তিষ্কের কোষে যে শিল্প-ভাবনা দিনরাত পাক খায় তার পরিণতি না দেখে সে সরে যাবে না। না, কোনো আপস নয়, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে সংগ্রাম করে যাবে, যে করেই হোক তাকে ভালো ছবি তৈরি করতে হবেই। পৃথিবীতে মহৎ

শিল্পগুলোর পথে গোলাপ ছড়ানো ছিল না। সেইসব শিল্পীদের রক্তাক্ত হতে হয়েছে প্রকাশের সময়। শিল্প কখনও হার মানে না।

সুব্রত যে ঘরটিতে ভাড়া আছে তার বাড়িওয়ালা একটু অন্য ধরনের মানুষ। বাড়ি ভাড়ার জন্যে তিনি তাগাদা করেন না। বলেন, 'লিখে রাখুন। হিসেব বুঝে সুখের দিন এলে মিটিয়ে দেবেন। আপনার এত প্রশংসা করল খবরের কাগজ আর আমি তাগাদা দেব?' কিন্তু বাড়িভাড়া দেওয়াটাই সব নয়। দুবেলা খেতেও পয়সা লাগে। জামাকাপড় আর জুতোও দরকার। মাঝখানে একটা বিজ্ঞাপনের ছবি করে কিছু পয়সা পেয়েছিল সে, তাই দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে! শেষ পর্যন্ত ডিস্ট্রিবিউটার পাড়ায় ঘুরতে শুরু করেছে সুব্রত। ধর্মতলা পাড়ায় বড় বড় ডিস্ট্রিবিউটার আছেন, তাঁদের কাজ শুধু ছবি হলে চালানোই নয়, কেউ কেউ নিজে ছবি করেন, তাঁদের কাছে আবেদন রাখলে কাজ হবে বলে মনে হলো।

গত তিনমাস ধরে দরজায় দরজায় ঘুরে একই কথা নানান ভাষায় শুনেছে সে। যাঁরা খুব ভদ্র তাঁরা বলেছেন, 'না মশাই, বাংলা ছবির বাজার খুব খারাপ। দেখছেন তো কোনো ছবিই চলছে না, এখন নতুন করে ইনভেস্টমেন্ট করা সম্ভব নয়।'

কথাগুলো আপাতত মিথ্যে নয়। এবছরে যেসব ছবি রিলিজ করেছে তাদের ব্যানার সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই খুলে ফেলতে হয়েছে। কিন্তু একটু মিথ্যে আছে। তা সত্ত্বেও এঁরা বাংলা ছবির জন্যে পয়সা দিচ্ছেন। দিচ্ছেন সেই সব পরিচালকের ছবিতে যাদের শেষ ছবি হিট করেছে।

যারা ভদ্রতার ধার ধারে না তারা বলেছে, 'দূর মশাই, আপনাকে দিয়ে কে ছবি করাবে? মাপ করুন। আমার তো মাথা খারাপ হয়ে যায়নি!'

বিব্রত সুব্রত জানতে চেয়েছিল, 'আমার অপরাধ?'

'অপরাধ? না, না, আপনার কেন, অপরাধ আমাদের। আপনি আপনার খ্যাতির জন্যে ছবি করবেন, দেশ বিদেশে নাম হবে আর আমরা ভিখিরী হয়ে সেই ছবি তৈরির জন্যে টাকা দেব না, এটা আমাদের অপরাধ নয়? দেখুন মশাই, আপনি ছবি করবেন আমার টাকায়, আর আমি সেই ছবি নিজের ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে দেখব, এতটা গর্দভ কেন ভাবছেন? পাবলিক আপনাদের মতো আঁতেল ডিরেক্টারের আর্টফিল্ম জীবনে দেখবে না। অথচ আমারই পয়সায় আপনি বিদেশের ফেস্টিভ্যালে নাম কিনবেন, এ তো হতে পারে না। পেয়েছেন ভালো। আপনারা সমস্ত ইন্ডাস্ট্রির সর্বনাশ করছেন।'

সুব্রত বলতে চেষ্টা করল, 'আপনি আগে থেকেই কী করে বুঝলেন ছবি চলবে না!'

'একটা ভাত টিপলেই বোঝা যায় সেদ্ধ হয়েছে কি না। আপনার প্রথম ছবি তো খুব প্রশংসা পেয়েছে, তার প্রযোজকের অবস্থা কী? তার তো ভিটেমাটি চাটি হয়ে গিয়েছে। আপনি লিখে দিতে পারবেন যে আপনাকে দিয়ে ছবি করালে সেই ছবি পয়সা দেবে?'

একটুও ইতস্তত না করে সুব্রত বলল, 'যেসব পরিচালকদের দিয়ে আপনারা ছবি করান তারা লিখে দিতে পারে, আপনার সব কমার্সিয়াল ছবি হিট করে?'

'করে না। কিন্তু তৈরি করার সময় পরিচালকের মতো আমারও মনে হয়, করবে। টাকা ঢালতে তাই আমার সাহস থাকে। কিন্তু আপনাকে দিয়ে ছবি করবার আগেই জানি ওটা জলে গেল, তাহলে মিছিমিছি মাথা গলাতে যাব কেন? নিজের টাকায় ছবি করে দেখুন, বুঝবেন কত ধানে কত চাল।'

ফিরে এসেছিল সুব্রত। তার যদি নিজের টাকা থাকত তাহলে কি অন্যের কাছে হাত পাততো? কত মানুষ তো সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মায়, তারা কি তাকে ছবির জন্যে টাকা দিতে পারে

না? এক বন্ধু বলেছিল, বর্ধমানে একজন বড়লোক ব্যবসায়ী আছেন। তাঁর খুব শখ ছবি করার। এক সকালে গিয়ে দেখা করেছিল সে। লোকটা পেট ভরে খাইয়েছিল। তারপর বলেছিল, 'আমি মোশাই, একটা গপ্পো ফেঁদেছি। সেইটেই করতে হবে।' গপ্পো শুনে চুপচাপ চলে এসেছিল সুব্রত। পঞ্চাশ বছর আগে কোনো বুদ্ধিমান পরিচালকও ওই গপ্পে ছবি করতেন না। ক্রমশ হতাশায় ভেঙে পড়ল সুব্রত। বন্ধুবান্ধবরা পয়সা না দিলে খাওয়া জোটে না। একথা তো স্পষ্ট, চলচ্চিত্র শিল্প এমন মাধ্যম যা অন্যের দয়ায় পালিত হয়। তার ক্ষেত্রে দয়া দেখাবার কেউ নেই। তাকে দেখলেই প্রযোজকরা গুটিয়ে যায়, ডিস্ট্রিবিউটাররা মুখ ফেরায়। এমন কি যে সব ফিল্ম সোসাইটিগুলো এককালে তাকে নিয়ে মাতামাতি করত তারাও আর কথা বলে না। স্রষ্টার পরিচয় তার সৃষ্টিতে। সেই সৃষ্টি যদি থেমে যায় তাহলে সে কীসের স্রষ্টা! একটা ছবি ভাঙিয়ে আর কতদিন চলবে। কফি হাউসের টেবিলে খুব কাছের বন্ধু ছাড়া অন্যরা আসে না! শেষ যে প্রযোজকের কাছে গিয়েছিল সুব্রত তিনি বলেই দিলেন, 'মশাই, আপনি ফিল্ম না করে আমার বাড়িতে আসুন। বাইরের ঘরের দেওয়ালটা বেশ বড়। সেখানে ছবিটা এঁকে দিন। শ'পাঁচেক টাকা দিতে পারি। আজকাল ঘরের দেওয়ালে দুর্বোধ্য ছবি থাকলে সোসাইটিতে প্রেস্টিজ বাড়ে।'

ক্রমশ সুব্রত আরও নরম হলো। ওর বয়স এখন বেশি নয়। সুদর্শন, শিক্ষিত এবং মার্জিত। ছবি করার বাসনা এখন রক্তে মিশে গিয়েছে, এ এমন নেশা যতই রক্ত ধোও দূর হবে না। তার দ্বারা অন্য কাজও সম্ভব নয়। এখন একটার পর একটা হেনস্তা সহ্য করে সে প্রযোজক জোগাড় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সুব্রত দুটো জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারে না। একজন পৃথিবী-বিখ্যাত পরিচালক কলকাতায় আছেন তাঁর কোনো ছবি তিন সপ্তাহের বেশি চলে না, মফস্বলের লোক দেখতে চায় না। কিন্তু তিনি একটার পর একটা ছবি করে যাচ্ছেন বড় বাজেটে। তাঁর কাছে প্রযোজকরা যায় কেন? ওঁর কোনো ছবি তো টাকা পায় না এদেশে। অথচ বিদেশের বড় ফেস্টিভ্যালগুলোতে তাঁর ছবি যায়, এখন জুরিও হন তিনি। কেউ কেউ বলে যে ভদ্রলোকের ছবির বাজার বিদেশে। সেখানে নাকি খুব বিক্রি হয়ে বলে প্রযোজক মার খায় না। বাংলা ভাষায় ছবি করে বিদেশে যার চল তিনি যত বড় পরিচালক হন তাঁর সম্পর্কে ধোঁয়াশা থেকে যায়। আর বুঝতে পারে না একদম নিম্নমানের বাণিজ্যিক ছবির পরিচালকদের। কলকাতায় ছবি চলল না, মফস্বলে মোটামুটি চলল কিন্তু পরের ছবির প্রযোজক পেতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় তা তাঁদের। কি কৌশল তাঁরা জানেন সে জানে না। আজ যদি অনীশ ঘটক বেঁচে থাকতেন তাঁর কী অবস্থা হতো?

গত একমাস ধরে সুব্রত ভেবেছে একটা ছবি করতে হবে যা সাধারণ মানুষ প্রসন্ন মনে দেখবে, যাকে বুদ্ধিজীবীরা প্রশংসা করবে, যেটা তৈরি করে তার নিজের তৃপ্তি হবে। সৎ ছবি কিংবা গুড ফিল্ম হিসেবে সেই ছবির প্রযোজক ভালো লাভ করে বলবেন পরের ছবি করুন সুব্রতবাবু। সেটা কী ধরনের ছবি তাকে নিয়ে দিনরাত ভেবে যাচ্ছে সুব্রত। অথচ কোনো কূল-কিনারা নেই। যদি কেউ তাকে একটা ফরমুলা বলে দিত! না, বাজার চলতি, মাথামুণ্ডুহীন ফিল্ম নামক যাত্রা সে করতে পারবে না। জাত খুইয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু ঢের ভালো। বিছানায় শুয়ে সাত-পাঁচ ভাবছিল সুব্রত। এখন বেশ বেলা হয়েছে। ঘুম থেকে উঠে নিচে নেমে মোড়ের দোকান থেকে এক ভাঁড় চা খেয়ে এসেছে। পকেটে এখন মাত্র দুটো টাকা পড়ে আছে। সুদেষ্ণার সঙ্গে তিনদিন দেখা হয়নি। সুদেষ্ণার স্কুলে টেলিফোন করার জন্যে পঞ্চাশটা পয়সা দরকার। তিনদিন আগে সে সুদেষ্ণাকে অনেক করে বুঝিয়েছে। আর নয়, এবার সুদেষ্ণা অন্য কাউকে বিয়ে করুক। তার সামনে কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রত্যাশা সেই। এই হতাশার মধ্যে ডুবে থেকে সে আর

ওকে জড়াতে চায় না। আগে এসব কথা শুনলে সুদেষ্ণা প্রতিবাদ করত। বলত, 'ফিল্ম করতে হবেই এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে তোমাকে? এত জানাশোনা যখন তখন একটা চাকরি তুমি পাবেই।'

তখন বড় গলায় সে বলেছিলে, 'চাকরি করার জন্যে আমি জন্মাইনি।'

তিনদিন আগে সুদেষ্ণা কিছুই বলল না। চুপচাপ তার কথা শুনে গেল। যদি কেউ শুধুই শোনে এবং জবাব না দেয় তাহলে অস্বস্তি হয়। সুব্রত জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কিছু বলছ না যে? প্লিজ, এবার আমার কথা শোনো।' সুদেষ্ণা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'তুমি ভেঙে পড়েছ সুব্রত। যে মানুষ ভেঙে পড়ে তার দ্বারা কোনো সৃষ্টি হয় না।'

'মানছি। কিন্তু তুমি কেন আমার জন্যে জীবনটা নষ্ট করবে? আমি তোমাকে খাওয়াতে পারব না, স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারব না—না, আর নয়।'

সুদেষ্ণা বলেছিল, 'কিন্তু আমি তো চাকরি করি।'

সুব্রত মাথা নেড়েছিল, 'সে-টাকায় আমি হাত দিতে পারব না।'

—'কেন? আমি তোমার পাশে দাঁড়াতে পারব না?'

—'পার। কিন্তু তোমার পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা যখন আমি অর্জন করব তখনই। এখন যা অবস্থা দেখছি ও জীবনে আর তা সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

সুদেষ্ণা যাওয়ার আগে বলে গিয়েছিল তিনদিন বাদে দেখা করবে। এর মধ্যে পারলে সে যেন ফোন করে। ফোন করা হয়নি। কী হবে মিছিমিছি বন্ধনের সুতোটাকে জিইয়ে রেখে। সুদেষ্ণা, তোমাকে আমি ভালোবাসি, কিন্তু তার চেয়ে নিজের বাসনাকে অনেক বেশি। একথা তো আর মুখ ফুটে বলা যায় না ওকে। চারধারে যখন হতাশা ঠিক তখন গতকাল একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল।

ধর্মতলা স্ট্রিটের দোতলায় হরিপদ সাহার ডিস্ট্রিবিউশন অফিস। এককালে প্রচুর হিট ছবি করেছেন ভদ্রলোক। কিন্তু দুজন নামী পরিচালক ওর শেষ দুটি ছবিকে প্রায় ডুবিয়ে দেওয়ায় এখন প্রযোজনা থেকে সাত হাত দূরে আছেন। দুটো চিত্রনাট্য বগলে নিয়ে সুব্রত ওর চেম্বারে গিয়ে শুনল, 'না মশাই, ছবি আমি করব না।'

'কিন্তু, আমি খুব আশা নিয়ে এসেছিলাম।'

'আমি হতাশ হয়ে বসে আছি। তাছাড়া আপনার ওইসব কচকচি শুনলে আমার মাথা ধরে যাবে। অন্য জায়গায় যান।' হরিপদবাবু ওঠার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন।

সুব্রত শেষ চেষ্টা করল, 'খুব ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট ছিল।'

এই সময় বাইরে বৃষ্টি নামল। হরিপদ বললেন, 'যাঃ, হয়ে গেল। আমার বৃষ্টিতে ভেজা বারণ। কী করি।' বলতে বলতে তাকালেন সুব্রতর দিকে, 'ঠিক আছে, বৃষ্টি বন্ধ হওয়া পর্যন্ত পড়ুন। বন্ধ হলেই আমি উঠব।'

দোনামনা করে দ্বিতীয় চিত্রনাট্যটি শুরু করেছিল সুব্রত। প্রথমটিতে একটু বেশি কাজকর্ম আছে, হরিপদবাবুর ভালো লাগবে না। দ্বিতীয়টিতে আর যাই থাক গল্পের টান আছে। সে প্রার্থনা করতে লাগল যাতে বৃষ্টিটা না থামে। চেয়ারে শরীর এলিয়ে হরিপদবাবু প্রথম দিকে শুনছিলেন। তারপরে সোজা হয়ে বসলেন। একসময় সুব্রত আড়চোড়ে জানলা দিয়ে দেখল বৃষ্টিটা থেমে গেছে। কিন্তু সে পড়া চালিয়ে যেতে লাগল।

শেষ হবার পর হরিপদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার গল্প?'

'আমারই।'

'কোত্থেকে ঝেড়েছেন?'

'মানে?'

'না ঝেড়ে তো পরিচালকরা এমন—। যাক, ও চিত্রনাট্য এবার পুড়িয়ে ফেলুন।'

'সেকী !' আঁতকে উঠেছিল সুব্রত।

'হুঁ। কারণ ওটা কোনোদিন ছবি হবে না। আরে মশাই, আপনার মেইন লিড্ কে করবে? এদেশে এমন কোনো নায়িকা আছে যে সরমা করতে পারে? নান্।'

গুম হয়ে গেল সুব্রত। চিত্রনাট্য লেখার সময় এ কথাটা তারও খেয়াল এসেছে, কিন্তু—সে বলল, 'স্ক্রিপটা আপনার কেমন লাগল?'

'ভালো লাগলে তো কোনো কাজ হবে না মশাই। ওটা নায়িকা-প্রধান গল্প। একজনই করতে পারত এই চরিত্র। তিনি করলে হেসে হেসে সুবর্ণ জয়ন্তী হয়ে যেত, কিন্তু তিনি তো আজ দশ বছর ছবি ছেড়ে দিয়েছেন। আকাশকুসুম চিন্তা।'

'আপনি কার কথা বলছেন?'

'আবার কার কথা? এদেশে তো একজনই অভিনেত্রী জন্মেছেন। উনি যদি আপনার সরমা করতেন আমি এক্ষুনি হ্যাঁ বলে দিতাম। এবার উঠতে হয়।' হরিপদ ড্রয়ারে তালা দিলেন।

সুব্রত শেষবার চেষ্টা করল, 'উনি যদি রাজি হন করতে?'

'রাজি হবেন না। এ পর্যন্ত এক হাজারটা প্রস্তাব নাকচ করেছেন। পছন্দের ভূমিকা না পেলে করবেন না। আবার চরিত্র পছন্দ হলে গল্প পছন্দ হওয়া চাই। গল্প পছন্দ হলে সহ-অভিনেতাদের মনের মতো হতে হবে। সেটাও যদি হয় তাহলে পরিচালক ওঁর পছন্দসই হতে হবে। এসবের মানে উনি আর ফিল্মে কাজ করবেন না। করতে চান না। সুধীর গড়গড়ি তিনলাখ অফার করেছিল পাঁচ বছর আগে। নো রেজাল্ট। আর গত বারো বছর ধরে তো কেউ ওঁর দেখাই পায় না। শুনেছি ধর্মকর্ম নিয়ে থাকেন, কারো সামনে আসেন না। তাঁকে রাজি করাতে পারলে চলে আসুন, আমি আছি। এভারেস্টকে কলকাতায় নিয়ে আসতে পারেন কি না দেখুন। সাতদিন সময় দিলাম।' হরিপদবাবু দেওয়ালে টাঙানো বিবর্ণ হওয়া একটা পোস্টার দেখিয়ে বললেন, 'ওই হাসির দাম লাখ টাকা।'

সুব্রত পোস্টারটা দেখল। মোহিনী হাসি হাসছেন অভিনেত্রী। প্রায় বিশ বছর আগের ছবি। সুব্রত তখন বালক। কিছুদিন আগে টি-ভি-তে দেখেছিল ছবিটা। 'অভিসারিকা' এক সময় সুপারহিট হয়েছিল। ওই নায়িকা যে অত্যন্ত প্রতিভাময়ী এবং সুন্দরী তাতে সন্দেহ নেই। তার বাল্যকালে সমস্ত হিট ছবির নায়িকা ছিলেন ইনি। নায়কের নামের ওপর তাঁর নাম ছাপা হতো। নামটা আবার দেখল সে পোস্টারে। বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে, মালিনী সোম।

এই শেষ সুযোগ। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে সুব্রত নিজেকে বলল, যেমন করেই হোক মিসেস সোমকে রাজি করাতে হবে। হরিপদবাবু কথা দিয়েছেন ম্যাডাম রাজি হলেই উনি টাকা দেবেন। টালিগঞ্জে এখন একজনই ম্যাডাম। যদিও গত দশবছরে তিনি নতুন ছবি করেননি, বারো বছর তাঁকে দেখা যায়নি কোথাও, তবু এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষ মনে করে তিনি এলেই ছবি সুপারহিট হবে। প্রায় বিশ বছর ধরে বাংলাদেশের তরুণদের মনে যে ভদ্রমহিলা রোমান্টিসিজম সঞ্চারিত করেছেন তিনি কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। তার প্রমাণ তো কাল বিকেলেই পেয়েছে সুব্রত। আলিপুরের সেই বিরাট কম্পাউন্ডওয়ালা বাড়ির গেটেই তাকে আটকে দিল দারোয়ান। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা না থাকলে কাউকে ঢুকতে দেওয়া নিষেধ আছে। অনেক অনুনয় বিনয়েও কাজ হয়নি। তারপর অন্তত পাঁচবার টেলিফোন করেছে সে। প্রত্যেকবার একটি

পরিচারিকা রিসিভার তুলে জিজ্ঞাসা করে, 'কে বলছেন?'

নিজের নাম বলতেই প্রয়োজন জানতে চায়। তারপরেই কট্ করে শব্দ, লাইন বিচ্ছিন্ন। পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। এক ভদ্রমহিলা খাস কলকাতায় বাস করেন অথচ তাঁর সঙ্গে দেখা করার কোনো উপায় নেই। দুপুরে স্টুডিওপাড়ার এক বন্ধু বলেছিল, 'ভাই, তুমি মন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করতে পার অপরিচিত হলেও, কিন্তু ম্যাডাম সোম? নো চান্স।'

সুব্রত উঠে বসল। এটাই তার শেষ সুযোগ। যেমন করেই হোক এই ভদ্রমহিলার কাছে পৌঁছতে হবে। একবার মুখোমুখি হলে সে ওঁকে রাজি না করিয়ে ছাড়বে না। টেবিল থেকে খামটা তুলে নিয়ে স্টিল ছবিগুলো সামনে সাজাল সুব্রত। আজ থেকে কুড়ি পঁচিশ বছর আগে তোলা ছবি। অপূর্ব সুন্দরী মহিলা। হাসলে পাগল হয়ে যেতে হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা তীব্র ব্যক্তিত্ব চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। আজকের অভিনেত্রীরা ওঁর কণামাত্র অর্জন করেনি। তার চিত্রনাট্যের প্রধান চরিত্রের সঙ্গে এই মহিলার প্রচণ্ড মিল। হরিপদবাবু ঠিকই বলেছেন। এই মহিলাই একমাত্র ওই চরিত্র করতে পারেন। কিন্তু কীভাবে করাবে সেটাই মাথায় আসছিল না।

গতদিনটা খুব ব্যস্ততায় কেটেছিল সুব্রতর। স্টুডিওপাড়ায় শুনেছিল ম্যাডাম খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মাকে প্রণাম করতে যান। আবার রাস্তায় লোক হবার আগেই নিজের দুর্গে ফিরে আসেন। অতএব ওঁকে ধরবার ওটাই সুযোগ। রাত থাকতে সুব্রত হাজির হয়েছিল আলিপুরে। কিন্তু গেট খুলল না। ম্যাডাম বের হলেন না। দিনের আলো ফুটে গেলে একটা লোক দুটো খবরের কাগজ গেটের গায়ে বক্সে রেখে চলে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সুব্রতর মাথায় আইডিয়াটা এসে গেল। লোকটাকে ধরে কাগজ দুটোর নাম জেনে নিল সে। একটা বাংলা অন্যটা ইংরেজি। বাড়ি ফিরে চোখে পড়ার মতো বিজ্ঞাপন তৈরি করল সে। 'আমি আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। টেলিফোন এবং দারোয়ান ফিরিয়ে দিচ্ছে। বিষয় চলচ্চিত্র। দায় প্রাণের। প্রতিভাময়ী বলে নির্দয়া হবেন কেন?' এর পরে বাড়িওয়ালার টেলিফোন নম্বর লিখল সে। মনে হয়েছিল নজরে পড়লে ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন ওটি তাঁরই উদ্দেশে ছাপা। কিন্তু বিজ্ঞাপন ছাপতে টাকা দরকার। কোনো খবরের কাগজ তার মুখ দেখে ওটা ছাপবে না। প্রথমে হরিপদ সাহার মুখ মনে পড়ল তার। সকালে চেম্বারে গিয়ে দেখল বেশ ভিড়। অনেকগুলো হিট ছবি আছে ওঁর হেপাজতে। পুরনো দিনের ছবি। সেগুলো নিতে আসে মফস্সলের হলগুলো। ওকে দেখে হরিপদবাবু বিরক্ত হলেন, 'কী ব্যাপার? আবার কী চাই?'

এক ঘর লোকের সামনে কথা বলতে অস্বস্তি হচ্ছিল। তবু সুব্রত বলল, 'একটা জরুরী দরকার। আপনার সঙ্গে আলাদা কথা বলতে পারলে ভালো হতো।'

'আলাদা-ফালাদা কথা বলার সময় নেই আমার। আপনাকে তো বলেই দিয়েছি ও ছবি হবে না, হতে পারে না। তাছাড়া আমার এখন ছবি করার কোনো ইচ্ছেই নেই।'

'কিন্তু সেদিন যে বলেছিলেন।'

'কী বলেছিলাম? ছবি করব? আশ্চর্য লোক তো?'

'না। বলেছিলেন মিসেস সোম যদি—।'

'ও হ্যাঁ'! একগাল হাসলেন হরিপদবাবু, 'বলেছিলাম এভারেস্টকে কলকাতায় নিয়ে আসুন। তা সেকথা এখনও বলছি। আগে নিয়ে আসুন তারপর আলাদা কথা বলব।'

'সেই ব্যাপারেই কথা বলব। আমি যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি।'

'চেষ্টা করছেন? মিছিমিছি সময় নষ্ট। বুঝলে হে, ম্যাডামকে নিয়ে এই বালক ছবি করবে। কত রুই কাতলা হাল ছেড়ে দিলো উনি এসেছেন—। হুঁ। যান, এবার কাজ করতে দিন।'

ঘরের লোকগুলো তাব দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকাল যেন খুব আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনছে তারা।

শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল সুব্রত, 'ওঁর সঙ্গে দেখা করতে হলে কিছু খরচ করতে হবে, তাই—।'

'খরচ? খরচ টরচের মধ্যে আমি নেই। ম্যাডাম যদি রাজি হয়, আসবেন, সব মিটিয়ে দেব। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।'

আর কোনো চান্স নেই। সুব্রত চটি টানতে টানতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওর মনে পড়ল হরেনের কথা। হরেন তার সঙ্গে কলেজে পড়ত। এখন একটা বিরাট পাবলিসিটি ফার্মের মালিক। খবরের কাগজে তার বিজ্ঞাপনের জায়গা বুক করা থাকে। দু'তিনমাস অন্তর পেমেন্ট করে। যদি বিজ্ঞাপনটায় কাজ হয় তাহলে হরিপদবাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে শোধ করে দেবে সে। এতে অবশ্য ঝুঁকি আছে। কিন্তু অন্য কোনো রাস্তা নেই।

পায়ে হেঁটে পার্ক স্ট্রিটে চলে এল সুব্রত। দোতলায় হরেনের বিশাল অফিস। ঢুকতেই একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান রিসেপশনিস্ট তার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'ই-য়া?'

'হরেন আছে?'

'উনি খুব ব্যস্ত। যা বলার আমাকে বলুন।'

'কিন্তু আমার যে শুধু ওর সঙ্গে দরকার।'

'হু আর য়্যু, প্লিজ?'

'সুব্রত রায়। ওর সঙ্গে পড়তাম।'

মিনিট দুয়েক বাদেই ডাক এল। হরেনের চেম্বারে কেউ নেই। কিন্তু তার ভেতরে রেস্ট রুমে আর একজন মহিলার সঙ্গে হরেন বসে। ওকে দেখে চিৎকার করে উঠল সে, 'আরে কি সৌভাগ্য! বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক সুব্রত রায় আমার চেম্বারে! আয় আয়, তোর কথা ভাবলেই নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হয়। সবাইকে বলি, একসঙ্গে পড়েছি আমরা। মিট মাই ফ্রেন্ড অ্যানিটা দাস আর একে নিশ্চয়ই চেনো, সুব্রত রায়, ফিল্ম ডিরেকটার। তা সুব্রত, কী মনে করে?'

'এলাম।' কীভাবে কথাগুলো বলবে ঠাওর করতে পারছিল না সে। বিশেষ করে এক অপরিচিত মহিলার সামনে অনুগ্রহ চাওয়া যায় না।

'গুড। বস্, চা না বিয়ার?

'কিছু না।'

'তা কি হয়?' ইন্টারকমে চায়ের ফরমান জানিয়ে হরেন বলল, 'ভালই হলো। অ্যানিটার খুব শখ ফিল্মে নামার। আমি দু' চারজনকে বলতে পারতাম। কিন্তু তারা একবার ওকে পেলে ছিবড়ে করে ফেলবে। শি শুড বি প্রিজার্ভড।' চোখ টিপল হরেন। আর সঙ্গে সঙ্গে শরীর দুলিয়ে অ্যানিটা বলল, 'অ-স-ভ্য।'

হরেন বলল, 'তুই দে না একটা চান্স।'

'দেখি, যদি ছবি করি তাহলে মনে রাখব। হরেন, যে ব্যাপারে এসেছি সেটা ব্যবসায়িক।'

'তোর সঙ্গে কোনো ব্যবসার সম্পর্ক নেই আমার। বলে ফেল।'

'আমরা যে এজেন্সির মারফত বিজ্ঞাপন দিই তারা ক্লোজ করেছে।' মিথ্যে কথা বলল সুব্রত, 'খুব মুশকিলে পড়েছি আজ। আমার প্রোডিউসর মাসখানেকের আগে টাকা দেবে না। এদিকে বিজ্ঞাপনটা যাওয়া দরকার কালই।'

'কোন কাগজ?'

কাগজের নাম বলে বিজ্ঞাপনের ম্যাটারটা এগিয়ে দিলো সুব্রত। তার বুক কাঁপছিল। সেটা পড়ে হরেন বলল, 'প্রেম ট্রেম নাকি?'

'না, খুব সিরিয়াস ব্যাপার। এমনভাবে দিবি যাতে চোখে পড়ে। মহিলার নাম মালিনী সোম।'

'হ্যাঁ!'! চোখ বড় হলো হরেনের, 'তাই নাকি! তাহলে তো এক্ষুনি দিতে হয়। উইশ ইউ গুড লাক।' ছবি হলে হরেনের বান্ধবীকে নেবে এমন ভাব দেখিয়ে বেরিয়ে এল সুব্রত। আঃ, কি আরাম!

সুব্রত ঝুঁকি নিল। মহিলা যদি বুদ্ধিমতী হন তাহলে বুঝতে পারবেন। এর চেয়ে বেশি খোলাখুলি লেখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। স্টুডিওপাড়ায় সেক্ষেত্রে খুব হাসাহাসি হবে।

কিন্তু বিজ্ঞাপন দুটো ছাপানো হলো বেশ চোখে পড়ার জায়গায়। কাগজ বের হবার পর সে সারাটা দিন অপেক্ষা করল। কোনো কাজ হলো না। কিন্তু তার পরের দিন সেই অলৌকিক ঘটনাটা ঘটল। একটি পরিচারিকা কণ্ঠ জিজ্ঞাসা করল 'বিজ্ঞাপন কি আপনি দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কার উদ্দেশে? আপনি কার সঙ্গে দেখা করতে চান?'

'ম্যাডাম সোমের সঙ্গে।'

'আচ্ছা! কেন?'

'ব্যক্তিগত দরকার।'

'টেলিফোনে বলুন।'

'না, টেলিফোনে ওসব কথা হয় না।'

লাইনটা কেটে গেল। আজ সকাল থেকে তিন চারটে টেলিফোন এসেছে এইরকম রসিকতা করে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে রসিকতা করেছে। তার নাম জিজ্ঞাসা করেছে। এটিও সেইরকম ভাবছিল সুব্রত। কিন্তু তার পরেই টেলিফোন বাজল, 'আপনার নাম কী?'

'কেন?' সুব্রত ভাবছিল এবাব টেলিফোন এলে বাড়িওয়ালা নিশ্চয়ই ডেকে দেবেন না। ঝামেলা কে সইবে?

'ম্যাডাম আপনাকে সময় দিচ্ছেন। আগে নাম বলুন।'

'সুব্রত রায়।

'কী করেন?'

'ছবি তৈরি করি।'

'কাল সকাল সাড়ে দশটায় আসুন।'

রাত্রে ঘুম হয়নি সুব্রতর। প্রচণ্ড উত্তেজনা মনে। সেই স্বপ্নের নায়িকা তাকে সময় দিলেন শেষ পর্যন্ত! হরিপদবাবুকে জানাবে নাকি? না, একেবারে কাজ হাসিল হলে তবেই সে মুখ খুলবে।

ঠিক সাড়ে দশটায় হাজির হলো সে। নিজের নাম বলাতে দারোয়ান গেট খুলে লন পেরিয়ে বিশাল সাদা বাড়ির ড্রইংরুমে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল। চমৎকার সাজানো ঘর। অর্থ এবং রুচির সুন্দর মিল। কিন্তু একা সোফায় বসে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল সুব্রতর। কেবল মনে হচ্ছিল অদৃশ্য থেকে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। যেন তার প্রতিটি ভঙ্গি সেই চোখের গভীরে পৌঁছে যাচ্ছে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ঢুকিয়ে রাখল সে। সুব্রত একটু অবাক হলো। ঘরের কোনো দেয়ালেই মালিনী সোমের ছবি নেই। অভিনেতা অভিনেত্রীদের বাড়িতে সচরাচর এরকম দেখা যায় না।

প্রায় পনেরো মিনিট অপেক্ষা করার পর ওপাশের পর্দা সরিয়ে যিনি এলেন তাঁর ভঙ্গিতে

অনেক ক্লান্তি। সুব্রত উঠে দাঁড়িয়েছিল। দুহাত জোড় করে নমস্কার করতে গিয়ে তার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। একি দেখছে সে? মহিলার বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে অবশ্যই। যদিও শরীরের বাঁধুনি অটুট কিন্তু চোখের তলায়, চিবুকে, দুই ঠোঁটের পাশে এবং কপালে বয়স কোপ মেরেছে নির্দয় হাতে। এমনকী গলাতেও বয়সের নগ্ন ভাঁজ। যদিও এসব সত্ত্বেও অদ্ভুত সৌন্দর্য পরিবর্তিত বয়সের সঙ্গে মানানসই হয়ে রয়েছে তবু কাল সারাদিন দেখা সেই স্টিল ছবিগুলোর সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল নেই।

'বসুন।' গলার স্বরে সেই বয়সটা যেন বেঁচে। শুধু কণ্ঠেই সুব্রত বসেছিল তার বুক থেকে ততক্ষণে সব উত্তেজনা মিলিয়ে গেছে। মহিলার বলার ভঙ্গি, সোফায় বসার মধ্যে একটা ব্যক্তিত্ব আছে কিন্তু তাই দিয়ে তার ছবির নায়িকার চরিত্র করা যায় না। তার চরিত্রটির বয়স সাঁইত্রিশ। বয়স যাকে স্পর্শ করেনি। সুন্দরী এবং ব্যক্তিত্বময়ী। এই চরিত্রে এঁকে মানায় না, কিছুতেই না। হরিপদবাবুরা ভুলে গেছেন দশ বছর সময়টা বড় মারাত্মক। সময়ের উই জীর্ণ করে দিয়েছে মহিলাকে অথচ ওদের মনে সেই পুরনো ছবিটা বেঁচে আছে।

মালিনী সোম এতক্ষণ লক্ষ্য করছিলেন সুব্রতকে। এবার জিজ্ঞাসা করলেন 'কী চাই?'

মুহূর্তে মন ঠিক করে ফেলল সুব্রত। না, এইভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে সে পারবে না। হরিপদবাবুর মন রাখার জন্য প্রৌঢ়াকে সে নায়িকার চরিত্রে নামাতে পারে না। জেনেশুনে চরিত্রটিকে হত্যা করার ছবি না করা ঢের ভালো।

সুব্রত হাসবার চেষ্টা করল, 'আপনাকে কখনও দেখিনি তাই।'

'এই জন্য পয়সা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন?'

'না মানে—।' সুব্রত থিতিয়ে গেল।

'বিষয় চলচ্চিত্র! আপনি কি ছবি করেন?'

'হ্যাঁ'। সুব্রত তার নিজের একমাত্র ছবির নাম বলল। এবং সেটা একটুও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না মালিনী সোমের মুখে। 'নাম শুনি, আজকাল তো স্টুডিওর ক্যান্টিন বয়রাও শুনছি ছবি করে। যাক, কী জন্য এসেছিলেন?' সুব্রত উঠে দাঁড়াল। তারপর সামনের টেবিল থেকে চিত্রনাট্যের বাঁধানো ফাইলটা তুলে নিয়ে বলল, 'এমনি এসেছিলাম। অতীতের প্রতিভাময়ীকে দেখবার সাধ ছিল।'

'অতীতের?' মালিনী সোমের ঠোঁটের ভাঁজ পড়তেই চট করে সেই অভিসারিকা ছবির নায়িকা উঁকি মেরে গেল যেন। সুব্রত বলল, 'চলি।'

'দাঁড়ান।' কারো কণ্ঠে আদেশ এত নিচু স্বরে বলবান হতে পারে জানা ছিল না সুব্রতর। সে বিস্মিত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'আপনার হাতে ওটা কী?'

'চিত্রনাট্য।'

'ওটা কেন এনেছিলেন?'

'আপনাকে শোনাব বলে।'

'না শুনিয়ে চলে যাচ্ছেন কেন?'

সুব্রত সামান্য ভাবল। সত্যি কথাটা খোলাখুলি বলা সমীচীন হবে কি না। তার পরেই ঠিক করল, বললে তার কোনো ক্ষতি নেই। কারণ সে তো ছবিটা করতে পারছে না। নিচু গলায় সে জানাল, 'এটি আমার আগামী ছবির চিত্রনাট্য। কিন্তু কোনো প্রযোজক পাচ্ছিলাম না এত

কাল। একজন বললেন যদি আপনাকে রাজি করাতে পারি তাহলে তিনি টাকা দেবেন। আপনার যে ছবি আমি দেখেছি তাতে মনে হয়েছিল মূল চরিত্রটিতে আপনি চমৎকার মানাবেন। কিন্তু—।

'কিন্তু?'

'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আমরা সময়টা ভুলে গিয়েছিলাম।'

মালিনী সোম চট করে উঠে দাঁড়ালেন, 'তার মানে? আপনার ওই চরিত্রের তুলনায় আমি বুড়ি হয়ে গেছি?'

চাবুকের মতো প্রশ্নটা ছুটে এল। সুব্রত কোনোরকমে বলল, 'বুড়ি ঠিক নয়, বয়স্কা!'

'কত বয়স আপনার নায়িকার?'

'সাঁইত্রিশ।'

রহস্যময় একটা হাসি খেলে গেল ঠোঁটে। তারপর মলিনী সোম যেন হুকুম দিলেন, 'আমাকে অপমান করে এই বাড়ি থেকে আজ পর্যন্ত কেউ বের হতে পারেনি। আর আপনার মতো একটা ব্যর্থ পরিচালককে সেই সম্মান নিশ্চয়ই আমি দেব না। আপনি বসুন।'

বিব্রত সুব্রতর চোখের সামনে থেকে বেরিয়ে গেলেন মালিনী সোম। সে বাইরের দরজার দিকে তাকাল। মিসেস সোমকে সে অপমান করতে চায় না। যদি উনি অপমানিত বোধ করেন তাহলে নিজে যেচে সেটা নিয়েছেন। কিন্তু তাকে আটকে রাখার কোনো অধিকার ওঁর নেই। সুব্রত বুঝতে পারছিল না সে কী করবে। এখন যদি বেরিয়ে যেতে চায় এখান থেকে তাহলে উনি স্বচ্ছন্দে দারোয়ানকে দিয়ে আটকাতে পারেন। মনগড়া কোনো অভিযোগ খাড়া করলে তার কিছুই করার থাকবে না। সুব্রত ঠিক করল সে অপেক্ষা করবে, দেখাই যাক।

নিজেকে খুব বোকা বলে মনে হচ্ছিল ওর। কুড়ি-পঁচিশ বছরে কোনো মানুষের চেহারা যে এক থাকে না, এই সত্যি সে ভুলে গিয়েছিল। অবশ্য সে কেন, বাংলা ছবি যাঁরা দেখেন তাঁদের কাছে মালিনী সোমের একটাই ছবি বেঁচে আছে। সেটাকে মন থেকে সরিয়ে ফেলা কষ্টকর।

প্রায় আধঘণ্টা কাটার পর কানে জুতোর হিল্-এর শব্দ বাজল। খট্ খট্ শব্দটা এগিয়ে আসছে। তারপরেই পর্দাটা যেন শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হলো। আর সুব্রত এমন চমকে গেল যেন সে সামনে ভূত দেখছে। অত্যন্ত স্মার্ট পায়ে অভিসারিকা ছবির নায়িকা ঘরে ঢুকে এগিয়ে এলেন দীপ্ত ভঙ্গিতে। তাঁর গভীর ছোঁয়া লেগে একটা রিভলভিং চেয়ার দুটো পাক খেয়ে গেল। টান টান চিবুকে হুকুম হলো, 'বসুন।'

সুব্রত যেন পায়ে জোর পাচ্ছিল না। কপাল এবং গলার ভাঁজ অন্তর্হিত। চোখের তল এবং চিবুকে নিটোল আদুরে ভাব মাখামাখি। এক ঝটকায় পঁচিশ বছর পিছিয়ে গেছেন মালিনী সোম। উজ্জ্বল পাকা সোনা শাড়িতে এখন লক্ষ রহস্য। যেন চিত্রনাট্যের সেই মূল চরিত্রটি তার সামনে বসে আছে। পৃথিবীর কোনো অভিনেত্রীকে ভাবা যায় না এঁকে দেখার পর। সুব্রতর গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল।

'কেন এসেছেন?' যেন গরিব প্রজাকে প্রশ্ন করছেন এক মহারানি।

'আমি-আমি একটা ছবি করতে চাই।' সুব্রতর গলা কাঁপছিল, 'আপনি যদি মেইন লিড করেন তাহলে আমি সুযোগ পাব।'

'আমি তো এখন ছবি করি না ভাই।'

'জানি। কিন্তু কেন করবেন না? আপনার মতো ট্যালেন্টেড অভিনেত্রী।'

'চুপ করুন। আমার ছবি করতে ভালো লাগে না। তাছাড়া যা সব গল্প শুনি তাতে আমার

ছবি করার ইচ্ছেই হয় না। আপনি আসতে পারেন।'

সুব্রত চমকে গেল। সম্পূর্ণ বিপরীত গলায় কথা বলছেন মালিনী সোম। সে ভিক্ষে চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি একবার আমাকে সুযোগ দিন।'

'বললাম তো। আপনি আসুন। হ্যাকনিক গল্প আর নতুন পরিচালক—।'

সুব্রত ওঁকে থামিয়ে দিলো, 'আমি নতুন নয়। আমার আগের ছবি প্রশংসা পেয়েছিল।'

'পয়সা? পয়সা কত পেয়েছিল?' মালিনী সোম ঘাড় বেঁকিয়ে প্রশ্ন করলেন। অবিকল সেই সব হিট ছবির মতো। ওঁর এই ভঙ্গিমা খুব বিখ্যাত ছিল। 'না, পয়সা পায়নি। সব ছবি পয়সা পাবে এমন বলা যায় না। আপনি যেসব ছবিতে অভিনয় করেছেন তার প্রত্যেকটাই হিট নয়?' সুব্রত পাল্টা প্রশ্ন করল।

'যখন নিজেকে চিনেছি তখন ছবি হিট করেনি। আমরা বলে বলে ছবি হিট করাতাম। এই বয়সে একজন ফ্লপ ডিরেকটারের ছবিতে কাজ করার ইচ্ছে নেই ভাই। এখন তো শুনেছি তোমাদের বয়সী ছেলেরা ছবি করছে, প্রযোজক মরে যাচ্ছে আর তারা বিদেশে পাড়ি দিয়ে নাম কিনছে। আমরা যেমন পয়সা নিতাম তেমনি প্রযোজককে তার কয়েকগুণ ফিরিয়ে দিতাম। ঠিক আছে, এবার এসো।' মিসেস সোম ঘুরে দাঁড়ালেন।

এবার সুব্রত মরিয়া হয়ে ডাকলেন, 'শুনুন ছবির গল্পটা আপনি কিন্তু শোনেননি।'

'বুঝে নিয়েছি। তাছাড়া ভাই আমি খুব টায়ার্ড! আর ছবি করতে ইচ্ছে করে না।'

'কিন্তু দিদি, আপনি যখন আমাকে ভাই বলছেন আজ আমার গল্প একটু আপনাকে শুনতে হবেই। আমি আপনার কাছে ভাই হিসেবে দাবি করছি।'

'ভাই। ওটা আমার মুদ্রাদোষ।'

এই প্রথমবার সুব্রত ভেঙে পড়ল, 'দিদি, আমি প্রত্যেকের দরজায় দরজায় ঘুরেছি। কেউ আমায় ছবি করার টাকা দেয়নি। আমার প্রথম ছবি চলেনি—এই আমার অপরাধ।'

'কিন্তু প্রেসিডেন্টস মেডেল পেয়েছিলে।' ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন ম্যাডাম সোম।

'হ্যাঁ পেয়েছিলাম। কিন্তু বাজারে তার কোনো দাম নেই। আমি এম. এ. পাশ করেছি। এখন ছবির কাজের অভাবে—।' সুব্রত নিজেকে সামলে নিল, 'শেষ পর্যন্ত এই স্ক্রিপটটা পছন্দ করেছেন একজন। তিনি বলেছেন মেইন লিডে যদি আপনি করেন তাহলেই তিনি টাকা নিতে রাজি আছেন। এটা আমার শেষ ভরসা।'

'তুমি কী করে আশা করলে যে তোমাকে আমি দয়া দেখাতে যাব? রাবিশ! এখন আমার পক্ষে টালিগঞ্জের এই পরিবেশে ছবি করা সম্ভব নয়।'

সুব্রত ঠোঁট কামড়াল। আর কিছুই করার নেই তার। ভদ্রমহিলা যে রকম অস্থির আচরণ করছেন তাতে কোনো যুক্তিই কাজ করবে না। সে বলল, 'তবে কি আমাকে বুঝতে হবে আপনার অভিনয় প্রতিভা আজ মৃত, তাই আপনি ক্যামেরার সামনে আসতে ভয় পাচ্ছেন।'

চাবুকের মতো মুখটা ফিরল, 'তার মানে?'

'আমি যা বলেছি সেটা আপনি বুঝতে পেরেছেন।'

কথাটা বলেই চিত্রনাট্যের ফাইল তুলে নিয়ে সুব্রত দরজার দিকে পা বাড়াল। তখনি ম্যাডাম সোম বললেন, 'শোনো, তুমি আমাকে কী ভাবো?'

'আমার খারাপ লাগছে। দুঃখ প্রকাশ ছাড়া কিছু করার নেই।'

'হোয়াট ড্যু য়ু মিন?' চাপা এবং উত্তেজিত গলায় প্রশ্নটা ছিটকে উঠল।

সুব্রত হেসে ফেলল, 'আপনি মিছিমিছি আমায় ফিরিয়ে দিচ্ছেন। অন্তত ভদ্রতা করেও এই স্ক্রিপটটা আপনার শোনা উচিত ছিল।'

একটা গাল ফুলে উঠল জিভের চাপে। সামান্য চিন্তা। তারপর ম্যাডাম সোম বললেন, 'অনেক বছর পরে কেউ আমাকে মুখের ওপর এভাবে কথা বলতে পারল। ঠিক আছে, আমি পড়ব তোমার স্ক্রিপট। জানি মিছিমিছি সময় নষ্ট করা, এবং আজকালকার নতুন ছেলেরা কি ধরনের স্ক্রিপট করে তার একটা আন্দাজ করা যাবে। ওটা রেখে যাও।'

'এটা রেখে যাব?' হঠাৎ যেন অনন্ত সমুদ্রে কোনায় এক টুকরো সবুজের ইশারা মিলল।

'আমি এক কথা দু'বার বলা পছন্দ করি না।'

সুব্রত বুঝতে পারছিল না ভদ্রমহিলার মতলবটা কি? জীবনে অনেক মানুষের সংস্পর্শে এসেছে সে কিন্তু এমন ব্যক্তিত্ব আর নজরে পড়েনি। যে কোনো মানুষকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে যা ইচ্ছে খেলা খেলতে পারেন উনি। সারাদিন ধরে একটাই চিন্তা পাক খাচ্ছিল ওর মনে। অত অল্প সময়ে ভদ্রমহিলা তাঁর বয়সটা অত কমিয়ে ফেললেন কী করে? নাকি প্রথমবার যে ভাবে এসেছিলেন সেটাই ওঁর মেক-আপ ছিল? তা কী করে হবে?

সময়ের হিসেব করলে প্রথম চেহারাটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু দ্বিতীয় চেহারাটা দেখলে যে বুকে ঝড় ওঠে সেটাও তো মিথ্যে নয়। তাহলে?

এসব কথা এই মুহূর্তে কাউকে বলা যাবে না। ম্যাডাম সোম স্পষ্ট নিষেধ করে দিয়েছেন। এমন কি হরিপদবাবুকেও নয়। জানাজানি হলে তিনি অস্বীকার করবেন। ম্যাডাম বলেছেন, ফেরত নেবার জন্যে সুব্রতকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার দরকার নেই। তিনিই পাঠিয়ে দেবেন। স্ক্রিপটটা রেখে আসার পর আশা নিরাশায় প্রত্যেকটা মুহূর্ত দুলছে তার।

এইসময় সুদেষ্ণা এসেছিল। তার সঙ্গে দেখা হয়নি। বাড়িওয়ালার স্ত্রীর কাছে একটা বিরাট প্যাকেট রেখে গেছে। তাতে খাবার-দাবারের সঙ্গে একটা একশ' টাকার নোট। সঙ্গে চিঠি, 'কিছু মনে করো না। এটা অহমিকা নয়। তোমার সুবিধে মতন ফেরত দিলে হাত পেতে নেব।' একটাও পয়সা ছিল না পকেটে। বুক ভরে উঠেছিল কৃতজ্ঞতায়।

তিনদিন পরে খুব ভোরে বাড়িওয়ালা ডাকলেন, তার ফোন এসেছে। একটু বাদেই মলিনী সোম লাইনে এলেন, 'কার সঙ্গে কথা বলছি?' গলার স্বরে একটি বিশেষ স্টাইল।

'আমি সুব্রত রায়।'

'গল্পটা কার?'

'আমারই। আমারই চিত্রনাট্য।'

'ও। এই মুহূর্তে চলে এসো।'

লাইনটা কেটে যেতেই লাফিয়ে উঠল সুব্রত। ঈশ্বর, তুমি তাহলে আছ! পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে সুসজ্জিত ড্রইংরুমে পৌঁছে গেল সুব্রত। আজ সদর দরজায় কোনো বাধা পায় নি সে। দারোয়ান আগের থেকেই অবহিত ছিল। মিনিট পনেরো অপেক্ষা করার পর মালিনী সোমের দেখা পাওয়া গেল। সেই সুন্দর বেশ।

'এই গল্প তুমি ছবি করবে?'

'আমার সেইরকম ইচ্ছে।'

'চিত্রনাট্যের চল্লিশ ভাগ ফেলে দিতে হবে।' নির্মম কণ্ঠস্বর।

'ফেলে দিতে হবে?' সুব্রত হতভম্ব।

'হ্যাঁ। কিস্যু হয়নি। গল্পটা নায়িকাকে নিয়ে। তার সুখদুঃখ এবং সংগ্রামের গল্প। সেটাই আরও বাড়াতে হবে। তপনের ব্যক্তিগত ঘটনাগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই। পুরো ছবিটাই সরমার প্রেফারেন্সে হওয়া দরকার। নইলে আমার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।'

ম্যাডাম সোম এবার সিগারেট ধরালেন। এই প্রথম ওঁকে সিগারেট খেতে দেখল সুব্রত। কিন্তু দুবার ধোঁয়া গলায় যাওয়ামাত্র প্রবল কাশি এল। সঙ্গে সঙ্গে মহিলার মুখে যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠল। এবং সেই মুহূর্তে সুন্দর মেক-আপের আড়াল থেকে একজন যন্ত্রণাকাতর মানুষের মুখ উঁকি দিল। কিন্তু খুব দ্রুত সামলে নিয়ে ম্যাডাম বললেন, 'সরি। কিছু মনে কোরো না।'

'আপনি কি অসুস্থ?' সুব্রত উদ্‌বিগ্ন গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'নো, কে বলল আমি অসুস্থ! আমি ঠিক আছি। তুমি রাজি?'

'একটু ভাবতে হবে।'

'তার মানে? আমি অভিনয় করব, তুমি বলছ ভাবতে হবে!'

'দেখুন। ছবিটা আমি করব। ভেবেছি আমি। আমার ভাগ্যটাকে আপনি উল্টোপাল্টা করে দিচ্ছেন, একটু সময় তো লাগবেই।'

'কিন্তু আমি সময় দিতে পারব না। তোমাকে এই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

'আপনি অযথা চাপ দিচ্ছেন আমার ওপর।'

'অযথা? না অযথা নয় সুব্রত! তুমি পরে বুঝবে এতে তোমার ছবি আরও ভালো হবে।'

সুব্রত হাত নাড়ল, 'ঠিক আছে, মেনে নিলাম। আমি সরমার পারস্‌পেকটিভে চিত্রনাট্য শেষ করব। কিন্তু আমি যা করতে বলব তাই আপনাকে শুনতে হবে।'

'তার মানে?'

'চিত্রনাট্য একবার ফাইন্যাল হয়ে গেলে সেটাই অনুসরণ করতে হবে।'

ঠোঁট কামড়ে মাথা নাড়লেন মালিনী সোম। তাঁকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল। তারপর একটু হেসে বললেন, 'অল্প বয়সে তুমি বেশ শক্ত কথা বলতে পারো তো। ঠিক আছে, এটা একটা ভালো গুণ। ওয়েল, এবার অন্য কথা বলি। তোমার ছবিতে অভিনয় করব কিন্তু আমার কয়েকটা শর্ত আছে। এগুলো তোমাদের মানতে হবে।'

'কী ধরনের শর্ত?'

'তোমার প্রোডিউসারের নাম কী?'

'হরিপদ সাহা।'

কপালে ভাঁজ পড়ল মালিনী সোমের। 'হরিপদ! অশিক্ষিত।' তারপর হেসে ফেললেন, হাসলে ওর সুন্দর দাঁত এখনও ঝকমকিয়ে ওঠে, 'কী আর করা যাবে। এদের নিয়েই তো বাংলা ফিল্ম চিরকাল চলেছে। হরিপদ তোমার এই স্ক্রিপ্ট শুনেছে?'

'হ্যাঁ, উনি আপনার কথা বলেছেন।'

'আমার সঙ্গে তোমার যে কথা হয়েছিল তা ওঁকে বলেছ?'

'আপনি নিষেধ করেছিলেন।'

'এই ছবি করার ইচ্ছে হরিপদর নেই তাই তোমাকে আমার কথা বলেছে। সে জানে আমি কখনই ছবি করব না। তোমাকে কাটাতে এই অস্ত্র সে প্রয়োগ করেছে। তোমার এই গল্পে প্রেমের প্যানপ্যানানি নেই, গাছ ধরে গান নেই, এ হরিপদর ভালো লাগতে পারে না। বাট আই উইল ডু ইট। যাক শর্তগুলো হলো, আমি যে আবার ছবিতে কাজ করছি এটা তোমরা রিলিজের আগে পাবলিকলি জানাতে পারবে না, কোনোও স্টিল যেন কোথাও ছাপা না হয়।'

মাথা নাড়ল সুব্রত, 'কিন্তু তা কী করে সম্ভব। আপনি স্যুটিং করতে গেলেই লোকে সে-কথা জেনে যাবে। চিত্র-সাংবাদিকরা তো এরকম খবর লুফে নেবেন। আর আপনি ছবিতে কাজ করছেন এটা জানতে পারলে ছবির কদর বেড়ে যাবে।'

'সেটা পরে জানালেও একই রিঅ্যাকশন হবে। ফিল্মের কাগজগুলো নিজেদের সোর্সে যা ইচ্ছে লিখুক তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু স্যুটিং-এর কোনো ছবি যেন না ছাপতে পারে। সেটা না দেখলে পাবলিক ভাববে গুজব। আমি চাই তোমরা এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ সাইলেন্ট থাকবে, ও কে?'

সুব্রত ঘাড় নাড়ল। এখন খবর ছাপলে জোর পাবলিসিটি হতো হয়তো কিন্তু রিলিজের সময়ে পাবলিক জানলে কম হবে না, একথাও সত্যি।

মালিনী সোম বললেন, 'দ্বিতীয় শর্ত আমার শুটিং-এর সময় বাইরে কোনো লোক থাকবে না! স্যুটিং-এর বাইরে আমার সঙ্গে তুমি ছাড়া যেন কেউ কথা না বলে। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট।'

'ঠিক আছে।'

'ঠিক দেড় মাসের মধ্যে শুটিং শেষ করতে হবে। দু'মাসের মধ্যে ডাবিং। এর বেশি একদিনও আমি সময় দিতে পারব না।'

'দু'মাস?' গলা শুকিয়ে গেল আবার সুব্রতর।

'আমার পুরো টাকাটা অ্যাডভান্স দিতে হবে। এতদিন পরে ছবি করছি যখন তখন আমার আড়াই লাখ চাই।'

'আড়াই লাখ?' চোখ কপালে উঠল সুব্রতর।

'ইয়েস। টাকাটা তোমার রিলিজের আগে হাউস থেকেই অ্যাডভান্স পেয়ে যাবে আমার নাম ভাঙিয়ে। আমি একটা অলটাইম রেকর্ড করে যেতে চাই বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে। অ্যান্ড লাস্ট পয়েন্ট হলো স্ক্রিপট আমার পছন্দমতো না-হওয়া পর্যন্ত আমি শুটিং করব না। যাও, তোমার প্রডিউসারের সঙ্গে কথা বলে আজ বিকেলে এসে আমাকে ফাইন্যাল জানিয়ে যাবে।'

সুব্রত উঠল। এর চেয়ে উনি যদি পারব না বলতেন তাহলে ঢের ভালো হতো। কোনো প্রযোজক এইসব শর্তে রাজি হবে না। না শব্দটাকে ঘুরিয়ে জানিয়ে দিলেন ম্যাডাম সোম। আড়াই লাখ একটা আর্টিস্টকে দেওয়ার কথা কোনো টালিগঞ্জের প্রযোজক কল্পনা করতে পারে না! চলে যাওয়ার আগে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনি কেন রাজি হলেন?'

'তার মানে?' ঘাড় কাত করে সেই হিট ছবির নায়িকার ভঙ্গিতে তাকালেন তিনি।

'মানে, এতকাল সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন--।'

'ও, চরিত্রটা পছন্দ হয়েছে আমার। ইন ফ্যাক্ট জীবনের শেষ ছবিটা আমি এই রকম কিছু চাইছিলাম। বাট ইট নিড্‌স চেঞ্জ। ও কে!'

পায়ে জোর ছিল না একফোঁটা। সুব্রত ধর্মতলা স্ট্রিটে হরিপদবাবুর অফিসে যখন পৌঁছল তখন সেখানে অনেক লোক। হরিপদ সাহা প্রথমে আমলই দিচ্ছিলেন না, শেষে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার? আবার কী মনে করে?'

'কথা ছিল।'

'কথা, কথা আর কী থাকবে? আমি তো আপনাকে বলেই দিয়েছে তিনি যদি করেন আমি আছি, নইলে নেই।'

'তিনি আছেন।'

'আছেন মানে?' হাঁ হয়ে গেলেন হরিপদ সাহা।

'করবেন।'

'অ্যাঁ সে কী! সত্যি?' দাঁড়িয়ে গেলেন হরিপদবাবু, 'ঠাট্টা করছেন না তো?'

'তাতে আমার লাভ?'

'ও বলুন বলুন। আপনি তো দেখছি ম্যাজিক করতে পারেন।'

'এখানে বলা যাবে না।'

'ও তাই তো। বেশ এ ঘরে আসুন।' উপস্থিত ভদ্রলোকদের কোনো কিছু না বলে হরিপদ সাহা পাশের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। তাঁর পরনে সিল্কের পাঞ্জাবি আর ফিকে ফিকে ধুতি।

পাশের ঘরে মুখোমুখি হলে হরিপদবাবু উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার বলুন? ম্যাডাম সোমের দেখা পেয়েছেন?'

সুব্রত একে একে সব ঘটনা খুলে বলল।

'আড়াই লাখ?' আঁতকে উঠলেন হরিপদ, 'মাথা খারাপ নাকি? ছবির বাজেট যদি পাঁচ হয় তো ওকে আড়াই দেওয়া যাবে কী করে?'

'জানি না। ওটা আপনার চিন্তা। আপনার কথা আমি রেখেছি।'

'আড়াই লাখ! নো পাবলিসিটি, নো ভিজিটর, অনলি দু'মাস সময়।'

'খ্যাপা! দশবছর ছবি করেনি, মাথাটা ঠিক আছে মনে হলো?'

'আমার চেয়ে ঠিক।'

'হুম। না, সম্ভব নয়। আড়াই লাখ কাউকে দেওয়া সম্ভব নয়।'

'আমি তাহলে না বলে দেব?'

'পেটের ছেলে পড়ে যাচ্ছে নাকি? দু' দিন সময় দিন ভাবতে।'

'সময় দেওয়া চলবে না। আজ বিকেলেই ওঁকে জানাতে হবে।'

'আজ বিকেলে? এ যে মিলিটারির বাবা।' চোখ বন্ধ করে বিড় বিড় করলেন হরিপদ, 'প্রায় আট লাখের ধাক্কা। দু'মাসের মধ্যে ঢালতে হবে। অসম্ভব। পারব না। আর্টিস্ট হুকুম করবে, আমাকে সেই মতো চলতে হবে?'

হরিপদ সাহা ঘর থেকে বেরিয়ে আবার দলে মিশলেন। সুব্রত ওঁর অবস্থা বুঝতে পারছিল। এত টাকার কথা সে ভাবতেও পারে না। হরিপদবাবুর দোষ কী! বাংলা ছবির যা বাজার তাতে বেশি টাকার ছবি করলে নির্ঘাৎ পথে বসতে হবে। কিন্তু মালিনী সোম থাকলে—। সুব্রত বেরিয়ে আসতেই হরিপদ সাহা ভিড়ের মধ্যে বসে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, কথা দিয়ে দিন।'

'কথা দেব?'

'হ্যাঁ। যে গরু দুধ দেয় তার—। সাতদিন সময় চাই, সাতদিন পরে আমরা যাব।'

'আমরা মানে? উনি তো অন্য কারো সঙ্গে দেখা করবেন না।'

'সেকি! আমি প্রডিউসার, কাকে টাকা দিচ্ছি দেখব না! টাকাটা তো আপনি ওর নাম করে মেরেও দিতে পারেন।'

'পারি। কিন্তু সেটা ভাবলে আমাকে দিয়ে ছবি করাবেন না।' প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করল সুব্রত, যে প্রযোজক পরিচালককে সন্দেহ করেন তার সঙ্গে ছবি করা অসম্ভব। দেখা না করার শর্তটা তিনি দিয়েছেন।

'আমি যাচ্ছি।'

'যাচ্ছি মানে?' আপনি ছবি করবেন না?'

'না।'

'কি আশ্চর্য! আমি তো আপনাকে কিছু বলিনি।' হরিপদবাবু আবার উঠে এলেন, 'আপনি বিবেচনা করুন, আমারই টাকা অথচ আমার কোনো ভয়েস থাকছে না।'

'না, না, রাগ করবেন না। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে আমাদের। বুঝলেন?'

সামনে বসা একজন জিজ্ঞাসা করল, 'কার কথা বলছেন, কী ছবি?'

হরিপদ সাহা দু হাত ছড়িয়ে উদাস গলায় বললেন, 'দু মুখো করাত।'

বিকেলে আবার সেই ড্রইং রুমে। তার আগে টেলিফোনে সুব্রত জানিয়েছিল হরিপদবাবু প্রস্তাবগুলোয় রাজি হয়েছেন। তবে সাতদিন সময় নিয়েছেন টাকা দেবার জন্যে। সুব্রত জিজ্ঞাসা করেছিল চিত্রনাট্যের ব্যাপারে সাতদিন পরে জানা যাবে কি না।

পরিচারিকা জিজ্ঞাসা করে এসে বলেছিল, 'কথা পাকা হয়ে গেলে আজই আসতে পারে।'

মালিনী সোম নেমে এলেন। সেই একই রাজেন্দ্রাণীর বেশ। নিজেকে চাকর-বাকর মনে হয় ওঁর সামনে এলে।

'প্রডিউসার রাজি হয়েছে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু সাতদিন—'।

'শুনেছি। টাকা অ্যাডভান্স না পেলে আমি সেটে যাব না। কিন্তু আমার হাতে বেশি সময় নেই। যা করার সঠিক হিসেব রেখে করবে। তোমার বয়স কত?

খানিকটা বিস্ময়ের স্বরে সুব্রত বয়স বলল।

'অনেক ছোট! অ-নে-ক। সুব্রত, আমি যা বললাম তা মাথায় রেখ। এই দু'মাস আমার জীবনের খুব মূল্যবান সময়। তোমার ছবিতে যখন রাজি হলাম, তখন তোমারও। এমনভাবে প্ল্যান করবে যাতে একটা মুহূর্তও নষ্ট না হয়।' চোখ বন্ধ করলেন মালিনী সোম, চোখের পাতায় একটা নীল শিরাকে এই প্রথম চমকে উঠতে দেখল সুব্রত।

'এসো, চিত্রনাট্য সম্পর্কে আমি যা ভেবেছি তাই বলি।' মালিনী সোম আবার কথা শুরু করলেন। প্রায় এক ঘণ্টার পর যে পরিবর্তনটা দাঁড়াল তা হলো সরমা নামে মেয়েটি যার মধ্যে অনেক প্রতিশ্রুতি ছিল, আর পাঁচটা মেয়ের মধ্যে যার ওপর চোখ পড়ত সবার আগে তার ওপর যখন সংসারের চাপ এসে পড়ল তখন একটি ছেলে যার নাম তপন এগিয়ে এসে ভালবাসার স্বপ্ন দেখাল। কিন্তু তপনকে মেনে নিতে পারছিল না সরমা। একদিকে সংসারের অভাব, পিতৃহীন ভাই-বোনদের কাতর মুখ, অন্যদিকে ব্যক্তিগত সুখ—সরমা প্রথমটাই বেছে নিল। তারপর প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে তিল তিল করে যখন পায়ের তলায় মাটি পেল তখন দেখল তার চারপাশে কেউ নেই। তারপর তপন যে কিনা এককালে ভালবাসার রঙ মাখিয়েছিল তার মনে, সে নিজের সংসারে বিপর্যস্ত হয়ে তার কৃপাপ্রার্থী। তপনের সন্তানের জন্যে একটি কিডনি দরকার। মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে সেই মেয়ে জীবনে প্রথমবার আবিষ্কার করল দিতে পারার মতো সুখ আর কিছুতেই নেই, নিঃশেষে দান করার মধ্যেই সবচেয়ে বড় শান্তি পাওয়া যায়।

সুব্রত শেষটুকুতে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সরমাকে সে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখতে চাইত না। মালিনী সোম ওটুকু পাল্টাননি জেনে ভালো লাগল। চোখ বুজলেই সে একজন সরমাকে দেখতে পায়। তার মৃত্যুদৃশ্যটা তাকে কুরে কুরে খায়। এই ঋণ কখনও শোধ হবার নয়। তাই গল্পের সরমাকে বাঁচিয়ে রাখলে বেইমানি করা হতো। সে বলল, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

'কেন?' মালিনী সোমের ভ্রু কুঁচকে উঠল।

'আপনি সরমাকে বাঁচাতে চাননি।'

ম্যাডাম সোম অদ্ভুত হাসলেন, 'তুমি তো ঠিকই লিখেছ, সরমারা বাঁচে না।'

তারপরেই স্বর পাল্টালেন, 'কাস্টিং হয়ে গেছে?'

মনে মনে সুব্রত ভেবে রেখেছিল কাকে কোন্ চরিত্রে নেবে, কিন্তু মুখে সেটা বলল না। 'আগে আপনি তারপর তো আর সবাই। এখন ও নিয়ে ভাবব।'

মালিনী সোম যেন খুশি হলেন, সুব্রত লক্ষ্য করেছে চাটুকারিতা করলে উনি চটে যান, কিন্তু প্রকৃত গুরুত্ব দিলে মুখে আলো ফোটে।

মালিনী সোম বললেন, 'আমার সময়ে যারা নাটক করত তাদের কাউকেই তো মানাবে না। এখনও অবশ্য একজন আছে, নাঃ, তাকে দিয়ে এই চরিত্র চলবে না। তপনের চরিত্রে এমন কাউকে নাও যার অভিনয় ক্ষমতা আছে।' সুব্রত মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ আমি ভেবেছিল গ্রুপ থিয়েটারের থেকেই নেব। থিয়েটারে এমন অনেক ছেলে আছে যারা সুযোগ পেলে অনেক প্রফেশনালের চেয়ে ভালো কাজ করবে।'

'ইডিয়ট। তোমার অন্য ছবি হলে তাতে নিও। আনকোরা বালকদের সঙ্গে অভিনয় করতে আমি পারব না। যারা কখনও ক্যামেরার সামনে দাঁড়ায়নি তাদের সঙ্গে ডায়লগ বলতে অত্যন্ত অসুবিধে হয়। তাছাড়া পাবলিক বলবে কী? মালিনী সোম হেঁজিপেঁজির সঙ্গে প্রেম করছে ফিল্মে! ইম্‌পসিব্‌ল! না, না, ওসব থিয়েটার থেকে তুমি সাইড ক্যারেকটার নাও, নট হিরো।'

সুব্রত তাকাল এঁর দিকে। অদ্ভুত অহঙ্কার অর্জন করছেন মহিলা। এইভাবে কথা বলতে পারা এবং তাকে সত্যের ওপর দাঁড় করাবার জন্যে ক্ষমতা থাকা দরকার। দীর্ঘদিন লেগেছে এটা অর্জন করতে। সে মুগ্ধ হলো। বলল, 'যেসব শিল্পী আপনার পরে ছবিতে এসেছে এবং নাম করেছে তাদের কাউকে নিলে কেমন হয়?'

'ওই তো মুশকিল। এত বছরেও একজন স্টার হতে পারল না।'

'আপনি তো স্টার চাইছেন না। তাই না?' একটু ঠোকার চেষ্টা করল সুব্রত। সঙ্গে সঙ্গে সরু চোখে তাকালেন মহিলা, 'তুমি কার কথা ভাবছ?' সুব্রত নাম বলল। ছেলেটি প্রথমে একজন বিখ্যাত পরিচালকের নায়ক হয়ে ছবিতে এসেছিল। তারপর নানা চরিত্রে করেছে, ঠিক সুবিধে করতে পারেনি। কিন্তু সম্প্রতি পর পর কয়েকটা ছবিতে দারুণ কাজ করেছে। ভদ্র, বিনয়ী এবং দুর্নাম নেই।

মালিনী সোম চিন্তা করলেন একটু, 'ঠিক আছে, ওরা তো সবাই আমার কাছে নতুন। কে কেমন অভিনয় করো তাও জানি না। ওকে কি পাবলিক অ্যাকসেপ্ট করেছে?'

'হ্যাঁ। চমৎকার অ্যাপিয়ারেন্স।'

'বেশ, তবে তাকে বলে দিও আমি যদি অপছন্দ করি তাহলে ওকে সরে যেতে হবে। আর হ্যাঁ, রোমান্টিক দৃশ্যগুলো একদম প্রথমে নিও না। সাতদিনের মধ্যে নতুন করে স্ক্রিপ্ট লিখে আমার সঙ্গে দেখা করবে। সুব্রত, আমার সময় কম, তাড়াতাড়ি ছবিটা শেষ করতে চেষ্টা করবে। ও হ্যাঁ, তুমি সিগারেট খাও না?'

'খাই।' সুব্রত হাসবার চেষ্টা করল।

'আমার সামনে খেও না।'

'কেন?'

'আমি উত্তর দেওয়া পছন্দ করি না, প্রশ্ন করতেই ভালবাসি।'

তিনদিনে চিত্রনাট্য তৈরি হয়ে গেল। স্যুটিং স্ক্রিপ্ট শেষ করতেও আটকাল না। হরিপদ সাহার সঙ্গে বসে কাস্টিং করে ফেলল সে। গত দশ বছরে যে নতুন নায়কটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে

নায়কের ভূমিকায় নেওয়া হলো। লক্ষ্য রাখা হলো মালিনী সোমের সময়ের কোনো অভিনেতাকে পার্শ্বচরিত্রেও যেন না রাখা হয়। তরুণ নায়ক সুব্রতকে বলল, 'নায়িকা কে করছে? বম্বে থেকে কাউকে আনুন না। এখানে যারা আছে—।'

সুব্রতর মজা লেগেছিল। সে হেসে বলেছিল, 'না, এখানকার অভিনেত্রীই করবেন।'

'কে?'

'নাম বলা এখন বারণ!'

'কি আশ্চর্য, হিরো হয়ে আমি নাম জানব না? আপনার চেয়ে আমাকে পাবলিক বেশি চেনে জানেন?' ঠাট্টা করছিল হিরো।

'জানি, তবে ছবিটার পরিচালক আমি।'

টাকা-পয়সা মিটিয়ে দেওয়া হলো। গুনে গুনে আড়াই লক্ষ টাকা। হরিপদ সাহা বলেছিল, কত টাকা হোয়াইটে নেবে জিজ্ঞাসা করে নিন, আমি রসিদ করব কী করে। মালিনী সোম সেই দিক দিয়ে গেলেন না। নিজের হাতে লিখে দিলেন আড়াই লক্ষ টাকা। তিনি ছবির জন্যে আগাম নিলেন। পরিবর্তিত চিত্রনাট্য সম্পর্কে আর কোনো আপত্তি নেই মালিনী সোমের। সুব্রত শু্যটিং-এর তারিখগুলো দিয়ে এল তাকে। কাউকে আনতে যেতে হবে না। ঠিক সময়ে নিজে চলে যাবেন তিনি। তবে হরিপদ সাহা যেন দুটো দারোয়ান রাখে ফ্লোরের মুখে। কোনো অবাঞ্ছিত মানুষ দেখলে তিনি সটান ফিরে আসবেন।

প্রচণ্ড টেনসনে ছিল সুব্রত। সত্যি এটা চমকে দেবার মতো খবর। মালিনী সোম এতকাল বাদে তার ছবিতে অভিনয় করছেন। লোকে ওঁকে দেখার জন্যেই তার ছবি দেখবে। সে যদি অনেক কষ্টে ধারধোর করে একটা ছবি বানাত তাতে লোক হতো কি না সন্দেহ। প্রথম ছবির ভাগ্যে ঘটেছিল। কিন্তু এবার সে স্বচ্ছন্দে ছবি করার সুযোগ তো পাবেই উপরন্তু দর্শকদের আগমন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকছে। অতএব এই ছবিটাকে যে করেই হোক ভালোভাবে তৈরি করতে হবে। মালিনী সোমের ব্যাপারটা টেকনিসিয়ান্‌দেরও বলা হয়নি। শু্যটিং-এর দিন সুব্রত তার সহ-পরিচালককে বলল, 'গেটে গিয়ে দাঁড়াও। মালিনী সোমের গাড়ি এলেই খবর দেবে। আর সোজা মেকআপ রুমে নিয়ে যাবে ওঁকে।'

ছেলেটা হতভম্ব হয়ে গেল, 'মালিনী সোম?'

'হ্যাঁ। নায়িকা করছেন। চেঁচামেচি করার দরকার নেই। যা বললাম তাই করো।'

কিন্তু খবর চেপে রাখা আর যেখানেই সম্ভব টালিগঞ্জে যায় না। ঠিক সময়ে এসে মিসেস সোম যখন মেকআপ রুমে ঢুকে গেলেন তখন বাইরে বেশ ভিড়। সবাই সেটে ঢুকতে চায়। তার মধ্যে নামী টেকনিসিয়ান্স থেকে ফিল্ম রিপোর্টারবাও আছেন। হরিপদ সাহার দারোয়ান তাদের ঢুকতে দিচ্ছে না। লাট্টুর মতো পাক খাচ্ছেন হরিপদ সাহা। সুব্রত শেষবারের মতো সেটা চেকআপ করছিল, তিনি দৌড়ে এলেন, 'আরে মশাই আপনি এখানে? ওদিকে ম্যাডাম এসে গেছেন মেকআপ রুমে, সেখানে যাবেন না?'

'কেন?'

'কেন মানে? অতবড় অভিনেত্রী, পাবলিক ভিড় করে এসেছে। একটু তেল না দিলে চলে? কী লোক আপনি?'

'হরিপদবাবু, আমি ছবির পরিচালক। এই কাজটা আমায় করতে দিন। ওঁকে আজ কী করতে হবে তা উনি জানেন। আমার অ্যাসিস্টেন্ট ওঁর মেকআপ রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তেল

দেবার দরকার হলে আপনি যান।' তারপর ক্যামেরাম্যানকে ডেকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'লাইটস ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ। আমরা রেডি।'

হরিপদ সাহা এখনও দাঁড়িয়ে, 'কিন্তু আমাকে তো মেকআপ রুমে, মানে, ঢোকাটা ঠিক নয়। ওঁর সঙ্গে আমার এখনও আলাপ হলো না।'

'আগে তো আলাপ ছিল বলেছিলেন।'

'সে অনেক কাল আগের কথা। এখন কি ছাই ওঁর মনে আছে।'

'ঠিক আছে সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই আলাপ করিয়ে দেব।'

সব রেডি হয়ে গেলে সুব্রত খবর পাঠাল। সেটে এখন বাইরের কেউ নেই। হরিপদবাবু দূরে একটা চেয়ারে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছেন। নায়িকার বোন যে করছে সে গ্রুপ থিয়েটারের ভালো অভিনেত্রী। তাকে চরিত্রটা বুঝিয়ে দিয়েছে সুব্রত। ম্যাডাম সোমের নাম শুনেই মহিলা খুব টেনসনে আছেন।

সহকারী পরিচালক খবরটা দিতেই কপালে ভাঁজ পড়ল মালিনী সোমের। এরকম তো হওয়ার কথা নয়। চিরকাল দেখেছেন, মেকআপ রুম থেকে পরিচালকরাই তাঁকে সসম্মানে ডেকে নিয়ে যায়। আর এই ছবিতে তিনি তো দয়া করে কাজ করছেন।

কিন্তু ম্যাডাম সোম বেরিয়ে এলেন। সেট থেকে মেকআপ রুম বেশি দূরে নয়। এমনভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে যাওয়া-আসা কেউ দেখতে না পায়। সেটে ঢুকেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তারপর হাতজোড় করে সবাইকে নমস্কার করে সুব্রতর সামনে চলে এলেন। সুব্রত তার সহকারীকে বলল, 'তুমি ম্যাডামকে সিচুয়েশনটা বুঝিয়ে দিয়েছ?'

'বুঝেছি।' ম্যাডাম সুব্রতর দিকে স্পষ্ট তাকালেন, 'টেক করতে পার।'

'রিহার্সাল?'

'তাহলে আমায় ডেকেছ কেন?'

'ঠিক আছে, একটা মনিটর?'

'আমি বসছি, কো আর্টিস্টের নাম?'

ম্যাডাম সোম ফ্লোর থেকে নেমে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। সুব্রত ঠোঁট কামড়াল। এত ডাঁট। কোনোরকম রিহার্সাল ছাড়াই ফাইন্যাল টেক চায়। অ্যাসিস্টেন্টকে প্রক্সি দিতে বলে সুব্রত একবার গ্রুপ থিয়েটারের মেয়েটিকে দিয়ে অ্যাকশন করিয়ে নিল। তারপর ডাকল, 'আসুন!'

ম্যাডাম সোম উঠে দাঁড়ালেন। সমস্ত ফ্লোরের মানুষ এখন তাঁর ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না। তিনটে শব্দ ছিল। একবারেই ও কে করতে হলো সুব্রতকে। শেষ করা মাত্র ম্যাডাম মেয়েটিকে বললেন, 'শুনুন ভাই, কেউ যখন দুঃখের কথা বলে তখন অমন বোকার মতো তাকিয়ে থাকতে নেই। পছন্দ না হলে মুখের পেশী শক্ত করবেন, হলে নরম এবং সহানুভূতিশীল। ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই।'

মেয়েটি বলল, 'না, মানে—।'

ম্যাডাম বললেন, 'নেক্সট শট নাও সুব্রত।'

তর তর করে কাজ এগিয়ে যাচ্ছিল। হরিপদবাবু রোজই ঘুর ঘুর করছেন কিন্তু ম্যাডামের ধারে কাছে আসতে পারছিলেন না। তৃতীয় দিনে শ্যুটিং-এর সময়ে হঠাৎ ম্যাডাম ডাকলেন, 'হরিপদবাবু!'

এরকম অভাবনীয় সুযোগে ছুটে এলেন ভদ্রলোক, 'বলুন ম্যাডাম।'

'আজকের কাগজে স্টেটমেন্টটা আপনি দিয়েছেন?'

'না না, না তো!'

'কিন্তু আপনার নাম বেরিয়েছে। আমি ছবিতে কাজ করছি। সুব্রত, তোমার সঙ্গে চুক্তি ছিল তোমরা এ ব্যাপারে মুখ খুলবে না।' একটা খবরের কাগজ ছুড়ে দিলেন মালিনী সোম হরিপদবাবুর দিকে!

সুব্রত অসহায় চোখে তাকাল। হরিপদবাবু জিভ কেটেছেন, 'না ম্যাডাম, আমি মুখ সেলাই করে রেখেছি। ব্যাটারা আমার নামে ফলস্ কথা ছেপেছে।'

'মামলা করুন।'

'করব!' সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন হরিপদ।

সেই দিনই নায়কের সঙ্গে নায়িকার প্রথম দেখার দৃশ্য তোলা হবে। নায়ক অতীশকুমার সেজেগুজে বসেছিল। তার চোখ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিল মালিনী সোমকে। এই কয় বছরে সে খুব জনপ্রিয় হয়েছে, অনেক নায়িকার সঙ্গে অভিনয় করেছে কিন্তু এমন সুন্দর এক ব্যক্তিত্বপূর্ণ মহিলা সে কখনও দ্যাখেনি।

দৃশ্যটি ছিল নায়ক, নায়িকার বাড়িতে এসেছে। সে নায়িকার বোনের পরিচিত। সেই সুবাদে দেখা করতে এসেছে। নায়িকার বোন নেই বাড়িতে! নায়িকা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'কী দরকার?' দেখামাত্র নায়ক নায়িকার প্রেমে পড়ে যাবে।

ম্যাডাম বললেন, 'আজকেই যতটা পারো তুলে নাও সুব্রত।'

'ইয়েস ম্যাডাম।' সুব্রত কথাটা বলে অতীশকুমারকে ডাকল, 'আপনার কি রিহার্সালের দরকার হবে, অতীশবাবু?'

'সে কি! রিহর্সাল ছাড়া টেক করবেন কী করে?' অতীশকুমার উঠে এসে মালিনী সোমের সামনে দাঁড়াল, 'নমস্কার। আমার নাম অতীশ। আমি আপনার গুণমুগ্ধ।'

হাসলেন মালিনী সোম। তারপর বললেন, 'রিহার্সালটা দিয়ে নিন। আমাদের কাজের ধারাটা অন্যরকম। ওটার জন্য ফ্লোরে সময় নষ্ট করা পছন্দ করি না।'

'বেশ। সুব্রতবাবু, আপনি টেক করুন।' অতীশ খুব আত্মবিশ্বাসে কথাটা বলল।

ডায়ালগগুলো আর একবার শুনিয়ে দেওয়ার পর সুব্রত নির্দেশ দিল, 'স্টার্ট।'

ক্যামেরা এগিয়ে এসেছে অতীশের সামনে। নায়িকাকে দেখে সে বিস্মিত, মুগ্ধ। তাই চমৎকার বলল, 'কে, আ-প-নি?'

'নীলা বাড়িতে নেই, কিছু বলতে হবে?'

অতীশকুমারের সংলাপ ছিল, 'আমি এসেছিলাম, শুধু এইটুকুই।'

অতীশকে চেষ্টা করতে দেখা গেল। সাধারণ সংলাপ। কিন্তু তার চোখে শুধুই আবেগ, ঠোঁটে কোনো শব্দ ঝরল না। বিরক্ত সুব্রত চিৎকার করল, 'কাট্' সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা নিশ্চল হলো। ফ্লোরের প্রতিটি মানুষ স্তব্ধ। সুব্রত এগিয়ে গেল, 'কী ব্যাপার? আপনার তো ডায়ালগ ছিল অতীশবাবু, বোবা হয়ে গেলেন কেন?'

ততক্ষণে অতীশ ধাতস্থ হয়েছে। সে সহকারী পরিচালককে জিজ্ঞাসা করল, 'ডায়ালগটা কী ছিল যেন? হঠাৎ যে কী হয়ে গেল।' শেষ কথাটা নিজেকেই বলা।

সুব্রত বলল, 'এই জন্যে রিহার্সালের দরকার হয়। মিছিমিছি ফিল্ম আর সময় নষ্ট।' শেষ কথাটা যে মালিনী সোমকে শোনানোর জন্যে এটা বোঝাতে সে তাঁর দিকে তাকাল না।

মালিনী সোম বললেন, 'রাগ করছ কেন? এরকম ভুল প্রথম প্রথম আমাদেরও হতো।'

কথাটাকে ভালভাবে নিল না অতীশ।। 'আমি নতুন নই ম্যাডাম। ফিল্মে দশ বছর হয়ে গেছে। মোর দ্যান সত্তর ছবিতে কাজ করেছি।'

মালিনী সেই মোহিনী হাসি হাসলেন, 'আমার সঙ্গে তো নতুন!'

অমনি বিহ্বল হয়ে তাকাল অতীশকুমার। ঠিক সেই সময় সুব্রত চেঁচাল, 'ম্যাডাম, আপনি জোন থেকে বেরিয়ে আসুন প্লিজ।'

'কেন?' ঘাড় বেঁকালেন ম্যাডাম সোম।

'অতীশবাবুকে একবার রিহার্সাল করতে হবে।'

অতীশের দিকে তাকালেন মালিনী সোম। তারপর ভুবনমোহিনী হাসলেন, 'ঠিক আছে, আমিই ওর সঙ্গে রিহার্সাল দিচ্ছি।'

অতীশের মুখে হাসি ফুটল, 'ধন্যবাদ। হেল্প মি টু হেল্প য়ু।'

'তার মানে?' কপালে ভাঁজ পড়ল ম্যাডাম সোমের।

'আমি ভালো করলেই তো আপনি আরও ভালো করবেন, তাই না?'

'ঠিক বলেছ, ভাই।'

এবার হাসল অতীশকুমার, 'আমি কিন্তু আপনাকে দিদি বলতে পারব না।'

সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে তাকালেন ম্যাডাম সোম, 'কেন?'

'তাহলে আপনার সঙ্গে প্রেমের সংলাপ বলব কী করে।'

'উম্‌ম।' মিসেস সোমের ঠোঁট যুক্ত হলো।

কিন্তু তারপর যে ঘটনাগুলো একটার পর একটা ঘটে গেল তার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না সুব্রত। ইউনিটের সবাই সে সব দেখেছে এবং বুঝছে। তাই নিয়ে কানাকানিও চলছে স্টুডিও মহলে। এবং এই ধরনের গুজব বাইরে বেরিয়ে যাবেই, গিয়েছেও। যদিও কোনো পত্রিকার গুজব-কলমে ঘটনাটা ওঠেনি তবে জানতে বাকি নেই কারো। সুব্রতর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। অতীশের শ্যুটিং না থাকলেও সে এসে বসে থাকে ফ্লোরে। টেকিং শেষ হলেই তার পাশে বসে গল্প করেন ম্যাডাম সোম। ধারেকাছে আর কারও চেয়ার তখন রাখা যাবে না। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে হরিপদ সাহা ফ্যাল ফ্যাল করে সেদিকে তাকাল। এমন কি ম্যাডামের মেকআপ রুমেও মাঝে মাঝে ডাক পড়ে অতীশের। এসব ঘটনা দেখেও দ্যাখে না সুব্রত।

কিন্তু মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে যায়। এখন তার আর্থিক কষ্ট নেই। পরিচালক হিসেবে তার পাওনা টাকা হরিপদবাবু দিয়েছেন। প্রত্যেক দিন শ্যুটিং-এর পরে সুদেষ্ণার সঙ্গে তার দেখা হয়। সুদেষ্ণাকে সে কথা দিয়েছে এই ছবি হিট করলেই তারা বিয়ে করবে। ম্যাডাম সোমের ঘটনাটা ওকে বলেছিল সুব্রত। তার ফ্লোরে সুদেষ্ণা বাইরের লোক নয়।

সব শুনে সুদেষ্ণা বলেছে, 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'ইউনিটের সবাই দেখেছে আর বিশ্বাস না করে পারি। দুজনের বয়েসের পার্থক্য অন্তত পঁচিশ বছরের। উনি কি করে অতীশের প্রেমে পড়লেন তাই বোধগম্য হচ্ছে না। ভদ্রমহিলা সম্পর্কে ইমেজ ছিল।'

সুদেষ্ণা বলেছিল, 'আমি বলছি ব্যাপারটা সত্যি নয়। অতীশকুমার কি ওঁর বাড়িতে যায়? মানে স্টুডিওর বাইরে ওদের দুজনের কোনো সম্পর্ক আছে?'

এখবরটা জানত না সুব্রত। পরদিন হরিপদ সাহা যখন তাকে একান্তে বললেন, 'এরকম ব্যাপার তো চুক্তিতে ছিল না মশাই। ফিল্মের সংলাপ ছাড়া উনি অন্য কারো সঙ্গে একটা কথাও বলবেন

না এই রকম তো বলেছিলেন।'

'তাতে আপনার কী ক্ষতি হচ্ছে?'

'ক্ষতি?' এত বছর বাদে ফিরে এসে উনি বাচ্চার প্রেমে পড়েছেন, এই খবর শুনলে পাবলিক আর ওঁকে রেসপেকট করবে?' হরিপদ সাহা উত্তপ্ত।

'পাবলিক ওঁর অভিনয় দেখবে, ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে নিশ্চয়ই মাথা ঘামাবে না। তাছাড়া আমি খবর পেলাম অতীশকে উনি কোনোদিন বাড়িতে অ্যালাউ করেননি। এমন কি স্টুডিও থেকে ফেরার সময় কোনোদিন এক গাড়িতে ওদের দেখা যায়নি। এসব ব্যাপার নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছেন? এই ছবিতে অতীশ অসাধারণ অভিনয় করছে। ওর ক্যারিয়ারে এটাই বেস্ট। কী করে সম্ভব হলো তা ভেবেছেন?' হরিপদ সাহা মাথা নাড়লেন, 'তা ঠিক। এরকম উৎসাহ পেলে পঙ্গুও পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে পারে। কিন্তু মহিলা আমার সঙ্গে একদিনও ভালো ভাবে কথা বললেন না। বিয়িং এ প্রডিউসার আমি খুব ইনসালটেড বোধ করছি।'

'কেন, সেদিন তো আপনার সঙ্গে কথা বলতে দেখলাম।' সুব্রত হাসল।

'মামলা করতে বলছিল। আরে মশাই, মামলা করলে তো নিজের বিরুদ্ধে মামলা করতে হয়।'

'তার মানে?'

'কাগজে ছাপা হয়েছে বলে যদি মামলা করি তাহলে টিকবে মামলা? প্রমাণ করতে পারব যে ম্যাডাম আমার ছবিতে কাজ করছেন না? করলেও কোনোদিন এই ছবি আমি রিলিজ করতে পারব? নিজের গলায় নিজের হাতে ছুবি মারতে হবে। মহিলার কী রকম প্ল্যান দেখেছেন? বলে কিনা মামলা করুন।' হরিপদবাবু উত্তেজিত।

'আপনি কী করলেন?'

'আমি একটা চিঠি কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছি। এই সংবাদ আমার মুখ থেকে কেউ শোনে নি। যা ছাপা হয়েছে তা সাংবাদিকের নিজের দায়িত্বে হয়েছে।'

'চিঠি ছাপা হয়েছে?'

'হবে না, সেটা যাতে না হয় তাই ভেতর থেকে চেপে দিয়েছি। কিন্তু চিঠি যে দিয়েছি তার রসিদ রেখে দিয়েছি। ম্যাডাম জিজ্ঞেস করলে দেখাব। তা আর জিজ্ঞাসা করার কথা কি ওঁর মাথায় আছে? অতীশ ছোঁড়াকে নিয়ে দিনরাত গুন গুন করে যাচ্ছেন। আর অতীশেরই বা কী দোষ? ফিগার দেখেছেন? উঃ! ওঁর শ্যুটিং থাকলে আমি রাত্রে ঘুমাতে পারি না।' ফোঁস করে নিঃশ্বাস পড়ল।

'হরিপদবাবু, ম্যাডামের বয়স কত তা জানেন?'

'রাখুন মশাই বয়স। উর্বশী রম্ভা অপ্সরাদের কি বয়স বাড়ে? এভারগ্রিন! চির যৌবনবতী। একটা করে হাসছে আর আমার ছবির এক এক সপ্তাহ হাউসফুল বাড়ছে। ও হ্যাঁ, সুধীর গড়গড়ি আমাকে খুব ধরেছে। ওর নেক্সট ছবি 'সাতরঙের পাকে'র নায়িকার রোলে ম্যাডামকে রাজি করিয়ে দিতেই হবে। তা আমি বলেছি করবে না; বলছে রাজি করিয়ে দিতে পারলে হাজার দশেক ব্ল্যাক দেবে কমিশন। পারবেন নাকি রাজি করাতে? ফিফটি ফিফটি?' শেষ কথাগুলো ফিসফিস করে বললেন হরিপদ সাহা।

হেসে ফেললো সুব্রত। তারপর বলল, 'আপনি কি চাইছেন এই ছবিটা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাক? দিস ইজ হার লাস্ট ফিল্ম। তাতে এই ছবির ডিমান্ড আরও বাড়বে। ওসব প্রস্তাবে

মোটেই কান দেবেন না।'

হরিপদবাবু মাথা নাড়লেন, 'ঠিক কথা, ঠিক কথা।'

শ্যুটিং চলছিল। মালিনী সোমের অংশগুলো প্রথমে তুলে নিচ্ছিল সুব্রত। টানা শ্যুটিং চলছে। মালিনী সোমের সঙ্গে কাজের বাইরে কম কথা হয় সুব্রতর। দারুণ চাপের মধ্যে থাকায় চোখে সরষে ফুল দেখছে সুব্রত। একদিন শ্যুটিং-এর শেষে হরিপদবাবু তাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গেলেন, 'দশ দিন কাজ বন্ধ রাখতে হবে ভাই।'

আজকাল উনি খুবই মধুর সম্বোধন করে থাকেন। আঁতকে উঠল সুব্রত, 'কেন?'

'হাতে টাকা নেই। ব্যবস্থা করতে দশটা দিন লাগবে।'

'টাকা নেই মানে?' সুব্রত হতভম্ব।

'আমি কী করব, একবছরের টাকা একমাসে খরচ করতে গেলে একজন গৌরী সেন দরকার হয়। আমার কি জানা ছিল দুমাস আগেই যে, এই বিপদে পড়তে হবে। এর মধ্যে লাখ পাঁচেক গলে গিয়েছে। যাদের যাদের কাছে ধারের জন্যে যাচ্ছি সে-ই মোটা সুদ হাঁকছে। এখন আমার হাতে একটাও পয়সা নেই।' রুমালে মুখ মুছলেন তিনি।

মাথায় বাজ পড়ল যেন। সুব্রত শূন্য চোখে তাকাল। ক্রমশ তার চোয়াল শক্ত হয়ে এল, 'আপনি তো প্রথম থেকেই জানতেন যে এইভাবে খরচ হবে। তাহলে রাজি হলেন কেন?'

'ভেবেছিলাম ম্যানেজ করতে পারব কিন্তু পারলাম না। পাঁচজনকে কিছু বলার দরকার নেই, আপনি দশদিন বাদে শ্যুটিং ফেলুন, আমি এর মধ্যে ঠিক— ।'

'অসম্ভব। ম্যাডাম রাজি হবেন না।'

'কেন? রাজি হবেন না কেন? দু'মাস শেষ হতে এখনও বেশ দেরি আছে। রাজি না হলে তাঁকেই বলুন না একটা কাবলিওয়ালা ঠিক করে দিতে, ধার করছি। আমি স্পষ্ট বলে দিলাম দশদিন শ্যুটিং বন্ধ রাখতে হবে।'

হরিপদবাবু সরে গেলেন সামনে থেকে। সুব্রত ভেবে পাচ্ছিল না সে কী করবে। আর্টিস্টরা যে যার বাড়িতে চলে গিয়েছে। কাল সকাল দশটায় একটা আউটডোর রয়েছে। মালিনী সোমের জন্যে পুলিশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলকাতা থেকে আঠারো কিলোমিটার দুরে। উনি বাড়ি থেকে যাওয়া-আসা করবেন। আজ সন্ধের পরেই টেকনিসিয়নদের সেখানে রওনা হওয়ার কথা। তারা সেইভাবেই তৈরি হয়ে এসেছে, এখন শ্যুটিং ক্যানসেলড্ জানলে সবাই বুঝে যাবে টাকা-পয়সা হাতে নেই। কারণ অন্য কোনো দুর্ঘটনার কথা তারা জানে না। তাছাড়া সমস্ত ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যাচ্ছে যখন, তখন সবাইকে আজ রাত্রের মধ্যেই জানানো দরকার।

বেশ কিছুক্ষণ ঝিম ধরে বসে রইল সে। কিছুই করার নেই। অন্তত লাখখানেক টাকার দরকার। তার কাছে সেটা আকাশকুসুম। সে সহযোগীদের দিকে তাকাল। ওরা এখন হরিপদবাবুর মুখে জেনে গেছে কাল থেকে শ্যুটিং হবে না। কেউ কেউ এবার জিজ্ঞাসা করতে এল সুব্রতকে। সুব্রত বলল, 'তোমরা যা শুনেছ আমিও তাই শুনেছি।'

'শ্যুটিং কবে থেকে?'

'সেটাও বলা যাচ্ছে না।'

'কী আশ্চর্য! আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য বসে থাকব?'

সুব্রত ঘাড় নাড়ল। এর অর্থ সে নিজেই জানে না। সে উঠল। হরিপদবাবু ধারে কাছে নেই। সুব্রত সহকারীদের বলল তার জন্যে অপেক্ষা করতে। শ্যুটিং-এর সময় হরিপদবাবু দুটো গাড়ি

সবসময়ে হাতের কাছে রাখতেন। তার একটা নেই, দ্বিতীয়টাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। ড্রাইভারকে বলল মালিনী সোমের বাড়িতে যেতে। যাবার আগে এই ভদ্রমহিলাকে জানানো দরকার, কাল শ্যুটিং হচ্ছে না। ওঁকে আউটডোরে যেতে হবে না। সন্ধের অন্ধকারে আলিপুরের দিকে যেতে যেতে তার মনে হলো সব শেষ হয়ে গেল! মন্দ বরাত তার কোনোদিন শেষ হবে না। এত আশা জাগিয়ে শেষ পর্যন্ত সব চুরমার হয়ে যাবে? সে ঠিক করল যেমন করেই হোক মালিনী সোমকে রাজি করাবে। দশ দিন পিছিয়ে যাওয়া মানে ডাবিং দুই মাসের মধ্যে হবে না তাহলেই চুক্তি শেষ হয়ে যাবে। ভেতরে ভেতরে কাঁপুনি অনুভব করল সে।

মালিনী সোমের ড্রইংরুমে পৌঁছতে সামান্য ঝামেলা হয়েছিল। দারোয়ান তাকে জানিয়েছিল, ম্যাডাম খুব ক্লান্ত, এখন দেখা হবে না। সে বারংবার অনুরোধ করতে ভেতর থেকে ছাড়পত্র এলো। সোফায় বসে অভ্যাসে সিগারেটের প্যাকেট বের করে আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখল সে। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে মালিনী সোম ঘরে এলেন। সাদা ম্যাকসি তাঁর পরনে, চুল খোলা। হাঁটতে যেন কষ্ট হচ্ছিল, মুখে ক্লান্তির ছাপ, 'কী ব্যাপার, হঠাৎ?'

সুব্রত উঠে দাঁড়াল, 'আপনার শরীর কী খারাপ?'

'আঃ, সুব্রত ডোন্ট আসক্ মি দ্যাট কোশ্চেন। এমন কী কথা যা সারাদিনে বলতে পার না। আমি পছন্দ করি না কাজের শেষে কেউ আমাকে ডিস্টার্ব করুক।'

কথাগুলো বলার সময়ে খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছিল ওঁর।

'আমি বাধ্য হয়েছি এখানে আসতে।'

'বাধ্য? আশা করি তুমি ওই রাস্তামুলো অতীশটার ভূমিকা নিচ্ছ না?'

'তার মানে?' সুব্রত অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

'তুমি কেন এসেছ এখানে?'

'আপনি কী ভাবছেন?'

'আমি টায়ার্ড সুব্রত। তোমার এই অতীশকুমারের সঙ্গে আমার শুটিং শেষ হয়েছে?'

'আর একদিন আছে।'

'গুড় গড়। তুমি ওর কাছে কেমন কাজ পেলে সুব্রত?'

'আমি এই জন্যে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'কৃতজ্ঞতা? থাক, কেন এসেছ?'

সুব্রত স্পষ্ট চোখে তাকাল, 'কাল থেকে শ্যুটিং বন্ধ।

'সেকি? কেন?' চমকে উঠলেন মালিনী সোম।

'হরিপদ সাহার হাতে এই মুহূর্তে আর টাকা নেই।'

'টাকা নেই? কই, সারাদিনে একথা একবারও জানাও নি কেন?'

'আমি জানতাম না। একটু আগে জেনেছি।'

হঠাৎ পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলেন মালিনী সোম, 'কী ধরনের ডিরেক্টার তুমি? স্যুটিং হবে কি না জানো না? ওঃ ভগবান! শেষবার তুমি আমাকে দিয়ে কি ভুল করালে! লোকে বলবে মালিনী সোম একটা ছেলের কথায় ভুলে এমন ছবি করল, যা কোনোদিন সম্পূর্ণ হবে না। কেন বলোনি পুরো টাকা হাতে নিয়ে তোমরা কাজে নামছ না?'

'আমি জানতাম না, বিশ্বাস করুন।'

'তুমি কিছুই জানো না। অথচ! ঠিক আছে, বেরিয়ে যাও।'

'আপনি আরও দশটা দিন—।'

'নোঃ।' সুব্রতকে থামিয়ে দিলেন মহিলা, 'আর সম্ভব নয়। আর সময় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ছবিটাকে শেষ না করে আমি যেতে পারব না। আই মাস্ট ফিনিশ ইট। কত টাকা লাগবে তোমার ডাবিং কমপ্লিট করতে?'

সুব্রত অনুমানে অঙ্কটা বলল। মহিলা এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। তারপর ধীরে ধীরে ভেতরে চলে গেলেন। সুব্রত ঠিক বুঝতে পারছিল না সে, কী করবে। ম্যাডাম তাকে বসতে বলেননি, ভীষণ বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। ঠিক সেই সময় পরিচারিকাটি এগিয়ে এলো। ওর হাতে ছোট্ট একটা ব্রিফকেস। পরিচারিকাটি ওর দিকে একটা চিঠি এগিয়ে দিল, 'সুব্রত, এখানে, টাকাটা আছে। কাল সকালে আমি আউটডোরে যাচ্ছি। ধন্যবাদ।'

সুব্রত চোখ বন্ধ করল, ওর শরীর কাঁপছে কৃতজ্ঞতায়।

মালিনী সোম পুনশ্চ লিখে জানিয়েছিলেন, সে যেন টাকার কথাটা কাউকে না জানায়। সেই সন্ধেয় আর দেখা করলেন না মালিনী সোম। টাকাটা নিয়ে গাড়িতে উঠে সোজা চলে এল সে স্টুডিওতে। কাল শ্যুটিং হবে শোনামাত্র সহকারীর উজ্জীবিত হলো। হরিপদ সাহাকে টেলিফোন করল সুব্রত, 'দশ দিনের মধ্যে টাকা পাবেন?'

'চেষ্টা করছি ভাই। এ তো প্রাণের দয়ায়।'

'হ্যাঁ তাই করুন, আপনি কি আগামিকাল আউটডোরে যাচ্ছেন?'

'আউটডোরে? তার মানে?'

'কাল তো আউটডোরের কথা ছিল এবং তাই হবে।'

'সেকি? টাকা, টাকা কোথায়?'

'আমি ধার করেছি।'

'ধার? তাই নাকি।' কত সুদ?'

'ভালোবাসা।' কথাটা বলে লাইন কেটে দিল সুব্রত।

আজ ছবির শেষ শ্যুটিং। সরমা তপনের ছেলেকে বাঁচানোর জন্যে ওর কিডনি দান করেছে। খবর এসেছে ছেলেটি বেঁচে যাবে। ডাক্তাররা আপত্তি করেছিলেন। সরমার শরীর রক্তাল্পতায় ভুগছে। এই অবস্থায় অপারেশনে ঝুঁকি আছে। নিষেধ শোনেনি সরমা। জিজ্ঞাসা করেছে তার নিজের লিভার ঠিক আছে কি না। সেটার কোনো খুঁত নেই জানে সে জোর করেছে, বন্ড লিখে দিয়ে অপারেশন করিয়েছে। তারপর কয়েকটি নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে সরমা জেনেছে তপনের স্ত্রী তার এই দেওয়াটাকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। সেই একই হাসপাতালে আর একটি লিভার রিপ্লেসমেন্ট কেসের সঙ্গে কথা বলে সরমারটা তাদের দিয়ে তাদেরটা নিজের ছেলের শরীরে বসানোর ব্যবস্থা করেছে। খবর শোনামাত্র তার মাথা ঘুরে গেল। পড়ে যাওয়ার সময় সে হাসপাতালের বিছানার কোনায় আঘাত পেল। এবং এখন সে মৃত্যুর মুখোমুখি। এই অবস্থায় ছুটে এসেছে তপন। ডাক্তারদেরও কিছু করার নেই।

আজ এই দৃশ্যটি তোলা হবে। গতরাত্রে একফোঁটা ঘুম হয়নি সুব্রতর। দৃশ্যটা কীভাবে ক্যামেরায় নেবে তা স্ক্রিপ্ট লেখার সময় সে ভেবেছিল। কাল নতুন করে ভাবতে গিয়ে যে মুখটা বারংবার মনে পড়েছিল, সেটা তার দিদির। দিদি আজ নেই। বহরমপুরে গরিব মাস্টারমশাই-এর ছেলেমেয়ে ওরা। শিশুবয়সে বাবা মারা যাওয়ার পরে সংসারের সমস্ত দায়দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছিল দিদি। তিল তিল করে তাদের মানুষ করেছিল নিজের ভবিষ্যৎ কিংবা সুখের কথা না ভেবে। সে দিদি আজ নেই। তিন দিনের জ্বরে তাকে পৃথিবী ছেড়ে যেতে হয়েছিল তখন সেই মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত

ছিল সুব্রত। আজকের মৃত্যুর দৃশ্যটি চিন্তা করলেই তার দিদির মুখ মনে পড়ে। মারা যাওয়ার সময় দিদির প্রতিটি ভঙ্গি সে চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পায়। বস্তুত চিত্রনাট্যের ওই অংশটি সে দিদিকে সামনে রেখেই লিখেছে। দিদির প্রতি তা সামান্য শ্রদ্ধাঞ্জলি।

যেহেতু দৃশ্যটি গুরুত্বপূর্ণ তাই সেদিন সবাই খুব সিরিয়াস। বাইরের লোককে কখনই সেটে ঢুকতে দেওয়া হতো না, সেদিন যেন একটা মাছিও ঢোকেনি। ঠিক দশটায় ম্যাডাম সোম এলেন। সময় ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে চলেন ভদ্রমহিলা।

আজ সহকারী নয়, সুব্রত নিজে এগিয়ে গেল ওঁর সামনে, 'আজকের দৃশ্যটা আপনি জানেন, ছবির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।'

অতীশকুমার উজ্জ্বল মুখে কাছেই দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে একবারও না তাকিয়ে ম্যাডাম বললেন, 'টেক করো।'

আজ কথাটাকে মানতে পারল না সুব্রত। বলল, 'আমার ইচ্ছে আজ এক বার রিহার্সাল দিয়ে নিন। আমি যেমনটা চাইছি—।'

'তুমি কী চাইছ?'

সুব্রত বিশদ ব্যাখ্যা করল। কথাগুলো চোখ বন্ধ করে শুনলেন ম্যাডাম সোম।

তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, টেক করো।'

সুব্রত অতীশকুমারের দিকে তাকাতে সে বলল, 'সুব্রতবাবু, আমি কালকে এই দৃশ্যটা অনেকবার রিহার্সাল দিয়েছি বাড়িতে। এই প্রথম একটা ছবির জন্যে আমি বাড়িতে পরিশ্রম করলাম। আমার জন্য চিন্তা করবেন না, টেক করুন।'

সাদা বিছানায় সরমা শুয়ে। তার শরীরে নানান নল বাঁধা। চোখ এবং ঠোঁট খোলা। চোখের সামনে তপন দাঁড়িয়ে আছে অপরাধীর ভঙ্গিতে। সুব্রত চিৎকার করল, 'স্টার্ট।' ক্যামেরা চালু হলো। সাউন্ড। প্রত্যেকটা মানুষের চোখ এখন ম্যাডাম সোমের দিকে। তিনবার চোখের পাতা বন্ধ করল এবং খুলল। ঠোঁটও কাঁপল। তারপর ডান হাতটা ধীরে ওপরে উঠতেই সুব্রত চিৎকার করল, 'কাট্।'

তখনও ম্যাডামের সংলাপ শুরু হয়নি। তিনি হতচকিত। অবাক হয়ে তাকাল অতীশ। সেটের সমস্ত হতভম্ব, ভুলটা কী হলো? সুব্রত দ্রুত মাথা নাড়ল, 'আপনার কিছুই হচ্ছে না।, ম্যাডাম। আমি যা চাইছি তার টেন পার্সেন্টও না।

'তার মানে?' সাপের মতো ফোঁস করে উঠলেন মালিনী সোম।

চোখ বন্ধ করল সুব্রত। বন্ধ চোখের পাতায় সে নিজের দিদির মুখ দেখতে পেল, 'আপনি মৃত্যুশয্যায়। পৃথিবীতে বাস করার আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। তপনকে দেখে আপনার উদার হতে ইচ্ছে করবে। শুধু যন্ত্রণা নয় সেই সঙ্গে ভালোবাসা স্পষ্ট হবে। তপনকে দেখামাত্র কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষাটা আবার ফিরে আসতে চাইবে। আমার দিদি ঠিক এইভাবে পৃথিবী থেকে গিয়েছিলেন। আই ওয়ান্ট য়ু টু ডু দ্যাট।'

'আমি যা করছি ঠিক করছি।'

'না, ঠিক করলেন না।'

'তুমি আমাকে অপমান করছ সুব্রত।'

'আপনি খামাকো অপমানিত হচ্ছেন। এই দৃশ্যটায় আমি আপনার সঙ্গে কোনো রকম আপস করব না। আমি যা বলব তা আপনাকে শুনতে হবে।'

'হোয়াট? এত বড় কথা বলার স্পর্ধা তোমার?'

'স্পর্ধা নয়, যোগ্যতা। আমি পরিচালক আপনি অভিনেত্রী।'

এই সময় হরিপদবাবু দৌড়ে এলেন সামনে, 'কিন্তু সুব্রতবাবু, ম্যাডাম তো দারুণ করেছিলেন। আমার চোখে জল এসেছিল দেখতে দেখতে। আপনি অতবড় অ্যাকট্রেসকে ওইভাবে বলবেন না---মানে---।' সুব্রতর চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন ভদ্রলোক।

সুব্রত বললো, 'আপনি এই মুহূর্তে বাইরে চলে যান।'

'আমি---আমি বাইরে চলে যাব?'

'হ্যাঁ। আপনি আমাকে বিরক্ত করছেন। ছবির পরিচালক আপনি না আমি?'

'আপনি?'

'ঠিক না বেঠিক সেটা আমি বুঝব।'

'তা ঠিক।'

'আই সে ইউ গেট আউট প্লিজ।'

'আমি ছবির প্রযোজক।'

'প্রযোজকের যা কাজ তাই করুন। এই সেটের স্যটিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনি ফ্লোরে থাকবেন না। আমাকে কাজ করতে দিন।' সুব্রত রূঢ় ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল। হরিপদবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। এতগুলো লোকের সামনে তিনি অপমানিত হয়েছেন। কিন্তু আর তর্ক করলেন না তিনি। ধীরে ধীরে মেকআপ রুমের দিকে গেলেন। সমস্ত ফ্লোর স্তব্ধ। ডিরেক্টার প্রডিউসারকে সেট থেকে বের করে দিয়েছে, ম্যাডাম সোমের মতো অভিনেত্রীকে বলেছে, ঠিক হয়নি। এরকমটা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। ম্যাডাম সোম এতক্ষণ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন। সুব্রত তার কাছে এগিয়ে এলো, 'আপনি বড় অভিনেত্রী। আপনার এমন ভুল হচ্ছে কেন?'

'কিছুই ভুল হয়নি।'

'হচ্ছে। আর যদি বলেন ভুল হয়নি তাহলে বলব এত বছরে আপনি অভিনয়ের 'অ' শেখেননি। শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভুলিয়েছেন।'

ফ্লোরে যেন বাজ পড়ল! মিসেস সোম বাক্‌শক্তিরহিত। সুব্রত বলে যাচ্ছিল, 'ফিল্ম হলো ডিরেক্টারস মিডিয়াম। পরিচালক যা চাইছেন তাই হবে। যে কোন অভিনেতা অভিনেত্রীর সেটা জানা দরকার। পরিচালক যা চাইছেন তা যদি করা না সম্ভব হয় তা হলে তিনি কিসের অভিনেতা বা অভিনেত্রী?'

ম্যাডাম সোমের সমস্ত শরীব কাঁপছিল। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ করলেন, 'আমার ভুলটা কোথায়? কী চাইছ তুমি?'

'আপনি অকারণে মেলোড্রামা করছেন। চোখ বা ঠোঁট কাঁপাচ্ছেন ঠিক আছে। হাত উঠবে কেন? ওটা পুরনো আমলের দর্শক কাঁদানোর চেষ্টা। আজকের দিনে লাইফ অ্যাক্টিং চাই। আমি তাই বিশ্বাস করি। ওরকম হাত কাঁপানোর চাইতে শুধু পাথরের মতো চেয়ে থাকা অনেক বেশি বাস্তব।'

'টেল মি হোয়াট ইউ ওয়ানট।' আদেশ হলো যেন।

সুব্রত একটা টুল নিয়ে বিছানার পাশে বসে ছোট ছোট ডিটেলস সমেত সে যা ভেবেছে খুলে বলল। বলতে বলতে তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল। এবং কথা শেষ করার সময় দিদির মুখটা সামনে এসে যাওয়ায় চোখের পাতা ভিজে উঠল।

সেদিকে তাকিয়ে মালিনী সোম বললেন, 'ঠিক আছে, একটা রিহার্সাল দিচ্ছি।'

'আপনি রিহার্সল দেবেন?' অতীশ অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। এই প্রথম।'

রিহার্সালে সুব্রত কয়েকটা ত্রুটি ধরিয়ে দিল। অতীশকুমারকেও সে আগাগোড়া পাল্টাল। তারপর নিজের মনের মতো করে ঠিক করল দৃশ্যটা। সেট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে মিসেস সোম বললেন, 'আর ইউ স্যাটিসফায়েড?'

সুব্রত তৃপ্তির হাসি হাসল, 'হ্যাঁ।'

ঠিক সময়ে ডাবিং শেষ করল ছবির। হরিপদবাবুর অভিমান ভাঙাতে সময় লাগেনি। সুব্রত তাকে বলেছিল, 'মিসেস সোমকে আমি সরাসরি রূঢ় কথা বলতে পারছিলাম না। আপনি আমাকে সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আপনি যখন নাক গলালেন তখন আমার সুবিধে হলো। আপনার ওপর বর্ষণ করে আমি ওঁকে বোঝাতে পারলাম যে, যা চাইছি তা করতে হবে। আমি সফল হয়েছি।'

হরিপদবাবু কথাটা বিশ্বাস করেছিলেন কি না বোঝা যায়নি কিন্তু এ নিয়ে আর কোনো কথা বলেননি। ডাবিং-এর শেষ দিনে মিসেস সোম খবর দিয়েছিলেন ওঁর আসতে দেরি হবে। শুধু শেষ দৃশ্য ছাড়া সব কাজ হয়ে গিয়েছিল। মিসেস সোম এলেন বেশ বেলায়। তাঁকে দেখে অতীশকুমার এগিয়ে গেল, 'কী হয়েছে?'

সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়ভাবে 'না' বলতে চেষ্টা করলেন তিনি। অতীশের সঙ্গে একটাও কথা বললেন না। সুব্রতকে অনুরোধ করলেন খুব দ্রুত কাজ শেষ করতে। তপনের সংলাপ ছিল, 'সরমা, আমাকে ক্ষমা করো। আমি—'

'তপন!' ওভাবে বলো না।' পর্দায় তখন সরমার ঠোঁট নড়ছে।

'কিন্তু আমার জন্যে, শুধু—।'

'তপন! আমার কোনো কষ্ট নেই। আমি যখন থাকব না তখন এ নিয়ে মন খারাপ কোরো না। নিঃস্বার্থভাবে কাউকে কিছু দিতে পারার মধ্যে যে আনন্দ তা তুমি জানো না। আমি সুখী, খুব সুখী। আমি এখন চুপচাপ চলে যেতে চাই।'

শেষ সংলাপটা বলেই ঘুরে দাঁড়ালেন মিসেস সোম। সামনের পর্দায় তখনও তাঁর মুখের ক্লোজ আপ। সংলাপটা বলার সময় তাঁর কণ্ঠে যে নির্লিপ্ত আবেগ ফুটে উঠেছিল তা স্পর্শ করেছিল সমবেত সমস্ত মানুষকে। তারা বিহ্বলভাবে দুপায়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, আর মিসেস সোম তাদের মাঝখান দিয়ে মাথা উঁচু করে নীরবে বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধেবেলায় সুব্রত টেলিফোন করেছিল। পরিচারিকা ফোন ধরে পরিচয় জানার পর বলেছিল, উনি এখন কারো সঙ্গে কথা বলবেন না। পর পর কয়েকদিন চেষ্টা করল সুব্রত, সেই একই উত্তর।

এডিটিং শেষ হয়ে গেল, সেন্সার সার্টিফিকেট পাওয়ার পর রিলিজের তারিখ ঠিক হয়ে গেল। ছবি দেখে হরিপদবাবু খুব উত্তেজিত। হাউস থেকে ভালো অ্যাডভান্স পাওয়া গিয়েছে। প্রত্যেকটা কাগজে খবর বেরিয়েছে মিসেস সোম দশ বছর পর ফিল্মে ফিরে এসে সুব্রত রায়ের ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। জনসাধারণের আগ্রহ তীব্র হয়েছে ছবিটা দেখার জন্যে।

অতীশকুমার প্রায়ই তাকে জ্বালাচ্ছে, কী ব্যাপার বলুন তো? হঠাৎ ভদ্রমহিলা এমন পাল্টে গেলেন কেন? ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতেই পারছি না। ফোন করলে কেউ না কেউ বলে উনি ব্যস্ত আছেন। আমাকে পর্যন্ত দারোয়ান ঢুকতে দেয়নি। আপনার সঙ্গে ওঁর দেখা হয়? মাথা নেড়ে না বলেছিল সুব্রত। আর তখনই তার মনে হয়েছিল সুদেষ্ণার অন্তর্দৃষ্টি কত স্বচ্ছ। ম্যাডাম সোম অতীশকুমারের সঙ্গে ততদিনই সম্পর্ক রেখেছিলেন যতদিন তাঁর শুটিং ছিল। অতীশকে

সহজ করার, সাবলীল অভিনয় করানোর জন্যে তিনি এমন করেছিলেন এটা অতীশের মাথায় ঢুকবে না। বেচারা! হরিপদবাবুকে ছবি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর থেকেই তাগাদা দিচ্ছিল সুব্রত। ম্যাডাম সোমকে তাঁর টাকাটা ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সে স্বস্তি পাচ্ছিল না। প্রতিবারই হরিপদবাবু বলছিলেন, 'আরে দাঁড়ান মশাই, 'দু'এক মাসের সুদ বাড়ছে এই তো? তা বাড়ুক। সব সুদে-আসলে পুষিয়ে দেব দেখবেন।'

কিন্তু রিলিজের তারিখ ঠিক হওয়া মাত্র সুব্রত টাকাটা আদায় করল হরিপদবাবুর কাছ থেকে। সুদের হিসাব যখন ভদ্রলোক চাইলেন তখন সত্যি কথাটা না বলেও পারল না। চমকে গেলেন হরিপদবাবু, তার চোখ মুখে অবিশ্বাস স্পষ্ট। সুব্রত পকেট থেকে ম্যাডাম সোমের চিঠিটা বের করে তাঁকে দেখাল। তারপর বলল, মিথ্যে বলে আপনার কাছ থেকে সুদ আদায় করতে পারতাম কয়েক হাজার টাকা— করিনি। সুতরাং এ বিষয়ে কাউকে কোনো গল্প করবেন না।

মৃত মানুষের মতো মাথা নাড়লেন হরিপদবাবু, 'নিজের লজ্জার কথা নিজের মুখে কী করে বলব? একজন অ্যাকট্রেসের টাকায় ছবিটা শেষ করলাম? এ যে বিনোদিনী, বিনোদিনীর গল্প জানেন? স্টার থিয়েটারের?'

সুব্রত বলছিল, 'যাত্রা করবেন না। আপনি কি আমার সঙ্গে ওঁর কাছে যাবেন?'

'কেন?' ভীষণ দুর্বল মনে হচ্ছিল হরিপদবাবুকে। ম্যাডাম সোমের কাছ থেকে টাকা আনা হয়েছে শোনার পর থেকেই কেমন যেন মিইয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

'বাঃ, রিলিজের দিন দেখতে আসার জন্য নেমন্তন্ন করবেন না?'

'যাওয়া উচিত। অবশ্যই যাওয়া উচিত। কিন্তু যেতে আমার ভয় করছে। সুব্রতবাবু, আপনি বরং যান। আপনার সঙ্গে সম্পর্কটা ভালো। এই টাকাটা দিয়ে আসুন আর নেমন্তন্নও। বলবেন আমরা সব ব্যবস্থা নেব। পুলিশ থাকবে যাতে শো দেখে তিনি ভালভাবে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন। কোনো চিন্তা করতে হবে না। হরিপদবাবুকে এই মুহূর্তে একদম অন্য রকম মানুষ বলে মনে হচ্ছিল।

এখন কলকাতা শহরের যে দিকে তাকাও শুধু মলিনী সোমের মুখ। সেই ভুবনজয়ী হাসি। পরিচালক সুব্রত রায়ের নামটাও মানুষের নজরে পড়ছে এখন। সুব্রত ঠিকই ভেবেছিল, এই মহিলাকে দেখতে এসে লোকে একটা ভালো ছবি দেখে ফেলবে। সুব্রতর আশা পূর্ণ হলো। অ্যাডভান্স টিকিট কেনবার জন্যে মানুষ লাইন দিয়েছে শেষ রাতে।

একহাতে নিমন্ত্রণ-পত্র অন্য হাতে ব্রিফ কেসটা নিয়ে সুব্রত হাজির হলো আলিপুরে। ওর খুব ইচ্ছে ছিল সুদেষ্ণা সঙ্গে যাক। কিন্তু সুদেষ্ণা রাজি হয়নি। বলেছিল, 'এটা তোমাদের ব্যবসার ব্যাপার। তুমিই যাও। তাছাড়া আমি কোন যুক্তিতে যাব?'

'মানে?' সুব্রত হেসে ফেলেছিল, 'তুমি আমার বউ হচ্ছো!'

'হই আগে। তার আগে তো কোনো সম্পর্ক নেই। তাই না?'

সুব্রত জানে সুদেষ্ণাকে আর রাজি করানো যাবে না। মানুষের আবেগ তার নিজের পথে চলে। টাকাটা সঙ্গে নিয়ে যেতে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল আজ। অথচ যেদিন নিয়ে এসেছিল সেদিন কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। একটা বিরাট পাহাড় মাথার ওপর থেকে সরে যাওয়ার আনন্দটাই তখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

গেটে দারোয়ান নেই। সুব্রত ট্যাক্সি থেকে নেমে একটু ইতস্তত করতে লোকটা খইনি টিপতে টিপতে এগিয়ে এলো, 'আরে সাহাব, আপ?'

'ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করব।'

'ভেট তো নেহি হোগা।'

'কেন? খুব জরুরী দরকার।' সুব্রত অনুনয় করব যেন।

'মেমসাব কুঠিমে নেহি হ্যায়।'

'কোথায় গিয়েছেন?'

দারোয়ান কিছু ভাবল; সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে তার দয়া হলো যেন। সে বলল, 'আপ মেরা সাথ আইয়ে।' তাকে নিয়ে বাগান পেরিয়ে সিঁড়ির কাছে আসতেই সেই পরিচারিকার দর্শন মিলল। দারোয়ান ফিরে যেতেই সুব্রত বলল, 'ম্যাডামের সঙ্গে আমার দেখা হওয়া খুব দরকার। কাল আমাদের ছবি রিলিজ করছে।'

'জানি! কিন্তু দেখা হবে না।'

'কেন?'

'ওঁর নিষেধ আছে।'

'কিন্তু এই টাকাটা তো ওঁকে পৌঁছে দিতেই হবে। লাখ টাকার ওপরে আছে।'

ব্রিফকেসটা সামান্য তুলে দেখাল সে।

পরিচারিকার মুখটা পাল্টে গেল টাকার কথা শুনে। তারপর মাথা নাড়ল সে, 'কিন্তু অসম্ভব। দেখা করতে দেবে না। নার্সিং হোমে—।'

'নার্সিং হোমে?' সুব্রত আঁতকে উঠল, 'নার্সিং হোম মানে?'

আর এখন মুখে আঁচল চেপে ডুকরে উঠল পরিচারিকা, 'কাউকে যেন না বলি উনি হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু আমি আর পারছি না।'

'কী হয়েছে ওঁর?'

'জানি না।' মাথা ঝাঁকালো পরিচারিকা। গলায় কান্না পাক খাচ্ছে, 'খুব ভারী রোগ।'

'কবে হয়েছে?'

'অনেক দিন। এখন বাড়াবাড়ি।'

'অ-নে-ক দিন? চার মাস আগেও?'

'হ্যাঁ, তারও আগে।'

সুব্রত কোনো হিসেব পাচ্ছিল না। কী এমন অসুখ যাতে ম্যাডাম সোম দীর্ঘকাল ধরে ভুগছেন। এবং সেই অসুখ নিয়ে তিনি তার ছবিতে কাজ করে গেছেন! সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ নার্সিং হোমে আছেন?'

'পার্ক স্ট্রিটে।' বলেই মেয়েটি উঠল, 'দোহাই আর কাউকে বলবেন না।'

সুব্রত মাথা নাড়ল। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে উঠল। এখন তার কাছে কয়েকটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেল। কেন মিসেস সোম কথায় কথায় বলতেন, আমি খুব টায়ার্ড! কেন বলতেন আমার হাতে বেশি সময় নেই সুব্রত। দু'মাসের মধ্যে ছবির কাজ শেষ করার চুক্তিটার কারণও বোঝা গেল। কিন্তু কী এমন অসুখ যা মিসেস সোম প্রাণপণে চেপে ছবিতে কাজ করে গেলেন। ডাবিং-এর শেষ দিন ওঁকে খুব কাহিল দেখাচ্ছিল, দেরি করেও এসেছিলেন। মনে হয়েছিল শরীর ভালো নেই, কিন্তু—।

পার্ক স্ট্রিটের সেই নার্সিং হোমের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল সে। সামনেই একটা বিরাট হোর্ডিং-এ ম্যাডাম সোমের ছবি। মালিনী সোম অভিনীত সুব্রত রায়ের ছবি। সেদিকে তাকাতে মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল সুব্রতর। শরীরের সমস্ত অসুস্থতাকে অতিক্রম করে কেউ অমন হাসতে পারে?

এখন ভিজিটার্সদের ভেতরে যাওয়ার সময় নয়। রিসেপশনে ম্যাডামের নাম বলতে একটা রহস্যের মুখোমুখি হলো সে। ম্যাডাম আছেন কি না তাই এরা স্পষ্ট করে বলতে চায় না। সুব্রত বুঝতে পারল এই গোপনীয়তা ম্যাডামেরই নির্দেশ। বাংলাদেশের জনপ্রিয় তারকা নিজেকে গোপন রাখতে চান। শেষ পর্যন্ত সে স্পষ্ট বলল, 'দেখুন আমি ওঁর আত্মীয়। চিকিৎসার জন্যে আমায় টাকা আনতে বলেছিলেন।' বলেই ব্রিফকেসটা খুলে টাকাগুলো দেখাল সে। লোকটা খুব ঘাবড়ে গেল এবার। তারপর বলল, 'আপনি একবার ডক্টর মুস্তাফির সঙ্গে দেখা করুন। উনি ওঁর ট্রিটমেন্টে আছেন।'

ডক্টর মুস্তাফি প্রবীণ এবং বিখ্যাত। সুব্রত তাঁকে অনুরোধ করল, 'আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। আজই।'

'অসম্ভব। আমি ডাক্তার হিসেবে কাউকে অনুমতি দিতে পারি না।'

'কিন্তু?'

'আপনি ওঁর কে হন?'

'আত্মীয়। খুব কাছের মানুষ।' ডক্টর মুস্তাফি হাসলেন, 'সেকি, কাছের মানুষ হয়েও জানতেন না?'

সুব্রত ঠোঁট কামড়াল, 'উনি কখনও বলেননি। কী হয়েছে ওঁর?'

'ব্লাড ক্যানসার। ইটস লাস্ট স্টেজ।'

শিউরে উঠল সুব্রত। তার চোখের সামনে এখন অজস্র হলুদ ফুলকি। জিভ হঠাৎ নিঃসাড় হয়ে গেল। কিছু চিন্তা করার শক্তিটা যেন আচমকা নিভে গেল। কোনোরকমে সে উচ্চারণ করল, 'অসুখটার নাম উনি জানেন?' নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন মুস্তাফি। তারপর সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, 'অসম্ভব মনের জোর মহিলার। প্রত্যেক সপ্তাহে এসে একবার চেক-আপ করিয়ে যেতেন। ছবি করা তো ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ আমাকে অনুরোধ করলেন ওঁকে শেষ ছবি করার অনুমতি দিতে হবে। আমি প্রথমে রাজি হইনি। পরে ভাবলাম যদি এতে মনে শান্তি আসে তো আসুক কিন্তু তাতে আরও বেশি ক্ষতি হলো। আফটার অল ক্ষতিটা হতোই।'

'এখন কেমন আছেন?' সুব্রতর শরীর ঝিম ঝিম করছিল।

আজ ভাল কাল খারাপ। ইট ডিপেন্ডস। নিশ্চয়ই জানেন, এই রোগে আমরা শুধু চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি মাত্র। আজকে হয়তো চেতনা নেই কালকে আবার অনেকটা নর্মাল। এখন রিপ্লেসড্ ব্লাডের ডিউরেশন খুব কমে এসেছে।

আমি দেখা করতে চাই।

নো। অন্তত আজ হবে না। মনে হয় কাল উনি কথা বলতে পারবেন। থার্ড ফ্লোরে একশ দশ নম্বর ঘর। বাই দ্য ওয়ে, আপনি যখন ওঁর খুব কাছের মানুষ তখন আশা করব এখনই খবরটা বাইরে চাউর করবেন না। উনি এটা চান না। আপনার নামটা যেন কী বললেন? ডক্টর মুস্তাফি চলে যাওয়ার আগে প্রশ্নটা করলেন।

'সুব্রত রায়।'

সারাটা দিন পাগলের মতো ঘুরল সুব্রত। অকারণে একা-একা বারংবার সে ফিরে এলো সেই বিশাল নার্সিং হোমের সামনে। পার্কের বেঞ্চিতে বসে উদ্দেশ্যহীনভাবে তাকিয়ে রইল। ওই বাড়ির একটা ঘরে মিসেস সোম রয়েছেন এখন চুপচাপ মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। অথচ সেকথা ঘুণাক্ষরে টের পেতে দেননি তাকে। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছিল তার। ছবি করার বাসনায় সে ভদ্রমহিলাকে বাধ্য করেছে পরিশ্রম করতে। জোর করে মৃত্যুকে আরও কাছে এগিয়ে এনেছে।

আজ তার ছবি মুক্তি পাচ্ছে। সারা দেশে প্রচণ্ড কৌতূহল। এ সবই সম্ভব হলো মহিলার জন্যে। নিজের ভবিষ্যতের কথা জানতেন বলে তিনি ছবি শেষ করার জন্যে টাকা দিলেন। একটা প্রচণ্ড কষ্ট সারাদিন সুব্রতকে কুরে কুরে খেল। একথা কাউকে বলা যাবে না। দধীচির দান যে নেয় তার মুখ বন্ধ থাকে। এখন যে কোনো আনন্দ তার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেছে।

দুপুর তিনটেতে ছবি রিলিজ করল। প্রেক্ষাগৃহের ওপরে বিশাল ব্যানারে মালিনী সোমের বিখ্যাত হাসি। হাউসফুল বোর্ডে ম্যাটিনি, ইভিনিং, নাইট লেখা। প্রচুর লোক ভিড় করেছে। ব্ল্যাকাররা টিকিটের বাড়তি দর হাঁকছে। প্রেক্ষাগৃহের উল্টো ফুটপাতে সুব্রত ব্রিফকেস হাতে দাঁড়িয়েছিল। তাকে কেউ চেনে না। কেউ লক্ষ্যই করছে না। সবার নজর মালিনী সোমেব মুখের দিকে। কাল সারারাত একটু ঘুমোতে পারেনি সে। কারও সঙ্গে দেখা করেনি। এমন কি আজকের দিনে সুদেষ্ণার সামনেও দাঁড়াতে চায়নি। হরিপদ সাহা বারংবার ফোন করেছেন, লোক পাঠিয়েছেন তবু সে আড়ালে থেকেছে। নিজের কাছে সে কোনো কৈফিয়ত দিতে পারছিল না। ভদ্রমহিলা কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না, সে বাধ্য করেছে। ছবির দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে বলল, 'তুমি মোরে করেছ সম্রাট। কিন্তু এ কেমন সাম্রাজ্য! বিকেলে নার্সিং হোমে এলো সুব্রত। হাতে ব্রিফকেস, রজনীগন্ধা। সারাদিন স্নান খাওয়া হয়নি তার। সোজা একশ দশ নম্বর ঘরের পর্দার সামনে চলে এসে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। তারপর কাঁপা হাতে পর্দা সরিয়ে ভেতরে পা রাখতেই স্তব্ধ হয়ে গেল সে। ঘরে কেউ নেই। সাদা বিছানা শূন্য। ভীষণ ক্যাটকেটে দেখাচ্ছে সাদাটা। বুকের ভেতর হু হু করে উঠল তার। আর সঙ্গে সঙ্গে কষ্টটা কান্নার চেহারা নিয়ে নিতে থাকল। আর ঠিক তখনই পেছনে গলা শুনল, কী চাই?

সুব্রত অস্পষ্ট দেখল একজন নার্স দাঁড়িয়ে আছেন।

সে মাথা নাড়ল, কিছু চাই না তার। আর কিছু চাওয়া নেই।

কার কাছে এসেছিলেন? নার্স-এর গলায় কৌতূহল।

মালিনী সোম। সুব্রত নিচু করে করিডোরে বেরিয়ে এল। তার পায়ে জোর নেই।

আপনার নামটা জানতে পারি?

সুব্রত অবাক হয়ে তাকাল। তারপর বলল, সুব্রত রায়।

মেয়েটি হাসলেন, এদিকে আসুন।

বিস্মিত সুব্রত দেখল ঠিক উল্টো দিকের দরজায় দাঁড়িয়ে পর্দাটা সামান্য সরিয়ে নার্স বললেন, উনি এখানে।

বিছানায় হাঁটু মুড়ে বসে আছেন মালিনী সোম। তার পেছনে দুটো বালিশ। পরনে সাদা জামা সাদা শাড়ি। শরীরের কোথাও রক্ত নেই। গায়ের রঙ ওই সাদা কাপড়ের মতো, নীরক্ত। গলায় চোখের কোণে মুখের সর্বত্র ভাঁজ। ভীষণ প্রৌঢ়া দেখাচ্ছে ওঁকে। অথচ চোখাচোখি হওয়া মাত্র উজ্জ্বল দাঁতে হাসলেন।

ছবির খবর কী? পাস করেছ?

সুব্রত ঠোঁট নাড়ল। তার কথা বলার শক্তি ছিল না।

তোমার কিন্তু খুব নাম হবে, দেখো। অনেক ছবি পাবে তুমি এবার থেকে। কাল মুস্তাফি বললেন তুমি এসেছিলে। ওই ঘরে গিয়েছিলে?

মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল সে।

শূন্য বিছানা দেখলে?

ঠোঁট চাপল সুব্রত।

কী মনে হলো? অনেক নাটকীয় সংলাপের চেয়ে একটি শূন্য বিছানা বেশি এফেক্‌টিং নয়? আবার হাসি। তারপর অন্য গলায় বললেন, শেষ দৃশ্যটা তোমার মনের মতো করতে পারিনি হয়তো। কী করে পারব? জীবনের সত্যি আর অভিনয়ের সত্যিটা যে আলাদা। তোমার দিদির অনুভূতি আমি কী করে পাব? ভীষণ অন্যমনস্ক হতে গিয়ে সামলে নিলেন, শুনলাম তুমি টাকা নিয়ে এসেছিলে। ওটা রামকৃষ্ণ মিশনকে দিয়ে দিও।

চোখ বন্ধ করলেন মালিনী সোম।

সুব্রতর ঠোঁট থেকে শব্দ হলে, 'দিদি!'

না। আমি যখন থাকব না তখন এ নিয়ে মন খারাপ কোরো না। নিঃস্বার্থভাবে জীবনে তো কিছু করি নি। তাই এবার যে আনন্দ পেলাম, যে আনন্দ তুমি দিলে তার তুলনা নেই। আমি সুখী, খুব সুখী। আমি এখন চুপচাপ চলে যেতে চাই।' কথাগুলো বলে বড় বড় চোখে তাকাল মালিনী সোম।

'কী হলো ডিরেক্টার মশাই, সংলাপটা ঠিকঠাক বলতে পারলাম?' তারপরেই খিলখিল হাসি, 'সুব্রত, যে যার নিজের মতো, কেউ অন্যের মতো হতে পারে না। কিন্তু কি আশ্চর্য, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে, ফুলগুলো দেবে না?' সুব্রত অসাড়ে এগিয়ে এসে ফুলগুলো এগিয়ে ধরতে দুহাতে সেটাকে ধরলেন মালিনী সোম। তারপর হঠাৎ ডুকরে উঠলেন, 'কিছুই করতে পারলাম না সুব্রত। জীবনটা মিছিমিছি নষ্ট হলো।'

সুব্রত মাথা নাড়ল, 'না।'

'না মানে?'

সুব্রতর সমস্ত শরীর কাঁপছিল। কান্নাটাকে সে চেপে রাখতে পারছিল না। এই মহিলা তাকে মায়ের মতো শক্ত জমিতে দাঁড় করিয়ে চলে যাচ্ছেন। মালিনী সোম ওর হাত ধরলেন, 'ছিঃ কেঁদো না। একজন ভালো পরিচালক ঈশ্বরের মতন। সমস্ত আবেগের ওপরে যেতে হয় তাঁকে। তুমি বড় হও, ভাই।'

দিন যায় রাত যায়

শেয়ালদা স্টেশনে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল তিস্তা। গিজগিজ করছে মানুষ। এখন পাঁচটা বেজে তিরিশ, কোনো প্লাটফর্মেই ট্রেন নেই, হাওয়ায় ফোলা মশারির মত মানুষের দঙ্গল টলটল করছে। নিঃশ্বাস ফেলল তিস্তা, হয়ে গেল আজ!

ভিড় যতটা বাঁচানো সম্ভব, এক কোণে ব্যাগটাকে বুকের ওপর চেপে দাঁড়িয়ে রইল সে। এখন কাউকে জিজ্ঞাসা করলে যে কটা উত্তরের একটা পাওয়া যাবে তা এতদিনে জানা হয়ে গিয়েছে। হয় তার ছিঁড়েছে, নয় কোথাও অ্যাকসিডেন্ট এবং অবরোধ হয়েছে, না হলে হকারদের সঙ্গে রেলের লোকের গোলমালের পরিণতি এটা। পাঁচ মিনিটেও যখন মাইকে কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট শোনা গেল না তখন বোঝাই যাচ্ছে যে কোন গোলমালের শিকার হয়েছে রেলের লোক।

সময় যত যাচ্ছে তত ভিড় বাড়ছে। ওদিকে বনগাঁ হাবড়া এদিকে নৈহাটি রাণাঘাট, সেইসঙ্গে ডানকুনির প্যাসেঞ্জারদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। প্রতিদিন ঠিক সময়ে কলকাতা থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায় এরা, সময়ে বাঁধা ট্রেনগুলোকে না পেয়ে হতভম্ব অবস্থা। কোণে সরে দাঁড়ালেও ভিড় একসময় তিস্তাকে গ্রাস করে নিল। লোকাল ট্রেনের প্যাসেঞ্জার হলে তোমার আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। কাছে দাঁড়ানো দুজন শীর্ণ চেহারার মহিলা কথা বলেছিলেন, 'কি হবে ভাই সাতটার মধ্যে না গেলে মেয়েটা একা হয়ে যাবে। কাজের লোকটা তারপর থাকতে চায় না!'

'তোমাদের পাড়াটা কি খারাপ?' দ্বিতীয় জন প্রশ্ন করল।

'কোন পাড়া ভালো বলো। উঠতি বয়সের মেয়ে সন্ধেবেলায় একা বাড়িতে থাকলে কখন কী হয়ে যেতে পারে। দেরি হলে আমার শরীর খারাপ লাগে তাই!'

'ওর বাবা তাড়াতাড়ি ফেরে না?'

'হুঃ। পেটে ধরেছিলাম যখন তখন আগলাবার দায়িত্ব আমার। তিনি অফিসে তাস পিটিয়ে বাড়ি ফেরেন এগারোটায়। ইছাপুরের বাপের ভিটে ছেড়ে আসবেনও না।'

তিস্তা অন্যদিকে তাকাল। চারপাশের যত মানুষ তাদের প্রত্যেকের কিছু না কিছু সমস্যা আছে। মেয়েদের যেন একটু বেশি। কলকাতায় চাকরি করতে আসা মেয়েদের সংখ্যা যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। আগে সাধারণ কম্পার্টমেন্টে ওঠার সময় ভিড় ঠেলতে হত, এখন মেয়েদের কম্পার্টমেন্টে পা রাখতে হলে মারপিট করতে হয়। এইসময় শেয়ালদা থেকে বসার কথা স্বপ্নের মত, বিশেষ করে অফিসের সময়। সবাই উল্টোডাঙা থেকে জায়গা দখল করে আসে। হাতের মুঠোয় ধরা রুমালটা ভিজে গেছে। দুদুটো রুমাল নিয়ে রোজ বের হয় তিস্তা। দুটোই নোংরা হয়ে ফেরে। এখন কী করা যায়। বাস ধরে শ্যামবাজার, সেখান থেকে আটাত্তর নম্বর বাসে চেপে বারাকপুর, সেখান থেকে অটোয় চেপে নোনাচন্দনপুকুর। ব্যাপারটা ভাবলেই মরে যেতে ইচ্ছে করে। ট্রেন স্বাভাবিক থাকলে অবশ্য কিছু নয়। বাড়ির সামনে থেকে রিকশা বা অটোয় স্টেশন, সেখান থেকে বারাকপুর লোকাল ধরলে শেয়ালদা পঁচিশ মিনিট। হুস করে চলে আসা। কোমরে অস্বস্তি হতেই কাপড়টাকে আর একটু ঝুলিয়ে দিল সে।

হঠাৎ চেঁচামেচি শুরু হল। কিছু ছেলে ট্রেন ছাড়ার জন্য দাবি জানাচ্ছে। প্লাটফর্মেই যেখানে ট্রেন নেই সেখানে ট্রেন ছাড়বে কী করে কে জানে! কিন্তু ছেলেগুলোর সঙ্গে বয়স্করাও জুটে গেলেন। ক্রমশ উত্তাপ ছড়াতে লাগল। স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্টের ঘরের সামনে বিক্ষোভ পৌঁছে গেল।

পাশপাশি কিছু লোক ট্রেনের নাম লেখা বোর্ডগুলো ভাঙতে লাগল। প্লাটফর্মের ওপরে টাঙানো টিভি মনিটরগুলো চুরমার হতেই মানুষজন প্লাটফর্ম ছেড়ে পালাতে লাগল। এখনই পুলিশ আসবে, লাঠি চার্জ হবে, টিয়ার গ্যাস ছুড়বে।

জলস্রোতে ভাসা কুটোর মতো তিস্তা ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের কাছে চলে আসতে বুঝতে পারল ভেতরে মারপিট শুরু হয়ে গেছে। এখন ছটা, রাত দশটার আগে শান্তি ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই। এমন সময় পাশে দাঁড়ানো এক যুবক জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবেন?'

অনেকসময় এইরকম গোলমালের দিনে কিছু প্যাসেঞ্জার জোট বেঁধে ট্যাক্সি ভাড়া করে যায়। তিস্তার মনে হল যুবকের উদ্দেশ্য সেইরকম হতে পারে। সে বলল, 'বারাকপুর।'

'তাহলে এখন যাওয়ার চিন্তা করে লাভ নেই।' যুবকটি হাসল, 'চলুন কোথাও চা খাওয়া যাক'।

তিস্তা গম্ভীর চোখে যুবককে দেখল। বড়জোর তিরিশ। সঙ্গে সঙ্গে আর এক বাস্তবে ফিরে এল সে। এই কলকাতার রাস্তায় এইসব কথা এতবার শুনতে হয়েছে যে এখন আর চমক লাগে না। সে চোখ না সরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কিসে মনে হল আপনি বললে চা খেতে যাব?'

'না, একা দাঁড়িয়ে আছেন, তাই বললাম।' যুবক স্মার্ট হবার চেষ্টা করল।

তিস্তা মুখ ফিরিয়ে একঝলক দেখে নিয়ে বলল, 'আসুন।'

যুবক নড়ল না, 'মানে?'

'আসুন না।' তিস্তা হাসার চেষ্টা করতে যুবক যেন ভরসা পেল। সে তিস্তার পাশে হাঁটতে লাগল। কয়েক পা যেতেই তিস্তা দাঁড়িয়ে গেল। কালো, খুব রোগা, ঘর্মাক্ত এক প্রৌঢ় মহিলা স্টেশনের ঘড়ির দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর সামনে গিয়ে তিস্তা যুবককে বলল, 'এঁকে ওই প্রস্তাব দিন!'

যুবক হতভম্ব, 'তার মানে!'

তিস্তা এবার অবাক হওয়া মহিলাকে বলল, 'দেখুন, আমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম। এই লোকটি আগবাড়িয়ে কথা বলে আমাকে চা খাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। আপনি কিছু মনে করবেন না, ওকে আপনার কাছে একই প্রস্তাব দিতে বলছি।'

যুবক বলল, 'আশ্চর্য! কাকে কি বলব সেটা আপনি ঠিক করবেন?'

'তাহলে আপনাকে বলতে হবে আমাকে কেন ওই প্রস্তাব দিয়েছেন?'

'ঠিক আছে, সরি!' যুবক চলে যাওয়ার চেষ্টা করতেই তিস্তা তার পথ আগলালো, 'উহুঁ। লেজ গুটিয়ে চলে যাওয়া চলবে না। আপনার বয়স কত?'

'কেন?' যুবক এবার ভয় পেল।

'আমার পঁয়ত্রিশ। এই সমস্ত ফাজলামি বন্ধ করুন।'

ইতিমধ্যে শ্রোতার সংখ্যা বেড়ে গেছে। গায়ে পড়ে কেউ কেউ কারণ জানতে চাইছে। তিস্তা এই জনতাকেও চেনে। সে যুবককে ধমকাল, 'যান।'

বলামাত্র যুবক প্রাচী সিনেমার দিকে হাঁটতে লাগল। তাকে চলে যেতে দেখে ভিড় আলগা হল। মহিলা এতক্ষণ পুতুলের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার বললেন, 'কি দিন পড়ল। অবশ্য স্টেশনে এত খারাপ মেয়ের ভিড় যে ভাল মেয়েদের ওরা খারাপ বলে ভুল করে। তবে আমাকে কোনোদিন কেউ ওসব বলেনি, জানেন!'

তিস্তা কিছু না বলে সরে আসতেই প্লাটফর্মের ভেতর থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল। আরও কিছু লোক প্রাণভয়ে ছুটে এল বাইরে। গাড়িগুলো পালাচ্ছে যে যেমন পারে। এত মানুষ চারপাশে ত্রস্ত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও ওর কানে একটু আগে শোনা মহিলার কথাগুলো বেজে যাচ্ছিল। আমাকে কোনোদিন কেউ ওসব বলেনি, জানেন! বলার ধরনে যতখানি গর্ব তার অনেক বেশি আফসোস

ছিল না তো! কোথায় পড়েছিল যেন, পুরুষের স্বভাব হল সুন্দরী মেয়ের সান্নিধ্য চাওয়া। যে পুরুষ চায় না তার ব্যবহারের সবটাই যেমন স্বাভাবিক নয় তেমনি যে নারীর দিকে পুরুষের ভ্রূক্ষেপ নেই তার কোথাও খামতি আছে।

কপালে পড়ে আসা চুল সরাল তিস্তা। মাঝে মাঝে মনে হয় ঈশ্বর তার মধ্যে কেন কিছু খামতি দিলেন না। এই পঁয়ত্রিশেও সে এমন ভরাট সুন্দর কেন? আজকাল চোখের তলায় মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত ভাঁজ পড়ে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দিন হলে ভাঁজটা বোঝা যায়। ভাল করে ক্রিম মালিশ করলে ধীরে ধীরে সেটা মিলিয়ে যায়। কিন্তু তিস্তা জানে এটা সতর্কীকরণ। এবার সময় হচ্ছে বয়সের জানান দেওয়ার। না, শরীরে তার বাড়তি চর্বি নেই একটুকুও। তলপেটে একটু ভার ঠেকলেই আসন বাড়িয়ে দেয়।

হঠাৎ চোখের সামনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। প্যাসেঞ্জার টাকা বের করতেই সে বৃদ্ধ সর্দারজিকে বলে ফেলল, 'যাবেন?'

'বসুন!'

সঙ্গে সঙ্গে দূরে দাঁড়ানো জনস্রোত ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্যাক্সির ওপরে। ট্যাক্সির হাতল আঁকড়ে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে ছিল তিস্তা। সর্দারজী কাউকে নেবে না। তার বক্তব্য এই দিদিকে আগে কথা দেওয়া হয়ে গেছে। তিস্তা কোনোমতে ভেতরে উঠতে পারল। এবার অনেকেই তাকে অনুরোধ করতে লাগল সঙ্গী করে নেবার জন্যে। অদ্ভুত লাগছিল তিস্তার। সে কোথায় যাবে না জেনেই লোকগুলো সঙ্গী হতে চাইছে। এখনকার কলকাতার মানুষদের আচরণ কোনোভাবেই বোঝা যায় না। সর্দারজী ট্যাক্সি চালু করে জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন, কোথায় যাবেন? আপনার বাড়ি কোথায়?'

'বারাকপুর।' মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল শব্দটা।

সর্দারজী মুখ ফিরিয়ে তাকাল, 'বারাকপুর তো অনেক দূর। আমার যেতেও আপত্তি নেই। কিন্তু দিদি, অনেক ভাড়া পড়বে যে।'

লোকটিকে পছন্দ হল তিস্তার। ভাড়ার কথা তার এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। ট্যাক্সিটা খালি হতেই মন মুক্তি চাইল ওই পরিবেশ থেকে। হ্যাঁ, অন্তত সত্তর আশি পড়বে। আর টাকাটা তার ব্যাগে না থাকলেও শেষ কটা দিন বিপাকে পড়তে হতে পারে। সে ব্রিজের ওপর থেকে শিয়ালদা স্টেশনবিল্ডিং দেখল। মুখে বলল, 'কী করা যাবে?'

'আজ ট্রেন কি বন্ধ?' সর্দারজী সামনের দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ। মারপিট হচ্ছে।'

'তাহলে আপনি পেছনের দরজাদুটো লক করে দিন। আমি সামনের সিটে দুজন প্যাসেঞ্জার তুলে নিচ্ছি। আপনি মিটার যা উঠবে তার হাফ দেবেন।'

সরস্বতী প্রেসের সামনে থেকেই সর্দারজি তিরিশ টাকা কড়ারে দুজন প্যাসেঞ্জার পেয়ে গেল। ইচ্ছে করলে লোকটা আরও চারজন লোক তুলতে পারত। তিস্তাকে ধরলে দুশো টাকা রোজগার করত বারাকপুর পর্যন্ত শাট্‌ল করে, কিন্তু করল না। এটাও সত্যি। মাঝে মাঝে কলকাতার মানুষের আচরণের মধ্যে কোনো সংলগ্নতা থাকে না।

লম্বা সিটে কিছুক্ষণ টান টান বসে থাকার পর শরীর এলিয়ে দিল তিস্তা। এখন হঠাৎ নিজেকে খুব ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে। সে চোখ বন্ধ করল। তাকে যে এভাবে যেতে হচ্ছে তা অরিত্র জানে না। জানলেও আলাদা কিছু হত না। বছরখানেক আগে এই রকম হঠাৎ ট্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়া সন্ধ্যায় সে অরিত্রর অফিসে পৌঁছেছিল। রিসেপশনে খবর দিয়েছিল অরিত্র যদি একবার বেরিয়ে এসে কথা বলে। আকাশবাণীর রিসেপশন এমন কিছু আরামদায়ক জায়গা নয়। অরিত্র খবর পাঠিয়েছিল তিস্তা

যেন একটু অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করেছিল তিস্তা। অরিত্র বেরিয়ে এসেছিল ন'টা নাগাদ। এসে সব শুনে বলেছিল, 'আশ্চর্য! ট্রেন বন্ধ হয়ে গেছে তো বাসের জন্যে চেষ্টা করোনি কেন?'

শুনে মনে হয়েছিল তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসে। কিন্তু অরিত্র বলেছিল, 'একটু দাঁড়াও। স্টেশনে খবর নিয়ে দেখি কী অবস্থা।' ফিরে এসে বলেছিল, 'চল, ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি। ট্রেন নর্মাল হয়ে গেছে।'

'তুমি যাবে না?'

নাঃ। এগারোটার আগে ছাড়া পাব না। চলো।'

সেই রাত্রে আকাশবাণীর মতো নির্জন জায়গা থেকে শেয়ালদা পর্যন্ত সে একা এসেছিল। প্রতিজ্ঞা করেছিল মরে গেলেও আর কখনও সাহায্যের জন্যে অরিত্রর অফিসে যাবে না। এরকম ঘটনা ঘটলে একসময় খুব তর্ক করত তিস্তা। কিন্তু অরিত্রর যুক্তি যন্ত্রের সত্যি। ও যখন বলে আমার ডিউটি এগারোটা পর্যন্ত এবং হুট করে কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ায় উপায় নেই তখন সেটাই পৃথিবীর শেষ সত্যি হয়ে যায়। অরিত্র সেন, তিস্তার স্বামী, স্ত্রী বিপদে পড়েছে জেনেও যে কর্তব্যে অটল থাকতে পারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে লাভ কী। ওর যুক্তি আরও, কেন? ট্রেন সার্ভিস নর্মাল হয়েছে জেনে তোমাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়েছিলাম না?

পৃথিবীর কিছু কিছু স্বামীর স্বপ্ন এককালে দেখত তিস্তা। যে স্বামীদের দায়িত্ববান বা কর্তব্যপরায়ণই শুধু বলা হয় না, মানুষও বলা হয়। যাকে সব বোঝাতে হয় না, বুঝে নিতে পারে। গল্প-উপন্যাসে এমন চরিত্রের দেখা এককালে খুব পাওয়া যেত। এক-আধজন যে বাস্তবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নেই তাও তো নয়। তিস্তার কপালে তেমন জোটেনি। অনেককিছুই তো সে পায়নি, এও না হয় তার একটা।

শ্যামবাজারের মোড় ছাড়াবার সময় বোঝা গেল ট্রেন বন্ধের ভিড় এদিকে চলে এসেছে। ফলে বাসের অবস্থা খুব খারাপ। ভাগ্যিস ট্যাক্সিটাকে পেয়ে গিয়েছিল। সে তো কিছু পেল, অনেকেই, তার মত অবস্থার অনেকেই এখন পথে দাঁড়িয়ে আছে কিছু পাওয়ার আশায়। হ্যাঁ, ট্যাক্সির এই সিটটায় আরও তিনজন স্বচ্ছন্দে বসতে পারত। কিন্তু কোন তিনজন? ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে তাদের নির্বাচন করার কোনো অধিকার তার নেই। দরজা খুললেই জলস্রোতের মত যারা ঢুকবে তাদের শরীরে শক্তি বেশি। তিস্তা চোখ বন্ধ করল।

কিন্তু কেউ সারারাত রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে না। হালিশহর কিংবা কাঁচরাপাড়া অথবা রাণাঘাটের যাত্রীরা শেষ চেষ্টায় বিফল হলে কলকাতার পরিচিতদের বাড়িতে ঢুকে যাবে। বারাকপুর শ্যামনগরে মানুষজন এতে ওতে করে ঠিক পৌঁছে যাবে। এটা মানুষের স্বভাবের একটা ধরন। নিয়মমাফিক জীবনে যদি হঠাৎ ছেদ পড়ে তাহলে সে দ্বিতীয় রাস্তা খুঁজে নেয় সেটাকে চালু রাখতে। দ্বিতীয় যদি কার্যকর না হয় তাহলে তৃতীয়। ট্রেন বন্ধ হলে বাস, বাস না পেলে ট্যাক্সি টেম্পো, অটো নিদেনপক্ষে মালবাহী লরিতেও জায়গা করে নেওয়া—এই তো জীবন। এই যেমন সে, তিস্তা সেন। পঁয়ত্রিশ বছরের এখনও সুন্দরী মহিলা, যে বঙ্কিম থেকে বাণী বসু পড়ে মনে রেখেছে, পথের পাঁচালি থেকে আগন্তুকের বিবর্তন লক্ষ্য রেখেছে, স্বাভাবিক থেকে অস্বাভাবিক, অস্বাভাবিক থেকে আরও অস্বাভাবিকের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে জেনেছে তোমাকে যা করার একা করতে হবে, কারও ওপর নির্ভর করা তোমার কপালে লেখা নেই। কোমরের কাছে একটু যন্ত্রণা হল। নড়ে বসল তিস্তা। সকালের দিকেও একবার হয়েছে। বারাকপুরের ডাক্তার মল্লিক তাকে দেখছেন। মানুষটি ভাল। কাল সকালে একবার যেতে হবে। এই যাওয়াগুলোও তো যেতে হয় একা।

শেষ বা শেষের আগের ট্রেন ধরে বাড়ি ফেরে অরিত্র। স্টেশনে ওঁর চেনা এক রিকশাওয়ালা অপেক্ষা করে। লোকটা বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায়। জল ঝড়ের রাতেও সে আসে। এর একটাই মানে অরিত্র লোকটাকে কোনোভাবে অধিকার করে রেখেছে। একটা মানুষ বাড়িতে স্ত্রীর কাছে আকর্ষণহীন

হলেও বাইরের জগতে অন্য ভূমিকা নিতে পারে। অরিত্র তাদের একজন। ওর সহকর্মী বা পরিচিতদের মুখে তিস্তা কোনোদিন নিন্দা শোনেনি। রাত বারোটার পর স্বামীর জন্যে জেগে থাকতে যেসব মহিলা বাধ্য হন তিস্তা তাঁদের শ্রেণিতে পড়ে না। খাবার হটবক্সে রাখা থাকে। অরিত্রর কাছে দরজার চাবি দেওয়া আছে। কখন সে বাড়িতে ঢোকে, স্নান করে খাবার খায় তিস্তা জানে না।

সকালে ঘুম ভাঙার পর তিস্তার প্রধান কর্তব্য হল অরিত্রর ঘুম না ভাঙানো। জানলা খোলা হয় না। বাজার রান্না ইত্যাদি যাবতীয় সাংসারিক কাজ শেষ করে অফিসের জন্যে তৈরি হয়ে ঠিকে ঝিকে চা বানাতে বলে। নিজের খাওয়া শেষ করে বেরুবার সময় কোনো কোনো দিন অরিত্রকে বিছানা ছাড়তে দেখা যায়। তিস্তা জানে এর পরে দুকাপ চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়বে অরিত্র। ঠিকে ঝি বিরক্ত হবে। সেই বিরক্তি সন্ধেবেলায় তিস্তাকে শুনতে হবে। বিছানা থেকে পৃথিবীর সব খবর ঠোঁটস্থ হয়ে যাওয়ার পর নামতে নামতে দুপুর। এর মধ্যে ব্রেকফাস্ট দিয়ে বিদায় নিয়েছে ঠিকে ঝি। স্নান খাওয়া শেষ করে বাবু অরিত্র সেন রাজকার্যে যাবেন একটা নাগাদ। বাড়িটা পড়ে থাকবে তালাবন্দী হয়ে।

স্বামীস্ত্রীর মিলিত জীবন যদি দাম্পত্যজীবন আখ্যা পায় তাহলে এটা কি ধরনের দাম্পত্যজীবন! অথচ আপাত চোখে অরিত্রর কোনো ত্রুটি নেই। অরিত্র অন্য কোনো মহিলার প্রতি আসক্ত নয়, মদ্যপান করে না। অরিত্র ডিভোর্সি। ডিভোর্সি তো তিস্তাও। তিস্তা তাকাল। সিঁথির মোড় পেরিয়ে যাচ্ছে ট্যাক্সিটা। গাড়ির সামনের আসনের তিনজন মানুষ নিঃশব্দে রয়েছে।

ডিভোর্স মানে তোমার সঙ্গে আমার বনছে না, কোনোভাবেই মিল হওয়া সম্ভব নয় তাই দুজনের দুটো আলাদা পথ বেছে নেওয়া উচিত, অতএব সম্পর্কটাকে বাতিল করা যাক। এক কথায় হয়, অনেক ঝগড়ানোর পর আইনের সম্মতি পেতে বেশ কিছু মাস খরচ করতে হয়। অরিত্রর ক্ষেত্রে ওর প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ এইভাবে হতে পারে কিন্তু তিস্তার বেলায় নয়। ডিভোর্স ওর কাছে অনেক যন্ত্রণাদায়ক মুক্তির নাম। হাত বাড়িয়ে চাইলেই কেউ সেটা তুলে দেয়নি। ডিভোর্স ওর জীবনে মারপ্যাঁচের নিষ্ঠুরতা দিয়ে আড়াল করে রাখা এক তিক্ত অভিজ্ঞতা। আর এর জন্যে কেউ দায়ী নয়।

চোখের পাতায় এখন নিজেকে দেখতে পায় তিস্তা। সেই সতেরো বছরের তিস্তা। লোকে বলত মোমের পুতুল। বাবা চাকরি করতেন কানপুরে। সেখানেই জন্ম, মিশনারি স্কুলে পড়াশোনা। জীবনের সাদাকে সাদা কালোকে কালো বলতে শেখা। কলকাতার অনেক বাঙালি মেয়ে যে সত্যিগুলো উচ্চারণ করতে সঙ্কোচ বোধ করত তিস্তা তা মুখের ওপর বলে দিতে পারত। কানপুরের জীবন তার মধ্যে অনেক অনর্থক মেয়েলিপনা আনেনি। স্কুলের শেষ পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে বাবা ভ্রু কুঁচকেছিলেন। গড়ে আর এক নম্বর পেলে আশি হত। তিস্তা বলেছিল, 'আই অ্যাম সরি বাবা। পরীক্ষা দিয়ে ভেবেছিলাম আমি পেয়ে যাব ঠিক।' বাবা বলেছিলেন 'তাহলে বুঝতে পারছ যা তুমি ভাব তাই সবসময় ঘটে না। এখন থেকে এই সত্যিটা অনেকবার আবিষ্কার করবে।'

সেদিন বাবা কথা বলেছিলেন দার্শনিকের মতো। তাই মনে হয়েছিল। মা বলেছিল, 'মেয়েটা এত ভালো রেজাল্ট করল অথচ তুমি তাকে উপদেশ দিচ্ছ।'

বাবা বলেছিলেন, 'সব ভালোই শেষ ভালো নয়।'

কথাগুলো যে কতখানি সত্যি তা বুঝতে পঁয়ত্রিশ বছরে পৌঁছে গেল সে।

ট্যাক্সিটা ডানলপ পেরিয়ে গেল। ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ শব্দ ছাড়া আর আওয়াজ নেই। গাড়ির ড্যাশবোর্ড থেকে ছিটকে আসা আলোয় সামনের লোকগুলোকে অদ্ভুত লাগছে। এইভাবে চললে আটটার মধ্যে বাড়িতে পৌঁছে যাবে সে। কোমরের ব্যথাটা বাড়ছে। পেটের দিকে নেমে আসছে।

এমন কিছু নয়। এসময় এরকম হয়েই থাকে। কাল সকালে ডাক্তার মল্লিকের কাছে যেতেই হবে।

আঠারো উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত কখনও জ্বর হয়েছে কি না মনে পড়ে না। আজ পর্যন্ত তার কখনও পক্স হয়নি। চেনাজানা সব মানুষের একবার না একবার অসুখটা হয়ে গেছে। অরিত্র অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সেকি ? তোমার পক্স হয়নি?' যেন না হওয়াটা অস্বাভাবিক, অপরাধ।

বাবা ভর্তি করে দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্সিতে। ইংরেজিতে অনার্স। বাবার খুব শখ ছিল মেয়ে ইংরেজিতে এম. এ. করে কলেজে পড়াবে। সাহিত্যের ওপর রিসার্চ করে নামের আগে ডক্টরেট ছাপ ফেলবে। ইংরেজি সাহিত্য খুব ভাল লাগত তিস্তার। বাবার ইচ্ছেটা ওর নিজের ইচ্ছে হয়ে গিয়েছিল।

কলকাতায় আত্মীয়স্বজন বেশ কিছু ছিলেন। বাবার ইচ্ছে ছিল না তাঁদের কারো কাছে তাকে রাখার। বিবেকানন্দ রোডের একটি মেয়েদের হোস্টেলে জায়গা পেয়ে গিয়েছিল সে। বাবা বলেছিলেন, 'এখানে তোমার একটু কষ্ট হবে। বাড়ির কমফর্ট তুমি পাবে না। সেটাও ঠিক নয়। সারাজীবন মানুষের একভাবে যায় না। কষ্ট কি তা প্রত্যেকের জানা দরকার।'

খারাপ লেগেছিল কিন্তু কষ্ট হয়নি। একঘরে তিনটে মেয়ে যাদের ভাবনা-চিন্তা কলেজে পড়লেও প্রাগৈতিহাসিক। সুজাতা নামের একটা মেয়ে গল্প করছিল যে সে তিনবছর বয়স থেকেই টেপজামার ওপর হাঁটুঢাকা ফ্রক পড়েছে। যতই গরম লাগুক এর অন্যথা হয়নি। তিস্তা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেন?'

'বাঃ, তুমি জানো না?'

'না।' বোকার মতো মাথা নেড়েছিল তিস্তা।

'মা বলত মেয়েমানুষের শরীর সবসময় ঢেকে রাখা উচিত।'

হেসে ফেলেছিল তিস্তা, 'তিনবছর বয়সে তোমার মেয়েমানুষের শরীর হয়ে গিয়েছিল নাকি?'

'আমি জানি না।' সুজাতা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, 'মা যা বলত তাই করেছি।'

এদের তিস্তা একটু একটু করে বুঝেছে। এই সংস্কারাচ্ছন্ন মেয়েদের জন্যে তার শুধুই মায়া হত। বেশি বোঝালে এরা হাঁ করে চেয়ে থাকত কিন্তু মেনে নিত না। কিন্তু আর এক ধরনের মেয়ের দেখা পেল সে প্রেসিডেন্সিতেই। যদিও তাদের সংখ্যা খুব অল্প কিন্তু কথাবার্তায় চালচলনে তারা নিজেদের আলাদা করে ফেলেছিল। অন্য মেয়েরা যেমন তাদের ঈর্ষার চোখে দেখত ছেলেরাও এদের কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল সহজেই। এদের বক্তব্য ছিল স্ত্রী স্বাধীনতার সপক্ষে। মেয়েরা কোনো অবস্থাতেই দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ নয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে মেয়েদের দাবিয়ে রেখেছে পুরুষরাই। একজন পুরুষ যদি চারটে বিয়ে করতে পারে তাহলে একটা মেয়ে তা পারবে না কেন? অর্জুনকে ভালবেসে দ্রৌপদী শ্বশুরবাড়িতে এসে শুনল শাশুড়ি তাকে না দেখেই সব ভাইকে গ্রহণ করতে বলছে। সে করতে বাধ্য হয়েছিল পাঁচ পাণ্ডবের চাপেই! বিয়ের পর মেয়েদের শাঁখা সিঁদুর পরতে হয়, ছেলেদের কেন বিবাহের চিহ্ন শরীরে রাখতে হয় না। এসব কথা শুনলে অকাট্য মনে হয়। আর যারা তা বলে তারা আকর্ষণীয়া হয়ে ওঠে। জয়তী নামের একটি মেয়ের সঙ্গে তিস্তার বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে ওই দলের। প্রথমদিন কফিহাউসে গিয়েছিল তিস্তা জয়তীর সঙ্গে। ওর বান্ধবীরা ছাড়াও তিনটে ছেলে ছিল এক টেবিলে। চুপচাপ ওদের কথা শুনে যাচ্ছিল তিস্তা। মনে হল ছেলেরাও একমত। এতকাল মেয়েদের ওপর অনেক অত্যাচার হয়েছে এবার তার সংশোধনের সময় এসেছে।

ধরিত্রী নামের একটা মেয়ে ঘোষণা করে ফেলল, 'রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর ছাড়া কোনো বাঙালি পুরুষ মেয়েদের জন্যে ভাবেনি।'

হঠাৎ মজা করতে ইচ্ছে করল তিস্তার, 'পুরুষদের জন্যে কে ভেবেছিল?'

ধরিত্রী বলেছিল, 'ওরাই তো সব। ওদের জন্যে ভাবার কী দরকার?'

তিস্তা বলল, 'মেয়েরাও তো সব হতে পারত।'

'পারেনি। পুরুষরা হতে দেয়নি।'

'রবীন্দ্রনাথ?'

'অসম্ভব। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মেয়েদের অপকার করেছেন।'

'যেমন?'

'ওঁর এক দাদা পাগল ছিল। তিনি মরে যাওয়া পর বউদি বাপের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। অল্পবয়স্ক বলে তাঁর বাবা আবার বিয়ের চেষ্টা করেন। খবর শুনে দেবেন্দ্রনাথ ছেলেদের হুকুম দিয়েছিলেন তাঁকে ফিরিয়ে আনতে। সব ছেলেই কোনো না কোনো বাহনায় সরে পড়েছিল শুধু রবীন্দ্রনাথ পিতৃআদেশ পালন করতে গিয়েছিলেন। একটি মেয়েকে আবার স্বাভাবিক জীবনে যাওয়া থেকে নিরস্ত করে বিধবার জীবনে বন্দি করতে চেয়েছিলেন।'

'কিন্তু ওঁর পুত্রবধূ বিধবা ছিলেন বলে শুনেছি।'

'নিজের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত অন্যের ওপর চালানো আর কি!'

তিস্তা হেসেছিল, 'তাহলে রামমোহন আর বিদ্যাসাগর ব্যতিক্রম?'

ধরিত্রী বলেছিল, 'হ্যাঁ একজন সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেছিলেন অন্যজন বাল্যবিবাহ বন্ধ এবং বিধবাবিবাহ চালু করেছিলেন। নইলে এতদিনে আমরা কোথায় তলিয়ে যেতাম ভাবতে পারছ না।'

'কেন করেছিলেন?' ছোট্ট প্রশ্ন করেছিল তিস্তা।

'কেন? আমাদের উপকার করতে।'

'উঁহু! তুমি একটু ভুল করছ।'

'তার মানে?'

'তুমি এতক্ষণ যে ফর্মুলায় কথা বলছিলে সেই ফর্মুলায় ব্যাপারটা যদি ফেলো তাহলে ওই কাজগুলোর পেছনে যুক্তি খুঁজে পাবে।'

ওরা সবাই মুখ চাওয়াচায়ি করছিল। জয়তী বলল, 'তুই বল না।'

'এমন হতে পারে রামমোহনের মনে হয়েছিল সতীদাহের ফলে অনেক সুন্দরী সুন্দরী যুবতী বিধবাকে পুড়ে মরতে হচ্ছে। তাদের যদি বাঁচিয়ে রাখা যায় তাহলে পুরুষরা আনন্দিত হবার সুযোগ বেশি করে পাবে।' তিস্তা বলেছিল।

জয়তী বলল 'যাঃ।'

তিস্তা বলল, 'তোরা এতক্ষণ যেভাবে ইতিহাসের ব্যাখ্যা করছিলি তার সঙ্গে এই কথাগুলো চমৎকার মিলে যায়।'

ছেলেরা খুব হেসে উঠেছিল। জয়তী গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আর বিদ্যাসাগর?'

তিস্তা বলল, 'আমার বলতে খুব খারাপ লাগছে কিন্তু এভাবে তো ব্যাখ্যা করাই যেতে পারে অল্পবয়সী মেয়েগুলো বুড়ো স্বামী মরে গেলে বিধবা হয়ে অন্দরমহলে পড়ে থাকত। তাদের মধ্যে যথেষ্ট সুন্দরীও ছিল। সেই মেয়েদের ব্যবহার করার জন্যে ধরো বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।'

ধরিত্রী রাগতস্বরে বলল, 'তুমি ইচ্ছে করে ভুল ব্যাখ্যা করে আমাদের বক্তব্যকে ছোট করতে চাইছ!'

'আমি কিছুই করতে চাইছি না। যে যার নিজের কাজটা ঠিকমত করলে এসব কমপ্লেক্সে ভুগতে হয় না।' তিস্তা বলেছিল।

'তুমি বাইরে মানুষ হয়েছ তো তাই জানো না এদেশের মেয়েদের অবস্থাটা।' ধরিত্রী উঠে গিয়েছিল।

কিন্তু খবরটা চাউর হতে বেশি সময় নেয়নি। বিদ্যাসাগর এবং রামমোহনকে নিয়ে কানপুরের একটা মেয়ে রসিকতা করেছে যাতে ধরিত্রীরা জব্দ হয়। কেউ কেউ তিস্তাকে দেখেও গেল। কফিহাউসের টেবিলে তখন তিস্তার জমাট আড্ডা। কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে ছেলেরাও এসেছে। এদের একজন সুমিত। ছেলেটা কম কথা বলে, চারমিনার সিগারেট খায়। পড়ে সিটি কলেজে। কিন্তু তিস্তা বুঝতে পারে সুমিত সারাক্ষণ তাকে লক্ষ্য করে যায়। ওর ঠোঁটে অদ্ভুত কিছু আছে। সেটা নিষ্ঠুরতা না উদাসীনতা তা বুঝতে পারে না তিস্তা। সুমিতকে এড়িয়ে যায় সে প্রায় প্রতিদিন। বিকেল বেলায় বাড়িতে ফেরার সময় বাস ট্রামে না উঠে ওইটুকু পথ হেঁটে আসতে মন্দ লাগে না। সুমিত প্রথম দুটো দিন পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, 'চলো, পৌঁছে দিয়ে আসি।'

এমন অপ্রত্যাশিত অনুরোধে বিপাকে পড়েছিল তিস্তা। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল, 'আমার কোনো সাহায্যের দরকার নেই। ধন্যবাদ।'

তবু তিস্তা বেশ কিছুদিন লক্ষ্য করেছে সুমিতকে পেছন পেছন আসতে। প্রচণ্ড অস্বস্তি হত সেইসময়। ইচ্ছে করত ডেকে জিজ্ঞাসা করে। একদিন করেওছিল। অম্লান মুখে সুমিত জবাব দিয়েছিল, 'পেছন থেকে দেখলেও কাউকে ভাল লাগে তা তোমাকে দেখার আগে বুঝিনি।'

খুব রাগ গিয়েছিল সেদিন। বলেছিলে, 'এটা আমি ঘেন্না করি।'

'সরি। কিন্তু পাশে হাঁটতে দিচ্ছ না যে!'

'আমি চাই না তুমি এমন করো।'

হ্যাঁ, তারপর থেকে সেটা বন্ধ করেছিল সুমিত। কিন্তু কফিহাউসের গেটে রোজ দাঁড়িয়ে থাকত। প্রেসিডেন্সি থেকে বেরিয়ে এইদিকে আসামাত্র হাসত। সারাক্ষণ একই টেবিলে বসে সিগারেট খেয়ে যেত চুপচাপ। একদিন কথা হচ্ছিল টিউশনি নিয়ে। ক্লাসের অনেকেই টিউশনি করে। কেবল অভাবের জন্যে নয় অনেকে শখেই যাতে বাড়ির ওপর চাপ না থাকে।

তিস্তা বলল, 'আমাকে কে টিউশনি দেবে?'

কেউ কিছু বলার আগেই সুমিত বলল, 'তুমি টিউশনি করতে চাও?'

তিস্তা কথা না বলে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'আমার মায়ের সঙ্গে দেখা কর। ভাই-এর জন্যে টিউটার খুঁজছে।' সুমিত গম্ভীর গলায় জানাল। জয়তী তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করল, 'কী ব্যাপার সুমিত? ওভাবে বলছ কেন? তুমিই তো ওকে নিয়ে আলাপ করিয়ে দিতে পার। তোমার মা ওকে চিনবেন কী করে?'

'আমার সঙ্গে হাঁটতে তিস্তা পছন্দ করে না।' সুমিত বলল।

জয়তী কিছু বলার আগেই তিস্তা বলল, 'শোনো, আমি কখনও কাউকে পড়াইনি। কিন্তু চ্যালেঞ্জ নিতে পড়াতে রাজি আছি। তোমার সঙ্গে হাঁটতে রাজি হইনি কারণ প্রয়োজন ছিল না। এখন প্রয়োজনে আপত্তি নেই।'

'তার মানে প্রয়োজনে তুমি সব কিছু করতে পার?'

'না। তবে যেটুকু করলে নিজের খারাপ লাগবে না বা লাগলেও মানিয়ে নিতে পারব ততটুকু।' তিস্তা জবাব দিয়েছিল।

সেই বিকেলেই সে সুমিতের সঙ্গে ওদের বাড়িতে গিয়েছিল। উত্তর কলকাতার বনেদী বাড়ি। বাইরের ঘরে চটি ছেড়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। সেই ঘরে আইনের বই প্রচুর। ওগুলো কার জানতে চাইলে সুমিত জবাব দিয়েছিল, 'পিতৃদেবের।'

সুমিতের মা মোটাসোটা পান খাওয়া গিন্নি টাইপের মানুষ। সুমিত যখন পরিচয় করিয়ে নিয়ে আসার কারণ জানাল তখন ভদ্রমহিলা উচ্ছ্বসিত হলেন 'বাঃ এতদিনে ছেলে সংসারের একটা উপকার

করল। আমার ছোটছেলে ক্লাস সিক্সে পড়ে। আমার তো ইচ্ছে রোজ তুমি ওকে এসে পড়াও।'

সুমিত বলল, 'আজকাল কেউ সপ্তাহে তিনদিনের বেশি পড়ায় না।'

'তুই থাম। আমি আর আমার মেয়ে বুঝে নেব। কি নাম যেন?'

'তিস্তা।'

'বাব্বা। নদীর নাম? আমি ওসব বলে ডাকত পারব না। আমি তোমাকে মেয়ে বলে ডাকব। কোথায় থাক?'

'হোস্টেলে।' তিস্তার বেশ ভাল লাগছিল মহিলার কথা।

'ওমা! তাই এমন কাঠ কাঠ চেহারা। খেতে দেয় না বোধহয়! বাড়ি কোথায়?'

'বাবা-মা থাকেন কানপুরে।'

'সে তো অনেকদূর। যাকগে, আলাপ যখন হল তখন আমাকেই মা ভাববে। তা হ্যাঁগা, কত দিতে হবে তোমাকে?'

'দেখুন, আমি তো কখনও টিউশানি করিনি। তাই— ।'

'ঠিক আছে। কদিন পড়াও, তারপর ভাল বুঝে মা যা দেবে মেয়ে কি নেবে না? গৌরী ও গৌরী।' শেষের তিনটে শব্দে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন।

একটি কাজের মেয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। সুমিতের মা তাকে বললেন, 'একটা প্লেটে মোহনভোগ আর দুটো রসগোল্লা নিয়ে আয়!'

তিস্তা আঁতকে উঠল, 'না না। আমি মিষ্টি খাই না।'

'ওই এক ঢঙ হয়েছে আজকালকার মেয়েদের মিষ্টি না খেলে শরীর বাড়বে কী করে? ভরন্ত শরীর না হলে পরে যুঝতে পারবে না। খ্যাংরা কাঠির মতো মেয়েছেলেকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না মেয়ে। নাও, খাও।'

তিস্তা দেখল তার সামনে একটা কাঁসার থালায় সুজি এবং রসগোল্লা দিয়ে গেল কাজের মেয়েটি। মহিলা বললেন, 'রোজ বিকেলে এ বাড়িতে আর কিছু হোক বা না হোক মোহনভোগ হবেই। তোমার মেসোমশাই কোর্ট থেকে ফিরে এক থালা খাবেন। নাও খেয়ে নাও।'

কাঁসার থালায় চামচ ছিল না। খেতে হলে আঙুল ব্যবহার করতে হয়। ভদ্রমহিলার এদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। দ্বিধা কাটিয়ে সুজি মুখে তুলল তিস্তা। মিষ্টিতে মুখ ভরে গেল। তবু মনে হল এই কলকাতা শহরে এমন একটা বাড়ি নেই যেখানে সে একটু স্নেহের স্পর্শ পায়। একটা তো হল।

সুমিতের ভাই খুব বুদ্ধিমান নয়। পড়াশোনাতেও মন নেই। প্রথম দিন পড়াতে বসেই সেটা টের পেল তিস্তা। ছেলেটার নাম অমিত। অমিত বলল, 'দিদি, আমার পড়তে একটুও ইচ্ছে করে না। তুমি মাকে বলো না।

সেই ছেলের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল একসময়। সপ্তাহে চারদিন পড়াতে যায় তিস্তা। যাওয়ার সময় সুমিত সঙ্গে থাকে। মাসীমার সামনে বসে মোহনভোগ খেতে হয়। পড়ানো শেষ হলে সুমিত তাকে হোস্টেলে পৌঁছে দিয়ে যায়। এই যাওয়া আসার পথে সুমিত নানান কথা বলে। বিশেষ করে আধুনিক ইংরেজি উপন্যাসের কথা। কত নতুন লেখক, কত নতুন উপন্যাস গল্প কবিতা যাদের নাম সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় এখনও ওঠেনি। তিস্তার চোখের সামনে সুমিতের চেহারা বদলে গেল। এমন একটা গভীর মনের ছেলের সঙ্গে সে আর অসহজ ব্যবহার করতে পারল না। উল্টে সে হঠাৎই দারুণ রকম আকৃষ্ট হল। যদি এর নাম ভালবাসা হয় তাহলে তাই।

জীবনটা তখন অদ্ভুত ছন্দে বাঁধা। সকালে কলেজে যায় তিস্তা। সেখান থেকে লাইব্রেরি হয়ে কফিহাউস। কফিহাউস থেকে সুমিতের সঙ্গে গল্প করতে করতে ওদের বাড়ি। মোহনভোগ খাওয়া

এবং অমিতকে পড়ানো। পড়ানো শেষ হলে আবার সুমিতের সঙ্গেই হোস্টেলে ফেরা। ওদের বাবার সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে। যেহেতু ভদ্রলোক কোনো কথা বলেননি সেও আগ বাড়িয়ে সামনে যায়নি।

এরকম একদিন সুমিতের সঙ্গে বাড়িতে পৌঁছে সে দেখল ওর মা নেই। তিনি অমিতকে নিয়ে হঠাৎ এক আত্মীয়ের বাড়ি চলে গেছেন। সুমিত ওকে নিজের ঘরে নিয়ে এলে তিস্তা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি জানতে না উনি থাকবেন না?'

'জানতাম।'

'বাঃ। তাহলে বলোনি কেন?'

'বললে তুমি এ বাড়িতে আজ আসতে না।'

'ও। তা আনলে কেন?'

'তোমাকে খুব চুমু খেতে ইচ্ছে করছে।'

'ডোন্ট বি ফানি।'

'সিরিয়াসলি বলছি।'

'হঠাৎ তোমার এমন ইচ্ছে হল কেন?'

'হঠাৎ নয়। সেই প্রথমদিকে তোমাকে ফলো করে যখন হাঁটতাম তখন থেকে। তুমি জানো না তোমার হিপ কি সুন্দর।'

'সুমিত।'

'ওহো, সরি। ও কে' সুমিত সামনে এসে ওর কাঁধে হাত রাখল, 'লেট মি ডু দ্য কারেক্ট ডিউটি অফ মাইন।'

তিস্তা চট করে সরে দাঁড়াল, 'সরি সুমিত।'

'ফর গডস সেক, হোয়াই?'

'বিকজ আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইট।'

'ডোন্ট ইউ লাভ মি?'

'ইয়েস আই ডু।'

'দেন, হোয়াট হার্ম ইন কিসিং!'

'তুমি এটা করবে বলে পরিকল্পনা করেছ। তোমার এই অ্যাটিচুডকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এটাই সত্যি।'

'মাই গড। ইউ আর রিয়েল কনজারভেটিভ। চুমু খেতে কাউকে কোনো ডাক্তারের কাছে যেতে হয় না।'

'সুমিত।'

'কাম অন।'

'নো।'

'ওয়েল। কী করলে তুমি রাজি হবে?'

'আমি জানি না।'

'নো। তোমাকে জানতে হবে। ইউ মাস্ট টেল মি।'

'বেশ। আমরা যখন বিয়ে করব।'

'দাঁড়াও। বিয়ে না করলে তুমি চুমু খাবে না?'

'নো।'

'তাহলে যখন তখন নয়, এখনই। আমরা এখনই বিয়ে করব।'

'তার মানে?'

'আমরা রেজেস্ট্রি করব।'

অবাক হয়ে গিয়েছিল তিস্তা। সুমিতকে তার ভাল লাগত। ভালও বাসতে শুরু করেছিল। কিন্তু একটা চুমু খাওয়ার জন্যে যে সুমিত তাকে বিয়ে করতে চাইবে অমন উন্মাদের মতো তা সে কল্পনা করেনি। তিস্তার খুব ভাল লাগল। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল তখনই ঝাঁপিয়ে পড়ে সুমিতকে চুমু খায়। কোনোমতে সামলাল সে। সুমিত ওর দিকে তাকিয়ে আছে। সে বলল, 'বিয়ে করলে দায়িত্ব নিতে হয়, মনে আছে?'

'কী ভাবছ? আমরা খুব গরিব?'

আর কথা বাড়ায়নি। সেদিন বেরিয়ে আসার পর মনে হয়েছিল এই একটা অহংকার নিয়ে সে চিরকাল বেঁচে থাকতে পারবে। কী ভুলই না ভেবেছিল।

নোটিস দেওয়া এবং অন্যান্য নিয়ম মানার কাজগুলো করেছিল সুমিতই। ওয়েলিংটনের মোড়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে যাওয়ার আগে তিস্তা একটা কাজ করেছিল। সে কানপুরে চিঠি লিখেছিল। সরাসরি বাবাকে। সমস্ত কথা জানিয়ে লিখেছিল সুমিত চাইছে এখনই বিয়েটা হয়ে যাক। আমি একটু দ্বিধায় আছি সময় নিয়ে। তোমার মতামত চাইছি।

উত্তরে বাবার চিঠি এসেছিল চটপট। তোমাকে কলকাতায় পড়তে পাঠানো হয়েছে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। সেটা পূর্ণ হতে অনেক দেরি আছে। অথচ তুমি তাতে মন না দিয়ে আর পাঁচটা মেয়ের মত বিয়ের কথা ভাবছ দেখে আমি মর্মাহত। তোমার কাজ পড়াশোনা করা। বন্ধুবান্ধব ওই বয়সে হতেই পারে। তাদের সঙ্গে মেলামেশায় আমি কখনই আপত্তি করিনি। ব্যাপারটা ওই পর্যায়ে রাখলেই খুশি হব। এসত্ত্বেও তুমি যদি এখনই বিয়ের দিকে ঝোঁকো তাহলে সেটা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার মায়েরও একই মত।

চিঠিটা পড়ে খুব খারাপ লেগেছিল তিস্তার। কিন্তু সুমিত বলেছিল, 'এই দেশের বাবা-মা কখনই চান না ছেলেমেয়ে পছন্দ করে বিয়ে করুক। নিজেদের পছন্দ ওদের ওপর চাপিয়ে দিতে ওদের জুড়ি নেই।'

'আমি এখন কী করব?' তিস্তা দ্বন্দ্বে দুলছিল।

'যা ঠিক আছে তাই করবে। তুমি তোমার বাবার সঙ্গে চিরকাল থাকবে না। আমি আর তুমিই এখন একত্রে থাকছি।'

মুহূর্তেই মন ঠিক করে নিয়েছিল তিস্তা। যার সঙ্গে সারাজীবন স্বামীস্ত্রীর মতো থাকতে হবে তাকে দুঃখিত করার কোনো অর্থ হয় না এখন। জয়তী এসেছিল তার হয়ে। সুমিতের বন্ধুরাও এসেছিল। সইসাবুদের পর ওরা আমিনিয়া রেস্টুরেন্টে গিয়ে চিকেন চাপ আর রুটি খেয়েছিল। পেমেন্ট করেছিল ওদের এক বন্ধু, সীতেশ।

সীতেশও একসময় হোস্টেলে থাকত। ওই সময়ে যারা এসেছিল তারা অভিনন্দনের বন্যায় তাদের ভাসিয়ে দিয়েছিল। সিঁথিতে সিঁদুর পরার মুহূর্তে কেঁপে উঠেছিল তিস্তা। কেমন ঝুম হয়ে ছিল সে।

দুপুরে ব্যাপারটা চুকে গিয়েছিল। তিস্তা বলল, 'এই একমাথা সিঁদুর নিয়ে আমি হোস্টেলে যেতে পারব না।'

জয়তী বলেছিল, 'তুই এখনও হোস্টেলের কথা ভাবছিস? সুমিতের মা তোকে ভালবাসেন. উনি তোকে বরণ করে নেবেন।'

জয়তীর দিকে তাকিয়ে তিস্তা বলেছিল, 'তোরা সঙ্গে চল।'

জীবনে প্রথমবার এমন লজ্জা জড়ানো সংকোচের অস্তিত্ব টের পেল তিস্তা। সুমিত একটু ইতস্তত করে বলেছিল, 'আজ না গেলে হয় না?'

জয়তী জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেন? অসুবিধে কোথায়?'

'না, মানে, আমি মাকে কিছু বলিনি তো। বলে রাখলে ভাল হত। মা তো বলতেই পারে তোরা আমাকে তৈরি হবার সুযোগ দিলি না।' সুমিত বলেছিল।

বন্ধুরা সুমিতের কথায় ভেবে পাচ্ছিল না কী করা উচিত। তিস্তা না বলে পারল না, 'অসম্ভব। আমি এই একমাথা সিঁদুর নিয়ে হোস্টেলে যেতে পারব না।'

'ঠিক আছে, সিঁদুর তুলে যাও।' সুমিত বলেছিল।

'কী বললে? সিঁদুর তুলব?' অবাক হয়ে গিয়েছিল তিস্তা।

'তোমার মতো আধুনিক মেয়ে সিঁদুর নিয়ে নিশ্চয়ই ফার্স করবে না!' ঠাট্টা করেছিল সুমিত।

ঠোঁট কামড়েছিল তিস্তা। সিঁদুর সম্পর্কে তার কোনো মায়া নেই। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে নিজেকে যে অন্যরকম লাগছে তা ওই সিঁদুরের জন্যে তাও তো অস্বীকার করতে পারছে না।

জয়তী বলেছিল, 'বাজে কথা বলো না সুমিত। তাছাড়া ওর হোস্টেলে ম্যারেড মেয়েদের থাকা নিষেধ আছে। বিয়ে যখন করেছ তখন বাড়িতেই নিয়ে চলো।'

পাঁচ বন্ধু একটা ট্যাক্সিতে চেপে সুমিতের বাড়িতে হাজির হয়েছিল। তখনও আকাশে রোদ। ফুচকাওয়ালারা পাড়ার মোড়ে বসেনি। কাজের মেয়ে দরজা খুলে দিতে সুমিত হুকুম করেছিল, 'মাকে ডেকে দাও। জরুরি ব্যাপার।' মেয়েটা অবাক হয়ে চলে গেল।

এটা বাইরে ঘর অথবা সুমিতের পিতৃদেবের আইন ব্যবসায়ের ঘর। কোনোদিনই এই ঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়নি তিস্তাকে। প্রথম দিন যখন এসেছিল তখনও সুমিত তাকে ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল। এই পরিবর্তন নতুন আর একটা অস্বস্তির জন্ম দিল। এই সময় অমিত এল স্কুল থেকে। ঘরে ঢুকে দাদার বন্ধুদের দেখে সে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যেতে তিস্তাকে দেখতে পেয়ে হেসে ফেলল, 'তুমি? এখানে কেন? ঘরে চলো তিস্তাদি।'

জয়তী হাসল, 'আর দিদিফিদি না, এখন থেকে বউদি বলবে।'

'বউদি?' অমিত অবাক হয়ে তিস্তাকে দেখল। তারপর ছুটে ভেতরে চলে গেল। সুমিত চাপা গলায় মন্তব্য করল, 'লজ্জা পেয়েছে।'

ওরা বসেছিল কাঠের চেয়ারগুলোতে। কাঠখোট্টা ধরনের লম্বা একটা ঘড়িতে সময় বাজল চারটে। ঠিক তখনই সুমিতের মা ভেতরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। ওরা সবাই উঠে পড়ল তাঁকে দেখে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার সুমিত?'

জয়তী ফিসফিস করে তিস্তার কানে বলেছিল, 'প্রণাম কর, মা।'

দুটো পায়ে যেন একমণ লোহার শেকল, তাই নিয়ে এগিয়ে গিয়ে নিচু হল তিস্তা। খুব অবাক হয়ে ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'একি! এসব কেন?'

সুমিত জবাবটা দিল, 'মা, আমরা আজ বিয়ে করেছি।'

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে রইলেন। দলের কেউ কথা বলছিল না। হঠাৎই নিজেকে যেন ফাঁসির আসামী বলে মনে হতে লাগল তিস্তার।

'আমার অনুমতি নিয়েছিলে?'

'না মা, হঠাৎই—।'

'কোথায়? কালীঘাটে?'

'না। আমরা সই করে বিয়ে করেছি।'

'সেটা করতে গেলে অনেক আগে নোটিস দিতে হয় বলে শুনেছিলাম।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে হঠাৎ হয়নি!'

সুমিত চুপ করে রইল। ভদ্রমহিলা এবার তিস্তার দিকে তাকালেন, 'তুমি যে আমার ছেলেকে বিয়ে করলে একথা তোমার বাপ-মা জানে?'

ঠোঁট টিপে মাথা নেড়ে না বলেছিল তিস্তা।

'চমৎকার। শোনো, তুমি পরের ঘরের মেয়ে। যতক্ষণ না তোমার বাবা নিজে এসে আমাকে অনুরোধ করছেন ততক্ষণ আমি তোমাকে এ বাড়ির বউ হিসেবে গ্রহণ করতে পারব না।' ভদ্রমহিলা ফিরে যাওয়ার উপক্রম করতেই সুমিত বলেছিল, 'মা, ওর বাবা এখনই বিয়ের বিরুদ্ধে! তুমি তো তিস্তাকে ভালবাস!'

'ওর বাবা বিরুদ্ধে হলে আমি সপক্ষে যাব এমন ভাবনা ভাবছ কী করে? তাছাড়া ওকে আমি ছেলের মাস্টারনি হিসেবে পছন্দ করতাম! এখন থেকে আর ও তা থাকছে না। আর কিছু বলার আছে?'

এবার জয়তী বলল, 'মাসিমা, আপনি একটু নরম হোন।'

'আমি তো নরম আছি। ওকে গ্রহণ করতে একটুও আপত্তি নেই। শুধু ওর বাবাকে আমার কাছে আসতে হবে। এ বাড়িতে থাকলে ওর খাওয়াপরার দায়িত্ব তো আমার। যাকে বিয়ে করল তার তো এক পয়সা মুরোদ নেই। তাই ওর বাপের সঙ্গে কথা বলতে হবে না?'

এই সময় এক প্রায় বৃদ্ধ মানুষ বাইরের দরজা দিয়ে উঁকি মারলেন, 'কী হচ্ছে?' সুমিতের মা গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন, 'তোমার কোনো দরকার নেই। যাও, ভেতরে যাও।' ভদ্রলোক আর একটিও কথা না বলে জোব্বা-প্রমাণ ব্যাগ নিয়ে সুড়সুড় করে ভেতরে চলে গেলেন। তাঁর যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে সুমিতের মা বললেন, 'এসো তোমরা।'

মিনিট দুয়েক বাদে ওরা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিল। তিস্তা অনেক চেষ্টায় নিজেকে সামলে রাখতে পারছিল। জয়তী জিজ্ঞাসা করল, 'তুই বলেছিলি তোকে খুব ভালবাসেন!'

'তাই মনে হত। রোজ সুজি আর রসগোল্লা খাওয়াতো!' তিস্তার গলা অন্যরকম।

সুমিত জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কী করা যায়?'

জয়তী বলল, 'সেটা তুমি ঠিক করো। ধরিত্রী বলে বিয়ের পর মেয়েকে কেন ছেলেদের বাড়িতে যেতে হবে, উল্টোটা হয় না কেন? ঠিকই বলে। তুমি তো একটু পরে সুড়সুড় করে নিজের বাড়িতে ফিরে যাবে, তিস্তার কী হবে?'

'আশ্চর্য! তোমার কিসে মনে হল ওর একটা ব্যবস্থা না করে আমি বাড়ি ফিরে যাব?'

'বেশ। তাহলে একটা ব্যবস্থা করো।'

'সেটাই তো মাথায় আসছে না। আচ্ছা, ম্যারেড মেয়েদের হোস্টেল নেই?'

'আছে। কিন্তু যাওয়ামাত্র আজ থেকে সিট পাওয়া যাবে নাকি?'

বলরাম নামের একটি চুপচাপ ছেলে ওদের দলে ছিল। এতক্ষণে সে কথা বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না তোরা বিয়ে করেছিস কী জন্যে?'

'একসঙ্গে থাকব বলে।'

'কোথায় থাকছিস? হোস্টেল খুঁজছিস কেন?'

'কীভাবে থাকব? মায়ের কথা তো শুনলি।'

'অদ্ভুত। কলকাতায় ঘরভাড়া নে, দুজনে থাক।'

'ঘর ভাড়া চাইলেই পাওয়া যায়?'

'তোদের চাই? আমার এক পিসেমশাই হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনে থাকেন। ওঁর বাড়িতে তিনটে ভাড়াটে। একটা গতকাল উঠে গেছে। আমি বললে তোকে দিতে পারে।'

'জায়গাটা কোথায়?'

'দমদমে। কাশীপুর ক্লাবের পেছনে।'

'ভাড়া?'

'আগের লোকটা শ'খানেক দিত। একমাসের অ্যাডভান্স।'

সুমিত কিছু বলার আগেই জয়তী বলে উঠল, 'ওর চেয়ে ভাল আর কিছুতেই হয় না। দুশো টাকা লাগছে এখন। টিউশনি করে আর তোর বাবার পাঠানো টাকায় একটু কষ্ট করে চালিয়ে নে। সুমিতও রোজগারের চেষ্টা করুক। কারো ওপর নির্ভর করতে হবে না। আর দেরি না করে এখনই হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনে যাওয়া যাক।

স্বপ্নের মত ঘটে গেল ঘটনাগুলো। তখন সবে বাবার পাঠানো টাকা তিস্তার হাতে এসেছে। কলেজের মাইনেটাই দিয়েছিল শুধু, হোস্টেল এবং আনুষঙ্গিক খরচ তখনও না মেটানোয় ব্যাগে টাকা ছিল। সুমিত কিছু জোগাড় করল।

হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনের বাড়িটায় যে ঘরটি খালি সেটা দোতলায়। লাভের মধ্যে ওর লাগোয়া বাথরুম আছে। সব শুনে বলরামের পিসেমশাই বললেন, 'দ্যাখো, আমি ঝামেলা পছন্দ করি না। ভাড়া দিচ্ছ, থাকবে। কিন্তু পুলিশ এলে চলে যেতে হবে।'

ভদ্রলোককে বিয়ের সার্টিফিকেট দেখাতে হল অবশ্য।

ঘরে কোনো আসবাব নেই। খাট দূরের কথা, একটা র‍্যাক পর্যন্ত নেই। এই ঘরে বাস করতে গেলে অনেক কিছুর প্রয়োজন। ওদের দুজনের কাছে যা আছে তা দিয়ে এতসব কেনা সম্ভব নয়। ওরা বিবেকানন্দ রোডে ফিরে এল।

হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সমস্ত শুনে হতভম্ব। বললেন, 'এরপরে তোমার এখানে থাকা চলবে না। তোমার বাবাকে আমি আজই জানিয়ে দিচ্ছি।'

'আমি জানি এখানে থাকা চলবে না। আমি আমার জিনিসপত্র নিতে এসেছি।' তিস্তা স্বাভাবিক গলায় বলেছিল।

জিনিসপত্র দিতে ভদ্রমহিলার কুণ্ঠা ছিল কিন্তু আটকে রাখার অধিকার না থাকায় কিছুই করতে পারলো না। যা কিছু দেয় ছিল দেবার পর তিস্তার ব্যাগে চল্লিশ টাকা পড়ে রইল। বিছানাপত্র স্যুটকেশ নিয়ে হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনে ট্যাক্সি ছাড়া যাওয়া—সম্ভব নয়। কিছু টাকা কমে গেল। বন্ধুরা চলে গিয়েছিল বিবেকানন্দ রোড থেকে। অনেক অভিনন্দন নিয়ে ওরা যখন ট্যাক্সিতে উঠেছিল তখন সন্ধে। এই যে এতক্ষণ একটার পর একটা টেনসনের ঢেউ ওরা পেরিয়ে এল, এবার তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে শরীরে, মনে। তিস্তা অবাক হয়ে দেখল সুমিত খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। যেন কিছুই হয়নি। সে মনে মনে খুশি হয়েছিল। একজন শক্ত না হলে চলবে কেন!

মাটিতেই বিছানা করা হল। চিড়িয়ামোড় থেকে রুটি আর মাংস কিনে আনল সুমিত। তিস্তার নিজের দুটো বালিশের ওয়াড় একটু ময়লাটে হয়ে এসেছিল, এখানে এসে সেটা খুলে নতুন পরিয়েছে। একজনের দুটো বালিশ দুজনের কাজে লাগবে। খাওয়া দাওয়া শেষ করে সুমিত বলল, 'একটা ভুল, হয়ে গেছে।'

'কী?'

'মাকে জানানো হয়নি।'

রাগ হয়ে গেল তিস্তার, 'কী জানাবে?'

'না, মানে, এখানে আছি। বাড়ি ফিরব না।'

'আশ্চর্য! তোমার মা তো বলেই দিয়েছেন।'

'স্পষ্ট কথা হয়নি কিছু।'

'আর কী স্পষ্ট হবে?'

'তোমার কথা বলেছেন। হয়তো ভেবেছেন আমি ফিরে যাব।'

'তুমি কী বলতে চাইছ?'

'আমার একবার বলে আসা উচিত যে এখন থেকে এখানেই থাকছি।'

হঠাৎ তিস্তার মনে হল সুমিতের মনে যদি কোনো অস্বস্তি থেকে থাকে তবে সেটাকে সরিয়ে ফেলতে সাহায্য করা উচিত। ও যদি ওর মাকে বলে এসে শান্তি পায় তবে তাই যাক। তিস্তা বলল, 'বেশ, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

'যাব আর আসব। বড়জোর এক ঘণ্টা। ক'টা বাজে?'

'নয়।'

'দশ সোওয়া দশের মধ্যে ফিরছি। ঘুমিয়ে পোড়ো না।

তিস্তা হাসল। তৈরি হয়ে সুমিত বেরুতে যাচ্ছিল তিস্তা ডাকল। সুমিত বলল, 'যাঃ পেছনে ডাকলে।'

তিস্তা এগিয়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরেছিল। এই প্রথম কোনো পুরুষ শরীরের গন্ধ তার সমস্ত সত্তায় মিশে যাচ্ছিল। সুমিত ওকে চুম্বন করল। তিস্তা হেসে বলল, 'ওঃ, এর জন্যে এত!'

'তার মানে?'

'তুমি এটা করতে চেয়েছিলে আর আমি বলেছিলাম বিয়ে করতে হবে।' এবার তিস্তা সক্রিয় হল। ব্যাপারটা যখন সেখানেই থেমে থাকল না তখন তিস্তা তাকে মনে করিয়ে দিল মায়ের কথা। নিজের জামার বোতাম খুলতে লাগল সুমিত, 'দূর শালা। মা ঠিক বুঝে নেবে। নো মোর যাওয়াযাওয়ি।'

এই ব্যাপারটা সেই মুহূর্তে অত্যন্ত ভাল লাগলেও পরে এ নিয়ে অনেক ভেবেছে তিস্তা। সুমিত কেন সেই রাত্রে যেতে চেয়েছিল? কেউ যায়? উত্তরটা পেতে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি।

একটা কেরোসিন স্টোভ পর্যন্ত বাড়িতে নেই। সকালে ঘুম থেকে উঠে চা বানাবার ব্যবস্থা করা দরকার। কাছাকাছি চায়ের দোকান নেই। সুমিত বলল, 'মুখ ধুয়ে চলো। দোকান থেকে চা খেয়ে আসি। চা নিয়ে আসব কিসে?'

এ এক আলাদা ধরনের মজা। তিস্তার ভাল লাগল। দশটার মধ্যে স্নান করে তৈরি হয়ে ওরা যখন বের হল তখন সম্বল তিরিশ টাকাও নয়। ওরা দুজনে সরাসরি চলে এল কফিহাউসে। কফিহাউস তখনও জমে ওঠেনি। সুমিত বলল, 'আমরা রোজ এখানে এসে ব্রেকফাস্ট করতে পারি।'

'যতদিন টাকাটা থাকবে।' গম্ভীর গলায় বলল তিস্তা।

সুমিতের মুখ ভাবলেশহীন। একটু বাদে বলল, 'কলেজ যাবে না?'

'আজ ইচ্ছে করছে না।'

'আমি ভাবছি কী হবে? এই টাকায় তিনচার দিন চলবে। তারপর?'

তিস্তা হেসে ফেলল, 'আমার কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না।'

সেদিন বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ওরা কফিহাউসে ছিল। সেই প্রথম তিস্তা কফিহাউসের টয়লেট ব্যবহার করেছিল। উনিশ কুড়ি বছরের বন্ধুরা মিলে এক সঙ্গে আলোচনা করে গেল কি করে খাওয়াপরার সমস্যা মেটানো যায়। ধরিত্রী বলেছিল, 'ওই সব কবিতা মাইরি পকেটে টাকা না থাকলে অর্থহীন।'

'কোন কবিতা?' জয়তী জিজ্ঞাসা করেছিল।

'ওই যে, তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।'

সবাই হেসে উঠেছিল। শুধু সুমিত বলেছিল, 'বাড়ির ভাত খেয়ে সুখে ছিলাম, সর্বনাশ যে কি হল তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।'

তিস্তা প্রতিবাদ করেছিল, 'সুমিত!'

সুমিত সাত তাড়াতাড়ি বলেছিল, 'সরি। উইথড্র করছি।'

বলরাম বলেছিল, 'তোরা টিউশনি করতে পারিস।'

পাওয়া গেল। বলরামের পিসেমশাই নিজের দুই ছেলের জন্যে মাস্টার খুঁজছিলেন। মাসে তিরিশ টাকার বেশি দেবেন না। তাই সই। চারদিনের মাথায় যখন টাকা শেষ হয়ে গেল তখন সুমিত বলল, 'তুমি ভেবো না। আমি কাজের চেষ্টা করছি।'

তিস্তা বলল, 'তাহলে আমি আর বের হচ্ছি না। বেরলেই তো খরচ।'

'ঠিক আছে। আমি তোমার খাবার নিয়ে ফিরব।'

সকালে ঘুম থেকে উঠেই সুমিত বেরিয়ে যায়। তিস্তা যায় বাড়িওয়ালার ছেলেদের পড়াতে। কারণ সেখানে এক কাপ চা মেলে। তারপর সারাদিন শুয়ে বসে থাকা। তিস্তা ভাবে মাইনে পেলে একটা স্টোভ কিনবে। জনতা স্টোভ। তাতে কিছু অন্তত ফুটিয়ে নেওয়া যাবে। সারাটা দিন কেটে যায়। রাত দশটা নাগাদ সুমিত ফের হাতে এক ভাঁড় তরকারি আর তিনটে রুটি নিয়ে। না, কোনো কাজের খবর সে পায়নি। অনেক ঘুরেছে। কেউ কেউ আশা দেখিয়েছে। সুমিত জানায় সে খেয়ে এসেছে। তিনটে রুটি মুখে দিতে কষ্ট হয় তিস্তার। যদি সুমিত না খেয়ে আসে। তাকে সাধাসাধি করে একটা রুটি অন্তত খেতে। কোনোদিন খায় কোনোদিন খায় না সুমিত। দুটো রুটি আর তরকারিকে অমৃত বলে মনে হয় তিস্তার। জল খেয়ে সুমিতের বুকে মাথা রেখে শুয়ে মনে হয় স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো সেটা এখানেই। ভালবাসার জন্যে এক লক্ষ মাইল হেঁটে যেতে পারি, এক কোটি পদ্মের দিঘি ছেড়ে ভালবাসার জন্যে এতটুকু ঘাসফুল বুকে তুলে নিতে পারি। ভালবাসা তুমি আমায় রাজেন্দ্রাণী করেছ, আমার ভাঙা দাওয়া আর রাজপ্রাসাদের কোনো ফারাক নেই।

সারাদিন না খাওয়া আর রাত্রে দুটো বা তিনটে রুটি আর তরকারি খেয়ে বেঁচে থাকতে যে কষ্ট তা তিস্তার মনে একটুও রেখাপাত করছিল না। প্রতিদিন সে সুমিতকে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে কীভাবে তার দিন কাটল, কি খেল! শোনে, রোজই কোনো না কোনো বন্ধু পেট ভরে তাকে খাইয়েছে। মাস দুয়েক বাদে একটা লোভনীয় চাকরি পাওয়া যাবে। কিছু টাকা সে ধার করেছে বন্ধুদের কাছে। মাইনে পেলেই শোধ করে দেবে।

মাসের মাঝামাঝি আরও দুটো টিউশনি পেল তিস্তা। সব মিলিয়ে মাসে একশ তিরিশ টাকা রোজগার। ওর মনে হতে লাগল অনেক টাকা। সারাদিন খিদে চেপে চেপে একসময় খাওয়ার ইচ্ছেটাই কমে যেতে লাগল। মাস শেষ হলে স্টোভ কেনা, নিত্যবাজার করা ছাড়া কফিহাউস এবং কলেজে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে এই চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকত সে। ওর যে ওজন কমছে, শরীর রোগা হচ্ছে, এ ব্যাপারে একটুও খেয়াল ছিল না তিস্তার। এর মধ্যে জয়তী একদিন এল দেখা করতে। এসে অবাক হয়ে বলল, 'একি চেহারা হয়েছে তোর?'

'কেন? খারাপ লাগছে?'

'কি রোগা হয়ে গেছিস? খাওয়া দাওয়া করিস না?'

'বাঃ, করব না কেন?'

'বাড়িতে রান্না করিস?'

'সামনের মাস থেকে করব।'

'শোন তিস্তা। তোর বাবাকে সব জানিয়ে চিঠি লেখ।'

'কেন?'

'সুমিতের মায়ের ইচ্ছে তোর বাবা যদি ওঁকে এসে বলেন এই বিয়ে মেনে নিয়েছেন তাহলে তোকে ঘরের বউ করে নিতে কোনো আপত্তি ওঁর নেই। এখন যে অবস্থায় কাটাচ্ছিস তার চেয়ে চিঠি লেখা ঢের ভাল।'

'আমি লিখলেই বাবা শুনবেন কেন?'

'শুনবেন। তুই ওঁর মেয়ে। বাবারা চিরকাল মেয়েদের সবচাইতে বেশি ভালবাসে।'

'না। আমি লিখব না। মরে গেলেও না।'

'কেন?'

'আমি বাবার অবাধ্য হয়েছি। আমার ওই চিঠি লেখার মুখ নেই।'

'তাহলে কী করবি?'

'যা করছি। এ মাসটা কষ্ট করি।'

'ঠিক আছে। যদি টিউশুনিই করবি তাহলে ভাল টিউশুনি কর।'

'কোথায় পাব?'

'দাঁড়া। আমাদের ক্লাশের লছমি আগরওয়ালা বলছিল ওর খুড়তুতো বোনকে পড়ানোর জন্যে ইংলিশ মিডিয়ামের মেয়ে ওরা খুঁজছে। কালই ওর সঙ্গে কথা বলে দেখি।' জয়তী বলেছিল।

দুদিন বাদে সুমিত এসে খবর দিয়েছিল কফিহাউসে ওর সঙ্গে জয়তীর দেখা হয়েছে। জয়তী বলেছে তিস্তা যেন সামনের মাসের এক তারিখে বাড়িতে গিয়ে দেখা করে। এক ভদ্রলোকের এক মেয়েকে পড়াতে হবে। মাসে দু'শো টাকা পাবে। সপ্তাহে তিনদিন।

কেঁদে ফেলেছিল তিস্তা। দ'শো টাকা। মাসে বারো দিন। তার মানে সে হেসে খেলে সাড়ে তিনশ টাকা রোজগার করতে পারবে। সেটা হলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না! একটা স্টোভ, থালা বাসন, কেটলি কাপ ডিস আর খাট এবং আলনা কিনলে আপাতত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মাসে একশ টাকা ভাড়া দিতে হবে অবশ্য। প্রথম তিনচার মাস একটু কষ্ট হবে কিন্তু তারপর তো আর নয়। সুমিত নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা চাকরি ঠিক পেয়ে যাবে। কি অদ্ভুত নিশ্চয়তাবোধ তিস্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

মাসের শেষ দিকে তিস্তার একটু জ্বর হল। সেই সঙ্গে পেটে ব্যথা। সুমিতকে এই ছোট্ট সমস্যার কথা বলেনি সে। বেচারা বাড়ি ফিরেই গম্ভীর হয়ে থাকে। প্রথম প্রথম সে জিজ্ঞাসা করত ওই রুটি তরকারি সুমিত কিনছে কী করে।

ধার করা টাকায় কিনেছে শুনে খারাপ লাগত। প্রায়ই মনে করিয়ে দিত যেন এই কারণে সুমিত বেশি ধার না করে। এখন আর প্রশ্ন করে না। মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে যতই ধার করুক রুটি তরকারির জন্য কত আর খরচ হয়। মাইনে পেলে একটু একটু করে ধার শোধ করে,দেবে।

কিন্তু জ্বর বাড়তে লাগল। তৃতীয় দিনে পড়াতে যেতে পারল না সে। সুমিত বেরিয়ে গেছে রোজকারমত চাকরির ধান্দায়। পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। মুখে কোন স্বাদ নেই। উঠে দাঁড়ালেই মাথা ঘুরে যাচ্ছে। দুপুরে বলরামের পিসিমা খোঁজ নিতে এলেন। তিস্তার অবস্থা দেখে চমকে উঠলেন

মহিলা। তিস্তা প্রচণ্ড চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে পারছে না। মনে হচ্ছে শরীর নিংড়ে নিচ্ছে কেউ। ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি পাড়ার ডাক্তারকে ডেকে আনলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, 'মনে হচ্ছে জন্ডিস হয়েছে। খুব খারাপ ধরনের জন্ডিস। সেই সঙ্গে পেটে আলসার হতে পরে। এখনই হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার।'

বলরামের পিসিমা ঘরোয়া ধরনের মহিলা। ডাক্তারকে ফি দিয়ে বিদায় করে আর এক ভাড়াটেকে ব্যাপারটা বললেন। তার ফলে বিকেল নাগাদ তিস্তা আর জি কর হসপিটালের জেনারেল বেডে শুতে পারল। সুমিত সেদিনও ফিরেছিল রাত দশটায় আলুপটলের তরকারি আর রুটি নিয়ে। খবরটা পেয়ে ঘাবড়ে গিয়েছিল। অত রাত্রে হাসপাতালে গিয়ে কোনো লাভ নেই জেনে তিস্তার ডায়েরি হাতড়েছিল। সেখানে তিস্তার কানপুরের ঠিকানা পেয়ে পরের দিন সকাল হতেই টেলিগ্রাম করেছিল, 'ডটার সিরিয়াসলি ইল। অ্যাডমিটেড ইন আর জি কর। কাম শার্প।'

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কিছুই টের পায়নি তিস্তা। কখন তাকে পেয়িং বেড থেকে কেবিনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা সে টের পায়নি। যখন কথা বলার অবস্থায় এল তখন বাবা চোখের সামনে। মা বাবার পাশে। পেছনে সুমিতও দাঁড়িয়ে। কেঁদে ফেলেছিল তিস্তা। চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে এসেছিল। ওর বাবার হাত এগিয়ে এসেছিল। মেয়ের ডান হাত আঁকড়ে ধরে ভদ্রলোক বিড়বিড় করেছিলেন, 'কেন এমন করলি! কেন?'

জবাব দিতে পারেনি তিস্তা। কিন্তু বুকের ভেতর এতদিন যেসব যুক্তি দিয়ে প্রতিরোধ তৈরি করে রেখেছিল তা এক লহমায় ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তাকে ওইভাবে কাঁদতে দেখে নার্স এগিয়ে এল, 'না, আর নয়, এবার আপনারা বাইরে যান।'

'দিদি, চিড়িয়ামোড় এসে গেছে।'

বাস্তবে ফিরল তিস্তা। চারপাশে আলো জ্বলছে। রিকশার হর্ন বাজছে এলোমেলো। বারাকপুরে চিড়িয়ামোড়ে ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে। সামনের লোকদুটো টাকা দিয়ে নেমে গেল নিঃশব্দে। তিস্তা ব্যাগ খুলল। বুড়ো সর্দারজি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কতদূরে যাবেন এখান থেকে?'

'নোনাচন্দনপুকুর।'

'বেশি ভেতরে না হলে আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

'না, না, আমি রিকশা নিয়ে চলে যাব। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কত দিতে হবে?' পেছনের সিট থেকে মিটার দেখতে পাচ্ছিল না তিস্তা।

'তিরিশ দিন।'

'কী বলছেন? মাত্র ষাট টাকা উঠেছে?'

'না দিদি। তিন তিরিশ নব্বুই পেলে মিটারের অনেক বেশি আমি পেয়ে যাব। আপনি তিরিশই দিন।'

টাকাটা দিয়ে তিস্তা বলল, 'আপনি অদ্ভুত মানুষ!'

বুড়ো সর্দারজি হাসল, 'আমি নিজের ক্ষতি করিনি কিন্তু।'

রিকশায় বসেও লোকটাকে ভুলতে পারছিল না তিস্তা। নিজের ক্ষতি না করেও কেউ তো অন্যের উপকার করে না। রেল লাইনের পাশ ধরে সিনেমা হাউসের সামনে দিয়ে লেবেল ক্রসিং-এর কাছে পৌঁছে দেখল সেটা খোলা। ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক থাকলে এখানে প্রায়ই জ্যাম হয়। অর্থাৎ এখনও ট্রেন চলাচল শুরু হয়নি। আনন্দপুরীর পাশ দিয়ে খানিকটা এগোতেই ক্ষিরোদ চক্রবর্তীর বাড়ি। তাঁর ভাইপো অসীম তাদের বাড়িওয়ালা। অসীমের স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিলেন বারান্দায়। তিস্তাকে নামতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কিসে এলেন ভাই? শুনলাম ট্রেনে খুব গোলমাল হয়েছে।'

ভাড়া মিটিয়ে কাছে সে তিস্তা বলল, 'হ্যাঁ।'

'দেখুন তো কী হবে!'

'কেন?'

'সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরবে বলেছিল, একটা নেমন্তন্ন রাখতে যেতে হবে। আপনি কী করে এলেন?' ভদ্রমহিলা খুবই উদ্বিগ্ন।

'আমি একটা গাড়ি পেয়ে গেলাম।' তিস্তা ঠোঁট কামড়ালো। ব্যথাটা আবার চাগিয়ে উঠেছে। কোমর থেকে তলপেটে নেমে যাচ্ছে পেঁচিয়ে! অসীমবাবুর স্ত্রী চমকে উঠলেন, 'কী হয়েছে আপনার?'

অনেক কষ্টে ভদ্রমহিলার সাহায্য নিয়ে তালা খুলে বাড়িতে ঢুকেছিল তিস্তা। আলো জ্বেলে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মিসেস চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কখন থেকে এমন ব্যথা হচ্ছে?'

'একটু আগে প্রথম টের পেলাম।' যন্ত্রণাটাকে সামলাতে চেষ্টা করছিল তিস্তা।

'আপনি এই অবস্থায় বেরিয়েছেন কেন?'

' অবস্থা? না, এখনও অনেক দেরি আছে। একবার ডক্টর মল্লিককে যদি ফোন করা যেত, আমি বুঝতে পারছি আপনার খুব অসুবিধে হচ্ছে!' তিস্তা হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল। কাউকে বিব্রত করতে তার কখনই ভাল লাগে না।

মিসেস চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। বিছানায় শুয়ে অরিত্রর কথা মনে হল তিস্তার। অরিত্র যদি পাশে থাকত। আকাশবাণীতে একটা খবর দিতে বলবে? কিন্তু ব্যথাটা একটু একটু করে কমে এল একসময়। কপালের ঘামও শুকিয়েছে। ধীরে ধীরে খাট থেকে নেমে দাঁড়াল সে। সামান্য মাথা ঘোরা ছাড়া আর তেমন কোনো অসুবিধে নেই। ঈশ্বর এ যাত্রায় বাঁচিয়ে দিলেন।

মিসেস চক্রবর্তী ফিরে এসে বললেন, 'আরে, উঠেছেন কেন?'

লজ্জিত হাসি হাসল তিস্তা, 'ঠিক আছি এখন।

'ডাক্তার মল্লিক আসছেন।'

'ও।' তিস্তার মনে হল না বললেই ভাল হত। ট্যাক্সি ভাড়ার পর আরও কিছু বাড়তি টাকা যাবে। এখন তো অসুবিধে নেই।

'আপনার সাহস আছে!'

'কেন?'

'এই স্টেজেও একা আছেন, অফিস করছেন।' মিসেস চক্রবর্তী বললেন 'আমি আকাশবাণীতেও টেলিফোন করে দিয়েছি।'

'ও ছিল?'

'হ্যাঁ, বললেন কাজ শেষ করেই চলে আসছেন। আপনি বরং একটু বিশ্রাম নিন। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'না না। আমার এখন ভালই লাগছে।'

'আপনি পারবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'তখন আপনার মুখের যা অবস্থা হয়েছিল! আচ্ছা, ডক্টর মল্লিক এসে দেখুন আপনাকে তারপর যা ইচ্ছে তাই করবেন।'

ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। একই বাড়ি হলেও ভাড়াটে হিসেবে তাদের যাওয়া আসা এবং অন্যান্য স্বাধীনতা সম্পূর্ণ আছে। ভদ্রমহিলার সঙ্গে এতদিন শুধুই ভালো সম্পর্ক ছিল। হৃদ্যতা গড়ে ওঠার

অবকাশ বা বাসনা কোনোটাই হয়নি। আজ এমনভাবে ওঁকে এগিয়ে আসতে দেখে ভাললাগার সঙ্গে অস্বস্তিও কম হচ্ছিল না।

বাথরুম হল এমন একটা জায়গা যেখানে শারীরিক দুর্ঘটনার ষাট ভাগই ঘটে থাকে। শোওয়ার ঘরের মত বাথরুমকে ছিমছাম রাখার দিকে ঝোঁক তিস্তার অনেক দিনের। অরিত্র ঠাট্টা করে বাতিক বলে। নতুন সাবান ব্যবহার করে অরিত্র মোড়কটাকে মেঝেয় ফেলে রেখে গেছে। হেঁট হয়ে সেটাকে তুলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল তিস্তা। পায়ে করে সরিয়ে দিল একপাশে।

ডাক্তার মল্লিক এসে পড়লেন একটু বাদেই। মিসেস চক্রবর্তী তাঁর সঙ্গে। তিস্তাকে দেখেই ভদ্রলোক বললেন, 'কী হল? এমন জরুরি হুমকি?'

'হঠাৎ একটা ব্যথা—!' তিস্তা অপরাধীর হাসি হাসল।

'কখন থেকে?'

প্রথম টের পাওয়ার সময়টা বলল তিস্তা। ডাক্তার মল্লিক ওকে বিছানায় শুইয়ে নানারকম পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, 'এখনও মাস দুয়েক বাকি। অনেক সময় টেনশনে এমনটা হতে পারে। একবার যখন হয়েছে তখন আর আপনি বাইরে বের হবেন না। ব্যথাটা যদি রিপিট করে সোজা আমার নার্সিংহোমে চলে আসবেন। আমি ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি।' প্যাড বের করলেন ভদ্রলোক। তিস্তা সেদিকে তাকাল, 'ভয়ের কিছু নেই তো?'

'না মা। এখন পর্যন্ত সব ঠিকঠাক আছে।'

'ডাক্তারবাবু, আমি কোনো ঝুঁকিই নিতে চাই না। কিন্তু পরেও তো অনেক ছুটি লাগবে। তিনমাসের বেশি তো পাব না।'

ডাক্তার মুখ তুললেন, 'এখন ঝুঁকি নিলে সেটায় দুটো প্রাণের ভালমন্দ জড়ানো থাকবে। পরে সেটা হবে আপনার একার। সিজার না হলে মাসখানেক বাদে অফিসে যেতে দিতে পারি।'

ওঁরা চলে গেলে প্রেসক্রিপশনের কাগজটা হাতে নিয়ে বসে থাকল তিস্তা। আজ বাড়িতে এসে কাজের মেয়েটাকে দেখতে পায়নি। নটায় ওষুধের দোকান বন্ধ হয় এখানে। অরিত্র যদি তার মধ্যে না আসে তাহলে অন্তত আজকের রাত্রের জন্যে এই কাগজটার কোনো মূল্য থাকবে না। তিস্তা কেঁদে ফেলল এবং তখনই দরজায় শব্দ হল। নিজেকে ঠিক করতে যেটুকু সময় তাতেই গলা পেল, 'বউদি!'

তিস্তা চোখ মুখ তাকাল। বাড়িওয়ালার কাজের মেয়েটি দাঁড়িয়ে, 'দিন।'

'কী?'

'মা বলল ওষুধ এনে দিতে হবে।'

'ও।' তিস্তা হেসে ফেলল। পৃথিবী এখনও হঠাৎ হঠাৎ ভাল হয়ে ওঠে।

'তোমাদের বাবু এসেছেন?'

'না।'

টাকা নিয়ে ওষুধ আনতে চলে গেল মেয়েটি। মিস্টার চক্রবর্তীর বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল তবু তিনি ফিরতে পারেননি। অরিত্র ফিরবে কী করে? সে যদি ট্যাক্সিটাকে না পেত, যদি সর্দারজি রাজি না হত, ভাবতেই গা কেমন করে উঠল। ওই যন্ত্রণা নিয়ে শেয়ালদা স্টেশনের জনস্রোতে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারত তিস্তা?

ওষুধ পৌঁছে দিল মেয়েটা। এসে বলল, 'এইমাত্র বাবু এল। বাসে এসেছে। ট্রেনে নাকি খুব গোলমাল।'

'জানি।'

'আচ্ছা বউদি, একটা কথা বলব?'

'কী কথা?'

'আপনার শ্বশুরবাড়ির কেউ নেই?'

'থাকবে না কেন?'

'নিজের মা-বাবাও তো আছে!'

'হুম্।'

'তাদের কাছে চলে যাচ্ছেন না কেন? আমরা এত গরিব তবু এসময় ঘরে মেয়ে এলে বুকে করে আগলে রাখি।'

তিস্তা হেসে ফেলল, 'ভেবেছিলাম ছুটি নেবার পর মায়ের কাছে যাব।'

'তাহলে মাকে আসতে লিখুন। এই সময় ব্যাটাছেলে কী বুঝবে?'

মেয়েটি চলে যাওয়ার পর ওষুধ খেল তিস্তা। খিদে পাচ্ছে বেশ। খালি পেটেই খেল। সকালে বিকেলের তরকারি বেঁধে গিয়েছিল। রাতে রুটিটা তৈরি করিয়ে নেয়। আজ কী হবে। এত অবসন্ন লাগছে যে রান্নাঘরে যাওয়ার ইচ্ছে এইটুকুও নেই। অরিত্র যদি দশটার মধ্যে আসে তাহলে দোকান থেকে রুটি কিনে আনতে পারে। চুপচাপ শুয়ে পড়ল তিস্তা। শুতে বড় স্বস্তি।

'একি দরজা বন্ধ না করে ঘুমিয়ে আছ?'

পাল্লার আওয়াজে ঘুম ভাঙতেই তিস্তা প্রশ্নটা শুনতে পেল। অরিত্র দাঁড়িয়ে আছে খাটের পাশে। অরিত্রকে চিনতেই যেন একটু সময় গেল। এর মধ্যে অরিত্র নিজেকে শুধরেছে, 'কী হয়েছে? কেমন আছ?'

তিস্তা উঠে বসল, 'ঠিক আছি।'

'মিসেস চক্রবর্তীর টেলিফোন পেয়ে আমি তো ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তুমি কী করে বাড়ি ফিরলে? ওঃ, আজ যা স্টেশনে মারপিট। আমি তো অফিসের গাড়িতে ফিরলাম।' অরিত্র জোরে জোরে কথা বলছিল।

'এখন কটা বাজে?'

'এখন?' ঘড়ি দেখল অরিত্র, 'বারোটা বাজতে তিন।'

তিস্তা হেসে ফেলল। জামা ছাড়তে ছাড়তে অরিত্র বলল, 'হাসছ যে!'

'তুমি খবর পেয়েই চলে এলে বোধহয়!'

'হ্যাঁ। স্টেশনে গিয়ে দেখি ট্রেন বন্ধ। বাসে ওঠা যাচ্ছে না। আবার অফিসে ফিরে গেলাম। কয়েকজন স্টাফকে এদিকে পৌঁছতে আসছিল তাই চলে আসতে পারলাম। ডাক্তার এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কী বলল!'

'ভয় নেই, মরব না।'

'বুঝলাম। ঠিক কী হয়েছিল?'

'পেইন।'

' সেকি ? এখনই?'

'জানি না।'

'তুমি তোমার মায়ের কাছে চলে যাও এবার।'

'থ্যাঙ্কস।'

'আচ্ছা, আমি যাই বলি তাই তোমার খারাপ লাগে কেন বলো তো?'

'বলার মধ্যে আন্তরিকতা থাকে না বলে।'

অরিত্র পাশে এসে বসল। একটা হাত তিস্তার কাঁধে রাখল, 'যদি দুঃখ পেয়ে থাকো তাহলে সত্যি আমি দুঃখিত। আসলে আমি ঠিক নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারি না বলে—।' অরিত্র থেমে গেল।

হঠাৎ কি হল, ভীষণ একা লাগতে লাগতে হয়তো সামান্য স্পর্শ অনেকটা পাওয়ার স্বাদ এনে দেয়। তিস্তা অরিত্রর হাতে গাল রাখল। সেই উষ্ণতায় যে আরাম তাতে তার চোখ বুজে গেল। অরিত্র জিজ্ঞাসা করল, 'খেয়েছ?'

কথা না বলে মাথা নেড়ে সত্যিটা জানাল তিস্তা।

'সেকি? রান্না হয়নি? টগরের মা আসেনি?'

'আমি যখন ফিরেছি তখন ও ছিল না।'

'তাহলে বাড়িতে খাবার নেই?' হাত সরিয়ে নিল অরিত্র।

'ভেবেছিলাম তুমি তাড়াতাড়ি ফিরলে রুটি কিনে আনতে বলব।'

'আশ্চর্য!'

'তার মানে?'

'আমরা দোকানের রুটি খাই?'

'এখন খাই না। কিন্তু না খাওয়ার কিছু নেই।'

'তুমি কখন ফিরেছ?'

'আটটার মধ্যে।

' সেকী? কিসে এলে?'

'ট্যাক্সিতে।'

'মাইগড। তিস্তা আমি বুঝতে পারি না মাঝে মাঝে তোমাব মধ্যে পুরনো ভূতটা কী করে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে! এখন ট্যাক্সিতে চড়া একদম লাক্সারি ছাড়া কিছু নয়। বাচ্চা হতে কত খরচ হবে কে জানে।' অরিত্র উত্তেজিত গলায় বলল।

'পাউরুটি আছে। তাই দিয়ে তরকারি খেয়ে নাও। আমার ঘুম পাচ্ছে।' পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল তিস্তা।

খাওয়ার ব্যাপারে অরিত্র একটু বিলাসী। মাঝে মাঝে মনে হয় খুব কম পুরুষই খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে নির্লিপ্ত। আজকাল ছুটি থাকলে রান্না করতে ভালই লাগে তিস্তার। সেদিন অফিসে কথা হচ্ছিল। গত তিরিশ বছরে মেয়েদের যেমন অনেক কিছু বদলে গিয়েছে তেমনি রান্নার ধরনেও পরিবর্তন এসেছে। মা ঠাকুমাদের হাতের রান্না ছিল অসাধারণ। এটা মেনেও বলতে হয় তাঁদের এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ ছিল না। বড়ির ঝোল, সুক্তো অথবা মুড়োঘন্ট তাঁরা অসাধারণ রাঁধতেন কিন্তু ওগুলো থেকে আর একটা পদ তৈরির কথা খুব কম মহিলাই ভাবতে পারতেন। তখন ডিমটাকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হত না। এখন ওই এক ডিম দিয়েই কত রকমের খাবার তৈরি করতে পারে একালের মনোযোগী মহিলারা। অথচ স্কুলজীবন পর্যন্ত রান্নাঘরে ঢোকার দরকার হয়নি। পরে কখন কেমন করে একটু একটু নাড়াচাড়া করতে করতে ব্যাপারটা আয়ত্তে এসে গেল তা নিজেরই জানা নেই। এখন কেউ খেতে ভালবাসলে তাকে ভালমন্দ রেঁধে খাওয়াতে ইচ্ছে হয়। আজ এত কাণ্ডের পরেও অরিত্র শুধু রুটি আর ঠাণ্ডা তরকারি খাচ্ছে বলে মন খারাপ হয়ে গেল তিস্তার। নিজের খিদের কথা মনে রইল না।

মাঝরাত্রে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখল তিস্তা। দেখে হাঁসফাঁস করে উঠে বসল। স্বপ্নে সে ধরিত্রীকে

দেখতে পেয়েছিল। সেই ধরিত্রী। কলেজ জীবনে যে ছিল নারীপ্রগতির সপক্ষে বলিয়ে মেয়ে। অনেককাল হয়ে গেল ধরিত্রীর সঙ্গে দেখা নেই। দেখা নেই জয়তীর সঙ্গেও। বিয়ে-থা করে পুনায় চলে গিয়েছে। ঠিকানা জানা নেই যে চিঠিপত্র দেবে। ধরিত্রীর বিয়ের ব্যাপারটাও অজানা। স্বপ্নে ধরিত্রীকে দেখল একটি মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করতে। লোকটা যে ওর স্বামী তা বুঝতে পারছিল। হঠাৎ কোথা থেকে লোকটা লোহার বেড়ি এনে ধরিত্রীর পায়ে পরিয়ে দিয়ে বিছানায় আরাম করে ঘুমিয়ে পড়ল। ধরিত্রী রাগত চোখে তাকে দেখল। তারপর হামাগুড়ি দেবার মতো হেঁটে এক ক্যান পেট্রল বিছানায় উপুড় করে দিয়ে দেশলাই জ্বেলে দিল। দাউদাউ আগুনের মধ্যে লোকটা জ্বলে যাচ্ছিল। সেটা দেখামাত্র ঘুম ভেঙে গেল তিস্তার। নীল আলো জড়ানো ঘরে সে চারপাশে তাকাল। অরিত্র ওপাশে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে আছে। এই ঘর তাদের ঘর।

কিন্তু এমন স্বপ্ন দেখল কেন? ধরিত্রী বা এতকাল পর আসবে কেন তার স্বপ্নে? অরিত্রর দিকে তাকাল সে। স্বামীর সম্পর্কে সে কি মনে মনে এতটা তিক্ত হয়ে গেছে যা স্বপ্নে প্রতিফলিত হচ্ছে? সে কি কখনও ঘুমন্ত অরিত্রকে পুড়িয়ে মারতে পারবে? অসম্ভব। তাছাড়া কেন সেটা করবে? এ ধরনের স্বপ্ন দেখা মানে নিজের মানসিক বিকৃতি ছাড়া কিছু নয়।

অরিত্রর কিছু কিছু ব্যবহার তার ভাল লাগে না, এটা ঠিক কথা। খুঁটিয়ে দেখলে ওর ব্যবহারে অনেক ত্রুটি পাওয়া যাবে। যাকে বলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানুষ অরিত্র প্রায় তাই। নিজের ভালো বুঝে নিতে ওর জুড়ি নেই। কিন্তু তার বাইরে ও খুব স্বাভাবিক। যে কোনো বিষয় নিয়ে কথা বললে ওর বুদ্ধিদীপ্ত মনের ছবি চমৎকার পাওয়া যায়। কোনো মানুষ সম্পূর্ণ নিটোল হয় না। অনেকেরই অনেক রকম খামতি থাকে। তিস্তার নিজেরই কি তা নেই? অতএব অরিত্রর ব্যবহারে যা কিছু অপছন্দ তা বাদ দিয়েই ওকে সে গ্রহণ করেছে এবং করে যাবে। অন্তত এটুকু কারণের জন্যে ধরিত্রীদের দলে সে কখনও সংখ্যা বাড়াতে পারে না।

ঘুমন্ত অবস্থায় অরিত্র মুখ ফেরাল। গাল রাখল কনুইতে। এখন ও কাদা। আর ওর এই ভঙ্গি দেখে কেঁপে উঠল তিস্তা। চট করে তার সামনে সুমিত চলে এল। ঘুমাবার সময় এটা খুব প্রিয় ভঙ্গি ছিল সুমিতের। একটু আলাদা, একদম একা শোওয়ার অভ্যেস সুমিতের, বলত কেউ গায়ের পাশে শুলে ওর ঘুম আসে না। হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনের বিছানাহীন মেঝেতেও ও সেই অভ্যেসটা চালু রেখেছিল। যতক্ষণ শরীরের প্রয়োজন ততক্ষণ জড়িয়ে থাকা, তারপর একা আলাদা হয়ে যাওয়া।

হাসপাতালেই বেশ রোগা হয়ে গিয়েছিল তিস্তা। যেদিন রিলিজ অর্ডার পেল সেদিন বাবা বললেন, 'মা, তোর সুখের জন্য আমাকে যা করতে বলবি আমি করব। সুমিতকে আমার খারাপ লাগেনি। শুধু ও চাকরিবাকরি করে না, মা-বাবার ওপর নির্ভর করে আছে এইটেই মেনে নিতে পারছি না। তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

কেবিনে বাবার সঙ্গে মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। তিস্তা মাথা নেড়েছিল।

'সমস্ত ছেলেবেলা ধরে তোকে আমি যে শিক্ষা দিয়েছিলাম তা কি বৃথা হয়ে গেল?' প্রৌঢ় অদ্ভুত চোখে তাকিয়েছিলেন।

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে আবার না বলেছিল তিস্তা।

'তুই এরকম কাণ্ড তাহলে কী করে করলি?'

খানিকক্ষণ চুপ করেছিল তিস্তা। তারপর বলেছিল, 'উত্তরটা পরে দেব বাবা।'

মা এবার কথা বললো, 'তোমার আর দমদমে থাকা চলবে না।'

বাবা বললেন, 'ওকে সব বলো।'

মা বললেন, 'গতকাল সুমিতের সঙ্গে ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওর মায়ের সঙ্গে পরিচয় হল। তিনি বললেন আমাদের আপত্তি না থাকলে তাঁরও তোকে ছেলের বউ হিসেবে করতে আপত্তি নেই।'

তিস্তা ঠোঁট কামড়েছিল।

বাবা বলেছিলেন, 'আমার তো ভদ্রমহিলার কথাবার্তা খারাপ লাগেনি। ছেলে না বলে বিয়ে করেছে তবু একটুও রাগ নেই। বললেন, আপনাদের মেয়ে, আপনারা অনুমতি না দিলে আমরা কেন গ্রহণ করব? ঠিক কথা।'

সেদিন সুমিত হাসপাতালে আসেনি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বাবা-মা তাকে নিয়ে সুমিতের বাড়িতে গেলেন। ওর মায়ের ব্যবহার দেখে মনেই হল না একদিন তিনি দরজা থেকে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। দুহাতে জড়িয়ে বুকে টেনে নিলেন। আন্তরিক গলায় বললেন, 'ওম্মা, কি চেহারা করেছিস তুই! আহারে।'

বাবা বললেন, 'খুব খারাপ ধরনের জন্ডিস হয়েছিল।'

'তা তো দেখেই বুঝতে পারছি। দ্যাখো কাণ্ড। সুমিত তো একবারও বলেনি।' ভদ্রমহিলা ওর মাথায় কাঁধে হাত বোলাচ্ছিলেন।

বাবা বললেন, 'জামাই কি এসেছে?'

'নাঃ। সে সেই দুপুরে চরতে বেরিয়েছে।' সুমিতের মায়ের গলা পাল্টালো।

মা বললেন, 'ও বোধহয় জানে না আজ হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে।'

সুমিতের মা বললেন, 'ঠিক জানে। যেমন বাপ তেমন ছেলে তো!'

বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, বেয়াইমশাই-এর সঙ্গে আলাপ হল না!'

'কী জানি কোথায় গেছে!'

'হ্যাঁ। আমার মনে হয় আপনার আমার একটা উৎসব করা উচিত।'

'কীসের?'

'আপনার ঘরে পুত্রবধূ এল। আমার মেয়ে পাত্রস্থ হল।'

'এটা অবশ্য খারাপ বলেননি। আত্মীয়স্বজনদের তো জানি। কুৎসা গাইতে জিভ লক লক করবে। যতই করুন ওদের মন পাবেন না। তা সেসব করতে অনেক খরচ। দিনকাল যা পড়েছে।'

'আমি তৈরি আছি। তাছাড়া আপনি যদি ছেলের জন্যে—'

'একটা কুটোও নয়। ওই অপদার্থ ছেলেকে কিছু দেবেন না!'

'তবু খাট বিছানা, ঘড়ি আংটি—।'

'একদম নয়। বউভাত বলুন আর যাই বলুন তার খরচটা দিলেই হবে।'

'সেটা কত?'

'এইরে। এখনই কী করে বলি। আমার এক ভাই আছে। এসব করায় সে ওস্তাদ। তার সঙ্গে কথা বলে বলব। আপনি, মানে, আপনারা কোথায় উঠেছেন?'

মা বললেন, 'আমার বোনের বাড়ি নাকতলায়।'

বাবা বললেন, 'আমার রিটায়ামেন্টের বেশি দেরি নেই। সঞ্চয়ের চেষ্টা তো কখনও করিনি। তবু কলকাতার দুই প্রান্তে দুটুকরো জমি কিনে রেখেছিলাম।'

'কোথায়?'

'একটা বেলেঘাটায়। আর একটা শ্যামনগরে।'

'বাড়ি করবেন?'

'সেইরকমই ইচ্ছে। গিন্নির ইচ্ছে শ্যামনগরেই বাড়ি করি। বেলেঘাটা বড্ড ঘিঞ্জি এলাকা, মানুষের

ভিড়। আসলে এতকাল ফাঁকায় থেকে অভ্যেস তো!'

'তা ভালো। আপনি কালকে যোগাযোগ করুন। আমি এর মধ্যে ভাই-এর সঙ্গে কথা বলে রাখব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার মেয়েকে আমি প্রথম দিনেই মেয়ে বলে ডেকেছি। ও আমার মেয়ে।'

খুশি হয়ে বাবা-মা চলে যাওয়ার পর হঠাৎ কান্না পেয়েছিল তিস্তার। শাশুড়ি বলেছিলেন, 'ওমা, এতকাল স্বামীর সঙ্গে কাটিয়ে এখন কান্না কেন? শোনো মেয়ে, তোমাকে একটা কথা বলি। তোমার স্বামীকে আমি পছন্দ করি না। ওর বাপও যেমন ও তেমন। তুমি যদি আমার মেয়ে হিসেবে এ বাড়িতে থাকতে পার তাহলে আমি তোমাকে মাথায় করে রাখব। বুঝেছ?'

কথাটার মানে কী বুঝতে পারেনি তিস্তা। অনেকদিন বাদে হাসপাতালের বিছানার বাইরে অনেকক্ষণ একা বসে থাকতে থাকতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই নিষ্কৃতি পেতেই মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলেছিল।

শাশুড়ি এতে খুশি হলেন খুব। জড়িয়ে ধরে তাকে নিয়ে এলেন সুমিতের ঘরে। বললেন, 'এই ঘর তোমার। তুমি যদি আমার মন বুঝে চলো তাহলে কোনো কাজ করতে হবে না তোমাকে।'

হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনে রাখা তার জিনিসপত্রকে এঘরে দেখতে পেল তিস্তা। শাশুড়ি চলে যাওয়ার পর সে চেয়ারে বসেছিল। সুমিতকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল তার। এই সময় একটি মহিলা ঘরে এল। বছর পঁয়ত্রিশের কালো খুব স্বাস্থ্যবতী চেহারার মহিলাটি যে কাজের মেয়ে তা বুঝতে পারল তিস্তা। মহিলার হাতে একটা থালা। তাতে সুজি এবং রসগোল্লা।

মহিলা বলল, 'আমার নাম মঙ্গলা। তুমি তো মাস্টারনি থেকে বউ হয়ে এলে এ বাড়িতে। দুমাস ছিলাম না বলে দ্যাখোনি। আমি গিন্নিমার খাসলোক। বুঝলে?'

তিস্তা মাথা নেড়েছিল।

মঙ্গলা থালাটা একটা টেবিলে রেখে বলেছিল, 'অমন লক্কা পায়রাকে মন দিলে কী করে বউ?'

'মানে?'

'ছোটবাবুর কথা বলছি।'

তিস্তা জবাব দিতে পারল না। মঙ্গলা হাসল, 'বাবু যে বাবু, তিনিও কাল রাত্রে বললেন, মঙ্গলা, ও ছোঁড়াও সুন্দরী বউ পেয়ে গেল! আমাদের দেশটার কী অবস্থা হল রে!'

তিস্তা অবাক, 'একথা বললেন কেন?'

'আর কেন? বুড়োর সারাজীবনের শখ তোমার মত ফর্সা সুন্দরী বউ-এর। নাও, খেয়ে নাও। আমার হয়েছে মরণ। সব দিক সামলাতে হয়।'

'তুমি এখানে অনেকদিন আছ?'

'তা আট বছর। আমার আগে ছিল গণেশের মা। আট বছর ধরে এ বাড়ির হাল ধরে আছি আমি। জয়নগরে বাড়ি। জমি জমা ছেলেমেয়ে সব সেখানে।'

'তুমি এখানে পড়ে আছ কেন?'

'ওমা! একি কথা। পড়ে আছি কিগো। না থাকলে এ বাড়ি অচল। থাকো কদিন বুঝতে পারবে। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব করতে হয়। হ্যাঁ। তোমার বর যদি খারাপ ব্যবহার করে আমাকে বলো, আমি এমন দাওয়াই দেব যে ঠিক হয়ে যাবে।'

'তোমার কথা সুমিত শোনে?'

'একশ বার। এই আটবছরে মাত্র একদিন আমার সঙ্গে দেখা করেনি।'

'একদিন?'

'হ্যাঁ। যেদিন তোমরা ঘর ভাড়া নিতে গিয়েছিলে।'

'তাছাড়া?'

'রোজ সকালে আসত। খেতো ঘুমাতো। রাত্রের খাওয়া খেয়ে পয়সা নিয়ে চলে যেত তোমার ওখানে শুতে।'

'কী?' হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল তিস্তা।

'ওমা, তুমি জানো না?'

'সুমিত রোজ এখানে আসত?'

'হ্যাঁ। আমি স্নান করিয়ে না দিলে বাবুর মন ভরে না!'

'ও এখানে এসে স্নান করত?'

'হ্যাঁ।'

তিস্তার মাথা ঘুরতে লাগল। সুমিত রোজ সকালে স্নান সেরে বেরিয়ে যেত চাকরির সন্ধানে। ওর মনে হল মঙ্গলা মিথ্যে বলছে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল সে। বলল, 'ওর মা ওকে পছন্দ করেন না।'

'তা করবেন কেন? সুমিত যে ওঁর সঙ্গে ঝগড়া করে।'

'কেন করে?'

'পয়সাকড়ির জন্যে। মায়ের দুর্বলতা তো জানে।'

'কী সেটা?'

'না বাবা। প্রথম দিনেই সব জেনে যাবে তা হবে না। জানলে গিন্নি আমাকে ছেড়ে দেবে না। এই যে আমি লাঠি ঘোরাই সেটা গিন্নী হতে দিচ্ছে যে কারণে সেটা তোমাকে বলব কেন এত শিগ্‌গির। গিন্নির দুচক্ষের বিষ ওঁর স্বামী। তাকে ঠাণ্ডা করতে হয় আমাকে। বিষ নেই শুধু কুলোপানা চক্কর। আর সেটা করি বলে গিন্নি আমাকে তোয়াজ করে। তা তোমাকে বলি নতুন বউ, এ বাড়িতে যদি থাকতে চাও তো গিন্নির মন জয় করো। সুমিতকে পাত্তা দিও না।'

'ও আমার স্বামী, ওকে আমি ভালবাসি।'

'তাহলে মরেছ।'

হঠাৎ বাইরে থেকে সুমিতের মায়ের গলা পাওয়া গেল। চিৎকার করে তিনি মঙ্গলাকে ডাকছেন। মঙ্গলা বলল, 'অশান্ত হয়েছে। যাই। খেয়ে নাও।'

খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না বিন্দুমাত্র। হাসপাতাল থেকে যে ডায়েট চার্ট দিয়েছিল তাতে ঘিয়ে ভাজা সুজি নেই। তা ছাড়া সে ভাবতেই পারছিল না সুমিত রোজ সারাদিন এ বাড়িতে আরাম করে গিয়েছে আর সে হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনে না খেয়ে থেকেছে। তার মনে হচ্ছিল মঙ্গলা মিথ্যে বলেছে। এই যৌবনবতী এবং অসুন্দরী দাসীটির মতলব ভালো নয় বলে মনে হচ্ছিল তার। এমন সময় বাইরে পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল, 'আমার পুত্রবধূ, অথচ আমি দেখব না। তোর গিন্নিমা ভেবেছে কি?'

মঙ্গলার গলা কানে এল, 'ভদ্রভাবে কথা বলবে। শিক্ষিত মেয়ে।'

'আমি অশিক্ষিত নাকি? আই অ্যাম এ ল-ইয়ার।'

তারপর দরজায় সুমিতের বাবাকে দেখতে পেল তিস্তা। রোগা, লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা একটি মানুষ অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছেন। মঙ্গলা বলল, 'তোমার শ্বশুরমশাই।'

তিস্তা উঠল। এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল। ভদ্রলোক বললেন, 'এ যে দেবী।'

'সুমিতের বউ।' মঙ্গলা বলল।

'হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে দেবী। হোল লাইফ, বুঝলে বউমা, আমি তোমার মতো একটি মেয়েকে স্বপ্নে দেখে এসেছি। আমি পাইনি কিন্তু আমার ছেলে পেল। দ্যাটস মাই স্যাটিফ্যাক্‌শন্‌।'

'এবার ঘরে যেতে হবে। বউমা বিশ্রাম নেবে।' মঙ্গলা হাত ধরে টানল।

'না, আমি যাব না।'

'তাহলে কিন্তু আমি ঘুম পাড়িয়ে দেব না।' চোখ রাঙাল মঙ্গলা।

তৎক্ষণাৎ একেবারে যন্ত্রের মতো ফিরে গেলেন সুমিতের বাবা।

তিস্তা চুপচাপ তাকিয়েছিল। ভদ্রলোক অ্যাবনর্মাল। কিন্তু তাই যদি হয় তা হলে তিনি কোর্টে যান কী করে? পৃথিবীর যেসব শ্বশুর বউমাকে দেখে সবার সামনে বলে তোমার মতো একজনকে চেয়েছি এবং পাইনি তাদের মস্তিষ্ক সম্পর্কে সন্দেহ হবেই। কিন্তু এটা পরিষ্কার, ভদ্রলোকের ওপর মঙ্গলার প্রভাব প্রচণ্ড। মঙ্গলা ওঁকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়? কি কাণ্ড!

সুমিত এসেছিল সওয়া নটা নাগাদ, কফিহাউস বন্ধ হলে। ততক্ষণ ওই ঘরে একদম একা ছিল তিস্তা। কিছু করার নেই বলে সুমিতের বইপত্র উল্টোচ্ছিল। সেইসময় অদ্ভুত কিছু দেখতে পায়নি কিন্তু একটা আবিষ্কার করেছিল। সুমিতের একটি বাঁধানো খাতা আছে। তাতে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত মেজর গল্প উপন্যাসের সম্পর্কে প্রকাশিত সমালোচনাগুলোর সারাংশ লেখা আছে সযত্নে। কোনো কোনোটা উপন্যাসের পেছন কভারে ছাপা সারমর্ম। অর্থাৎ সুমিত এইসব লেখা পড়েছে বলে যে দাবি করে তা ঠিক নয়। ওই লেখাগুলোর ওপর যে সমালোচনা ওর চোখে পড়েছে তাই সংগ্রহ করে নিজের পাণ্ডিত্য জারি করে! ব্যাপারটায় এক ধরনের তঞ্চকতা থাকলেও তিস্তার মনে হল এটুকু করতেও তো বেশ উদ্যমের দরকার হয়। কজন ছেলে বা মেয়ে এতটা পরিশ্রম করে? এই ঘরে একটাও ইংরেজি বই নেই।

রাত্রে সুমিত ঘরে ঢুকে হাসল, 'দেবী স্বস্থানে এলেন।'

হঠাৎ খুব অভিমান হল তিস্তার। সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

'কী হল? ও, আজ হাসপাতালে যাইনি বলে রাগ করেছ। প্ল্যান করে, বুঝলে, ইচ্ছে করে যাইনি। তোমার বাবা যাতে একা নিজের মেয়েকে আমার মায়ের হাতে তুলে দেন তাই সরে থেকেছি। আমি সামনে থাকলে মা বিগড়ে যেতে পারত।' জড়িয়ে ধরতে চাইল সুমিত।

'না, ছোঁবে না তুমি।' ত্রস্তে সরে গিয়েছিল তিস্তা।

'কেন? আমার অপরাধ?'

'তুমি আমাকে ঠকিয়েছ!

'আমি? তোমাকে? এর মধ্যেই? যা তা বলছ!'

'তুমি রোজ চাকরি খোঁজার কথা বলে এ বাড়িতে দুবেলা এসে খাওনি? এখানে স্নান করোনি? দুপুরে ঘুমাওনি? কফিহাউসে আড্ডা মারোনি? বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আমার জন্যে রুটি তরকারি কিনে এমন ভাব দেখিয়েছ কত ক্লান্ত! জিজ্ঞাসা করলে বলেছ, বন্ধুবান্ধবরা খাইয়েছে তোমাকে? বলোনি?'

প্রথমটায় অবাক হলেও পরের দিকে অদ্ভুত শান্ত মুখে হাসতে লাগল সুমিত। তিস্তা থামলে বলল, 'মিথ্যে কথা বলেছি বলতে পারো কিন্তু ঠকাইনি। মিথ্যে যুধিষ্ঠিরও বলেছিল। ওই দুটো জিনিস এক নয়।'

'তুমি এমন করতে পারলে?'

'কেন, অন্যায় কী আছে?'

'আমি সব কিছু ছেড়ে না খেয়ে ওখানে পড়েছিলাম কারণ আমরা—।'

'দ্যাখো, যতক্ষণ তুমি না জেনেছ যে আমি বাড়িতে খেয়েছি ততক্ষণ তোমার মনে হয়েছে আমিও স্ট্রাগল করেছি। হয়েছে তো? নাও, ফরগেট ইট। কিন্তু কথা হল, এ বাড়িতে ঢোকামাত্র এ সব কথা

তোমার কানে কে দিল? মাতৃদেবী?'

'তাতে তোমার দরকার কী?'

হঠাৎ বাঁ হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে সজোরে চড় মারল সুমিত তিস্তার গালে, 'এ বাড়িতে আমার সঙ্গে ওই ভঙ্গিতে কথা বলবে না।'

তিস্তা পাথর হয়ে গেল। সেই প্রথম কেউ তাকে শরীরে আঘাত করল। আজন্ম এমন অভিজ্ঞতা ছিল না তার। সুমিত ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। অনেকক্ষণ বসেছিল তিস্তা। তার চোখে একটুও জল এল না। শুধু অবাক, আরও অবাক হয়ে যাচ্ছিল সে।

রাত্রে পাশে শুয়ে সুমিতই কথা বলল, 'আই অ্যাম সরি। নীল রক্ত আছে তো শরীরে, মাথা ঠিক রাখতে পারিনি।'

'নীল রক্ত!' প্রশ্নটা আপসেই বেরিয়ে এসেছিল ঠোঁট থেকে।

'ব্যভিচার। পুরোন যুগ থেকে চলে আসছে। আমাদের বাড়ি মাতৃতান্ত্রিক। মাতৃদেবীই সব। মায়ের শাশুড়িও তাই ছিলেন। তিনিই সব শিখিয়ে দিয়ে গেছেন মাকে। হয় তো মা তোমাকে সেটা শিখিয়ে দেবে। আগে প্রচুর বিষয়সম্পত্তি ছিল। কুঁজোর জল গড়িয়ে খেতে খেতে এখন প্রায় তলানিতে ঠেকেছে। আমার বাবা যে কী করে ল পাশ করেছিলেন তা ঈশ্বর জানে। তিনিই প্রথম এ বাড়ির গ্র্যাজুয়েট। বাবার কোনও ক্লায়েন্ট নেই। ব্রিফলেস উকিল। কোর্টে যাওয়া আসা সার।'

'উনি এসেছিলেন এ ঘরে।'

'অ। মঙ্গলা এসেছিল?'

'হ্যাঁ। এ বাড়িতে মঙ্গলার ভূমিকা কী?'

হেসে উঠল সুমিত, 'তুমি তো দুমাস অমিতকে পড়িয়ে গিয়েছ। কিছু টের পেয়েছিলে তখন? পাওনি। বাইরের লোকেরা কিছুই বুঝবে না। এমন ট্রেনিং। আমার কাছে না শুনে নিজেই একটু একটু করে জেনে নাও।'

'মঙ্গলার কাছে তুমি স্নান করতে?'

'এ গল্পও শুনে ফেলেছ? পুরনো অভ্যেস। ছেলেবেলা থেকে স্নান করাতো।'

'ছেলেবেলা? মঙ্গলা এ বাড়িতে এসেছে আট বছর আগে।'

'ওই তখন থেকেই। এখন অমিতকে রোজ করায়।'

মাথামুণ্ডু বুঝে পাচ্ছিল না তিস্তা। অমিতের বয়স বারো হয়ে গিয়েছে। অত বড় ছেলেকে স্নান করাবে কি। হঠাৎ গা ঘিনঘিন অনুভূতি ছড়ালো। সেইসময় সুমিত তাকে জড়িয়ে ধরতেই সে খুব শান্ত গলায় বলল, 'হাসপাতাল থেকে বলে দিয়েছে এখন এসব নয়।'

'কেন?'

'অসুখের পরেও শরীরে কিছু জার্ম থেকে যায়!'

'চমৎকার। তোমার সংক্রামক রোগ হয়েছিল নাকি?'

'আশ্চর্য! আমি সম্পূর্ণ সুস্থ নই।' তিস্তা উঁচু গলায় বলামাত্র দরজায় শব্দ হল। সুমিত জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

'আমি।' অমিতের গলা।

'কিরে?' সুমিত প্রশ্ন করল।

'মা বলল আজ বউদিকে আমার ঘরে শুতে।'

হঠাৎ প্রচণ্ড রেগে একটা লাথি মারল সুমিত। শেষ সময়ে সরে না গেলে মারাত্মক আহত হতে পারত তিস্তা। একটুও দেরি না করে সে বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলতেই হাফ প্যাণ্ট পরা অমিতকে

দেখতে পেল। তাকে বেরুতে দেখে অমিত হাঁটতে লাগল। তিস্তা ওকে অনুসরণ করছিল। একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অমিত বলল, 'মা, বউদিকে ডেকে এনেছি।'

'তুমি যাও। বউমা দাঁড়াও।' ঘরের ভেতর থেকে গলা ভেসে এল। তার একটু বাদে শাশুড়িকে দেখল তিস্তা। সুন্দর শাড়ি পরেছেন। মাথায় যত্ন করে খোঁপা বাঁধা। ভাল আতরের গন্ধ বের হচ্ছে। মুখে পান।

শাশুড়ি বললেন, 'আরও আগে বলা উচিত ছিল। সুমিত কিছু, মানে, বুঝতেই পারছ, ঠিক আছো তো?'

নির্বাক তিস্তা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন মহিলা, 'তোমার এখন ছয়মাস বিশ্রাম প্রয়োজন। ডাক্তার বলেছে এইসময় কোনোভাবে শরীরের ব্যবহার চলবে না। জন্ডিস খুব খারাপ রোগ। আমি তোমাকে আমার ঘরেই শুতে বলতে পারতাম কিন্তু তাতে একটু অসুবিধে হবে। অমিত ছেলেমানুষ, তোমার অস্বস্তির কোনো কারণ নেই। একি, গালে কী হয়েছে?'

অজান্তেই গালে হাত দিল তিস্তা, 'কই, কিছু না।'

'না বললেই হবে। কালশিরা পড়ে গেছে। সে হতভাগা মেরেছে তোমাকে? জোরজবরদস্তি করেছিল বুঝি। দূর করে দেব এ বাড়ি থেকে।' ভদ্রমহিলা বেশ রেগে গেলেন। তিস্তা বলল 'আমি যাই।'

'হ্যাঁ, এসো।'

একটা জিনিস ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে গেল। সুমিত বাড়িতে থাকলে শাশুড়ি তার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেন। কিন্তু সে বাইরে গেলেই কত প্রাণের কথা। বিকেলে কুলপি মালাই আনিয়ে নিজের হাতে খাওয়ানো। তাঁর এক কথা, শরীরটাকে একটু ভারী করো। ভারী শরীর না হলে সন্তান বসবে কী করে। এ বাড়িতে কথাবার্তায় অদ্ভুত এক ধরনের অশ্লীলতার ফোড়ন সবসময় যেন মিশে থাকে। তিস্তা ভদ্রমহিলাকে বুঝতে পারছিল না। এই গায়ে হাত দিয়ে আদর করছেন আবাব সুমিত এলে দাঁত খিচোচ্ছেন। সারাদিনে সুমিতের জন্যে বরাদ্দ পাঁচ টাকা। সেটা দিয়ে বারংবার তিস্তাকে কথা শোনান। তাঁর মতে অমিতের মতো ছেলে হয় না।

সুমিত আর অমিত ভাই হলেও স্বভাবে একদম বিপরীত। অমিত অনেক ছটফটে। কথা বলে মনে যা আসে। চেহারায় দুজন দুই মেরু। অমিত ফর্সা, মায়ের গড়ন পেয়েছে। রাত্রে ওর ঘরে তিস্তার জন্যে আর একটা খাট দেওয়া হয়েছে। নিজের খাটে শুয়ে অমিত বলে, 'দাদা তোমাকে খুব বিরক্ত করে, না বউদি?'

'কই না তো!'

'বাঃ, তা হলে মা তোমাকে এ ঘরে শুতে বলবে কেন?'

'কি জানি।'

'তুমি সব জানো, আমাকে বলছ না। বাবা মাকে বিরক্ত করত বলে মঙ্গলামাসীর ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'হু।'

'তুমি একা স্নান করতে পারো না অমিত?'

'খুব পারি। কিন্তু মঙ্গলা মাসী আমাকে স্নান করিয়ে দেবেই। মঙ্গলামাসী তো মাঝে মাঝে দাদাকেও স্নান করাতো। এখন মা পছন্দ করে না বলে এক আধদিন দেয়।'

তিস্তার ইচ্ছে হচ্ছিল জিজ্ঞাসা করতে সেই স্নানের বৈশিষ্ট্য কী? কিন্তু তার জিভ প্রশ্নটা উচ্চারণ করতে পারল না।

একমাস পরে আবার কলেজে যেতে পারল তিস্তা। এই তিনমাসে ঘটনা বলতে যা ঘটেছে তা আপাতচোখে তেমন অস্বাভাবিক নয়। তাদের বিয়েকে সামাজিক চেহারা দেবার জন্যে একটা উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রায় সাতশ লোক এসে খেয়ে গেছে। এদের অধিকাংশই সুমিতের আত্মীয়। পুরে খরচটাই তিস্তার বাবার পকেট থেকে হয়েছে। খাট আলমারি থেকে যাবতীয় আসবাব, কাপড়চোপড় তিস্তার বাবা পাঠিয়ে দিয়েছেন এ বাড়িতে।

তিস্তা সুমিতের সঙ্গে কথা বলতে পারে সকালে, দুপুরে, রাত গভীর না হওয়া পর্যন্ত। মাঝে মাঝে সুমিত দুতিনদিনের জন্যে বাইরে যায়। আর ওর মা তিস্তার সঙ্গে দেখীর মতো ব্যবহার করেন। এরকম একদিনে ওকে নিয়ে বিশ্বরূপায় থিয়েটার দেখে এসেছেন এক সন্ধ্যায়। ছেলের ওপর মহিলার এত রাগের কারণ তিস্তা এখনও বুঝতে পারেনি।

সুমিতকে তিস্তা কলেজে যাওয়ার কথা বলেছিল। শুনে খেঁকিয়ে উঠেছিল সুমিত, 'আবার কলেজে যাওয়ার কী দরকার?'

'আমি পড়তে চাই।'

'খরচা দেবে কে?'

'মানে?'

'পড়াশুনায় খরচ নেই? তোমার বাবা দেবে?'

'বাবাকে বলব কেন?'

'তাহলে তোমার শাশুড়িকে বলো। তিনি তো তোমাকে দীক্ষা দিয়েছেন।'

সেই দুপুরেই শাশুড়িতে কথাটা বলেছিল তিস্তা। শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন মহিলা, 'কী দরকার?'

'এভাবে অর্ধেক পড়ে ছেড়ে দিতে চাই না।'

'সুমিতের সঙ্গে যখন উদ্বাস্তুর মতো ছিলে তখন কলেজ করতে?'

'না।'

'তাহলে? মেয়েছেলে বেশি পড়লে মাথা নষ্ট হয়ে যায়। তোমার যদি সেটা করতে ইচ্ছে করে করো তবে আমি একটা পয়সাও দিতে পারব না।'

'আমি যদি রোজগার করি তাহলে আপত্তি করবেন?'

'তুমি আবার কী ভাবে রোজগার করবে?'

'এ বাড়িতে আমি প্রথম দিন যে জন্যে এসেছিলাম তাই করে।'

'অ। বেশ দ্যাখো চেষ্টা করে।'

ভদ্রমহিলা যাই হোন না কেন, এই অনুমতিটুকু দেবার জন্যে তিস্তা ওঁর কাজে সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে। কলেজের মাইনে বাকি পড়ে গিয়েছিল, পার্সেন্টেজ নিয়েও সমস্যা হবে। তবু জয়তীর চেষ্টায় লছমির সঙ্গে কথা বলতে পারল তিস্তা। বিয়ের পর এই কয়েক মাসে তার চেহারার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। কলেজের ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে তাকে দ্যাখে। তিস্তা প্রতিজ্ঞা করল যেমন করেই হোক তাকে ভাল রেজাল্ট করতে হবে।

লছমির কাকা থাকেন থিয়েটার রোডে। বিরাট ব্যবসায়ী। ওঁর দুই মেয়ের বয়স দশ আর আট। দুজনেই ক্যালকাটা গার্লসে পড়ে। লছমির কাকিমা খুব নরম প্রকৃতির মানুষ। কাকার নাম শাওনরাম আগরওয়ালা। বছর পঁয়তাল্লিশের মানুষ। বললেন, 'লছমি যখন আপনাকে রেফার করছে তখন আমার কোনো আপত্তি নেই। তিনজনকে পড়াতে আপনাকে কত দিতে হবে?'

'তিনজন?'

'দুই মেয়ে আর ওদের মা। মাকে ইংরেজি বলতে শেখাতে হবে।'

'আপনি যা ভাল বুঝবেন।'

'আপনি ম্যারেড?'

'হ্যাঁ।'

'মাসে সাতশ দেব যদি মেয়েরা অ্যাভাব্ সিক্সটি পার্সেন্ট পায় তাহলে মাথা পিছু পঞ্চাশ করে ইনক্রিমেণ্ট। চলবে?'

'তিস্তার মনে হয়েছিল অঙ্কটা আশাতিরিক্ত।

সকালে পড়াশুনা, দশটায় কলেজ করে চারটের মধ্যে থিয়েটার রোডে যায় তিস্তা সপ্তাহে চারদিন। তিনদিন মেয়েদের জন্যে একদিন ওদের মায়ের প্রয়োজনে। সেখান থেকে সাড়ে ছটায় বেরিয়ে বাড়ি পৌঁছতে সাতটা পার হয়ে যায়। মিসেস আগরওয়ালা ওই সময় একা ছাড়েন না। ওদের গাড়ি তাকে ধর্মতলা নিয়ে এসে ট্রাম ধরিয়ে দেয়। মাড়োয়ারি বাড়ির রান্না মন্দ লাগে না ওর। একটু ঘনিষ্ঠতা বাড়তে ভদ্রমহিলার অনেক কষ্টের কথা জেনে ফেলল তিস্তা।

এই এত বড় ফ্ল্যাট, এত টাকা পয়সা, ঘরে ঘরে টিভি, একাধিক গাড়ি সত্ত্বেও ভদ্রমহিলা স্বামীর মন জয় করতে পারেননি। শাওনরামজী কর্তব্য করতে ভুল করেন না কিন্তু বাইরের জীবনে স্ত্রীকে কিছুতেই নিয়ে যাবেন না। তাঁর স্ত্রী নাকি অভিজাত সম্প্রদায়ের সামনে কথা বলার উপযুক্ত নয়। স্ত্রীর সঙ্গে ওর কোনো ঝগড়াঝাঁটি নেই। কিন্তু বাইরে ভদ্রলোকের প্রচুর বান্ধবী আছে। তাঁরা এক একজন ডানাকাটা আধুনিকা। শাওনরামজীর মোটা খরচ হয় তাঁদের পেছনে। একদিন ওঁর ব্যাগে মেয়েরা সেসব মহিলার ছবি দেখেছিল। শাওনরামজী ঠাট্টা করে মেয়েদের ছবিগুলো দেখিয়ে বলেছেন, 'এদের মধ্যে যে কেউ তোমাদের মা হতে পারত।'

এসব কথা শুনে শাওনরামজী সম্পর্কে যে ধারণা তৈরি হয়েছিল তা তাঁর ব্যবহারে দেখতে পায়নি তিস্তা। বস্তুত ভদ্রলোকের সঙ্গে তার দেখা হয় কদাচিৎ। দেখা হলেই বাঁধাধরা কয়েকটা প্রশ্ন, 'স্ত্রীর শরীর ভাল আছে? মেয়েরা কেমন পড়ছে? ওদের মায়ের প্রগ্রেস হচ্ছে কেমন?' ব্যাস। তিস্তা সম্পর্কে একটুও আগ্রহ দেখাননি ভদ্রলোক। অথচ ওরকম চরিত্রের মানুষের সম্পর্কে সেটাই ভাবা যেতে পারে।

সুমিতকে দূরে সরিয়ে রাখা তিস্তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। এক সকালে ওর ঘরে যেতে পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা বিয়ে করেছিলাম কেন?'

বুঝতে পারেনি তিস্তা, 'মানে?'

'তোমাকে চুমু খেতে চেয়েছিলাম। রাজি হওনি। বলেছিলে বিয়ের আগে ওসব চলবে না। তাই বিয়ে করেছিলাম।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'কিন্তু বিয়ে করে কী লাভ হল?'

'আশ্চর্য। তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করো।'

'তুমি কাকে মান্য করবে? আমাকে না মাকে?'

'এ বাড়ির সব তো তোমার মা।'

'বাজে কথা বলবে না। হাসপাতাল থেকে ফিরে শরীরের দোহাই দিয়েছিলে। জন্ডিস তো সেরে গেছে অনেকদিন। থিয়েটার রোডে টিউশনি করতে যেতে পারছ। আর কতদিন আমাকে উপোসী রাখবে?'

'একটু ভদ্রভাবে কথা বলো।'

'না। আর বলা সম্ভব নয়।' সুমিত পাশ কাটিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করল। তারপর একটুও ভূমিকা না করে তিস্তাকে জড়িয়ে ধরল। তিস্তা বাধা দিল না। বাধা দেবার কথা তার মাথায় এলও না। সে পুতুলের মতো সুমিতের ইচ্ছের কাছে নিজেকে সমর্পণ করল। ক্ষুধার্ত কুকুর যেমন গোগ্রাসে এঁটোকাঁটা খেয়ে নেয় তেমনি সুমিতের আচরণ ছিল। একসময় সে শান্ত হতে তিস্তা জিজ্ঞাসা করল, 'আর কিছু বলার আছে?'

'না। দরজা খুলে দাও।'

'ওটা তুমি বন্ধ করেছ, তুমিই খুলবে।'

'মানে?'

'আমি যা বলেছি তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।'

'তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে আমি তোমাকে রেপ করলাম।'

জবাব দিল না তিস্তা। সুমিত কয়েক মুহূর্ত অস্বস্তিতে থেকে উঠে দরজা খুলল। তিস্তা আর দাঁড়াল না। নিজের ঘরে পৌঁছানো না পর্যন্ত সে কাঁদতেও পারছিল না। প্রথম মাসের মাইনে শাওনরামজী নিজের হাতে দেননি। স্ত্রীকে খামটা দিয়ে গিয়েছিলেন। মিসেস আগরওয়ালা সেটা দিতে তিস্তা লক্ষ্য করেছিল খামের মুখ বন্ধ। আচমকা একটা সন্দেহ হল। খাম বন্ধ করে টাকা দেবার উদ্দেশ্য কী? টাকার সঙ্গে অন্য কোনো প্রস্তাব আছে নাকি?

মিসেস আগরওয়ালার সামনেই খামটা ছিঁড়েছিল তিস্তা। ভেতর থেকে টাকা বের হল। শুধুই টাকা। আর নিজের সন্দেহের জন্যে লজ্জিত হল সে। তার মনে হল আগে হলে সে সন্দেহ করার কথা ভাবতই না। এই কয়েকমাস তার মনের গঠন একদম পাল্টে দিয়েছে।

সুমিতকে সে ভালবেসে বিয়ে করেছিল। এখন সেই ভালবাসা কতটুকু বেঁচে আছে? সেই টান অথবা উন্মাদনা। যে ভালবাসা মাটিতে কাগজ পেতে শোওয়ার কষ্টকে উপেক্ষা করার শক্তি জোগায় সেটা কোথায় উধাও হয়ে গেল এই কয় মাসে। সুমিতকে এখন অপরিণতমনস্ক মানুষ ছাড়া কিছুই মনে হয় না। ওর বাড়িতে থাকতে হবে তাকে। বাবা-মায়ের জন্যে থাকতে হবে। হাসপাতালে বাবা যে প্রশ্নটা তাকে করেছিলেন তার জবাব নইলে এখনই দিয়ে দেওয়া হবে।

মাইনের টাকায় নিজের প্রয়োজনীয় খরচটুকু বাদ দিয়ে সবার জন্যে কিছু না কিছু উপহার কিনে ফেলল তিস্তা। শাশুড়ির জন্যে শাড়ি, শ্বশুরের ধুতি, সুমিতের টি শার্ট, অমিতের জন্যে কলম আর, হ্যাঁ, মঙ্গলার জন্যে একটা শাড়ি। মঙ্গলার জন্যে কেন কিনেছিল তার ব্যাখ্যা অনেক পরেও মনে আসেনি। এখন মঙ্গলার সঙ্গে তার কথা হয় খুবই কম।

বাড়িতে ফিরতে রাত হয়ে গেল আজ। ওপরে উঠতেই শাশুড়ি সামনে এসে দাঁড়ালো, 'কী ভেবেছ? পড়াশুনার অনুমতি দিয়েছিল বলে কি মাঝরাত্রে বাড়ি ফিরবে? এরকম হলে আমাকে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।'

'দোকানে গিয়েছিলাম বলে দেরি হয়ে গেল।'

'দোকানে আবার কী করতে গিয়েছিল?'

'আজ মাইনে পেয়েছি। তাই—।' ব্যাগ থেকে শাড়ির প্যাকেটটা বের করে তিস্তা সামনে ধরল, 'এটা আপনি পরবেন।'

'কী এটা?' প্যাকেট খুলে ভদ্রমহিলা অবাক চোখে তাকালেন। হঠাৎ তাঁর চোখ চকচক করে উঠল। জড়ানো গলায় বললেন, 'তুই বড় বোকা মেয়ে।'

টি শার্টটাকে চোখের কোণে দেখল সুমিত। তারপর বলল, 'কাল মাইনে পেয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'কত?'

'সাড়ে সাতশ।'

'বাপস। তুমি তো দেখছি বড়লোক।'

'ঠাট্টা কোরো না।'

'মাইনে পেয়েই এত খরচ করার কোনো দরকার ছিল না।'

'সেটা আমি বুঝব।'

সুমিত উঠল। তারপর বলল, 'তুমি আজকাল সবসময় আমার ওপর রেগে থাকো। আমাকে তোমার খুব খারাপ লাগছে?'

জবাব না দিয়ে ঘর থেকে চলে যাচ্ছিল তিস্তা, সুমিত ডাকল, 'তিস্তা।'

দরজায় পৌঁছেছিল তিস্তা, সেখান থেকেই জবাব দিল, 'বলো।'

'একটা কাজের খবর পেয়েছি। আমার এক বন্ধু বিহারের জমিদার পরিবারের ছেলে। এর আগেও কয়েকবার গিয়েছি আমি। ওদের একটা ব্যবসা দেখাশোনা করতে হবে। প্রব্লেম হল আমার পকেট একদম খালি। যাব কী করে? দাও তো শ'দুয়েক, মাইনে পেলে শোধ করে দেব।'

'আমার কাছে টাকা নেই।'

'মাইরি আর কি! কাল সাড়ে সাতশ পেলে আর আজ বলছ নেই! ঢপ!'

'যা সত্যি তাই বললাম।'

'আশ্চর্য! তুমি চাও না আমি রোজগার করি?'

'নিশ্চয়ই চাই।'

'একটা শার্ট কিনতে সাড়ে সাতশো নিশ্চয়ই শেষ করোনি?'

'কলেজের মাইনে বাকি ছিল। তাছাড়া সবাইকে দিতে গেলে আর কি থাকে।'

'সবাইকে মানে? মা-বাবাকে দিয়েছ নাকি? কী দরকার ছিল! যাচ্চলে, আমি ভাবলাম আমাকেই তুমি স্পেশ্যাল অনার দিলে। কলেজের মাইনে দেবার স্কোপ তো এখন পর্যন্ত পাওনি। আজ দিতে হবে না। সামনের মাসে দিলেই হবে।'

'তোমার মায়ের কাছে চাও না।'

'মুখ দেখতে চায় না, পাঁচটাকাই বরাদ্দ।'

'এমন ছেলে তুমি যে নিজের মা মুখ দেখতে চায় না।'

'যা জানো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। আমি যদি ওই উকিলের ছেলে না হতাম তাহলে মা কি এই ব্যবহার করত?'

'উকিলের ছেলে না হতে মানে?'

'বললাম তো, বুঝবে না। বুঝতে চেও না। তবে আমিও ছেড়ে দেবার পাত্র নই। সাপের বিষেই সাপ মারব। শুধু ওয়েট করছি, সময় এলেই দেখতে পাবে। যাক গে, মালটা এনে দাও।'

'আমার পক্ষে তোমাকে এক পয়সা দেওয়া সম্ভব নয়।' তিস্তা হনহন করে বারান্দা দিয়ে হাঁটতে লাগল। এইসময় মঙ্গলা আসছিল। তাকে দেখতে পেয়ে চাপা গলায় ডাকল, 'বউমা।'

তিস্তা তাকাল। মঙ্গলা বলল, 'তুমি আমার জন্যে অত দামী শাড়ি কিনে আনলে? আমি ভাবতেই পারছি না। এ বাড়ির গিন্নীর হাত এত ওপরে আজ পর্যন্ত ওঠেনি, উঠবে না। আমি পাপী তাপী মানুষ, আমার জন্যে—।'

'নিজেকে পাপী বলছ কেন?'

'পাপ করছি তা পাপী বলব না। দুটো পয়সার লোভে একটার পর একটা পাপ করে যাচ্ছি। তোমার মন দেবীর মতো।'

'মা কোথায়?'

'তাঁর ঘরে।'

তিস্তা আর দাঁড়াল না। শাশুড়ি নিজের ঘরের মেঝেয় বসে পান সেজে চলেছেন একটার পর একটা। নিজে না সাজলে পান মুখে দিতে পারেন না। মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল?'

তিস্তা মাথা নিচু করল। তারপর বলল, 'আপনার ছেলে বলছে বিহারে গেলে একটা চাকরি পেতে পারে। ব্যবসা দেখাশোনা করতে হবে।'

'কার ব্যবসা?'

'আমি জানি না।'

'তা কী করতে হবে?'

'যাওয়া আসা এবং পথখরচার জন্যে আমার কাছে টাকা চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি তো জানতাম না, সব খরচ হয়ে গেছে।'

'এক পয়সাও দেবে না।' হুঙ্কার দিলেন শাশুড়ি।

তিস্তা অবাক হয়ে তাকাল। শাশুড়ি বললেন, 'বিহারে যাবে চাকরি করতে। ছাই চাকরি। ওর ওই জমিদারের বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্য অন্য। সেসব তোমাকে জানতে হবে না। ওকে বলো, আমার কাছে এসে টাকা চাইতে।'

'বলেছিলাম। আমায় চাইতে বলল।'

'না। তুমি চাইবে না। বিনিপয়সায় বড়লোকের বউ-এর সঙ্গে ফুর্তি করতে যাবে আর আমি পথখরচা দেব?'

তিস্তা নীল হয়ে গেল। সুমিত রোজগার করে না। পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে। ওর কথাবার্তায় অশালীন শব্দ আসছে। তাকে মেরেওছে। এসব ঠিক। কিন্তু অন্য কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে ও জড়িত এটা ভাবতে পারছিল না তিস্তা। চোরের মতো সে সরে এল শাশুড়ির সামনে থেকে।

দুপুরে প্রচণ্ড মাথা ধরেছিল। সকালে কলেজে আসার সময় খেতে পারেনি। কথাটা শোনার পর থেকেই শরীর গোলাচ্ছিল। সম্ভবত খালি পেট বলেই কলেজের টয়লেটে গিয়ে বমি করে ফেলল সে।

সেদিন আর থিয়েটার রোডে পড়াতে গেল না সে। ইউনিভার্সিটির টেলিফোন বুথ থেকে মিসেস আগরওয়ালাকে টেলিফোনে বলে দিল শরীর খারাপ। বাড়ি ফিরে গিয়ে সে চুপচাপ শুয়ে রইল। অবেলায় তাকে ফিরতে দেখে অমিত জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?' তিস্তা চোখের ওপর হাতের আড়াল রেখে বলেছিল, 'শরীর খারাপ লাগছে।' শোনামাত্র অমিত ছুটল মায়ের কাছে।

মিনিট দশেক বাদে মঙ্গলা এসে হাজির। ঘরের আলো জ্বেলে সে পাশে বসে মাথায় হাত দিল, 'না তো। জ্বর নেই। গিন্নিমা বলল তোমার নাকি শরীর খারাপ।'

তাড়াতাড়ি উঠে বসল তিস্তা, 'এমন কিছু নয়।'

'কী হয়েছে?'

'গা গুলোচ্ছিল।'

'কখন?'

'কলেজে। মাথা ধরেছিল।'

'বমি করেছ?'

'হ্যাঁ। তারপর থেকে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। একটু বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাবে। মাকে চিন্তা করতে মানা করো।'

'সাধে কি চিন্তা করছে। তার কারণ আছে!'

'কী কারণ?'

'এ মাসে আতর তোমার কলঘরে সেসব কিছু পায়নি।' রহস্যময় হাসি হাসল মঙ্গলা, 'গিন্নিমার চিন্তার কারণ তো সেটাই।'

তিস্তা ঠোঁট কামড়াল। ব্যাপারটা তাকেও চিন্তান্বিত রেখেছিল। কিন্তু এ বাড়ির মানুষজন তার ওপর এমন নজর রেখেছে!

মঙ্গলা বলল, 'আমি এক গ্লাস দুধ এনে দিচ্ছি। খাও তো!'

'আমি দুধ খেতে যাব কেন?'

'আহা! শরীরে বল পাবে।' মঙ্গলা আঁচল থেকে একটা পুরিয়া বের করল, 'তার আগে এটা খেয়ে নাও।'

'কী এটা?'

'হোমিওপ্যাথি ওষুধ। পালসিটিলা। তোমার কপাল যদি না পোড়ে তাহলে সাতদিনের মধ্যে আতরের কাছে খবর পেয়ে যাব। হাঁ করো।'

'খামোকা ওষুধ খেতে যাব কেন?'

'দ্যাখো বউমা, আমি তোমার ভালো চাই। এই ওষুধ তোমার কোনও ক্ষতি করবে না। তুমি আমার কথা শুনলে লাভ বই ক্ষতি হবে না। হাঁ করো।'

প্রায় মন্ত্রপূতের মত তিস্তা হাঁ করল। মঙ্গলা তার মুখে একটা কাগজের ভাঁজ খুলে খানিকটা সাদা গুঁড়ো ঢেলে দিল। দিয়ে বলল, 'ভগবানকে মন দিয়ে ডাকো, যেন এতে কাজ হয়।'

শরীরে বমি বমি ভাবটা কিছুতেই যাচ্ছিল না। অথচ শারীরিক স্বস্তি আসছিল না কিছুতেই। তিস্তা কলেজ করছে, টিউশনিতে যাচ্ছে কিন্তু সারাক্ষণ ওই একই চিন্তা তাকে কুরে খাচ্ছিল। আজকাল রোজ একবার করে বমি হচ্ছেই; খাওয়াদাওয়ায় অরুচি এসে গেছে। ভগবানকে আপ্রাণ ডেকে যাচ্ছিল সে।

সাতদিন পার হয়ে গেলে এক সকালে শাশুড়ি ওর ঘরে এলেন। অমিত তখন তার পড়ার টেবিলে। শাশুড়ির ধমকে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবার শাশুড়ি তার দিকে তাকালেন, 'শেষ পর্যন্ত বাধালে?'

কথাটার মানে প্রথমে ধরতে পারেনি তিস্তা।

'তোমাদের আলাদা করে দিলাম, ওই হতভাগা যাতে তোমাকে নষ্ট না করতে পারে তার ব্যবস্থা করলাম অথচ সেসব বৃথা হল, শাশুড়ি গম্ভীর গলায় বললেন, 'কথাগুলোর জবাব দাও।'

'আমি কিছু জানি না।' তিস্তা বলল।

'জানি না বললে হবে? আকাশ থেকে দেবতা নেমে তো তোমার পেটে বাচ্চা দিয়ে যায়নি!' শাশুড়ির গলা শনশনে।

প্রচণ্ড কেঁপে উঠল তিস্তা। তার পেটে বাচ্চা? তার পেটে?

'পালসিটিলা হাজার খেয়েও যখন হোল না তখন তো সন্দেহ বলে আর কিছু রইল না। তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ।'

'আমি?'

'হ্যাঁ। তোমাকে আমি বলেছিলাম ওকে প্রশ্রয় না দিতে, তুমি শোনোনি। শরীরের মজা পাওয়ার

জন্যে আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও ওর কাছে গিয়েছ।'

হঠাৎ মাথায় বিদ্যুৎ বয়ে গেল যেন। তিস্তা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আপনার নিজের ছেলে সম্পর্কে এমন কথা বলছেন কী করে?'

'তার জবাবদিহি তোমাকে দেব না। আমি তোমাকে বলেছিলাম এ বাড়িতে থাকতে হলে আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে। বলিনি?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি শোনোনি। কী শাস্তি চাও তুমি?'

'শাস্তি?'

'হ্যাঁ। হয় তোমাকে এ বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে নয় এই পাপ দূর করতে হবে।'

'কী বলছেন আপনি?'

'ঠিকই বলছি। উকিলের রক্ত এ বংশের উত্তরাধিকারের শরীরে থাকুক আমি চাই না। জীবিত অবস্থায় চাইব না' শাশুড়ি উঠলেন, 'আজকের রাতটা সময় দিলাম। যা করবে কাল আমাকে জানিও।'

শাশুড়ি চলে যাওয়া মাত্র হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল তিস্তা। সে কী করবে? এ বাড়ি থেকে চলে যাওয়া এখন কি সম্ভব? চলে গেলে যে এখানে আর কখনও ঢুকতে পারবে না তা জলের মতো পরিষ্কার। সুমিতকে সে আর হয়তো আগের মতো ভালবাসে না কিন্তু তার শরীরে যদি সন্তান এসে থাকে তাহলে সেটা তো তারই সন্তান। তার ইচ্ছে করছিল এখনই বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। শ্যামনগরে বাড়ি হচ্ছে। বাবা-মা, সেখানেই বাসাভাড়া করে আছেন। সামনের মাসে গৃহপ্রবেশ। কিন্তু এখন যদি সে ওদের কাছে যায় তাহলে সত্যি কথা বলতে হবে। তাহলে বাবার প্রশ্নের জবাবটা দেওয়ার দরকার হবে না। কিন্তু সেটা তার উত্তর নয়। কিছুতেই নয়।

রাত বাড়ল। সুমিত নিশ্চয়ই এতক্ষণ ফিরে এসেছে। তার মনে হল একমাত্র সুমিতই তাকে এ অবস্থা থেকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু আজ রাত্রে সুমিতের কাছে যেতে তার সঙ্কোচ হচ্ছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল শাশুড়ি একজন মেয়ে। ওঁর কাছে নিজেকে মেলে ধরলে নিশ্চয়ই সাহায্য পাবে। ভদ্রমহিলা তাকে মেয়ে বলেছেন। ওঁর বুকের ভেতরে যে একটা নরম মন আছে তার প্রমাণ সে পেয়েছে অনেকবার। তিস্তার বুকে একটু একটু করে ভরসা ফিরে আসছিল। কিন্তু সে ভুল করেছিল।

সকালবেলায় জড়ানো পায়ে সে যখন শাশুড়ি ঘরে গেল তখন মঙ্গলা সেখানে কথা বলছে। দরজার বাইরে পৌঁছাতেই তার পা আড়ষ্ট হল। ঘরের ভেতর শাশুড়ি বলছেন, 'তোর এত ঠাট ধমক চমক আর এখন এমন ভাব করছিস যে কিছুই জানিস না। শেকড় বাকড় কি আছে নিয়ে আয় চটপট।'

মঙ্গলা বলল, 'এটা ঠিক হবে না গিন্নিমা।'

'কেন?'

'একদম প্রথম দিকে। হিতে বিপরীত হোক আর কি!'

'তার মানে?'

'পেটেরটাকে মারতে গিয়ে যে পেটে ধরেছে তার ক্ষতি হতে পারে। তার চেয়ে বলি সত্যি যদি যা বলছ তাই চাও তাহলে কোনো নার্সিংহোমে নিয়ে যাও, ডাক্তার দেখাও। একবেলায় হয়ে যাবে।'

'খুব বক্তৃতা দিচ্ছিস। নার্সিংহোমে কত খরচ জানিস?'

'তা না হয় হলো।'

'আহা, ন্যাকা!'

'এ ছাড়া কোনো রাস্তা নেই।'

'তুই তাহলে ওষুধ দিবি না?'

'ওষুধ দিতে পারি কিন্তু থানা পুলিশ তুমি করবে।'

'থানা পুলিশ কেন?'

'মরলে তোমার বেয়াই ছেড়ে দেবে? তার ওপর ঘরেই তোমার শত্রু আছে। একটু খরচা হলেও নার্সিংহোমই ভাল। আর ও যদি বাপের বাড়ি চলে যায় তাহলে সোনায় সোহাগা।'

'মঙ্গলা, তোর বুদ্ধি দিন দিন ঢেঁকি হচ্ছে। বাপের বাড়িতে গিয়ে ও যখন বিয়োবে তখন উকিলের নাতিনাতনি জন্মাবে। ঠিক আছে, আজ তোদের মামা এলে বলব নার্সিংহোমের ব্যবস্থা করতে। যাবে কিছু টাকা!'

শাশুড়ির কথা শেষ হওয়ামাত্র তিস্তা ধীরে ধীরে নিজের ঘরে ফিরে এল। ওর সমস্ত শরীর কাঁপছিল। বিছানায় বসে নিজের পেটে হাত দিল সে। অসম্ভব। একে সে মেরে ফেলাতে দেবে না।

দিনটা কেটে গেল অলসভাবে। রাত এল। শাশুড়ি বা মঙ্গলা কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে এল না। অমিত খাওয়াদাওয়া শেষ করে ঘরে ঢুকে বলল, 'বউদি, মা তোমাকে বলতে বলল দাদার ঘরে গিয়ে শুতে।'

বিশ্বাস করতে পারছিল না তিস্তা। শাশুড়ি আজ এই অবস্থায় হঠাৎ উদার হয়ে গেলেন কেন? তার পরেই খেয়াল হল। তিস্তা আর তাঁর স্নেহের ছায়ায় নেই জানার পর তিনি তাকে শত্রু ভাবে দেখার জন্যেই মুক্তি দিতে চাইছেন। সুমিতের ঘরে গিয়ে শোওয়ার অনুমতিতে বিন্দুমাত্র উৎফুল্ল হত না তিস্তা কিন্তু আজ হল।

সুমিত নিজের বিছানায় শুয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। তাকে ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক হল, 'কী ব্যাপার? এই সময়ে?'

তিস্তা কথা না বলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টুকটাক কাজ সারতে লাগল।

'মতলবখানা কী বলোতো? তুমি এ-ঘরে শোবে নাকি?' পাশ ফিরল সুমিত।

'তোমার মা অমিতকে দিয়ে তাই বলে পাঠিয়েছেন।' মুখ না ঘুরিয়েই বলল তিস্তা।

'আই বাপ! এ যে মেঘ না চাইতেই জল।' উঠে বসল সুমিত, 'উঁহু। ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না। ডালমে কালা হ্যায়।'

'তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে এসো!'

'জানার সোর্স আমার আছে। এখনই জেনে আসছি। তুমি বুঝতে পারছ না, আমার মাতৃদেবীর হৃদয় হঠাৎ প্রশান্ত মহাসাগর হয়ে যেতে পারে না। বিরাট ঝড়বৃষ্টি আসছে। মনে হচ্ছে কেলো তুমিই করেছ। তাহলে আমাকে জড়ানো কেন। আসছি।' সুমিত বিছানা থেকে নেমে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মায়ের কাছে নিশ্চয়ই যাবে না। জিজ্ঞাসা করবে কাকে? এক পলক দরজার দিকে তাকিয়ে মেঝেতে চাদর আর বালিশ পেতে শুয়ে পড়ল তিস্তা। মিনিট তিনেক বাদে সুমিত ফিরে এল। চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল তিস্তা। পায়ের আওয়াজ পেলে বলল, 'আলোটা নিভিয়ে দাও, প্লিজ।'

'আমায় বলোনি কেন?' সুমিত চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'কী বলব?'

'তোমার পেটে বাচ্চা এসেছে!'

'কথাটা ভদ্রভাবে বলতে পারছ না।'

'আর ভদ্রভাবে। চাকরি নেই, তোমার সাড়ে সাতশ' টাকায় বাচ্চা মানুষ করতে পারবে? একটুও তর সইল না। অদ্ভুত মেয়েছেলে মাইরি তুমি।'

সুমিত পাশে এসে দাঁড়াল। তিস্তা ওর দিকে তাকাল মেঝেতে শুয়েই। কি লম্বা দেখাচ্ছে সুমিতকে। এখন যদি ও একটা লাথি মারে—। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল তিস্তা। তারপর বলল, 'সেদিন সকালের ব্যাপারটার জন্যে দায়ী কে? আমি?'

'নিজেকে ঠিক রাখতে পারোনি। শালা, আমার প্রথম সন্তান, ওঃ, অদ্ভুত।' সত্যি সত্যি ককিয়ে উঠছিল সুমিত। অন্তত সেই আচরণে কোনো অভিনয় নেই বলে মনে হচ্ছিল তিস্তার। সে তাড়াতাড়ি উঠে সুমিতের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, 'সুমিত!'

'কী?' স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে।

'তোমার মা—।' আচমকা কেঁদে ফেলেছিল তিস্তা।

'কী বলেছে তোমাকে?'

'দুটো রাস্তার একটা বেছে নিতে বলেছেন। হয় এ বাড়ি ছেড়ে চিরকালের মতো চলে যেতে হবে নয় আমার পেটে সে এসেছে তাকে—।' ডুকরে উঠল তিস্তা।

তাকে ভীষণ অবাক করে সুমিত বলল, 'এতে কান্নাকাটির কী আছে?'

অবাক হওয়া তিস্তা হঠাৎ যেন আলোর দেখা পেল, দুহাতে সুমিতকে আঁকড়ে বলে উঠল সে, 'আমি পারব সুমিত। তুমি পাশে থাকলে নিশ্চয়ই পারব। আমি আরও টিউশুনি করব। তুমি যদি কিছু রোজগার করো তাহলে—।'

'হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনের বাড়িটায় আবার যেতে পারি। তাই?'

'হ্যাঁ। তুমি কালই যাও। যদি খালি থাকে এখনও—।'

'পাগল।'

বুঝতে পারল না তিস্তা, 'মানে?'

'আমাকে পাগলা মশা কামড়ায়নি। সুখে থাকতে ভূতের কিল সহ্য করতে যাব কেন? ওখানে গিয়ে অনেক শিক্ষা হয়েছে। ন্যাড়া আর বেলতলায় যাবে না।'

'মানে? দ্বিতীয়বার শব্দটা ঠোঁট থেকে বের হল।

'ওই রকম ভিখিরির মতো থাকতে পারব না আমি।'

'ভিখিরি।' কেঁপে উঠল তিস্তা।

'অফকোর্স। কিন্তু প্রেমের জন্যে লক্ষ মাইল হাঁটতে পারি। হেঁটে দ্যাখো না। আমি দেখেছি। ফাঁপা রোমান্টিসিজম আমার ধাতে নেই। একটা পুরনো বাংলা ছবি দেখেছিলাম। তাতে চমৎকার ডায়ালগ ছিল। অভাব যখন দরজা দিয়ে ঢোকে তখন ভালবাসা জানলা গলে পালিয়ে যায়।'

'তাহলে?'

'তাহলে আবার কি! মা যা চাইছে তাই হবে। তাতে মাথার ওপর ভাল ছাদ থাকবে। পেটে খাবার জুটবে দুবেলা, পরীক্ষা দিতে পারবে। তিস্তা, তোমার ওই সস্তা রোমান্টিসিজম ছেড়ে একটু প্র্যাকটিকাল হও।'

'একটু আগে তুমি, তুমি তোমার প্রথম সন্তান—।' গলা বন্ধ হয়ে গেল তিস্তার।

'শোনামাত্র একটু সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছিলাম। এখন পরিষ্কার হয়ে গেছি।'

'না। অসম্ভব।' তিস্তা জোরে বলল।

'কী?' ঘুরে দাঁড়াল সুমিত।

'আমার শরীরে যে এসেছে সে থাকবে।'

'অ। তাহলে কাল সকালেই তোমাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। একা।'

'সুমিত।'

'আমি তোমাকে আবার স্পষ্ট বলছি তিস্তা এই সেন্টিমেন্টের কোনো মূল্য নেই। মা এরই মধ্যে তোমার জন্য নার্সিংহোমের ব্যবস্থা করে ফেলেছে।'

'এরই মধ্যে?'

'হ্যাঁ। মায়ের ডান হাত খুব অ্যাকটিভ।'

হাউহাউ করে কেঁদে উঠল তিস্তা। সুমিতকে জড়িয়ে ধরে অনেক মিনতি করতে লাগল। সুমিত কিছুক্ষণ পরে বলল, 'যাকে চোখে দ্যাখোনি, অনুভব করতে পারছ না, যার কোনো শেপ আসেনি তাকে রাখার জন্যে এমন হ্যাংলাপনা করছ কেন?'

'এ আমার প্রথম সন্তান।'

'তাই? কীভাবে এসেছে? তোমাকে তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে সেদিন সকালে রেপ করেছিলাম বলেই তো। এমন কি দরজাটা আমাকে খুলতে বাধ্য করেছিলে তুমি। মনে পড়ে! তাহলে তোমার কাছে যেটা অন্যায় ছিল, ঘৃণ্য কাজ ছিল, তার ফসলের জন্যে এমন হামলে পড়ছ কেন? অদ্ভুত মাইরি।'

'আমি অ্যাবরশন করাব না।'

'ঠিক আছে। বেরিয়ে যাও। কেউ তো আটকাচ্ছে না।'

'বেরিয়ে কোথায় যাব?'

'কেন? তোমার বাপ-মায়ের কাছে।'

'অসম্ভব। আমি তাহলে হেরে যাব। সুমিত, প্লিজ, তুমি আমাকে একটু বোঝ। সুমিত— ।' তিস্তা জড়িয়ে ধরেছিল সুমিতকে।

'আঃ ছাড়ো বলছি।'

'না। আমি তোমাকে ছাড়ব না। সকালে তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

'যেতে হবে?'

'হ্যাঁ। আমরা ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম।

'ভুল করেছিলাম। শালা একটা চুমুর জন্যে বিয়ে।' হঠাৎ টেবিলে রাখা নিজের বেল্টটা তুলে নিল সুমিত, 'আর একবার ফালতু কথা বললে—'।

'তুমি আমাকে মারবে?' বিশ্বাস করতে পারছিল না তিস্তা।

'ইয়েস। তোমার পাল্লায় পড়ে আমি আর বোকামি করতে চাই না।'

'পাল্লায়! কে কার পাল্লায় পড়েছে? আমার পেছনে ঘুরেছিল কে? তুমি মানুষ? ছিঃ। তোমার চেয়ে একটা জন্তুও অনেক বেশি বিশ্বাসভাজন।' রাগে ঘেন্নায় কথাগুলো তিস্তার মুখ থেকে ছিটকে ওঠা মাত্র সুমিতের হাত চলল। চতুর্থবার আঘাত লাগামাত্র দরজায় মঙ্গলার গলা শোনা গেল, 'কী হচ্ছে সুমিত?'

'ঠিকই হচ্ছে।' সুমিত মঙ্গলার দিকে তাকাল।

'না। ঠিক হচ্ছে না। এ বাড়িতে বউমা এসেছে গিন্নিমায়ের ইচ্ছেয়। তোমার ইচ্ছেতে নয়। অতএব ওর গায়ে তুমি হাত তুলতে পারো না। এসো বউমা, তুমি তোমার ঘরে শোবে চল।' মঙ্গলা এগিয়ে এসে তিস্তার হাত ধরল।

তিস্তা কাঁদছিল না। সে পাথরের মতো সুমিতকে দেখছিল। বেল্ট হাতে সুমিত এখন বিছানায়

গিয়ে বসেছে। এই লোকটা তার স্বামী! একেই ভালবেসে সে বিয়ে করেছিল। বাবা তাকে এমন লোককে বিয়ে করার শিক্ষা দিয়েছিলেন। মানুষ যখন ভালবাসে তখন ঈশ্বর তাকে ভবিষ্যৎ দেখতে দেন না কেন? এ কেমন জুয়াখেলা!

অমিতের ঘরে নিয়ে যাওয়ার সময় লম্বা করিডোরের প্রান্তে পৌঁছে মঙ্গলা দাঁড়াল, 'বউমা। আমি অশিক্ষিত মানুষ। গতর ছাড়া কিছু নেই। তবু আমার কথা শোনো। জীবনে তো অনেক দেখেছি। গিন্নীমা যা চাইছে তা কর।'

চোখ বন্ধ, দাঁতে দাঁত, দ্রুত মাথা নেড়ে না বলল তিস্তা।

'আমি জানি তোমার কষ্ট হবে। কিন্তু সারাজীবনের কষ্টের চেয়ে এখনকার কষ্ট কি খুব বেশি দামি? কিছুতেই না। যে লোকটা তোমার গায়ে হাত তুলল, পথে নামিয়ে যে সরে দাঁড়ায় তার সন্তান তুমি শরীরে রাখতে চাইছ? যাকে একটু একটু করে বড় করবে সে যে বড় হয়ে বাবার চেয়েও সাংঘাতিক বিশ্বাসঘাতক হবে না তা কে বলতে পারে!'

'না!'

'হ্যাঁ। পুরুষমানুষের শরীর থেকে তার সমস্ত ভালখারাপ একসঙ্গে বেরিয়ে আসে। মেয়েদের সেটা শুধু বয়ে যেতে হয়। সুমিত কে তা যদি কখনও জানো তাহলে আমার একথার মানে বুঝতে পারবে। আমি বলছি, তুমি আর আপত্তি করো না। গিন্নীমাকে জানি। রাজি না হলে কাল তিনি তোমাকে ঠিক বের করে দেবেন।'

অমিতের ঘরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গিয়েছিল মঙ্গলা। কিশোর অমিত ওর খাটে ঘুমে কাদা হয়ে আছে। সারারাত বিছানায় বসে রইল তিস্তা। সে ইংরেজিতে অনার্স পড়তে কলকাতায় এসেছিল, না মধ্যযুগে বাস করছে ভেবে পাচ্ছিল না।

সকাল আটটায় মঙ্গলা এল ঘরে, 'বউমা স্নান করে নাও।'

তিস্তা জবাব দিল না।

'মন খারাপ করে বসে থেকো না। যা হচ্ছে ভালোর জন্যে হচ্ছে।'

এইসময় দরজায় শাশুড়ির গলা পাওয়া গেল, 'থাক। এখন স্নান করতে হবে না। ফিরে এসে তো স্নান করতেই হবে। নার্সিং হোমের জামাকাপড়ে ঘরে ঢুকবে নাকি?'

কিছুই করার নেই। মিনিট পনেরো বাদে তিস্তা শাশুড়ি আর মঙ্গলার মাঝখানে বসে ট্যাক্সিতে চেপে রওনা হল। যাওয়ার আগে সুমিতের কথা মনে হয়েছিল একবার। কিন্তু ইতিমধ্যে সে জেনে গেছে কোনো লাভ নেই।

হঠাৎ তার মনে হল বাবার কথা। এসব ব্যাপার বাবা জানেন না। যদি তাঁর কানে যেত তিনি কী করতেন? মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে এসে সিদ্ধান্ত বদল করার ক্ষমতা তাঁর নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু তিনি কি তিস্তাকে শ্যামনগরে নিয়ে যেতেন? তার পর একদম একা হলে সে কী করে বাবার মুখের দিকে তাকাত? সেই ছোট্টবেলা থেকে বাবা তার কাছে ভগবানের মতো, যে ভগবান বন্ধু ছাড়া কিছু নয়। যখন প্রথম বুঝতে শিখল, কানপুরেও কাশফুলের জঙ্গলে দৌড়ে যাওয়া দুর্গা অপুর আনন্দে আনন্দিত হতে শিখল তখন থেকে সে এমন একটা কাজও করেনি যা বাবা অপছন্দ করেন। হ্যাঁ, সুমিতকে ভালবেসে বিয়ে করার সময় সে যুক্তি তৈরি করে নিয়েছিল। যে কাজ করলে মনে হবে না অন্যায় করছি সেই কাজ করাটাই স্বাভাবিক। এটা বাবারই শিক্ষা। সুমিতকে ভালবাসা অন্যায় ছিল না। ভালবেসে বিয়ে করাটাও ঠিক ছিল। কিন্তু এখন? বারো বছরের তিস্তাকে বাবা যা যা শিখিয়েছিলেন তাতে সে কি কখনও এমনভাবে নার্সিংহোমে যেতে পারে? হঠাৎ কেঁদে ফেলল সে শব্দ করে। পাশ থেকে শাশুড়ি বলে উঠলেন, 'আঃ। এই জন্যে কারো উপকার করতে নেই।'

পার্ক সার্কাসে যেখানে ট্যাক্সি থামল সেখানে একজন লোক দাঁড়িয়েছিলেন। খুব লম্বা, ফর্সা, ধুতি পাঞ্জাবি পরা, স্টেনলেশের চশমা চোখে। এগিয়ে এসে তিনিই ভাড়া মিটিয়ে দিলেন, 'তোমরা ভেতরে গিয়ে বসো, ডাক্তার আসছে।'

'কত দেরি হবে?' শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করলেন।

'বেশি নয়। আজ বেশি কেস নেই বলল।'

লোকটাকে কখনও দ্যাখেনি তিস্তা। শাশুড়ির যে ভাই-এর কথা সে মাঝেমাঝে শুনেছে তিনিই হয়তো হবেন। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় মনে হল অন্ধকূপে ঢুকছে। স্যাঁতসেতে, অন্ধকার অন্ধকার চারদিকে। ভিজিটার্স রুম বলতে যেটা রয়েছে সেখানে বিভিন্ন বয়সের মহিলা বসে। ওরা তিনজনে এক পাশের বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। নার্সের পোশাক পরে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের দেখে একটু ভক্তি হবার কথা নয়। একটা বিশ্রী গন্ধ আসছে নাকে। বেঞ্চির অন্য পাশে একজন রোগা প্রৌঢ়া বসেছিল। সে শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'মেয়ে?'

'না। বউমা।'

'অ। পরপুরুষ। ছেলে বুঝি বাইরে থাকে?'

'হ্যাঁ।' অম্লানবদনে বলে ফেললেন শাশুড়ি। তিস্তার শরীর এমনিতেই ঘিনঘিন করছিল এখানে এসে, শুনে মনে হল বমি হবে।

প্রৌঢ়া বলল, 'কয়মাস?'

'এক।'

'তাহলে চিন্তার নেই। আমি যাকে নিয়ে এসেছি তার সাড়ে তিন।'

'সাড়ে তিন?'

'কী করব? চেপে ছিল। শেষে না পেরে কাঁদাকাটি। পায়ে ধরে কাঁদলে তো না বলতে পারি না। বিধবা হয়েছে দুবছর তারপর এই কাণ্ড।'

'ভয় নেই কিছু?'

'বাড়তে দিলে যে ভয় তার থেকে তো বেশি নয়। আজ পর্যন্ত একশ বত্রিশটা কেস করিয়েছি, একটা ছাড়া কখনও ফেল করিনি।'

অদ্ভুত সব কথাবার্তা। এ ধরনের মানুষ আগে কখনও দ্যাখেনি। তিস্তা। তিস্তা প্রৌঢ়ার পাশে বসা মহিলাকে দেখল। শাঁখা-সিঁদুর নেই। সাদামাটা চেহারা। মাথা নিচু করে বসে আছে। কী বিষণ্ণ।

দশটা নাগাদ ডাক এল। মঙ্গলার সঙ্গে ভেতরে ঢুকল তিস্তা। শাশুড়ি গেলেন না। শুধু মুখে বললেন, 'দুগ্গা দুগ্গা।'

তারপরের আধঘন্টা তিস্তার জীবনে চিরকাল মনে থাকবে। একটা নোংরা নার্সিং হোমের টেবিলে অর্ধনগ্ন হয়ে শুয়ে সে যেভাবে মুক্ত হল তা ভোলার মতো দিন কখনও আসবে না জীবনে। যখন ডাক্তার জানল সময়টা এক মাসের বেশি নয় তখন পুরো অজ্ঞান করার প্রয়োজনও বোধ করল না। ঘরে একজন নার্স, একজন অ্যানাসথেসিস্টের সঙ্গে ওরা মঙ্গলাকে থাকতে দিল। তাকে যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখে নার্স মন্তব্য করেছিল, 'মজা লোটার সময় খেয়াল ছিল না।'

কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত একটা যন্ত্রণা নিয়ে সে টেবিল থেকে উঠতে বাধ্য হল। তখনও রক্তপাত বন্ধ হয়নি। তাকে যে ঘরে শুইয়ে দেওয়া হল সেখানে যতই বোঁটকা গন্ধ থাকুক তা যেন তিস্তার নাকে ঢুকছিল না। চিত হয়ে শুয়ে চুপচাপ কেঁদে যাওয়া ছাড়া তার আর করার কিছু ছিল না। এই সময় নার্স তাকে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে বলল, 'একঘন্টা ঘুমান। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অথচ ঘুম আসছিল না। একঘন্টা বাদে শরীর নাড়তে পারল তিস্তা। ব্যথা কম কিন্তু কোমরের

কাছটা আড়ষ্ট হয়ে আছে। মঙ্গলা বলল, 'এখানে না শুয়ে থেকে বাড়িতে গিয়ে শোবে চল। যা বদগন্ধ এখানে।'

'আমি হাঁটতে পারব না।' কেঁদে ফেলল তিস্তা। 'পারবে। আমার হাত ধরো।' মঙ্গলা যত্ন করে তাকে খাট থেকে নামাল। দু-পা তিন-পা সে হাঁটল। বেশ অস্বস্তি হচ্ছে। তলপেটে যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। কিন্তু তিস্তারও মনে হল এই দুর্গন্ধময় জায়গা এখনই ছেড়ে যাওয়া উচিত।

তার আর এক প্রস্থ পোশাক সঙ্গে নিয়ে এসেছিল মঙ্গলা। যা পরে এসেছিল তা ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পরিষ্কারগুলো পরে সে মঙ্গলার হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এসে শাশুড়িকে দেখতে পেল। শাশুড়ির পাশে সেই লোকটি দাঁড়িয়ে। শাশুড়ি বলল, 'একটু অসুবিধে হবে প্রথমে, পরে ঠিক হয়ে যাবে। চলো।'

মঙ্গলা না থাকলে যে তার কী হত! কয়েক পা হাঁটার পর পা যখন আর সরছিল না তখন মঙ্গলাই তাকে জড়িয়ে ধরে ট্যাক্সির দরজা পর্যন্ত নিয়ে এল। ভদ্রলোক ট্যাক্সিতে উঠলেন না, 'এই প্রেসক্রিপশন নাও। ওষুধ আনিয়ে নিও।'

ছোঁ মেরে সেটা নিয়ে মহিলা বললেন, 'তিনশ গেছে, তাতেও শান্তি নেই।' ট্যাক্সি চললে তিনি মঙ্গলাকে বললেন, 'হ্যাঁরে, কাজ ঠিক করেছে তো?'

মঙ্গলা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলেছিল।

বাড়িতে ঢুকেই শশুড়ি বললেন, 'দাঁড়াও। ওপরে যাবে না।'

দাঁড়াতে পারছিল না তিস্তা। অসহায় চোখে তাকাল।

'নার্সিংহোমের জামাকাপড়ে ঘরে ঢুকবে কী? তোমার বাপমা কিছু শেখাননি দেখছি। যাও, নিচের বাথরুমে ঢোকো। আমি ওপর থেকে কাপড় পাঠিয়ে দিচ্ছি।' শাশুড়ি হুকুম দিলেন। তিস্তা আস্তে আস্তে এগোল। এটা ঝি চাকরদের বাথরুম। মনে মনে বলল, আমার মা বাবা জানতেন না কখনও আমাকে অ্যাবরশসনের জন্যে নার্সিংহোমে যেতে হবে। জানলে ঠিক শিক্ষা দিতেন।

বাথরুমে ঢুকতেই শাশুড়ির গলা ভেসে এল, 'ওখানে গামলা আছে?'

তিস্তা দুর্বল চোখে বাথরুমের এক কোণে সেটাকে দেখতে পেল। একগাদা কাপড় সাবানজলে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে। সে শব্দ করল, 'হ্যাঁ।'

'ওগুলো আওয়াজ করে কাচো। কি জানি বাবা, পেটে যদি কিছু এখনও থেকে থাকে, ডাক্তারদের যা গল্প শুনতে পাই আজকাল।'

নিজের কানকে অবিশ্বাস করার কিছু ছিল না। শাশুড়ি আগে থেকেই এসব ভেবে ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সে কাতর চোখে গামলাটার দিকে তাকাল। এখন আর একটুও কান্না পেল না ওর। কোনরকমে দেওয়াল ধরে উবু হয়ে বসতেই যন্ত্রণাটা শুরু হল। সেই যন্ত্রণার মধ্যে একটার পর একটা কাপড় কেচে যাচ্ছিল সে শব্দ করে। হঠাৎ বাথরুমের দরজা খুলে গেল। হয়তো ভেতরে ঢুকে ভাল করে বন্ধ করেনি সে! মঙ্গলা দাঁড়িয়ে আছে, 'থাক। আর করতে হবে না। মুখ হাত পা ধুয়ে এগুলো পরে নাও।'

সারাটা দিন আচ্ছন্নের মতো পড়েছিল তিস্তা। শেষ বিকেলে মঙ্গলা এসে এক গ্লাস গরম দুধ খাইয়ে গিয়েছিল সেইসঙ্গে কয়েকটা ট্যাবলেট আর ক্যাপসুল। তারপর আবার ঘুম। একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইল পনেরো ঘণ্টা। ঘুম ভাঙল যখন তখন চোখ না খুলেই কপালে হাতের স্পর্শ পেল সে। কেউ আলতো করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বেশ আরাম হচ্ছে। সে চোখ খুলতেই শাশুড়িকে দেখতে পেল। মাথার পাশে বসে আছেন।

'এখন কেমন লাগছে?'

তিস্তা জবাব দিল না।

'বোকা মেয়ে। যা করেছি তোমার ভালোর জন্যে করেছি। দ্যাখো তো, এখন উঠতে পারবে কি না। একটু বাথরুম থেকে ঘুরে এসো।'

পারল তিস্তা। খাট থেকে নেমে বাথরুমে যেতে কোনো অসুবিধে হল না। শুধু মাথাটা ঘুরছিল তার। শাশুড়ি বললেন, 'দুর্বল তো হবেই। দুদিন পেটে কিছু পড়েনি যে। এই সকালে চা-বিস্কুট খাও। পরে ডিম আর রুটি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়েছিল তিস্তা। এটা তার আর সুমিতের ঘর ছিল একসময়। এখন সুমিতের। এঘরে শাশুড়ি ঢোকেন না, আজ ঢুকলেন।

'আর একটু ঘুমাবে?'

'না।'

'আজ আর বেরিয়ো না। বাড়িতেই বিশ্রাম নাও। বুঝলে?'

নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল তিস্তা। শাশুড়ি উঠলেন, 'আমি পরে আসব। দরকার পড়লে ডেকো।'

চা নিয়ে এল মঙ্গলা, এই তো। বাব্বা! যা ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলে। কিছুতেই মেয়ের ঘুম ভাঙে না নববাবু শেষে ডাক্তার ডেকে আনলেন।'

'নববাবু কে?'

'ওই যে! যিনি তোমার নার্সিং হোমের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তা ডাক্তার এসে অভয় দিল, ভয়ের কিছু নেই। নাও, খেয়ে নাও।'

চুপচাপ চা-বিস্কুট খেল তিস্তা। সুমিত কোথায়?

'কাকে খুঁজছ?'

'সুমিত নেই?'

'নাঃ। তিনি বিহারে গেছেন কাজের সন্ধানে। বউ গেছে নার্সিং হোমে কিন্তু তার হুঁশ হবে কেন? বুঝলে বউমা, অনেক তো দেখলাম, ব্যাটাছেলের মতো বজ্জাত যখন ভগবান সৃষ্টি করেছেন তখন তার প্রতি আর ভক্তি নেই বাপু।'

'ভগবানও ছেলে।'

'নইলে এই অবস্থা।'

'কিন্তু তোমার বাবা, আমার বাবা, অমিত, এরাও তো ছেলে!'

'ওই তো মুশকিল। সব গোলমাল পাকিয়ে যায়।'

'তুমি খুব ভাল মঙ্গলা!'

'মোটেই না। সারা দিনরাত পাপের কাদা মাখছি।'

'একথা আগেও তুমি বলেছ। কেন তোমার এমন মনে হয়?'

'তাহলে বলি। এই যে কলকাতার শ্যামবাজার, বাগবাজার, শোভাবাজার আর আহেরিটোলা, এসব জায়গায় যারা থাকে তারা অনেকে পুরনো দিনের মানুষ। এককালে টাকা ছিল, প্রতিপত্তি ছিল। শুনেছি তখন বালিগঞ্জ নিউ আলিপুর হয়নি। এসব বাবুদের কেউ কেউ যাতে এদিকে কেউ টের না পায় তাই বালিগঞ্জে বাড়ি বানিয়ে মেয়েছেলে রাখতেন। তাদের নামে বাড়ি লিখে দিতেন। এ দিকের যারা ওসব করত না তারা বাগানবাড়িতে যেত। পয়সা যখন কমে এল তখন গ্রাম থেকে মেয়েছেলে তুলে নিয়ে আসা হল। বারো বছর বয়স হলেই এক একজন খোকাবাবুর সেবা করার জন্যে এক একজন পনেরো ষোলো বছরের ঝি রাখা হত। মাইনে কম। পয়সা বেশি লাগছে না,

আবার যৌবনে পড়ে খোকাবাবু বাইরে রাত কাটাবে না। ঝি-এর টানে ঘরেই ফিরবে। বাপের কাছে টাকা চেয়ে ঝামেলা করবে না। বিয়ের পরও কেউ কেউ ঝি-কে ছাড়ল না।'

'এর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী?'

'আমার মা ছিল শোভাবাজারের এমনি এক লোক। খুব নামযশ ছিল। বড়গিন্নি মাকে ছাড়া দুর্গাপুজাই করতেন না। আমি জন্মালাম। বাপ ছিল একটা, বুঝতেই পারছ, নামেই বাপ। ও বাড়িতেই বড় হতে ন'বাবুর দায়িত্ব পেলাম। তখন তার দশবছর বয়স। আমি বারো। দশবছরের ছেলেকে ন্যাংটো করে স্নান করিয়ে দিতে হত। রাত্রে ঘুম পাড়াতে হত। বুঝতেই পারছ এরপর কী হতে পারে। কিন্তু আমার নাকি খুব নাম হল। অন্যবাবুরা তাদের মায়ের কাছে আমার জন্যে দাবি করতে লাগল। ন'বাবুও ছাড়বে না। তখন গিন্নি মা আমার বিয়ে দিয়ে দিলেন। মজিলপুরে শ্বশুরবাড়ি। মাটির ঘর, মোটাভাত শহরের আরাম পেয়ে মাথা ঘুরে গিয়েছে তখন। মন টিকবে কেন? দত্তবাড়ির বাবুদের মুখে আমার নাম তখন অনেকেই শুনেছে। উত্তর কলকাতার সেনেরা লোক পাঠাল। ভাল মাইনে, চলে এলাম। আমার মা একটা উপকার করেছিল। নানারকম শেকড়বাকড় চিনিয়ে দিয়েছিল। যেগুলো খেলে বাচ্চা হবে না, নষ্ট হবে। কত পাপ করেছি তার ফলে। নিজের স্বামীর কাছ থেকে একটা বাচ্চা পেয়েছিলাম। ফেলতে পারিনি। সেনবাবুরা বলল তাকে সঙ্গে রাখা চলবে না। বড্ড ন্যাওটা ছিল সে। কাছছাড়া হতে চাইত না। পাঠিয়ে দিলাম স্বামীর কাছে মজিলপুরে। আমার টাকায় ধানের জমি বাড়ল, মাটির ঘর ভেঙে দোতলা বাড়ি তৈরি হল। নিজে দাঁড়িয়ে স্বামীর আবার বিয়ে দিলাম। সে বেচারা কেন কষ্ট করবে বলো? এদিকে সেনবাড়িতে ভাগাভাগি শুরু হয়ে গেল। যে যার অংশ বুঝে নিয়ে বিক্রি করতে চায়। সুন্দরী শিক্ষিতা বউ এসেছে বাড়িতে। তারা সব বালিগঞ্জ নিউ আলিপুরে ফ্ল্যাট নিয়ে চলে যাবে। তখন বুড়ো কর্তাবাবুকে দেখাশোনা করতাম আমি। বুড়োর বয়স আশি তবু আমাকে স্নান করিয়ে দিতে হত। একসময় মনে ঘেন্না হল। কাজ ছেড়ে চলে গেলাম দেশে। ছেলে যুবক হয়েছে। বছর পনেরো বয়স। সতীন বলল, 'ওমা, একি কথা, পাকাপাকি থাকবে নাকি?'

বললাম, 'লোকে তো নিজের ঘরে একটা সময় ফিরেই আসে।'

সে বলল কী জানো? সাতসাগরে স্নান করে এই পানাপুকুরে ডুবে মরতে এলে আমি শুনব কেন? বিয়ের সময় কথা হয়েছিল কখনও সতীনের সঙ্গে ঘর করতে হবে না। স্বামী আমাকে দেখে নরম হয়েছিল। শহরে আরামে থেকে আমার শরীর তার দ্বিতীয় পক্ষের থেকে বোধহয় ভাল ছিল। কিন্তু বেঁকে বসল পেটের ছেলে। স্পষ্ট আমার মুখের ওপর বলে দিল, 'সবাই বলে তুমি ভদ্দরলোকের ভাড়া করা মেয়েমানুষ। আমি তোমার সঙ্গে কিছুতেই থাকতে পারবনা।'

বললাম, 'এই বাড়ি জমি কার পয়সায় হয়েছে? ভাড়া না খাটলে পেতিস?'

কিন্তু বুঝলাম আমি ওদের কাছে শেষ হয়ে গেছি। যদ্দিন সেনেরা ভাগ হয়নি তদ্দিন ওদের কাছে আমার কদর ছিল। বুড়োকর্তা ছাদের ঘরে টিমটিম করছে, ট্যাঁকে চাবি নেই, আমারও আঁচলে কিছু আসছে না। ওরা তোয়াজ করবে কেন?'

হাঁ করে এই কাহিনি শুনে যাচ্ছিল তিস্তা। বিমল মিত্র সাহেব বিবি গোলামে যেসব বৃত্তান্ত লিখেছেন তা থেকে কম অবাক করা জীবন নয়। মঙ্গলার গালে ঈষৎ মেচেতার দাগ। শরীর ভারী। বুক এবং নিতম্ব তো যথেষ্ট দৃষ্টিকাড়ার মত ভারী। দেখলেই মনে হয় পেছনে কোনো রহস্য আছে। কিন্তু মানুষটা যে কত ভাল তা সে জানে। এই মানুষের কাহিনি শুনে সে একটুও ঘেন্না করতে পারছে না কেন?

তিস্তা বলল, 'তারপর?'

'ফিরে এলাম কলকাতায়। আট বছর আগেকার কথা। আমার বয়স কত বলোতো?

'বুঝতে পারছি না।'

'চল্লিশ। ষোলোয় বিয়ে হয়েছিল। সতেরোতে ছেলে। তা ফিরে উঠলাম ওই সেনেদের বাড়িতেই। সব ছেলেরা তখন যে যার ফ্ল্যাটে চলে গিয়েছে। গিন্নি মারা গিয়েছেন অনেকদিন। মাড়োয়ারি বাড়ি কিনে দয়া করে বুড়ো কর্তাকে থাকতে দিয়েছে। সেই মাড়োয়ারিদের ব্যবসা দেখাশোনা করত এ বাড়ির নববাবু।'

'তিনি বললেন, তুমি যদি ভাল কাজ চাও তাহলে আমার সঙ্গে মানিকতলায় যেতে পার। মাস গেলে একশ টাকা আর খাওয়া পরা পাবে। বাকিটা যদি আদায় করতে পার তাহলে সেটা তোমার হাতযশ।'

'জিজ্ঞাসা করলাম, কী কাজ করতে হবে? আমি রান্নবান্না ঘরমোছার কাজ কখনও করিনি। খোঁজ নিয়ে দেখুন।'

'সেটা আমি শুনেছি। ওরা খুব বর্ধিষ্ণু পরিবার। কর্তা উকিল। তার দেখাশোনার ভার নিতে হবে। দুই ছেলে আছে। একজন ষোলো আর একজন চার। যদি দরকার হয় এদের দেখতে হবে। তবে কোনো অবস্থাতে উকিলবাবু বাড়ি থাকলে তার কাছছাড়া হবে না। ওটাই তোমার চাকরি। এলাম এ বাড়িতে। গিন্নিমা আমায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। মনে হল খুশি হলেন। বললেন, আগে কাজের নমুনা দেখি তারপর রাখব কি না বলব।'

'তারপর?'

'আর শুনতে চেও না বউমা।'

'আমি শুনব।'

'না। তাতে তোমার দুঃখ বাড়বে।'

'আমার আর কোনো কিছুতেই দুঃখ নেই।'

'তা হোক। বউমা। পৃথিবীতে কোনো কোনো কথা আছে যা না শোনাই ভালো।' তিস্তা অবাক হয়ে মঙ্গলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার গিন্নিমা কেন সুমিতকে এত অপছন্দ করেন?'

'সুমিত উকিলবাবুর ছেলে, তাই।'

'নিজের স্বামীর ছেলেকে কি কেউ অপছন্দ করে?'

'কখনও কখনও করে। যখন মেয়েমানুষ স্বামীর কাছে কিছু পায় না, যখন স্বামীর খারাপ দিকটা ছেলের মধ্যে ফুটে ওঠে তখন সেই ছেলেকে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না।'

'সেগুলো কী?'

'শুনতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'উকিলবাবুর একসময় খারাপ অসুখ হয়েছিল। খারাপ পাড়ায় গেলে যে অসুখ হয়। সেই সময়েই সুমিত জন্মেছে। কথাটা জানার পরে গিন্নিমা আর উকিলবাবুর সঙ্গে এক বিছানায় শোয়নি। এখন উকিলবাবুর মাথার অবস্থা ঠিক নেই। কোর্টে গিয়ে কী করে কে জানে। গিন্নিমায়ের ধারণা এসব এই অসুখের জন্যেই হয়েছে। আর সুমিত যেহেতু তখনকার সন্তান তাই তাকে মানতে পারেন না উনি।'

'আর অমিত?'

'একথার জবাব আমার মুখ থেকে নাই বা শুনলে।'

'গিন্নিমা কাউকে ভালবাসেন?'

'হ্যাঁ। রোজ সন্ধের পর তিনি আসেন। মাঝরাত্রে চলে যান। আমার কাজ উকিলবাবুকে পাহারা দেওয়া।'

'সুমিত এসব জানে?'

'না জানার তো কিছু নেই। ওর মুখ বন্ধ।'

'কেন?'

'আমি উত্তর দিতে পারব না।' মঙ্গলা হঠাৎ চলে গেল।

তিস্তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। যে পরিবেশে সে এতকাল বড় হয়েছে তার সঙ্গে এ সবের কোনো মিল নেই। হঠাৎ তার মনে হল সুমিতের ব্যবহার কি স্বাভাবিক! কোনদিন কি সুমিত তার মনের কথা বলেছে? কেঁপে উঠল তিস্তা। সে চোখ বন্ধ করল। ভগবান। সুমিতের সন্তান তার শরীরে নেই এটা যেন বিরাট আশীর্বাদ বলে মনে হল। এ বাড়ির রক্ত সে বহন করছে না আর। যতই কষ্ট হোক এর চেয়ে আশীর্বাদ আর কিছুই নেই। তিস্তা বিছানায় শুয়ে পড়ল। নিজের বদলে মঙ্গলার জন্যে তার কষ্ট হচ্ছিল।

সুমিত এল দিন পাঁচেক বাদে। বেশ উৎফুল্ল হয়েই এল। তখন আবার আগের জীবনে ফিরে গিয়েছে তিস্তা। এবার আর শাশুড়ি তাকে অমিতের ঘরে শুতে বলেননি। আচরণে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি যা চান তার বাইরে এ বাড়িতে কিছু হবার উপায় নেই। দ্বিতীয়বারেও তিনি একই ঘটনা ঘটাতে দ্বিধা করবেন না।

তিস্তা অপেক্ষা করছিল সুমিত কখন তাকে জিজ্ঞাসা করে সেই তিক্তময় অভিজ্ঞতার কথা। তার জীবনে যে ঝড় বয়ে গেল যার সঙ্গে সুমিত জড়িত তার পরিণতির কথা জানতে চাইবে। কিন্তু সুমিত যেন কিছুই জানে না। কোনো ব্যাপার সে জেনে যায়নি। খুব খুশিতে টগমগ করছিল সে। বলল, 'তুমি জানো না কি দারুণ জায়গা! রাঁচি থেকে যেতে হয়। ওদের বাড়িটা বিশাল। অথচ তিনজন মাত্র লোক তিরিশজন চাকর।' তিস্তা শুনে যাচ্ছিল। তিরিশজন চাকর যে লোক নয় তা প্রথম বুঝতে হল! সুমিত বলল, 'ম্যাডাম আমাকে ব্যবসাটা দেখাশোনা কবতে বলেছেন।'

'ম্যাডাম কে?'

'আমার বন্ধুর মা। ইনফ্যাক্ট বন্ধুর সৎমা।'

'ও, কীসের ব্যবসা?'

'ওদের একটা মাইন আছে। অভ্রের। তার সেট আপ ভালই। কিন্তু ম্যাডাম মনে করেন একজন পারিবারিক মানুষ যদি ওভারঅল দেখাশোনা করে তাহলে ভাল হয়। তাছাড়া ল্যান্ড, বিস্তর জমি বিভিন্ন নামে ছড়ানো ছেটানো আছে। সেগুলোকে অর্গানাইজ করতে হবে। জঙ্গলের কিছু কন্ট্রাক্টরি ম্যাডমের নামে অ্যালটেড। হিউজ ব্যাপার।'

'বাঃ। খুব ভাল।'

'আর এইসব দেখতে গেলে আমাকে ওখানে গিয়ে থাকতে হবে।'

তিস্তা সুমিতের দিকে তাকাল। হঠাৎ তার মনে হল কলকাতা থেকে চলে যাওয়ার বাহানা দেখাবার জন্যেই সুমিত এতক্ষণ ওরকম উচ্ছ্বাস দেখাচ্ছিল। সুমিত এখান থেকে চলে যেতে চায়। যে কাজগুলোর কথা সে বলছে তা করতে গেলে অবশ্যই অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। যিনি এতদিন ব্যবসা চালিয়ে এসেছেন তিনি কেন ওর মত অনভিজ্ঞ এক তরুণের হাতে এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন তাই সে বুঝতে পারছিল না।

তিস্তা বলল, 'ওসব জায়গা নিশ্চয়ই থাকার পক্ষে খুব ভাল।'

'ফ্যান্টাস্টিক। গরমকালে একটু কষ্ট হতে পারে কিন্তু বাকি সময়ে দারুণ।'

'তাহলে তোমার চলে যাওয়া উচিত। কলকাতায় এমন কাজের সন্ধান তুমি পাবে না। দেখলে তো এতদিন চেষ্টা করে।'

'হ্যাঁ। আই হেট ক্যালকাটা। তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ।'

'আমি? আমি কেন?' এইটে আশা করেনি তিস্তা।

'বাঃ। আমি ওখানে আর তুমি এখানে পড়ে থাকবে নাকি। ইন দিস ফিলদি হাউস? নো! তুমি আমার সঙ্গে যাবে।'

'দেখি।'

'তুমি বুঝছ না। দিস টাইম ভিখারির মত হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনে নয়, বিশাল একটা বাংলো আমাকে ছেড়ে দেবেন ম্যাডাম। কুক, আর্দালি থাকবে।'

'আমার পড়াশোনা?'

'দূর!'

'তার মানে?'

'আর পড়ে কী হবে? এদেশে লোকে পড়াশুনা করে ভাল চাকরি পাওয়ার জন্যে। আমি এখন এটা পেয়ে গেছি তোমার তো কোনো চিন্তা নেই!'

'সুমিত, আমার পরীক্ষা সামনে।'

'ওয়েল। তেমন বুঝলে কদিনের জন্যে এসে পরীক্ষা দিয়ে যেও।'

'ঠিক আছে ভেবে দেখি।'

সুমিত খুব খুশি হল না কথাটা শুনে। তিস্তা লক্ষ্য করল সুমিত তার সিগারেটের প্যাকেট পাল্টেছে। সাদা সাপটা হলদে প্যাকেটের বদলে দামি বিদেশি প্যাকেট। কদিন বাইরে গিয়ে লোকটা যেন প্রদীপের সেই দৈত্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এসেছে।

'মা তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছে?'

'যেমন করেন।'

'হুঁ। এবার মুখের ওপর জবাব দিতে হবে।'

'দিও।'

'ওভাবে আমার সঙ্গে কথা বলো না। ওহো, ভুলে গিয়েছিলাম---।' সুমিত থামল। তিস্তার মনে হল এতক্ষণে সুমিতের খেয়াল হয়েছে। এবার নিশ্চয়ই তার অ্যাবরশন নিয়ে একটা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করবে।

'তিস্তা, তোমাকে একটা উপকার করতে হবে।' সুমিতের গলার স্বর নরম।

তিস্তা অবাক। তাহলে তার ভাবনাটা আবার মিথ্যে হল।

'ব্যাপারটা হচ্ছে, ম্যাডাম চান, এই যে এত বড় ব্যবসা আমি হ্যাণ্ডেল করব, কেউ যাতে কিছু মনে না করে তার জন্যে একটা ডিপোজিট আমি যেন, বুঝতেই পারছ, খুবই স্বাভাবিক। মায়ের কাছে আমি চাইব না। তোমার বাবাকে তুমি রাজি করাও।'

অদ্ভুত গলায় তিস্তা জিজ্ঞাসা করল, 'তার মানে?'

'খুব সিম্পল। এই ধরো লাখখানেক টাকা আমাকে জমা রাখতে হবে। এই টাকায় ওঁরা হাতও দেবেন না। ইন্টারেস্ট যা পাওয়া যাবে তা আমার নামেই জমবে। যেদিন আমি চাকরি ছেড়ে দেব সেদিনই ওটা ফেরত পেয়ে যাব। কি একটা নিয়মকানুনের জন্যে ম্যাডাম এটা করতে বলেছেন। তুমি তো জানো, মায়ের কাছে আমি কিছুতেই হাত পাততে পারি না। তুমি তোমার বাবাকে বলো

টাকাটা দিতে। ওঁর টাকা ওঁরই থাকবে। ক্লিয়ার?'

নিজের কানকে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ নির্বাক চেয়ে রইল তিস্তা। তার রকম দেখে সুমিত হাসল, 'আরে! সমাধি হয়ে গেলে নাকি?'

'আমার বাবার টাকা নেই।'

'কী যে বল। এত বছর চাকরি করলেন। বাইরে থাকলে খরচও কম হয়। তাছাড়া তোমার যদি নর্মাল বিয়ে হত তাহলে কত খরচ হত ভাবো তো? আমরা তার অনেকটাই বাঁচিয়ে দিয়েছি। দিইনি? আবার ভেবো না আমি এতদিন বাদে বরপণ চাইছি। ওঃ, নেভার। আমি ওসবের বিরুদ্ধে তা তুমি ভাল করেই জানো। এটা আমায় একটু সাহায্য করা!'

'আমার বাবার টাকা নেই।'

'ঠিক আছে। আছে কি নেই তা তুমি আমার চেয়ে বেটার জানবে। এক কাজ করো, বেলেঘাটায় ওঁর যে জমিটা আছে সেটা আমার নামে লিখে দিতে বলো। টাকা দিতে হবে না, আমি এই জমিটাই ডিপোজিট করব। ম্যাডাম তাতেও রাজি।'

'আমার বাবার ওটা শেষ সঞ্চয়।'

'ফাইন! সঞ্চয় তো উড়িয়ে দিচ্ছি না। আমি জমিটা দেখে এসেছি। আলোছায়া সিনেমা ছাড়িয়ে। হাজার আশি নব্বুই কাঠা হবে। নট ব্যাড্।'

'আমার পক্ষে বাবাকে বলা সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'নিজেকে নোংরা বলে মনে হবে।'

'নোংরা। আশ্চর্য। তুমি চাও না আমি জীবনে প্রতিষ্ঠা পাই? তোমার বাবার একটা জমি পড়ে আছে। সেইটে দেখালে আমার হিল্লে হয়ে যায়। তুমি চাও না?'

'না। আমি বাবার কাছ থেকে কিছুই নিতে চাই না।'

'তুমি ওঁর একমাত্র মেয়ে।'

'হোক। বাবা ছেলেবেলায় যা শিখিয়েছিলেন তা আমার যে কোনো কাজে লাগেনি সেটা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। বার বার সেটা প্রমাণ করতে চাই না।' তিস্তা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু তার পথ আটকে দাঁড়াল সুমিত, 'দাঁড়াও। তুমি আমাকে ভালবাসো না?'

তিস্তা সুমিতের দিকে তাকাল। প্রথমে জবাব দেবে না বলে স্থির করল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সুমিত খপ করে ওর ডানহাত চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবরসনের আগের রাত্রের কথা মনে পড়ে গেল তিস্তার। তার গায়ে হাত তুলতে একটুও দ্বিধা করেনি এই লোকটা। সে নীরবে মাথা নেড়ে না বলল।

সুমিত হতভম্ব হয়ে গেল, 'ভালবাস না?'

'না।'

হাত ছেড়ে দিল সুমিত। সে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

তিস্তা বলল, 'কাউকে একবার ভালবাসলে সবরকম পরিবর্তন সত্ত্বেও আজীবন ভালেবেসে যেতে হবে এমন থিওরিতে আমি বিশ্বাস করি না।'

'গেট্ লস্ট। বেরিয়ে যাও এখান থেকে।' চিৎকার করে উঠল সুমিত।

হঠাৎ মাথায় আগুন জ্বলে উঠল তিস্তার। যেন এই কথাগুলো শুনবে বলে সে এতদিন অপেক্ষা করছিল। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে নিজের স্যুটকেস টেনে নিয়ে তাতে জামাকাপড় গুঁজতে লাগল। সেটা দেখে সুমিত গড়গড় করল, 'তেজ দেখানো হচ্ছে। মেরে বিষদাঁত ভেঙে দিলে তবে তেজ যাবে।'

বাপসোহাগী মেয়ে। বাপের জমি যেন শ্রাদ্ধে লাগাবে। আরে আমি তোর বাপকে মাসে হাজার টাকা করে দিতাম, বলতেই পারিস মাগনা জমি দিবি না।'

এসব কথা কানে ঢুকছিল না তিস্তার। প্রায় অন্ধ এবং কালা হয়ে সে উঠে দাঁড়াতেই সুমিত আবার চেঁচাল, 'এই বাড়ির বাইরে একবার পা রাখলে আর কখনও এখানে ঢোকার অনুমতি পাবে না।'

তিস্তা স্যুটকেস নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। পেছনে সুমিত। অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে যাচ্ছে সে। মঙ্গলাকে দেখা গেল প্যাসেজে। সে কিছু বলতে এলে সুমিত চেঁচিয়ে উঠল, 'খবরদার, কেউ ওকে বাধা দেবে না। তুমি যাও আমার ঘরে, আজকাল তো আমার খোঁজই নিতে চাও না।'

শাশুড়ির ঘরের দরজা বন্ধ। বাইরে যে ছেলে এমন ঝড় তুলছে তা তাঁর কানে ঢুকছে বলে মনে হয় না। বাঁক ঘুরতেই মঙ্গলা অথবা শ্বশুরের দরজার সামনে এসে পড়ল তিস্তা। হঠাৎ কানে এল কেউ একজন ডাকছে, 'অ্যাই বোকা মেয়ে!'

তাকিয়ে দেখল শ্বশুরমশাই, দরজায় দাঁড়িয়ে অদ্ভুত হাসি হাসছেন। তিস্তা দাঁড়িয়ে পড়ল। শ্বশুরমশাই বললেন, 'নো, নো পালানো। কালই আমি জজসাহেবের কাছে কেস ঠুকে দেব তোমার হয়ে। আমাকে ওকালতনামায় সই করে দাও। ও ছেলের ব্যবহার ওরকম তো হবেই। কেউ চায়নি অথচ জন্মে গিয়েছিল। এসো, আমার ঘরে এসো। কাল সকাল সকাল কোর্টে গিয়ে প্রথমে দরখাস্তটা টাইপ করাতে হবে। আহা, ঠিক তোমার মত বউ চেয়েছিলাম আমি অথচ কপালে জুটল মঙ্গলা।'

কথা শেষ হওয়ামাত্র মঙ্গলা ছুটে এল। প্রায় ধাক্কা দিতে দিতে ভদ্রলোককে সে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এল, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এত রাত্রে কেউ বাড়ি থেকে বের হয়? হিন্দু মেয়েরা স্বামীর মুখে অনেক কথা শোনে, তাই বলে এমন হুট করে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে? আশ্চর্য!'

'মা কোথায়?'

'গিন্নিমা এখন ঘুমাচ্ছে!'

'একটু ডাকো।'

'আমার ছাল ছাড়িয়ে নেবে এখন ঘুম ভাঙালে। যা বলার কাল সকালে বলো। বউমা, মাথা গরম করো না।' মঙ্গলা যেন মিনতি করছিল।

'আমি মায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'ওঃ। তুমি কবে বড় হবে!'

'মানে?'

'সত্যি তুমি কিছু জানো না, না চোখে ঠুলি পরে থাকো?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।' নিচু গলায় বলল তিস্তা। ঠিক তখন সুমিত এসে দাঁড়াল সামনে, 'তিস্তা, আই অ্যাম সরি। আমি ক্ষমা চাইছি। যেতে হয় কাল সকালে যেও। উত্তেজনায় যা বলতে চাইনি তাই বলে ফেলেছি।'

মঙ্গলা হাসল, 'যাও, এর পরে রাগ করে থেকো না।'

তিস্তা বলল, 'ঠিক আছে। আমি এখন বের হচ্ছি না। তবে ওর সঙ্গে আর একঘরে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

সুমিত জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'কারণ তুমি অমানুষ। আমি তোমাকে ঘেন্না করি।' তিস্তা অমিতের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। কিশোর অমিত তখন দরজায় দাঁড়িয়ে। তাকে এগিয়ে আসতে দেখে সরে দাঁড়াল। ওর ঘরে আলো

নেভানো ছিল। অমিত জিজ্ঞাসা করল, 'দাদার সঙ্গে তোমার কী হয়েছে?'

তিস্তা দ্বিতীয় খাটে ধপ করে বসে পড়ল। তারপর মাথা নেড়ে না বলল।

'বউদি, তুমি দাদার থেকে অনেক ভালো।' অমিত কাছে এসে দাঁড়াল।

'তুমি শুয়ে পড়ো অমিত। আমার এখন কথা বলতে একটুও ভাল লাগছে না।' সরে গিয়ে জানলার পাশে বসল তিস্তা। তার বুকে চিনচিনে যন্ত্রণা দাঁত বসাচ্ছিল।

আশ্চর্য! এতদিন পরেও মাঝে মাঝে সুমিত আচমকা হামলা করে। সুমিতের কোনো বিশেষ ভঙ্গির সঙ্গে অরিত্রর ভঙ্গি মিলে গেলেই এমনটা হয়। অথবা কোনো বিশেষ প্রশ্নের জবাবে দুজনের কথা এক হয়ে গেলে এমনটা মনে আসে।

অথচ দুজনের স্বভাবচরিত্র আলাদা। অরিত্র মার্জিত, পড়াশুনা বেশি না হলেও সংস্কৃতিমনস্ক। কলকাতার শিল্পীসাহিত্যিক মহলে ভালো জানাশোনা আছে। সকলেই ওকে ভালোবাসে। সুমিতের এসব কিছুই ছিল না। ঘুমন্ত অরিত্রর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিস্তার মনে হল যতই রাগ অভিমান করুক ও না এলে তাকে এখনও একা থাকতে হত। একা থাকায় হয়তো স্বস্তি আছে কিন্তু সেই স্বস্তি যে কি পরিমাণে কষ্টকর তা তার চেয়ে আর কে বেশি জানে! সেদিক থেকে ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বর না দীপান্বিতা? ওদের অফিসের একটু দেমাকি মেয়ে দীপান্বিতা আকাশবাণীর বি-হাই আর্টিস্ট। প্রায়ই রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান পায়। যত অপ্রচলিত কাঠ কাঠ গান ওর মুখে শোনা যায়। শৈলজারঞ্জনের ছাত্রী বলেই হয়তো প্রচলিত গান গাইলে সম্মান নষ্ট হবে এমন তার ভাব। দীপান্বিতার সঙ্গে তিস্তার সম্পর্ক ভাল ছিল। একবার তিস্তা বলেছিল, 'এবার আমি তোর গান বেছে দেব।'

'আমি যে রাতে মোর দুয়ারগুলি গাইতে পারব না।'

'তোকে গাইতে হবে না। ওই কঠিন ধ্রুপদাঙ্গ গান না গেয়েও মানুষের ভাল লাগবে এমন অনেক গান গাইতে পারিস। রবীন্দ্রনাথ অনেক বিশাল।'

দীপান্বিতা কথা শুনেছিল। কিন্তু জোর করে নিয়ে গিয়েছিল আকাশবাণীতে রেকর্ডিং-এর দিনে। সেখানেই আলাপ অরিত্র সেনের সঙ্গে। লোকটার কথাবার্তা ভদ্রলোকের মত। কিন্তু যে মানুষের সঙ্গে কখনও দেখা হয়নি আলাপ হয়নি তার সঙ্গে সেটা হওয়ামাত্র ঘনঘন দেখা হবে এমনটা কে ভেবেছিল। আর সেটা যে ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে পৌঁছে যাবে তা বোধহয় বিধাতাই জানতেন। তিস্তা জানিয়ে দিয়েছিল সে কুমারী নয়। নামমাত্র বিবাহ নয়, বেশ কিছুকাল শ্বশুরবাড়িতে কাটাতে হয়েছে তাকে। ডিভোর্স পেতে অনেক ঝামেলা সহ্য করেছে। অরিত্র জানিয়েছিল সে-ও কুমার নয়। দশবছর সংসার করার পর চাকুরিরতা স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করতে বাধ্য হয়েছে। যেহেতু তার মা আর নতুন কোনো ঝামেলা চান না তাই স্থির করেছিল বাকি জীবন একাই থাকবে। একদিন ভবানীপুরে ওর বাড়িতে নিয়ে গেল অরিত্র। দুপুরবেলায়। অরিত্রর মা পুরনো দিনের মহিলা। বেশ আদরযত্ন করলেন। বললেন, 'ছেলে যা ভাল বুঝবে তাই করুক।'

এসব যখন হয় তখন বোধহয় এভাবেই হয়। কোনো নিয়ম মানে না, অঙ্কের ধার ধারে না। অফিস ছুটির পর কলকাতার সমস্ত রেস্টুরেন্টগুলো একে একে নতুন করে চেনা হয়ে গেল। শ্যামনগরের বাড়িতে ফিরত আটটার ট্রেন ধরে। সেটা এক ঘোরের মধ্যে কেটে যাওয়া সময়। আঠারো বছরের প্রথম প্রেম আর তিরিশের ইমোশনাল ইনভলভমেন্ট-এর মধ্যে ফারাক অনেক। কিন্তু কোথাও কোথাও মিলও তো ছিল।

প্রথম, যেদিন অরিত্র ওর সঙ্গে এসে মা-বাবার সামনে দাঁড়াল সেদিন তিস্তারই বুকের মধ্যে ছলাৎ

ছলাৎ বেজেছিল। মা স্বাভাবিক গলায় অরিত্রর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। বাবার সেটা ছিল না। শুধু অরিত্রকে ট্রেনে তুলে দিয়ে যখন তিস্তা ফিরে এসেছিল তখন তিনি বলেছিলেন, 'ভোর এবং দুপুরের মধ্যে অনেক পার্থক্য। ভোরের ভুল কেউ দুপুরে করে না। এইটুকু মনে রেখে জীবনটা দ্যাখো।'

সেই প্রথম সরাসরি প্রশ্ন করেছিল তিস্তা, 'তোমার ওকে কেমন লাগল?'

'স্বাভাবিক। যেমন স্বাভাবিক মানুষকে প্রথম দেখলে মনে হয়।'

তারপরে বিয়ে। না, মন্ত্র পড়ে সানাই বাজিয়ে বিয়েতে দুজনেরই আপত্তি ছিল। সই করে নিজেদের সম্পর্কটাকে আইনসঙ্গত করে নিয়েছিল ওরা। অরিত্রর এক বন্ধুর ফ্ল্যাট ছিল সল্টলেকে। ভদ্রলোক বিদেশে চলে যাচ্ছিলেন চাকরি নিয়ে। তার ফ্ল্যাট ভাড়া নিল ওরা। বন্ধু বলেই মাত্র পনেরশো টাকার বারো'শ স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট পেয়ে গিয়েছিল। কোনো সেলামি নয়। অতএব যত্নে সাজিয়ে তুলেছিল তিস্তা। অরিত্রর বন্ধুবান্ধবরা আসত। শখে পড়ে চিনে খাবাবের সঙ্গে স্কচ হুইস্কি চলত একটু আধটু। সে বড় সুখের সময় ছিল।

কিন্তু বিবাহিত অরিত্র তার কাছে অন্য অভিজ্ঞতা। রাত দুপুরে বাড়ি ফিরে শুতে শুতে অরিত্রর দুটো বেজে যেত। প্রথম প্রথম জেগে থাকতে ভাল লাগত। কিন্তু সকালে চটপট না উঠলে অফিসে ঠিক সময়ে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে যাচ্ছিল। ব্যবস্থা হল অরিত্রর জন্যে খাবার হট বক্সে রাখা। আর এইটে অরিত্রকে অনেক সুবিধে করে দিল। মাঝরাতে বাড়ি ফিরে সে গড়িমসি করে খাবার খেত। সকাল দশটার আগে বিছানা ছাড়ার উপায় ছিল না। ফলে সাতসকালে বাজার, রান্না, রেশন, গ্যাস, ব্যাঙ্ক— সব কিছুর দায়িত্ব পড়ল তিস্তার কাঁধে। খারাপ লাগলেও মুখে কিছু বলেনি তিস্তা। সব মানুষ সবকিছু পারে না। অরিত্রও পারে না, এমনটা ভেবে নিয়েছিল। কিন্তু তারপরে মনে হয়েছিল এটা কি ধরনের জীবন? একলা থাকতে না পেরে সে বিয়ে করেছিল। আর বিয়ে করে সেই একাকীত্ব কোথায় ঘুচল। অফিসে না যাওয়া পর্যন্ত যে সকাল সেই সময়ে বাড়িতে থেকেও অরিত্র গভীর ঘুমে। তখন তার সঙ্গে কথা বলা অসম্ভব। বেশিরভাগ দিন চুপচাপ বেরিয়ে যেতে হয়। কোনো কিছু বলার থাকলে অরিত্র রাত্রে শোওয়ার সময় কাগজে লিখে টেবিলে চাপা দিয়ে রাখে। অফিস থেকে যখন বাড়ি ফেরে তখন দরজায় তালা। সারাটা সন্ধে একা কাটিয়ে একাই খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়া। অরিত্র যখন ফেরে তখন তিস্তা গভীর ঘুমে। তাহলে বিয়ে করে কোথায় তার একাকীত্ব ঘুচল? বিন্দুমাত্র নয়। বরং দায়িত্ব বাড়ল।

অরিত্র যা মাইনে পায় তার একাংশ মাকে দেয়। তিস্তার হাতে যা দেয় তাতে একটা মানুষের কোনোমতে চলে যায়। এই কোনোমতের মধ্যে পারফিউম, জামা প্যান্ট, লন্ড্রির বিল পড়ে না। অথচ অরিত্রের সেটা খেয়াল নেই। দায়িত্ব যে একবার বহন করে সে নিজের অজান্তেই একটু একটু করে বাড়তি ভার বহন করতে শেখে। তিস্তার সেই অবস্থা হয়েছিল। তবু অরিত্রের ছুটির দিনে বাড়ির আবহাওয়া অন্যরকম হত। কিছু বন্ধুবান্ধব আসত। এরা ওর অফিসের সূত্রেই পরিচিত। খাওয়াদাওয়া গানবাজনা হত। পুনশ্চর কবিতাগুলো চমৎকার আবৃত্তি করতে পারে অরিত্র। এই দিনগুলোর জন্যেই বেঁচে থাকতে ভাল লাগত।

সল্টলেকের সুখ বেশিদিন সইল না। অরিত্রর বন্ধু চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিদেশ থেকে চলে আসছিল। মাত্র পনেরো দিনের নোটিস পেল ওরা। তড়িঘড়িতে কলকাতায় বাড়ি খুঁজতে গিয়ে নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা। সেলামি অথবা অ্যাডভান্সের ধাক্কার সঙ্গে ভাড়ার অঙ্ক ওদের যখন দিশেহারা করে তুলেছে ঠিক তখন নোনাচন্দনপুকুরের ফ্ল্যাটটার সন্ধান পাওয়া গেল। অরিত্র হিসেব করে দেখাল, রিকশা ট্রেনের মান্থলিতে যা খরচ হবে তার সঙ্গে বাড়ি ভাড়া যোগ করলেও কলকাতা থেকে অনেক কম পড়ছে। ডানলপ থেকে ডালহৌসি যেতে যে সময় লাগে বারাকপুর থেকে তা লাগে

না। তাছাড়া তিস্তার এসে সুবিধে হবে কারণ কাছেই শ্যামনগর। চট করে মা বাবার কাছে পৌঁছে যেতে পারবে। অতএব চলে আসা হল নোনা চন্দনপুকুরে অসীমবাবুর বাড়িতে। লোকাল ট্রেনে যাতায়াতের অভ্যেস তৈরি ছিল তিস্তার। কিন্তু তখন বাড়ি ফিরে রান্নাঘরে ঢুকতে হত না। দায় ছিল না কোনো। এখন সেটা যোগ হওয়াতে তার ধকল বেড়েছে। আর এইসময় শরীরে তিনি এলেন।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই প্রথম প্রতিক্রিয়া ভাল ছিল না তিস্তার। অরিত্রর সঙ্গে এমন বসবাস, সংসারের চাপ, কেমন বন্ধুবিহীন হয়ে থাকা জীবনে আর একটি প্রাণ এলে তার দায়িত্ব যে সবটাই তিস্তাকে বহন করতে হবে এটা বুঝতে অসুবিধে ছিল না বলে সে রাজি হচ্ছিল না। কিন্তু অরিত্র বেঁকে বসল। তার আগের বিবাহিত জীবনে সন্তানের দেখা পায়নি সে। অতএব সন্তানের আকাঙ্ক্ষা তার তীব্র। সে নানান সহযোগিতার কথা বলে বলে সময়টাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল। আর তখনই কথাটা মায়ের মাধ্যমে বাবার কাছে পৌঁছাল। শ্যামনগর থেকে এক ছুটির দিনে তিনি এলেন। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এতদিন যা করেছ তা কিছুই নয়। এখন যা করবে তাই তোমার জীবনের সেরা কাজ। তবে আমি যতদিন জীবিত আছি ততদিন নিজে দায়িত্ব বহন করতে না পারলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।'

এটাই সবচেয়ে বড় ভরসার কথা। তিস্তা আর বিরূপ ভাবনা ভাবেনি।

এখন এই মাঝরাত পেরিয়ে যাওয়া সময়ে বিছানায় বসে তিস্তার মনে হল মানুষ কেন শুধু আশা দেখে যায়? আশা দেখা ছাড়া মানুষ হয়তো বাঁচতে পারত না কিন্তু সেটা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে হবে কেন? কেন বর্তমানকে সুন্দর করার জন্যে মানুষ বাঁচতে পারে না। পেটে যা এসেছে তাকে পৃথিবীতে আনতে গিয়ে যদি আমি মারা যাই তাহলে আমার কী লাভ হল? হ্যাঁ, এভাবে কোনো মা চিন্তা করবে না। করাটা শোভন নয়। তবু এটা সত্যি। দীপান্বিতারা বলে তার শাড়ি পরার ধরনের জন্যেই নাকি চট করে বোঝা যায় না শরীরে সন্তান এসেছে। খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখলে ধরা পড়ে। আজ অন্ধকার শেয়ালদা স্টেশনে যে যুবক তাকে চা খাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল সে বেচারাও বোধহয় বুঝতে পারেনি। পারলে একশ হাত দূরে থাকত। নাকি কোনো কোনো জন্তুর এসব হুঁসও থাকে না। কথাটা তাকে অরিত্র বলেছিল কোনো এক ছুটির দিনে, 'যাই বলো, তোমাকে দেখে মনে হয় না এমন অ্যাডভ্যান্স স্টেজে আছো।' যেন তুমি এখনও মা মা চেহারা তৈরি করতে পারনি! দোষটা তোমার।

ভোরবেলায় আবার যন্ত্রণা শুরু হল। সেই পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ব্যথা। ওপর থেকে নিচে নেমে আসছে। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছিল তিস্তা। শেষে আর পারল না। হাত দিয়ে ঠেলল অরিত্রকে। ঘুমের ঘোরে প্রতিবাদ জানাল অরিত্র। চিৎকার করে উঠল তিস্তা যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে। চিৎকার করে কেঁদে ফেলল।

অরিত্র ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। বিড় বিড় করল, 'কী হয়েছে?'

'আমি পারছি না। আমাকে নার্সিংহোমে নিয়ে চলো।' ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছিল তিস্তা। অরিত্র হাঁ করে তাকিয়েছিল। যেন কোনো কথাই তার মাথায় ঢুকছিল না। তারপর খেয়াল হতেই লাফিয়ে নামল বিছানা থেকে। খুব নার্ভাস গলায় বলল, 'কী করি! এখন তো রিকশাও পাব না। সকাল অবধি—?'

'তুমি, তুমি মিসেস চক্রবর্তীকে ডাকো।' কোনোমতে বলতে পেরেছিল তিস্তা।

তার আধঘণ্টা বাদে তিস্তা যখন ডক্টর মল্লিকের নার্সিংহোমে তখন আবার ব্যথাটা কমে এসেছে। ঘরে তখন কেউ নেই। জানলা দিয়ে সকালের আকাশ দেখছিল সে। একটু আগে পরীক্ষা করেছেন ডক্টর মল্লিক। ওঁর মুখ গম্ভীর ছিল। এখন আবার ঢুকলেন হাসিমুখে, 'চলে এসে ভাল করেছেন মা।

আমি ভাবছি সিজার করব। কাল অথবা পরশু।'

'আপনি যা ভাল মনে করেন।'

'আপনার হাজব্যান্ড বলছিলেন শ্যামনগরে যাবেন খবর দিতে। আপনার বাবামায়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে। দুদিন আমরা অপেক্ষা করতে পারি।'

'এখনই করা যায় না?'

হেসে ফেললেন ডক্টর মল্লিক, 'এখনও কিন্তু তারিখ আসেনি। তারিখ চলে গেলে পেইন না আনতে পারলে যেটা করি সেটা এখনই করতে হচ্ছে কেন জানেন? আপনি মুক্তি পেতে চাইছেন। এর আগে ইস্যু হয়নি বলেছিলেন। কোনো অ্যাবরসন?'

'হ্যাঁ। হয়েছিল। আমার তখন আঠারো বছর বয়স।'

'কতদিনের?'

'একমাসও নয়।'

'দ্যাটস নাথিং। মন চিন্তামুক্ত করুন। একটুও টেনশনে রাখবেন না। পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান ভূমিকায় স্বাভাবিকভাবে পৌঁছানোটা কাম্য, তাই না?'

সেই বিকেলে তাতান এল।

এবার ব্যথা শুরু হওয়ামাত্র নার্স লক্ষণ দেখতে পেলেন। যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়নি। তিস্তা স্পষ্ট অনুভব করল তার শরীরের ভেতর থেকে আর একটা শরীর বেরিয়ে এল পৃথিবীতে। খানিক বাদে একটা কান্নার আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত চেতনায় অদ্ভুত আরামবোধ ছড়িয়ে পড়ল। এত সুখ সে এ জীবনে পায়নি। চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। নার্স কানের কাছে ফিসফিস করছিল, 'এই যে, শুনছেন, শুনুন।' তিস্তা চোখ মেলেছিল।

নার্স হেসেছিল, 'আপনার মেয়ে হয়েছে। দারুণ সুন্দর।'

পরের সকালে যখন চারধারে ঝকমকে রোদ তখন তিস্তা মেয়ের চেহারা দেখল। অদ্ভুত শান্ত একটা পুতুলের মত কম্বলের ভাঁজে ঘুমিয়ে আছে। নার্স বলেছিল, 'এখন কিছুই বোঝা যাবে না। এই মুখ পাল্টে যাবে।'

সকালবেলায় সবাই মেয়ে দেখে বেরিয়ে গেলে অরিত্র তার পাশে বসে উদাসীন গলায় বলেছিল, 'আমার কপালে চিরকাল এমন হয়।'

শোওয়া অবস্থাতেই তিস্তা তাকাল মুখ ঘুরিয়ে, 'মানে?'

'যখন কিছু আশা করি তখনই জানি উল্টোটা হবে। তুমি?'

'আমার কোনো বিশেষ আশা ছিল না। যা পেয়েছি তাই ভালো।'

'এভাবে ভাবলে তো সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারতাম।'

'আমি কিন্তু ভেবেও হইনি।'

কথাবার্তা এগোয়নি। কথা বলার মত অবস্থাও ছিল না। মেয়ে হয়েছে বলে অরিত্রর মন খারাপ হলে সে কিছুই করতে পারে না। ওর মন খারাপ যে কারণে সেই কারণটাকে কিছুতেই সমর্থন করে না তিস্তা। তবে হ্যাঁ, পৃথিবীতে এসে আরও একজনকে লড়াইতে নামতে হবে যদি না ততদিন সামাজিক অবস্থাটা পাল্টায়। এখনও এদেশে মেয়ে মানে প্রতিমুহূর্তে লড়াই-এর জীবন যদি না সে দাসীবাঁদী হয়ে থাকতে চায়। তিস্তা জানে তার মেয়ে কখনই সেরকম হবে না। কিন্তু সেই সময় আসবে আরও আঠারো কুড়ি বছর পরে। তদ্দিনে কি চেহারাটা বদলাবে না?

এই দশ বছরে কত বদলে গেল। দশ বছর আগেও শীতকালে রাস্তায় মোজা পরা মেয়ে ক'টা দেখা যেত? হেসে ফেলল তিস্তা। কি অদ্ভুত একটা দৃষ্টান্তের কথা ভাবল সে। অদ্ভুত কিন্তু সত্যি।

মেয়েদের জন্যে চটি পরা পায়ের মোজা বের হল তো এই সেদিন। সুমিতদের বাড়িতে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। এখনও পারে কি না তার জানা নেই। সেই রাত্রে বেরিয়ে আসতে না পারলেও আরও মাস ছয়েক তাকে থাকতে হয়েছিল। ছ'টা মাস তার জীবনের অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছিল।

কানের কাছে অহরহ জমিটা লিখে দেবার প্রস্তাব শুনতে শুনতে প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল তিস্তা। শাশুড়িকে গিয়ে কথাটা জানিয়েছিল। সব শুনে ভদ্রমহিলা অদ্ভুত কথা বললেন, 'দ্যাখো বউমা, মেয়েমানুষের জীবনে স্বামীর ঘরের কোনো বিকল্প নেই। ও যদি ভালো চাকরি পেয়ে তোমায় নিয়ে আলাদা সংসার পাতে তাহলে তোমার বাবার উচিত জমিটা ওর নামে লিখে দেওয়া। আমি তো একটা টাকাও দেব না, তোমার বাবাও যদি না দেন তাহলে ও বেচারা কোথায় যায় বল দেখি।'

'আপনি দিচ্ছেন না কেন?'

'কারণ আমার যা আছে তা আমি ছোটটার জন্যে রাখব।'

'কিন্তু ও তো আপনারও ছেলে!' ইচ্ছে করে খুঁচিয়েছিল তিস্তা।

'হ্যাঁ। আমিই বিইয়েছিলাম। বাধ্য হয়েছিলাম। ওর বাপ সেয়ানা উন্মাদ। আমার বাবাকে মিথ্যে কথা বলে এ বাড়িতে বিয়ে দেওয়ানো হয়েছে।' হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে গেলেন মহিলা, 'না। তোমার সঙ্গে এই নিয়ে কোনো কথা বলতে চাই না।'

বাবা আসতেন খবর নিতে। কিন্তু কখনই তিস্তা তাঁকে সুমিতের ইচ্ছের কথা বলতে চায়নি। শেষপর্যন্ত চলে গেল সুমিত বিহারে। আর তার ফলে তিস্তা পরীক্ষা দিতে পারল নির্বিঘ্নে।

মাস দুয়েক বাদে সুমিত এল। তার চেহারা পাল্টে গিয়েছে। বেশ চকচকে হয়েছে। জামাপ্যান্টও দামি। বিদেশি পারফিউম ব্যবহার করছে। সুমিত জানাল সে এখন পুরোদমে চাকরি করছে। ম্যাডাম তার ওপর খুব খুশি। উনি বলেছেন সে যেন তিস্তাকে নিয়ে একবার ওখান থেকে ঘুরে আসে। এখন তিস্তা যদি যেতে রাজি না হয় তাহলে তার সম্মান থাকবে না। ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তিস্তার মনে হল সব মানুষের একটা না একটা সময়ে পরিবর্তন আসে, সুমিতেরও হয়েছে। অন্তত ওর চালচলন কথাবার্তা যদি চাকরির কারণে পাল্টে গিয়ে থাকে তাহলে সেটা হওয়া অসম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে পুরনো জেদ আঁকড়ে ধরে থাকার কোনো মানে হয় না। সে যেতে রাজি হল।

রাঁচি এক্সপ্রেসে রাঁচিতে পৌঁছাতে সকাল। সেখান থেকে ট্রেন বদলে যে স্টেশনে নামল সাধারণত রমাপদ চৌধুরীর প্রথমদিকের উপন্যাসে সেইরকম স্টেশনের বর্ণনা পাওয়া যেত। ভাল লাগল তিস্তার। স্টেশনে গাড়ি ছিল। সেটা তাদের নিয়ে এল গেস্ট হাউসে। পাশেই রাজকীয় মহল। সুমিত জানাল ওটা ম্যাডামের বাড়ি। তিনি এখন বিলেতে আছেন।

কুমারসাহেব রঙ্গলাল সুমিতের বন্ধু। বেশ শান্ত সুন্দর চেহারার যুবক। তিস্তার সঙ্গে যেচে এসে আলাপ করে গেল। বলল, 'বিকেলে মহলে আসুন।' চমৎকার বাংলা বলে। চলে যাওয়ার পর সুমিত বলল, 'লালের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো। ও ইচ্ছে করলে ম্যাডামকে বলে ডিপোজিটের ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে পারে। তিস্তা জানল ম্যাডামের বয়স ছত্রিশ। রঙ্গলালের বাবা মোহনলাল ষাট বছরের বৃদ্ধ। তিনি শয্যাশায়ী। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মহলে আসার পরেই ওঁরে স্ট্রোক হয়। সেই থেকে আর বিছানা ছাড়েননি। এতবছর ধরে ম্যাডাম স্বামীসেবা করে গেছেন। নিজের ব্যক্তিগত সুখের কথা ভাবেননি। এই যে তিনি বিলেত গিয়েছেন তাও স্বামীর জন্যেই। ডক্টর বার্নার্ড নামের এক চিকিৎসকের সঙ্গে স্বামীর আরোগ্য নিয়ে আলোচনা করতে। যদি সম্ভব হয় তিনি ডক্টর বার্নার্ডকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবেন। রঙ্গলালের ব্যবসায় মন নেই। ফলে ম্যাডাম সুমিতের ওপর নির্ভর করতে চান।

সুমিত যে কাজে ডুবে গেছে তার প্রমাণও পেল তিস্তা। গেস্ট হাউসে পৌঁছে রঙ্গলালের সঙ্গে কথা শেষ করেই সেই যে সে কাজে বেরিয়ে গেল ফিরে এল সন্ধ্যায়। ক'দিন কলকাতায় যাওয়ায়

যেসব গাফিলতি দেখতে পেয়েছে তাই ওর মাথায় গিজগিজ করছে। স্নান সেরে তৈরি হয়ে সে তিস্তাকে নিয়ে মহলে গেল। বিয়ের পর সেদিনই প্রথম চমৎকার সেজেছিল তিস্তা। সুমিত পর্যন্ত বলেছিল, 'দারুণ দেখাচ্ছে তোমাকে।'

রঙ্গলাল ওদের চমৎকার চা খাবার খাইয়েছিল। মহলের বৈভব দেখে মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড়। কয়েক পুরুষের সঞ্চিত স্মৃতিচিহ্নের সঙ্গে আধুনিক জীবনযাত্রার অদ্ভুত মিশেল সেখানে। রঙ্গলাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাল? একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'এ হল আমার বাবার জায়গা। আমি আপনাকে ওখানে নিয়ে যেতে চাই না।'

'কেন?' তিস্তা প্রশ্ন করেছিল।

'উনি অশ্লীল শব্দ ছাড়া কথা বলতে পারেন না। এত বছর বিছানায় শুয়ে থেকে সুস্থ মানুষ দেখলে সহ্য করতে পারেন না। আপনি বরং মায়ের ঘরে চলুন। দেখার মত ঘর।' রঙ্গলাল বলেছিল।

সত্যি দেখার মত ঘর। দেওয়ালের সিমেন্ট দেখা যায় না, পুরো দেওয়াল জোড়া ওয়ানপিস আয়না। আয়নাগুলো ইতালিতে তৈরি। দাঁড়ানো মাত্র ওর মনে হল চার তিস্তা চারদিক থেকে ঘরে ঢুকল। পায়ের তলায় পারস্যের কার্পেট। ফার্নিচারগুলো অত্যন্ত আধুনিক। খাটের দিকে তাকালে বোঝায় যায় এটি যিনি ব্যবহার করেন তিনি কতখানি সৌখিন। সুমিত আর রঙ্গলাল কথা বলছিল। তিস্তা ড্রেসিং টেবিলের সামনে গেল। প্রায় শ'খানেক বিদেশি পারফিউম। অধিকাংশের নাম সে এর আগে শোনেনি। বাইশ রকমের চিরুনি রয়েছে। গুনল তিস্তা। একটা কি হাতির দাঁতের! কোন কিছু না ভেবেই সে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার ধরে টানল। গোল করে বাখা একটা তার, তারের একপাশে প্ল্যাক অন্য পাশে অদ্ভুত দেখতে একটা জিনিস। লম্বা গোলাকার একটা বস্তুর গায়ে যেন কাঁঠালের ভূতি লাগান হয়েছে। সে বিস্মিত গলায় দূরে দাঁড়ানো রঙ্গলালকে প্রশ্ন করল, 'এটা কী জিনিস? অদ্ভুত দেখতে তো!'

আড়চোখে দেখে নিয়ে রঙ্গলাল বলল, 'ছেড়ে দিন।' কথাটা বলার সময় রঙ্গলালকে বেশ অস্বস্তিতে পড়তে দেখল তিস্তা। সে সামান্য ঝুঁকে জিনিসটাকে দেখতে যেতেই বঙ্গলাল এগিয়ে এল, 'ফরগেট দ্যাট।'

'কেন?'

এই প্রশ্নটা করামাত্র তিস্তার মনে হল বড্ড বেশি কৌতূহল দেখিয়ে ফেলেছে। অনেক আগেই তার চুপ করে যাওয়া উচিত ছিল। সে ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে সরে এল।

পাশের ঘরটি লাইব্রেরি। দেওয়ালজোড়া বই। এটাও নাকি ম্যাডামের সংগ্রহ। কি বই নেই সেখানে। রঙ্গলাল কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যেতেই সুমিত কাছে এগিয়ে এল, শোনো, তুমি লালকে একটু অ্যাটেন্ড করো।'

'বুঝলাম না।'

'ওঃ, মাঝে মাঝে তুমি এমন ভাব করো যে গ্রাম থেকে সবে এসেছ। তখন বললাম না, আমার ডিপোজিটের টাকাটা একমাত্র লালই ওর মাকে বলে ম্যানেজ করে দিতে পারে। ও আমার সঙ্গে পড়ত কিন্তু শুধু সেই কারণে এতটা করবে না। তোমার বাবার কাছ থেকে যখন এনে দিলে না তখন এটুকু করো।'

'কী করতে হবে?' তিস্তার গলায় অন্য সুর।

'কিছুই না। একটু কম্পানি দেবে। ও কবিতা পড়লে শুনবে। দ্যাটস অল।'

'আর কিছু?'

'দ্যাখো, এখানে এসে নাটক করো না।' সুমিত কথাটা শেষ করামাত্র ঘরে ঢুকল রঙ্গলাল। ঢুকে

দেরি হবার জন্য বিনয় দেখিয়ে বলল, 'আমার স্ত্রীর শরীরটা আজ ভাল নয়। ও আগামীকাল আপনার সঙ্গে আলাপ করবে।'

রঙ্গলাল বিবাহিত জেনে তিস্তা খুশি হল। পরে ভেবেছিল কেন তার ওরকমটা হয়েছিল। বিবাহিত পুরুষকে সে নিরাপদ প্রাণী বলে ভেবেছিল? অদ্ভুত।

সুমিত ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'কী হয়েছে?'

'ঠিক কী হয়েছে আমি জানি না।'

'ডাক্তার সাহেব এসেছেন?'

'ওটা তোমার ডিপার্টমেন্ট।'

সুমিত তিস্তাকে বলল, 'তোমরা কথা বলো আমি ঘুরে আসছি।' সে বেশ দ্রুত লাইব্রেরিঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তিস্তার বোধগম্য হচ্ছিল না। স্ত্রী অসুস্থ অথচ স্বামী চিন্তিত নন, সুমিতের আচরণে মনে হল সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। ওর চাকরির শর্তে কি বন্ধুর স্ত্রীকে দেখাশোনা করাও আছে? রঙ্গলাল বলল, 'আপনার স্বামী এখানে আসার পর আমাদের অনেক চিন্তা দূর হয়ে গেছে। অ্যাকচুয়ালি, আমি আর বিমলা ঠিক ক্লিক করছিলাম না। সুমিত এসে সেটাকে চাপা দিতে পেরেছে।'

'আচ্ছা! আপনার বন্ধু আর কী করল?'

'ওতো চমৎকার কথা বলতে পারে। মা খুব খুশি। আসলে এখানে মা কথা বলার উপযুক্ত মানুষ পেতেন না। বাবাকে দেখাশোনা করে এস্টেট চালিয়ে উনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। সুমিত আসায় ওঁর মনমেজাজ ভাল হয়ে গেছে অনেক।'

'আপনি এখানেই থাকেন?'

'না, না। বেশিরভাগ সময় কলকাতা। মা বিদেশ যাওয়ায় স্ত্রীকে নিয়ে এখানে এসেছি। বাবা একা আছেন তো। তা আসার পর থেকেই বেচারা খুব মন খারাপ করে আছে। এখানে পার্টি নেই, ফ্রেন্ডস নেই, খুব লোনলি। আমি তো বলি মা কীভাবে আছেন তাহলে বোঝো! যাকগে! কবিতা শুনবেন?'

আপনার লেখা?'

'হ্যাঁ। ওই আমার হবি বলতে পারেন।'

'বাংলা?'

'না। বলতে পারি কলমে আসে না ঠিক। হিন্দিতে।'

অতএব সোফায় বসতে হল তিস্তাকে। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে একই লাইন বারংবার আবৃত্তি করতে করতে একটা বিশাল কবিতা শেষ করল রঙ্গলাল।

হিন্দি ভাষাটা ভালই জানে তিস্তা। বুঝতে অসুবিধেও হয়নি। রঙ্গলালের কবিত্ব এই জীবনে কতখানি পরিপূর্ণতা পাবে তাতে ঢের সন্দেহ হচ্ছিল। আবৃত্তি শেষ করে কাছে এল রঙ্গলাল, 'কেমন লাগল?'

'বেশ সহজ।'

'এটা আমার কাছে বিরাট কমপ্লিমেন্ট। সহজ কথাটা কে সহজভাবে বলতে পারে! আমার স্ত্রী এসব শুনতে চায় না। আসলে মনের ব্যাপারটা সকলে ঠিকঠাক বোঝে না। আমার খুব ভাল লাগছে আপনার পছন্দ হয়েছে বলে। আর একটা কবিতা আমি লিখেছিলাম যৌনবিষয় নিয়ে। শুনবেন?'

'সুমিত ফিরে এলে শুনলে হত না?'

'সুমিত? ও এত তাড়াতাড়ি ফিরবে বলে ভাবছেন নাকি?'

'কেন?'

'মরুভূমিতে এক টুকরো মেঘ উড়ে গেলে যেমন আর ফিরে আসে না তেমনি আমার স্ত্রীর লোনলিনেস ওকে ফিরতে দেবে না। না, মানে মেঘের মত চিরকালের জন্যে নয়, অন্তত ডিনার পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

'আমি বুঝতে পারছি না, আপনার স্ত্রীর লোনলিনেস সুমিত কী করে সমাধান করবে! ওর চাকরি কি এটাই।'

'পার্টলি।'

'আমি গেস্ট হাউসে ফিরে যেতে চাই।'

'সেকী? এখনই?'

'হ্যাঁ। আমার ভাল লাগছে না।'

'কী ভাল লাগছে না? সুমিত সম্পর্কে না আমাকে?'

'আমি আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না।'

'দেখুন, আমি খারাপ লোক নই। আমাদের প্রচুর টাকা, সম্পত্তি কিন্তু আমি কবিতা লিখি, মদ খাই না, মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করতে পারি না। চাই না বলে পারি না নয়, পারি না বলেই চাই না। অতএব আমার কাছে আপনি নির্ভয়ে বসে থাকতে পারেন। এ বাড়িতে এতদিন সবকিছু অ্যাবনর্মাল ছিল। সুমিত আসার পর একটু একটু করে নর্মাল হয়ে আসছে। একটু আগে মায়ের ড্রেসিং টেবিলে যে যন্ত্রটাকে দেখলেন সেটা আর ব্যবহৃত হয় না। এখানে এলে আমার স্ত্রীর মেজাজ শান্ত থাকে। আমি চমৎকাব কবিতা লিখতে পারি।' বঙ্গলাল হাসল।

উঠে দাঁড়াল তিস্তা, 'আর আপনাদের ব্যবসা? মাইন, জঙ্গল, চাষবাস?'

'বাবা অসুস্থ হবার পর মা কাজ করেছিলেন বুদ্ধিমতীর মত। সবকিছু তিনি তিনটে লিমিটেড কোম্পানির আন্ডারে নিয়ে গেছেন। বছরে কয়েকবার বোর্ড মিটিং-এ অ্যাটেন্ড করা ছাড়া আমাদের কিছুই করার নেই। চাষবাস অবশ্য লোক দিয়ে করাতে হয়। বাট উই আর নট ইন্টারেস্টেড।'

'সুমিত বলেছিল আপনারা ওকে ব্যবসা দেখাশোনার চাকরি দিয়েছেন।'

'বলেছিল বুঝি। হয়তো মা ওকে তাই দিয়েছেন।'

'কিন্তু আপনার কথায় তো সেটা মনে হচ্ছে না।'

'আমার ওই একটা দোষ। বেশি বলে ফেলি। কবিতাতেও, জানেন।'

তিস্তা ঠোঁট কামড়াল। সে সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিল। রঙ্গলাল যে পরিবারের ছেলে তাতে তার যে আচরণ করা স্বাভাবিক ছিল তা করছে না কারণ ওর মস্তিষ্ক বোধহয় পুরোপুরি ঠিক নেই। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কবিতার হবি কী করে হল আপনার?'

'মা। মা ব্যাপারটার আমার মধ্যে ঢুকিয়েছেন। শি ইজ লাইক এ কুইন। আমার অনেক কবিতা ওঁকে নিয়ে লেখা।'

'আপনি আমার একটা উপকার করবেন?'

'ও সিওর! বলুন।'

'এখন কলকাতায় ফিরে যাওয়ার ট্রেন আছে?'

'এখন? ঘড়ি দেখল রঙ্গলাল। তারপর এগিয়ে গিয়ে ইন্টারকমের বোতাম টিপে একই প্রশ্ন কাউকে করল। জবাবটা পেয়ে রিসিভার রেখে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। আর ঘণ্টা দেড়েক বাদে একটা মেইল ট্রেন আছে।'

'আমি আজই কলকাতায় ফিরে যেতে চাই।'

'সেকী? আজই এসেছেন আপনি, ফিরে যাবেন বললেই হল। মা ফিরে এসে এটা শুনে ভাববেন

নিশ্চয়ই আমি আপনার সঙ্গে অভদ্রতা করেছি তাই আপনি থাকতে পারলেন না।'

'মোটেই নয়। আপনি আমার সঙ্গে যথেষ্ট ভাল ব্যবহার করছেন।'

'তাহলে আপনি চলে যেতে চাইছেন কেন?'

'আমার ঘেন্না লাগছে, তাই।'

'ঘেন্না? হোয়াটস দ্যাট? ঘৃণা?'

'হ্যাঁ। আরও জোরালো।'

'আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট ফিলিং। আমার কখনও মনে ঘেন্না আসেনি। ওটা আপনার মনে কেন এল বলুন তো? দেখি একটা কবিতা লেখা যায় কিনা!'

'আপনি আমার অনুরোধ রাখুন।'

'অসম্ভব। কাল যান পরশু যান, নট দিস নাইট।'

হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গেল তিস্তার, 'আপনি কিরকম পুরুষ? আপনার স্ত্রীকে সঙ্গ দিচ্ছে সুমিত আর আপনি এখানে চুপ করে বসে আছেন?'

রঙ্গলাল মাথা নাড়ল. 'সেটা আপনারও প্রব্লেম। অন্য নারীকে সঙ্গ দিচ্ছে আপনার স্বামী, কি রকম আপনি যে এখানে বসে আছেন?'

'ওই কারণেই আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।'

'বাট নট বিফোর আমি আপনাকে দেখি।'

'আমাকে দেখবেন মানে?'

রঙ্গলাল হাসল, 'কথাটা আমি বলতে পারি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আপনার ভাল লাগবে না। সুমিতের কথা শুনে আপনাকে এমন অ্যারোগান্ট মনে হয়নি।'

'আপনি বলুন, আমি সব কিছু শুনতে তৈরি আজ।'

'ওয়েল, আমার নেক্সট কাব্যগ্রন্থে এক মানবীর বর্ণনা আছে। ব্রহ্মা তাকে সৃষ্টি করেছেন সমুদ্রের ভেতর। সূর্যদেব উদিত হলে সেই মানবী সমুদ্রের গভীর থেকে ধীরে ধীরে তীরে উঠে আসছে হেঁটে। সমুদ্রজলে সিক্ত অবস্থায় তার শরীর রোদ পড়ায় অদ্ভুত সৌন্দর্য জন্ম নিল। সেই সৌন্দর্যের বর্ণনা আমি করতে পারছিলাম না। কলকাতায় টাকা দিয়ে অনেক নারীর শরীর দেখেছি আমি কিন্তু তারা আমার মানসীর ধার কাছ দিয়ে যায় না। আমার স্ত্রী বলে সে গিনিপিগ হতে রাজি নয়। অবশ্য তার শরীর একটু হস্তিনী টাইপ, ওই মানসীর সঙ্গে মেলে না। সুমিত আমাকে বলল ওর স্ত্রীর ফিগার খুব ভাল। আমি যদি আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারি তাহলে আপনি দর্শনে আপত্তি করবেন না।'

'কীভাবে সন্তুষ্ট করবেন?' দাঁতে দাঁতে চেপে বলল তিস্তা।

'সুমিতের কিছু প্রয়োজন আছে। সেগুলো মিটিয়ে দিয়ে।'

তিস্তা চোখ বন্ধ করল। সেটা দেখে রঙ্গলাল বলল, 'আপনি নিশ্চিত থাকুন। আর্ট কলেজে যেমন ছেলেমেয়েরা মডেলের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকে এও তেমনি। আমি মানসপটে ছবি আঁকব। আপনাকে স্পর্শ করব না।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমি একটু গেস্ট হাউসে যাব।'

'কেন?'

'ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে।'

'নিশ্চয়ই। আমি খুশি হলাম আপনি ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছেন না। চলুন, আপনাকে আমি এগিয়ে দিয়ে আসি।'

মহল থেকে বেরুবার সময় অনেক সেলাম কুড়িয়ে রঙ্গলাল বলল, 'সত্যি, আপনি খুব অদ্ভুত

মহিলা। আমার স্ত্রীর চেয়ে অদ্ভুত।'

গেস্টহাউসের দারোয়ানকে ডেকে রঙ্গলাল হুকুম করল, 'মেমসাহেব যা বলবে তাই সঙ্গে সঙ্গে করে দেবে।' তারপর তিস্তার দিকে ফিরে বলল, 'এক ঘন্টা পরে আমাদের দেখা হতে পারে মায়ের ঘরে?'

'মায়ের ঘরে?'

'হ্যাঁ। ওই ঘরে কোনো দেওয়াল নেই দেখেছেন নিশ্চয়ই। নীল আলো জ্বালিয়ে দিলে সমুদ্রের মত মনে হবে। আমি এসে নিয়ে যাব, কেমন?' রঙ্গলাল চলে গেল।

ঘরে ঢুকে একটুও সময় নষ্ট করল না তিস্তা। স্যুটকেস থেকে যা যা বের করেছিল সব চটপট আবার ঢুকিয়ে নিল। আর মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় আছে। ট্রেন যদি ঠিক সময়ে থাকে তাহলে যে করেই হোক তাকে পৌঁছতে হবে। আসার সময় গাড়িতে আধঘন্টা লেগেছিল। এই রাত্রে হেঁটে সেখানে পৌঁছানোর কথা ভাবা বোকামি। অতএব মিথ্যে কথা বলতে হবে।

সে বেরিয়ে এল বাইরে। দূরে মহলের ঘরগুলোয় আলো জ্বলছে। ওরই একটা ঘরে সুমিত এখন এ বাড়ির বউরানীর সেবায় ব্যস্ত। শরীর গুলিয়ে উঠল ওর। তিস্তাকে দাঁড়াতে দেখে ছুটে এল দারোয়ান, 'মেমসাহাব!'

তিস্তা বলল, 'আমার একটু বাইরে যাওয়া দরকার। গাড়ি আছে?'

'হ্যাঁ মেমসাহাব। দো গাড়ি হ্যায়।'

'ড্রাইভারকে বলো গাড়ি নিয়ে আসতে।'

মিনিটখানেকের মধ্যেই একটা অ্যাম্বাসাডার সামনে এসে দাঁড়াল। তিস্তা দেখল ওই ড্রাইভারই তাদের স্টেশন থেকে এখানে এনেছিল। হঠাৎ সে বুঝতে পারল স্যুটকেস নেওয়া চলবে না। সে স্যুটকেস নিয়ে গাড়িতে উঠলেই দারোয়ান মহলে খবর দেবে। দ্বিতীয় গাড়িতে ওদের স্টেশনে পৌঁছাতে বেশি দেরি হবে না। সুটকেসে শাড়ি জামা রয়েছে। ওগুলোর মায়া বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই। সে সোজা এগিয়ে যেতে ড্রাইভার পেছনের দরজা খুলে দিল। গাড়িতে বসে তিস্তা বলল, 'একটু নিরিবিলিতে কিছুক্ষণ ঘুরতে চাই।'

'জী মেমসাহেব।' ড্রাইভার গাড়ি চালু করল। পেছনে পড়ে রইল মহল, আলোকিত গেস্টহাউস, তার স্যুটকেস। খানিকটা যাওয়ার পর তিস্তা জিজ্ঞাসা করল, 'এই রাস্তা কোনদিকে গিয়েছে?'

'রামগড় মেমসাহাব।'

'স্টেশনটা কোনদিকে?'

'বাঁয়া।'

'ওখানে একবার চলো তো।'

গাড়ি একটু এগিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিল। তিস্তা দেখল পেছনের অন্ধকারে কোনো হেডলাইটের আলো নেই। এত তাড়াতাড়ি দারোয়ান নিশ্চয়ই খবর দেবে না। তার মনেই হতে পারে মেমসাহাবদের খেয়ালের একটা হল নির্জনে ঘুরে বেড়ানো।

স্টেশনটা দেখা যাচ্ছিল। হিসেবমত আর দশ মিনিট বাকি ট্রেন আসতে। ড্রাইভারকে গাড়ি পার্ক করতে বলল তিস্তা। তারপর কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে সে স্টেশনে ঢুকে পড়ল। টিকিট কাউন্টার খোলা। কোনো যাত্রী নেই। ব্যাগ থেকে টাকা বের করে তিস্তা বলল, 'একটা কলকাতার টিকিট দিন।'

'মেইল ট্রেন আট ঘন্টা লেট।'

'আট ঘন্টা?' তিস্তা কেঁপে উঠল।

'হ্যাঁ। দেব?'

'এখন কোনো ট্রেন নেই?'

'একটা প্যাসেঞ্জার আছে।'

'থাক।'

অসহায়ের মত প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল সে। কী করা যায়? তিস্তা মরিয়া হল। বাইরে বেরিয়ে এসে সোজা গাড়িতে উঠে জিজ্ঞাসা করল, 'ড্রাইভার, গাড়িতে কত তেল আছে?'

'তিরিশ লিটার।'

'রাঁচিতে যাওয়া যাবে?'

'রাঁচি? এখন?'

'হ্যাঁ। আমার একটা ওষুধ দরকার। খুব জরুরি।'

'ঠিক হ্যায়। লালসাহাবকো—।'

'আমার বলা আছে।' থামিয়ে দিল তিস্তা।

লোকটা বলল যে মেমসাহেবের ফিরে আসতে দেড়টা দুটো বেজে যাবে। খুব কষ্ট হবে। ওষুধটার নাম যদি লিখে দেন তাহলে সে নিজেই নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু তিস্তা বলল যে ওষুধটা একটা ইনজেকশন। সে নিজে না গেলে কোনো কাজ হবে না। অতএব ড্রাইভার গাড়ি ঘোরাল।

পথ যেন শেষ হচ্ছিল না। রাস্তা ভাল। কিন্তু মাঝে মাঝেই জঙ্গল পড়ছিল। দ্রুতগতিতে গাড়ি ছুটছিল। তিস্তা জানে এতক্ষণে রঙ্গলাল জেনে গেছে ব্যাপারটা। প্রথমে সে যাবে স্টেশনে। হয়তো সুমিতও সঙ্গে থাকবে। টিকিট কাউন্টারে সমস্ত ঘটনাটা ওর শুনতে পাবে। তারপর? ওরা কী সন্দেহ করবে সে গাড়ি নিয়ে রাঁচি গেছে? খুবই স্বাভাবিক সেটা। সঙ্গে সঙ্গে রাঁচি রওনা হবে ওরা? হতে পারে? সুমিত পারবে। কেন না সে তিস্তাকে হাতছাড়া করতে চাইবে না।

সেই গাড়ি অন্তত তিরিশ চল্লিশ মিনিট পরে রওনা হয়ে তাদের ধরে ফেলতে পারে? পেছনে হেডলাইট দেখলেই বুকের ভেতর ড্রাম বাজছিল। এখন মাঝরাস্তায় নেমে পড়ার কোনো উপায় নেই। ড্রাইভারটা যে রাজি হয়েছে এই ঢের। একে আর বোকা বানাতে যাওয়া বোকামি হবে।

খোলা থাকলে এদেশে বাজার হাসপাতালের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু এখন, রাঁচি শহরে ঢুকে, তিস্তার মনে হল সব কিছু বন্ধ হয়ে গেছে। কিছু রিকশা ঘুরে বেড়াচ্ছে যত্রতত্র। সে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, 'বড় ওষুধের দোকান জানা আছে?'

'নেহি মেমসাব।'

'স্টেশনের দিকে চলো।'

স্টেশন শব্দটা উচ্চারণ করার পর নজর করেছিল লোকটার দিকে। না, তেমন কিছু সন্দেহ হয়েছে বলে মনে হল না।

সেই রাত্রে, স্টেশনে যে ট্রেন, সেটা কোথায় যাচ্ছে জানার প্রয়োজন ছিল না তিস্তার। যা কিছু ওই স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাচ্ছে তাই যেন মুক্তির পথে এগোচ্ছে এমন ভাবনা ওর মাথায় কাজ করছিল। ট্রেনটা যখন প্ল্যাটফর্ম ছাড়ল তখনও ড্রাইভার বাইরে, গাড়িতে, তখনও সুমিতরা এসে পৌঁছায়নি শহরে। খুব ধীরে চলা ট্রেনটার কামরায় বসে প্রাথমিক উত্তেজনা কমে যাওয়ার পর তিস্তা সহযাত্রীদের লক্ষ্য করল। এত কম মানুষ কেন? ট্রেন মানেই তো ভিড় উপচে পড়া। সামনে বসা একা বিহারী প্রৌঢ়কে সে জিজ্ঞাসা করল, 'এই ট্রেন কোথায় যাবে?'

'আমি রামগড়ে যাব।' লোকটা হিন্দিতে জবাব দিল।

হতভম্ব হয়ে গেল তিস্তা। হায় ঈশ্বর! সে কোন ট্রেনে উঠে পড়ল? সুমিতের সঙ্গে এইরকম

একটা ট্রেনে চেপে সে রঙ্গলালের স্টেশনে নেমেছিল। এত ছুটে উত্তেজনা নিয়ে এখানে এসে কি লাভ হল! আবার সে ফিরে যাচ্ছে সেই স্টেশনে। তিস্তা শরীর এলিয়ে দিল পেছনের দেওয়ালে। ভালই হল। স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকলে নির্ঘাত ধরা পড়ে যেতে হত। ওরা চিন্তাও করতে পারবে না আবার ওদের ওদিকেই সে যেতে পারে!

কীভাবে কলকাতায় ফিরে এসেছিল সেটা বড় কথা নয়, কলকাতায় ফিরে কোথায় উঠবে তাই ছিল চিন্তার বিষয়। সুমিতদের বাড়ি মানে সুমিতের অস্তিত্ব। যতই ওর মা মুখে বলুন সুমিত তাঁর ছেলে। যখন ইচ্ছে হবে সুমিত সেখানে যেতে পারে। তার পক্ষে আর সুমিতের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়। অপমান যখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকে তখন অনেক কিছু সহ্য করা যায়। সুমিত সেটাকে বাইরে টেনে নিয়ে গেছে নিজের আখের গোছানোর লোভে।

জিনিসপত্র সবই সুমিতদের বাড়িতে। সেখানে যে এর মধ্যে সুমিত পৌঁছে যায়নি তার নিশ্চয়তা কোথায়? হাওড়া স্টেশন থেকে শেয়ালদায় চলে এল তিস্তা। তখন সে প্রায় বিধ্বস্ত। শ্যামনগরের টিকিট কেটে লোকাল ট্রেনে উঠে আঁচলটাকে ভাল করে শরীরে জড়িয়ে নিল। স্টেশন থেকে বাড়ি বেশ দূরে নয়। লাইন ধরে হেঁটে গেলে কয়েক মিনিট। কিন্তু তবু রিকশা নিল সে। ছাউনিটাকে তুলে দিল। গঙ্গার ধারে বাবার নতুন বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ার আগেই সেটা খুলে গেল, 'আয়।'

মা দাঁড়িয়ে। তিস্তা তাকাল। চোখ সরিয়ে ভেতরে চলে যাওয়ার আগে মা বলে গেল, 'দরজাটা বন্ধ করে দে।'

'বাবা—?'

'থানায় গিয়েছে।'

'থানা?' চমকে উঠল তিস্তা।

'একটু আগে সুমিত এসেছিল। ঝামেলা করে গিয়েছে।'

দরজা বন্ধ করার কথা আর মাথায় রইল না। ধপ করে বাইরের ঘরের সোফায় বসে পড়ল তিস্তা। তাহলে ওরা তার আগেই এখানে পৌঁছে গিয়েছে? কী ঝামেলা করেছে সুমিত যে বাবাকে থানায় যেতে হল।

'সঙ্গে জিনিসপত্র নেই?' মা আবার ভেতরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

নিঃশব্দে মাথা নেড়ে না বলল তিস্তা।

'বাথরুমে যা। স্নান কর। আমি শাড়ি জামা বের করে দিচ্ছি।' মা আবার চলে গেল। তিস্তা অবাক হচ্ছিল। মা তার কাছে কিছুই জিজ্ঞাসা করছে না। কেন এমন হল, কীভাবে সে ফিরেছে, কিছুই না। কিন্তু স্নান শব্দটা তিস্তাকে অনুপ্রাণিত করল। সে শরীরটাকে তুলল।

একটু পরে বাথরুমে দাঁড়িয়ে ওপর থেকে নেমে আসা জলের ঢল শরীরে ছড়িয়ে বন্ধ করে কেঁপে উঠল তিস্তা। সেই অবস্থায় মাথা ঝাঁকাল সে। না। আর কখনও পেছন দিকে তাকাবে না সে। এতদিনের সব কিছু নেহাৎই ভুল। যা ভুল তা ভুলে যাওয়াই ভাল।

তার নিজস্ব পোশাক মায়ের কাছে থাকার কথা নয়। কানপুরে যখন ছিল তখন তো স্কার্ট পরত। বাবা শামনগরে বাড়ি করার পর যে কদিন এসেছে কিছু রেখে যাওয়ার কথা মনে হয়নি। এই শাড়ি যা তার শরীরে, তা মায়ের শাড়ি। জামাটাও। কিন্তু এগুলো প্রায় নতুন এবং রঙিন। মা আজকাল রঙিন কিছু ব্যবহার করে না। তাহলে কি অনেককাল আগে কেনা এবং মায়ের সঞ্চয়ে ছিল? আজ চমৎকার কাজে লেগে গেল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে তিস্তার মনে হল তার প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে। সে আর দাঁড়াতে পারছে না। মা এককাপ চা এগিয়ে দিতে সে চুমুক দিল কিন্তু তবু বিছানা টানতে লাগল

ওকে। আধকাপ খেয়ে সে মায়ের বিছানায় উপুড় হল।

ঘুম ভাঙল যখন পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে গেছে। দূরে কোথাও মাইকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান হচ্ছে। একটানা ঘুমাবার পরেও মনে হচ্ছিল আরও ঘুমালে ভাল লাগত। জোর করে উঠে পড়তেই বাবাকে দেখতে পেল সে। ঘরের এক কোণে চেয়ারে বসে আছেন গালে হাত দিয়ে। তাকে উঠতে দেখে সোজা হলেন।

হঠাৎ এক ধরনের লজ্জা, ভয়, নিজের ওপর ঘেন্না মেশানো অনুভূতি আক্রমণ করল তিস্তাকে। হাঁটুতে মুখ রেখে কেঁদে উঠল সে। এবং একবার কান্না শুরু হতেই সে আবিষ্কার করল ব্যাপারটা তার নিয়ন্ত্রণে নেই। বুকের আনাচে কানাচে যেন অনেক জলের ধারা এতকাল মুখবন্ধ অবস্থায় ফুঁসছিল, আজ হঠাৎ আড়াল সরে যেতে সেগুলো সে তীব্রবেগে বেরিয়ে আসতে লাগল তাকে নিয়ন্ত্রণ করা ওর সাধ্যের বাইরে। হঠাৎ একটা চাপা ধমক কানে এল, 'তোর লজ্জা করছে না'? তুই কাঁদছিস? ছিঃ ওঠ্! বাথরুম থেকে ঘুরে আয়। তোর বাবা না খেয়ে বসে আছে। বাইরের অপমানের জবাব বাইরে না দিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে তিনি কেঁদে চলেছেন! আশ্চর্য!'

বুক ভারী, নিঃশ্বাসও, কিন্তু কান্নাটা বন্ধ হল। তিস্তা উঠল। বাবার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি একটাও কথা বললেন না। বাথরুম থেকে ফিরে সে দেখল বাবা খাওয়ার টেবিলে বসে গেছেন।

তিস্তা দাঁড়িয়েছিল। প্লেটে খাবার দিতে দিতে মা ডাকলেন, 'আয়।'

তিস্তা এগিয়ে এসে বাবার উল্টোদিকে বসল। তিনজন মানুষ চুপচাপ খেয়ে গেল। একটুও ইচ্ছে করছিল না, মায়ের ধমক খেয়ে গিলতে হল তিস্তাকে। খাওয়া যখন প্রায় শেষ তখন বাবা বললেন, 'কাল তোমাকে থানায় যেতে হবে। আমি ডায়েরি করেছিলাম তুমি মিসিং বলে। কেন কী অবস্থায় পড়ে তোমাকে এভাবে আসতে হল তার একটা স্টেটমেন্ট তৈরি করে কাল থানায় নিয়ে যাবে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট।'

মাথা নেড়েছিল সে। বাবা শেষপর্যন্ত তার সঙ্গে কথা বললেন, এই স্বস্তিতে।

মায়ের পাশে শুয়েছিল সে। শুয়েছিল কিন্তু ঘুমাতে পারছিল না হঠাৎ মনে হচ্ছিল পৃথিবীর কোথাও তার জন্যে একটুও ঘুম নেই। ঘরে নীল আলো জ্বলছে। মা একটা হাত ভাঁজ করে চোখের ওপর রেখেছে। তিস্তা ভেবে পাচ্ছিল না এরা কেন তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করছে না! ব্যাপারটা যত ভাবছিল তত অস্বস্তি বাড়ছিল। সে মায়ের দিকে তাকাল। তারপর চুপচাপ বিছানা থেকে নামল।

ছেলেবেলা থেকেই সে দেখেছে বাবা এবং মা একসঙ্গে শোয় না। তখন একঘরে দুটো খাট ছিল। এখন ঘর বেশি বলেই আলাদা ঘর। তার মনে পড়ল না কখনও বাবার সঙ্গে মাকে ঝগড়া করতে শুনেছে। বাবা মাকে কখনও তার সামনে একটা কড়া কথা বলেননি। তবু এমন আলাদা হয়ে থাকে কেন দুটো মানুষ তা বুঝতে পারে না তিস্তা।

বাবার ঘরে অন্ধকার। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বাবার মাথার পাশে বসল সে। ওর ধারণা সত্যি হল। বাবা জেগেই ছিলেন। বাবার একটা হাত তার পিঠে উঠে এল। তিস্তা নিচু গলায় বলল, 'বাবা, আমি হেরে গেলাম।'

তাকে প্রচণ্ড অবাক করে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিসে?'

নাড়া খেল তিস্তা। সত্যি তো, কিসে হারল সে? কোন খেলায়? যেটা নেহাতই একতরফা, অসম, সেই খেলায় হারজিতের কী দাম আছে?

'তোর জন্ডিসের পরে হাসপাতালে যে প্রশ্নটা করেছিলাম সেটার উত্তর এখনও দিতে হবে না তোকে। আজ আমি অন্য প্রশ্ন করছি। তুই কি সব শেকড় তুলে এসেছিস?'

'বাবা, বিশ্বাস করো, আমার কোন অর্থেই ওখানে শেকড় নামাবার সুযোগ হয়নি। আমার অস্তিত্বই

টলমলে ছিল। এখন আমি সব ভুলতে চাই।'

'ভুলতে পারবি?'

'হ্যাঁ।'

'সুমিত তোকে সহজে ছেড়ে দেবে না।'

'কী করবে? জোর করে নিয়ে যেতে নিশ্চয়ই পারবে না।?'

'না। তা পারবে না। এই সুমিত তোর অচেনা ছিল, না?'

'হ্যাঁ বাবা। বিয়ে আগে ও এরকম ছিল না।'

'ঠিকই। আমরা সবাই চিরকাল একরকম থাকি না। যা শুয়ে পড়।'

'আর ঘুম আসছে না বাবা।'

'মন থেকে ভাবনা সরিয়ে ফেল, ঘুম এসে যাবে।'

হঠাৎ কি হল, তিস্তা বাবার পাশে শুয়ে পড়ল, 'তুমি তা হলে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দাও, আগের মতন।'

শ্যামনগর থানার দারোগা স্টেটমেন্ট পড়লেন। তারপর বললেন, 'এসব যদি ঘটে থাকে তা হলে জল অনেকদূর গড়াবে। ভেবে দেখুন, পরে স্বামীর কাছে সারেন্ডার করবেন না তো! এখনও সময় আছে।'

তিস্তা বলল, 'না।'

দারোগা বললেন, 'তবু ভাবতে বলছি। বাঙালি মেয়েদের তো জানি। মার খাচ্ছে, কপাল ফাটছে কিন্তু স্বামী নরম গলায় ডাকলেই ছুটে যাচ্ছে।'

'আমি সে ধরনের মানুষ নই।'

'আচ্ছা। কিন্তু মুশকিল হল আপনার অভিযোগ পেয়ে সুমিতবাবুকে আমি অ্যারেস্ট করতে পারি। কিন্তু কোর্টে আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না কিছুই। কারণ কেউ সাক্ষী দেবে না যে রঙ্গলালের কাছে সুমিতবাবু আপনাকে—। বুঝতেই পারছেন। শ্বশুরবাড়িতে যে অত্যাচার করা হত তারও কোনো প্রমাণ নেই। আছে?'

হঠাৎ মঙ্গলার মুখে মনে এল। মঙ্গলা কি সাক্ষী দেবে?

'তাছাড়া ওরা অনেক কথা বলবে। আপনি কিছুদিন আগে অ্যাবরশন করিয়েছেন যখন সুমিতবাবু কলকাতায় ছিল না। যতই জোর করে ওরা করাক কোনো ডাক্তার সেটা স্বীকার করবে না। আপনি অ্যাডাল্ট, নিজের ইচ্ছেয় করেছেন। কারণ সুমিতবাবুকে আপনি পছন্দ করতেন না। কোর্টে এটা আপনার বিপক্ষে যেতে পারে। বিচারকদের তো সেন্টিমেন্ট আছে।'

বাবা পাশে বসেছিলেন, 'তা হলে?'

'একমাত্র আপনার বাড়িতে ওর হামলা যা প্রতিবেশীরা দেখেছে তা নিয়ে কিছু করার চেষ্টা করা যেতে পারে।'

'আমি ডিভোর্স চাইছি।' তিস্তা বলল।

'চাইতে আপনি নিশ্চয়ই পারেন। কোন্ গ্রাউন্ডে?'

'অত্যাচার।'

'আবার বলছি প্রমাণ করতে পারবেন না।'

বাবা বললেন, 'সুমিত কি জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে?'

দারোগা মাথা নাড়লেন, 'না, পারে না। আর সেই চেষ্টা করলে আমি ওকে ছেড়ে দেব না, এটুকু কথা আপনাদের দিচ্ছি।'

অদ্ভুত হতাশায় আক্রান্ত হচ্ছিল তিস্তা। ফিরে আসার সময় রিকশায় বসে কথা বলতে পারছিল

না। বাবা বসেছিলেন গম্ভীর মুখে। দারোগা যা বললেন সেটা যুক্তির কথা। তুমি আবেগে আক্রান্ত হয়ে কাউকে জীবনের সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করতে পার কিন্তু বাস্তবের আঘাতে যদি শেষ পর্যন্ত চোখ খুলে যায় তা হলে নিজস্ব অস্তিত্ব আলাদা করতে পারবে না। আইন নামক মস্তিষ্ক-জাত সাঁড়াশির হাত একটুও আলগা হবে না যতক্ষণ তুমি স্বপক্ষে প্রমাণ হাজির করতে পারছ।

তিস্তা মাথা নাড়ল। এসবে কী এসে যায়। সুমিত তার কাছে মৃত। একটি মৃত মানুষকে নিয়ে এত ভাবনা ভাবার কোনো দরকার নেই।

অথচ ভাবতে হল। পরদিন সকালে সুমিত এল একটা অ্যাম্বাসাডারে চেপে। সঙ্গে আরও তিনজন লোক। তারা গাড়ি থেকে নামল না অবশ্য। বাবাই দরজা খুলেছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কী চাই?'

সুমিত হেসেছিল, 'আচ্ছা! শুনুন, যা হবার তা হয়ে গেছে। মানুষমাত্রই ভুল কাজ করতে পারে, হয়তো আমিও করেছি।'

বাবা মাথা নেড়েছিলেন, 'আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। তুমি আমার বাড়িতে কখনও আসবে না।'

'আশ্চর্য! আমার স্ত্রী আপনার বাড়িতে থাকলে আমাকে আসতেই হবে। কথাবার্তা একটু স্বাভাবিকভাবে বলুন!' শেষের দিকে সুমিতের গলায় তরল সুর।

তিস্তা ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়েছিল। লোকটা কী চায় সে বোঝার চেষ্টা করছিল। বাবা না ডাকলে ভেতরে যাবে কি না বুঝতে পারছিল না। সুমিতের সামনে দাঁড়াতে তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে করছিল না। এত কাণ্ডের পরে কেন এল ও? কিন্তু তখনই তার পাশ দিয়ে মা ঘরে ঢুকল, 'ওকে ভেতরে এসে বসতে বলো। যা বলার ভদ্রভাবে বলুক।' কথা শেষ করেই মা আবার গম্ভীর মুখে ভেতরে চলে গেল। বাবা দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন।

সুমিত ভেতরে ঢুকে সোফায় বসল, 'আপনার মেয়েকে ডাকুন।'

'কেন?'

'বাঃ, আমি এসেছি, আমার সঙ্গে ওকে যেতে হবে।'

'না, সে যাবে না।'

'আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই। সে আমার স্ত্রী। আপনি কেন খামোখা আমাদের মধ্যে আসছেন? যান, ডাকুন।'

তিস্তা আর পারল না। ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে বলল 'কী চাও?'

'তোমাকে।'

যেন চাবুকের আঘাত পড়ল সারা শরীরে, চোখ কুঁচকে উঠল উত্তরটা শুনে। সুমিত বলল, 'মিসআন্ডারস্টান্ডিং হয়ে গেছে। লালের কথাবার্তা ঠিক নেই। কী বলতে কি বলেছে। চলো, ফিরে যাবে।'

'শোনো সুমিত। আমি তোমাকে ঘেন্না করি। তোমার সঙ্গে আর আমার থাকা সম্ভব নয়। তুমি তোমার কাজ করো, আমাকে বিরক্ত কোরো না।' তিস্তা স্পষ্ট বলল।

'তুমি আমাকে ঘেন্না করো?'

'হ্যাঁ।'

'কারণটা জানতে পারি?'

'তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছ? নিজে জানো না?'

'না।'

'আমি তোমাকে কোনো ব্যাখ্যা দেব না।'

'আমি জানি না তোমার কাছে কী অপরাধ করেছি কি কিন্তু আমাকে না বলে সন্ধেবেলায় লালের মহল থেকে বেরিয়ে কার সঙ্গে বাইরে রাত কাটিয়েছ তা নিয়ে কিন্তু আমি কোনো প্রশ্ন তুলছি না। আমি বলছি, সব ভুলে যাও, ফিরে চল।'

'তুমি এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।'

'রাগ করছ!'

'বেরিয়ে যাও।' চিৎকার করল তিস্তা।

'চেঁচাচ্ছ কেন? আমি তো বেরিয়ে যেতে আসিনি।'

'আমি পাড়ার লোক ডাকব।'

'কোনো লাভ হবে না। আমার সঙ্গে যে তিনজন এসেছে তারা ওদের দাঁড়াতে দেবে না। শোনো, আমি লালকে কথা দিয়ে এসেছি, তোমাকে আমার সঙ্গে ফিরে যেতে হবে। নইলে ম্যাডাম ফিরে এসব জানতে পারলে ঝামেলা করবেন।'

তিস্তা ঘুরে দাঁড়াল, 'বাবা, তুমি এখনই থানায় যাও। অফিসার কথা দিয়েছেন প্রটেকশন দেবেন।'

'বাঃ। এর মধ্যে থানায় যাওয়া হয়েছিল নাকি? কোন্ অফিসার? গাড়িতে বসা ছেলেরা একবার থানায় গেলে লোকটাকে আর চিনতে পারবে না তা জানো? থানা দেখাচ্ছে!' সুমিত উঠে এগিয়ে এল, 'চলো!'

'খবরদার সামনে আসবে না।'

'কী করবে? খুন করবে নাকি?' সুমিত হাসল।

'সেটা করলে বেশি মর্যাদা দেওয়া হবে।'

'আচ্ছা! তিস্তা। আমার চাকরির জন্যে তোমাকে আমার দরকার। এটা একটা সহজ সত্যি কথা। কিন্তু যদি না পাই তা হলে আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না। তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত অ্যাসিডে পুড়িয়ে দেব। তারপরও বাঁচলে বাঁচবে, মরলে মরবে। আমি তোমাকে সাতদিন সময় দিলাম।' আচমকা ঘুরে বেরিয়ে গেল সুমিত। গাড়ি চালু হবার আওয়াজ হল। শব্দটা মিলিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিল তিস্তা। তার চোখের সামনে দিয়ে বাবা বেরিয়ে গেলেন। মা এল পাশে, 'তোর বাবা কোথায় গেল?'

নীরবে জানি না বলল তিস্তা।

'ওর এই স্বভাবের কথা তুই জানতিস না?'

চোখ বন্ধ করল তিস্তা। তারপর চোখের জল চাপতেই ঘন ঘন মাথা নাড়ল।

'তোর কিছুদিন এখানে থাকা উচিত না।'

'মানে?'

'সুমিত যা বলল তাই করবে।'

'কী বলছ তুমি? এটা কি মগের মুলুক।'

'আজ যদি ওর সঙ্গীরা ঘরে ঢুকে তোর ওপর অত্যাচার করত কি করতে পারতাম আমরা। চেঁচাতাম। লোক জড়ো হত। কিন্তু যদি ওরা গুণ্ডা হয় তা হলে ঠিক ফিরে যেত।'

'তাই হলে তাই হোক। আমি কোথাও যাব না।'

'বোকার মতো কথা বলিস না। সব সময় জেদ ধরে থাকলে চলে না। তোকে যদি ডিভোর্স পেতে হয় তা হলে বুদ্ধি খাটাতে হবে।'

'কি করে?'

'তোর মাসিমার দেওর খবরের কাগজে কাজ করে। খুব নামকরা রিপোর্টার। তুই তো যাস না, তাই জানিস না। এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে ওরাই। ওর কাছে যেতে হবে আমাদের।' মা বলল।

'তুমি যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ভদ্রলোক কী করতে পারেন?'

'কলকাতা শহরে তোর বাবার বেশি চেনা মানুষ নেই। পরামর্শ নেবার জন্যে কার কাছে যাওয়া দরকার তাও জানা নেই। মান্তুর দেওর হয়তো সেটা দিতে পারবে।'

বাবা থানা থেকে ফিরে এসেছিলেন গম্ভীরমুখ নিয়ে। দারোগা তাঁকে বলেছেন চব্বিশ ঘণ্টা পুলিশ পোস্টিং দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সুমিত আসামাত্র যদি তাঁকে জানানো হয় তা হলে তিনি ব্যবস্থা নিতে পারেন। ভদ্রলোকের কথায় আজ একটুও আশার আলো দেখতে পাননি বাবা।

মায়ের প্রস্তাব শুনে বাবা প্রথমে আপত্তি করেছিলেন, 'ওকে নিয়ে যেও না।'

'কেন?'

'বলা যায় না কিছু। যেটা বাড়ি বয়ে এসে বলে গেল রাস্তায় পেলে যদি সেটাই করে ফেলে! আমার আর কিছু ভাল লাগছে না। দেশটা কোথায় গেল।'

মা বলল, 'যাওয়ার সময় তো দিয়ে গিয়েছে। তাছাড়া নিশ্চয়ই সব জায়গায় ওঁত পেতে বসে নেই।'

বাবাকে সঙ্গে নেওয়া হল না। বাবা যেন আর টেনশন সহ্য করতে পারছিলেন না। দুপুরে মাকে নিয়ে তিস্তা বের হল। বাইরে পা দিয়েই তার অদ্ভুত অস্বস্তি হচ্ছিল। যে কোন মুহূর্তে কেউ তাকে আক্রমণ করতে পারে, ক্ষতি করতে পারে এমন একটা ভয় প্রবল হচ্ছিল। শেয়ালদায় নেমে ওরা ট্যাক্সি নিল। বারংবার পেছনে তাকিয়ে সে নিঃসন্দেহ হল সুমিত বা কেউ তাদের অনুসরণ করছে না। ধর্মতলায় খবরের কাগজের অফিসের চারতলায় উঠে মাসির দেওরকে দেখে সে বেশ হতাশ হল। একটা বড় হলঘরে অনেক কর্মীদের সঙ্গে বসেছিলেন তিনি। চেহারাও সাধারণ। পরিচয় দিতে হল মাকে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বললেন, 'ছি ছি আপনি কষ্ট করে কেন এলেন! কী অবস্থা দেখুন, আপনি বউদির দিদি অথচ আমাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগই নেই।'

মা বললেন, 'চিরকাল বাইরে থেকেছি, সেটাই কারণ।'

ভদ্রলোকের নাম সুখেন্দু রায়। ওদের নিয়ে এলেন একটি নির্জন ঘরে। বললেন, 'সমস্যা কী বলুন।'

মা সব কথা পরিষ্কার বলে গেলেন। ভদ্রলোক একটা কাগজে নোট করে যাচ্ছিলেন। তিস্তার মনে হল সাংবাদিক হিসেবে উনি ওই অভ্যেসটা রপ্ত করেছেন। মায়ের কথা শেষ হবার পর সুখেন্দু তিস্তাকে কিছু প্রশ্ন করলেন। রঙ্গলাল এবং তার ব্যবসা ছাড়াও সুমিতের বাড়ির কথা জানতে চাইলেন। তারপর অপারেটারকে একটা নাম্বার দিতে বললেন। উল্টো দিকের মানুষটির সাড়া পেলে প্রথমে সামান্য খোশগল্প করে বললেন, 'একটা উপকার করতে হবে। আমার এক আত্মীয়া তার স্বামীর অত্যাচারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। ও এখন আছে শ্যামনগরের বাপের বাড়িতে। আমি আপনাকে নাম-ঠিকানা দিচ্ছি, আপনি শ্যামনগর পি এস-কে যদি একটু বলে দেন ওদের প্রটেক্ট করতে। হ্যাঁ, ওখানে গিয়ে হুমকি দিয়ে এসেছে। কলকাতায়। মানিকতলার কাছে। হ্যাঁ আমি ডি সি নর্থকে বলছি। হ্যাঁ, নাম-ঠিকানা লিখে নিন।' সুখেন্দু টেলিফোনে সব জানিয়ে দিয়ে রিসিভার রাখল।

মা জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা এখন কী করব?'

'কী চান আপনারা?'

'কী করা সম্ভব?'

'সুমিতকে পুলিশ থানায় এনে শাসিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হবে না। তবে এখন আপনারা কদিন শ্যামনগর পুলিশের সাহায্য পাবেন। তুমি কী করতে চাও বলো?' এবারের প্রশ্নটা তিস্তাকে।

'ডিভোর্স।'

'দ্যাটস নট ভেরি ইজি থিং, যদি ও কনটেস্ট করে। আমার মনে হয় সেটা ও করবেই। এদেশে অপরাধীরাও আইনের ফাঁককে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে মাথা তুলে ঘুরে বেড়াতে পারে। সোজা পথে তাই কাজ হবে না। আপনাদের ভাল উকিল জানা আছে?'

'না।'

'বেশ। আমি একজনের কাছে আপনাদের পাঠাচ্ছি। ভদ্রলোক খুব সাহায্য করবেন। কেসের কাগজ জমা হয়ে গেলে তোমাকে কিছুদিনের জন্যে কলকাতা মানে শ্যামনগর ছাড়তে হবে।'

'কেন?' তিস্তা জানতে চাইল।

'মরিয়া হয়ে গেলে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। তখন সে কী করবে তুমি জানো না।'

'কিন্তু আমি কোথায় যাব?'

'মাণ্ডর কাছে চলে যা।' মা বলল।

'বাঃ। ভালো। দাদা বউদির শান্তিনিকেতনের বাড়ি একদম খালি। খুব খুশি হবে তোমাকে দেখে। তাছাড়া কলকাতার কাছাকাছি থাকা ভাল, কখন প্রয়োজন হবে কে বলতে পারে। দিদি, আপনি চিন্তা করবেন না ডিভোর্সে ও যাতে কনটেস্ট না করে আমি চেষ্টা করব।' সুখেন্দু একটা কাগজে উকিলের নাম-ঠিকানা লিখে দিল।

মা বলল, 'যে ছেলে নিজের বাবা মা বউ-এর কথা শোনে না তাকে কি রাজি করানো যাবে? আমার বিশ্বাস হয় না।'

সুখেন্দু বলল, 'ঠিকই। তবে এমন কেউ কেউ আছে যার কথা না শুনলে ও চোখে সরষের ফুল দেখবে। জলে বাস করে কেউ কুমিরের সঙ্গে মারপিট করতে চায় না। ওর কুমিরটি নানা কারণে আমাকে খাতির করেন। তাঁকে বলব।'

তিস্তা অবাক, 'কুমির মানে?'

'পলিটিক্যাল লিডার।' সুখেন্দু জবাব দিয়েছিল।

অদ্ভুতভাবে সব পাল্টে গেল। শান্তিনিকেতনে তিস্তা ছিল মাস দেড়েক। সেই সময় মাসির অনেক অনুরোধেও বাড়ি থেকে বের হত না। বই নিয়ে বসে থাকত প্রায় সবটা সময়। তারপর খবর এল সুমিত রাজি হয়েছে ডিভোর্সের জন্যে যৌথ আবেদনে সই করতে। সে কোনো ক্ষতিপূরণ করবে না এবং বাধাও দেবে না ডিভোর্স কার্যকরী হতে। বিশ্বাস করতে যতই অসুবিধে হোক ব্যাপারটা ঘটে গেল। অবশ্য তদ্দিনে কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়ে ফেলেছে তিস্তা। এ সবই সম্ভব হল সুখেন্দুর জন্যে। এক বিশেষ রাজনৈতিক নেতার ছেলেরা তুলে নিয়ে গিয়েছিল সুমিতকে। নেতা তাকে বলে দিয়েছিলেন কী করতে হবে। না করলে কী হবে তাও জানিয়েছিলেন। সুমিত আর বোকামি করেনি।

তিস্তা মাঝে মাঝে একটা কথা ভেবে অবাক হয়। এই যে এত কাণ্ড হল, আদালতে বারংবার যেতে হল কিন্তু তার শাশুড়িঠাকরুণ একবারও দেখা দিলেন না। তিনি ইচ্ছে করলে স্বচ্ছন্দে

যোগাযোগ করতে পারতেন। নিজে না পারুন, মঙ্গলাকে পাঠাতে অসুবিধে ছিল না। কিন্তু তিনি এ সব কিছুই করেননি। এই যে অদ্ভুত নির্লিপ্ত হয়ে থাকা, এর কারণ কী? তাঁর ব্যবহারে মাঝে মাঝে অনেক নির্মম ব্যাপার দেখলেও তিস্তার সঙ্গে ভাল ব্যবহারও করেছেন। তাই ছেলে অন্যায় করছে জানলে তাঁর তো আরও সক্রিয় হবার কথা। নাকি বড়ছেলেকে তিনি পছন্দ করতেন না এটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। যখনই সেটা পারিবারিক সম্মানের মুখোমুখি হল তখনই তিনি পুত্রকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করবেন? এছাড়া ওঁর ব্যবহারের কোনো ব্যাখ্যা তিস্তার মনে এল না।

জীবনটা অদ্ভুত হাল্কা হয়ে গেল তিস্তার। যে ঝড় এই কয়েক বছরে তার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে তা থেমে যাওয়ার পর অদ্ভুত শান্ত যেন চারধার। প্রেম ভালবাসা সম্পর্কে বই-এর পাতায় ছড়ানো ব্যাখ্যাগুলোর কথা ভাবলে নিঃশ্বাসে কষ্ট জমে। রবীন্দ্রনাথের গান শুনলে বুক ভার হয়। যা স্বাভাবিক এবং সত্যি তা কি রকম করে ওর জন্যে মিথ্যে হয়ে গেল।

এবার সে মুক্তনারী। মুক্তি মানে আরও বেশি দায়িত্ব। এই কয়েক মাস অথবা বছরের টানাপোড়েনে তিস্তার আয়ের উৎসগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। নতুন করে টিউশনি হয়তো খোঁজা যায় কিন্তু তাতে সে উৎসাহ পাচ্ছিল না। একটি ভদ্রগোছের চাকরি চাই। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে কার্ড করা, কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত পাঠানোর প্রচলিত পদ্ধতিগুলো যে শুধুমাত্র হতাশা বাড়ায় তা আর একবার প্রমাণিত হল। স্কুলের মাস্টারি থেকে সাবান কোম্পানির বিক্রেতা, কোনো চাকরির জন্যেই সে পিছুপা হয়নি। ইন্টারভিউ পেয়েছিল গোটাদুয়েক। একটা বিক্রেতা নেবে কমিশনে, আর একটা সওদাগরী অফিসের কেরানি। দু জায়গায় শেষ প্রশ্ন, 'আপনি ডিভোর্সি?'

'হ্যাঁ।'

'কে করল? আপনি না তিনি?'

'কেন বলুন তো?'

'ব্যাপারটা জানা দরকার।'

'আমি বুঝতে পারছি না, এই চাকরির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক।'

'আপনি একটা ঘর বাঁচাতে পারেননি, চাকরি বাঁচাতে পারবেন কি না সেটা জানতে চাইব না?' দু জায়গায় শব্দগুলো একটু অদলবদল হয়ে উচ্চারিত হয়েছিল।

কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় যাওয়া বন্ধ। বাড়িতে বসে থাকলে কেউ চাকরি দেবে না। তিস্তা রোজ কলকাতা আসে। কিছু না থাক ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি আছে। একদিন সে লাইব্রেরির সামনে পৌঁছতেই একটা দামি গাড়ি পাশে এসে দাঁড়াল, 'আমরা কী দোষ করেছি সেটা বুঝতে পারছি না।'

চমকে তাকিয়ে তিস্তা অবাক হল, 'আরে আপনি?'

'হ্যাঁ, আমি। কিন্তু ভাই তুমি না বলে চলে এলে কেন?'

'আই অ্যাম সরি। হঠাৎ জীবনে এমন ঝড় উঠল যে, সব টালমাটাল হয়ে গিয়েছিল। পরে ভেবেছিলাম কিন্তু—! ভাবীজি কেমন আছেন?'

'ভাল। বাচ্চারাও ভাল। এখানে?'

'সময় কাটাতে। চাকরি খুঁজছি।'

'তাই নাকি?' শাওনরাম চোখ বন্ধ করলেন, 'গ্র্যাজুয়েশন হয়নি?'

'হ্যাঁ। হয়েছে।'

'এসো। আমাকে একটু জলদি বাড়ি ফিরতে হবে। তুমি আমার সঙ্গে গেলে গাড়িতে বসে কথা হবে।' ভদ্রলোক পাশের দরজা খুলে দিলেন।

একটু দ্বিধা মনে এল না। লাইব্রেরিতে তার জরুরি কাজও ছিল না। গাড়ি চালাতে চালাতে

শাওনরামজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় আছ?'

'শ্যামনগরে। বাবার কাছে।'

'হাউ অ্যাবাউট ইওর হাসব্যান্ড?'

'আমরা ডিভোর্সড।'

শাওনরামজী তাকালেন কিন্তু কিছু বললেন না।

'মেয়েদের নিশ্চয়ই কেউ পড়াচ্ছে?'

'হ্যাঁ। তবে তোমার ভাবীজির আর ইংরেজি শেখা হল না। তিস্তা, তুমি কী ধরনের চাকরি খুঁজছ?'

'যে কোনো ভদ্র চাকরি।'

'ভদ্র? দ্যাখো, আমি তোমাকে আমার কোম্পানিতে নিতে পারতাম! কিন্তু সেটা নেওয়া ঠিক হবে না! অন্যায় করব।'

'কেন?' তিস্তা অবাক।

'তোমার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হবে।'

'কেন?' আরও জোরে উচ্চারণ করল তিস্তা।

'প্রথমত কাজে ভুল হলে তোমাকে কড়া কথা বলতে আমার অসুবিধে হবে যা অন্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে হবে না। দ্বিতীয়ত তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে অফিসে আছে অথচ তাকে কোনভাবে ব্যবহার করছি না এটা আমার বন্ধুরা মানতে চাইবে না। লোকে যাকে খারাপ লোক বলে আমি প্রায় তাই! সব গুণ আমার মধ্যে আছে।' শাওনরাম বললেন।

'আপনি আজেবাজে কথা বলছেন।'

'না। তোমার ভাবীজিকে জিজ্ঞাসা করে দেখো। ওয়েল, আমি তোমাকে একটা ভালো জায়গায় পাঠাব। এম. ডির বয়স আশি। ওর ছেলে সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছে। মনে হয় সেফ থাকবে।

সেদিন শাওনরামজী ওকে সোজা থিয়েটার রোডের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভাবীজি খুব খুশি। পেট ভরে খাইয়েছিলেন। সে যখন ভাবীজির সঙ্গে গল্প করছে তখন শাওনরামজী আবার বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার আগে একটা ঠিকানা দিয়ে বললেন, 'তুমি এখনই দেখা করো। গুড লাক।'

অফিসটা ক্যামাক স্ট্রিটে। ভাবীজির বাড়ি থেকে দূরে নয়। আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিস্তা ক্যামাক স্ট্রিটে এল। দশতলা বাড়ির চারতলায় অফিস। ঢোকার আগেই বাহার দেখে তিস্তা বুঝল কোম্পানির অবস্থা বেশ ভাল। স্লিপ দিয়ে মিনিট পনেরো অপেক্ষা করার পর জুনিয়রের সামনে সে পৌঁছতে পারল। তিস্তার মনে হল ছেলেটি তার চেয়ে বয়সে ছোট। ঠাণ্ডা ঘরে বসে ছেলেটি প্রশ্ন করল, 'এনি এক্সপেরিয়েন্স?'

তিস্তা মাথা নাড়ল, না নেই।

'গ্র্যাজুয়েট?'

'হ্যাঁ।'

'কোন্ কলেজ?'

'প্রেসিডেন্সি।'

'আই সি। আমরা ট্রান্সপোর্ট বিজনেসে আছি। প্রচুর ঝামেলা। আমার বাবার বয়স না হলে আমি নিজেই এসবের মধ্যে ঢুকতাম না। ছয় মাসে কিস্যু বুঝিনি। গোয়েঙ্কা কলেজে আছি এখনও। আপনার বুঝতে কতদিন লাগবে?'

'কী রকম কাজ সেটা না জেনে বলব কী করে?'

'বললাম তো বহুৎ ঝামেলার কাজ।' ছেলেটা একটা সিগারেট ধরালো। ওকে বেশ বেমানান লাগছিল। ধোঁয়া ছেড়ে ছেলেটি বলল, 'বাবা একটু আগে বললেন আপনি আসছেন। কত মাইনে চান?'

'আমি যে পোস্টে কাজ করব তার নিশ্চয়ই একটা স্কেল আছে।'

'না নেই। ওসব এখানে নেই। আমরা যাকে যেমন খুশি তেমন মাইনে দিই। আপনি জয়েন করলে এই অফিসে সেকেন্ড মেয়ে হবেন। কত হলে চলে?'

এই সময় ইন্টারকমে আওয়াজ উঠল। তড়িঘড়ি অ্যাসট্রেতে সিগারেট চেপে ছেলেটি রিসিভার তুলল, 'জী! হ্যাঁ, নিয়ে আসছি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল ছেলেটি, 'চলুন, বাবা এখন ফ্রি আছেন। শুনুন, বাবার মুখের ওপর একটা কথাও বলবেন না।'

সিনিয়ারের ঘরের দরজায় সোনালি ধাতুতে লেখা এম ডি। অফিসটা বেশ বড়। অন্তত জনা সত্তর মানুষ কাজ করছেন। টেলিফোন অপারেটার মহিলা ওর দিকে তাকালেন। এরা কি জেনে গেছে সে কেন এসেছে?

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই বৃদ্ধকে দেখতে পেল তিস্তা। বাঁ পা ভাঁজ করে চেয়ারের ওপর তোলা। খুব রোগা। পাকা চুল এবং পাকা গোঁফ অদ্ভুত কম্বিনেশন তৈরি করছে।

সিনিয়ার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোনো কথা বলেছ?'

জুনিয়ার মাথা নাড়ল, 'না।'

'তা হলে কী করছিলে এতক্ষণ?' খেঁকিয়ে উঠলেন সিনিয়ার। তারপর তিস্তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী নাম তোমার?'

তিস্তা নাম বলল। সিনিয়ারের সেটা পছন্দ হল বলে মনে হল না।

'শ্যাওন তোমাকে পাঠিয়েছে। গ্র্যাজুয়েট। ঠিক আছে। তুমি একটা দরখাস্ত লেখো। আমার কোম্পানিতে জুনিয়ার একজিকিউটিভ হিসেবে জয়েন করতে চাও। হ্যাঁ, চটপট এখানে বসেই লিখে ফেলো।' সিনিয়ার একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন।

সঙ্কোচ না করে লিখে ফেলল তিস্তা। লিখে এগিয়ে দিল। সিনিয়ার সেটা পড়লেন। মাথা নাড়লেন. 'গুড। কোনো ভুল নেই।'

জুনিয়ার দাঁড়িয়েছিল. বলল, 'প্রেসিডেন্সির স্টুডেন্ট।'

'তুমি জানলে কী করে?' সিনিয়ার তাকালেন।

'ওইটুকুই জিজ্ঞাসা করেছিলাম।' বিড়বিড় করল জুনিয়ার।

সিনিয়ার রুমালে নাক ঝাড়লেন। সর্দির ধাত আছে বোধহয়। তারপর বললেন, 'তুমি একুশশো পাবে। নো ডি.এ অর এনিথিং। যেমন কাজ করবে তেমন ইনক্রিমেন্ট হবে। তোমার কাজ হবে সমস্ত করেসপনডেন্স আপ-টু-ডেট রাখা। ওকে কোণের ঘরটা দেখিয়ে দাও।'

তিস্তার জীবনে প্রথম চাকরি। ওই ঘরে আরও তিনজন বসেন। তিনজনের বয়সই পঞ্চাশের কাছাকাছি। দু দিনেই তার টেবিলে ফাইলের পাহাড়। জবাব লিখতে তাকে প্রায় সিনিয়ারের ঘরে যেতে হচ্ছে। কোম্পানি কাকে কীরকম জবাব দিতে চায় তা তার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সিনিয়ার যতই বিশ্রী মেজাজের মানুষ হোন না কেন কাজের ব্যাপারে খুব সিরিয়াস। কোন পার্টি কেমন সেই বুঝে তাকে কী লিখতে হবে তার রীতিনীতি কয়েকদিন বলে দেবার পর তিস্তার নিজেরই আন্দাজ হয়ে গেল। এখন নেহাত আটকে না পড়লে তিস্তাকে সিনিয়ারের ঘরে যেতে হয় না। অফিসটা খারাপ নয়। কর্মচারীরা বেশ নিরীহ। ক্রমশ সে জানতে পারল কর্মচারীদের মধ্যে মাত্র চারজন দু

হাজারের ওপর মাইনে পায়। অথচ লোকগুলো কাজ করে মাথাগুঁজে, কোথাও কোনো প্রতিবাদ নেই।

একুশশো টাকা তিস্তার কাছে অনেক টাকা। শ্যামনগর থেকে পৌনে আটটায় বেরিয়ে আবার রাত সাড়ে সাতটায় ওই টাকার জন্যে বাড়ি ফেরা যায়। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে তিস্তা থিয়েটার রোডে গিয়েছিল। শাওনজী, ভাবী, মেয়েদের জন্যে টুকটাক উপহার নিয়ে গিয়েছিল। ভদ্রমহিলা খুব খুশি। বললেন, 'তোমার দাদা লোকটা অদ্ভুত। আমি আজও বুঝতে পারলাম না।'

'কেন?' তিস্তা হাসল।

'প্রায় তোমার কথা বলে। কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি না ভাবে। তোমাকে ও ঠিক বোনের মতো মনে করে। অথচ মেয়েদের সম্পর্কে ওর আসক্তি তুলনাহীন। ওর একটা অ্যালবাম আছে। আজ পর্যন্ত যত মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে তাদের প্রত্যেকের ছবি আছে সেখানে। ভাবতে পার?'

'যাঃ। আমি বিশ্বাস করি না।' জোর দিয়ে বলল তিস্তা।

'আমার বড় মেয়ে একদিন অ্যালবামটা দেখে ফেলেছিল। অত মেয়ের ছবি দেখে সে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ওর কারা। তোমার দাদা জবাব দিয়েছিল, এদের মধ্যে যে কেউ তোমার নতুন মা হতে পারত। হয়নি।'

'আমি ভাবতে পারছি না ভাবীজি।'

'কিন্তু তোমার ওপর ওর একদম অন্যরকম ধারণা। মেয়েদের বলে তিস্তা আন্টিকে দেখে শেখো। কীভাবে নিজে লড়াই করে যাচ্ছে।'

শাওনরামজীর কথা সেদিন বাড়ি ফেরার সময় বেশ কিছুক্ষণ ভেবেছিল সে। মানুষটা সত্যি অদ্ভুত। আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে এমন কোনো ব্যবহার করেনি যে, মনে খারাপ চিন্তা আসে। তার কাছে যে সত্যিকারের ভদ্রলোক হয়ে থাকে সেই মানুষের জীবনে ভাবীর কথানুযায়ী এমন নারীর পর নারী আসে কী করে? এত মানুষের সঙ্গে একের পর এক ঘনিষ্ঠতা করা যায়?'

তিন মাস চাকরির পর ঘটনাটা ঘটল। তিস্তা গম্ভীর, কাজের মানুষ, ব্যক্তিত্ব আছে এমন একটা ধারণা অফিসে চালু থাকায় ওব সুবিধেই হয়েছিল। শুধু মাঝে মাঝে জুনিয়ার তাকে ডেকে পাঠায় যখন সিনিয়ার অফিসে থাকেন না। ছেলেটার বয়স কম বলে মনে প্যাঁচ জমেনি তেমনভাবে। সিগারেট খেতে খেতে বলে, 'একা চা খাচ্ছিলাম তাই আপনাকে ডাকলাম। নিন, খান।'

'আমি একটু আগে চা খেয়েছি।'

'দূর। ওটা তো পাবলিকের চা। মুখে দেওয়া যায় না। এটা মকাইবাড়ির পাতা। খেয়ে দেখুন। কেমন লাগছে অফিস?'

'ভাল।'

'হ্যাঁ। বাবা আপনার কাজে খুব স্যাটিসফায়েড। আমার বাবাকে কী মনে হয় আপনার? রাবণের কটা মাথা ছিল? দশটা না? আমার বাবার একশটা। দশ ডবল রাবণ। সব জায়গায় চোখ আছে।'

মোটামুটি এই ধরনের কথাবার্তা হয়। নির্দোষ। কিন্তু এক দুপুরে সিনিয়ার অফিসে থাকা সত্ত্বেও জুনিয়ার তিস্তাকে ডেকে পাঠাল। উল্টোদিকের চেয়ারে বসে তিস্তা দেখল ছেলেটা সাদা রুমালে ঘাড় মুছছে।

'বলুন?'

'আমি একটা প্রবলেমে পড়ে গেছি। আপনি আমাকে হেলপ করবেন?'

'বলুন।'

'দুজনের একটা ফরাসি টিম আসছে কলকাতায়। যাদের সঙ্গে আমাদের ভাল ব্যবসা আছে। আপনি তো জানেন!'

'হ্যাঁ জানি। ওঁরা আজ সন্ধ্যায় কলকাতায় আসছেন।'

'হ্যাঁ। ওঁদের জন্যে দুজন একসর্ট ঠিক করে দিতে হবে।'

'একসর্ট?'

'হ্যাঁ। গাইড নয়। ওরা তো বেড়াতে আসছে না যে, গাইড দরকার। দে নিড একসর্ট ফর টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স। আমাদের এক কন্ট্রাক্ট আছে। কিন্তু গতবার ডেনমার্ক থেকে যে দলটা এসেছিল তাদের জন্যে লোকটা যাদের পাঠিয়েছিল তারা খুব সাবস্ট্যান্ডার্ড। যাওয়ার সময় সেটা বলে গিয়েছিল ওরা। তাই বাবা চান আগে থেকে সিলেকশন করে রাখা।'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'ওঃ। ইটস সো সিম্পল। আপনাকে গাড়ি দিচ্ছি। এই মেয়েগুলো পার্ক স্ট্রিটের একটা বাড়িতে তিনটের সময় অপেক্ষা করবে। আপনি তাদের মধ্যে থেকে দুজনকে সিলেক্ট করবেন যাদের ফরাসিরা পছন্দ করবে। আন্ডারস্টান্ডিং। দিস ইজ পার্ট অফ দি বিজনেস।'

'এসব করার জন্যে আমাকে চাকরি দেওয়া হয়নি।'

'আই নো, আই নো। ইটস এ রিকোয়েস্ট।'

'আপনি যাচ্ছেন না কেন?'

'কারণ আছে। তাছাড়া আপনি একজন মহিলা হিসেবে যেমন বুঝবেন সেটা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।'

'আপনার বাবা জানেন যে আপনি আমাকে ওই প্রস্তাব দিচ্ছেন?'

'ও সিওর। উনি বলেছেন কাজটি করতে হবে। কীভাবে করছ তা তোমার হেডেক। আমি শুধু রেজাল্ট দেখতে চাই।' জুনিয়ারের কথা শেষ হওয়া মাত্র উঠে দাঁড়াল তিস্তা। হনহন করে ওই ঘর থেকে বেরিয়ে সিনিয়ারের দরজায় পৌঁছে বেয়ারার বাধা পেল, 'মালিক বিশ্রাম করছেন।'

'বলো, খুব জরুরি।'

ঘরে ঢোকার অনুমতি পেলে তিস্তা সিনিয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। লম্বা বেতের ইজিচেয়ারের বৃদ্ধ শুয়েছিলেন, 'ইয়েস।'

'আমার পক্ষে এখানে আর চাকরি করা সম্ভব নয়।'

'কারণ?'

'আপনারা আমাকে যে কাজটা করতে বলেছেন সেটা—।'

'তোমাকে বলা হয়েছে সিলেকশন করতে সাহায্য করতে?'

'হ্যাঁ!'

'দুজনকে?'

'হ্যাঁ।'

'দুজন বিদেশির জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে তোমাকে বলা হয়নি ওদের এনটারটেইন করতে। বলা হয়নি কারণ তুমি শাওনরামের ক্যান্ডিডেট। অন্য কোনো অফিস হলে একজন প্রফেশনাল এসকর্টের টাকা বাঁচিয়ে তোমাকে পাঠাত। বুঝতে পারছ? তোমাকে সম্মান দেওয়া হয়েছে অথচ তুমি বুঝতে পারছ না।'

'আমি একটু কম বুঝি। তাই আমার পক্ষে এরপরে এখানে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। আমি কি যেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। তবে তার আগে তোমাকে একটা দরখাস্ত লিখতে হবে।'

'দরখাস্ত?'

'রেজিগনেশনের।'

মিনিট পনেরো পরে ক্যামাক স্ট্রিটের রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস ফেলল সে। চাকরিটা গেল। এক্শশো টাকায় বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল সে। শাওনজী নিশ্চয় এর মধ্যে সিনিয়ারের কাছ থেকে খবর পেয়ে গেছেন। হয়তো ওর ওপর রেগে যেতে পারেন। কিছু করার নেই তার। হঠাৎ মনে হল রঙ্গলাল কিংবা সুমিত এখন সব জায়গায় সক্রিয়। কিন্তু যেদিন কোনো নারীতে পুরুষের মন ভরবে না, যেদিন নারীমাংস সরবরাহ করে যখন ধান্দাবাজের লাভ হবে না সেদিন কীভাবে এরা বেঁচে থাকবে? দেড়শো জন্ম ধরে মানুষ যে কাজটা করে যাচ্ছে তার পূর্ণচ্ছেদে আর কত দেরি? সব কিছুর মতো এ ব্যাপারে একঘেয়েমি আসে না কেন?

দিনগুলো চলে যাচ্ছিল দিনের মত। চাকরি যে কারণে ছেড়ে এসেছে তা বাবার কাছে বলতে অসুবিধে হয়নি তিস্তার। তিনি বলেছিলেন, 'কিছু করার নেই। এইভাবেই কিছু মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকে, এইভাবেই কেউ কেউ তার মত প্রতিবাদ জানায়। তুই বরং এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়ে যা!'

এম. এ-র সেশন তখন মাঝপথে। তার রেজাল্টও এমন আহামরি নয় যে যাওয়ামাত্র বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ভর্তি করে নেবে। তিস্তার মাথায় বি সি এস পাক খাচ্ছিল। ঠিক তখনই তার কাছে একটা চিঠি এল। কলকাতার এক বিখ্যাত বিজ্ঞাপনসংস্থা তাকে দেখা করতে বলেছে।

ব্যাপারটা সে বুঝতে পারছিল না। এই সংস্থায় কাজ করে এমন কাউকে সে চেনে না। চাকরির আবেদন জানিয়ে সে কখনও ওখানে দরখাস্ত করেনি। এত বড় সংস্থা নিজে থেকে তার কাছে কেন চিঠি পাঠাবে তা সে বুঝতে পারছিল না।

নির্দিষ্ট দিনে সে বিজ্ঞাপন সংস্থার অফিসে হাজির হল। তাকে বলা হল অপেক্ষা করতে। তারপর যখন ডাক এল তখন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এক বিশাল ঘরে ঢুকে সে সৌম্যদর্শন এক ভদ্রলোকের মুখোমুখি হল, 'বসুন।'

তিস্তা বসল। ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি এখন কী করছেন?'

'আপাতত কিছুই না। আমি বুঝতে পারছি না কোন সূত্রে আমায় ডেকে পাঠানো হল। আমি তো এখানে কোন আবেদন করিনি।'

'করেননি। রাইট। বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে?'

'না। নেই। আমি এর আগে একটা অফিসে কাজ করেছিল কয়েক মাস।'

'আপনি ইন্টারেস্টেড?'

'কী ব্যাপারে?'

'কাজ শিখতে। আমি আপনাকে একটা সুযোগ দিতে পারি মাস তিনেকের জন্যে। এই তিনমাসে আপনাকে কাজ শিখতে হবে। ব্যাপারটায় অন্য কোন পরীক্ষার দরকার হয় না। কাজের ধরন দেখেই বোঝা যায়। আপনি রাজি?'

'আমাকে কী কাজ করতে হবে?'

'এজেন্সির সব কাজ। ক্লায়েন্ট ভিজিট, কাগজগুলোর সঙ্গে নেগোসিয়েশন, দরকার হলে কপি রাইটিং, এভরিথিং। তিনমাস পরে আমরা কথা বলব।'

তিস্তা চুপ করে থাকল একটু। তারপর বলল, 'কিন্তু আমি কেন?'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'আপনি খুব সন্দেহ করতে ভালবাসেন?'

'না। জীবন আমাকে এটা শিখিয়েছে।' তিস্তা চোখ তুলে তাকাল।

'আই সি। বেশ, তাহলে আপনাকে খুলেই বলি। আপনি যেখানে কাজ করেছিলেন সেখানে

আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের আত্মীয় কাজ করেন। তাঁর কাছে আপনার পদত্যাগের গল্পটা শুনে সে আমাকে জানিয়েছিল। এমন ঘটনা আজকাল রোজ রোজ ঘটে না। আমি আপনার সম্পর্কে খবর নিলাম। এই অফিস থেকেই সেসব পাওয়া গেল।'

'আপনি তো আমাকে চেনেন না।'

'আপনি প্রেসিডেন্সির ছাত্রী, ইংরেজি নিয়ে পড়েছেন। দ্যাটস অল।

আসলে কোন মেয়ে জীবনের নানান অড্‌সের বিরুদ্ধে লড়ছে জানলে আমার খুব ভাল লাগে। আমার মা সেটা করতে পারেননি। তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন শাশুড়ির গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে। ওকে! কী মনে হচ্ছে?'

'আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।'

'অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্যি। একটা কথা, আপনি যদি জয়েন করেন তাহলে ইউ আর টু টেক কেয়ার অফ ইউরসেল্ফ। আমাদের কাজ হল ক্লায়েন্ট জোগাড় করা যে বিজ্ঞাপন দিতে চায়। আমাদের কাজটা সহজ নয় কারণ প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয়ত, ক্লায়েন্টকে এমনভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে যে সে স্যাটিসফায়েড হয়। আর সব ক্লায়েন্ট যে আপনার বাবা, ভাই বা বন্ধু এমন মনে করার কারণ নেই। তাকে না চটিয়ে নিজেকে কীভাবে দূরে রাখবেন সেটা আপনার ব্যাপার। কোম্পানি আপনাকে স্বাধীনতা দেবে সন্ধের পরে কাজ না করার। কোনো ক্লায়েন্ট সেই সময়ে আপনাকে ডাকলে আপনি ইচ্ছে করলে রিফ্যুজ করতে পারেন। ডিটেইলস কাজে এলে জানতে পারবেন।'

তিস্তা ভাবছিল। বোঝাই যাচ্ছে তারের ওপর দিয়ে হাঁটতে হবে তাকে। চ্যালেঞ্জটা নিলে কেমন হয়? হঠাৎ সোজা হয়ে বসল সে, 'বেশ, চেষ্টা করে দেখি।'

হঠাৎ এক অদ্ভুত জগতে ঢুকে পড়ল তিস্তা। স্পেস, সেন্টিমিটার, কলম, কালার, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ইত্যাদি শব্দ অন্যরকম মানে নিয়ে এল জীবনে। কলকাতার সব কটা দৈনিক এবং চালু সাপ্তাহিকের বিজ্ঞাপন দর ঠোঁটস্থ রাখতে হল। প্রথম দিন তাকে এক প্রবীণ ভদ্রলোককে সাহায্য করতে বলা হয়েছিল যিনি বিজ্ঞাপন আদায় করার ব্যাপারে প্রবাদ-পুরুষ। পরিচিত হবার পরে সেই ভদ্রলোক যার নাম চিত্তহরণ দত্ত সংক্ষেপে সি আর বলেছিলেন, 'দ্যাখো বাবা, গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে মানুষ যখন বিজ্ঞাপন দেয় তখন নিশ্চয়ই সেটা সে প্রয়োজনে করে। তার প্রয়োজন নেই এমন সময়ে হাজারবার গেলেও তুমি বিজ্ঞাপন পাবে না। কিন্তু তুমি যদি সেইরকম সময়ে তাকে এই গল্পটা শোনাতে পার তাহলে কাজ হতে পারে।'

তিস্তা জিজ্ঞাসা করল, 'কী রকম?'

'সেটা যুদ্ধের সময়। এক মাখন কোম্পানির প্রোডাকশন বন্ধ। বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বের হচ্ছে। সেসময় কোম্পানিতে স্ট্রাইক অথবা লকআউট চলছিল বলেই প্রোডাকশন হচ্ছিল না। কিন্তু ওই বিজ্ঞাপনের দৌলতে চাহিদা বহুগুণ বেড়ে গেল। ফলে তারপরে কারখানা খুললে মাল বাজারে এলে দেখা গেল আগের চেয়ে অনেক বেশি বিক্রি হচ্ছে। বিজ্ঞাপনে মাখন কোম্পানি যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলেছিল।' সি আর বলছিলেন, 'ক্লায়েন্ট বিজ্ঞাপন দেবে কাগজে। আমরা মাঝখানে। আমাদের কর্তব্য সেই বিজ্ঞাপনকে সাজিয়ে দেওয়া, কখন কোথায় দিলে সেটা বেশি কাজে লাগবে তা বোঝানো। এর জন্যে প্রথমে যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হল ক্লায়েন্টকে মনে করিয়ে দেওয়া সে খুব মূল্যবান মানুষ।'

তিন মাস বাদে চাকরিটা পাকা হয়ে গেল তিস্তার। অর্থাৎ একটি বিশেষ স্কেলে মাইনে পাওয়ার জন্যে উপযুক্ত বিবেচিত হল। বিজ্ঞাপন জগতের চাকরি কখনই সরকারি চাকরির মত পাকাপাকি নয়। যেকোনো মুহূর্তে উভয়পক্ষের কাজ ছাড়িয়ে এবং ছেড়ে দেবার স্বাধীনতা আছে। যাঁরা সত্যি

কাজ জানেন তাঁদের জন্যে সবকটা বিজ্ঞাপন সংস্থার দরজা খোলা আছে সবসময়।

বাইরে ঘোরাঘুরি, ক্লায়েন্ট সার্ভিস, কাগজের অফিসে ছোটার কাজের চেয়ে বিজ্ঞাপনের কপি লেখা, দরকার মত ক্যাপসন তৈরির কাজ তিস্তার বেশি ভাল লাগছিল। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করে একসময় বাংলায় অনেক লেখালেখি হয়েছিল। সেগুলো সংকলিত করে একটা বড় কোম্পানি বই বের করতে চাইলে তিস্তা নামকরণ করে দিল, 'আক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ।' বিজ্ঞাপন কাগজে বের হওয়া মাত্র সকলেই নড়েচড়ে বসেছিল। প্রত্যেক সপ্তাহে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা একটা কোম্পানি হোর্ডিং রেখেছিল নিজেদের প্রচারের জন্যে। সরাসরি তার প্রোডাকশনের কথা না বলে অদ্ভুত ক্যাপসন লিখে প্রচার বাড়িয়ে দিল তিস্তা। প্রতি সপ্তাহে সেটা পাল্টাতে হত। মাথা ঘামানোর এই কাজে সে এখন অনেক স্বচ্ছন্দ।

যে কোনো কাজেই কিছু ঝামেলা থাকে। ক্যাপসন অ্যাপ্রুভ করাতে প্রায়ই তাকে ক্লায়েন্ট ভিজিট করতে হয়। সে লক্ষ্য করেছে সত্যিকারের ব্যবসামনস্ক মানুষ তাকে বিরক্ত করে না। চাকরি করা কর্তারা কাজের শেষে ঘুরিয়ে প্রস্তাব করেন, 'তাজের ডিনারে ফ্রায়েড চিকেন খেয়েছেন? অপূর্ব!' সে না বললেই সরাসরি প্রস্তাব। কেউ কেউ একটু মোটা ধরনের, 'চলুন না, আজ একটু ডিনার খাওয়া যাক। আপনাদের এত কাজ দিচ্ছি অথচ আপনি আমাকে দেখছেন না।'

প্রথম প্রথম অস্বস্তি, অপমানবোধ প্রবল হয়ে উঠলেও শেষপর্যন্ত এগুলোকে চমৎকার পাশ কাটাতে শিখে গেল তিস্তা। দু বছর বাদে আর একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপন সংস্থার কাছ থেকে চাকরির আমন্ত্রণ পেল। তদ্দিনে তিস্তার নিয়োগকর্তাও কলকাতা ছেড়ে বোম্বে চলে গেছেন। যে কৃতজ্ঞতাবোধ তিস্তা লালন করত তা ততদিনে বেশ কমে এসেছিল। জানিয়ে শুনিয়ে চাকরির জায়গা পরিবর্তন করল সে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সে তখন মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত।

এই রকম একটা সময় ঘটনাটা ঘটল। শনিবার অফিসের এক সহকর্মিনীর বাড়িতে গিয়েছিল তিস্তা নেমন্তন্ন রাখতে। ভদ্রমহিলা থাকেন সল্ট লেকে। বেরুতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। বাস ধরে উল্টোডাঙায় নেমে ট্রেনে উঠবে। এমন কিছু বেশি সময় লাগার কথাও নয়। বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে তার পা ধরে গেল তবু বাসের দেখা নেই। এই এলাকা এত নির্জন যে দ্বিতীয় কোনো মানুষের দর্শন পাওয়া যাচ্ছিল না। অন্ধকার পাতলা চাদরের মত জড়িয়ে রেখেছে, রাস্তার আলোকে। এমন সময় একটা প্রাইভেট গাড়িকে ছুটে আসতে দেখল সে হেড লাইট জ্বালিয়ে। গাড়িটা তার সামনে দিয়ে চলে যেতে যেতে হঠাৎ ব্রেক কষল। তরপর পিছিয়ে আসতে লাগল।

প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল তিস্তা। সল্টলেকে মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব নিয়ে সে অনেক গল্প শুনেছে। গাড়ির লোকগুলোর মতলব নিশ্চয়ই ভাল নয়। কী করবে সে যখন ভেবে পাচ্ছিল না তখন গলা কানে এল, 'কেমন আছ?'

তিস্তা চমকে উঠল। স্টিয়ারিং-এ সুমিত বসে আছে, একা। সুমিত তার দিকে তাকিয়ে আছে। স্বাস্থ্য বেশ ভাল হয়ে গেছে সুমিতের। সেই সুমিত যে চারমিনার খেতো, কথা কম বলত কফি হাউসে। সেই সুমিত যে তাকে অনুসরণ করে হোস্টেলে যেত, সেই সুমিত যে বলত ভালবাসার জন্যে লক্ষ মাইল হেঁটে যাওয়া যায়। হঠাৎ বুক মুচড়ে উঠল। তার শরীরের সর্বত্র যেসব জলকণা ছিল তা একত্রিত হয়ে হঠাৎ বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করল দুচোখ বেয়ে। মুখে হাত চেপে কান্নার শব্দটাকে আড়াল করতে পারল না তিস্তা। অভিমানী এক শিশুর মত সল্ট লেকের নির্জন বাসস্টপে দাঁড়িয়ে সে কেঁদে যেতে লাগল। তার নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছিল। সব বাধা ভাঙা নদীর মত একূল ওকূল একাকার হয়ে যাচ্ছিল। সম্বিত এলেও সে কিছুতেই নিজেকে সামলে নিতে পারছিল না। সুমিত বসেছিল গাড়িতে, চুপচাপ। তার মুখ তিস্তার দিকে ফেরানো।

যখন তিস্তা নিজেকে কিছুটা সামলে নিতে পারল, এইরকম আকস্মিক কান্নার জন্যে তার মনে লজ্জা এল ঠিক তখন সুমিত কথা বলল, 'আমায় লিখে না দিলে বেলেঘাটার জমিটা তো বিক্রি করতে পারবে না। কি লিখে দেবে?'

বেত্রাঘাত কি তা এ জীবনে জানা হয়নি। কিন্তু আজ তিস্তার মনে হল তার যন্ত্রণা নিশ্চয়ই এর কাছে সামান্য। সে হঠাৎ উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল অন্ধের মত। কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে তা জানা নেই। কিন্তু একটা নরপশুর দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার জন্যে সে দ্রুত হেঁটে চলেছিল। সুমিত অবশ্য পিছু ধাওয়া করেনি। চলে যাওয়া গড়ির আওয়াজ কানে আসতে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল তিস্তা। সেই অন্ধকারে হঠাৎ প্রচণ্ড রাগ হল নিজের ওপর। কি বোকা সে? কোন কান্না এতদিন কার জন্যে এমন গোপনে বুকের খাঁচায় মজুত রেখেছিল?

ব্যাপারটা নিয়ে পরে সে অনেক ভেবেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় রাস্তায় বা অন্য কোথাও সুমিতকে দেখলে নিশ্চয়ই সে কাঁদত না। কান্নার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। ওই ঘটনার এক মুহূর্ত আগেও কেউ প্রশ্ন করলে সে হেসে উড়িয়ে দিত। তাহলে কান্নাটা এসেছিল কেন? কান্না এমন বিনা নোটিস দিয়ে আসে কখন? কেন সেই মুহূর্তে বিয়ের আগের দিনগুলোর কথাই মনে আসছিল? বিয়ের পর স্বপ্নভঙ্গের ঘটনাগুলো আড়ালে চলে গিয়েছিল কেন? জবাবটা সে পায়নি। এটা এমন ব্যাপার কাউকে বলা যায় না। বাবাকেও নয়।

নার্সিংহোম থেকে নোনা চন্দনপুকুরের বাড়িতে যাওযার কোনো কথাই উঠতে পারে না। অরিত্র এবং বাবা ওকে নিয়ে গেল শ্যামনগরে। ষষ্ঠীপুজো হল। প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হল দিনরাত। মা বললেন আজ বিধাতা পুরুষ মেয়ের কপালে ভবিষ্যৎ লিখে যাবেন। তিস্তা জিজ্ঞাসা করল, 'সেটা তো জন্মানো মাত্র নাকি লেখা হয়!'

মা মাথা নাড়লেন, 'না। আজ ষষ্ঠীপুজোর পর লেখা হবে!'

'কী লিখবেন?'

'আশ্চর্য! আমি জানব কী করে? যাতে ভাল কিছু লেখেন তাই প্রার্থনা কর।'

'কোনো লাভ হবে না।'

'বেশি বুঝে গেছিস!'

'হ্যাঁ মা। বিধাতার একটা ছাপা ফর্মুলা আছে। মেয়ে জন্মালেই তার কপালে সেই ফর্মুলাটাকে ছেপে দেন। তবে ভদ্রলোক খবর রাখেন না যে দিন পাল্টে যাচ্ছে দ্রুত। নিজেদের কপালের লেখা মুছে দেবার ক্ষমতা মেয়েরা নিজেরাই অর্জন করে নিচ্ছে। তোমার নাতনিকে নিয়ে তাই আমার কোনো চিন্তা নেই।'

একটা পরিবর্তন দেখতে পেল তিস্তা। মেয়ের জন্যে অরিত্র যেন চনমন করে। চন্দনপুকুরে থাকলেও অফিসে যাওয়ার সময় ফেরত পথে শ্যামনগর ঘুরে না গেলে তার চলে না। পনেরো কুড়ি দিনেই টিয়াও যেন বাবার স্পর্শ বুঝে ফেলল। এই ব্যাপারটা তিস্তার খুব ভাল লাগছিল। কোনো মেয়ে যদি বাবার ভালবাসা না পায় তাহলে তার জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ অপূর্ণ থেকে যাবে।

মাসখানেক বাদে ফিরে এল সে চন্দনপুকুরে। সঙ্গে মা এল। কাজের মেয়েটা বাবার দেখাশোনা করতে পারবে। শ্যামনগর থেকে চন্দনপুকুর এমন কিছু দূরে না যে ইচ্ছে হলেই বাবা চলে আসতে পারবে না। মা এল তিস্তাকে গুছিয়ে দিয়ে যেতে। আজকাল অরিত্র তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে আসে। সে নাকি একজনের সঙ্গে সাময়িক ভাবে ডিউটি বদল করেছে। এখন সর্বত্র বেশ সুখ সুখ ভাব ছড়ানো।

বাবার ইচ্ছে ছিল তিস্তা ইংরেজি ভাষায় অধ্যাপনা করুক। অঙ্কের নিয়ম মেনে জীবন চললে হয়তো এতদিনে সে তাই করতে পারত। বিজ্ঞাপন জগতে সে যখন মোটামুটি অভ্যস্ত তখনই বাড়িতে একটা চিঠি এল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে। দীর্ঘকাল আগে করা কার্ডেব অনুকূলে প্রথম চাকরিব পরীক্ষায় বসার আমন্ত্রণ। চাকরিটা ট্যুরিস্ট ব্যুরোয়। পাকা সরকারি চাকরি। সে বিজ্ঞাপনসংস্থায় যা পাচ্ছিল তার থেকে কম কিন্তু নিশ্চিত জীবন। বাবা বলেছিলেন, 'সোনার জামার চেয়ে সুতোর জামা অনেক আরামদায়ক। এখানে যে টেনশন নিয়ে তোকে কাজ করতে হচ্ছে, যে রাঘববোয়ালদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তা থেকে তো বেঁচে যাবি।' কথাটা মনে ধরেছিল। সিরিয়াস হয়ে পরীক্ষা দিয়েছিল। তারপর ইন্টারভিউ-এর ডাক এবং চাকরি পাওয়া সহজেই হয়ে গেল। কোনো টেনশন নেই। যাঁরা আসছেন তাঁদের পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রের হদিশ দেওয়া, খালি থাকলে ট্যুরিস্ট লজে ঘর বুক করে খবর পাঠানো। এই তো কাজ। মেয়ে হবার জন্যে তিন মাস সবেতন ছুটি তাও তো ওই সরকারি চাকরির দাক্ষিণ্যেই।

লোক রাখতে হল টিয়াব জন্যে। মায়ের পক্ষে বাবাকে ছেড়ে বেশিদিন থাকা সম্ভব নয়। কাজের মেয়েটিকে মা বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন শ্যামনগর। তার তিন দিন বাদেই টিয়ার পেট খারাপ। পায়খানা যেন বন্ধ হতে চায় না। যমে-মানুষে টানাটানি। যখন সুস্থ হল মা বলল, 'তোমাদের এখানে থাকলে ও নির্ঘাত মরে যাবে। তোমরা যে যাই বল আমি ওকে আমার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

প্রথম সমর্থন এল অরিত্রর কাছ থেকেই। মেয়ে কোথায় ভাল থাকবে তা যেন সে বুঝে গিয়েছিল। অতএব মেয়ে চলে গেল শ্যামনগরে। কয়েকটা দিন খুব খারাপ কেটেছিল তিস্তার। মন কেমন করত খুব। অফিস থেকে বারাকপুরে না নেমে চলে যেত সে শ্যামনগরে। সেখান থেকে ফিরতে রাত সাড়ে নটা। পরিশ্রম হত কিন্তু মেয়েকে দেখতে পাওয়ার আনন্দের কাছে সেটা কিছুই নয়।

মেয়ে হবার পর থেকে অন্য একটা চিন্তা তিস্তাকে বিব্রত করত। চিন্তা অরিত্রর আচরণ নিয়ে। শরীরে সন্তান আসার পর থেকেই সে এমন একটা ভাব করতে লাগল যে কাছাকাছি গেলে তিস্তার ক্ষতি হয়ে যাবে। হাস্যকর ওই ভাবনাটাকে কিছুতেই তিস্তা অরিত্রর মন থেকে সরাতে পারেনি। টিয়া জন্মাবার পর সে যখন সুস্থ হয়ে অফিস করছে তখনও অরিত্র নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। নিত্যনতুন ফন্দী আঁটতে লাগল সে। শেষ ট্রেনে বাড়ি ফেরা, তিস্তার ঘুম না ভাঙিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়ায় ও যেন স্বস্তি পেত। ছুটির দিনে তিস্তা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার ব্যাপার কী?'

'কেন?'

'তুমি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছ!'

'বাঃ, কোথায় এড়ালাম। আসলে আমার চাকরিটা এমন –।'

'তোমার আর শরীরে চাহিদা নেই, না?'

'তা নয়, আসলে– –।'

'তোমার খারাপ লাগতে পারে, আমি একজন মানুষ। কাচের পুতুল নই। স্বামীর সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক থাকলে আমিও এসব আশা করতে পারি।'

'তিস্তা, ব্যাপারটা, সত্যি বলছি, আর আমাকে টানে না।'

'টানে না?'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে আমি তোমার কাছে আকর্ষণহীন হয়ে গেছি?'

'না, না, তুমি নও। আমি নিজেই– –।'

'ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন?'

'ডাক্তার?'

'হ্যাঁ। তোমার বয়সে এটা অ্যাবনর্মাল, ব্যাপার!'

'ও।'

'তুমি ডাক্তার দেখাবে।'

'আশ্চর্য! আমি ডাক্তারের কাছে গিয়ে কী বলব?'

'তোমার প্রব্লেমটা বলবে।'

'দূর। আমার লজ্জা করে।'

'আমি এসব বাজে কথা শুনতে চাই না।' তিস্তা কড়া গলায় কথাগুলো বললেও কেমন দুর্বল হয়ে পড়ছিল। বিয়ের পর একদম স্বাভাবিক ছিল যে মানুষ সে মেয়ের জন্মানোর পর এমন পাল্টে যেতে পারে? তিস্তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। সে বলল, 'আমরা বিয়ে করেছিলাম কেন তোমার মনে আছে?'

'তা থাকবে না কেন?'

'আমরা পরস্পরের সঙ্গ চেয়েছিলাম।'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু কী পাচ্ছি? আমি অফিসে বেরুবার সময় তুমি ঘুম ওঠো। আমি রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ার পর তুমি বাড়িতে ঢোকো। চমৎকার সম্পর্ক। আমি এই সম্পর্ক কখনও চাইনি। বিয়ে না করলে কী তফাত হত?'

'হত। আমাদের একটা মেয়ে থাকত না।'

'সেই মেয়েকে মানুষ করছে আমার মা। তোমার বা আমার সেই কাজটা করার ক্ষমতা হচ্ছে না। অথচ বিয়ের আগে তুমি রোজ ছুটির পর দেখা করতে।'

'ও, দ্যাখা হত। দ্যাখো, বিকেলে ঘণ্টা দেড়-দুয়েকের জন্যে অফিস থেকে কেটে পড়া যায়। এই সময় কাজের প্রেসার কম থাকে। এই সময় এখনও আমি তোমার সঙ্গে কলকাতার রেস্টুরেন্ট কফিহাউসে দেখা করতে পারি। কিন্তু এই সময়ে চন্দনপুকুরে এসে আবার ফিরে যাওয়া কি সম্ভব? তুমি বলো!' অরিত্র জবাব দিয়েছিল।

হয়তো ঠিক। যুক্তি মানুষকে অনেক আড়াল এনে দেয়। সেই যে বিখ্যাত কথা, হৃদয়ের নিজস্ব কিছু সমস্যা আছে যা কখনই মস্তিষ্ক বুঝবে না। অরিত্র এখন মস্তিষ্কের শরণাপন্ন হৃদয়কে সরিয়ে দিতে। কিছু করার নেই। জীবনকে জীবনের মত মেনে নেওয়া ছাড়া বেঁচে থাকা যায় না।

অফিসে আবার যাতায়াত শুরু করার দিন দশেক বাদে এক বিকেলে টেলিফোনটা এল। স্বপ্না এসে বলল, 'তিস্তা, তোমার ফোন।'

উঠে রিসিভার তুলল তিস্তা, 'হ্যালো!'

'আমি কি তিস্তা সেনের সঙ্গে কথা বলছি?' একজন মহিলার গলা।

'হ্যাঁ। আপনি?'

'আমার নাম বললে আপনি চিনতে পারবেন না। আমি ইন্টারন্যাশন্যাল এক্সপোর্ট এজেন্সিতে কাজ করি। অফিসটা খাদি গ্রামোদ্যোগের পাশে। তিন তলায়।'

'ও। কেন ফোন করছেন।'

'আমার নাম নীলিমা সেন।'

'ও।'

'চিনতে পারেননি নিশ্চয়ই।'

'না।'

'আমি আপনাকে অনেকদিন আগে টেলিফোন করতে পারতাম। করিনি। কারণ আমি অপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম। আপনার তো একটা বাচ্চা হয়েছে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে আপনার কী প্রয়োজন'

'প্রয়োজন আছে। এখন থেকে আপনি আর আপনার মেয়ে আমার দয়ায় বেঁচে থাকবেন। আমি ইচ্ছে করলে আপনাদের রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি।'

'কী বলছেন?' তিস্তা কিছুই বুঝতে পারছিল না।

'বোঝার চেষ্টা করুন। আমি নীলিমা সেন। অরিত্র সেনের বিবাহিতা স্ত্রী। আমাদের ডিভোর্স হয়নি। বিয়ের পর যেকোনো কারণে আমরা একমত ছিলাম না। চোরের মত অরিত্র আমাকে ছেড়ে দিয়ে আপনাকে বিয়ে করেছে। ওর খুব বাচ্চার শখ। ও বাচ্চা যাতে পায় তাই অপেক্ষা করেছি এতদিন। এখন আমি ইচ্ছে করলে ওকে জেলে পাঠাতে পারি। হাতকড়া দিয়ে থানায় পাঠাতে পারি। ওর জীবন আমার হাতে। আর আপনি? আপনার বিয়েটাই অবৈধ। আপনার সন্তান জারজ সন্তান। কিন্তু এসব আমি করব না। এখন তো নয়ই। শুধু এই ভেবে আনন্দ পাব যে আপনারা আমার দয়ায় বেঁচে আছেন।' খট্ করে লাইনটা কেটে গেল ওপার থেকে।

শেষ কথাগুলো যেন কানে ঢুকছিল না। কোনো শব্দই আর আলাদা করে মানে তৈরি করছিল না। চোখের সামনেটা সাদা। তিস্তা ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল। সহকর্মীরা ছুটে এল অবস্থা দেখে। জল হাওয়ার ব্যবস্থা হল। বাচ্চা হবার পর ট্রেনযাত্রার ধকলের জন্যে এমনটা হয়েছে বলে ধারণা হল অনেকের। স্বপ্না টেলিফোন করল আকাশবাণীতে। অরিত্র বিব্রত গলায় বলল, 'সেকি? কেমন আছে? ও। কিন্তু এখন আমার রেকর্ডিং চলছে, বেরুবো কী করে? আচ্ছা দেখি।'

স্বপ্নার খুব রাগ হয়ে গেল। তিস্তার চেতনা ফিরে আসতেই সে পাথরের মত বসে রইল। স্বপ্না যখন অরিত্রর কথা বলল তখন একবার মুখ ফেরালো মাত্র। একটু একটু করে শক্তি ফিরে এল শরীরে। সহকর্মীদের আপত্তি গ্রাহ্য না করে তিস্তা রাস্তায় পা রাখল।

এখন তার কেবলই মনে হচ্ছিল এসব মিথ্যে। বানানো। কেউ তাকে যন্ত্রণা দেবার জন্যে গল্পটা করেছে। অরিত্রর মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার। ডিভোর্স না হলে তিনি কখনই বিয়েতে অনুমতি দিতেন না। সে আকাশবাণীর দিকে হাঁটতে লাগল। কথাটা মিথ্যে তা অরিত্রর মুখে না শুনলে সে বিশ্বাস করতে পারবে না। আকাশবাণীর কাছে পৌঁছে ওর হঠাৎ মনে পড়ল ব্যাপারটা যখন সত্যি তখন অরিত্রকে প্রশ্ন করা মানে ওকে অপমান করা নয়? না, সে প্রশ্ন করবে না। শুধু ফোনের ব্যাপারটা জানিয়ে দেবে।

রিসেপশনে আজ বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না তিস্তাকে। হন্তদন্ত হয়ে অরিত্র ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে তোমার?'

'কিছু না।'

'আমাকে তোমার অফিস থেকে বলল তুমি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছ। মুখচোখ তো বলছে শরীর খারাপ। কী হয়েছে?'

'একটু মাথা ঘুরে গিয়েছিল।'

'কেন? খাওয়া-দাওয়ার গোলমাল হয়েছে?'

'না।'

'ডাক্তার দেখেছে?'

'তার দরকার হয়নি। এখন ঠিক হয়ে গেছে।'

'ও। তাহলে দাঁড়াও, দেখি ছুটি ম্যানেজ করতে পারি কিনা।'

'অরিত্র।'

'বলো।'

'আজ একটা অদ্ভুত টেলিফোন পেলাম।'

'তাই নাকি? কী ব্যাপার?'

'তোমার প্রথম স্ত্রীর নাম নীলিমা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'সে আবার এর মধ্যে আসছে কেন?'

'যে ফোন করেছিল সে নিজের নাম বলল নীলিমা সেন।'

'নীলিমা ফোন করেছিল তোমাকে? যাঃ, বিশ্বাস করি না।'

'আমিও না। কেউ মিথ্যে ফোন করেছে।'

'কী বলল সে?'

'বলল তোমাদের ডিভোর্স হয়নি। বলল, এখন থেকে তার দয়ায় আমরা বেঁচে থাকব। আমাদের বিয়েটা অবৈধ। টিয়া জারজ সন্তান। উঃ। কে এই মহিলা? আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।'

অরিত্র চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তিস্তা বলল, 'নীলিমা কি ইন্টারন্যাশন্যাল এক্সপোর্ট এজেন্সিতে চাকরি করে?'

'হ্যাঁ।'

'ওর টেলিফোন নাম্বার জানো?'

'কেন? কী হবে?'

'ওঁকে ফোন করব। আমি জানতে চাইব টেলিফোনটা ও করেছিল কিনা!'

অরিত্র বলল, 'ছেলেমানুষী করো না। ও তোমাকে অপমান করতে পারে!'

'করুক। কিন্তু আমি ওর মুখেই শুনতে চাই টেলিফোনটা ও করেনি।'

অরিত্র ঘড়ি দেখল। তারপর বলল, 'এখন ওদের ছুটি হয়েছে।'

তিস্তার এটা খেয়ালে ছিল না। সে খুব হতাশ হল। অরিত্র বলল, 'এ নিয়ে বেশি টেনসন করো না। তুমি কি একা বাড়িতে যেতে পারবে?'

'হ্যাঁ।' তিস্তা এগোল। তাকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল অরিত্র। খুব আন্তরিক গলায় বলল, 'তুমি যদি এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে পার তাহলে আমি ম্যানেজ করে বেরিয়ে পড়তে পারি।'

তিস্তা মাথা নাড়ল। অরিত্রকে সরাসরি প্রশ্নটা করতে ইচ্ছে করছিল ওর। কিন্তু পারল না। বারংবার কি একটা বাধা হয়ে যাচ্ছিল। একা বাসে স্টেশনের দিকে যেতে যেতে তিস্তার মনে হল অরিত্র নিজেও তো একবারও কথাটা অস্বীকার করল না! কেন করল না? মানুষটা কি কোনো কিছুতেই আর রিঅ্যাক্ট করে না?

সরাসরি শ্যামনগরে চলে এসেছিল সে! মা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী হয়েছে?'

'কিছু না।' তিস্তা টিয়ার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। টিয়া ঘুমাচ্ছে।

'কিছু একটা হয়েছে তা তোকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে!'

তিস্তা জবাব না দিয়ে নিচু হচ্ছিল, মা বাধা দিল, 'না। বাইরের জামাকাপড় হাত ধুসনি, এইটা কখনও করবি না।'

বাথরুমে ঢুকে মিনিট পনেরো শরীরে জল ঢেলেও শান্তি নেই। স্নানের শেষে মেয়ের পাশে এসে শুয়ে পড়ল সে। একদম পুতুল পুতুল চেহারা হয়েছে মেয়েটার। নাকটা ভারি মিষ্টি। হঠাৎ বুকের মধ্যে কাঁপুনি আসতেই মেয়ের গায়ে হাত রাখল তিস্তা। না, হতে পারে না, কক্ষণো নয়।

কথাগুলো কাউকে বলা যায় না। এমন কি বাবা মাকেও নয়। তিস্তাকে যারা ভালবাসে তারাই চমকে উঠবে। রাত্রে ফিরে গেল তিস্তা। মা ঠেলেঠুলে পাঠাল। অরিত্র বাড়ি ফিরে খাবার পাবে না। সাড়ে নটায় বাড়িতে ঢুকে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। সে খুব আশা করেছিল আজ অরিত্র তাড়াতাড়ি ফিরবে। কিন্তু তার বদলে মিসেস চক্রবর্তী এলেন, 'অরিত্রবাবু টেলিফোন করেছিলেন। আজ রাত্রে ফিরতে পারবেন না। সমস্ত কর্মচারীকেই স্পেশ্যাল ডিউটি দেওয়া হয়েছে। আপনার শরীর খারাপ হয়েছে শুনলাম।'

'কে বলল?'

'উনিই বললেন।'

'এমন কিছু না।'

'কাজের মেয়েটাকে পাঠিয়ে দেব?'

'না, না। ঠিক আছি।'

সকাল নটায় যখন তিস্তা তৈরি তখন অরিত্র এল। ঝড়ো কাকের মতো চেহারা। বলল, 'দিল্লি থেকে একটা জরুরি অ্যানাউসমেন্ট করার কথা ছিল। মিনিস্ট্রি ভেঙে যেতে পারত গতকাল। তাই সবাইকে থাকতে হয়েছে। তুমি কেমন আছ?'

'ভাল। নীলিমার টেলিফোন নম্বরটা বলবে?'

'ওঃ। এখনও ওই ভূত তোমার মাথা থেকে যায়নি।'

'যায়নি উল্টে গলার দিকে হাত বাড়িয়েছে।'

'বিশ্বাস করো, কত বছর হয়ে গেল, এক্সচেঞ্জ নম্বরও বদলে গিয়েছে, আমার কিছুই মনে নেই। আগে টু থ্রি ছিল।'

'এলাম।'

অরিত্র ওর দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু কিছু বলছে না। তিস্তা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল। তারপর আচমকাই ঘুরে হনহন করে হাঁটতে লাগল।

অফিসে বসে টেলিফোন গাইড থেকে নম্বরটা বের করল তিস্তা। তারপর একটু নার্ভাস হয়েই টেলিফোন করল। ওপাশে অপারেটর ধরতে সে নীলিমা সেনকে চাইল। মেয়েটি বলল, 'উনি আজ দেরিতে আসবেন। লাঞ্চের পর করুন।'

অস্বস্তি আরও বাড়ল। তিস্তার আর তর সইছিল না। সে তার কাজও ঠিক মত করতে পারছিল না। লাঞ্চ হতেই টেলিফোনের কাছে চলে গেল সে। এবার অপারেটার লাইনটা দিল। হাত কাঁপছিল তিস্তার। সে কি নিজের পরিচয় দেবে? অরিত্র বলেছে তাকে অপমানিত হতে হবে। নাকি গলার স্বর গতকালের মত হলেই রিসিভার নামিয়ে রাখবে?

'হ্যালো। নীলিমা সেন বলছি।'

ফাঁপরে পড়ে গেল তিস্তা। এই গলা কি? সে বুঝতে পারছিল না।

'হ্যালো!'

তিস্তার গলা থেকে শব্দ বের হয়ে এল, 'হ্যালো!'

'হ্যাঁ বলুন, কে বলছেন?'

'আমি তিস্তা। একটু বিরক্ত করছি। গতকাল কি আপনি ফোন করেছিলেন?'

'কেন? সন্দেহ হচ্ছে?' আমি করেছিলাম। এবং যা বলেছিলাম সব সত্যি। আমাকে যদি তোমরা বিরক্ত না করো তাহলে আমি আগ বাড়িয়ে কিছু করব না। কিন্তু করতে পারি।'

'আপনি আপনি বলছেন অরিত্রর সঙ্গে—।'

'তুমি আমার অফিসে আসতে পার।' টেলিফোনের লাইন কেটে গেল।

শরীর আবার গতকালের মত ঝিম ঝিম করতে লাগল। কিন্তু আজ সামলে নিতে পারল সে। অফিস থেকে অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তখনই। হেঁটে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। মিশন রো এবং গণেশ অ্যাভিন্যুর হকারঠাসা ফুটপাত ধরে কী ভাবে হেঁটেছিল রোদ মাথায় নিয়ে তা নিজেরই খেয়াল নেই।

একটা পার্টিসন দেওয়া খুপরিতে নীলিমার টেবিল। আর পাঁচজনের থেকে যখন আলাদা তখন পদে মর্যাদা আছে। সেখানে উপস্থিত হতে নীলিমা হাসল, 'তুমিই তিস্তা, বসো। তুমি বলছি বলে কিছু মনে করো না।'

অরিত্রর প্রথম স্ত্রীকে অবাক হয়ে দেখছিল তিস্তা। চল্লিশের কাছেই বয়স। প্রচণ্ড প্রসাধন, জামা সংক্ষিপ্ততম। ভদ্রমহিলাকে ঈশ্বর যে তেমন সৌন্দর্য দেননি সেটা না মানতে চাওয়ার ঘোষণা চড়া গলায় করা হয়েছে। তিস্তা বসল।

'বলো। টেলিফোনে কী বলছিলে? এক সেকেন্ড, চা খাবে?'

'না।'

'বেশ। হ্যাঁ—।'

'আপনাদের ডিভোর্স হয়নি?'

'একদম না।'

'আপনি সত্যি বলছেন?'

'মিথ্যে বলার কোনো কারণ নেই। ডিভোর্স হলে অরিত্র কাগজ দেখাতে পারে। এটা তো জলের মত পরিষ্কার।' নীলিমা হাসল।

'আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'গতকাল অরিত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলে?'

'না।'

'জিজ্ঞাসা করলেও জবাব পেতে না। যে জবাব দিতে ওর অসুবিধে হত সেটা ও দিত না। মুখ বুজে থাকত। অন্তত আমার সময়ে তাই দেখেছি।'

তিস্তা ভদ্রমহিলাকে দেখল। মানুষের কোনো কোনো স্বভাব আদৌ বদলায় না একথাটা বলার প্রয়োজন মনে করল না।

'অরিত্র যে আবার বিয়ে করতে যাচ্ছে তা আপনি জানতেন?'

'জেনেছিলাম।'

'আশ্চর্য! জেনেও আপনি চুপ করেছিলেন?'

'কী করতাম? যে লোক দুপুরবেলায় চুপি চুপি চোরের মত স্যুটকেশ গুছিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় তাকে আমি কী বলতাম? দোহাই, এমন কাজ কোরো না?'

'আপনার বিরুদ্ধে ওর কোনো মামলা শুরু হয়নি?'

'না। সেটা করতে গেলে যে উৎসাহ থাকা দরকার তাও ওর ছিল না। বরাবর অন্যের ওপর নির্ভর করেই ওর চলেছে। যখন ওর চাকরি ছিল না তখন আমিই ওকে চালিয়েছি। আমাকে ওর পছন্দ হত না সেটা ওর প্রব্লেম।'

'আপনাদের নাকি কোনো মিল হয়নি?'

'না। সেই কারণেই আমি ওর সন্তানের মা হতে চাইনি।'

'আমাদের বিয়ে হয়েছে অনেকদিন। এতটা সময় চুপ করে ছিলেন কেন?'

'আগে আমি থানায় ডায়রি করলে অরিত্রকে ধরে নিয়ে যেত! কেস হত, জেলও হত। তুমি নতুন করে জীবন শুরু করতে পারতে। এখন তোমাদের সন্তানের জন্যে সেসব সম্ভব নয়। এটাই আমার জয়।'

'আপনি কী চাইছেন?'

'আনন্দ।'

'মানে?'

'প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে আমার ওপর যে অন্যায় হয়েছিল এখন তার প্রতিশোধ নিতে পারি। নিচ্ছি না দয়া করে। এটাই আনন্দ।'

'আমি, আমি আপনার কোনো কথাই বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'ঠিক আছে। অরিত্রর মায়ের কাছে তুমি তো একবার গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি তোমাকে বরণ করে ঘরে তোলেননি কেন?'

'পারিবারিক প্রব্লেমের কথা বলেছিলেন।'

'না। কারণ অরিত্র ছেড়ে চলে এলেও আমি এখন পর্যন্ত ওই বাড়িতেই আছি। ওঁর দেখাশোনা আমিই করছি। ছেলেকে তিনি যতই স্নেহ করুন যা কিছু যত্ন আমার কাছেই পাচ্ছেন। এ অবস্থায় তোমাকে ওই বাড়িতে যেতে বলেন কী করে?'

'কী বলছেন আপনি? উনি সব জানতেন?'

'না জানার তো কিছু নেই।'

দুহাতে মুখ ঢাকল তিস্তা, 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। উনিও আমার সঙ্গে প্রতারণা করলেন? উনি—'

'স্নেহান্ধ মহিলা। আমার খাচ্ছেন, আমার পরছেন আর প্রায়ই ছেলেকে দেখতে চাইছেন। আমি বলেছিলাম ছেলের কাছে যান। তা যাবেন না।'

'আপনি সেই থেকে অরিত্রদের বাড়িতেই আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'অরিত্র আপনাকে ছেড়ে যাওয়ার পরেও থাকতে পারছেন?'

'কেন পারব না? সে যেতে পারে কিন্তু আমার আইডেন্টিটি তো নষ্ট হয়নি। আমি অরিত্র সেনের আইনসম্মত স্ত্রী। ওর সব কিছুর ওপর আমার অধিকার আছে। আর বুড়িটাকে দেখার জন্যেও আমার থাকা দরকার ছিল।'

আমি অরিত্র সেনের আইনসম্মত স্ত্রী। পাঁচটা শব্দ। একটা বিশাল বর্শার মত বিদ্ধ করল তিস্তার হৃদপিণ্ডকে. আমি কে? কেউ নয়? রক্ষিতা। বেআইনি বউ? অসম্ভব। তিস্তা উঠে দাঁড়াল 'আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।'

'কী? ও, আমাদের বাড়ি? যাও। দেখবে আমার একটা লাল ম্যাক্সি ভেতরের বারান্দায় শুকোচ্ছে। আমার একটা কথা ভাবতেঅবাক লাগছে, বিয়ের আগে তুমি ওর কাছে ডিভোর্সের কাগজপত্র দেখতে চাওনি কেন?'

তিস্তা দাঁড়াল না। প্রশ্নটার জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করল না। নিচে নেমেই সে ট্যাক্সি নিল। শেষ সত্যিটা নিজের চোখে দেখতে চায় আজ। কেন দেখতে চাইনি সেদিন কাগজপত্র! অরিত্রও চায়নি তার কাছে সুমিতের সঙ্গে বিচ্ছেদের প্রমাণপত্র দেখতে। কে চায়? বিশ্বাসটাকে প্রথম দিনেই

মেরে ফেলে যন্ত্রের জীবন কাটাতে পারে কজন?

দরজার কড়া নাড়ল তিস্তা। তৃতীয়বারে সাড়া এল। দরজা খুললেন অরিত্রর মা। প্রথমে বোধহয় চিনতে অসুবিধে হচ্ছিল। কিন্তু চিনতে পারামাত্র উনি উচ্ছ্বসিত হলেন, 'এসো মা, এসো। কতদিন পরে তোমায় দেখলাম।'

নিজেকে কোনমতে সংযত করে তিস্তা জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছেন?'

'আর থাকা! ট্রেনে উঠে বসে আছি কিন্তু ট্রেন ছাড়ছে না। দিনরাত ডাকছি ঠাকুর নিয়ে নাও। তিনি তো কালা, শুনবেন কেন? ছেলে কেমন আছে?' তিস্তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনার ছেলে খারাপ থাকবে কেন?'

'তোমার হাত পড়েছে। আমি তখনই জানি তুমি ওকে অযত্ন করবে না। আগের বউ তো শাকচুন্নি। উঠতে বসতে কথা শোনাতো গো।' বৃদ্ধার হঠাৎ খেয়াল হল, 'তা এদিকে এসেছিলে বুঝি? তাই দেখা করে গেলে! ভালই করেছ। দুপুরবেলায় আমি একাই থাকি। সময় কাটতে চায় না।'

'অন্যসময় কে থাকে?'

'কেন? খোকার বড় বউ?'

তিস্তা শক্ত হয়ে গেল। আর কিছু জানার নেই। বলার নেই। বৃদ্ধা বলে চললেন, 'সে তো এ বাড়ি থেকে কোথাও যায়নি। সংসার তো তার টাকায় চলছে। মুখ করে খুব, শাকচুন্নি বলি আর যাই বলি, খরচাপাতি তো সে-ই করে। তা তোমার মনে নেই? খোকা তোমাকে এখানে এনেছিল এক দুপুরে, আমি বলে দিয়েছিলাম তোমাদের এ বাড়িতে থাকা চলবে না। মনে নেই?'

'বলেছিলেন। কিন্তু অজুহাতটা ছিল আপনারা কনজারভেটিভ, তাই।'

'আর কীভাবে বলব বাপু। সতীন নিয়ে ঘর করবে কেন বলা কি ঠিক?'

'আপনি জানতেন আমরা বিয়ে করব!'

'জানতাম তো। খোকা আমাকে বলে গিয়েছিল। আমি বলেছিলাম যাতে তুই সুখ পাস তাই কর। এই বউ তোকে সুখ দেবে না তা বুঝে গিয়েছি।'

'আপনি জানতেন না আপনার খোকা ডিভোর্স করেনি।'

'ওমা। তা কেন করবে! ডিভোর্স মানে তো ছাড়াছাড়ি আইন থেকে করিয়ে দেবে। তাহলে বড় বউ এখানে থাকবে কী করে!'

'ডিভোর্স না করেই আমাকে বিয়ে করছে তাও জানতেন?'

'হ্যাঁ। আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না বাপু।'

'আপনি সত্যিই বুঝতে পারছেন না?'

'না। পুরুষমানুষ যদি দুটো বিয়ে করে তাহলে অন্যায় কী!' বৃদ্ধা মাথা নাড়লেন, 'আমার ঠাকুর্দার দুটো বিয়ে ছিল। আমার বাবাও দুই বিয়ে করেছিলেন।'

'আপনি জানেন না হিন্দু বিবাহ বিল পাস হবার পর স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ আইনসম্মতভাবে না করে দ্বিতীয়বার বিয়ে করা যায় না?'

'তাই নাকি? ওমা! না, না। ভুল বলছ। ওই যে সিনেমার নায়ক, কি যেন, ধর্মেন্দ্র, সে তো বউ বাচ্চা থাকা সত্ত্বেও হেমামালিনীকে বিয়ে করেছে। এই বিয়ে তো সবাই মানছে। ছেলেপুলেও তো হয়েছে বলে শুনছি। কী যে বল। আসলে তোমাদের মধ্যে ভাব থাকলেই হল, পাড়ার কে কী বলছে বয়ে গেল। এসব কথা আবার বড় বউমার সামনে বলা যাবে না। চা খাবে?'

নোনা চন্দনপুকুরে আজকাল সন্ধে থেকেই ঝুপ করে রাত নেমে যায় না। কোথাও কোথাও নিত্যে মাইক বাজে আর তার সুর কানের পর্দায় ক্রমাগত আঘাত করে যায়। অন্ধকার ঘরে চুপচাপ বিছানায় চিত হয়ে পড়ে থাকা তিস্তা আবিষ্কার করল সেই মাইকগুলোও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

ঘুম নেই। দুটো চোখ আজ একদম খটখটে শুকনো। নিঃশ্বাসের কষ্ট ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতি নেই। একটা দিন না একটা জীবন। কি অদ্ভুতভাবে কেটে গেল। এখন শুধু অবিত্রর ফেরার জন্যে অপেক্ষা করা।

রাত বাড়ছে। অন্ধকারে ঘড়ির কাঁটা দেখল সে। বারোটা দশ। খুটখাট শব্দ এল কানে। তালা খোলা হচ্ছে। এটা কোনো চোর করতে পারে। করুক। তিস্তা একটুও নড়ল না। আলো জ্বলল বসার ঘরে। এ ঘরে পায়ের শব্দ। একটু থমকাল। তারপর নীল আলোটা জ্বলে উঠল। তিস্তা মুখ ফেরাল।

অবিত্র অবাক হল। তাকে খুব বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল, 'ঘুমাওনি?'

'তোমার সঙ্গে কথা বলব অবিত্র।'

'হ্যাঁ, বলো।' অবিত্র একপা এগোতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল।

'তুমি নীলিমাকে ডিভোর্স করেছিলে?'

নিঃশ্বাস ফেলল অবিত্র। তারপর হেরে যাওয়া গলায় বলল, 'পারিনি।'

'পারোনি?' চিৎকার করে উঠল তিস্তা, 'তুমি আমাকে মিথ্যে বলেছিলে?'

অবিত্র চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। উত্তেজিত তিস্তা ছুটে গিয়ে ওর জামা আকড়ে ধরল, 'চুপ করে থাকলে আমি ছাড়ব না। তুমি আজ আমায় কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছ? বল, কেন মিথ্যে বলেছিলে? চিট।'

অবিত্র নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল না। তিস্তা আরও খেপে গেল 'বোবার মত দাঁড়িয়ে থেকো না। এটা তোমার পুরনো কায়দা। এ কায়দা আর মানব না। বল, কেন আমাকে চিট করেছ?'

'আমি তোমাকে ঠকাতে চাইনি।'

গায়ের সমস্ত জোর একসঙ্গে করে ঠেলে দিল তিস্তা অবিত্রকে। ছিটকে পড়ে যেতে যেতে কোনোরকমে নিজেকে সামলাতে পারল অবিত্র। কিন্তু আলমারির কোণায় কনুই ঠুকে যাওয়ায় সে খুব ব্যথা পেল। অন্য হাতে জায়গাটাকে আঁকড়ে ধরে অবিত্র সোজা হল, 'তোমার সঙ্গে আলাপের সময় আমি জানতাম নীলিমা ডিভোর্স মামলায় কনটেস্ট করবে না। শেষপর্যন্ত ও সেটা করল। কাগজপত্র দেখতে চাইলে দেখাতে পারি। ও বলেছিল ডিভোর্স দেবে না বটে কিন্তু আমি যেখানে ইচ্ছে গিয়ে থাকতে পারি, ও আমাদের বাড়িতেই থাকবে, যাকে খুশি তাকে বিয়ে করতে পারি ও কোনো আপত্তি করবে না। সেই সময় তুমি বিয়ের কথা বলছিলে। আমি অনেক ভেবেছি। সত্যি কথা বললে তুমি আমায় কখনই বিয়ে করতে না। নীলিমার সঙ্গে আমার শারীরিক বা মানসিক কোনো সম্পর্ক ছিল না। আমার দ্বিতীয় বিবাহতে ওর কোনো আপত্তি নেই। তাই আমি তোমাকে হারাতে চাইলাম না। আমি ওই ছোট্ট মিথ্যে কথা বলেছিলাম।'

'ছোট্ট মিথ্যে! বাঃ। এক চামচ সায়োনাইড।'

'তুমি একটু বেশি উত্তেজিত হচ্ছ।'

'মানে? হোয়াট ডু ইউ মিন?' বিস্ময় ছিটকে বের হল তিস্তার গলায়।

'নীলিমার সঙ্গে আমার আইনসম্মত ডিভোর্স হয়নি এ কথা ঠিক কিন্তু ডিভোর্সের বাকি কী আছে? আমাদের মনের কোনো সংযোগ নেই। আমরা কেউ পরস্পরের জন্যে ভাবি না। যেহেতু সে ওই বাড়িতে আছে তাই আমি মায়ের সঙ্গে সেখানে গিয়ে দেখা করি না। মায়ের সঙ্গে দেখা হয় অন্য আত্মীয়ের বাড়িতে। তিনি কখনই ওই বাড়ি ছেড়ে আসবেন না। তোমার কাছে এগুলোর কোনো মূল্য নেই?'

'ছিল।'

'ছিল? এখন নেই?'

'না। তুমি যদি নিজে থেকে স্বীকার করতে, বলতে মিথ্যে বলেছ, কষ্ট হলেও আমার ভাল লাগত। এখন তোমার নীলিমা আমাকে খাঁচায় পুরে লোহার শিক দিয়ে খোঁচাচ্ছে, এইসময় তুমি স্বীকার করলে আমার কী এসে যায়!'

'নীলিমা তোমাকে শাসিয়েছে?'

'কেন? কী করবে? বউকে ধরে মারবে?'

'ও আমায় কথা দিয়েছিল এরকম করবে না।'

'কথা দিয়েছিল। নীলিমা তোমার সব খবর রাখে। তোমার মাতৃদেবী একবার ওর দিকে একবার—। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না তোমার মা কি করে বিয়ের আগে এত বড় সত্যিটা আমার কাছে চেপে গেলেন। কী লাভ হল তাঁর? ছিঃ।' হঠাৎই কান্নাটা এল। চেষ্টা করতে লাগল তিস্তা সেটাকে লুকিয়ে রাখতে। না, সে কাঁদবে না। কিছুতেই না।

'টেক ইট ইজি তিস্তা। আমি তো বদলাইনি। আমাদের সম্পর্ক তো মিথ্যে নয়। ভুলে যাও টেলিফোনটার কথা। তুমি যদি চাও তাহলে আমি নীলিমার কাছে গিয়ে বলতে পারি ও যেন প্রতিশ্রুতি মনে রাখে।'

'না। নেভার। কারো করুণাকে আমি ঘেন্না করি।' উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল তিস্তা।

বুকের ভেতর লক্ষ চিতা শব্দ করে পুড়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর কোথাও বিশ্বাসের জমি নেই। একা ভাবতে ভাবতে ক্রমশ পাগলের মত মনে হচ্ছে নিজেকে। দাঁড়াতে গেলেই মাথা ঘুরে যাচ্ছিল, নিঃশ্বাস ভারী, যেন একটা লোহার বল গলার নিচে ঝুলছে। সকালে বাথরুম থেকে ঘুরে এসে তিস্তা আবার বিছানায় পড়েছিল। তার মাথা যেন কাজ করছিল না।

আজ অরিত্র তাড়াতাড়ি উঠেছে। হয়তো ঘুমায়নি রাত্রে। কিন্তু সকাল হতেই সে কোনোরকমে চা তৈরি করে তিস্তার জন্যে এক কাপ এনেছে। তিস্তা তাকিয়ে দেখেছে কিন্তু স্পর্শ করেনি। আজ অফিসে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। দুটো মানুষ দু'ঘরে চুপচাপ বসেছিল। এই সময় তিস্তার বাবা হঠাৎ এলেন। আজকাল বয়সের কারণে খুব কম বের হন ভদ্রলোক। নাতনির জন্যে যা কিছু ছোটাছুটি।

অরিত্র দরজা খুলে দিয়েছিল। ভদ্রলোক স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কি হে, তোমাদের খবরাখবর কী?'

অরিত্র জবাব দেয়নি। মাথা নিচু করেছিল। সেটা লক্ষ্য না করে ভদ্রলোক ভেতরের ঘরের দরজায় পৌঁছে মেয়েকে দেখতে পেলেন, 'একি রে! তৈরি হসনি; বেরোবি না?'

তিস্তা অপলক তাকিয়ে রইল।

তিস্তার বাবা এগিয়ে এলেন, 'কী হয়েছে? শরীর খারাপ নাকি?'

তিস্তা খুব নিচু গলায় বলল, 'বাবা!'

'হ্যাঁ। দেখি জ্বর এসেছে কিনা।' কপালে হাত রাখলেন তিনি, 'একটু গরম লাগছে বটে তবে এখনও আসেনি। চোখ মুখ বসে গেছে, রাত্রে ঘুমাসনি?'

'বাবা, বসো।' তিস্তা স্পষ্ট বলল।

ভদ্রলোক বেশ অবাক। বিছানার পাশে রাখা চেয়ারটায় ধীরে ধীরে তিনি বসলেন। তিস্তা বলল, 'অনেকদিন আগে একবার আমার জন্ডিস হয়েছিল। আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। যখন প্রায় ভাল হয়ে উঠেছিলাম তখন তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলে। আমি সেদিন জবাব দিতে পারিনি। বলেছিলাম পরে দেব। তুমি আমাকে কী জিজ্ঞাসা করেছিলে মনে আছে বাবা?'

ভদ্রলোক চুপচাপ মেয়েকে দেখছিলেন, এবার মাথা নেড়ে না বললেন।

'আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে যে শিক্ষায় আমি বড় হয়েছিলাম তাতে কী করে অমন করেছিলাম। বাবা, আমি এখনও বুঝতে পারি না কেন ভুল হয়। কেন আমি পুরুষমানুষের কাছে বারবার প্রতারিত হই! একজন পুরুষ যখন স্বামী বা প্রেমিক তখন সে যেরকম বাবা হলে সে পাল্টে যায় কি? বাবা, তুমি তো পুরুষমানুষ, তুমি কোনো নারীকে কি প্রতারণা করেছ?'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তিস্তা চোখ সরাচ্ছে না। যেন এই প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত ওইভাবে অপেক্ষা করবে। বাবা বললেন, 'মানুষের ধর্ম হল নিজের স্বপক্ষে কথা বলা। আমাকে যে সবচেয়ে বেশিদিন ধরে জানে তাকে জিজ্ঞাসা কর।'

'তুমি মায়ের কথা বলছ?'

'এ ছাড়া আর কে আছে!'

'কিন্তু মায়ের সঙ্গে তোমার অনেক অমিল।'

'ওই তো সত্যি কথা বলতে পারবে।'

'বাবা, আমি বুঝতে পারি না।'

'কী হয়েছে তোর?'

'বাবা, তুমি আমার পাশে এসো। এইখানে।' হাত বাড়াল তিস্তা।

তিস্তার বাবা বিছানায় উঠে বসে মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন, 'কী হয়েছে মা?'

'বাবা, আমি আবার ঠকে গেলাম।'

'ঠকে গেলি?'

'হ্যাঁ। আমার কোনো লিগ্যাল স্ট্যাটাস নেই। আমি, আমি জাস্ট রক্ষিতা।'

'কী বলছিস তুই?' চিৎকার করে উঠলেন বৃদ্ধ।

'হ্যাঁ বাবা। অরিত্রর আগের বিয়ে এখনও আইনসম্মত। ওদের ডিভোর্স হয়নি।'

'মাইগড! ও তাহলে বিয়ে করল কী করে?'

'আমি জানি না, কিস্যু জানি না। আমার কথা ভাবি না, টিয়ার কী হবে?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। দাঁড়া। অরিত্র, অরিত্র,?' বৃদ্ধ ডাকলেন।

অরিত্র ঘরে এল। মুখ গম্ভীর। বৃদ্ধ বললেন, 'ও কী বলছে?'

'হ্যাঁ বাবা। ঠিকই। কিন্তু তিস্তা একটু বেশি আপসেট হয়ে পড়েছে।'

'তুমি কী বলছ?'

'আসলে আমি সত্যি কথাটা বলতে পারিনি কারণ ওকে হারাতে চাইনি। সেদিন ওকে যেমন ভালবাসতাম আজও তেমনি ভালবাসি। আমার আগের বিয়ে বাতিল হল কি হল না তাতে কি যায় আসে। স্বামী হিসেবে আমি তিস্তার পাশে আছি আন্তরিকভাবে। আর, আর রিস্ক তো আমারই বেশি।'

'মানে?'

'আমার বিরুদ্ধে নালিশ পেলে পুলিশ আমাকে অ্যারেস্ট করবে। এটা আমার অজানা ছিল না। তবু কেন এমন ঝুঁকি নিয়েছিলাম তা তিস্তাকে ভাবতে বলছি।'

'তোমার লোভ, লোভের জন্যে মিথ্যে বলেছ তুমি। সেদিন ভেবেছিলে নীলিমা কথা রাখবে। কখনও বিরক্ত করবে না। তুমি গায়ে হাওয়া লাগাতে পারবে।'

'হ্যাঁ। এখন এমন ব্যাখ্যা করা যায়!'

তিস্তার বাবা মাথা নাড়লেন, 'কী অন্যায় করেছ ভাবো। এই বিয়ে যদি আইনের স্বীকৃতি না পায় তো টিয়ার কী হবে?'

'আমি বুঝতে পারছি না। আমি মরে যাইনি, টিয়ার সঙ্গে আছি এবং থাকব। ওর বাবা বেঁচে থাকতে কেন আপনারা এসব ভাবছেন?' অরিত্র গলা তুলল।

'বাবা ঠিকই বলেছেন। নীলিমাকে ডিভোর্স না করলে আমি আর তোমার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে পারব না।'

'নীলিমা সেটা দিতে রাজি হয়নি।'

'আমি জানি না। যেমন করে হোক রাজি করাও।'

'তারপর?'

'তারপর আমরা আবার বিয়ে করতে পারি টিয়ার জন্যে।'

'যদি তোমার পরিকল্পনা মত সব ঠিকঠাক করতেও পারি তবু তাতে একটা অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে না কি?'

তিস্তার বাবা বললেন, 'তিস্তা তো ঠিকই বলছে।'

'না। ঠিক বলছে না। আমাদের বিয়ের সময় টিয়ার বয়স কত হবে?'

তিস্তা মাথা চাপড়ালো, 'ওঃ, ভগবান।'

অরিত্র বলল, 'তা ছাড়া ডিভোর্স পেতে সময় লাগবে। নীলিমা কনটেস্ট না করলেও। যেমন ছিল তেমন থাকলেই—।'

'না।' তিস্তা চেঁচিয়ে উঠল, 'তেমন থাকবে না। আমি তোমার রক্ষিতা নই অরিত্র। বাবা. তুমি একজন ল-ইয়ারের খবর নাও। আমি দেখা করব।'

বাবা উঠে দাঁড়ালেন, 'তোর কি পুলিশের কাছে যাওয়ার ইচ্ছে আছে?'

'ল-ইয়ার যা বলবেন!'

'তুই কি আমার সঙ্গে যাবি?'

'এখন না।'

'কেন?

'টিয়ার দিকে তাকাতে পারব না।'

'তুই বিকেল চারটের সময় বারাকপুর স্টেশনে আয়। আমি দেখছি।' বৃদ্ধ বাইরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই অরিত্র তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'বাঃ। আপনি মেয়েকে শেষপর্যন্ত এই বোঝালেন?'

বৃদ্ধ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। 'দ্যাখো অরিত্র। আমি পুরনো দিনের মানুষ। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না কোনো মেয়ে কোনো ছেলের থেকে একটুও কম। আমার মেয়েকে যেভাবে বড় করেছিলাম তাতেও সে দু-দুবার ভুল করল। তুমি ওকে প্রতারণা করে যে অবস্থায় নিয়ে গিয়েছ তাতে এখন আর কিছু বলার মুখ নেই। তিস্তার উচিত থানায় গিয়ে তোমার নামে ডায়েরি করা। কিন্তু টিয়ার কথা ভাবতে হচ্ছে আমাদের।'

অরিত্র বলল, 'আমি সব বুঝতে পারছি, আপনারা আমাকে সময় দেবেন না?'

'সময়? কেন?'

'আমি এখন অনেক বছর নীলিমার সঙ্গে থাকি না। এইটে ডিভোর্স পেতে আমাকে সাহায্য করবে। আমাকে এটা করতে দিন।'

'আশ্চর্য। তোমার প্রথম স্ত্রী সেটা তো দিতে চান না। আজ চাইবেন কেন?'

'সেটা আমার ওপর ছেড়ে দি।'

'ঠিক আছে। তুমি তোমার মত দ্যাখো। তাড়াহুড়ো করে কোনো লাভ নেই। তবে তিস্তারও জানা দরকার সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে।' বৃদ্ধ মেয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আমি তোর জন্যে বারাকপুর স্টেশনে অপেক্ষা করব মা।'

অরিত্র ওঁকে দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে এসে বলল, 'ভদ্রলোককে এসব কথা না বললেই চলত না? এটা তোমার আমার ব্যাপার!'

তিস্তা বলল, 'আমাকে বিরক্ত করো না।'

'বাড়িতে রান্না হবে না?'

তিস্তা জবাব দিল না। অরিত্র চেষ্টা করল কাজের মেয়েটিকে দিয়ে কিছু খাবার তৈরি করিয়ে নিতে। তারপর রোজকার মত সে ঠিকঠাক অফিসে বেরিয়ে গেল। এতবড় একটা ঝড় বয়ে গেল অথচ ওর জীবনযাপনে কোনো পরিবর্তন নেই। তিস্তার মনে হচ্ছিল সে যে কত বড় বোকা তা অরিত্র তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। গতকাল সকালেও অরিত্র ছিল তার স্বামী। এই মুহূর্তে আর সেই সম্পর্কটাকে মানতে পারছে না। কেন? শুধু বিয়েটা বাতিল হয়ে গেল বলে? না নীলিমার দর্পভরা কথাগুলোর জন্যে। ওর করুণায় তাকে থাকতে হবে এখন থেকে। কী করতে পারে নীলিমা? পাঁচজনকে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলবে তাদের বিয়ে অবৈধ? বলুক। বিয়ের সার্টিফিকেটটা তো ছিঁড়ে ফেলতে পারবে না। ওই মুহূর্তে যেটা সত্যিভাবে গ্রহণ করেছিল সেটা তো সারা জীবনের সত্যি।

বারাকপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুই যেতে পারবি তো? শরীর কেমন লাগছে?'

'ঠিক আছি। গম্ভীর গলায় জবাব দিয়েছিল সে।

আর তার এক ঘন্টা বাদে দমদমের এক ল-ইয়ারের চেম্বারে বসে তিস্তা চোখ বন্ধ করল স্বস্তিতে। সত্যব্রতবাবু বলেছিলেন, 'এখন আইন পাল্টে গেছে। আপনার মেয়ে আর কোনো অবস্থাতেই জারজ সন্তান নয়। নার্সিংহোমের সার্টিফিকেটে তার বাবার নাম আছে, এই নামটা আপনাদের ম্যারেজ সার্টিফিকেটে পাওয়া যাবে। সুতরাং ওর জন্ম আইনসম্মত। যদি বিয়েটা নাও হতো তবু পিতৃত্ব প্রমাণ করতে পারলে আজকাল যে কোনো সন্তান লিগ্যাল রাইট পেতে বাধ্য। মিসেস সেন, আপনার মেয়ে অবৈধ সন্তান নয়।'

তিস্তার বাবা বললেন, 'অনেক উপকার করলেন কথাটা বলে। কিন্তু আমার মেয়ের কী হবে?'

সত্যব্রতবাবু বললেন, 'তিনটে পথ আছে। এক আপনি পুলিশকে জানাতে পারেন। প্রবঞ্চনা ও দ্বিতীয় অবৈধ বিয়ের জন্যে ওর জেল হতে পারে। কিন্তু তাতে কিছু লাভ হচ্ছে না। দ্বিতীয় পথটা হল, মিস্টার সেন তার আগের স্ত্রীকে যেকোনো ভাবে ডিভোর্স করুন। এটা উনি পারবেন না। করতে গেলে তাঁকেই জেলে যেতে হবে। তৃতীয় পথটাই সহজ। আপনারা স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে কোর্টের কাছে আবেদন করুন বিবাহ-বিচ্ছেদের। যৌথ আবেদন করলে ওই বিয়ে বাতিল হতে পারে। তারপর মিস্টার সেন আগের স্ত্রীর বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা আনুন। তখন তিনি মুক্ত। তাঁর বিরুদ্ধে আর কেস টিকবে না। ইতিমধ্যে অনেক বছর আলাদাও থেকেছেন, ডিভোর্স পেলে তিনি আবার আপনাকে বিয়ে করতে পারেন। আপনাদের বিয়েটাকে বাতিল করতে আর একটা পথ আছে। সাধারণত সই করা বিয়েতে সবসময় প্রত্যেকটা নিয়ম ঠিকঠাক মানা হয় না। নোটিসের সময় কম থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। সেইরকম একটা কারণ দেখিয়ে বিয়েটা বাতিল করলে মিস্টার সেনের প্রথম স্ত্রী কোনো অভিযোগই আনতে পারবেন না। তবে এসব করার আগে একটা দলিলে ভদ্রলোককে সই করতে হবে। তিনি এখনই লিখিতভাবে নিজের মেয়ের নামে তার যাবতীয় সম্পত্তির অর্ধেক লিখে দেবেন। উনি রাজি হবেন?'

তিস্তার বাবা বললেন, 'মনে হয় আপত্তি করবেন না।'

'তাহলে আমি কাগজপত্র তৈরি করে রাখব। আপনি তিনদিন পরে ওঁকে এখানে নিয়ে এসে

সইসাবুদ করে যাবেন।'

তিস্তা জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা আলাদা থাকতে পারি?'

'অবশ্যই। মিউচুয়াল হলেও আপনার আলাদা থাকা দরকার।'

'আমার কোনো স্বীকৃতি নেই, না?'

'কেবলেছে নেই। বিয়ের সার্টিফিকেট আপনার কাছে আছে। ওই বিয়ে আইনসঙ্গত বলেই আপনি জানেন। ডিভোর্সটা হবে। সেটাও আপনার স্বীকৃতি। আর কী চাই?'

ফিরে আসার সময় তিস্তার বাবা বললেন, 'তাহলে শ্যামনগরে চল।'

'আজ নয়।'

'কেন?'

'আজ ওর সঙ্গে কথা বলব।'

বৃদ্ধ আর কথা বাড়াননি।

শুধু অপমানবোধ ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতি নেই। বুকের ভেতর ভার হয়ে আছে সেই অনুভূতি। নিজেকে নষ্ট করতে ছিবড়ে করে দিতে যে ইচ্ছেটা প্রবল হচ্ছিল সেটা যেন নিস্তেজ। রাত গভীর হলে অরিত্র ফিরল।

ঘরে ঢুকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

তিস্তা যা শুনেছে বলে গেল।

অরিত্র বলল, 'বেশ তাই হবে।'

'তুমি বেঁচে যাবে। আমাদের বিয়েটা বাতিল হয়ে গেলে আমি অথবা নীলিমা আর তোমাকে বিপদে ফেলতে পারব না।'

'হয়তো। কিন্তু এর ফলে আমি নীলিমার কাছ থেকে মুক্তি পাব।'

'তারপর?'

'আমি সিনসিয়ারলি যা চাই, তোমার সঙ্গে সম্পর্কটাকে আইনসঙ্গত করে নেব। টিয়াকে ছেড়ে থাকতে পারব না আমি।'

'তুমি কি এই বাড়ি রাখবে?'

'কেন?

'আমি কাল শ্যামনগরে চলে যাব।'

'ও। না। আমার পক্ষে একা থাকা সম্ভব নয় এখানে।'

'কোথায় থাকবে জানিয়ে দিও।'

'আমি তো শ্যামনগরে যাবই।'

'না।'

'না মানে?'

'যতদিন তুমি নীলিমার কাছ থেকে মুক্তি না পাচ্ছ ততদিন ওখানে যাবে না!'

'সে কি? টিয়াকে দেখতে পাব না?'

'না।'

'এতে তো সময় লাগবে।'

'লাগুক। তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।' তিস্তা হাসল, অনেকক্ষণ পরে হাসি এল, 'তুমি তো টিয়ার জন্মানোর খবরে খুশি হওনি।'

'ওঃ। ওটা একটা সাময়িক প্রতিক্রিয়া।'

'জানি না। তোমাকে যোগ্য হতে হবে।'

রাত আরও বাড়ল। অরিত্র আজ পাশের ঘরে। হঠাৎ তিস্তার মনে কথাটা এল। টিয়া শরীরে আসার পর থেকে অরিত্র যে আচরণ করেছে, যে শীতলতা দেখিয়েছে সেটা কি ওর অপরাধবোধ থেকে তৈরি হয়েছিল? ও কি ভেবেছিল সেই সন্তান জারজ হবে? নিজেকে গুটিয়ে নেবার তো অন্য কোনো কারণ নেই। তিস্তার মনে হচ্ছিল অরিত্র তাঁকে দু-দু'বার প্রবঞ্চনা করেছে।

আজ চোখে ঘুম নেই। কিন্তু অদ্ভুত এক স্বপ্নের ঘোরাফেরা আছে চোখে। তারা আলাদা হল। অরিত্র আর তার কেউ নয়। অরিত্র নীলিমার বিরুদ্ধে মামলা করল। ধরা যাক জিতেও গেল। তারপর একদিন এল তার কাছে ফিরে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। সেই দিনটার জন্যে অপেক্ষা করবে সে। এখন প্রতিদিনের বেঁচে থাকা সেই মুহূর্তের জন্যে। খুব স্পষ্ট গলায় সে জবাব দেবে, 'না। আর নয়।'

সারা শরীরে না শব্দটিকে নীরবে বহন করতে লাগল তিস্তা। শুধু নির্দিষ্ট সময়ে সেটি ছুড়ে দিলে যে বিস্ফোরণ হবে তার নাম পুনর্জন্ম।

শ্যামনগর থেকে শেয়ালদা আর কতদূর? রাণাঘাট, কল্যাণী কিংবা নৈহাটি ধরলে হুস করে চলে আসা। কিন্তু ট্রেনগুলো যখন প্ল্যাটফর্মে এসে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে দাঁড়ায় তখন প্রায়ই এক অদ্ভুত হতাশায় আক্রান্ত হয় তিস্তা। মানুষে মানুষে ঠাসাঠাসি কামরাগুলোয় কোথাও এক চিলতে ফাঁক নেই। প্ল্যাটফর্মের ঠিক যে জায়গায় লেডিস কামরা এসে দাঁড়াবে সেটাও এখন জানা। নৈহাটি লোকাল ছাড়া সেটার অবস্থা একই রকম। প্রথম প্রথম ট্রেন ছেড়ে দিত সে। পরেরটার জন্যে অপেক্ষা করত বাধ্য হয়ে। ফলে অফিসে পৌঁছাত যথেষ্ট দেরিতে। কথা শুনতে হত। আর তা থেকেই মরিয়া ভাবটা মনে এল। আপাতচোখে যেখানে তিলমাত্র জায়গা নেই সেদিকেই ছুটে যাওয়া। কোনোমতে হাতল আঁকড়ে ধরলে জমাট ভিড় তাকে গিলে নেবেই। শারীরিক সংঘর্ষের জন্যে যে সংকোচ এতদিন ছিল প্রয়োজনের চাপে তা ওই মুহূর্তে উধাও। যাতায়াত ঠিক সময়ে করে হলে তোমাকে লড়াই করতে যেতে হবে। আর সেই ঠাস মানুষের দঙ্গলে দাঁড়িয়ে এক ফোঁটা বাতাসের জন্যে সবাই যখন আকুলি বিকুলি করে তখন তিস্তার মনে হয় ঈশ্বর মানুষের সহ্যশক্তির কাছে নিজেই পরাজিত হয়েছেন।

শেয়ালদায় নেমে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাওয়া মানুষের মধ্যে যেন সাঁতরাতে সাঁতরাতে তিস্তাকে সার্কুলার রোডে পৌঁছে ট্রাম কিংবা বাসের প্রতীক্ষায় থাকতে হয় যেটা তাকে অফিসে পৌঁছে দেবে। গলদঘর্ম হয়ে যখন অফিসের চেয়ারটায় সে বসতে পারে তখন নিজেকে ছিবড়ে মনে হয়। শরীর এমন কাহিল যে মনের কোনো কষ্টই আর তীব্র হয় না। মাঝে মাঝেই মনে হয় যে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ পেটের খিদে মেটাতে দিনরাত পরিশ্রম করতে বাধ্য হয় তাদের মানসিক যন্ত্রণা অনেক কম। হয়তো দেখা যাবে তারা হৃদরোগে আক্রান্ত কদাচিৎ হয়!

প্রাথমিক ঝিমুনি কাটিয়ে কাজে ডুবে যেতে হয় তিস্তাকে। প্রতিমুহূর্তে মানুষ আসছে তাদের কাছে। এইসব মানুষেরা ক'দিনের জন্যে কলকাতা থেকে পালাতে চায়। বকখালি পারমাদান থেকে হলং দার্জিলিং, একটু জায়গা করে দিলেই যেন মুক্তির আনন্দ। প্রতিদিন এমন বেড়াতে উন্মুখ মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে তারও মনে হয় কোথাও গেলে হত। আর এমনটা মনে এলেই কষ্ট। তার পক্ষে আর কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। গত হেমন্তে বাবা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছে। অনেক চেষ্টায় তাঁকে এখন ঘরের মধ্যে লাঠি হাতে হাঁটানো সম্ভব হয়েছে। টিয়া এবার তিনে পড়বে। ওর জন্যে স্কুলের ব্যবস্থা করে রেখেছে মা। আর এদের সঙ্গে জড়িয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হবে। যতই মনে হোক এভাবে উদ্দেশ্যহীন বেঁচে কি লাভ তবু এ থেকে পরিত্রাণও নেই।

উদ্দেশ্যহীন শব্দটিতে প্রবল আপত্তি আছে মায়ের। টিয়াকে পৃথিবীতে নিয়ে আসার পর তিস্তার

যে দায়িত্ব বেড়েছে তাতে জীবন উদ্দেশ্যহীন বলা আর ঠিক নয়। টিয়াকে মানুষ করাটাই এখন অন্যতম উদ্দেশ্য হতে পারে।

কেন? মাঝেমাঝে প্রশ্নটা মনে চলে আসে তিস্তার। কেন টিয়াকে মানুষ করার দায়িত্ব শুধু তাকেই বহন করতে হবে? পৃথিবীর আদিকাল থেকে পুরুষেরা এই দায়িত্ব নারীদের ওপর ছেড়ে দিয়ে যেন ধন্য করেছে। মা এবং সন্তান নামক সম্পর্কটিকে আরও সেন্টিমেন্টাল করে সেই দায়িত্ববোধকে গভীরতর হতে সাহায্য করেছে। এসবই পুরুষেরা করেছে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে। টিয়ার দিকে তাকালে মাঝে মাঝেই একটা অস্বস্তি হয় তার। বড় হয়ে এই মেয়েও তার সঙ্গে ওর বাবার মত মিথ্যাচার করবে না তো! হামাগুড়ি, টলটলে পায়ে হাঁটার পর্বগুলো পেরিয়ে এসেছে টিয়া। তার দিদিমা তাকে বুঝিয়েছে বাবা অনেক দূর দেশে গিয়েছে। ওইটুকুনি মেয়ে বাবার ছবি দেখে আজকাল গাল ফোলায়। অভিমান মেয়েরা জন্মমাত্র আয়ত্ত করে ফেলে বোধহয়।

অরিত্র এই সময়ে বেশ কয়েকবার টেলিফোন করেছে তিস্তাকে। টিয়ার খবর জানতে চেয়েছে। তিস্তা একেবারে নিস্পৃহ গলায় যতটুকু বলার ততটুকু বলেছে। অরিত্র শামনগরে যেতে চাইলে সে স্পষ্ট নিষেধ করেছে। মেয়েকে দেখার জন্যে অরিত্র যতই ছটফট করুক তিস্তা এখন অনুমতি দিতে পারে না। তিস্তার বাবার শরীরের অবস্থার জন্যে দায়ী যে তাকে ওই বাড়িতে সে ঢুকতে দেবে কেমন করে! তাছাড়া যতক্ষণ অরিত্র নীলিমার কাছ থেকে ডিভোর্স না পাচ্ছে ততক্ষণ টিয়ার সঙ্গে দেখা করার কোনো অধিকার পাবে না।

এসব চাপ নিয়েই বেঁচে থাকা। অরিত্র এখন কোথায় থাকে সে-খবরও তার জানা নেই। নীলিমা তাকে ডিভোর্স দিতে সম্মত হয়েছে এমন একটা কথা একবার ফোনে বলেছিল। খবরটা সত্যি কি না তাও জানা নেই। আজকাল কোনো কিছুকেই সহজ ভাবে নিতে অস্বস্তি হয়। অরিত্র বলেছে নীলিমা ডিভোর্স দিতে পারে যদি সে একটা বড় অঙ্কের টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয়। টাকাটা জোগাড় করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে অরিত্র। কিন্তু যে করেই হোক জোগাড় সে করবেই। কদ্দিন করবে কীভাবে করবে তা জানতে চায়নি তিস্তা। হয়তো এ জীবনে নয়। হয়তো ওই মুক্তিপ্রাপ্ত জীবন অরিত্র নষ্ট করবে না। এখন তো আর জেলে যাওয়ার ভয় নেই।

মুক্ত তো তিস্তাও। সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত। আঠারো বছরে যে প্রেমের আবেগ তাকে দিশেহারা করেছিল জীবন তার অন্য চেহারা দিল। এখন পেছন দিকে তাকালে শুধুই হতাশা, নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসা। জীবনের শুরুতে যেসব স্বপ্ন চোখে থাকে, যে পদ্ধতিতে নিজেকে গড়ে তোলার সময় ভবিষ্যতের ছবি চোখে আঁকা হয় তার সঙ্গে যাপিত হওয়া জীবনের কোনো মিল নেই।

তবু এক একদিন হঠাৎ ঘুম ভাঙা ভোরে ছাদে উঠে পাতলা হয়ে আসা অন্ধকারে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে তিস্তার ভাল লাগা বোধটা ফিরে আসে। হঠাৎ মাঝরাত্তিরে টিভিতে পথের পাঁচালি দেখতে দেখতে মনে সুর জেগে ওঠে, ঘুমন্ত টিয়ার গায়ের গন্ধে নিজের শৈশব চমৎকার ফিরে আসে আর তখনই মনে হয় আগামীকালের জন্যে আজ বেঁচে থাকতে হবে।

নিজেকে খুব ভালবাসতে ইচ্ছে করে তখন।

অনুরাগ

●

মনীশ

●

ডানায় রোদের গন্ধ

●

মনের মতো মন

●

অহঙ্কার

●

দিন যায় রাত যায়